গ্রন্থাবলী সিরিজ

সৌরীন্দ্র গ্রন্থাবলী

(দ্বিতীয় ভাগ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
—বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে—
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

[মূল্য ১৷৽ দেড় টাকা।

সূচি-পত্র

সহিত এ লেখা মিলাইল। এ পাপিয়ার হস্তাক্ষর! ছবিখানায় কালি লেপা? এ'ও তবে তার কাজ!—অমল অবাক হইল। তার রাগ হইল। একখানি নিরীহ ছবি···তার প্রতি এ কি প্রচণ্ড বিদ্বেষ এই নারীর! অমল শিহরিয়া উঠিল।

বহুক্ষণ স্তম্ভিতভাবে বসিয়া থাকিবার পর সে শয্যায় গিয়া বসিল। বালিশটা কোলে লইতেই কি একটা হাতে ঠেকিল। একটা আংটি! তাতে মস্ত এক টুকরা চুনী পাথর বসানো, লাল টক্‌টক্‌ করিতেছে। এ পিয়ারীর আংটি! নিশ্চয় ফেলিয়া গিয়াছে! সর্ব্বনাশ!

অমল আংটি হাতে লইয়া বাগানের দিকে ছুটিল। মালীকে ডাকিয়া খবর লইয়া জানিল, বিবি সকালে একবার আসিয়াছিল বটে, কিন্তু সে চকিতের জন্য! বাগানে আসিয়া মুখ-হাত ধুইয়া একটু চা খাইয়াছে, তারপর একটা ভাড়া-গাড়ী কোথা হইতে আসিয়া ফটকে দাঁড়াইল, তিনিও অমনি সেই গাড়ীতে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছেন!

অমল চোখে অন্ধকার দেখিল। তাই তো, আংটিটা তাকে ফিরানো যায় কি করিয়া? রাখিয়া দিবে? যদি হারাইয়া যায়?···কি বিপদ্‌! মালীর কাছে রাখিয়া যাইবে? না। কি জানি, ছোট লোক—যদি গাপ্‌ করিয়া বসে! তার চেয়ে···ঠিক! সে মালীকে প্রশ্ন করিল,—বিবি কোথায় থাকে, ঠিকানা জানো?

মালী কৌতূহল-ভরা দৃষ্টিতে অমলের পানে চাহিল। অমল কহিল,—তাঁর কাছে আমার একটু দরকার আছে। তাঁর ঠিকানা জানো?

মালী একটু অবাক হইয়াই বলিল, ঠিকানা সে জানে। কাগজে লেখা আছে।

অমল কহিল,—দেখি।

মালী অমলকে লইয়া ঘরে গেল, এবং তার কালো কাঠের বাক্স খুলিয়া একটা গেঁজিয়া বাহির করিল। তার পর গেঁজিয়ার মধ্যে হাত পুরিয়া একটুক্‌রা কাগজ বাহির করিল। অমল সেই টুক্‌রা কাগজে লেখা ঠিকানাটা লইয়া বাগান ছাড়িয়া নিজের ঘরে ফিরিল।

ফিরিয়া সে তখনি আবার উঠিল। যাইবে কি সেখানে? কি জানি, এ-সব ব্যাপারের পর অভ্যর্থনা কেমন হইবে! যদি আবার এম্‌নি সব কথার বাণ সহ্য করিতে হয়? তেমনি মিনতি, তেমনি অশ্রুময় আবেদন··· কত লোকের সামনে···! যদি বিরোধ ঘটে? যদি বাবুরা তার এ-সব রহস্য বুঝিয়া তাকে নির্য্যাতন করে!

অমল হাসিল, এও কি সম্ভব! বাবুরা এ-সবের কিছু জানেও না! চরিত্রহীনা নারী! তার কি না সংযম! এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় নেশার ঝোঁকে কি সব বকিয়া গিয়াছে···তা কি তার নিজেরই এখনো মনে আছে! সে পাগল, তাই ঐ কথাগুলা লইয়া এ[illegible] করিয়া ভাবিয়া মরিতেছে! এ সব কিছু নয়—রঙ্গি[illegible] ক্ষণিক রঙ্গ, খেয়ালী নারীর মুহূর্ত্তের খেয়াল, [illegible] নেশা···! তাছাড়া আর কিছু নয়!

অমল স্থির করিল, দুপুর বেলায় সে যাইবে—এ[illegible] তো ছাত্র দুটিকে পড়ানো চাই। আংটিটা সযত্নে বা[illegible] তুলিয়া রাখিয়া সে ঘর বন্ধ করিল এবং ছাত্রদে[illegible] পড়াইবার জন্য বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু পড়াইবার মন কোথায়! কাণের কাছে ঝ[illegible] সেই বিকট গর্জ্জন, আর তার অন্তরালে সেই বেদন[illegible] আকুল আর্ত্ত স্বরে মিনতির ধারা···! অমলের চি[illegible] উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল।

দুপুরবেলায় সে ভাবিল, অত লোকের ভিড়ে, সে[illegible] কোলাহলের মাঝে সে যাইবে কি করিয়া! হয়তো [illegible] তার সহচর-সহচরী লইয়া কালিকার ঘটনাটা দুঃস্বপ্নে[illegible] ব্যাপার বলিয়া তাকে বিদ্রূপ-বাণে জর্জ্জরিত করি[illegible] সেখানে কত রঙ্গই করিতেছে! সে গেলে তখন[illegible] হয়তো তার কবিতাগুলিকে, তার মনের অতি-গোপ[illegible] গানকে কি খোঁচায় জর্জ্জরিত করিবে!—তার প্রস[illegible] লইয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িবে! না, না, তা সে স[illegible] করিতে পারিবে না! ছবি—একটা তুচ্ছ ছবিকে কালি লেপিয়া বিশ্রী কদর্য্য করিয়া দিয়া গেল! [illegible] অসাধ্য কি আছে!

অমল ভাবিতে লাগিল। তার শান্তি-ভরা বিজন [illegible] তার সহজ-তৃপ্ত সরল মন লইয়া নিশ্চিন্ত আরামে [illegible] বাস করিতেছিল, ঝড়ের মত পিয়ারী আসিয়া তার [illegible] ঘরে অশান্তি-বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়া, সে-মনে ঝ[illegible] তুলিয়া এ কি করিয়া গেল! অমল তো তার কা[illegible] কোন অপরাধ করে নাই। তবে? তার শান্তি-সু[illegible] এতটুকু আঘাতও কোনো দিন দিতে যায় নাই! ত[illegible] সে কেন এমন করিয়া অমলকে দারুণ বিশৃঙ্খলার মা[illegible] ফেলিয়া গেল! খেদে হতাশ্বাসে অমলের দুই চো[illegible] জল ঠেলিয়া আসিল।

৭

জল্পনা করিতে করিতে দুইটা দিন কাটিয়া গেল। বাহি[illegible] হইবে ভাবিয়া অমল যেই গৃহের দ্বারে আসিয়া দাঁড়া[illegible] অমনি কোথা হইতে যেন কারা আসিয়া তার দুই [illegible] জড়াইয়া ধরে, বলে, ছি, কোথায় যাও? সেই নির্লজ্জ অভিসারিকার কবলে গিয়া পড়িলে লাঞ্ছনার যে তোমা[illegible] সীমা থাকিবে না! অমলও দুশ্চিন্তার ভারে পীড়ি[illegible] হইয়া ঘরের দ্বারে বসিয়া পড়ে, আকাশের পানে চাহি[illegible] কত কি ভাবে,—দিনের সূর্য্য মাথার উপর দিয়া মধ্য গগনে উঠিয়া আবার কখন্‌ তারি মাঝে শ্রান্তিভ[illegible]

লোহিত কিরণচ্ছটায় ভরা দুই হাত বাড়াইয়া পশ্চিমের আকাশে ঢলিয়া পড়ে! তৃতীয় দিনে কিন্তু এ-সব বাধা-নিষেধ জোর করিয়া ঠেলিয়া সে পথে বাহির হইয়া পড়িল। কিসের লাঞ্ছনা! লাঞ্ছনা করে, করুক্! তা বলিয়া পরের আংটি নিজের কাছে এমন করিয়া আর রাখা চলে না! সে কি ভাবিতেছে!

অমল সেদিন সহরের পথে পথে ঘুরিয়া দুই-চারি-জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া একটা প্রশস্ত গলির মধ্যে ঢুকিয়া কয়-পা চলিয়া নির্দ্দেশ-মত যে-বাড়ীটার সামনে দাঁড়াইল, বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া দেখে, সে যেন এক রাজার প্রাসাদ! ফটকওয়ালা বাড়ী,—রাস্তার ধারে দোতলায় দীর্ঘ বারান্দা—বারান্দায় বাহারে থামের বুক চিরিয়া পরীর মূর্ত্তি বাহির হইয়াছে—আর সেই সব পরীর হাতে একটা করিয়া বিচিত্র গাছের ডাল, ডালে নানা লতা-পাতার আভরণের মাঝে টক্‌টকে লাল গোলাপ—আর সেই গোলাপের পাপ্‌ড়ির মাঝখানে ইলেক্‌ট্রিকের বাতি লাগানো। ফটকে একটা দরোয়ান বসিয়া আছে। অমল গিয়া ভয়ে ভয়ে দরোয়ানকে প্রশ্ন করিল,—এ বাড়ীতে পাপিয়া বিবি থাকে?

দরোয়ান অমলের বেশভূষা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। এই দীন-বেশ ছোকরাটাও আসিয়া পাপিয়া বিবির সন্ধান করে! সে অমলের পানে তাকাইয়া আবার চোখ ফিরাইয়া নিজের মনে শুখা তৈয়ার করিতে লাগিল। অমল কহিল,—বলো না দরোয়ানজী, পাপিয়া বিবি এখানে থাকে? এই তাঁর বাড়ী?

দরোয়ান তাচ্ছল্যভরে কহিল,—হাঁ, হাঁ। বিবির কাছে কি দোরকার?

অমল বলিল, সে কাশীপুরের বাগান হইতে বিবির কাছে আসিয়াছে—জরুরী খবর আছে। কাশীপুরের বাগান শুনিয়া দরোয়ান আর-একবার অমলের পানে চাহিয়া তাকে ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিল; পরে উঠিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। সে গিয়া এত্তালা দিল পাপিয়ার খাস-দাসী রঙ্গিণীর কাছে। রঙ্গিণী তখন পাণগুলা সাজিয়া রাখিবার উদ্যোগ করিতেছে। দরোয়া-নের কাছে শুনিয়া সে ভিতরের একতলার ঘর হইতে জানলা দিয়া একবার বাহিরে উঁকি পাড়িয়া দেখিল, পরে দরোয়ানকে বলিল,—আচ্ছা। দরোয়ান খড়ম-পায়ে খট্‌খট্ করিতে করিতে আসিয়া নিজের টুলে বসিল, এবং অমলকে বলিল,—খবর ভেজা। অমল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রঙ্গিণীর কিন্তু বিবিকে খবর দেওয়ার অবসর মিলিল না। গুপী-বেয়ারাটা কাল রাত্রে আহার সারিয়া ফিট্-ফাট্ হইয়া সেই যে কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে, আজ বেশ বেলা হইতে ফিরিয়াছে; ফিরিয়া নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিয়াছে! কৈফিয়ৎ দেওয়া দূরের ক[illegible] সঙ্গে দেখাও করে নাই। তার এত-বড় অপরা[illegible] লইবার উদ্দেশে রঙ্গিণী তাই পাণ চিবাই[illegible] রণ-রঙ্গিণীর মূর্ত্তি ধরিয়া গুপীর ঘরের দিকে চ[illegible]

অমল সেই পথেই দাঁড়াইয়া আছে! [illegible] কোন আহ্বান নাই, একটা সাড়া অবধি [illegible] কত লোক চলিয়াছে। বহুক্ষণ এমনি দাঁড়[illegible] লোক-চলাচল দেখিল—পরে হঠাৎ হুঁশ্ হই[illegible] বহুক্ষণ সে দাঁড়াইয়া আছে! হুঁশ্ হইতেই [illegible] দিকে চাহিল, দরোয়ান তখন কি একখানা [illegible] সুর করিয়া পড়া সুরু করিয়াছে।

অমল ডাকিল,—দরোয়ানজী…

বিরক্ত হইয়া দরোয়ান মুখ তুলিল। অ[illegible] —খপর তো এলো না! আর একটিবার যাবে[illegible]

দরোয়ান কহিল, সময় হইলেই খবর আসি[illegible] এখন গোসল করিতেছেন কি না…

অমল বিরক্ত হইল; একবার ভাবিল, চলি[illegible] আবার পরক্ষণে মনে হইল, এতখানি পথ [illegible] আংটি ফেরত না দিয়াই চলিয়া যাইবে, সে-ও [illegible] কথা নয়! সে দরোয়ানের দিকে চাহিল—[illegible] তখন আবার বইয়ের পড়ায় মনঃ-সংযোগ ক[illegible] সে তখন দরোয়ানের তোয়াক্কা না রাখি[illegible] অলক্ষিতেই আগাইয়া ফটকে ঢুকিল। ফ[illegible] হইয়া একটা বড় উঠান—উঠানের চারি-ধা[illegible] শ্রেণী, উপরে দোতলায় বারান্দা; বারান্দা[illegible] ঘর। উপরের ঘর হইতে বাদ্যের ঝঙ্কার [illegible] আসিতেছে। অমল উঠানে দাঁড়াইয়া চারিধারে[illegible] চাহিল।

দাঁড়াইবার একটু পরেই একটা স্ত্রীলোক [illegible] হইতে কহিল—কে গা?

অমল চারিদিকে চাহিল,—কিন্তু কে যে কো[illegible] কথা কহিল, তার কিছুই দেখিতে পাইল না। লক্ষ্য করিয়াই সে জবাব দিল,—কাশীপুরের [illegible] থেকে আমি আসচি। পাপিয়া বিবির কাছে একটু[illegible] আছে।

ঘর হইতে জবাব আসিল,—তা ওখানে দাঁড়ি[illegible] ঐ ডান দিকে সিঁড়ি—সেই সিঁড়ি ধরে দোতলা[illegible] দেখা হবে।

অমল আর অপেক্ষা না করিয়া ডাহিনের [illegible] ধরিয়া একেবারে দোতলায় গিয়া উঠিল। [illegible] গিয়া দাঁড়াইতে দেখিল, বারান্দার দাঁড়ে একটা [illegible] কাকাতুয়া, আর একটা ভৃত্য সেই কাকাতুয়াকে [illegible] দিতেছে। বারান্দায় অমলকে দেখিয়া ভৃত্যটা তা[illegible] চাহিল—অমল তাহাকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত

ভৃত্য আসিলে অমল কহিল,—পাপিয়া বিবিকে একবার খপর দাও তো···আমি কাশীপুর থেকে আসচি।

ভৃত্য জবাব দিবার পূর্ব্বেই ঘর হইতে কে কহিল,—কে রে বিট্টু?

বিট্টু একটু সরিয়া গিয়া কহিল,—একঠো বাবু আস্‌ছে, কাশীপুরসে।

ঘরের মধ্য হইতে পাপিয়া আসিয়া কহিল—কে বাবু রে?

কথার সঙ্গে সঙ্গেই পাপিয়া আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল। অমল বিস্মিত দুই চোখ তুলিয়া দেখে, সাম্‌নে রূপের প্রতিমা! মাথায় কোন আবরণ নাই, স্নানের পর দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশের রাশি পিঠের উপর এলানো, টক্‌টকে লাল-পাড় শাড়ী খানি পরা, অপরূপ-রূপসী পাপিয়া তার সাম্‌নে! যেন বহু আঁধার রাত্রির পর ধরাতলে মূর্ত্তিমতী উষার এই প্রথম উদয়···! পুলকের দীপ্তির মত, বিস্ময়ের মত পাপিয়া আসিয়া তার সামনে দাঁড়াইল। মৃদু হাসিয়া পাপিয়া কহিল,—তুমি···! কবি···!

অমলের বিস্ময় তখনো তাকে এমনি আবিষ্ট রাখিয়াছিল যে, সে কথা কহিয়া উত্তর দিতে পারিল না। সে কেমন মোহাচ্ছন্নের মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পাপিয়া আসিয়া অমলের হাত ধরিল, কহিল—এসো। এবং অমলের দিক হইতে কোন সাড়া উঠিবার পূর্ব্বেই পাপিয়া অমলের হাত ধরিয়া একেবারে তাকে লইয়া আপনার ঘরে গিয়া ঢুকিল। পরিপাটী সজ্জিত ঘর; বিলাসের সর্ব্ব-উপাদানই সে ঘরে যথাস্থানে সংরক্ষিত। পাপিয়া শয্যার উপর অমলকে বসাইয়া নিজে মেঝের বিছানায় তার পায়ের কাছে বসিল, এবং অমলের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—আমার এখানে হঠাৎ! মনে দয়া হলো বুঝি···?

অমল নির্ব্বাক বিস্ময়ে ঘরটার চারিধারে একবার চাহিয়া লইয়া পাপিয়ার পানে চাহিল। বিদ্যুতের সে তীব্র হল্‌কা তো এর কোথাও নাই,—কথায় বিদ্যুতের সে গর্জ্জন নাই, দৃষ্টিতেও বিদ্যুতের সে স্ফুলিঙ্গ নাই! অমল বলিল—একটু দায়ে পড়েই আমি এসেচি—বলিয়া সে পকেট হইতে আংটিটা বাহির করিয়া পাপিয়ার হাতে দিয়া কহিল,—এই আংটিটা সেদিন আমার ঘরে ফেলে এসেছিলে···

আংটিটা হাতে লইয়া পাপিয়া দেখিল, কহিল,—হুঁ!···তা এ তুচ্ছ জিনিসটা কি এমন কাঁটার মত ফুটছিল ···না হয়, এটা রেখেই দিতে! কোনো দিন যদি সেই একটা রাত্রির কথা মনে জাগতো···! তাছাড়া এ আংটি আমি ফেলে আসিনি—রেখেই এসেছিলুম। আমার একটু স্মৃতি মাত্র···তাও সহ্য করতে পারলে না!

পাপিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল; নিশ্বাস ফেলি[য়া] তখনি বলিল,—তুমি যে আমার কি করেচো, তা তু[মি] জানো না! আর তা বুঝতেও পারবে না, এই আম[ার] বড় দুঃখ! তোমার জন্য কখনো এমন হবো, এ ক[থা] দুদিন আগে এমন অসম্ভব ছিল, যে, তা বলবার না[ই]। তোমার কি আছে···? যা আমি চাই, যার নেশ[ায়] এতকাল মাতাল হয়ে আছি? তার কিছুই তোমার নেই তবু তোমার জন্য এমন হয়েচি যে, পাগলের মত [সে] রাত্রে তোমার কাছে ছুটে গেছলুম। এই তো এ[ত] বিলাস-ঐশ্বর্য্য দেখচো, এ সব আমার,—তবু তুমি য[দি] আদেশ করো, এই দণ্ডে তুচ্ছ ধূলার মত এ-সব ত্যা[গ] করে তোমার সঙ্গে চলে যেতে পারি—যেখানে নি[য়ে] যাবে···বিজন বনে, মরুর প্রান্তে···এমন কি মরণে[র] বুকে পর্য্যন্ত!—এখন বুঝলে?

অমলের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। সে-রাত্রে যে উচ্ছ্বাসকে সে চরিত্রহীনা নারীর সুরার নেশা[র] প্রলাপ ভাবিয়া কতক নিশ্চিন্ত ছিল, এখন দেখিল, [এ] তো নেশা নয়! পাপিয়া নেশা করে নাই। যা বলিতেছে তা বেশ বুঝিয়া বলিতেছে!···কিন্তু এ যে আগাগোড়[া] কি বিশ্রী, কি কুৎসিত! তার সমস্ত মন যেন এ কথা[য়] কালো হইয়া গেল! এ যেন জাগিয়া সে স্ব[প্ন] দেখিতেছে! পাপিয়া বেশ সুস্থ চিত্তে এ কি-সব প্রলা[প] বকিতেছে!···

অমল উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—ও-সব কথা বলো না আর। ও-সব শোনবার আকাঙ্ক্ষা আমার নেই আর কেনই যে তুমি বলো···

পাপিয়া বিদ্যুতের বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল অমলের একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—কেন বলি, তা বোঝো না, এইতেই আমি আরো ভেঙ্গে যাই! শোনো, আমি যা বলচি, এ খেয়ালের ঘোর নয়! ক'দিন কেবল এই কথাই ভাবচি। কিছু ভালো লাগচে না। যাদের নিয়ে মত্ত ছিলুম, কাণের কাছে অহর্নিশি যারা স্তব-স্তুতি শোনায়, যে স্তব-স্তুতির নেশায় বিভোর ছিলুম, তাও আর ভালো লাগে না। ক'দিন তাদের কাছেও ঘেঁষতে দিইনি···তারা আকুল হয়ে চলে গেছে, অনেক দুঃখ জানিয়ে গেছে, তবু টলিনি! আর তুমি···?

পাপিয়া অমলের পানে চাহিয়া রহিল। অমল কহিল,—কিন্তু কেন এ পাগলামি করচো! আমি পথের কাঙাল···আমায় কেন এ-সব বলচো! দু'বেলা আমার অন্নও ভালো করে জোটে না যে···

পাপিয়া কহিল,—কেন তুমি এত দুঃখ পাও? এ শুনলে আমার বুক ফেটে যায়! আমি এখানে সোনার পালঙ্কে শুয়ে আছি—আর তুমি···

চপলা কহিল,—একাই আছি। থিয়েটার থেকে ওরা ভারী ধরেচে। ওদের কথা কিছুতেই ঠেলতে পারলুম না। ওরা এই নতুন বই খুলচে—সীতার বনবাস। তা আমায় ভারী ধরেছে, অন্ততঃ প্রথম রাত্রিটাতে যেন সীতা সাজি। তাই সীতার পার্টটা দেখে নিচ্ছি…।

পাপিয়া কহিল,—ভৃঙ্গরাজ অনুমতি দেছে…?

চপলা কহিল—অনুমতি দেবে কি! ওঃ! আমার খেয়াল হবে, তাই করবো। তাতে ভৃঙ্গরাজের বাধা দেবার ক্ষমতা থাকতে পারে কখনো?

পাপিয়া হাসিয়া কহিল,—তা বটে!

চপলা কহিল—বোস্ না ভাই। আর এই ক'খানা নভেল আছে, পড়ে নি।…

পাপিয়া বসিল। তার হাসি মুহূর্ত্তে ম্লান হইয়া গেল।…ওরে কুহকিনী, ওরে ছলনাময়ী অভিনেত্রী, শুধু ভঙ্গীতে কৃত্রিম স্বরে আর কৃত্রিম হাব-ভাবে তার স্বর্গই তুই ছিনাইয়া রাখিয়াছিস্! নিজে তুই সে-কথা জানিলি না, জানিবার প্রবৃত্তিও তোর নাই…তবু তারই জন্ম পাপিয়া আজ পথের কাঙাল…তার দুর্ভাগ্যের আজ আর সীমা নাই…!

চপলা বই পড়িতে লাগিল, আর পাপিয়া চুপ করিয়া বসিয়া তাকে দেখিতে লাগিল। বই পড়া শেষ হইলে চপলা কহিল,—তার পর খপর কি? হঠাৎ মনে পড়লো যে…?

পাপিয়া কহিল,—হঠাৎ আমি আসিনি। একটু দরকারেই এসেচি।

চপলা কহিল,—কি দরকার, শুনি?

পাপিয়া কহিল,—তোমায় সেই বলেছিলুম, মনে আছে…আমাদের কাশীপুরের বাগানের কাছে একটি ছোকরা থাকে, তোমার উদ্দেশে কবিতা লেখে…?

চপলা একটা সিগারেট ধরাইয়া কহিল,—হ্যাঁ। তা কি করতে হবে, শুনি?

পাপিয়া কহিল—বেচারী কি-রকম পাগল যে তোমার ধ্যানে…তা এক দিন তাকে দেখতে চলো না।

চপলা কহিল—আমার তো মাথা খারাপ হয় নি যে চিড়িয়াখানা দেখতে যাবো…

পাপিয়া কহিল—না ভাই, অমন করে বলো না তুমি…আমার কিন্তু দেখে ভারী মায়া হয়েচে তার উপর…

হাসিয়া চপলা কহিল,—দেখিস, যেন স্বয়ংবরা হোস্‌নে! বেচারা মানগোবিন্দ তাহলে পাগল হয়ে যাবে।

পাপিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল! সে ভাগ্য যদি তার হইত!

চপলা কহিল,—চুপ করলি যে!…কি ভাবচিস?

পাপিয়া কহিল,—ভাবচি, তুমি কি নিষ্ঠুর!…আহা, কবে থিয়েটারের সেই বিজ্ঞাপনের কাগজে তোমার কি ছবি বেরিয়েছিল…সেখানিকে কেটে খাতায় এঁটে রেখেচে,—সেই ছবিরই কি আদর!…আমি বলচি, সত্যি, তোমার ভৃঙ্গরাজের চেয়েও ঢের বেশী কামনার ধন…

চপলা কহিল,—তোরও দেখচি নেশা লেগেচে রে! …দূর!…তুই দেখিস্ নে কখনো, ছ্যাথ,—ও-সব নভেলের প্রেম আমার ঢের দেখা আছে।…তা তুই যদি তার যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী হোস্ তো তাকে একটা ভালো উপদেশ দিস্ দিকিন্। তাকে কাজ-কর্ম্ম করতে বলিস, কুড়ের মত ও-সব ছাই-ভস্ম লিখে কোনো ফল তো নেই! …হুঁঃ, থিয়েটারে থাকতে কত লোকের কত চিঠিই যে পেতুম! কেউ লিখতো, তুমি আমায় মাথার মণি…কেউ লিখতো, আমার সাধের সাধনা, আমার শূন্য জীবন-বিহারী! কেউ লিখতো, আমার নিষ্কাম ভালবাসা, শুধু তোমায় দেখেই খুশী হবো!…ষ্টেজে ফুলের তোড়া পড়লো তারিফ করে,—দেখি, তার মধ্যে চিঠি—কি কাঁদুনি আর কি মিনতিতেই সে-চিঠি ভরা।…চপলাসুন্দরী তো কচিখুকী নয় যে ওতে ভুলবে—দু ছত্র চিঠিতে কি চার ছত্র কবিতায়!…বলে, অত বড় জহরৎওলা যে মাধোরাম—তারি একমাস টাকা পেশ্ করতে দেরী হতে বললুম, পথ ছাখো!…

পাপিয়া কোনো কথা কহিল না, চপলার পানে চাহিয়া স্থির হইয়া তার কথা শুনিতেছিল।

চপলা কহিল,—আর এক মজার গল্প বলি, শোন্। সে এই বছর-খানেকের কথা। একখানা সামাজিক নাটকে পার্ট করেছিলুম,—এক বৌয়ের। বৌটো স্বামীর হাতে নিত্যি মার খায়,—কাঁদলে ওদিকে শাশুড়ী-[illegible] হুঙ্কার দিয়ে এসে পড়ে, খবর্দ্দার হারামজাদী, বা[illegible]তে চোখের জল ফেলে অকল্যাণ করচিস!…বৌটার কোন সুখ নেই! এক দিন বৌটার শরীর খারাপ ছিল বলে পাতে দুটি ভাত ফেলা গেছলো, এইতে শাশুড়ী তাকে খুব গাল দিয়ে অনেক রাত্রে পথে বার করে সদর দোর বন্ধ করে দেয়। শীতকাল—বেচারী তো শীতে কেঁপে সারা! তবু শাশুড়ী দোর খোলে না।…পাড়ার একটি ছেলে তাকে নিজেদের বাড়ী নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দেয়! পরদিন তার মা এসে শাশুড়ী মাগীকে যাচ্ছে-তাই করে, বৌকে ঘরে দিয়ে যায়। বৌয়ের কিন্তু দুর্দ্দশার সীমা রইলো না। ননদ কুচ্ছ করতে লাগলো।—স্বামীর অত্যাচার চার-পো বাড়লো, আর জটিলে-শাশুড়ী রাম-রাজত্বি সুরু করলে। তখন সেই পাড়ার ছেলেটি তাদের বাড়ী-চড়াও হয়ে তাকে রক্ষা করতে আসতো!…বৌটা তাকেই একমাত্র বন্ধু বলে জানতো!…একদিন স্বামীর

মার খেয়ে বৌটি হঠাৎ অজ্ঞান হতে সেই ছেলেটি এসে ধমকে বলে, সবাইকে পুলিশে দেবে!…এমনি অত্যাচারে-অত্যাচারে বৌটি মর-মর, শেষে মরণের সময় সেই ছোকরা এলো। মরবার সময় বৌটি শুধু বলে গেল—ভালোবাসার কাঙাল হয়ে মলুম—একটু ভালো-বাসাও যদি পেতুম…ছেলেটির পানে চেয়ে তার হাতখানি চেপে ধরে একরকম তারি কোলে মাথা রেখে সে মলো! তা ভাই, এই বৌয়ের পার্টটিও প্লে করা, অমনি ছোকরার দল চিঠি পাঠাতে লাগলো,—ওগো, আমি ভালোবাসবো গো—কি-দুঃখে ভালোবাসার কাঙাল হয়ে তুমি মরবে,…এমনি!…সব কাব্য করচেন! ষ্টেজের ঐ রঙ-চঙ আর ঢঙে ওঁরা ভুললেও, আমরা ও-সব ফাঁকা কথায় ভুলি কখনো! হায় রে!

পাপিয়া অবাক হইয়া চপলার কথা শুনিতেছিল। তার এই অবহেলা-উপেক্ষার কথাগুলা পাপিয়ার প্রাণে পাথরের কুচির মত আঘাত করিতেছিল! চপলা শুধু টাকাই চিনিয়াছে—আর ঐ টাকার পিছনে তার যে প্রেমের উচ্ছ্বাস—সেটা কি পঙ্কিল গন্ধে ভরা, কি স্বার্থের বিষে জড়ানো! আহা, অমল…বেচারা!…নিজের মনে শুধু সে কবিতা লেখে—কোনো দিন চপলাকে দেখিবে বলিয়া তার ঘরের দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায় নাই,…পাওয়ার কামনা—সে তো দূরের কথা।

পাপিয়ার হঠাৎ মনে হইল,—সে তো চপলাকে দেখিতে চায়, চপলাও দেখা দিবে না! তা, এই তো থিয়েটারে সীতার বনবাস অভিনয় হইবে, আর চপলা সে বইয়ে সীতা সাজিবে! অমলকে এ খবর দিলে হয় তো সে সীতার বনবাস দেখিতে আসে—অমনি চপলাকেও একবার চোখে দেখিতে পায়!

সঙ্গে সঙ্গে একটা সম্ভাবনার কথাও তার মনে জাগিল। অমল যা চায়,…পাপিয়া তাকে তাহারি সন্ধান দিবে…তার পর চপলার পরিচয় যাহাতে সে ভালো করিয়া পায়, তাও করিবে। তাহা হইলেও কি চপলার প্রতি তার এ অন্ধ উন্মত্ত আবেগ আর থাকিতে পারে!…তার উপর যখন অমল জানিবে, অমলের সুখের জন্য পাপিয়াই এই থিয়েটার দেখার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে—তা জানিয়া যদি কোনো দিন…

পাপিয়া কহিল,—তোমাদের এ বই কবে খুলচে?

চপলা কহিল,—কবে আবার! আস্‌চে শনিবারে! রাস্তায় বড় বড় কাগজ মেরে দেছে, দেখিস্ নে? এই যে কালই রাত্রে আমি দেখছিলুম, ইডন্ গার্ডন্ থেকে ফেরবার সময়…বড় বড় অক্ষরে লেখা—সীতার বনবাস, আর তার ঠিক তলায় লাল কালিতে সীতা—শ্রীমতী চপলাসুন্দরী…কেবল এক রাত্রির জন্য…

কথাটা বলিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দে চপলা পাপিয়ার পানে চাহিল।

পাপিয়া কহিল—না ভাই, আমি অত নজর করিনি। তা বেশ, আজ তাহলে উঠি। তোমায় বিরক্ত করবো না। তুমি তোমার পার্ট ছাখো…

চপলা কহিল,—আর এক দিন আসিস্ না…পাপিয়া!…দুপুরবেলায়…মানগোবিন্দ যখন আপিসে থাকে…

পাপিয়া হাসিল, হাসিয়া কহিল,—তোমার ভৃঙ্গরাজ চটে যাবে না?

চপলা তাচ্ছল্যের ভরে কহিল,—চটুক গে! মেড়ো কোথাকার!…কি বলবো, পয়সা দেয় বহুৎ, না হলে ওরা কি মানুষ, না, প্রাণে কোনো সখ আছে!

পাপিয়া কহিল,—নেমকহারামি করো না। যা চাইছো, তা তো দিচ্ছে…

চপলা কহিল,—তা দেবে না তো কি! আমার একটা কথা, একটুকুরো হাসির দাম যে লাখ টাকা!…ব্যাটা কাপড় বেচে কত লাখ টাকাই যে করেচে…তা যাক্ ও সব কথা! থিয়েটার দেখতে যাবি তো?

—নিশ্চয়। কত দিন বাদে তুমি নামচো!…তোমার ভৃঙ্গরাজ কটা বক্স নিচ্ছে?

—একখানা নিয়েচে!—মানগোবিন্দকে বলিস্ না, একটা বক্স নিতে…

—সে আর আমায় বল্‌তে হবে না—নিজে থেকেই নেবে'খন।…সত্যি ভাই, আমরা যাদের চাই না, তারাই আমাদের ঘিরে থাকে সর্ব্বক্ষণ…আর যাদের চাই…পাপিয়ার স্বর গাঢ় হইয়া উঠিল। সে একটা নিশ্বাস ফেলিল।

চপলা কহিল,—তারা কি…?

পাপিয়া স্বপ্নাভিভূতের মত কহিল,—তারা যে কত দুর্লভ, কত দূরের…

চপলা কহিল,—তোর কি হয়েচে বল্ তো পাপিয়া…তুই কি চাস,—যা পাস না…? মানগোবিন্দর দৌলতে তোর অভাবটা কি, শুনি? ও-রকম বেইমানী কথা বলিস্ নে। এই যে সেদিন বলে গেলি, তোর কোনো অভাব নেই। তবে…?

ঈষৎ আত্মগতভাবে কতক মৃদু কণ্ঠে পাপিয়া কহিল,—সেদিন কি জানতুম সত্য অভাব কাকে বলে…সত্য পাওয়াই বা কি…! তার পর আর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—তা হলে আজ আসি ভাই…তুমি পার্ট মুখস্থ করো।

৯

বাড়ী ফিরিয়া পাপিয়া ভাবিতে বসিল…ঠিক, এই বেশ হইবে! কি বলিয়া কোন্ মুখে সে অমলের গৃহে

আবার গিয়া হাজির হইবে, কয়দিন ধরিয়া ভাবিয়া তার কোন উপায়ও সে বাহির করিতে পারে নাই! আর আজ!…এ বেশ হইয়াছে!…

রাত্রে মানগোবিন্দ আসিলে পাপিয়া কহিল,—আমার শরীরটা বড় খারাপ, একলা থাকতে চাই।…তুমি এক কাজ করো দিকিন্,—আসচে শনিবারে ইণ্ডিয়ান থিয়েটারে সীতার বনবাস প্লে হবে,—চপলা দিদি শুধু এক রাত্রের জন্য সীতা সাজবে…তুমি একটা বক্স নিয়ে রাখো……

মানগোবিন্দ কৌচে বসিয়াছিল; উঠিবার কোনো উদ্যোগ করিল না। পাপিয়া তার পানে চাহিল, চাহিয়া বলিল,—বসলে যে! যাও এখনি—নাহলে বক্স পাবে না এর পর গেলে।

মানগোবিন্দ পাপিয়ার পানে হতাশ দৃষ্টিতে একবার চাহিল, তার পর উঠিয়া বাহির হইয়া গেল।

মানগোবিন্দ চলিয়া গেলে পাপিয়া একতলায় সারদার ঘরের সামনে গিয়া ডাকিল,—সারদা দিদি—

—কে? পাপিয়া!—বলিয়া সারদা বাহিরে আসিল।

পাপিয়া কহিল,—তোমার নেমন্তন্ন রইলো ভাই, শনিবারে—আমাদের সঙ্গে থিয়েটারে যাবে। মোদ্দা এক কাজ করতে হবে। তোমার ভাইকে একবার থিয়েটারে পাঠাও…এখনি। আমি পাঁচটা টাকা দিচ্ছি …পাঁচ টাকার একটা সীট্ রিজার্ভ করে টিকিট কিনে আনিবে। ইণ্ডিয়ান থিয়েটারের…বুঝলে? সামনের শনিবারের জন্যে।…আমার এখনি টিকিট চাই কিন্তু… বলিয়া সারদার হাতে পাঁচটা টাকা দিয়া পাপিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল; আসিয়া এস্রাজটা পাড়িয়া গান ধরিল,—

> তেরি লিয়ে রোয়ে, রোয়ে—
> তু ন আওয়ে,—পিয়ারে!

গাহিতে গাহিতে চকিতে সুরের মধ্যে ডুবিয়া সে একেবারে উধাও হইয়া গেল, কোন্ সুদূর কল্পলোকে! সেখানে অপ্সরীরা প্রমোদ-কুঞ্জ সাজাইয়া রাখিয়াছে—ফুলের মালায়, আলোর ফানুসে এক বিচিত্র মায়াপুরী… অপ্সরীরা করুণ চোখে চাহিয়া আছে—আর ঐ ফুলদলে রচা শয্যা, তার উপর মলিন মুখে ম্লান চোখে পড়িয়া আছে…কে ও বিরহিণী? পিঠের উপর কালো কেশের রাশি তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত ঝরিয়া পড়িয়াছে!…যুগ-যুগ ধরিয়া প্রিয়ের বিরহ-দুঃখ সহিয়া তার প্রাণ যেন আর বাঁচে না! অপ্সরীরা তাকে পদ্মপত্রে বীজন করিতেছে… ছিন্ন লতিকার মত বিরহিণী মৃণাল-শয়নে পড়িয়া আছে! …কে, ও? পাপিয়া শিহরিয়া উঠিল। ও যে চপলা! সেই থিয়েটারের কাগজে ছাপা ছবির মূর্তি!…

চমকিয়া পাপিয়া গান থামাইল। এস্রাজ রাখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। দুই চোখে তার জলের ধারা, বুক যেন কে সবলে চাপিয়া ধরিয়াছে! পাপিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া একেবারে বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র ফুটিয়া নীরবে নত নেত্রে পৃথিবীর পানে চাহিয়া আছে। চোখে তাদের কি করুণা, কি সমবেদনা…

পাপিয়ার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, তার হাতে-গায়ে আষ্টে-পৃষ্ঠে কেবলি নাগপাশের বন্ধন! সে বাঁধন আঁটিয়া চাপিয়া তাকে যেন পিষিয়া মারিবে। কি করিলে কোথায় গেলে এ বন্ধন হইতে মুক্তি মেলে!—

মুক্তি, ওগো মুক্তি! মুক্তির পিপাসায় প্রাণ তার আর্ত্ত আকুল হইয়া উঠিল। পাপিয়া বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আকাশে মেঘের ছুটাছুটি, পথে লোকজনের ভিড়, সামনের বাড়ীর একতলার ঘরে নবীন স্যাকরার হাতুড়ি-পেটার পট্‌পট্ আওয়াজ, আর ঐ পানের দোকানের পাশে রোয়াকে বসিয়া মণ্টুর মা ফুলুরি ভাজিতেছে—এ-সব সমানে চলিয়াছে,—কোনো দিকে কোথাও যে কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, কারো কোনো বাঁধনে টান্ পড়িতেছে,—সে-সব দিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া!…

সারদার ভাই বৃন্দাবন আসিয়া কহিল,—টিকিট এনেচি।

পাপিয়া ফিরিয়া চাহিল।

বৃন্দাবন আবার কহিল,—সীতার বনবাসের টিকিট।

পাপিয়া বলিল,—ও, এনেচো! দাও…টিকিটটা সে হাতে লইল; লইয়া বলিল,—একটু দাঁড়াও। বলিয়া পাপিয়া ঘরে গেল এবং পর-মুহূর্তে একটা টাকা আনিয়া বৃন্দাবনের হাতে দিয়া কহিল,—জল খেয়ো।

বৃন্দাবন খুশী-মনে টাকা লইয়া চলিয়া গেল।

পাপিয়া টিকিট হাতে লইয়া ঘরে আসিয়া একটা কৌচে বসিয়া পড়িল। এ টিকিট তার ইষ্ট-কবচ! এই কবচ বুকে আঁটিয়া আর একবার অমলের চিত্ত-গৃহের দ্বারে সে গিয়া দাঁড়াইবে—এবার একটু প্রসন্ন-দৃষ্টি যদি তার ভাগ্যে লাভ হয়!…আশার কল্পনায় পাপিয়ার মন নাচিয়া উঠিল। কিন্তু এত রাত্রে…? তার চেয়ে কাল দিনের বেলায়!

মন তখনি বলিয়া উঠিল, না, না! এই স্তব্ধ রাত্রি, সেই বিজন ঘর…কোলাহলের তীব্রতা যখন কোথাও এতটুকু নাই…এই ঠিক সময়…! পাপিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া আয়নার সামনে গিয়া দাঁড়াইল। এই বেশে…? হাঁ, এই ভালো! নির্লজ্জের মত সাজিয়া গিয়া উপেক্ষার বাণে জর্জ্জরিত হইয়া ফেরা…সে ভারী অসহ্য ঠেকে!

একটা সিল্কের চাদর গায়ে জড়াইয়া পাপিয়া হাঁকিল,—বিট্টু···

বিট্টু ভৃত্য আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। পাপিয়া বলিল—একটা ট্যাক্সি ডেকে দে, শীগ্‌গির।

ভৃত্য চলিয়া গেল। পাপিয়া আলমারি খুলিয়া সিল্কের একটা ছোট থলি বাহির করিয়া সেটা টাকায় ভর্ত্তি করিয়া লইল—তার পর আলমারি বন্ধ করিয়া বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

বিট্টু তখনই ট্যাক্সি ডাকিয়া আনিল। পাপিয়া বিদ্যুতের মত নীচে নামিয়া আসিল এবং ট্যাক্সিতে উঠিয়া ভৃত্যকে বলিল,—আমি একটু বেড়াতে যাচ্ছি। রাত্রেই ফিরতে পারি, নয় তো কাল সকালে ফিরবো।—বাবু এলে বলিস্।···বুঝলি? আর ঘর-দোর খোলা রইলো, বন্ধ করিস্।

ভৃত্য মাথা নাড়িল। পাপিয়া ট্যাক্সির ড্রাইভারকে বলিল,—যাও, কাশীপুর—

ট্যাক্সি আসিয়া কাশীপুরে বাগানের সামনে দাঁড়াইল। পাপিয়া ট্যাক্সির ভাড়া চুকাইয়া মালীকে ডাকিল, বলিল,—সজাগ থাকিস্ রে। আমি রাত্রে এখানে আসতে পারি···বলিয়াই সে অমলের গৃহের দিকে চলিল।

মাথার উপর আকাশে জ্যোৎস্না ফুটিতেছিল। হাওয়াও বেশ বহিতেছে। চারিদিকে যেন হাসির পাথার উছলিয়া উঠিয়াছে! পাপিয়া আসিয়া অমলের ঘরের দ্বারে করাঘাত করিল। অমল দ্বার খুলিয়া পাপিয়াকে দেখিয়া কহিল—তুমি···! আবার এসেচো?

পাপিয়া কহিল,—আজ আমি বসন্তের দূত! সু-খপর এনেচি···

অমল তার মুখের দিকে চাহিল। পাপিয়া কহিল,—দূতকে আগে ভিতরেই যেতে দাও···ধুলো-পায়েই এখান থেকে বিদায় করো না। আজ আমি আমার নিজের কোন দুঃখ বা মিনতি জানাতে আসিনি···

অমল দ্বার ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল, পাপিয়া গিয়া ভিতরে ঢুকিল।

সেই ঘর···জীর্ণ, মলিন···তবু কি সুখ, কি শান্তিতেই না ভরিয়া আছে!···

পাপিয়া চারিধারে চাহিল, কহিল—কৈ···খাতা কৈ? তোমার সেই কবিতার খাতা?

অমল কহিল,—খাতা কি হবে?

পাপিয়া কহিল,—আবার নতুন কিছু লিখলে কি না, দেখি···আমি যে তোমার কবিতা পড়তেই এলুম!

অমল কহিল—কেন তুমি আমার এ দুর্ব্বলতাকে বার-বার এমন বিদ্রূপের বাণে জর্জ্জরিত করো! এতে কি সুখ পাও তুমি!···

পাপিয়া অমলের পানে চাহিল,···অমলের চোখে বেদনার কাতরতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাপিয়া বলিল,—এ বিদ্রূপ নয়। সত্যি বলছি, আমার ভারী ভালো লাগে তোমার কবিতা পড়তে···

অমল কহিল,—না, তোমার দেখার জন্য নয়!

পাপিয়া বলিল,—তবে দেখিয়েছিলে কেন?···সে কবিতা দেখিয়েই তো আমার এ দশা করেচো আজ··· পথের কুকুরের অধম···এমন যে, তাড়িয়ে দিলেও বার বার ফিরে আসি!

অমল কহিল—আমি করেচি!···মিথ্যা কথা তোমার লজ্জা নেই,—তাই তুমি আমার মত কাঙালের পিছনে কেঁদে ফিরচো।—তুমি কত উঁচুতে, আর আমি পৃথিবীর ধুলোর চেয়েও হীন,···এ যে মস্ত বড় পরিহাস! অমলের স্বর স্থির, গম্ভীর।

পাপিয়া কহিল,—কিন্তু ঐ ধুলোর মাঝে কি রত্নই আছে···তা তুমি নিজে ধুলোয় পড়েও জানো না! আর তোমার ঐ চপলাসুন্দরী, সেও তার কোন খোঁজ রাখে না, রাখতে চায়ও না···আশ্চর্য্য!

অমল কহিল,—তুমি জহুরী, একদিনে সে রত্নের সন্ধান পেয়েচো, না? অমলের স্বরে হাসির ঝিলিক মৃদু বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল।

পাপিয়া কহিল,—বাজে তর্ক নয়। তোমার সঙ্গে তর্ক করতে আমি চাই না, সেজন্য আসিও নি। ক'দিন ঢের তর্ক হয়েচে। তাতে আমার অঙ্গে কাঁটার চাবুক পড়েচে যেন—আর সে কাটা ঘায়ে রক্ত ঝুঁজিয়ে তুলো না গো, দোহাই, তোমার পায়ে পড়ি। একদণ্ড স্থির হয়ে শোনো, যা বলতে এসেচি···পাপিয়ার স্বর অশ্রুর বাষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল।

অমল বলিল,—বেশ··কি বলতে চাও, বলো। কোন তর্ক করবো না আর।

পাপিয়া বলিল,—কবিতা তাহলে দেখতে পাবো না? ···কবিতার সম্বন্ধে কোনো কথাই কবো না, শুধু পড়বো ···পড়বো শুধু···পাপিয়ার স্বর বাধিয়া গেল।

অমল আর আপত্তি না করিয়া কবিতার খাতা লইয়া পাপিয়ার হাতে দিল। পাপিয়া পাতা উল্টাইয়া পড়িতে লাগিল। এই যে,···দুটো, তিনটে,···না, চারটে নূতন কবিতা লেখা হইয়াছে। এ কি···

কঠিন ধরা, কঠিন চারিধার,
তোমার পূজায় মগ্ন আমার মন—
বিঘ্ন সেথা, তাতেও জ্বালাতন।
এটুকুতে নাইকো অধিকার।

এ কবিতার মানে? পাপিয়া আবার পড়িতে লাগিল। আর এক জায়গায় লেখা রহিয়াছে,—

দূর হয়ে যা, সর্ব্বনাশী,
কুহকিনী ওরে,—
রূপের গরব এতই কিসে!
কণ্ঠ ও তোর ভরা বিষে!
লোভ দেখিয়ে ভোলাবি হায়,—
ভোলাবি তুই মোরে!
পারবিনে তা, পারবিনে তুই,
যে-বেশে সাধ হয়,
সেই বেশে তুই আয় না সেজে—
মান্‌বি পরাজয়!

পাপিয়ার দুই চোখ ক্ষোভে যাতনায় একেবারে মলিন নিষ্প্রভ হইয়া গেল। সে অমলের পানে চাহিয়া বলিল,—আমায় উদ্দেশ করে লিখেচো! এত বড় কঠিন কথা লিখতে তোমার মায়া হলো না? একটু দয়া…? আমি যে জ্বালা পাচ্ছি, সেই কি যথেষ্ট নয়? তার উপর আরো…এমন নিষ্ঠুর অবিচার!

পাপিয়ার দুই চোখ জলে ভাসিয়া গেল। সে বাষ্প-রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল,—যাক্, আমি তোমার ধ্যানভঙ্গ করতে আসিনি…সত্য বলচি! মোহিনী সেজে তোমায় ভোলাতেও আসিনি। আমি এসেছিলুম শুধু তোমার পায়ে আমার ব্যাকুল নিবেদন জানাতে…তোমার ভোলাতে আসি নি…এত বড় শক্তি কি স্পর্দ্ধা আমার নেইও! আর সত্যই আমি এমন সর্ব্বনাশী কুহকিনী নই!…তোমায় অত করে বলেছিলুম,—একটি কবিতা লেখো, আমার সে রাত্রের কথা নিয়ে…তা এ বেশ লেখেচো! আমার বুকে তোমার ছুরি বেঁধার কথাটাই জ্বল্‌-জ্বল্ করতে থাকুক! তৃপ্তি হয়েচে তো তোমার এ ছুরি বিঁধে?

অমল অপ্রতিভ হইল। এ কথাগুলা পাপিয়াকে দেখানো ঠিক হয় নাই! ছি!

পাপিয়া বলিল,—শোনো এখন, যেজন্য এসেছিলুম…বলিয়া সে সিল্কের থলি খুলিয়া থিয়েটারের টিকিট বাহির করিয়া অমলকে বলিল,—এই নাও থিয়েটারের টিকিট। শনিবারে সীতার বনবাস হবে,—আর সীতা সাজবে চপলা—ঐ একটি রাত্রির জন্যে শুধু। তুমি ভালোবাসো বলে চপলার কাছ থেকে এই টিকিট এনেচি তোমার জন্য। তুমি দেখতে যেয়ো।

অমল টিকিট লইয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে পাপিয়ার পানে চাহিল। এ কি, এ যে সত্যই থিয়েটারের একখানা টিকিট! টিকিটখানা ভালো করিয়া দেখিয়া সে বলিল,—পাঁচ টাকার টিকিট!—ও, তুমি কিনে এনেচো!…তা এ তো আমি নেবো না।…আমার সামর্থ্যে কুলোয়, আমি আট আনার টিকিট কিনে দেখে আসবো…

পাপিয়া তীব্র দৃষ্টিতে অমলের পানে চাহিল। এত তেজ…! ওঃ ভগবান! ঐ চোখ একদিন যদি তার পানে একটু কৃপার ভিখারী হইয়া চাহিত, ঐ স্বর একদিন মিনতির একটি অতি-ক্ষুদ্র সুরেও যদি ভরিয়া উঠিত, একটি পলকের জন্যও…! পাপিয়া তাহা হইলে তার সর্ব্বস্ব বিকাইয়া দিতে পারিত!…

পাপিয়া কহিল,—এ টিকিট আমি কিনি নি। আমার কি বয়ে গেছে কিন্‌তে! সর্ব্বনাশী কুহকিনী আমি, এতে তো আমার পথে কাঁটাই আরো পড়বে…না, তা নয়। চপলাকে তোমার কথা অনেক বলেচি,…রোজই বলি। তাই সে এই টিকিট পাঠিয়েচে আমার হাতে…তোমার জন্য। সে সীতা সাজবে…তুমি থিয়েটার দেখতে গেলে সে খুশী হবে…তাই। বুঝলে?

তৃপ্তির উচ্ছ্বাসে অমলের অন্তর ভরিয়া উঠিল। সে তৃপ্তি দুই চোখের দৃষ্টিতে হীরার মত এমন জ্যোতি মাখিয়া ফুটিয়া বাহির হইল যে, পাপিয়া তা দেখিয়া একে-বারে যেন মরিয়া গেল।

অমল কহিল,—চপলা পাঠিয়েচে? সত্য বলচো?

পাপিয়া কহিল,—মিছে বলে আমার লাভ! পাপিয়া স্থির গম্ভীর মূর্ত্তিতে অমলকে লক্ষ্য করিতেছিল।

অমল কহিল,—তোমায় ধন্যবাদ!…কিন্তু পাঁচ টাকার সীটের কি দরকার ছিল?

পাপিয়া কহিল,—ভালো দেখতে পাবে। তা ছাড়া সে-ও তোমায় দেখতে চায় কি না…

অমল কহিল,—আমায় দেখতে চায়…অমল একটা নিশ্বাস ফেলিল।

পাপিয়া ভাবিল, হায় অন্ধ, কি মন্ত্রে কিসের মোহেই যে সে তোমায় ভুলাইয়াছে! যার আগাগোড়া ভাণ…এই মুহূর্ত্তে সীতা সাজিয়া মর্ম্মভেদী বিলাপে নিজে কাঁদিয়া লক্ষ লোকের চোখে জলের ধারা বহাইয়া, পর-মুহূর্ত্তেই সাজ-ঘরে গিয়া সিগারেট টানিয়া অপরূপ কৌতুকের যে নির্ঝর ছুটাইয়া দেয়—তার কি দেখিয়াই যে তোমরা মজো…অন্ধ, মূঢ় পুরুষ, তা তোমরাই জানো! সেও কি রূপের ফাঁদ পাতে না…? পাতে! তবে এত কৃত্রিমতা, এমন প্রচণ্ড মিথ্যা দিয়া সে কোন দিন লোক ভুলাইতে যায় নাই!

অমল পাপিয়ার পানে চাহিল, কহিল,—তুমি তাহলে এখনি তো বাড়ী যাবে? গাড়ী আছে…? এত কষ্ট করে এলে আমার জন্য…

পাপিয়া সগর্ব্ব ভঙ্গীতে কহিল—তোমার জন্যে আসি নি আমি! আমার কে তুমি…! চপলাদিদির কথায় আমি এসেচি…তার সময় নেই, তা ছাড়া আমি তোমার বাড়ী চিনি, তোমায় চিনি, তাই তার কাজে এসেচি…কথাটা বলিতে বলিতে রুদ্ধ অভিমান কখন যে ফাটিয়া চুরমার হইয়া তার বুকটাকে একেবারে বেদনায়

আতুর করিয়া তুলিল···। সে আর এক মুহূর্ত্ত সেখানে না দাঁড়াইয়া চলিয়া আসিল।···পাষাণ, পাষাণ! এ পাষাণকে একবার যদি সে ভাঙ্গিতে পারিত, খুব কঠিন নির্ম্মম আঘাতে···! পাপিয়ার অন্তরের মধ্যে হু-হু করিয়া প্রচণ্ড আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

১০

কম্পিত চরণে বাগান-বাড়ীতে পৌঁছিয়া পাপিয়া একেবারে নিজের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল; আসিয়া যা দেখিল, তাহাতে চমকিয়া উঠিল। মানগোবিন্দ মুখ ভার করিয়া একটা কৌচে বসিয়া আছে। পাপিয়াকে দেখিয়া মুখ তুলিয়া সে কহিল,—এর মানে কি পিয়ারী? আমায় থিয়েটারের বক্সের জন্য পাঠিয়ে হঠাৎ এমন পালিয়ে আসা···!

পাপিয়া কোন কথা কহিল না, নীরবে নত-মুখে আসিয়া একধারে একটা সোফায় বসিয়া পড়িল। তার বুকের মধ্যে অসহ্য বেদনা ঠেলিয়া উঠিতেছিল! সেখানে যেন একটা প্রচণ্ড ঝড় বহিতেছে!

মানগোবিন্দ বলিল,—শুধু আজ বলেই নয়—আজ ক'দিন ধরেই আমার উপর তুমি বিমুখ হয়েচো। ব্যাপার কি? তোমার কি চাই, মুখ ফুটে বলো! একটা কথার ওয়াস্তা! যদি অদেয় না হয়···পাবেই।··· অসুখই যদি হয়ে থাকে, তাই বা আমার কাছে লুকোচ্ছ কেন···?

পাপিয়া তবু মাটীর দিকে মুখ নত করিয়া বসিয়া রহিল। স্তম্ভিত অশ্রুর বেগে তার নাকের ডগা ঈষৎ কাঁপিতেছিল···বাতাসের দোলায় ফোটা ফুলের পাপড়ির মত। চোখে অশ্রু নাই! কাঁদিবার ইচ্ছায় মনটা একেবারে উচ্ছ্বসিত, উন্মাদ—কিন্তু ভিতরকার ব্যথার তাপে সে অশ্রু ভিতরেই শুকাইয়া উঠিতেছে।

মানগোবিন্দ উঠিয়া পাপিয়ার পাশে দাঁড়াইল, তার চিবুকে হাত দিয়া মুখখানি তুলিয়া ধরিল—কি ম্লান মুখ! কি হতাশ দৃষ্টি পাপিয়ার দুই চোখে! মানগোবিন্দ বলিল—কি হয়েচে, বলো।···বলবে না?

পাপিয়া মুখ তুলিয়া ক্ষণেকের জন্য মানগোবিন্দর পানে চাহিল; আবার পরক্ষণেই একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মুখ নামাইল।

মানগোবিন্দ বলিল,—কোনো অপরাধ করেচি কি আমি?···তা'ও বলো···

একটা প্রচণ্ড নিশ্বাস ঝড়ের মত পাপিয়ার বুকটাকে তোলপাড় করিয়া ছুটিয়া বাহির হইল। সে মুখ তুলিয়া বলিল—বলবার কিছু নেই···।

—তবে?

—এমনি! অর্থাৎ আমার মনটা ভালো নয়। লোকের সঙ্গ ভালো লাগে না। আমি নির্জ্জনে থাকতে চাই, একলা!

মানগোবিন্দ স্থির দৃষ্টিতে পাপিয়াকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—কেন এমন হলো হঠাৎ?···তার পর একটু থামিয়া আবার কহিল,—সে রাত্রে সেই যে শশধরের সঙ্গে বকাবকি হচ্ছিল—তার পর কোথায় তুমি ছুটে বেরিয়ে গেলে, সারা রাত তোমায় খুঁজে হায়রাণ—ভয় লাগিয়ে দিয়েছিলে কি রকম! তাতে একটি কথা কই নি! তার উপর জানো, শশধর আমার একজন শাঁসালো মক্কেল! সেই ঘটনা থেকে তার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ হয়ে গেছে! তোমার কথায় আমি কি না করতে পারি, পিয়ারী? আর তুমি আমাকে এমন করে ছেঁটে ফেলচো! এর পরিণাম কি হবে, জানো···?

পাপিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মানগোবিন্দর পানে চাহিল। মানগোবিন্দ বলিল,—তোমায় এমন ভালবেসেচি যে তুমি আমায় ত্যাগ করলে আমার পক্ষে বেঁচে থাকা দায় হবে।···

কথাটা বলিয়া সুগভীর সহানুভূতির প্রত্যাশায় মানগোবিন্দ পাপিয়ার পানে চাহিল। পাপিয়া তবু কোনো কথা কহিল না। এ যেন একটা মাটীর প্রতিমূর্ত্তির সামনে পাগলের মত তার যা-তা বকিয়া যাওয়া!

মানগোবিন্দ কহিল—নির্জ্জনে থাকার কথা যা বলচো··· তাই যদি তো আমায় তা বলে আসতেও পারতে! তু না হাসি-মুখে বললে, বক্স রিজার্ভ করতে···আমি চলে গেলুম। ফিরে এসে দেখি, তুমি নেই!···আমি অবাক! ···তার পর বিটু বললে, ট্যাক্সিতে করে কাশীপুরে য... কথা। তাই তো এলুম···নাহলে কি ভাবনাতেই থাকতুম এই রাত্রে, ভাবো দিকিন্···

মানগোবিন্দ চুপ করিল; কিন্তু সে বিস্মিত হইল।·· এ তো অভিমান নয়, ক্রোধ নয়···কি তবে? এই যে হাসি-খুশী-গান চলিয়াছে—পরক্ষণেই হঠাৎ স্থির-গম্ভীর মূর্ত্তি···কঠিন নির্ম্মম হেঁয়ালির মত ভাব···কি এ!···কাঁটার মত একটা চিন্তা তার মনে বিঁধিল। তাই কি···? সে পাপিয়ার পানে চাহিল। পাপিয়ার সেই একই ভাব·· উদাস, আকুল অবিচলিত মূর্ত্তি! যেন পাথরের পুতুল

মানগোবিন্দ বলিল—আর কারো প্রতি সদয় হয়ে থাকো যদি···

আহত সর্পের মত পাপিয়া একেবারে গর্জ্জিয়া উঠিল তীব্র বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, দুই চোখে আগুন জ্বালিয়া সে কহিল—চুপ! ও কথা নয়, খবর্দ্দার! এবং কথাটা বলিয়াই সে একেবারে মূর্চ্ছিতার মত সোফার বুকে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া বুক-ফাটা কান্নায় নিজেকে ভাসাইয়া দিল।

মানগোবিন্দ ব্যাকুল হইয়া তার হাত ধরিয়া ডাকিল,—পাপিয়া…

পাপিয়া পাগলের মত উদ্বেলিত আবেগে মানগোবিন্দর দুই হাত ধরিয়া আর্ত্ত কণ্ঠে কহিল,—ছুটি, ছুটি, ওগো আমায় ছুটি দাও…এ মন-জোগানো ব্যবসা, এ রূপের পশরা সাজিয়ে নিত্য ধরা…এ আর ভালো লাগে না, সত্য ভালো লাগে না…আমার ঘৃণা ধরে গেছে। আমি বুঝতে পেরেচি, এর চেয়ে হেয় হীন কাজ নারীর আর কিছু নেই! নারী হয়ে বুকের মধ্যে রাজার ঐশ্বর্য্য নিয়ে তার পানে না চেয়ে, অতি তুচ্ছ খেলা, হীন জঘন্য বিলাসে মত্ত থাকা নারীর সাজে না। নারীত্বকে অহরহ ছেঁচে পিষে এই উদ্দাম রঙ্গ আর নির্লজ্জ হাসি-খুশী…অসহ্য হয়েচে আমার!…আমায় তোমরা ছুটি দাও· এই প্রাণ নিয়ে মন নিয়ে ঢের ছেলাখেলা করেচি…আর নয়…আর নয়!

উত্তেজনায় পাপিয়া হাঁফাইতে লাগিল।

মানগোবিন্দ কহিল,—কি বলচো তুমি পাপিয়া… এ-সব কথা…এ কথার মানে?

পাপিয়া কহিল,—কি বলচি, তা আমি নিজেই জানি না।…বলচি তো, আমার কিছু হয়েচে। কি হয়েচে, তা আমি জানি না, বুঝতেও পারচি না। তাই ছুটি চাইছি…দু'দিন ছুটি দাও। একবার নির্জ্জনে বসে ভেবে দেখি, আমি কে ছিলুম, আর কি-বা হয়েচে আমার! নিজে না বুঝলে তোমাদের কি বোঝাবো?

মানগোবিন্দ বলিল,—আমায় তাড়িয়ে দিয়ো না তোমার কাছ থেকে, পাপিয়া। তোমার এ অবস্থায় তোমায় ছেড়ে দূরে থাকা আমার পক্ষে সম্ভবও হবে না।

পাপিয়া সে কথায় কাণ দিল না। সে হঠাৎ ধড়-মড়িয়া উঠিয়া পাশের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে ঐ উদার মুক্তি…দেওয়ালের এতটুকু আড়াল নাই—প্রাণ-মাতানো মধুর বাতাস…আর ঐ নীল নির্ম্মল মুক্ত আকাশ, নীচে গঙ্গার স্নিগ্ধ শুভ্র বারির অবাধ প্রসার…প্রাণ যেন জুড়াইয়া গেল! বারান্দায় চুপ করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

মানগোবিন্দ ঘরের মধ্যে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তার পর সহসা নীচে নামিয়া গেল। গিয়া মালীকে জিজ্ঞাসা করিল,—যে বাড়ীতে সেদিন সকালে গেছলি, সেখানে শুধু সেই ছোকরা বাবুটি থাকে…না, আর কেউ?

মালী বলিল, আর কেহ থাকে না।

—হুঁ! বলিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মানগোবিন্দ উপরে আসিল, আসিয়া বারান্দায় গিয়া পাপিয়ার পিছনে দাঁড়াইল; দাঁড়াইয়া গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিল,—পাপিয়া…

এ আহ্বানে চমকিয়া পাপিয়া ফিরিয়া চাহিল কহিল,—কি?

মানগোবিন্দ কহিল,—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো—সত্য জবাব দেবে?

পাপিয়া ঈষৎ গর্ব্ব-ভরে মানগোবিন্দর মুখের পানে চাহিয়া কহিল,—বলবো।

মানগোবিন্দ বলিল,—তুমি যখন যা চেয়েচো, তখনি তা আমার কাছ থেকে পেয়েচো কি না…?

পাপিয়া এ কথার কোন জবাব দিল না। মান-গোবিন্দ বলিল,—যে খেয়াল তোমার হয়েচে, যখন যা, তাই পূরণ করেচি—তোমার গায়ে যে গহনা পরিয়েচি, আমার স্ত্রীর গায়েও তা নেই! ঘরে আমার স্ত্রী কেঁদে পায়ে লুটিয়ে পড়েচে,—তা গ্রাহ্য না করে তোমার পায়ের কাছে আমি কুকুরের মত লুটিয়ে রয়েচি—নয় কি?

পাপিয়া ফুঁশিয়া উঠিল,—আমি তোমায় কোনদিন এ অনুগ্রহ, এ প্রসাদ পাবার জন্য অনুরোধ করেচি…? আমার কথায় এ-সব করেচো তুমি…?

মানগোবিন্দ বলিল,—ঠিক এমন হুকুম তুমি করোনি বটে, কোনদিন—কিন্তু তোমার জন্যেই তো আমি ঘর-ছাড়া!

পাপিয়া কহিল,—মিথ্যা কথা! লুব্ধ ব্যাধ তুমি, আমার এই রূপ দেখে শিকারে এসেছিলে—নিজের মনের বাসনা মেটাতে, নিজের প্রাণে তৃপ্তি পেতে…আমার মুখ চেয়ে আমায় দয়া করতে আসোনি! তুমি এসেচো তোমার ক্ষুব্ধ বাসনা লালসা, তার পরিপূর্ণ তৃপ্তির প্রত্যাশায়…আমায় লুণ্ঠন করতে…নিজের স্বার্থে! তোমরা পুরুষ, তোমরা যখন ভালোবাসার কথা তোলো, তোমরা যখন মুখে বলো, ভালোবাসি—তখন তার অর্থ এ নয় যে আমাদের ভালোবেসে ও কথা বলচো—নিজের পিপাসা পূর্ণ করতে তোমরা মুখে বলো ভালোবাসি!…

মানগোবিন্দ বলিল,—কিন্তু কোনদিন তোমার উপর কোন অত্যাচার আমি করেচি? বলো! তোমারি খেয়ালে চলেছি আমি চিরদিন…

পাপিয়া কহিল, কারণ,—আমার খেয়াল নিবৃত্ত করাতেই ছিল তোমার সুখ! আমার খেয়াল তুমি যে মিটিয়েচো, সে আমায় তৃপ্ত করতে নয়, নিজেকে তৃপ্ত করবার জন্য! আমার হাসি ভালো লাগে বলেই আমায় হাসি-মুখে রাখবার প্রয়াস পেয়েচো!…মানুষ পাখী পোষে, তাকে আদর করে, যত্ন করে, সেটা পাখীর প্রতি অনুকম্পার দরুণ নয়—মানুষের নিজের সখের জন্য, তৃপ্তির জন্য! পাখীকে নেড়ে-চেড়ে সে নিজে সুখ পায়, তাই! ছেলে যদি বায়না নিয়ে বলে, বাপের পিঠে চড়বে তো বাপ ছেলের তৃপ্তির জন্যই তাকে পিঠে তোলে না,—ছেলের তৃপ্তি দেখলে নিজে ঢের বেশী

তৃপ্তি পাবে, তাই ছেলেকে পিঠে তোলে।...সে তৃপ্তি বাপ যদি না পেতো, তা হলে ছেলের বায়না শুনে পিঠে তাকে চড়তে দিত না—ছেলের পিঠে চড় বসাতো।

মানগোবিন্দ বলিল,—তবু বলো, তোমার কোন সাধে কখনো কোন বাদ সেধেছি? তোমার কোনো আকাঙ্ক্ষা কখনো অতৃপ্ত রেখেছি?

পাপিয়া কহিল,—তা তো রাখবার কথা নয়।...এ যে দেনা-পাওনার কারবার। আমি কাঁচের পুতুল। আমায় নিয়ে নানাভাবে তুমি খেলা করেচো, খেলা করে নিজে তৃপ্ত হয়েচো...আর সে তৃপ্তির দাম দিয়েচো টাকাকড়ি, গহনা, আমার অতি তুচ্ছ বায়না মেনে। প্রাণের সম্পর্ক এর মধ্যে কোথায়, বলো দিকিনি...একবার ভাবো—ভেবে বলো...

মানগোবিন্দ কোন কথা বলিল না। পাপিয়া বলিল,—কিন্তু এ-সবে অরুচি ধরে গেছে। সারা জীবনটা দাম নিয়ে পরের মন জুগিয়েই বেড়াবো কি? নিজের মন কি চায়, তার খোঁজ নেবো না? সে যা চায়, তা বুঝে তাকে তা দেবার কোন চেষ্টা করবো না...?

মানগোবিন্দ কহিল,—কিন্তু এ কি ভালো...? আমায় গোপন করে এই যে জঙ্গলের মধ্যে আর-এক-জনের কাছে ছুটে আসা...?

দুই চোখে আগুন জ্বালিয়া পাপিয়া মানগোবিন্দর পানে চাহিল। মানগোবিন্দ ভয় পাইল। সে বলিল, —আমি তোমায় যতখানি বিশ্বাস করি...তার কি এই প্রতিদান? আমি যে কুকুরের মত পড়ে আছি—নিজের মান-মর্য্যাদা, আত্মীয়স্বজন, ঘর-বাড়ী সব ছেড়ে...

পাপিয়া সগর্জ্জনে কহিল,—এইখানেই তো দুঃখ।...যাদের চাই না, তারা কুকুরের মত পায়ের কাছে লুটিয়ে থাকে...আর যাকে চাই...সে কঠিন, নির্ম্মম,—ফিরেও তাকায় না...! বলিতে বলিতে তার রুদ্ধ আবেগ বাঁধ ভাঙ্গিয়া তীব্র স্রোতে বহিয়া চলিল। পাপিয়া বলিল,—এ জীবনে এই রূপ আর যৌবন নিয়ে কত লোককে মুগ্ধ করেচি, লুব্ধ করেচি, শেষে নিরাশ প্রাণে তাদের তুচ্ছ অবহেলা দেখিয়ে ফিরিয়েও দিয়েচি—কত দীর্ঘ-নিশ্বাস যে আশে-পাশে সঞ্চিত আছে—সে কি কম পাপ!...সেই পাপেই আজ এ শাস্তি!...প্রকাণ্ড গর্ব্ব নিয়ে ভীরু কাপুরুষদের মজিয়ে জয় করেই ফিরেচি...কখনো ভাবিনি যে, এ-সব কাপুরুষ ছাড়া পৃথিবীতে যথার্থ পুরুষও আছে—যারা এ রূপ, এ যৌবনের মায়াজাল একটি দৃষ্টির ভঙ্গীতে এক-মুহূর্ত্তে ফাঁশিয়ে চুর করে দিতে পারে!—কথাটা বলিয়া সে শ্রান্ত হইয়া বারান্দার উপর বসিয়া পড়িল।

মানগোবিন্দ ব্যর্থ মনোরথে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মূর্খের মত সে যে এ নিজের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছিল।—পাপিয়ার রূপের ফাঁদ কাটিয়া যাওয়া তার পক্ষে এখন অসম্ভব। তার চোখের দৃষ্টিতে, তার মুখের কথায়, তার ঐ যৌবনের উচ্ছ্বাসে যে কি মাদকতা আছে, কি সুগভীর আকর্ষণ—কঠিন অবজ্ঞায় পাপিয়া ফিরাইয়া দিলেও সে এখান হইতে নড়িতে পারিবে না! মান-গোবিন্দ অস্থিরভাবে খানিকক্ষণ বারান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়াইল—তার পর পাপিয়ার পাশে বসিয়া তার শ্রান্ত শির কোলের উপর তুলিয়া লইল এবং তার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া বলিল—তোমার স্বাধীনতায় কখনো হাত দেবো না, পিয়ারী! তুমি মুক্ত!...কিন্তু আমি তোমার অতি দীন হতভাগা ভক্ত...আমায় কোন দিন তোমার পাশ থেকে তাড়িয়ে দিয়ো না। বেশী না পারো, এইটুকু দয়া অন্ততঃ করো। না হলে...না হলে আমি মরে যাবো,—সত্য মরে যাবো।

১১

শনিবার থিয়েটারে ভারী ধূম।

পাপিয়া মনে-মনে একটা সঙ্কল্প আঁটিল—এই চপলা যে কি দিয়া তৈরী, সে যে কত হীন, সেটুকু অমলের চোখে যদি ধরাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে অমলের অন্ধ চিত্ত হয়তো জাগিতে পারে! আর জাগিলে তখন হয়তো সে দেখিতে পাইবে, পাপিয়া কি অমূল্য মন লইয়াই তার প্রাণের দ্বারে বসিয়া আছে!

শুক্রবার সন্ধ্যার সময় সে কাশীপুরে আসিয়া অমলের সঙ্গে দেখা করিল, এবং অবিচল মূর্ত্তিতে অকম্পিত স্বরে বলিয়া গেল, অমল যেন থিয়েটার সুরু হইবার ঠিক আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ডানদিকে ফটকের সামনে দাঁড়াইয়া থাকে। কারণ, চপলা তাকে দেখিয়া চিনিতে চায়! এই কথাটুকু বলিয়াই সে গম্ভীরভাবে চলিয়া আসিল।

শনিবার সকালে পাপিয়া চপলাকে লিখিয়া পাঠাইল,—

ভাই চপলা দিদি, আমি তোমার সঙ্গে থিয়েটারে যেতে চাই। আমায় নিয়ে যেয়ো। মানগোবিন্দ অফিস থেকে সোজা থিয়েটারে যাবে। তার সঙ্গে বক্সেই দেখা হবে। তার অফিসের কাজে মোটরটা সন্ধ্যার সময় ব্যস্ত থাকবে, তাই ভাই, তোমার সঙ্গে যেতে চাইছি। তোমার মোটর ঠিক আছে তো? ভৃঙ্গ-রাজও যাচ্ছেন নিশ্চয়?

চপলা জবাব লিখিল,—

আচ্ছা। এখানে সন্ধ্যার আগেই আসিস্ তা হলে। ভৃঙ্গরাজ এখানে নেই। পাথরের কণ্ট্রাক্টের কাজে চুণার গেছে। আশ্বস্ত হও। দুদিন ছুটী সখি, ছাতু মাখতে হবে না। ভারী আপদ,—তা যাই বলিস্, নয় ভাই?

সন্ধ্যার পর চপলার গাড়ী থিয়েটারের ফটকের সামনে

আসিলে গাড়ীর মধ্য হইতে পাপিয়া দেখিল, তৃষিত চাতকের মত পিপাসু নেত্রে চাহিয়া অমল ঐ দাঁড়াইয়া আছে…তার বুকে কে যেন ছুরি বসাইয়া দিল! এত দরদ! তবু চপলা তার কথা কিছুই জানে না! তার মনে হইল, চপলাকে একবার বলে, ঐ ছাখো তোমার সেই কবি…

কিন্তু না! যদি চপলা তার পানে চাহিয়া একটা তাচ্ছিল্যের হাসিও হাসে,…তাহা হইলে অমল হয়তো ভাবিবে, ও তাচ্ছিল্য নয়, দরদের হাসি, তারিফের হাসি! না—তার চেয়ে…

পাপিয়া চপলার গায়ে ঠেলা দিয়া কহিল,—ওঃ ভিড় দেখচো!

—ফটকের সামনে ভিড় তো হবেই!

—তা নয় গো, পিছন দিকে ওধারে!

চপলা পিছন ফিরিয়া চাহিল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে তার গাড়ীও ফটকের মধ্যে ঢুকিল। পাপিয়া খুশী হইল, অমলের দিকে চপলার নজর পড়ে নাই! অমলের পানে চাহিয়া পাপিয়া হাসিল, আর অমল মুখে-চোখে রাজ্যের লজ্জা লইয়া কাঠের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া ছিল।…

বক্সে বসিয়া পাপিয়া নীচে চাহিয়া দেখে, ঐ যে অমল! কি সতৃষ্ণ ভঙ্গীতে প্রকাণ্ড পর্দ্দাখানার দিকে সে চাহিয়া আছে!…

ঘণ্টা বাজাইয়া পট তুলিয়া থিয়েটার-ওয়ালারা পালা সুরু করিয়া দিল।…ঐ সীতা! ঊর্ম্মিলা, মাণ্ডবীদের সঙ্গে উদ্যানে বসিয়া সীতা গল্প করিতেছে—কৌশল্যা আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল…লক্ষ্মণ আসিয়া চরণ বন্দনা করিল!…চকিতে একটা হাসির ঝাপটার মত সে দৃশ্য সরিয়া রাজবাড়ীর ঘর আসিয়া উদয় হইল। দুর্ম্মুখ অস্থির মনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—ঐ রাম…ঐ লক্ষ্মণ… বশিষ্ঠ…কি-সব কথাবার্ত্তা হইতেছে। তার পর…মুখে প্রেমের হাসির জ্যোতি মাখিয়া সীতা আসিল। রামের বুকে কি আদর যাচিয়া সে মাথা রাখিল…রাম কথা কহিল না—শুষ্ক চোখে সীতার পানে চাহিয়া। সীতা ব্যাকুল চোখে চাহিল, কহিল,—কথা কচ্ছ না কেন? মুখ তোমার মলিন কেন? রামচন্দ্র সীতার হাত ধরিয়া সখেদে নিশ্বাস ফেলিয়া বসিয়া পড়িল—তার পর দুর্ম্মুখের মুখে যা শুনিয়াছিল, সীতাকে বলিল। সীতা ম্লান চোখে রামের পানে চাহিল। রাম বলিল,—প্রজারা তোমার নির্ব্বাসন চায় সীতা…বলিয়াই রাম মূর্চ্ছিত হইল!… কিন্তু এ-সব যেন পুতুলের খেলা! তাদের একটা কথাও পাপিয়ার কাণে যাইতেছে না! পাপিয়ার চোখের সামনে ষ্টেজের উপর কি কতকগুলা সাজে সাজিয়া কয়টা প্রাণী নড়াচড়া করিতেছে, আর তার চোখের দৃষ্টি, তার সমস্ত মন…নীচে, ঐ পাঁচ-টাকার সীটে একটি লোকের হাব-ভাব-ভঙ্গী, তার ব্যথিত নিশ্বাসটুকু অবধি সাগ্রহে লক্ষ্য করিতেছে!…ও কি, ও যে কাঁদিতেছে…অমলের দুই চোখে জল!…ষ্টেজের পানে চাহিয়া পাপিয়া দেখে, রামের কাছে বিদায় লইয়া সীতা কম্পিত ত্রস্ত চরণে লক্ষ্মণের সঙ্গে ঐ কোথায় চলিয়াছে!

চারিধারে চটপট্ করতালি-ধ্বনি উঠিল। পাপিয়ার চমক ভাঙ্গিল। মানগোবিন্দ পাপিয়াকে ঠেলিয়া বলিল, —Excellent! তোমার চপলা দিদি কিন্তু first-class actress! নাঃ, ওর আর জোড়া নেই ষ্টেজে!

এ-সব কথা পিয়ারীর কাণেও গেল না।…সে পাষাণ-মূর্ত্তির মত নিশ্চল বসিয়া পাঁচ টাকার একটা সীটের দিকে চাহিয়া ছিল।…এত লোক বসিয়া থিয়েটার দেখিতেছে, পাণ খাইয়া, সিগারেট টানিয়া, হাসিয়া গল্প করিয়া কারা মাঝে মাঝে চঞ্চল উন্মাদ হইয়া উঠিতেছে… কিন্তু ঐ লোকটি…ওর চোখের সামনে অযোধ্যার সেই প্রাচীন যুগ বুঝি ছবির মত ফুটিয়া উঠিয়াছে—আর একাগ্রচিত্তে বসিয়া ও সেই ছবি দেখিতেছে!…এ লোকগুলার সঙ্গে উহার কত প্রভেদ…! পাপিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল।…

সহসা থিয়েটার-শুদ্ধ লোক হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া পড়িতে পাপিয়া আবার চমকিয়া উঠিল। ব্যাপার কি? মানগোবিন্দ তার হাত ধরিয়া টানিল, কহিল,—ওঠো পাপিয়া…

পাপিয়া সবিস্ময়ে কহিল,—কেন…?

মানগোবিন্দ হাসিয়া কহিল—কেন আবার কি!… থিয়েটার হয়ে গেল যে। সীতার পাতাল-প্রবেশ, তার পর আবার কি থাকবে! সব তো ফুরিয়ে গেল। বেড়ে করেছিল কিন্তু শেষের ঐ trick scene! মাটী ফেটে সীতা নেমে গেল তার মা-বসুন্ধরার কোলে! চমৎকার!…তা এখন ওঠো,—আর ফার্স-টার্স তো নেই—আজ শুধু এই একখানা বই-ই যে!

—ওঃ! বলিয়া কোন মতে অপ্রতিভ ভাব কাটাইয়া পাপিয়া উঠিল!…এতক্ষণ সে তো থিয়েটার দেখে নাই—চোখের সামনে কয়ঘণ্টা ধরিয়া কি যে হইয়া গেল, তার কিছুই সে জানে না! সে শুধু ঐ একটি লোকের উপরই তার দৃষ্টি আর মন নিবদ্ধ রাখিয়া উহারই ধ্যানে তন্ময় ছিল!

পাপিয়া তখন উঠিয়া বলিল,—তুমি যাও। আমি চপলা দিদির সঙ্গে যাবো—ওর সঙ্গেই এসেচি কি না! ভয় নেই, এখনি আমি বাড়ী ফিরবো…

—দেখো…মানগোবিন্দ একটু চিন্তিত হইল।

পাপিয়া কহিল,—ভয় নেই গো। তুমি এগোও… বলিয়া পাপিয়া ক্ষিপ্র চরণে নীচে ষ্টেজে নামিয়া গেল।

চপলা তখন মুখের হাতের রং ধুইয়া তোয়ালে দিয়া জল মুছিতেছে—আর আশে-পাশে ভক্তের দল জয়ধ্বনি করিতেছে।

পাপিয়াকে দেখিয়া চপলা কহিল,—এই যে আমার হয়েচে। আমি তৈরী। এখনি যাবো।···তার পর ম্যানেজারের দিকে চাহিয়া সে বলিল,—আমার গাড়ীটা ভেতরে এসেচে কি না, একবার দেখতে বলুন না কাকেও···

কাছেই প্রম্পটার দাঁড়াইয়া ছিল—ম্যানেজার তাহাকে আদেশ করিতেই সে ছুটিল গাড়ীর খোঁজে! ম্যানেজার তখন সবিনয়ে চপলার পানে চাহিয়া কহিল,—তাহলে আসচে-শনিবারেও একবার দয়া করতে হচ্ছে, চপল। আজ যে কত লোক জায়গা না পেয়ে ফিরে গেছে! তাদের নিশ্বেস কুড়িয়ো না···বুঝলে!

চপলা হাসিয়া কহিল,—ছাখ্‌তো ভাই পাপিয়া, ওঁদের মজা! ওঁরা বল্‌লেন, শুধু এক রাত্তির নামবো··· তার পর আবার এখন নতুন আব্দার তুলচেন···

পাপিয়া কোন কথা কহিল না।

ম্যানেজার বলিল—ভৃঙ্গরাজকে ধরতে হবে ফের···? বলো···

চপলা বলিল,—সে এখানে নেই, চুণার গেছে।

ম্যানেজার বলিল,—তা হলে···কি হবে? নামতেই হবে যে! না হলে থিয়েটার চালাবো কি করে? ও পার্ট আর কাকে দিতে পারি এখন, বলো? লক্ষ্মীটি, আমাদের একেবারে ভুলো না!···

চপলা বলিল,—আচ্ছা, আসচে শনিবারে নামবো— কিন্তু সে রাত্রে আর দেড়শো টাকা নিচ্ছি না। পুরোপুরি দুশো চাই!···

ম্যানেজার বলিল,—ঐ তো···আমরা ছাঁপোষা মানুষ—তোমার ভাবনা কি চপল?

—না, না, ওর কমে পারবো না।

ম্যানেজার কহিল,—আচ্ছা, ঐ দুশোই হবে···পঞ্চাশ টাকা নয় আমাকে দান করে যেয়ো, বাড়ী ফেরবার সময়।···কিছু কি দাবী নেই···?

ম্যানেজার হাসিল। চপলাও চোখের দৃষ্টিতে হাসির ফিনিক ফুটাইয়া কহিল,—বটেই তো!···

প্রম্পটার আসিয়া সংবাদ দিল, গাড়ী হাজির।

—তাহলে আসি। বলিয়া চপলা ম্যানেজারকে নমস্কার করিয়া পাপিয়ার হাত ধরিয়া আসিয়া মোটরে উঠিল। মোটর ফটকের মুখে ভিড় পাইয়া থামিল।

পথে তখন কি ভিড়! কালো মাথার ঢেউ ছুটিয়াছে যেন! তা ছাড়া গাড়ী, মোটর—

ফটকের ধারে পথের উপর দাঁড়াইয়া অমল। পাপিয়া তাকে দেখিল। হর্ণ বাজাইয়া তাদের মোটর অমলের পাশে আসিয়া পড়িল। অমল তন্ময়-দৃষ্টিতে চাহিল, পাপিয়া মুখ বাড়াইয়া হাসিল। চপলাও ফিরিয়া দেখিল। পাপিয়াকে কহিল,—কে রে? তোর জানা···

মৃদু স্বরে পাপিয়া কহিল,—আমার দেবতা!

কথাটা চপলার কাণে গেল।—বটে! বলিয়া সে মুখ বাড়াইল। অমলের সঙ্গে অমনি তার চোখোচোখি হইল। নিরীহ বেকুবের মত তার ভঙ্গী দেখিয়া চপলা একেবারে দমকা হাসিতে ফাটিয়া পড়িল। মোটরও তীব্র বেগে আগাইয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে পিছনে একটা ভয়ঙ্কর রোল উঠিল—গেল, গেল—ধরো, ধরো—এমনি রব। পাপিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল—কে একজন গাড়ী চাপা পড়িয়াছে, আর ভিড় একেবারে হৈ-হৈ করিয়া সেখানটায় গিয়া জড়ো হইতেছে!

পাপিয়ার বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। যদি তা হয়? যে রকম তন্ময় হইয়া এদিকে চাহিয়াছিল, আ কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া!···তার অন্তরাত্মা কাঁপি উঠিল। কি করিয়া জানা যাইবে···?

সোফারের পাশে বিট্টু ভৃত্য বসিয়াছিল। পাপি গাড়ী থামাইয়া তাকে বলিল—তুই যা তো রে, কি হয়েচে, দেখে আয়।

চপলা বলিল,—কি আবার হবে···?

পাপিয়া কহিল,—কেউ চাপা পড়লো, না, কি···

চপলা কহিল,—দেখে কি হবে?

পাপিয়া কহিল,—তবু জানবো না? আহা!

চপলা কহিল,—তুই যেন কি! এখন বাড়ী গি শুতে পারলে বাঁচি।

পাপিয়া কহিল,—না ভাই, না। তুই যা রে বিট্টু··

বিট্টু ছুটিয়া গেল। আর গাড়ীর মধ্যে বসিয় পাপিয়া কম্পিত বক্ষে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল—ত যেন না হয়, ঠাকুর···

একটু পরেই বিট্টু আসিয়া খপর দিল, একটি ছোকরাবাবু মোটর চাপা পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে

পাপিয়ার বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। সে কহিল— কি রকম দেখতে? গায়ে একটা হলদে রঙের রেশমী চাদর···? সেই বাবু···?

বিট্টু কহিল,—হাঁ মা, ঐ যে বাবু হামাদের বাড়ী গেছলো···ও-রোজ সবেরে···

—এ্যাঁ! পাপিয়ার সামনে সমস্ত আকাশখানা যেন সশব্দে ফাটিয়া গেল! সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।···

জ্ঞান হইলে পাপিয়া চাহিয়া দেখে, মোটর তার বাড়ীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর বিট্টু ডাকিতেছে, —মা, মা-জী—

পাপিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল। চপলা···? বিট্টু কহিল, তিনি তাঁর বাড়ীতে নামিয়া গিয়াছেন। পাপিয়ার

াথের শয়নে সেই চীৎকার ভাসিয়া উঠিল—গেল গেল, ্রা ধরো…পাপিয়া কাঁপিয়া উঠিল, ডাকিল—বিট্টু—

—মা-জী—.

পাপিয়া কহিল,—এই পাঁচ টাকা বখশিস্ নে! নিয়ে ্গ্‌গির যা! সেই ছোকরাবাবু যে মোটর চাপা পড়লো—্র কি হলো, খপর নিয়ে আয়। শীগ্‌গির…যাবি আর ্সবি—একটা ট্যাক্সি নিয়েই যা।

বিট্টু চলিয়া গেল। পাপিয়া মোটর হইতে নামিয়া ্পরে উঠিল। ঘরে আসিয়া দেখে, মানগোবিন্দ বিছানায় ইয়া ঘুমাইতেছে! সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল, ্র পরে বারান্দায় আসিয়া বসিল। নির্জ্জন পথ। মাঝে ্ঝে গ্যাস জ্বলিতেছে! পাপিয়ার মনে হইল, ও-গুলা ্ন রাত্রির চোখ! অসংখ্য করুণ নেত্র মেলিয়া নিশীথিনী ্র দুঃখ দেখিতেছে! সে বারান্দায় বসিয়া পথের পানে ্হিয়া রহিল; আর কায়-মনে ভগবানকে ডাকিতে ্গিল,—বিট্টু যেন ভালো খপর আনে ঠাকুর!

বিট্টু যখন খবর লইয়া ফিরিল, রাত্রি তখন তিনটা ্জিয়াছে। পাপিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া নীচে আসিল, ্হল,—কি খপর রে?

বিট্টু বলিল, লোকটি মারা যায় নাই—পুলিশ তাকে ্টা মোটরে চাপাইয়া বেলগেছিয়ার হাসপাতালে লইয়া ্য়াছে।

পাপিয়া কহিল,—ঠিক খপর দিচ্ছিস? দেখিস্, মিথ্যে ্স্ নে। যদি তোর খপর ঠিক হয়, তাহলে আরো ্শিস্ পাবি।

বিট্টু বলিল, সে একটা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া ্মেই থিয়েটারে যায়; সেখানে বীটের পাহারাওয়ালার ্ছে খবর লইয়াছে—তার পর সেখান হইতে থানায় ্য়া খবর লয়, থানা হইতে খবর লইয়া সে হাসপাতালে ্য়—এবং বাবুর ঘরের লোক বলিয়া সেখানে পরিচয় ্য়া দেখিয়া আসিয়াছে, বাবু বাঁচিয়া আছেন। নিশ্বাস ্ড়িতেছে, তবে নাক হইতে মাথাটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ্চাট লাগিয়াছে চোখে আর মাথায়। আপাততঃ ভয়ের ্কিছু না থাকিলেও পরে কি হইবে, ডাক্তার বাবুরা সে ্ম্বন্ধে নিঃসংশয়ে এখন কোনো কথা বলিতে পারেন না।

পাপিয়া কহিল—কাল একবার আমায় নিয়ে যেতে ্পারবি হাসপাতালে?

বিট্টু বলিল,—কেন পারবো না!

পাপিয়া কহিল,—তাহলে তোর সঙ্গে যাবো। আমি ্গাড়ীতে থাকবো, আর তুই ভেতরে যাবি।… বাবু যেন ্জানতে না পারে…বুঝলি?

বিট্টু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, আচ্ছা! অর্থাৎ সে খুব বুঝিয়াছে। এ পাড়ায় বিট্টু আজ প্রায় ্সাত বৎসর কাজ করিতেছে—কাজেই এ-সব কথা বুঝিবার মত বুদ্ধি যে তার বিলক্ষণ জন্মিয়াছে, এইটুকুই সে ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়া দিল।

পাপিয়া কহিল,—আচ্ছা, যা, এখন শুগে যা। গাড়ী ভাড়া ওর মধ্যে হয়ে গেছে তো? কাল সকালে বখশিস্ নিস্। পাঁচ টাকা দেবো।

বিট্টু চলিয়া গেল। পাপিয়া সেই বারান্দাতেই বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিল। ঘুমাইতে হইবে, ঘুম পাইয়াছে, এ কথা এখন সে ভুলিয়া গিয়াছিল।

১২

হাসপাতালে প্রায় একমাস থাকিবার পর অমল সারিয়া উঠিল, কিন্তু চোখের দৃষ্টি হারাইল। সে অন্ধ হইল। ডাক্তাররা বলিলেন, চোখের চোট খুব গুরুতর—ভিতরে প্রচুর রক্তস্রাব হইয়াছে। যদি ভবিষ্যতে এমনি কখনো সারে, তবেই ভালো। নচেৎ আজীবন তাকে অন্ধ হইয়া কাটাইতে হইবে।

সারিয়া উঠিয়া অমল শুনিল, এবার তাকে হাসপাতাল ছাড়িয়া যাইতে হইবে। অমল ভাবিল, এর চেয়ে তার মৃত্যু হইল না কেন? একা অসহায়—অন্ধ হইয়া সে বাঁচিবে কি করিয়া? ডাক্তারদের বলিল—অন্ধ আমি, কোথায় যাবো?

ডাক্তার বলিলেন,—কেন, আপনার তো সে ভাবনার কোন কারণ দেখচি না। আপনার লোক অত টাকা খরচ করে আপনার নার্শদের ভোজ দেওয়ালেন, আমাদের পার্টি দেওয়ালেন…

অমল অবাক হইয়া বলিল,—আমি…আমার লোক…?

ডাক্তার বলিলেন—কেন, রোজ আপনার কে আত্মীয়া দেখতে আসেন তো! আপনার দিদি হন বুঝি? বিধবা মানুষ—থান-পরা, মোটা চাদর গায়ে…গাড়ীর মধ্যে বসে থাকেন, চাকর এসে দেখে যায়…

অমল আরো বিস্মিত হইয়া কহিল—সে কি ডাক্তার-বাবু! আমার যে কেউ নেই এ পৃথিবীতে…

ডাক্তার ভাবিলেন, লোকটার মাথা আজো ঠিক হয় নাই! ঠিক না হওয়া বিচিত্রও তো নয়! যে আঘাত লাগিয়াছিল, এ তো এক-রকম পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে! তিনি বলিলেন,—তিনিই তো আসবেন, বলে গেছেন। বেলা তিনটে নাগাদ্ এসে আপনাকে আপনার বাড়ীতে নিয়ে যাবেন! নাহলে আজ সকালেই আপনার ডিস্‌চার্জ্জ হয়ে যাবার কথা…!

অমল অবাক্ হইয়া গেল। তার দিদি…? নিত্য খবর লইতে আসেন! ডাক্তারবাবুদের ও নার্শদের ভোজ দিয়াছেন!…এ কি সে স্বপ্ন দেখিতেছে,…না, দয়াময় ভগবান আজ অন্ধ করিয়া কোন্ আপনার জনকে

সহায় করিয়া পাঠাইয়াছেন, এই অন্ধকে হাত ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য…!

আহারাদির পর অমল শয্যায় পড়িয়াছিল। তার চোখ হইতে সব আলো কাড়িয়া এ কি করিলে, ভগবান…! যে ধ্যানটুকুকে সে সম্বল করিয়া পড়িয়াছিল… সে ধ্যানের দেবী যে-মুহূর্ত্তে পরম তৃপ্তি-ভরে তার পানে হাসিয়া চাহিল—যে-মুহূর্ত্তে পরম তৃপ্তি-ভরে তার চোখের সহিত দৃষ্টি বিনিময় করিয়া সে ধন্য হইয়াছে, কৃতার্থ হইয়াছে, এ চোখের সে-দৃষ্টি ঠিক তার পরক্ষণেই এমন অকরুণ নির্ম্মম হাতে কাড়িয়া লইলে!…এ জীবনের মত তাকে দেখার আশাও বিলুপ্ত করিয়া দিলে…!

হাসপাতালের বেয়ারা আসিয়া খপর দিল, আপনার গাড়ী আসিয়াছে—আসুন…

অমল অবাক্! তার গাড়ী আসিয়াছে! সে কোনো প্রশ্ন তুলিল না। ভৃত্য হাত ধরিয়া অমলকে একখানা ঘোড়ার গাড়ীতে তুলিয়া দিল। গাড়ীর দ্বার বন্ধ হইল; গাড়ী চলিল। অমল হাত বাড়াইয়া দেখিল, গাড়ীতে কেহ আছে কি না?

কেহ নাই! কথা কহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—গাড়ীতে কে? কোনো জবাব নাই। গাড়ীর মধ্যে সত্যই কেহ ছিল না—শুধু একটা ভৃত্য কোচবক্সে বসিয়া গাড়োয়ানকে পথ নির্দ্দেশ করিতেছিল।

চলিয়া চলিয়া গাড়ী আসিয়া এক জায়গায় থামিল। …কে একজন গাড়ীর দ্বার খুলিয়া তার হাত ধরিল, কহিল,—নামুন, বাড়ী এসেচি।

অমল কহিল,—কোথায়? কার বাড়ী?

যে হাত ধরিয়াছিল, সে বলিল,—কাশীপুরে আপনার বাড়ী।

অমল কহিল,—তুমি কে?

লোকটা বলিল,—আপনার চাকর।

অমল কহিল,—আমার চাকর! আমার তো চাকর নেই। তোমার নাম?

লোকটা বলিল—শিবশঙ্কর। আমায় শিবু বলে ডাকবেন।

অমল তার হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামিল। গাড়ী চলিয়া গেল।

অমল কহিল—আচ্ছা শিবু, বলতে পারো, তোমায় কে পাঠালে?

শিবু কহিল,—আজ্ঞে, মা-জী…

—মা-জী! কোথাকার মা-জী?…কে তোমার মা-জী…

—আজ্ঞে, বাড়ী গেলেই দেখতে পাবেন।

—আমার তো চোখ আর নেই, শিবু…দেখার ভাগ্য চিরদিনের জন্যে খুইয়েচি…অমল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যা[গ] করিল। শিবু তার হাত ধরিয়া তাকে ঘরে লইয়া গেল

ঘরের মধ্যে শয্যায় বসিয়া অমল হাত বুলাইয়া শ[য্যা] অনুভব করিল; ডাকিল,—শিবু…

—বাবু…

—এ কার বিছানায় আমায় নিয়ে এলে?

—আজ্ঞে, আপনার বিছানা।

—আমার বিছানা!…না। সে তো এত নরম নয়… এ যে নরম, ফুলের মত!…তারপর একটু থামিয়া আব[ার] সে ডাকিল—শিবু…

শিবু কাছে আসিল। অমল কহিল—তোম[ার] হাত…

শিবু অমলের হাতে হাত রাখিল। অমল তার হা[ত] দুটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল—তোমার এই হাত ধ[রে] মিনতি করচি, আমায় আজ অন্ধ পেয়ে তামাসা ক[রো] না। বলো ভাই, এ আমায় কোথায় নিয়ে এলে… কেন নিয়ে এলে…?

শিবু মিনতির স্বরে কহিল—কি সব বলচেন বাবু… আমি চাকর, আপনি মনিব। আপনাকে ছুঁয়ে আ[মি] বলচি, আপনার সঙ্গে তামাসা করচি না, কো[নো] ছলনাও করচি না। এ যথার্থই আপনার সেই চি[র]কালের পুরানো ঘর…

অমল তার হাত ছাড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া রহিল… তার চিরকালের ঘর!…গাছের ডালে একটা পা[খী] ডাকিতেছিল—ও-পাশের ঘাটে মাঝিরা নৌকায় পে[রেক] মারিয়া কাঠ জুড়িতেছিল। উৎকর্ণ হইয়া অমল শব্দ শুনিল, তার পর কহিল,—সেই চেনা শব্দ…পাখী… সেই চেনা ডাক…এখন বোধ হয় বিকেল—

শিবু কহিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ।

অমল কহিল,—সব মিলচে…বিকেলের সেই হাও[য়া]… পাখীর সেই ডাক,…সব ঠিক! শুধু বিছানাটা তফ[াৎ] হয়ে গেছে!…তা, শিবু…

শিবু বলিল—ব ন…

অমল কহিল,—তুমি যে বললে, তোমার মা-জী সব করেচেন…তা কোথায় তিনি? তাঁকে ডাকে[া] একবার…দয়াময়ী দেবী, তাঁর এত দয়া অন্ধ আতুরে[র] উপর! তাঁকে ডাকো, তাঁকে আমি প্রণাম ক[রি] একবার।

শিবু কহিল,—তিনি আপনার জন্য খাবার নি[য়ে] এখনি আসবেন—খাবার তৈরী করচেন।

অমল সস্নেহে কহিল,—না না, খাবারের কো[নো] দরকার নেই। তাঁকে ডাকো, তাঁর পায়ের ধূলো পেলে আমার সব ক্লান্তি ঘুচে যাবে…

শিবু কোনো কথা বলিল না। অমল উৎকর্ণ হই[য়া]

আকুল চিত্তে বসিয়া রহিল—করুণাময়ী, এত করুণা… কে তুমি!…আজ চোখের দৃষ্টি কাড়িয়া ভগবান, এ দগ্ধ দীন পৃথিবীকে কি শ্যামল স্নেহচ্ছায়ায় ভরাইয়া তুলিলে!…

শিবু কহিল,—মা-জী এসেচেন, বাবু…আমি বাইরে যাচ্ছি।

অমল কহিল,—একটু দাঁড়াও শিবু। তিনি কোথায়? তোমার মা-জী? আমায় তাঁর পায়ের কাছে বসিয়ে দাও—বলিয়া অন্ধ অমল আশ্রয় মাগিয়া দুই হাত বিস্তার করিয়া দিল; অমনি হাতে কার কোমল স্পর্শ অনুভব করিল। সেই কোমল হাতখানি দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া সেই হাতখানি বুকে তুলিয়া অমল তার উপর প্রাণের কৃতজ্ঞতা উজাড় করিয়া দিল। তার পর বাষ্প-গাঢ় কণ্ঠে কহিল—অন্ধ আমি, চক্ষু হারিয়েচি…করুণাময়ীকে দেখতে পেলুম না…কিন্তু এ স্পর্শ—এ যেন অমৃত! স্বর্গ আমার…বলিয়া সেই কোমল হাতখানি নিজের অন্ধ নয়নের উপর চাপিয়া ধরিল। অন্ধের নয়নের কোণে দুই বিন্দু জল মুক্তার মত ফুটিয়া উঠিল।

করুণাময়ী গাঢ় কণ্ঠে কহিল,—একটু কিছু খান…

এ কার স্বর…! এ স্বর…? না, এ স্বর তো আগে আর কখনো সে শোনে নাই!

অমল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—খাবো না।

করুণাময়ীর বুক ভাঙ্গিয়া দুই চোখ ঠেলিয়া অশ্রুর সাগর ছুটিয়া আসিতেছিল। অতি-কষ্টে সে অশ্রু-বেগ চাপিয়া সে কহিল,—কেন…?

অমল কহিল,—কে আপনি, না জানলে আমি খাবো না। এত দয়ার পর এ নির্দ্দয়তা…এ যে আমার প্রাণে বড় বাজচে!

করুণাময়ী কাতর কণ্ঠে কহিল—দয়া! তার কি পরিচয় পেয়েচেন আপনি?

অমল হাসিয়া কহিল—পাই নি…? হাসপাতালে নিত্য গিয়ে খোঁজ নেওয়া, ডাক্তারবাবুদের নার্শদের ভোজ দেওয়া—অন্ধ আমি, আমার জন্য লোক পাঠিয়ে এমন সমাদরে এখানে আনা…তারপর এই ফুলের মত বিছানা, তৈরী খাবার—এ যে কল্পনার অতীত! এততেও কি পরিচয় যথেষ্ট পাই নি!

করুণাময়ীর দুই চোখ ছাপাইয়া জল ঝরিতেছিল। আঁচলে চোখের জল মুছিয়া সে কহিল—পরিচয় যদি না দি…? পরিচয় না নিয়ে যদি শুধু স্নেহ আর সেবাই খান, তাতে ক্ষতি আছে?

—আছে।…আমার দিক থেকে শুধু নেওয়াই চলবে, বুঝচি। তবু কার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো, মনকেও তা জানাবো না?

—আমি কে, বুঝতে পারচেন না…?

—ঠিক পারচি না। তবে—

—তবে কে, বলুন দিকি…

—কিন্তু না…কে আপনি? কিসের আকর্ষণেই বা এই গরিব অন্ধ আতুরের জন্য এতখানি করচেন—এ যে পাগলেও করে না…

—যদি বলি, আমারি জন্য আপনার এই দুর্দ্দশা, সে রাত্রের সেই বিপদ, এই অন্ধতা—এ-সব আমারি জন্য…আর এত যত্ন পাওয়া? অত-বড় অপরাধের কিছু প্রায়শ্চিত্তও যদি এতে হয়, এই ভেবে শুধু এ সেবার ভার আমি নিতে এসেচি…

অমল অবাক হইয়া গেল। এঁর অপরাধে তার এই দুর্দ্দশা! কে…ইনি? তবে কি ইহারই মোটরে সে-রাত্রে সে চাপা পড়িয়াছিল! তাই অনুতাপে গলিয়া…কিন্তু না—এ তো একজন নারী…একজন নারী অসাবধানে মোটর চালাইয়া তাহাকে আহত করে নাই, নিশ্চয়ই!… তবে? কার অপরাধের জন্য কে এ কঠিন দণ্ড মাথায় তুলিয়া লইতেছে! একজন নারী কার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে আসিয়াছে—তার নিজের ঘর-বাড়ী, আত্মীয়-স্বজন, সব ছাড়িয়া? এ যে অসম্ভব ব্যাপার! কে এ…?

অমল কহিল,—এ হতেই পারে না। আমি অন্যমনস্ক ছিলুম বলেই চাপা পড়েছিলুম—সে দোষ আমারই। আর কারো দোষ তাতে থাকতে পারে না!

—কিন্তু আপনার তো সেখানে যাবার দরকার ছিল না, যদি না…

—যদি না থিয়েটার দেখতে যেতুম—এই কথা বলচেন তো?

—থিয়েটারে তো আপনি যান না—শুধু সেই দিনই গিয়েছিলেন!

অমল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। কিন্তু পরক্ষণেই কিসের আনন্দে তার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল! উচ্ছ্বসিত স্বরে সে কহিল,—চপলা যদি সীতা না সাজতো, তাহলে যেতুম না—এই কথা বলচেন? সে কথা ঠিক…তাহলে… তাহলে আপনি…না, না—পাগলের মত এ আমি কি বকচি…

উদ্গত আগ্রহে করুণাময়ী কহিল,—বলুন, বলুন, আমি কে?…উত্তরের প্রতীক্ষায় সে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া যেন ফুঁশিতে লাগিল।

অমল কহিল,—আপনি চপলাসুন্দরী…আপনারই ধ্যানে…?

সহসা পাশে একটা আর্ত্ত স্বর ফুটিল। সে আর্ত্ত স্বরে শিহরিয়া অমল থামিয়া পড়িল, এবং পরক্ষণেই কহিল,—ও কি! আপনার লেগেচে কোথাও…?

গাঢ় স্বরে উত্তর হইল—না।

—তবে…তেমনি একটা চীৎকার যেন শুনলুম…!

—ও আপনার মনের ভুল! উত্তেজনার ঘোরে কি নেচেন!

অমল কহিল—কৈ, দেখি আপনার হাত!—আঃ! তাহলে আপনি চপলাসুন্দরী…?

গাঢ় স্বরে উত্তর হইল,—যদি সে হলে আপনি অসুখী হন, তাহলে সে-ই! নারীর দুই চোখে অশ্রুর ঝর্ণা হিল।

অমল কহিল,—কিন্তু এত দয়া…! বুঝেচি, আপনি রবেচেন, আপনাকে দেখতে গিয়েই অসাবধানে গাড়ী পা পড়েচি—ঠিক তা নয়!—তবে আপনার চোখের ষ্টির সঙ্গে যে-দণ্ডে আমার দৃষ্টি মিশলো, আমার দেহে-নে যেন কিসের বান ডেকে গেল—দুনিয়ার যত আলো চোখের সামনে কি প্রখর দীপ্তিতে যে জেগে উঠলো—ার পর সব অন্ধকার!…অন্ধকার, কেবলি অন্ধকার—জীবন দুই চোখে এই অন্ধকার বয়েই আমায় বেড়াতে বে এখন!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অমল চুপ করিল—আর করুণাময়ী…। তার চোখের জল কিছুতে আর থামিতে চায় না! এত জলও ছিল তার দুই চোখে!

বহুক্ষণ পরে অমল কথা কহিল। সে বলিল,—আপনিই আমার জন্য এত করেচেন, করচেনও! এ যে অন্ধ হয়েও আমার আনন্দ ধরচে না আজ…

করুণাময়ী কহিল,—কি আর করেচি!…আমি পোড়ারমুখী আপনার পানে যদি চেয়ে না দেখতুম—তাহলে তো আর এ বিপদ ঘটতো না!…সে যে কি অপরাধ করেচি—তার জ্বালায় পলে-পলে পুড়ে মরচি…

অমল কহিল—মাঝে মাঝে আসবেন তো আমাকে দেখতে…? আর ঐ চাকরটিকে আপনিই বুঝি আমাকে আগলাবার জন্য রেখেচেন…?

করুণাময়ী আর্ত্ত স্বরে কহিল—না, না, কারো কাছে বিশ্বাস করে তোমায় আমি ছেড়ে দিতে পারি না যে… আমি যাবো না, তোমার এ ঘর ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না আমি!…এখানেই আমি থাকবো গো!… ওগো অন্ধ, ওগো বেচারা,—তোমার সেবাই আমার জীবনের ব্রত হোক্। অনেক পাপ করেচি, তোমার সেবায় কি কিছু তার কমবে না? আমার হারানো হাসি কি এ জীবনে কোনো দিন ফিরিয়ে পাবো না?

কিন্তু না। করুণাময়ী দুই হাতে জোর করিয়া মনের যা-কিছু বেদনা ঠেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—এবার তুমি খাও।

অমল রেকাবি লইয়া খাবার খাইতে লাগিল—আর করুণাময়ী তার পানে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতেছিল, আর-একদিনের কথা…সেদিনও অমল জলখাবার খাইতেছিল, কিন্তু মুখে সেদিন কি অপ্রসন্ন ভাব! আর আজ…!

হা রে হতভাগিনী! সেদিন সে যা, তাই ছিল-পাপিয়া! অমলের একটু হাসি, এতটুকু প্রসন্ন দৃষ্টি ভিখারিণী পাপিয়া! আর আজ? সে পাপিয়া নয়—চপলা সেই নির্ম্মম নিষ্ঠুর পিশাচী চপলা! যেদিন সে পাপি ছিল, অন্ধ অমল সেদিন সে পাপিয়াকে চেনে নাই আর আজ দুই চোখ হারাইয়া সে-পাপিয়াকে চেনা তা পক্ষে আরও অসম্ভব!

১৩

পাপিয়া ঘরের কোণে বসিয়া ষ্টোভ জ্বালিয়া খাবা তৈরী করিতেছিল; অমল বিছানায় চুপ করিয়া বসি ছিল। হঠাৎ সে ডাকিল,—চপলা…

পাপিয়া শিহরিয়া চাহিয়া দেখিল। অমল দুই হা বাড়াইয়া আবার ডাকিল,—শুনচো চপলা?

পাপিয়া হাতের কাজ রাখিয়া অমলের কাছে আসিল মৃদু কণ্ঠে কহিল,—কি?

—আমার কাছে একটু বসতে পারবে?

পাপিয়া কহিল,—কেন?

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো।

—বলো।

—আমি বাড়ী এসেচি…আজ ক'দিন?

—পাঁচ দিন।

—এই পাঁচ দিন তুমি সর্ব্বক্ষণই এখানে আছো… এর মানে? অমল একটু থামিল।

একটু পরে সে আবার কহিল,—তুমি কি এর মধ্যে বাড়ী যাওনি? একবারও না…?

গাঢ় স্বরে পাপিয়া কহিল,—না।

—কেন যাওনি, চপলা…?

চোখের জল মুছিয়া পাপিয়া কহিল,—কি ক যাবো…তোমায় একলা ফেলে…!

—কিন্তু আমার তো এ দু-একদিনের রোগ নয়!… হয়তো আজন্মই অন্ধ হয়ে থাকবো। আর তুমি…?

—আমাকেও তা হলে আজন্ম এখানে থাকতে হবে!

সুগভীর বিস্ময়ে অমল কহিল—না, না, তা হতে পারে না!

পাপিয়া বেশ স্থির কণ্ঠেই জবাব দিল,—কেন হতে পারে না?

অমল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—তা হতে পারে না, চপলা। একটা অন্ধ আতুরের জন্য তুমি তোমার এত বড় নাম, অমন কীর্ত্তি—সব ত্যাগ করবে!… তা ছাড়া এই বিশ্রী বদ্ আবহাওয়ার মধ্যে থাকো তুমি, তোমার প্রাসাদ, ঐশ্বর্য্য সব ছেড়ে, এই নির্ব্বাসন মাথায় বয়ে…এ হবে না, হতে আমি দেবো না…

পাপিয়ার বুক অসহ্য বেদনায় টলমল করিতেছিল। দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া সে কহিল,—তোমায় কে দেখবে···?

অমল কহিল,—ঐ যে পথে কত অন্ধ আতুর ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের কে দেখে, চপলা···?

পাপিয়া কহিল;—তাদের যে-ই দেখুক, সে খপর আমি জানতে চাই না। তবে এটুকু জানি, তোমায় না দেখা ছাড়া আমার উপায় নেই···

অমল আশ্চর্য্য হইয়া গেল; কোনো কথা কহিল না।

পাপিয়া কহিল,—আমার জন্যই তোমার এ দশা, আজ!···তুমি যদি থিয়েটার দেখতে না যেতে!···এখন তোমায় না দেখলে আমার পাপ হবে···তোমায় দেখা আমার কর্ত্তব্য আজ···!

অমল একটু বেদনা পাইল, কহিল,—শুধুই কি কর্ত্তব্য এ?

পাপিয়ার দুই চোখে জল ঠেলিয়া আসিল। ভগবান, ভগবান, এ যে অসহ্য! এমনি করিয়া চপলা সাজিয়া তাহারি উদ্দেশে অমলের প্রাণের যা-কিছু আবেদন-নিবেদন এমন করিয়া শোনা, গ্রহণ করা···এ যে কতখানি মর্ম্মান্তিক···! সে আঁচলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অমল আবার ডাকিল,—চপলা···

গাঢ় স্বরে পাপিয়া কহিল,—কেন?

অমল কহিল,—তুমি বাড়ী যাও—কখনো-কখনো এক-আধবার আমায় নয় দেখতে এসো, তা হলেই আমার ঢের পাওয়া হবে!···

পাপিয়া কোনো কথা কহিল না। অমল উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিতে লাগিল,—সেই তোমায় দেখি,···শ্রীরাধা সেজে বিশ্বের বিরহ বুকে নিয়ে তোমার সেই কাতর অশ্রু···সে অশ্রু আমার বুকে এখনো টলটল্ করচে··· তোমার সে ছবি কখনো ভুলবো না!···এই বিজনে বসে সেই ছবি ধ্যান করে আমি প্রাণের গান গাই···তা তুচ্ছ, জানি···তবু গেয়ে কি সুখ যে পাই···! আমার জীবনের সান্ত্বনা, আমার মস্ত সম্বল, এ নিয়ে কি সুখে আছি, এ দুঃখ-দারিদ্র্য আমায় টলাতেও পারে না··· এতটুকু না!···আমি আমার মন নিয়ে বিভোর হয়ে আছি! আমার চারিধারে দুনিয়াও আমার স্বপ্নের রঙে রঙীন হয়ে আছে!···অমল হাসিল, হাসিয়া কহিল,— আমার এ স্বপ্ন যে এমন করে সফল হবে, সে কল্পনা করতেও কখনো আমার ভরসা হয় নি! চপলা···

ক্ষুব্ধ বেদনায় প্রাণ ভাঙ্গিয়া গেলেও পাপিয়া অবিচল কণ্ঠে সাড়া দিল,—উঁ···

—সেদিন আমার দুর্দ্দিন নয়, চপলা, সুদিন—যেদিন মোটরের ধাক্কায় পথে পড়ে মরতে বসেছিলুম···যেদিন চোখের দৃষ্টি হারিয়ে অন্ধ হয়েচি···অমল আবেগের উচ্ছ্বাসে পাপিয়ার স্বর লক্ষ্য করিয়া একটা হাত বাড়াইয়া দিল।

পাপিয়া তাহা দেখিল। চোখে তার অশ্রুর আর বিরাম ছিল না। মন্ত্র-চালিতের মত সেও অমলের হাত ধরিল। অমল পাপিয়ার হাতখানি নিজের হাতে চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—না হলে এ হাতের এই সেবা তো কখনো পেতুম না!···

অমল স্থির হইল! তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিল,—এক পিশাচিনী···সে কি বলতো, জানো?

পাপিয়ার বুক কাঁপিয়া উঠিল; দুই চোখ অশ্রুতে ভরা থাকিলেও বিপুল শিহরণে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। সে তার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ করিয়া অমলের কথার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিল। অমল কহিল,—সে বলতো, তুমি পাষাণী শয়তানী···

পাপিয়া আর আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না; উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে ফাটিয়া পড়িয়া একেবারে হাহাকার করিয়া উঠিল,—ওগো থামো, থামো,—আমি জানি, জানি···সে যে তোমার প্রেম কামনা করে উন্মাদ হয়ে গেছে···সে যে কত বড় দুর্ভাগিনী, তা আমি জানি··· বলিতে বলিতে পাপিয়া শিহরিয়া উঠিল—এ কি, এ সে কি করিতেছে! এই ছদ্ম ভূমিকায় ছলনার মাঝ দিয়া যদি তার কামনাকে আজ অমলের সেবায় সার্থক করিয়া তুলিবার অবসর পাইয়াছে তো মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় এ সে কি করিতেছে! সে যে বাতাসে প্রাসাদ রচনা করিতেছে! বালির বাঁধ দিয়া সাগরের উচ্ছ্বসিত বারিরাশি বাঁধিতে বসিয়াছে, তা সে জানে···তবু এই অতর্কিত কথার আঘাতে সে প্রাসাদ, সে বাঁধ এমন করিয়া নিজের হাতেই ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দিতেছে! সর্ব্বনাশ! তা হইলে যে তার আর কোনো উপায় থাকিবে না!···তাড়াতাড়ি নিজেকে সে সম্বরণ করিয়া কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল—এ সব কথা আর নয়!···

অমলের বিস্ময়-কৌতূহলের আর সীমা রহিল না।··· সে মাথা তুলিল; এবং ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল,—তুমি সত্যই চপলা···?

পাপিয়া আপনাকে প্রাণপণ বলে চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—হ্যাঁ।···বলিয়া আতঙ্কে-অধীর চোখে সে অমলের পানে চাহিল।

অমল কহিল,—ও কথায় তুমি কষ্ট পেলে! তার কথায় অমন ব্যাকুল হয়ে উঠলে যে!

পাপিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল,—সে যত-বড় পিশাচিনীই হোক, আমার ছোট বোনের মত! তা ছাড়া আমি যে তাকে জানি···

—কি জানো, চপলা ?

—এই জানি যে, সে তোমার জন্য সমস্ত পৃথিবী-টাকে পায়ের ঠোক্করে হঠিয়ে সব ছেড়ে চলে আসতে পারে···

অমল একটু চুপ করিয়া বসিল; তার পর মৃদু-কণ্ঠে কহিল,—পাগল···! আমি তো এই···

পাপিয়া স্থিরভাবে তাকে লক্ষ্য করিল। মনে মনে বলিল, তুমি যা, তাই—তবু সে মরিয়াছে! কি করিয়া মরিল, তা ভাবিয়া নিজেই সে অবাক হইয়া আছে···!

অমল কহিল,—ও-কথা থাক্!··· এখন আমার একটা কথা শুনবে ?

পাপিয়া কহিল,—কি ?

অমল একটু সঙ্কোচ-ভরে কহিল,—আমার সে খাতা-খানা আনবে···? একটু পড়বে?···তোমারি উদ্দেশে প্রাণের গান গেয়েচি···সে কিছুই নয় তবু তোমারি জন্য গাওয়া···! আমার তো ক্ষমতা নেই··থাকলে নিজেই তোমায় পড়ে শোনাতুম······সেগুলি যদি পড়ো, আমার সামনে···

পাপিয়া দেখিল, ছলনার পথে পরীক্ষা কত! আর সে পরীক্ষা কি নির্ম্মম, কি অকরুণ!—তবু তা সহিতেই হইবে! সে তো সব সহিবার জন্যই নিজেকে প্রস্তুত করিয়া এখানে আসিয়াছে···এখন আর ভাবিয়া ফল নাই! এ সর্ব্বনেশে খেলার সূত্রপাত সে-ই করিয়াছে—এখন এ খেলা ফেলিয়া হঠিবারো উপায় নাই··উপায় থাকিলেও সে শক্তি নাই··!

পাপিয়া বলিল,—পড়বো। কিন্তু খাবার তৈরী করছিলুম—সেগুলো শেষ করে আসি। এসে পড়বো।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অমল কহিল,—তাই হবে।···

পাপিয়া অমলের পানে আর একবার চাহিয়া ষ্টোভের পাশে গিয়া বসিল। তার দুই চোখে তখনো জল ঝরিতেছিল। আঁচলে চোখের জল মুছিয়া সে ষ্টোভের উপর ছোট কড়াখানা চাপাইয়া দিল, এবং কড়ায় খানিকটা তেল ঢালিয়া আলু ছাড়িয়া দিল। এমন সময় দ্বারের পাশে শিবু আসিয়া দেখা দিল। হাতের ইঙ্গিতে তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া কড়ায় তরকারী চাপাইয়া পাপিয়া উঠিয়া শিবুর কাছে আসিল ও তাহাকে ডাকিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

শিবু বলিল,—বাবু তো তুলকালাম্ লাগিয়ে দেছেন, মা। বাগানেও এসেছিলেন। মালীকে এই মারতে যান্ তো এই মারতে যান্! তা মালী ঠিক আছে···সে বললে, মা-জী এধারে আসেনও নি, ক'দিন! তা বাবু বললেন, বেশ, এবারে যে-বাড়ীতে সে-রাত্রে মা-জী ছিল, সেই বাড়ী দেখিয়ে দে! তা মালী নাকি ওদিককার একটা কোন্ পোড়ো বাড়ী দেখিয়ে দিয়েছিল!...

পাপিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে শিবুর কথা শুনিল; তার পর ভাবনায় একেবারে পাথরের মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া গেল। তার চোখের সামনে সমস্ত দিক উচ্ছ্বসিত নদীর তরঙ্গে ভরিয়া উঠিল। এ তরঙ্গ কি করিয়া সে ঠেলিয়া রাখিবে! ···কতকাল এখন এমনি পড়িয়া থাকিতে হইবে···! এখান হইতে মুক্তি! সে চায় না! চাহিবে যে, তার কোন সম্ভাবনাও নাই! মানগোবিন্দকে তো সে চেনে।···এই পাঁচ দিনের অদর্শনে সে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে! ···এবং পাপিয়াকে ফিরিয়া পাইবার জন্য তার দুঃসাহ-সেরও অন্ত থাকিবে না!—যদি হুড়মুড় করিয়া এই-খানেই আসিয়া পড়ে? এখান হইতে কতটুকু বা পথই! মালীর কথায় অবিশ্বাস করিয়া এখানে ঘরে ঘরে যদি সে সন্ধান করিয়া বেড়ায়···? সর্ব্বনাশ! কি করিয়া ওদিক-কার সমস্ত ক্রুদ্ধ আক্রমণকে ব্যর্থ করিয়া রাখা যায়!···

নিশ্চল মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া এই কথাই সে ভাবিতে লাগিল। তার মুখে গভীর হতাশা ফুটিয়া উঠিল। শিবু তাহা লক্ষ্য করিল, লক্ষ্য করিয়া বলিল,—এখানে ক'দিন লুকিয়ে থাকবে মা?···বাড়ীতেও সব তচ্‌নচ্ হয়ে পড়ে আছে। বাবু ঝড়ের মত আস্‌চেন যাচ্ছেন- তাঁর আপিস তো উঠেই গেছে! তিনি পাগলের মত হয়েচেন!···

হোন্! পাপিয়ার তাহাতে কোনো ক্ষোভ নাই। এতকাল তার জীবনটাকে নিংড়াইয়া প্রাণের যা-কিছু রস, তার এই পুষ্পিত যৌবনের যা-কিছু মধু নিঃশেষে মানগোবিন্দকে সে উপহার দিয়াছে, ফেনিল রক্ত-মদিরার মতই তাকে তা পান করাইয়াছে। নিজের পানে ফিরিয়াও চাহে নাই···মানগোবিন্দর সখের পুতুলটি হইয়া, শুধু তার খেলার সুখেই সে মত্ত ছিল! বুকের মধ্যে এত-বড় যে প্রাণটা পড়িয়া ছিল, সে প্রাণটারও যে ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, এ তার চোখেও পড়ে নাই!···আজ তা চোখে পড়িয়াছে এবং ভালো করিয়াই পড়িয়াছে। আজ সে-সব তুচ্ছ খেলা ফেলিয়া তার প্রাণ সার্থকতার তৃষ্ণায় ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে! এখন এ শুষ্ক প্রাণ লইয়া সে ছেলেখেলা, সেই মন-না-দিয়াও মন জোগাইবার প্রবৃত্ত তার আর নাই! সে প্রবৃত্তির কথা মনে হইলেও লজ্জায় ঘৃণায় সে যেন এতটুকু হইয়া যায়! সত্য, এ সব সত্য! কিন্তু অতদিনকার কঠিন বাঁধন,···কাটিতে গেলে তারা তা কাটিতে দিবে কেন? এ বাঁধন শিথিল হইবার সম্ভাবনায় তারা যে সেটাকে আরো কষিয়া বাঁধিবে···দয়া-মায়া বিসর্জ্জন দিয়া, নিজেদের দিক্ দেখিয়া বড় জোরে এ বাঁধন শক্ত করিবার জন্য তারা কষিয়া টানিবে! পাপিয়ার হাড়-পাঁজরাগুলা সে-টানে ছিঁড়িয়া গেলেও তারা ছাড়ান্ দিবে না! এ যে জীবন-পণ সংগ্রাম বাধিবে···বাঁচিবার উপায় কি ?···

াপিয়া ডাকিল,—শিবু···

—কেন মা ?

—দূরে, খুব দূরে, নিরালায় একটা ছোট-খাটো বাড়ী ত পারিস ?

—কেন মা ?

—এখানে থাকা হবে না, বাবু জানতে পারবে। তে পারলে ধরে নিয়ে যাবে, কোনো কথা শুনবে আর এ অজ্ঞাত-বাসে ক'দিন এমন করে চলবে···

—তার চেয়ে বাড়ী চলো না, মা···

—বলিস কি শিবু···! একে ফেলে ? এই অন্ধ, হায় বেচারাকে ফেলে···?

—কে এ মা, যার জন্য তুমি সব ছেড়ে এমন ভিখা-র মত পড়ে আছো···এত কষ্ট করচো !

—কে···! সহসা তার কণ্ঠ গর্জ্জিয়া উঠিল, সে কহিল, ক···! তার দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল—কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই কে সংযত করিয়া শান্ত স্বরে কহিল,—আমার খুব নার লোক, শিবু। এতদিন সন্ধানও পাইনি। যখন ম, তখন ওর মহাদুর্দ্দিন ! যতদিন দেখিনি, বেশ । এখন একে দেখে আর ফেলতে পারি নে শিবু, তে না—রাজার সিংহাসন পেলেও নয় ! বলিতে ত আবার তার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। ল চোখের জল মুছিতে মুছিতে সে ভাবিল, । কি করিতেছে—শিবুর কাছে এ-সব কি বকি-! ছি !···

শবু বলিল—তাহলে উপায় ?

—কোনো উপায় দেখচি না, বাবা। এক, এ-বাড়ী করে অন্য বাড়ীতে যাওয়া ছাড়া···

শিবু কহিল,—আমাদের কলকাতার বাড়ীতে নিয়ে হয় না মা ? সেখানে চোখের চিকিৎসাও তো ত পারে !

—তা পারে, তবে সে বাড়ী···না···দিন-রাত পাঁচ-র আনাগোনা, জ্বালাতন করা···তার মধ্যে রোগীর চলে কখনো···!

—তাহলে একটা বাড়ীই দেখি, মা !···বাবু কিন্তু কে একেবারে পাগল হয়ে উঠেচেন···তোমার জন্য একদণ্ড সোয়াস্তি নেই···

পাপিয়া হাসিল, হাসিয়া কি একটা কথা বলিতে তেছিল, কিন্তু শিবুর পানে চাহিয়া থামিয়া গেল। মনে হইতেছিল, ভোগ-বিলাসী পুরুষের স্বাচ্ছন্দ্য ! চোখের নেশা···! বাগানে ফুলের অভাব নাই···একটা ঝরিয়া গেলে আরো লক্ষ ফুল আছে···! এরা মধুর াল বৈ তো নয় ! যেখানে হোক, মধু-ভরা ফুল লেই হইল !···

পাপিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—তুই মালীকে আরো পাঁচটা টাকা দি'গে যা, বলিস, খুব হুঁশিয়ার ! আরো বকশিস্ পাবে।···

আঁচল খুলিয়া পাঁচটা টাকা বাহির করিয়া শিবুর হাতে দিয়া পাপিয়া কহিল,—একবার সেখানে আমায় যেতেও হবে, শিবু—কিছু টাকার দরকার।···তবে সাবধানে যেতে হবে···তুই বাবুকে নিয়ে আর কোথাও আমার খোঁজে বেরুবি, সেই ফাঁকে একবার গিয়ে কিছু টাকা আনতে হবে।

পাপিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল ; আসিয়া তরকারীর দিকে মনঃ-সংযোগ করিল। তার পর খাবার তৈরী হইয়া গেলে অমলকে খাওয়াইয়া তার কাছে আসিয়া বসিল। অমল কহিল,—এবার পড়বে ?

—পড়বো—বলিয়া পাপিয়া খাতা খুলিল।

অমল কহিল,—তোমার হাতটা দাও, চপলা···

পাপিয়া হাত বাড়াইয়া দিল। অমল তার হাতখানা বেশ করিয়া নিজের দুই হাতে চাপিয়া ধরিল কহিল,—পড়ো।

পাপিয়া হাতের পানে একবার চাহিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল, তারপর বুকটা কতক হালকা করিয়া লইয়া কবিতা পড়িতে লাগিল।

১৪

দক্ষিণেশ্বরের কাছে গঙ্গার ঠিক উপরেই শিবু একখানি পরিষ্কার একতলা বাড়ী দেখিয়া আসিয়া পাপিয়াকে খবর দিলে, পাপিয়া অমলের কাছে কথাটা পাড়িল, বলিল,—আমারি বাড়ী সেটা, এমনি পড়ে আছে—যাবে সেখানে ?

অমল কহিল,—তুমি যদি বলো, তাহলে যেতেই হবে আমায়। কিন্তু এখানে আমার সব চেনা—এই হাওয়া, ঐ নদীর ঢেউ, পাখীর গান···সেখানে অন্ধ আমি—এ-সবের সঙ্গে কোনো পরিচয়ই যে হবে না চপলা !

পাপিয়া কহিল,—তবে থাক্।

—রাগ করলে ?

—না।···

তার পর চুপচাপ ! অমল কহিল,—একটা বড় সাধ ছিল, চপলা···

—কি ?

—তোমার নামে লেখা কবিতাগুলি বই করে ছাপাবো···ভেবেছিলুম, তোমার দৃষ্টি তো কোনদিন পড়বে না আমার পানে···আমার পানে তুমি চেয়ে দেখবে, এ যে বড় দুরাশার বড় দুর্লভ আকাঙ্ক্ষা—সে আকাঙ্ক্ষা করবার সাহস আমার ছিল না তো ! তাই ভেবেছিলুম, কতকগুলি কবিতা ছেপে একেবারে বই করে তোমায় পাঠাবো। কলকাতায় কত বইয়ের দোকান। তারা লেখা নিয়ে ছাপে ! তা আমি তো বইয়ের জন্য

এক পয়সার প্রত্যাশা করিনে…শুধু দুখানি ছাপা বই চাইতুম…একখানি তোমায় পাঠাতুম, আর একখানি নিজে রাখতুম—বাকী বই, যারা ছাপতো, তারাই বেচে তাদের ছাপার দাম তুলতো…কিন্তু তা হলো না…

—নাই বা হলো! আমি তো এসেচি, ধরা দিয়েচি… তোমার হাতে লেখা এই কবিতাও পেয়েচি তো! তোমার হাতে লেখা অক্ষরের চেয়ে কি ছাপার অক্ষরের দাম বেশী হতো?

অমল একটা নিশ্বাস ফেলিল, ডাকিল,—চপলা—

পাপিয়া কহিল,—কেন?

অমল কহিল,—ভগবান মানুষকে কখনো সব সুখে সুখী করেন না।…আমার দুর্লভকে পেলুম…তবে অন্ধ হয়ে! বলিয়া একটু থামিল, পরে হাসিল; হাসিয়া কহিল,—কিন্তু অন্ধ না হলে তোমারি কি দয়া হতো… তুমি কি আসতে…!…তাই ভাবি, অন্ধ হয়ে আমার কোনো দুঃখ নেই—আমি তোমায় পেয়েচি। তুমিই আমার চোখের দীপ্তি, আমার আলো…

পাপিয়ার বুক দুঃখে ক্ষোভে অভিভূত হইয়া উঠিল! এ কি-ঝড়ের সঙ্গে তার লড়াই চলিয়াছে, সর্ব্বক্ষণ! আর সেই চপলা…যার জন্য এ একেবারে উন্মাদ, অন্ধ হইয়াও যার চিন্তায় এত সুখী…সেই চপলা এখন? হয়তো তার মাড়োয়ারী বাবুটির গায়ে ঢলিয়া তার মুখে বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া অপূর্ব্ব মায়া বিস্তার করিয়াছে তুচ্ছ দু-খানা গহনার লোভে!…অভিনয়! চপলা ষ্টেজে উঠিয়া শুধু দুই দণ্ড কি অভিনয় করে! পাপিয়া এখন যে অভিনয় করিতেছে এখানে, চব্বিশ ঘণ্টা, সর্ব্বক্ষণ, অবিরাম…তার যে তুলনা নাই! এই সর্ব্বনেশে ভূমিকা লইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে বুকে ছুরির ঘা খাইয়া রক্তাক্ত হইয়া এ কি ভয়ঙ্কর অভিনয়!

পাপিয়া কোনো কথা কহিতে পারিল না—অশ্রুর বাষ্পে দুই চোখ তার ঝাপসা হইয়া আসিল। অমল কহিল,—একবার একটি মুহূর্ত্তের জন্যও যদি এ চোখের দৃষ্টি খোলে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও যদি তোমায় আমার ঘরে দেখতে পাই! তোমার স্পর্শ অনুভব করচি প্রতি মুহূর্ত্ত…তবু একবার যদি তোমায় এ ঘরের মাঝে দেখে তার পর জন্মের মত আমি অন্ধ হই, যুগ-যুগ ধরে আমায় অন্ধ জীবন বইতে হয়, তাহলেও কোনো দুঃখ থাকবে না আমার!…তা যদি সম্ভব হতো…!

পাপিয়া শিহরিয়া উঠিল। চোখ চাহিয়া যদি অমল দেখিত, এ তার সাধের প্রাণের চপলা নয়, পাপিয়া… সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে কি যে হইত, সে কথা ভাবিয়া পাপিয়া আবার শিহরিয়া উঠিল।

অমল কহিল,—কিন্তু তুমি কত কাল আমার এখানে পড়ে থাকবে, চপলা?…কত দিন আমায় এখন বাঁচতে হবে, তার ঠিক নেই—কত দীর্ঘ দিন…আমার এ কুৎসিত অক্ষতার ভার এমনি করে বইবে তুমি…এ আমার প্রাণে সইচে না, চপলা!

—তার জন্য তুমি ভেবো না…আমি তো স্বেচ্ছ এ ভার নিয়েছি—এ ভার ভারী বলেও মনে হচ্ছে না!— এতে আমি কি সুখ যে পাই! পাপিয়া একটা নিশ্বা ফেলিল।

—সুখ…! অমল হাসিল; হাসিয়া কহিল,—কি বলচো তুমি চপলা! সুখ…?

—হ্যাঁ, সুখ! অসহ্য সুখ! তোমার সেবায় প্রা ঢেলে অসহ্য সুখে আমি সুখী হয়েচি…

—কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি,—তুমি…

—আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই! আমি নারী…নারী হলো কাজই—সেবা, মমতা, স্নেহ…

—তুমি দেবী, চপলা…

রাক্ষসী, রাক্ষসী!…পাপিয়ার মন ক্ষুব্ধ অভিমানে গর্জ্জিয়া উঠিল, তোমার চপলা দেবী নয়! সে যে কা বড় রাক্ষসী, অন্ধ তুমি, তার কি বুঝিবে!

পাপিয়া কহিল,—বেলা পড়ে এসেচে, তোমা খাবার সময় হলো।

অমল কহিল,—শুধু সেবা?…যে রাজভোগ নিত্য মুখে তুলে দিচ্ছ, এর যে অনেক দাম…এত পয়সা ণ আমার জন্য খরচ করচো…

পাপিয়া সুদৃঢ় কণ্ঠে কহিল,—হ্যাঁ, করচি। কিন্তু খরচের কথা বলচো…! আমি…কথাটা বলিতে গি সে থামিয়া পড়িল। এ সে কি বলিতেছিল? ছি তার এ দুর্ব্বলতা কি কখনো ঘুচিবে না? এই অভিম এই ক্ষোভ, এই রোষ…নিজেকে এমন করিয়া যদি বলি দিতে আসিয়াছে তো ছোট্ট অভিমানটুকুকে এখ ছাড়িতে পারিবে না? এখনো সেটাকে আঁকড়াই রহিবে? এ কি নীচ মন তার!…না, এ অভি আর নয়!

পাপিয়া ক্ষিপ্র পায়ে উঠিয়া গেল। অমল করিয়া বসিয়া রহিল। পাপিয়া অদূরে ঘরের কোণে ব ষ্টোভ জ্বালিল। তারপর তরকারী কুটিতে কুটিতে অম পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।—ও মুখ কি সা পুলকেই না প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে—কপালে দীপ্তি কি রেখাই না জলজ্বল করিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে! সে একটা নিশ্বাস ফেলিল। হায় রে, তার মত দুর্ভাগি কি আর কেহ আছে!

দুই-চারিদিন পরে অমল পাপিয়াকে ধরিয়া কলিকাত কয়েকটা বইয়ের দোকানে চিঠি লেখাইল; সঙ্গে স কবিতা নকল করিয়া খাতাও পাঠাইল, যদি তারা সেগু লইয়া বই ছাপায়! যথাসময়ে সকলেরই জবাব আসি

—এ-সব পাগলামির ব্যাপারে মাথা ঘামাইবার তাদের াটে অবকাশ নাই!…এগুলা যা হইয়াছে, তা কবিতা য়, উন্মাদের প্রলাপ! এ কথায় অমল একেবারে ়বড়াইয়া পড়িল—তার অন্ধ নয়নের কোণে জল-বিন্দু ়টিয়া উঠিল। দেখিয়া পাপিয়ার প্রাণটাও হা-হা ়বিয়া উঠিল—কিন্তু তৃপ্তিও যে একটু না হইল, এমন য়!…বেশ হইয়াছে! তোমার চপলার পূজা যে এমন াঘাত পাইয়াছে—এ বেশ হইয়াছে!…

কিন্তু আর একটা জায়গা হইতে জবাব এখনো বাকী াছে।

অমল কহিল,—সত্যবান লাইব্রেরী এখনো কোনো বাব দেয়নি। তারা বোধ হয় নিতে পারে—কি বলো, পলা?

পাপিয়া কহিল,—পারে বৈ কি। সবাই কি র মাকরকুম!

অমল কহিল,—কবিতাগুলো' কি সত্যই কিছু হয়নি পলা?…ওগুলো কি সত্যই উন্মাদের প্রলাপ? বলো, মি বলো…

পাপিয়া কহিল,—চমৎকার হয়েচে। কবিতা কি কলের বোঝবার! তা হলে আর ভাবনা কি 'ছল…

অমল হাসিয়া কহিল,—ঠিক বলেচো! কবিত্বং ভিং লোকে…

পাপিয়া কহিল—তা নয় তো কি!

তবু শেষ আঘাতটিকেও ঠেকাইয়া রাখা গেল না। ত্যবান লাইব্রেরীর চিঠিও আসিল। শুনিয়া অমল প্রদীপ্ত ৎসাহে কহিল,—পড়ো, পড়ো,—নিয়েচে কি না…

পাপিয়া চিঠি খুলিয়া পড়িল!—এও যে ছুরির ফলায় খা নির্ম্মম জবাব! সব-চেয়ে নির্ম্মম! সত্যবান ইব্রেরী লিখিয়াছে,—

আপনার কবিতাগুলি ফেরত দিলাম। এ যে অমূল্য না…এ ছাপিবার লোক এ দেশে মিলিবে না! বিলাতে াইবেন। একদিন ইহার জোরে নোবেল প্রাইজ পনার হাতে আসিবে। ইতি…

অমল কহিল,—তুমি চুপ করে রইলে কেন? চেঁচিয়ে া…পড়চো না যে! এরাও ফেরত দেছে, না…? ম তা জানি…

নিরাশার কালো কালি তার মুখে লেগেযে যেন কে য়া দিল! সুগভীর ব্যথা এমন স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল াপিয়া তাহা লক্ষ্য করিল! ঐ ব্যথিত চিত্তে আবার ত লাগিবে…আহা! করুণায় তার প্রাণ ভরিয়া । সে কহিল,—না, না, ভালো চিঠি…এরা বই ব।

—ছাপবে…? অমলের মুখের কালি বিদ্যুতের য় চকিতে কোথায় সরিয়া গেল।

পাপিয়া কহিল,—হ্যাঁ।

—কি লিখেছে, পড় পড়,…

পাপিয়া অমলের পানে একবার চাহিয়া দেখিল, তার পর পড়িল,—

মহাশয়, আপনার কবিতাগুলি সুন্দর হইয়াছে। আজকাল এমন কবিতা বড় দেখা যায় না। আপনার কবিতাগুলির অর্থ আছে এবং তার ভাবও খুব স্পষ্ট। এ বই আমরা ছাপিব। এ সম্বন্ধে আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। ইতি…

অমল সোচ্ছ্বাসে পাপিয়ার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া ডাকিল,—চপলা…

পাপিয়া কথা কহিল না—স্থির নেত্রে শুধু তার পানে চাহিয়া রহিল।

অমল কহিল,—আজ অন্ধ করে ভগবান আমায় এত সুখ দিচ্ছেন!…আমার সব কামনাই সার্থক হয়ে উঠচে …বলিয়া সে হাসিল, হাসিয়া বলিল,—আমার নীরব পূজা যখন তোমায় বিচলিত করেচে, তখনই তো তা সার্থক হয়েচে…এ তো ফাও!…তা তুমি তাদের লিখে দাও…আমি অনুমতি দিলুম। আমি এক পয়সা চাই না বইয়ের দামের জন্য! শুধু দু'খানি বই যেন তারা ছাপা হলেই পাঠিয়ে দেয়।…অমল আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

পাপিয়া অবিচল নেত্রে তার সে আনন্দোচ্ছ্বাস দেখিতে লাগিল।…তার চোখের সামনে হইতে সব আলো কোথায় যেন মিলাইয়া যাইতেছিল! এমনি খেলা খেলিয়াই তাকে বাকী জীবনটা কাটাইতে হইবে…শুধু মিথ্যা—আগাগোড়া মিথ্যা দিয়া! অথচ তার যেটুকু সত্য, যেটুকু খাঁটী—সেটুকু প্রাণপণে তাকে গোপন রাখিতে হইবে!…ভগবান, ভগবান, বুক যে ভাঙ্গিয়া যায়! এ কি দুশ্ছেদ্য বন্ধনে তাকে আঁটিয়া বাঁধিতেছে! আর যে সহা যায় না, প্রভু! সহিবার সীমাও তো একটা আছে! সে সীমা…

১৩

পাপিয়াকে একবার বাড়ী ফিরিতে হইল। টাকার দরকার—আরো ছোট-খাট নানা দরকার আছে। শিবুকে দিয়া খবর লইয়া সতর্ক হইয়াই সে বাড়ী আসিল। বাড়ীর লোক অমনি সহস্র প্রশ্নে তাকে ঘিরিয়া ফেলিল, —মানগোবিন্দ পাগলের মত আসা-যাওয়া করিতেছে— এক মুহূর্ত্ত সে সুস্থির হইতে পারে না…পাপিয়ার এ লুকোচুরি করার মানে কি?…পাপিয়া যেন হাঁফাইয়া উঠিল।

সকলকে বিদায় দিয়া সে একবার একা নিজের নির্জ্জন ঘরে বসিয়া আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাকে বুঝিবার চেষ্টা করিল।

যে তাকে চাহে না, তার পিছনে এমন সর্ব্বত্যাগী, এমন ভিক্ষুক হইয়া কেন সে ফিরিয়া মরিতেছে! তার একটু সুখের জন্য, এতটুকু স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এই যে গভীর কাতরতা···এ কেন···? তার যা কামনা, তা তো কোনো দিনই মিটিবে না! অথচ চপলার ছদ্ম আবরণে সোহাগের ঐ যে নানা কথা শোনা, আদর গ্রহণ করা··· বুক যে ইহাতে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে··পলে পলে মরণাধিক যাতনা সে ভোগ করিতেছে!···সে তো কতবার বলিয়াছে, —চপলা একটা তুচ্ছ গণিকা মাত্র, দাম লইয়া এই দেহ সে ভাড়ায় খাটাইয়াছে! যে আসিয়া পয়সা দিয়াছে, তারি কণ্ঠ ধরিয়া চপলা তার হইয়াছে—কত কুৎসিত, নীচ তার মন! ভাণ অভিনয়ে প্রেমের লীলা দেখাইয়া কত লোককে সে চমৎকৃত করিয়াছে, মুগ্ধ করিয়াছে! আবার যখনই তাদের দিক হইতে আদায়ের সামান্য ত্রুটি ঘটিয়াছে, তখনি রুদ্র মূর্ত্তিতে তাদের বিদায় দিয়াছে, এবং নূতন লোকের মন জোগাইবার জন্য আবার সুচারু সাজে সাজিয়া, মিথ্যা কথার ফাঁদে নূতনকে ভালো করিয়া বন্দী করিয়াছে!···এই মন-জোগানোর কাজে কোনো মিথ্যার আশ্রয় হইতে বাকী রাখে নাই! আগাগোড়া মিথ্যা অভিনয় করিয়া করিয়া তার ভিতরে সত্য যেটুকু ছিল, সেটুকুকে কবে সে বাহির করিয়া দিয়াছে, তার কোন ঠিকানাও নাই—এখন অন্তরে-বাহিরে মিথ্যাচারী হইয়াই সে পড়িয়া আছে!···তবু এই মিথ্যাকেই অমল এমন করিয়া আদর করিবে, পূজা করিবে···!

অমল তবু বলিতেছে, এই মিথ্যাই তার কাম্য, এই মিথ্যার পায়েই সে আপনাকে বিকাইয়া দিয়াছে, এই মিথ্যাই তার সব! এই মিথ্যা ছাড়িয়া এত বড় বিশ্বের কোথাও যদি একবিন্দু সত্য থাকে, অমল তা চায় না, চায় না!···অমলের এ কি সর্ব্বনেশে সৃষ্টিছাড়া মোহ!

···কিন্তু সে যাই হোক, নিজে যে সে শ্রান্ত হইয়া পড়িল,—সেবা করিয়া নয়, এই ছদ্ম মিথ্যা ভূমিকার অভিনয়ে তার দেহ-মন যে বিপুল শ্রান্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে!···আর যে এ-খেলা ভালো লাগে না, ভালো লাগে না গো···

পাপিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতে বসিল।···ভাবিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। না, তার দূরে থাকিবার উপায় নাই! তাকে ফিরিতেই হইবে! অমলের নিষ্ঠাই তাকে সেখানে আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে! হোক্ এ মিথ্যা অভিনয়, প্রকাণ্ড ছলনা···তবু ঐ অন্ধ ব্যথিতের কাছ হইতে এই ভূমিকার ছদ্ম বেশ পরিয়া চপলা সাজিয়া যেটুকু সে পায়, তা যে প্রাণের নিষ্ঠায় ভরপুর, তা যে সত্য, সার,···সেটা রূপ-বিলাসীর মোহ নয়, মাতালের নেশার ঘোর বা পয়সার পণ্য নয়!···সেই খাঁটি বস্তুটুকু পাইবার জন্য আহত রক্তাক্ত হইলেও তার মন সেইটুকুরই কাঙাল যে! এই নিষ্ঠা··· [illegible] করিয়াছে, তাকে বিপুল ঐশ্বর্য্য-ভরা রাণীর আ··· [illegible] জীর্ণ কুটীরে ভিখারিণী দাসীর আসনে টানিয়া বসাইয়াছে। তাহাতেই সুখ!···তাহাতেই সে যে সুখ পাইয়াছে, তা··· আর তুলনা নাই!···মনটা মাঝে মাঝে নৈরাশ্যের ব্যথা ঝরিয়া পড়িবার মত হয়, বেদনায় টাটাইয়া ওঠে, ক্ষোভে ঝড়ে মনটা কাণায়-কাণায় ভরিয়া যায়···তা যাক,·· তবু উপায় নাই, কোনো উপায় নাই!···

কিন্তু তার দিক হইতেও যে এতখানি নিষ্ঠা, এতখা··· সত্য সেবায় অমলকে সে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, এর বি··· কোন দাম নাই?···অমল কি এটা বুঝিবে না···? তা··· চোখের দৃষ্টি রুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু মন···? মন তো··· অন্ধতায় ঢাকিয়া যায় নাই! যদি সে কোনোদিন বুঝিতে পারে, যাকে সে হেলায় অবজ্ঞায় উপেক্ষায় বিঁধিয়া কুকুরের মত তাড়াইয়া দিয়াছিল, সে-উপেক্ষার ক্ষোভ··· গ্রাহ্য না করিয়া সে-ই আসিয়া তার এ দুর্দ্দিনে সেবা··· তাকে তৃপ্ত করিয়াছে, কোনোদিকে তার কোনো অভা··· রাখে নাই···এবং সে চপলা নয়, চপলা নয়, পাপিয়া··· পিয়ারী বিবি! তার সেবায় নিজেকে ঢালিয়া দি··· পাপিয়া আজ সব ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে···আর এ··· সেবাই সে তার বাকী জীবনের একমাত্র ব্রত ব··· গ্রহণ করিয়াছে···স্বেচ্ছায় আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করিয়··· ···তাহা হইলেও কি তার প্রতি—সে যা তাই— পাপিয়ার প্রতি অমলের বিমুখ মন প্রসন্ন হইবে না··· ···ভাবিতে ভাবিতে আশার পুলকচ্ছটায় পাপিয়ার··· প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল!···

তা যদি হয়···আঃ! তাহা হইলে এই ছদ্ম ভূমি··· কুৎসিত খোলসটা টানিয়া দূরে ফেলিয়া প্রাণে··· কেবলি সত্যের দীপ্ত রাগ মাখাইয়া তার সেবাকে আরো সুন্দর, আরো সার্থক করিয়া তুলিতে পারে!

চপলার উপর তার রাগ ধরিল। এত-বড় পা··· সে—বিলাসের যত-বড় উপাসনাই করুক, তবু সে ন··· তো! নারীর প্রাণকে একেবারেই সে এই কুৎ··· জঘন্য লালসার বিষে জর্জ্জরিত করিয়া মারিয়া ফেলিয়া··· ···পাষাণী, পাষাণী, শয়তানী সে...!···কিন্তু তার ··· থাক···! পাপিয়া এখন কি করিবে? কিসের আ··· সে এমন অন্ধ আবেগে সেখানে ছুটিতে চায়?···মরীচি··· ···মরীচিকা—আলেয়ার আলোয় মাতিয়াই সে থাকিতে চিরদিন···!

পাপিয়া নিশ্বাস ফেলিল।···তাছাড়া উপায়ও ··· নাই! বিলাসের আহ্বানে যে-পথে সে প্রথম যাত্রা ··· করিয়াছিল, সে পথে শুধুই আলেয়া! ধন, ··· ঐশ্বর্য্য···? কি তুচ্ছ বস্তু এগুলা!··মনকে তার যে খোরাকে বঞ্চিত করিয়া তুচ্ছ ধন-জনের পিছনেই

য়াছিল। প্রথম যৌবনে জীবন যখন প্রাণের
য দীপের শিখা জ্বালিয়া দিল, সে আলোয় চারিধারে
আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছিল···হায়, কোথায় গেল সে
পের সে স্নিগ্ধ আলো! ঝড়ের মত লোকের পর লোক
সিয়াছে, হাতে নগদ দাম লইয়া···আর সে তার এই
বন-পুষ্পটিকে লইয়া চড়া দামে বাজারে বেসাতি
রিয়াই চলিয়াছিল···! সেই সুন্দর শুভ্র প্রাণটাকে
জারের ভিড়ে কি ধূলা, কি কালি মাখাইয়াই না মলিন
ংসিত করিয়া ফেলিয়াছে!

তার দুই চোখে জল ছাপাইয়া আসিল···সর্ব্বস্ব দিয়াও
দি আজ প্রথম যৌবনের সেই শুভ্র নির্ম্মল মুহূর্ত্তটিকে
রাইয়া পাওয়া যাইত, ভগবান! সে আজ দুর্ল্লভ,
ীত, সুদূরের···একটা জন্ম দিলেও বুঝি সে মুহূর্ত্তটিকে
র ফিরিয়া পাওয়া যায় না!···

অবসাদে পাপিয়ার মন ভরিয়া উঠিল। নির্জীবের
 বালিশে শ্রান্ত শির রাখিয়া পাপিয়া বিছানায় লুটাইয়া
ড়ল।···

তার পর বহুক্ষণ পরে চোখ মেলিয়া সে চাহিয়া দেখে,
াচে বসিয়া মানগোবিন্দ। মানগোবিন্দর চোখের দৃষ্টি
াদের ব্যথায় শুষ্ক, মলিন। পাপিয়া তাড়াতাড়ি চক্ষু
ল।···আবার সেই পুরানো নাগপাশের বাঁধন!
াসের শিকল তার দুই পা বাঁধিয়া ফেলিবার জন্য
গাইয়া আসিতেছে! ধড়মড়িয়া সে উঠিয়া পড়িল।

মানগোবিন্দ ডাকিল,—পিয়ারী···তার স্বর যেন
ান্ বহুদূরের অতল কোণ হইতে ভাসিয়া উঠিল।···
ানো স্মৃতির রেশের মত সে ডাক!···

পাপিয়া কহিল,—কি?

মানগোবিন্দ উঠিয়া তার হাত ধরিল, করুণ আর্ত্তস্বরে
হিল,—আমি কি কোনো অপরাধ করেচি পিয়ারী যে,
ভাবে আমায় দগ্ধাচ্ছো!···

উচ্ছ্বসিত স্বরে পাপিয়া কহিল,—না, না···তবে বলেচি
া ছুটী, ছুটী! ওগো, দুদিনের ছুটী দাও আমায়!
ামার তৃপ্তির জন্য একেবারে কিছু না রেখে ঢেকে আমি
ামার সব তোমায় সমর্পণ করেচি, তার জন্য দু'দিন
ামায় ছুটী দাও। বাড়ীর চাকর-বাকরও দুদিন ছুটী
ইলে পায়···সে ছুটী কি আমি দুদিনের জন্যও পেতে
ারি না?

মানগোবিন্দ কহিল,—তাহলে এ বিচ্ছেদ চিরদিনের
য়···? বলো···আশা দাও···

পাপিয়া কহিল,—যদি বলি, না—বিশ্বাস করবে?

মানগোবিন্দ কহিল,—তোমার কথা বিশ্বাস করবো
ব কি! কোনোদিন অবিশ্বাস করেচি?

পাপিয়া চুপ করিয়া রহিল। সে জানে, এখানে
খন 'হাঁ' বলিলে মানগোবিন্দ একেবারে মরিয়া হইয়া
উঠিবে,—তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে এমন শিকলে বাঁধিবে যে, তার
মুক্তির আর কোনো আশা থাকিবে না! উপায়···?

সে বলিল,—আমাকে বিশ্বাস···? নিত্য যে ছলনার
কারবার করচে—মিথ্যা দিয়ে যার আগাগোড়া ভরা···
তাকে বিশ্বাস? এ যে পাগলের কথা···

মানগোবিন্দ স্থির দৃষ্টিতে পাপিয়ার পানে চাহিল,
কহিল,—তবু তোমার বিশ্বাস করবো। আমি যে তোমায়
ভালোবেসেচি পাপিয়া···শেষের দিকটায় মানগোবিন্দর
স্বর আকুল উচ্ছ্বাসে কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল।

পাপিয়া মানগোবিন্দর পানে চাহিল, পরে দৃঢ় কণ্ঠে
কহিল,—বিশ্বাস যদি করো, তাহলে বাধা দিয়ো না।
আমায় একটু একলা নিজের মনে থাকতে দাও!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মানগোবিন্দ কহিল,—তাই
হোক পাপিয়া! আমিও ঢের ভেবেচি এ-সম্বন্ধে। ভেবে
কি দেখেচি, জানো?···তোমায় যে এতদিন ভালোবেসে
সুখী হয়েচি, সে সুখ তোমার জন্য নয়—আমি যে ভালো-
বাসতে পাচ্ছি, এই ভেবে। তোমায় জিনিষ দিয়ে টাকা-
কড়ি দিয়ে সুখ পেয়েচি এই ভেবে যে, তোমায় এ সব
দেবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে—দিতে পারায় সেই তৃপ্তি!
তোমার মুখে হাসি দেখে খুসী হয়েচি—কেন না, ও-হাসি
আমার ভালো লেগেচে বলে!—আমার প্রাণের বাসনা
চরিতার্থ হচ্ছে, এই সুখেই আমি বিভোর ছিলুম। এ
ক'দিনের অদর্শনে ভেবে দেখলুম, এই যে ভালোবেসেচি,
সুখ পেয়েচি, এ তো নিজেকেই তৃপ্ত করেচি মাত্র···
যখনই দরকার বোধ করেচি, তোমার মুখ থেকে হাসি
লুট করেচি, গহনা ঘুষ দিয়ে খুশী আদায় করেচি···কিন্তু
এ কথা তো কখনো ভাবিনি যে, তুমি এ প্রাণের হাসি
হাসচো কি না, এ হাসি হাসতে তোমার কোথাও বাধচে
কি না! মনে এ প্রশ্নও তুলিনি কোনোদিন, এ হাসি
বুকের রক্ত নিঙড়ে তুমি আমার ক্ষুধিত তৃষিত চোখের
সামনে, মনের সামনে ধরে দিচ্ছ! তোমায় দিয়ে নিজের
সুখই শুধু পেয়েচি পাপিয়া! নিজের সুখ পেয়েই সব
পেয়েচি—তোমার মুখের পানেও চাইনি, তোমার সুখও
চাইনি কোনোদিন···

মানগোবিন্দ আর একটা নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া
পাপিয়ার পানে চাহিল।

পাপিয়া অবাক হইয়া গেল। মানগোবিন্দ এত বড়!
···এই যে মধুপিয়াসীর দল! নিত্য আসিয়া ভিড় বাধাইয়া
কাণের কাছে গুঞ্জন-গানকেই যারা সর্ব্বস্ব বলিয়া জানে,
তাই দিয়া যাদের আগাগোড়া তৈরী···মানগোবিন্দ
তাদের দলে নয়! তা নয় সে, সত্য! তা হইলে জোর
করিয়া পাপিয়াকে সে করতলগত করিয়া রাখিত!···
মানগোবিন্দর উপর শ্রদ্ধায় পাপিয়ার চিত্ত ভরিয়া
উঠিল।

মানগোবিন্দ কহিল,—তুমি ছুটী চাইছো, আরামের জন্য ? বেশ, ছুটী মঞ্জুর !···এতদিন আমায় কত সুখে তুমি সুখী করেচো, যে-ভাবে চেয়েছি, সেই ভাবে আমায় তৃপ্তি দিয়েচো···কখনো তোমার মনের পানে তাকাইনি। সেখানে যে কোনো অনুযোগ উঠতে পারে, তা ভাবিও নি !···এ কি ভালোবাসা ? শুধু দস্যুর মত তোমার লুণ্ঠন করেচি, ক্রেতার মত মূল্য দিয়ে তোমার প্রীতি পণ্য ভেবে তা জোর করে কিনে উপভোগ করেচি···তুমি গণিকা, পয়সার দাসী, পয়সা ফেল্‌লেই কায়-মনে তোমায় অধিকার করবো ···এই ভেবে তোমার ভিতরটাকে উপেক্ষা করে উপর-টাকে নিয়েই তুষ্ট হয়েচি, তৃপ্তি পেয়েচি ! ছি, এ কি মানুষের কাজ !···তুমি যে নারী, কোনো দিন সে কথা ভুলেও ভাবিনি।···পাপিয়া, এই অদর্শনে তুমি আমার মনুষ্যত্বকে চেতনা দিয়ে জাগিয়ে তুলেচো, তার জন্য তোমায় শত শত ধন্যবাদ দি···তোমার ছুটী মঞ্জুর করলুম। আরো শোনো, তোমায় যা যা দিয়েচি, তোমার নারীত্বের মূল্য-হিসাবে তা কতটুকু, কত তুচ্ছ ! এ সব তোমারই···তবে আমায় এটুকু অনুমতি দাও যে, শ্রান্ত হলে এই ঘরে যেন আমি জুড়োতে আসতে পারি ! আর কখনো যদি মনে পড়ে, তাহলে আমার কাছে আবার এসো ! কোনো প্রয়োজন বোধ করো আমায় ডেকো !···জেনো, তোমায় খাঁটী ভালোবাসা বাসবার জন্য একটা হৃদয় এখানে উন্মুখ প্রতীক্ষায় তোমার সে আহ্বানটুকু পাবার প্রত্যাশায় বসে থাকবে, চিরকাল, যুগ-যুগ ধরে।···দেহটা কিছু নয় পাপিয়া। তোমার ঐ মন···যেদিন স্বচ্ছন্দে সহজভাবে সে-মন পাবার যোগ্য হবো, জানি, সেদিন তোমায় আমি প্রাণের মধ্যে সত্যই পাবো !···

পাপিয়া মানগোবিন্দর পানে চাহিয়া রহিল, তেমনি স্থির অবিচল দৃষ্টিতে।···এ কি সম্ভব ! এই মানুষ ! যাকে সে শুধু পয়সা আর গহনা উপার্জ্জনের একটা নির্জীব যন্ত্র মাত্র মনে করিয়া চিরকাল ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে, মনের দ্বারেও যাকে ঘেঁষিতে দেয় নাই কোনো দিন···এত বড় মানুষটা তারি বুকের কোণে লুকাইয়া ছিল !···হায় রে মধুপিয়াসীর দল, তোরা এমন মূঢ় যে, এ বুঝিস না, পতিতা, গণিকা হইলেও আমরা নারী ! নারী পুরুষত্বের পায়ে চিরদিন নিজেকে বিকাইবার জন্য অধীর আগ্রহে পথ চাহিয়া বসিয়া আছে,—দেহটা লইয়া তোরা এমন প্রমত্ত থাকিস যে দেহের আড়ালে মন বলিয়া যে একটা বস্তু আছে, তার খেয়ালও রাখিস না, সে-মনের সন্ধানও নিস না ! পৈশাচিক তাণ্ডব লীলায় নারীর প্রাণ ছেঁচিয়া তার দেহের সৌরভ লুটিতে আসিস, যৌবনের মধু আহরণ করিতে আসিস ! মূঢ় বাতুলের দল···তার ফলে কি পাস্ ? কঙ্কালের কুৎসিত অট্টহাস আর ঘৃণার জঘন্য পরশ ! এ মুহূর্ত্তে কাছ হইতে চলিয়া গেলে পর-মুহূর্ত্তে তোদের স্মৃতিও এখানে পড়িয়া থাকে না—তোদের মত মৃত অতিথির মৃতভার বুকের উপর আবার আমরা চাপা মৃত্যু জুড়িয়া দিই !···

মানগোবিন্দ বলিল,—কি ভাবচো পাপিয়া ?

পাপিয়া কহিল,—ভাবচি···তুমি এত বড়, তা যে এতদিন জানতে পারিনি !

মানগোবিন্দ কহিল,—আমি নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি পাপিয়া, আমার মনের এ ভাব দেখে। আমি যে নিজের সুখ ছাড়া আর কারো সুখের কথা ভাবতে পারি, এ আমিও জানতুম না !···চিরদিন নিজের সুখ চেয়ে এসেচি, আর সে সুখ পাবার জন্য অপরকে মাড়িয়ে ঠেলে যদি ছুটতে হয় তো তা ছুটতে দ্বিধাও করিনি কোনোদিন ···কিন্তু তুমি এই ক'দিনের অদর্শনে আমায় নতুন করে গড়ে তুলেচো !···প্রথম প্রথম কি মনে হতো, জানো···

প্রশ্ন-ভরা দৃষ্টিতে মানগোবিন্দ পাপিয়ার পানে চাহিল।

পাপিয়া কহিল,—কি ?

মানগোবিন্দ বলিল,—ভাবতুম, দুনিয়া ওলোট পালোট করে তোমায় খুঁজে বার করি···তার পর তোমা সাজা দি ! রাজার ঐশ্বর্য্য এনে তোমার পায়ে ঢেলে দিয়ি এত সুখে তোমায় আমি রেখেচি,—আর তুমি আমা পাশ কাটিয়ে সরে যাবে···! কিন্তু একটা ঘটনা হলো,— মনের এই জ্বালা নিয়ে যখন অস্থির আকুল, তখন আমা এক ছেলের খুব অসুখ হলো। আর সে-অসুখে সে বায়না নিলে, আমায় তার পাশে চাই, সর্ব্বক্ষণ ! শিশুর · অস্থিরতায় তার পাশেই পড়ে রইলুম···তার সে যাতনা দেখতে দেখতে মনটা কখন্ যে বদলে গেল···তোমা সন্ধানে নিবৃত্ত হলুম। ভাবলুম, যদি এততেও তাকে ধরে রাখতে না পারলুম, তাহলে এ টানা-হেঁচড়া করে ফল ! সে তাহলে পাবার নয় !···

পাপিয়ার দুই চোখে জল ছাপাইয়া আসিল। একেবারে মানগোবিন্দর পায়ের উপর পড়িয়া আর্ত্ত স্ব কহিল,—আমায় মাপ করো। তোমার দেওয়া সব তু ফিরিয়ে নাও গো···আমি বেইমান, বিশ্বাসঘাতক· তোমার এ দান গ্রহণের যোগ্যতা আমার নেই··· দানের বোঝা নিয়ে তার অপমান করবারও আমা কোনো অধিকার নেই !···

মানগোবিন্দ পাপিয়ার হাত ধরিয়া উঠাইল, কহিল —না পাপিয়া, সে কথা তো আমি বলিনি। আমি শু বলচি, অন্ধতা ঘুচিয়ে তুমি আমার চোখ ফুটিয়েচো !·· তোমার কাছে এসে, তোমায় পাশে পেয়ে, কত সুখ আমি পেয়েচি ! তবু আজ মনে হচ্ছে, সে সুখ কি ঠিক !·· যার কাছ থেকে বন্যার মত এ সুখ পাচ্ছি, স্বেচ্ছায় এ-সুখ দিচ্ছে, না, এ-সুখ আমি জোর করে আদা করচি !···তাতে সুখে সুখ থাকে না, পাপিয়া !···তা

বলছিলুম, যদি কোনোদিন স্বেচ্ছায় আমার সুখের জন্য নিজেকে তুমি আমার হাতে তুলে দিতে পারো···বলেচি তো, সেই সুখের আশায় আমি প্রতীক্ষা করে থাকবো!···যদি এই প্রতীক্ষা করেই আমার জীবনের সব দিন কেটে যায়, তবু কাতর হবো না···নিরাশও হবো না আমি, পাপিয়া!···করুণ প্রাণের এ অধীর আকুলতা কি ব্যর্থ হবার?···না।

পাপিয়া শিহরিয়া উঠিল। না? ব্যর্থ হইবার নয়! প্রাণের অধীর আকুলতা তবে ব্যর্থ হয় না?···তার···তারও তবে আশা আছে!···

পাপিয়া মানগোবিন্দর পায়ের কাছে প্রণাম করিল, কহিল,—বেশ, আমিও কথা দিচ্ছি, যেদিন নির্ম্মল শুদ্ধ মন নিয়ে তোমার এ মনুষ্যত্বের পূজা করবার জন্য একটুও ...ল হবো,...সেদিন আসবো, তোমার পায়ে নিশ্চয় সেদিন ফিরে আসবো।···আর এই যে ছুটী আমায় দিলে ...মি, এর জন্য, নারী আমি, পতিতা নারী—তবু ভগবান ...দি আমায় ঘৃণা না করে আমার ডাক শোনেন, তাহলে ...র পায়ে আমার অন্তরের প্রার্থনা জানাচ্ছি, তোমার ...বন সার্থক হোক্, পূর্ণ হোক্, পরিতৃপ্ত হোক্!···

কথাটা বলিয়া পাপিয়া চলিয়া যাইবার জন্য উদ্যত ...ইল। মানগোবিন্দ তার হাত ধরিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে ...লে,—তাহলে এ আমাদের চিরবিদায় নয়?

পাপিয়া কম্পিত দৃষ্টিতে মানগোবিন্দর পানে চাহিল, ...ও চোখে কি বিশ্বাস, কি তৃপ্তি···! সে কোনো কথা না ...লিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে ...হির হইয়া গেল।

মানগোবিন্দ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ...র পর শয্যায় দেহ-ভার লুটাইয়া দিয়া অবোধ বালকের ...় কাঁদিতে লাগিল।

১৩

বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছে, অমল ডাকিল,—...লা···

পাপিয়া কহিল,—কি?

অমল কহিল,—আমার হাত ধরে একটু গঙ্গার ধারে ...য়ে যাবে? সেই যে বড় জামগাছটার নীচে একটা ...ঙ্গা চাতালের মত আছে...সেইখানে একটু বসবো···

পাপিয়া কহিল,—চলো।

অমলের হাত ধরিয়া পাপিয়া বাহিরে গঙ্গার তীরে ...তালে আসিয়া বসিল। নদীতে ভাঁটা পড়িয়াছে, ...লর সে কলরব থামিয়া গিয়াছে—শান্ত মৃদু উচ্ছ্বসিত ...টে ঢেউগুলি···জোয়ারের খেলার পর বায়ুস্পর্শে যেন ...ন্তিতে ঝিমাইয়া পড়িয়াছে!···

অমল বলিল,—এমন করে কেন তুমি বন্দী হয়ে রইলে, চপল!···এক অন্ধ কাঙালের সেবায় সব ত্যাগ করলে!

পাপিয়া কহিল,—এ ত্যাগের মধ্যে সুখ পাচ্ছি বলেই না পড়ে আছি!

—কিন্তু আমি যে পদে পদে ক্ষুণ্ন হচ্ছি, আমার যে বেদনার সীমা থাকচে না।···আমি ভাবতুম, সেজে যারা অভিনয় করে, তাদের প্রাণ নেই, মন নেই···নানা ভূমিকার ছদ্মবেশে মানুষকে ছলনায় প্রতারিত করাই তাদের একমাত্র কাজ! মানুষের সুখ-দুঃখের পানে তারা ফিরেও চায় না···নিজেদের যশ আর অর্থই তাদের জীবনের কাম্য!

পাপিয়া নিশ্বাস চাপিয়া কহিল,—সে কথা মিথ্যাও নয়···

—কিন্তু তুমি তা মিথ্যে প্রমাণ করেচো!···

পাপিয়া বক্র কটাক্ষে অমলের পানে চাহিল, তার পর কহিল,—এ জেনেও আমার উদ্দেশে তোমার মনকে এমন ছন্দে-গানে ভরিয়ে তুলেছিলে?

অমল কহিল,—কি জানি, তোমার কথা মনে হলেই কে যেন আমায় বলতো,—তুমি ওদের মত নও,—তুমি ওদের ঢের উর্দ্ধে, ওদের সঙ্গে তোমার কোথাও মেলে না। ···তুমি মন দিয়ে অপরের মন বোঝো, তোমার চোখের দৃষ্টি মানুষের বাইরেটাকে ফুঁড়ে ভিতর অবধি যায়, বিপুল দরদ আর সহানুভূতি নিয়ে তার ভিতরকার সমস্ত জিনিষ, তার দোষ-গুণ, তার যা কিছু খুঁটিনাটী সব নিরীক্ষণ করতে পারে, বুঝতে পারে,...তা না হলে অভিনয়ে এতখানি কৃতিত্ব কি তোমার সম্ভব হতো! যে নিজেকে ভুলে পর হয়ে পরকে মনে-প্রাণে না নিতে পারে, আত্মভোলাভাবে পরের সুখ-দুঃখের এমন জীবন্ত ছবি সে কখনো ফুটিয়ে দেখাতে পারে!

পাপিয়ার বুকে অমলের প্রতি কথা তীক্ষ্ণ ছুঁচের মত বিঁধিতে লাগিল—বুক তার রক্তে রক্তময় হইয়া উঠিল। এত দরদ, এমন শ্রদ্ধা!···চপলা পরের সুখ-দুঃখ বোঝে? ···বটে! আর পাপিয়া···? যার পানে নির্ম্মম নিয়তির মত তোমার ঐ ক্রূর উপেক্ষার দৃষ্টি···সে পাষাণ, পাষাণ, পাষাণই বটে! চোখ থাকিতেও তুমি অন্ধ ছিলে, চিরদিন অন্ধ ছিলে, নহিলে সেই শয়তানীর জয়-গানে আজো তোমার কণ্ঠ এমন উচ্ছ্বসিত হয়!

অমল কহিল,—এ কি আমার ভুল, চপলা?···প্রশ্ন করিয়া সে হাসিল। পরে কহিল,—ভুল নয়। না হলে আমার তুচ্ছ দুটো কবিতা তোমায় এত মুগ্ধ করে যে তুমি তোমার প্রাসাদ ছেড়ে—ভোগ-বিলাস ছেড়ে এখানে এসেচো! অন্ধতাকে ঘিরে এমন করে পড়ে থাকচো!··· আমি অন্ধ বটে, কিন্তু মন আমার আলোয় ভরপূর···

পাপিয়া বলিল,—কিন্তু এ তো শুধু দয়া নয়···

অধীর আবেগে অমল কহিল—তবে…তবে একি চপল?

পাপিয়া কহিল,—আমি তোমায় ভালোবাসি।… অধীর হয়ো না, সত্যই ভালোবাসি। তুমি অন্ধ, তুমি কাঙাল,…রূপ, যৌবন, শ্রী…তোমার চেয়ে অন্য পুরুষের আরো মধুর হয়তো…কিন্তু এ-সবের জন্য ভালোবাসিনি, তোমার কবিত্বে মুগ্ধ হয়েও তোমায় আমি ভালোবাসিনি …রুদ্ধ নিশ্বাসে পাপিয়া এতখানি বলিয়া যেন ফুঁশিতে লাগিল। আর অমল? তার বুকের মধ্যে যেন প্রলয়ের রোল…বুক বুঝি ফাটিয়া যাইবে! এ কি আনন্দ, না উত্তেজনা, না, কি এ…!

অমল কহিল,—বলো, চপল, বলো, কেন তবে ভালো-বেসেচো?…আমি তো তোমার ভালবাসার যোগ্যও নই …তবু তোমার এ ভালোবাসা…

দলিত মনের রুদ্ধ অভিমান ঝড়ের বেগে গর্জ্জিয়া উঠিল। উত্তেজিতভাবেই পাপিয়া কহিল,—তা জানি, তুমি যে এ ভালোবাসার যোগ্য নও, তা জানি—তবু আমি ভালোবেসেচি, তবু যে তোমার পাশ ছেড়ে নড়তে পারি না, এ তোমার নিষ্ঠায়…যে আশা পূর্ণ হবার কোনো সম্ভাবনা নেই, সেই আশাকে সম্বল করে এমন ভাবে একান্ত নিষ্ঠায় ধ্যানমগ্ন থাকা…ওঃ ভগবান্, পাগল ছাড়া এ আর কেউ পারে না!…বলিতে বলিতে তার মন সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া আর্ত্ত হাহাকারে ফাটিয়া পড়িল, তার প্রাণের দুই কূল ভাঙ্গিয়া, তাকে চূর্ণ করিয়া…

পাপিয়া বলিল,—এ পাগলকে ভালোবাসা…আমারো এ পাগলামি ছাড়া আর কি! পাগল! এই নিষ্ঠাই আমায় পাগল করেচে…আমায় ধূলোয় লুটিয়ে দেছে! না হলে আমার একটা ভ্রূ-ভঙ্গীর জন্য, আমার এক ফোঁটা হাসির জন্য কত রাজা-মহারাজা এসে আমার পায়ে কেঁদে পড়েচে…আমি ফিরেও তাকাই নি! আর আজ…? আমি পাগল। পাগল না হলে এমন হয়…!

বলিতে বলিতে পাপিয়া শিহরিয়া উঠিল, এ কি, এ সে কি বলিতেছে!… এ-সব কথায় আত্মবিস্মৃতির ঘোরে এখনি যে নিজেকে সে প্রকাশ করিয়া ফেলিবে, আর তাহা হইলে এই প্রীতি, এ আদর কোথায় উবিয়া যাইবে বাষ্পের মত! সঙ্গে সঙ্গে তাকেও এই দণ্ডে উপেক্ষার ঘ্রাণে জর্জ্জরিত হইয়া দূরে সরিয়া যাইতে হইবে!…

অমল বিস্ময়ে অভিভূত হইল। এ নারীর এই সেবা, এই প্রীতি-ভালোবাসা, এ কি তবে পাগলের খেয়াল?…

অমল ক্ষুণ্ন হইল। এ সেবা তবে…সে নিঃস্ব বলিয়া নয়, অন্ধ বলিয়া নয়—এ সেবা দরদী চিত্তের স্বতঃ-উৎসারিত দরদের জন্যও নয়! এক বাতুল নারীর বাতুলতা মাত্র, খেয়াল শুধু?…এই খেয়ালকেই অন্ধ সে এ-ভাবে নির্ভর করিয়া আঁটিয়া ধরিতেছে!…তার পর জোয়ারের উচ্ছ্বসিত জলের মতই ঐ নারীর এ খেয়াল যখ চলিয়া যাইবে, তখন সে আরো নিঃস্ব, আরো কাঙাল হই একেবারে দুর্ভাগ্যের রসাতলে গড়াইয়া পড়িবে যে!…

অমল কহিল,—আমায় মাপ করো, চপলা।…এ খেয়া তোমার শাস্ত করো। অন্ধ আমি, কৃপার পাত্র। তোমার ভালোবাসা কামনা করবো, এত বড় ভাগ্যও করি নি আমি!…তবু অন্ধ কাঙাল বলে এইটুকু আমায় দরদ করো, মিথ্যা মরীচিকার পিছনে আমার লুব্ধ মনকে আ অগ্রসর হতে দিয়ো না—তাতে আমার ক্ষোভের সীমা থাকবে না!…আমি কাঙাল, আমার এ অন্ধতা নিয়ে আমার এই জীর্ণ ঘরে একলা পড়ে থাকি, তাই আমায় থাকতে দাও, তোমার প্রসাদের লোভে আমায় ক্ষিপ্ত করে তুলো না আর!…নিরাশায় আমি মরে যাবো, বু ফেটে মরে যাবো। এটুকু দয়া করো…। আমি তোমার কাছে কোনো অপরাধ করি নি…তুমি যাও, এ হীন দারিদ্র্য, এই কুৎসিত আবহাওয়া ছেড়ে ফিরে যাও তুমি তোমার ঐশ্বর্য্য-ঘেরা যশের সৌরভে-ভরা সেই সোনা প্রাসাদে…

অমলের প্রাণের কাতরতা, তার নিরুপায় অসহ অন্ধতার বেদনা এ কথার-মুখে অঝোরে ঝরিয়া পড়িল পাপিয়া নিজেকে কশাঘাত করিল। নিজের প্রেমে দর্পে এমনি স্পর্দ্ধিতা তুই নারী, যে পরের ভূমিকা দুর্ভাগ্যের রসাতলে পড়িয়াও এই রোষের অগ্নিস্ফুলি ছিটাইতে তোর ভরসা হয়!…তুই চোর, চুরি করি এ কথা এ-ভাবে আদায় করিতেছিস্, ধরা পড়িলে তো যে আর গতি থাকিবে না!…তা ছাড়া এ কি অন্ধে প্রীত করিবার জন্যই তুই এখানে পড়িয়া তার সেবা নিজেকে আজ জুতিয়া দিয়াছিস, না, এ সেবায় নি তুই তৃপ্তি পাস!…আর শুধু কি তাই? এ তো হিংস তোর প্রবল হিংসাই তোকে এখানে আটকাই রাখিয়াছে। পাছে চপলা কোনো মুহূর্ত্তে এখানে আসি এই প্রেম, এই প্রীতি পুরাপুরি ভোগ করিয়া তার কালি মাথা জন্মটার কালি মুছিয়া সাফ করিয়া তাকে চর সার্থকতায় ভরাইয়া তোলে, এই হিংসাতেই না তো এখানে পড়িয়া থাকা! ইহার জন্য আবার চোখ রাঙাই পরকে অনুযোগ জানাস্! হা রে দুর্ভাগিনী মূঢ় নারী!

মানগোবিন্দর কথা অমনি তার মনে পড়িয়া গেল পরকে তৃপ্তি দিয়া তবে নিজের তৃপ্তি! ঠিক, এই তো প্রেম, ইহাকেই তো বলে ভালোবাসা। না হইলে নিজের সুখ কে না চায়? নিজেকে ভালো কে না বাসে নিজের কথা ভুলিয়া পরকে যে ভালোবাসিতে পারে সেই তো প্রেমিক, সেই তো ভালোবাসিবার অধিকারী ভালোবাসা পাইবার অধিকারও শুধু তারই আছে!… ঠিক, ঠিক! পাপিয়া সবলে নিজের মনকে চাপি

দাঁড়াইয়া ধরিল। তার পর ঝড়ের মত একটা মস্ত নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল,—আমায় মাপ করো, ক্ষমা করো। আমার অপরাধ হয়েচে। ওগো, আমি মিথ্যা অভিমানে মিথ্যা কথা বলেচি। তোমায় আমি ভালোবাসি, ভালোবাসি, প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। আমি মনে তুমি যদি সুখী হও, তা হলে এই দণ্ডে মরতেও আমি প্রস্তুত আছি···

অমল কহিল,—অভিমান!···কিসের অভিমান, চপলা?

পাপিয়া হাঁফাইয়া উঠিয়াছিল। শ্রান্তি-ভরা আর্ত্ত স্বরে সে কহিল,—কিছু না, ওগো আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করো না···কিছু না। আমি নিজেকে বুঝতে পারচি না।···আমার বলে কিছু আর আমি রাখতে চাই না। আমি তোমার, তোমার দাসী, সেবিকা,···তোমার ঐ পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে থাকবার ধুলো-মাটি আমি···

অমল কহিল,—আজ আমার বড় দুঃখ হচ্ছে চপলা, দ্যখ, আমি অন্ধ, আমার দৃষ্টি হারিয়েছি। আজ যদি দৃষ্টি থাকতো, তাহলে আমার বুকের উপর তোমার ঐ মুখখানি তুলে নিয়ে দেখতুম, মুখের কথা বন্ধ রেখে আকুল চোখে শুধু তোমায় দেখতুম! ভগবান চক্ষু কেড়ে নিয়ে তবে তোমায় এনে দিলেন!···এ তাঁর কি নিষ্ঠুরতা, চপল!

চক্ষু! দৃষ্টি! সর্ব্বনাশ! এ কথা মনে হইতেই পাপিয়ার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। ঐ চোখে দৃষ্টি থাকিলে আজ কোথায় থাকিত সে! অমলই বা এ প্রীতির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইতে পারিত কি! দুই জনকেই নৈরাশ্যে পীড়িত হইতে হইত! একজন ঘরের কোণে বসিয়া নৈরাশ্যে দহিয়া দহিয়া কবিতা লিখিত, আর একজন···সে যে কি করিত, তা সে বুঝিয়া পাইল না! ঐ হট্টগোল, ঐ কোলাহল···না, না, সেখানে থাকা সম্ভবও ছিল না! সে···সে তাহা হইলে পাগল হইয়া যাইত, হয়তো নিজের গলা টিপিয়া নিজেকে হত্যা করিত! এত-বড় নৈরাশ্যের কথা মনে হইলে পৃথিবী যেন পায়ের তলা হইতে সরিয়া যায়—একটা গহ্বর···তার বিরাট অতলতার মাঝে তাকে যেন গ্রাস করিতে চায়!

অমল কহিল,—চোখ কি আমার হয় না, চপলা?··· এমন কি কেউ নেই? আমি তো জন্মান্ধ নই! তা যদি পারো চপল আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে—তাহলে তুমি যে-ই হও, আমি তোমার পায়ে আজীবন বিকিয়ে থাকি।

আবার শিহরণ!···পাপিয়া কহিল,—আমি যেই হই···? তার বুক সঘন স্পন্দিত হইল। সে বলিল— যদি চোখ মেলে ভাখো, আমি তোমার সে ধ্যানের ধন চপলা নই···? আমি···আমি···

না, না!, ওরে মূঢ়, ওরে বাতুল, ও নাম নয়! এখনি সংশয়ের বাণে তোর সব যাইবে···!

অমল হাসিয়া কহিল—কে তুমি?

প্রাণপণ-শক্তিতে কণ্ঠস্বর সহজ করিয়া পাপিয়া কহিল, —যে-ই হই—যদি চপলা না হই···?

হাসিয়া অমল কহিল,—যে হও তুমি, আমি তোমার। এই সেবা, এই দরদ, এতেও যদি আমি নিজেকে তোমার হাতে সমর্পণ না করি, তাহলে কি আমি মানুষ থাকবো, চপলা? একটা কৃতজ্ঞতাও কি আমার নেই···?

পাপিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল,—কৃতজ্ঞতা!

অমল কহিল,—কথার কথা বলচি! কিন্তু এ কৃতজ্ঞতা নয়—ভালোবাসাই। এত দিন একসঙ্গে থেকে আমরা দুজনে দুজনকে যেমন চিনেচি, এমন চেনা অনেক স্বামি-স্ত্রীর ভাগ্যেও ঘটে না যে!···তবে আমি দুঃখী, কাঙাল···আমার তো কোনো দাম নেই, গ্রহণ করবার যোগ্যও আমি নই!

পাপিয়া কহিল,—মানুষ মানুষকে গ্রহণ করে বুঝি তার টাকা-কড়ি আর প্রাসাদ-ভবন দেখে?···না। মনই মানুষের একমাত্র দাম!···এক-একজন মানুষের মনের দাম এত বড় যে তার পাশে বড় বড় রাজার রাজ-কোষও মলিন তুচ্ছ হয়ে পড়ে···অবশ্য নারীর কাছে, নারীর প্রেমের কাছে!

অমল কহিল,—আর তুমিও সেই নারী, যার মন কেনবার মত মূল্য কোনো মহারাজার রত্ন-ভাণ্ডারও জুগিয়ে তুলতে পারে না!···তুমি যেই হও চপলা, তুমি নারী, আমার বন্ধু, আমার প্রাণের একমাত্র স্বজন···আমি অন্ধই থাকি, আর আমার চোখই ফুটুক, তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে জেনো, আমি তোমার চির-জীবনের সাথী থাকবো।···

—থাকবে? থাকবে?···সত্য বলচো? অধীর উত্তেজনায় পাপিয়া যেন পাগল হইয়া উঠিল।

—অমল কহিল,—এর চেয়ে বড় সত্য আর নেই!···

—বেশ, তাই হবে। আজ থেকে আমার এক লক্ষ্য— কি করে তোমার ঐ দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনবো···

অমল স্তব্ধ হইল। সে ভাবিল, তবে কি এ চপলা নয়, সত্যই?···না হইলে এ-সব প্রশ্ন? এ প্রশ্নের অর্থ কি?···কিন্তু কে এমন বাতুল নারী আছে যে, তার মত অন্ধ কাঙালকে এমন ভালোবাসিয়া তার সেবায় নিজেকে এভাবে উৎসর্গ করিয়া দিবে!···অথচ, এ নারী অগাধ পয়সার মালিক! অমলকে রাজার সুখে রাজার ঐশ্বর্য্যে রাখিয়াছে!···অমলের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না!...

১৭

পরের দিনের কথা।

অমলকে খাওয়াইয়া নিজে কোনমতে মুখে দুটি ভাত গুঁজিয়া পাপিয়া বাহির হইল কলিকাতার ডাক্তারের সন্ধানে। অত করিয়া বলিয়াছে, যদি চোখ সারে!··· আহা, অন্ধ, বেচারা! সেই সঙ্গে এ কথাও মনে

হইল, চোখের দৃষ্টি ফিরিলে তার জীবনের সাধ যদি একেবারে চূর্ণ হইয়া যায়? সেবার এ আনন্দ-ধূলায় লুটাইবে। জন্মের মত এ ঘর হইতে তাকে বিদায় লইতে হইবে।...হোক্ তা! তা বলিয়া স্বার্থপরের মত শুধু নিজের তৃপ্তি-সুখের জন্য ইহাকে অন্ধ রাখিয়াই দিবে! দিবানিশি এ ছলনার ছদ্মবেশে অভিনয় করাতেও আর রুচি নাই। তার চেয়ে কঠিন সত্য যদি আঘাতে চূর্ণ করিয়া দেয়, সেও ঢের ভালো!

কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে সে নিজের গৃহে গেল—পরে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া একটা লোক সঙ্গে করিয়া একেবারে মেডিকেল কলেজে আসিয়া উঠিল।...চোখের হাসপাতালে খোঁজ করিয়া, কলিকাতায় যতগুলি চোখের ডাক্তার আছেন, সকলকে ডাকিয়া দেখাইবে, যিনি সারাইতে পারিবেন, তাঁর পায়ে অনেক টাকা সে ঢালিয়া দিবে!...

সেই দিনই চার-পাঁচজনের সঙ্গে সে কথাবার্ত্তা কহিয়া আসিল, কাল তাঁরা সকলে কাশীপুরে গিয়া রোগী দেখিয়া আসিবেন।...

যথাসময়ে ডাক্তাররা আসিয়া চক্ষু পরীক্ষা করিলেন। বলিলেন, একটা অস্ত্র করিলে সারিতে পারে। তবে বলা যায় না। হয় সারিবে, নয়তো জন্মান্ধই থাকিয়া যাইবে!—আশঙ্কা আছে—তবু এখন যা আছে, জন্মান্ধ হইলে তার চেয়ে বেশী ক্ষতিই বা কি হইবে!...পরামর্শ করিয়া সকলে কহিলেন, বাড়ীতে এত-বড় অস্ত্র করায় খরচ ঢের হইবে, তাছাড়া তাতে অসুবিধাও বিস্তর আছে!

পাপিয়া কহিল,—তা হাসপাতালে আলাদা ঘর তো ভাড়া নেওয়া যেতে পারে?

ডাক্তার বলিলেন—পারে।

পাপিয়া কহিল,—তবে তার বন্দোবস্ত করুন। যত টাকা খরচ হয়...বাধবে না।

তাহাই ঠিক হইল। কটেজ হাসপাতালে দোতলা কামরা ভাড়া লওয়া হইল; এবং অমলকে লইয়া পাপিয়া একদিন সেখানে আসিল।...তার পর অস্ত্র!...

অমল ডাকিল,—চপলা...

পাপিয়ার বুক উদ্বেগে আশঙ্কায় কাঁপিতেছিল। কোনমতে সে কহিল,—কি? ইহার বেশী আর একটা কথাও তার মুখে ফুটিল না।...সে শুধু সকাতরে ভগবানকে ডাকিতেছিল—হে ঠাকুর, রক্ষা করো।

অমল বলিল,—যদি এই সঙ্গে জন্মের মত জ্ঞান হারাই? জ্ঞান আর ফিরে না আসে...?

পাপিয়া কাতরভাবে অমলকে জড়াইয়া ধরিল, আর্ত্ত স্বরে কহিল,—ওগো, না, না, অমন কথা বলো না গো! আমার এ সাধনা কি নিষ্ফল হবে?

—যদি হয়...?

—না, না, তা হবে না! পাপিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিল।—তা হতে পারে না। আমার প্রাণ বলচে, তুমি সেরে উঠবে—চোখে অজস্র আলো নিয়ে, নতুন দীপ্তি নিয়ে তুমি জেগে উঠবে—ওগো, আমি যে কাতরভাবে তাঁকে ডাকচি। তাঁর পায়ে কি সে ডাক পৌঁছুবে না? সত্যই তিনি বিমুখ হবেন?...না, না, এমন নিষ্ঠুর তিনি হতে পারেন না! তিনি যে দয়াময়, বিশ্বের ভগবান তিনি!

—তাই হোক্ চপলা! অমল একটা নিশ্বাস ফেলিল। তার পর ডাকিল—চপলা—

—কেন?

—আমার একটা কথা রাখবে...?

—কি...?

—আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েছে, তার স্পর্দ্ধা সীমা লঙ্ঘন করতে চায়, চপলা...

পাপিয়া বিস্ময়াকুল নেত্রে অমলের পানে চাহিল।

অমল কহিল,—জীবনের এ চরম ক্ষণ, চপল তাই...

পাপিয়া কোনো কথা বলিল না, স্থির দৃষ্টিতে শু অমলের পানে চাহিয়া রহিল।

অমল বলিল,—যদি যেতে হয় তো পাথেয় কি দাও, যা পেয়ে মনে ভাবতে পারি, এ জীবনটা আমা একেবারে ব্যর্থ হয় নি...তার অন্তিম ক্ষণটুকু সার্থকতা ভরে উঠেছিল...

পাপিয়া অমলের পাশেই দাঁড়াইয়াছিল। অমল হা বাড়াইয়া পাপিয়াকে আঁকড়াইয়া ধরিল। তার প বিপুল আবেগে তাকে বুকের মধ্যে টানিয়া তার অধ চুম্বনের পর চুম্বন বর্ষণ করিল। পাপিয়া নড়িল না, বা দিল না—তার চেতনা যেন বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। যেন কোন্ আশার অতীত স্বপ্নলোকে উধাও ভাসি চলিয়াছিল! তার নারীত্ব সার্থকতায় ভরিয়া বিপু মহিমায় তাকে এ ধূলি-জর্জ্জর মলিন মর্ত্ত্যলোক হইতে অনেক ঊর্দ্ধে তুলিয়া লইয়াছিল!...

ডাক্তার আসিয়া রোগীকে অচেতন করিয়া তা চোখে অস্ত্র করিলেন। সে এক ভীষণ মুহূর্ত্ত!...পাপি আর্ত্তের মত দাঁড়াইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, চোখে তা এক বিন্দু জল নাই!...সে কেবলি ডাকিতেছিল, ঠাকুর হে ঠাকুর, রক্ষা করো!

অস্ত্র শেষ হইলে ডাক্তার রোগীর চোখে পটি বাঁধি দিলেন। পাপিয়াকে বলিলেন,—আলো জ্বালবেন, খু সাবধানে! চোখে আলো লাগলে জন্মের মত চো যাবে! আশা হয়, দৃষ্টি ফিরে পাবেন!...

পাইবেন! ঐ চোখ তার পুরানো দীপ্তিতে ভরি উঠিবে! এই সুন্দর পৃথিবী তার শ্যামল নির্ম্মল শোভা ঝলমল্ করিয়া আবার অমলের চোখের সামনে উদ্ভাসি হইয়া উঠিবে, তার প্রাণখানিকে মুগ্ধ আবিষ্ট করিবে!...

কিন্তু সে…? কঠিন নিয়তি তার ভাগ্যে কি দুঃখই না আনিয়া দিবে! আজ অমল অন্ধ, তাই তার এ দুঃখ…সে তো জানে, পাপিয়ার নামে কতখানি ঘৃণার বিষ অমলের অন্তরে পুঞ্জিত হইয়া ওঠে! সে কুহকিনী, মায়াবিনী, ডাকিনী, অমলের কাছে এই মাত্র তার পরিচয়! আর চপলা? ক্ষুব্ধ অভিমানের ব্যথায় পাপিয়ার বুক টনটন্ করিয়া উঠিল!…দুই চোখে জলও ঠেলিয়া ঠেলিয়া আসিতেছিল!…

সংজ্ঞা পাইয়া অমল ডাকিল,—চপল…

পাপিয়া তার হাতে হাত রাখিয়া বলিল—এই যে আমি…

অমল কহিল,—এ যে আরো অন্ধকার, চপল…

পাপিয়া কহিল,—চোখ যে ওঁরা বেঁধে দেছেন…

—কতদিন এমন বাঁধা থাকবে?

—প্রায় একমাস।

—একমাস!…তার পর চোখে দেখতে পাবো…?

—পাবে। ওঁরা তো সেই আশাই দিলেন। ওঁরা বলেন, আরো আগে কেন অস্ত্র করা হলো না, তা হলে ত দীর্ঘ দিন কষ্ট সয়ে থাকতে হতো না!

—কিন্তু অন্ধ হয়ে আমার তো কোনো কষ্ট ছিল না, ল…অমল থামিল, তার পর মৃদু হাসিয়া কহিল—অন্ধ তোমায় পেয়েচি চপল…তুমি আমার এ অন্ধ নয়নে নর তারা…

পাপিয়ার চোখে আবার জলের স্রোত দেখা দিল। ায়া কি কোনো দিন ঘুচিবে না, ভগবান? এ জীবনটা কাঁদিতেই পাঠাইয়াছিলে!…

তখনি আবার মনে হইল, কাঁদিতে হইবে না তো অন্ধ যৌবনের দর্পে প্রাণ লইয়া কি পৈশাচিক াই খেলিয়াছিস্, নারী! নিজের মনের পানেও য়া তাকাস্ নাই! তার যে মৌন আহ্বান ধীরে জাগিয়াছিল, তা কাণেও শুনিস্ নাই! না য়া যৌবনকে লইয়া শুধু ছিনিমিনি খেলিয়াছিস, ত্বকে খর্ব্ব করিয়া লজ্জিত করিয়া কেবলি কালির পঙ্কে ডুবাইয়া ধরিয়াছিস! শুধু বিলাস-কৌতুক আর কড়িকেই সম্বল করিয়াছিলি! তার ফল কোথায় !…নারীত্ব কি পণ্য, নারীত্ব কি লোকের সামনে বিকাইবার, না, বিলাইবার বস্তু!…

মল কহিল,—কথা কচ্ছ না যে?

াপিয়া কহিল,—এই যে আমি।

-তুমি কাঁদচো?

াঢ় স্বরে পাপিয়া কহিল—না। বলিয়া সে চোখ ।

অমল কহিল,—দেখি…বলিয়া হাত বাড়াইয়া পিয়ার মুখ স্পর্শ করিল। তার মুখে-চোখে-গালে হাত বুলাইয়া কহিল,…এই যে গাল ঠাণ্ডা, ভিজে বা মনে হচ্ছে…

পাপিয়ার চোখ এ কথায় আরো যেন বান ডাকাইল। কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করিয়া পাপিয়া কহিল,—না, ও আমি আগে কেঁদেছিলুম…

—কেন কেঁদেছিলে?

—ভাবনা হয়েছিল যে…তোমায় ওঁরা অজ্ঞান করেছিলেন যে…যদি জ্ঞান না হয়, তাই…

অমল হাসিল, হাসিয়া কহিল,—তুমি যে আমার কে ছিলে, জানি না। কিন্তু এখন তুমি আমার চোখ, তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার সব!…যদি চোখ ফিরে পাই তো সে তোমারি দয়ায়! তোমার এ ঋণ কি দিয়ে শোধ করবো চপল?

—শোধ করিতে হবে না গো। ও-সব কথা বলো না আর!…আমার জন্যই তোমার এ দশা, তুমি অন্ধ, এ কথা মনে হলে বুক আমার ফেটে যায়। ইচ্ছা হয়, আমার এই দুই চোখ উপড়ে ছিঁড়ে অত-বড় অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করি…

অমল কহিল,—ছি, তোমার জন্য আমার চোখ যাবে কেন! মনের অন্ধ আবেগে আমি যদি তখন গাড়ীর পিছনে অমন করে না তাকাতুম, তাহলে বেহুঁশিয়ার হয়ে গাড়ী চাপাও পড়তুম না তো!

—সেও ঐ আমাকে দেখবার জন্যই!…যদি সে রাত্রে তোমায় টিকিট দিয়ে থিয়েটারে না নিয়ে যেতুম…

—তা হোক চপলা, সে দিন আমার জীবনের সুদিন। তোমার করুণা পেয়েচি, তাই…এ যে অন্ধ হয়েও দুনিয়া আমি আলো দেখচি!…আমার সাধনার ধন, আমার ধ্যানের ধন চপলাকে আমার পাশে অহরহ পেয়েচি…

—আমি সর্ব্বনাশী পোড়ারমুখী, আমা[illegible] অমন করে বলো না, তোমার পায়ে পড়ি।

—আচ্ছা, সে কথা থাক। যা বলছিলুম…আমার কি মনে হচ্ছে, জানো? কবে এই একমাস পূর্ণ হবে! ডাক্তার চোখের বাঁধন খুলে দেবেন!…আঃ, সে দিন… যেদিন এই চোখের বাঁধন খুলে তোমায় দেখতে পাবো! তোমার মুখ, তোমার হাসি…তার পর দিনের আলো, নীল আকাশ…

পাপিয়া কোন কথা বলিল না। হায়, সে সুদিন তার ভাগ্যে কি যে সঞ্চিত রাখিয়াছে, নৈরাশ্যের লাঞ্ছনার ঘৃণার কি অসীম অসহ্য বেদনা!…

অমল কহিল,—এই একমাস এখানেই থাকতে হবে?

পাপিয়া কহিল;—না, অন্ততঃ দিন পনেরো…

অমল কহিল,—তুমি বই আনাও, পড়বে, আমি শুনবো…

পাপিয়া কহিল,—কি পড়বো, বলো?

অমল কহিল,—যা খুশী···যা তোমার ভালো লাগে···

পাপিয়া কহিল,—বেশ, বেয়ারাকে বলবো,—একটা র্দ্দ করো···তাকে দোকানে পাঠাবো। তোমার সঙ্গে রামর্শ করে ফর্দ্দ লিখবো···কেমন?

অমল কহিল,—আচ্ছা।

১৮

পাপিয়া বহি পড়িতেছিল; আর অমল বিছানায় শুইয়া শুনিতেছিল। একখানা উপন্যাস। নায়িকা প্রাণ ঢালিয়া ভালোবাসিয়াও নায়কের মন পাইতেছে না,—আর নায়ক এক পাষাণীর প্রাণের দ্বারে মাথা কুটিয়া মরিতেছে—তবু সে পাষাণী ফিরিয়া দেখিতেছে না। যখন পাষাণীর কাছে লাঞ্ছনার একশেষ পাইয়া নাকাল, তখন হঠাৎ পথে কে গাহিয়া উঠিয়াছে—

> কাছে আছে, দেখিতে না পাও,
> তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও!

নায়ক তখন বিহ্বল চিত্তে ভাবিতে লাগিল, কে এ··· কাছে কে আছে!···

এইখানটা পড়িতে পড়িতে পাপিয়ার বুক বেদনায় ভারী হইয়া আসিল, তার কণ্ঠ কে যেন চাপিয়া ধরিল!··· দুই চোখ বহিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল। এত দুঃখ সত্যই তবে কেহ সহিয়াছিল···তার মত, এমনি প্রচণ্ড, এমনি তীব্র বহ্নি-দাহ!···মহাপুরুষ, মহাপুরুষ এ বইয়ের লেখক, নারীর অন্তরের বেদনা এমন করিয়াও তিনি জানিয়াছেন! না জানিলে তুলির রেখায় নায়িকার এই অসহ্য দুঃখ এমন করিয়া কখনো লিখিতে পারিতেন না! এ যে তার সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যাইতেছে—নায়িকার অতি-ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাসটুকু অবধি!···

চোখের জলে বইয়ের পাতা এমন অস্পষ্ট ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল যে আর পড়া চলে না।

পাপিয়া বই পড়া থামাইয়া কাঁদিতে বসিল। প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল।

অমল বলিল,—থামলে যে···

পাপিয়া কহিল,—আর পড়তে পারচি না। কমলার এত দুঃখ...বড় কষ্ট হয় যে!

চেষ্টা করিয়াও পাপিয়া তার স্বরে অশ্রু-বারির জড়তা ঘুচাইতে পারিল না।

হাসিয়া অমল কহিল—এ যে বইয়ের গল্প পড়চো! এ কি সত্যি···?

পাপিয়া কহিল,—হোক গল্প—তবু জীবনেও তো এমন ঘটে!

অমল আবার হাসিল, হাসিয়া কহিল—তুমি পাগল হয়েচো!

—না গো, পাগল নই আমি। আমি যে মেয়েমানুষ —মেয়েমানুষের দুঃখ তুমি তো···

—তোমাকেও কি এমন দুঃখ পেতে হয়েচে না কি···?

পাপিয়া শরাহতের মত চমকিয়া অমলের পানে চাহিল। অমলের ঠোঁটের কোণে হাসির বিদ্যুৎ তখনো মিলাইয়া যায় নাই।···নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর···পাইতে হইয়াছে কি! পলে পলে যে বেদনা সে সহিতেছে, তাহা তোমার অতি-চমকপ্রদ কোনো উপন্যাসে আজ পর্য্যন্ত কোনো লেখক তুলির লেখায় ফুটাইয়া তোলে নাই! ফুটাইবার সাধ্য কি! কালির আঁচড়ে এ বেদনা ফুটানো যায় না· এ বেদনা ফুটাইয়া দেখাইতে গেলে বুকের মাঝে শির ছেঁড়া রক্তে তুলি রঞ্জিত করিতে হইবে!···

অমল কহিল,—এইতেই ধরা পড়ে যাচ্ছ চপল·· তোমার মন যে কতখানি কোমল, কি দরদে ভরা,— উপন্যাসে লেখা মিথ্যা নর-নারীর দুঃখে এত বিচলিত হচ্ছ! সত্যই তুমি দেবী···

কি ক্রূর পরিহাস! অদৃষ্টের কি এ মর্ম্মঘাতী নিদারুণ ব্যঙ্গ!···তবু কি নাগপাশই যে তাকে আঁটিয়া বাঁধিয়াছে ···মুক্তি নাই, মুক্তি নাই! এ বাঁধন কাটিয়া পলাইবার তার কোন উপায়ও নাই! সে জানে, আর ক'টা দিন মাত্র···তারপর তার প্রকাণ্ড ছলনা ধরা পড়িয়া যাইবে, আর সে· অদৃষ্টে যাই থাক্, সুধার পাত্র যখন অধরের সামনে এমন উদ্যত রহিয়াছে, তখন মৃত্যু আসন্ন বলিয়া ভয়ে কাতর হওয়া নয়,···এ সুধা যতটুকু পারি, পান করিয়া ধন্য হই!

অমল বলিল,—পড়তে কষ্ট হয় তো থাক্—আর পড়ো না!···মোদ্দা লেখাটা ভালো। এমন জায়গায় থেমে থাকলে ভারী অস্থির হতে হয়—কি হলো শেষে বেচারী কমলার···

উচ্ছলিত আগ্রহে পাপিয়া কহিল,—তোমার দুঃখ হচ্ছে না কমলার দুঃখে···?

অমল কহিল,—হচ্ছে বৈ কি। তা বলে তোমার মত কাঁদবো, এ যে রচা গল্প-কথা, চপল···অমল থামিল।

তার পর মৃদু হাসিয়া অমল কহিল,—এ তো আমার চপলা নয়, আমার জীবনের একমাত্র সত্য···যে তার দুঃখে আমার চোখে জল পড়বে!···তবে দুঃখ হয়। বড় লিখিয়ের লেখার শক্তিই এই, তাঁর কল্পিত নর-নারীর সুখে আমরা আনন্দ পাই, তাদের দুঃখে প্রাণ আমাদের বেদনায় ভরে ওঠে!···

পাপিয়া কহিল,—তুমি তো আমায় ভালোবাসো··· পাপিয়ার কথা বাধিয়া গেল। আর কিছু সে বলিতে পারিল না।

অমল কহিল,—বাসি তো···তার পর···? বলো···

পাপিয়া কহিল,—আমি যদি এই দুঃখ ভোগ করি,

নৈরাশ্যের এমনি তীব্র যাতনা…তাহলে…? পাপিয়ার নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিল। সে আর কিছু বলিতে পারিল না—বেদনা তার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিল।

অমল কহিল,—তাহলে আমি কি করি, জানো…? য হতভাগার জন্ম তুমি এত দুঃখ পাচ্ছ, ঠিকানা পেলে আমি গিয়ে তার কাণ দুটো আচ্ছা করে মলে দি…আর চাবুকের ঘায়ে জর্জ্জরিত করে তাকে এনে তোমার পায়ের উপর তার মুখখানা গুঁজড়ে ধরি…

পাপিয়ার আর সহ্য হইল না, এ বেদনার যে সীমা নাই গো!…পাছে সব গোপনতা ভাঙ্গিয়া আসল সত্য প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই ভয়ে ঘর হইতে ছুটিয়া সে বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল এবং বারান্দার এক কোণে পড়িয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল—ওগো, সত্যই কি তাই!…সত্যই কি পাপিয়ার বেদনা তুমি বুঝিবে, বুঝিয়া এমনি দরদ করিয়া এমনি সহানুভূতির পুঞ্জিত ধারায়…তবে কি সত্যই আজ তোমায় প্রকাশ করিয়া বলিব গো, এই ছদ্মবেশ, ছলনায় পূর্ণ প্রকাণ্ড জাল ছিঁড়িয়া চূর্ণ করিয়া—কে আমি?…হায়, তুমি কি তা বিশ্বাস করিবে—যে, পাপিয়া তোমার ছোট্ট একটু সুখের জন্ম হাসিমুখে আজ মরণের কোলে ঝাঁপ দিতে পারে? আর যে-চপলার জন্ম তুমি পাগল, সে কত বড় পাষাণী…? এ ছদ্ম অভিনয়ে তোমায় ভুলাইয়া রাখিতে পাপিয়ার বুক যে আজ ভাঙ্গিয়া খানখান হইয়া যাইতেছে—কলঙ্ক-লাঞ্ছনার কালি বাঁচাইয়া, তার যেটুকু নারীত্ব শুভ্র মহিমায় মর্ম্মের এককোণে লুকাইয়া পড়িয়া ছিল, সেটুকু যে এ ভাণ, এ মিথ্যার আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে!…মানুষের প্রাণ তো…আর কত সয়!…

কিন্তু না, সে কি পাগল হইয়াছে! এ তো উপন্যাস নয়, এ যে জীবন—নির্ম্মম কঠিন ভীষণ জীবন! এখানে একফোঁটা অশ্রুজলে মানুষের মন ফেরে না, একটা কাতর দীর্ঘশ্বাসে আর-একটা প্রাণের গতিও বাঁকিয়া অন্য পথে ছুটিয়া চলে না!…চোখের জল এখানে শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে, দীর্ঘশ্বাস নীরবে বাতাসে মিলাইয়া যায়,—সত্যকার জীবনে তার কোন মূল্যও নাই…! তা যদি থাকিত, তাহা হইলে এই পৃথিবী আজ স্বর্গ হইত, বেদনার একটুকরা মেঘও আজ পৃথিবীর বুকে কালো দাগের মত তাকে মলিন করিয়া রাখিত না…!…

রাত্রে অমল বলিল,—আর ক'দিন আছে, চপলা?

পাপিয়া কহিল,—আজ সতেরো দিন হলো।

অমল কহিল,—আর তেরো দিন পরে তোমায় দেখতে পাবো।…

পাপিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

অমল কহিল,—এই তেরোটা দিন যদি আজ এই রাত্রের একটি ঘুমে কাটিয়া দেওয়া যেতো, চপল…অমল হাত বাড়াইল। পাপিয়া বুঝিল, অমল তাহাকে পাশে চাহিতেছে!…তার মন ক্ষুব্ধ হইল, কিন্তু মনকে কেন আর এ আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন দেখানো! এ মরীচিকায় প্রলুব্ধ করা বৈ তো নয়!—তবু তেরো দিন! দীর্ঘকাল! হায় রে! অমল চাহিতেছে, এই একটা রাত্রির মাঝেই সে-তেরোটা দিনের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যায়! আর সে…? সে চায়, এই তেরোটা দিন যেন কখনো শেষ না হয়…!

অমল কহিল,—কাছে এসো চপল…আমার হাতে হাত দাও…

পাপিয়া তাই করিল; অমলের হাতে হাত রাখিল। অমল তাকে টানিয়া বুকের কাছে আনিল, ডাকিল,—চপল…

পাপিয়া কহিল,—কি বলচো?

অমল কহিল,—আমার অন্ধতা ঘুচলে আমায় তুমি ফেলে যাবে?…বলো, তা যদি যাও তো কাজ নেই আমার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে—আমি যেন চির-অন্ধ হয়েই থাকি!

পাপিয়া কহিল,—ছি, ও কথা কি বলতে আছে! আমি তুচ্ছ নারী…

অমল কহিল,—তুচ্ছ নারী…! তুমি দেবী…

পাপিয়া কহিল—দেবীই বটে! স্বর্গ আমায় কামনা করচে!

অমল কহিল,—করবেই তো। অন্ধের প্রতি এই মমতা!…ভগবান দেখচেন। তিনি অন্ধ নন্!

পাপিয়া কোন কথা কহিল না।

অমল কহিল,—তবু একটা কথা, চপল। আমার চোখ সারবে, আমি রোজ রোজ তোমায় দেখবো, এ আশায় আমার আনন্দ ধরচে না…কিন্তু তুমি কেন সে-রকম আনন্দ প্রকাশ করচো না? তুমি কেন দূরে সরে সরে যাচ্ছো…? তবে কি আমায় তুমি ছেড়ে যাবে…আমার এ অসহায়তা ঘুচলে…?

পাপিয়া কহিল,—তুমি যদি তাড়িয়ে না দাও তো আমি কোথাও যাবো না, কোথাও না…স্বর্গ পেলেও নড়বো না।…কিন্তু তুমি কি আমায় সহ্য করতে পারবে? সেই ভয়েই আমি শিউরে উঠচি…

অমল কহিল,—ও কথা বলো না। আমি এত বড় অকৃতজ্ঞ নই যে…

পাপিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিল,—আমি যে কত ছলনাময়ী, তোমায় অন্ধ পেয়ে কত বড় ছলনায় কি মোহেই তোমাকে ভুলিয়েছি, তা জানতে পারলে তুমি আমার গলা টিপে এই দণ্ডে মেরে ফেলবে…

ক্ষুব্ধ অভিমানে অমল কহিল,—আবার!…মোহ! ছলনা! এমনি মোহে চিরদিন আমায় তুমি ভুলিয়ে রাখো—এ ছলনা আমার যে কতখানি কাম্য…

হায় অন্ধ, সত্যই তুমি অন্ধ, বেচারা!

১৯

একমাস কাটিয়া গিয়াছে। কাল সকালে অমলের চোখের ব্যাণ্ডেজ খোলা হইবে। আনন্দের উল্লাসে, উত্তেজনায় অমলের চিত্ত মুহুর্মুহু আন্দোলিত হইতেছে—আর পাপিয়া ঝরা ফুলের মত মলিন। তার মুখ শুকাইয়া ম্লান, মুখে কথা নাই—চোখের দৃষ্টি উদাস, অসহ্য কাতরতায় ভরা। এ কয়দিনে সে এমন শীর্ণ হইয়া গিয়াছে যে, তাকে দেখিলে মনে হয়, কোন্ দুশ্চর তপস্যায় তনু তার ক্ষীণ,—সেই যৌবন-কৌতুকময়ী জীবন্ত পাপিয়ার এক বিবর্ণ ছায়ার মত সে এই জীর্ণ গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।···

আর এই একটা রাত্রি! আজ মহীয়সীর পরিপূর্ণ মহিমায় ভরিয়া ওঠা চাই···তার পর কাল সকালে জীর্ণ মলিন রিক্তের মত তাকে পথে বাহির হইতে হইবে! এই একটি রাত্রি যা রাজ-সিংহাসনে রাণীর মহিমায়··· কাল সকালে সে সর্ব্বহারা নিঃস্ব ভিখারিণী···!

অমল বারবার অনুযোগ করিতেছিল, চপলা যেন তাকে ছাড়িয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে—এ আনন্দের মাঝখানে তাকে যেন সে ভুলিয়া যাইতেছে···! এ দুঃখ অমলের বুকে বড় বাজিতেছে—চোখ ফুটিবে, তবু তার সব আনন্দ যেন উবিয়া যাইতেছে!···

পাপিয়া কহিল,—কিন্তু অন্ধ ছিলে বলেই না তুমি আমায় সহায় চেয়েছিলে! আর এখন তো সহায়ের দরকার নেই!—তার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, এই অন্ধতার আবরণ ছিল বলিয়াই না অমল তাকে মালিন্য-কলঙ্কের স্পর্শলেশহীন শুধু নারী বলিয়াই ভাবিতে পারিয়াছে। কাল চোখ চাহিয়া যখন দেখিবে, এ নারীর সর্ব্ব অবয়বে পাপের গভীর কালি তাকে কি কালো করিয়া রাখিয়াছে, মুখে-চোখে কালির কি গভীর রেখা, মন তার নারীত্বের লাঞ্ছনায় পাথর হইয়া আছে, তখন···?

অমল কহিল—তুমি যেই হও, তুমি যদি আপত্তি না করো, তাহলে তোমায় চির দিন এমনি পাশটিতে রেখে আমার জীবনকে আমি সার্থক করবো।—আর কিছু না হোক, অকৃতজ্ঞতার পাপেও যে আমি লিপ্ত হতে চাই না। এত বড় সেবায় কৃতজ্ঞতাও কি কিছু নেই আমার যে, তুমি বার বার এই সব যা-তা ভেবে, যা-তা বলে আমায় ক্ষুণ্ণ করচো, অপমানিত করচো···!

পাপিয়া কহিল,—কিন্তু এই ভয়ে আমি যে সর্ব্বক্ষণ শিউরে কুণ্ঠিত হয়ে আছি!

—না, না, কোন কুণ্ঠা, কোন ভয় নেই, চপলা। সমাজ তার ভ্রূকুটি নিয়ে এলেও আমি তার সামনে দাঁড়িয়ে দম্ভ-ভরে বলতে পারি, এই নারী আমার সেবায় তার প্রাণ পণ করেছিল···এ নারী যে-ই হোক, সমাজের চোখে সে যত লাঞ্ছনার যোগ্যই হোক—আমার কাছে দেবী! যদি এই নারীর আপত্তি না থাকে তো একে আমি বিবাহ করবো—আর আমার ক্ষুদ্র জীবনে একেই সঙ্গিনী করে সহধর্ম্মিণী করে আমার যা ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যটুকু, সযত্নে তা পালন করবো।—সমাজ শত ধিক্কার দিলেও এই আমার পণ!

পাপিয়া অবিচল চিত্তে অমলের কথাগুলি শুনিল।—তবু ভয় কি ঘোচে! এ যে কত বড় ছলনার অন্তরালে দাঁড়াইয়া সে এ সেবা করিয়াছে···সে ছলনার কি শাস্তি নাই?

তবু রাত্রি নিবিড় হইয়া আসিল। পাপিয়াকে জোর করিয়া কে সাজাইয়া অমলের কাছে পাঠাইয়া দিল। এই একটি রাত্রির জন্য তার জীবন আলোয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠুক, দেহ-মন এই একমাত্র পুরুষের সেবা করিয়া, তাকে তৃপ্তি দিয়া সার্থক হউক—নৈরাশ্যের অকূল সমুদ্র—কাল তো সে সমুদ্রে ভাসিতেই তাকে হইবে! তবু কালিকার সে দুর্ভাবনায় আজিকার এ আগত পুলককে ঠেলিয়া নাই রাখিলাম!

আপনাকে অসঙ্কোচে সে অমলের হাতে সঁপিয়া দিল—নাও বঁধু, আমায় নাও—আমার জীবনের আজিকার এ শেষ পূজা তুমি গ্রহণ করো, গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হও, প্রসন্ন হও···! কাল অন্ধকার আসিবে বলিয়া আজ এ আলোর দীপ্তিকে তো অন্ধ হইয়া ঠেলিয়া রাখা চলে না!

ক্রমে রাত্রির অন্ধকার ঠেলিয়া আলোর ছটা ফুটাইয়া পাখীর গানে দশ দিক ভরাইয়া প্রভাত আসিয়া দেখা দিল। পাপিয়া কম্পিত বক্ষে গিয়া গঙ্গায় স্নান করিয়া আসিল। তার পর অমলের মুখ-হাত ধোয়াইয়া তার জন্য জলখাবার আনিয়া দিল।

অমল কহিল,—আর এ কতটুকু সময়···! তার পর—চপলা, আজ আমার পুনর্জন্ম! সব দৈন্য ঘুচিয়ে আজ আমায় রাজাসনে বসিয়ে দেবে তুমি!

পাপিয়া দৃঢ় অটলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, কোন কথা কহিল না। কথা কহিবার তার শক্তিও ছিল না। পাষাণ-মূর্ত্তির মত সে নিশ্চল! শুধু দম-খাওয়া পুতুলের মত নিত্যকার কাজ করিতেছে! মনের ভিতর তার কোন অনুভূতি নাই—চিন্তার প্রচণ্ড আঘাতে মন তার সত্যই পাষাণ হইয়া গিয়াছে!

বেলা আটটা। ঐ ডাক্তারের গাড়ী! পাপিয়ার মনে হইল, মৃত্যুর আহ্বান আপনা হইতে ঘনাইয়া আসিতেছে তবু তার কর্ত্তব্য—বড় কঠিন, তবু এ বড় কর্ত্তব্য!··· নিজের হাতে নিজের মৃত্যুবাণ সে আগাইয়া দিয়াছে!

অনুশোচনায় সে অস্থির হইয়া উঠিল। বেশ ছিল সে এই অন্ধকে লইয়া, এই ঘন ছায়ার অন্তরালে—সে যে সকল-সুখে সুখী ছিল! নিজের প্রাণে তৃপ্তির কোন সীমা ছিল না!···তবু—না, মানগোবিন্দ তাকে শিখাইয়াছে, যাকে ভালোবাসো, তার তৃপ্তি আগে

খোঁজো, নিজের সুখ বলি দিয়াও তাকেই সুখী করো!··· বেশ! সেই ভালোবাসাই তার লক্ষ্য হউক! বেদনা···সে তো পাইতেই হইবে! এ যে কত বড় পাপের শাস্তি! সে-পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি নাই?

ডাক্তার আসিয়া বলিলেন—এবার চোখ খুলবো।

পাপিয়া অবিচল মূর্ত্তিতে ডাক্তারের কাজে সাহায্য করিল—তার পর ডাক্তার চোখের ব্যাণ্ডেজ খুলিতে লাগিলেন। পাপিয়ার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, পায়ের নীচে পৃথিবী ভূমিকম্পের প্রচণ্ড দোলে দুলিয়া উঠিল। লিতে টলিতে সে-ঘর হইতে আসিয়া পাশের ঘরে ছিন্নের মত মেঝেয় সে লুটাইয়া পড়িল। বুকের মধ্যটা মন দুলিতেছিল, এমনি তার প্রচণ্ড শব্দ, ধ্বক্-ধ্বক্···যে পাপিয়া আর-সব ভুলিয়া গেল। সেই শব্দটাই তার প্রাণের কাছে ভীষণ হুঙ্কারে গর্জ্জন করিতে লাগিল। এ শব্দটুকু ছাড়া দুনিয়ায় যেন আর কিছু নাই,···রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, কিছু না!

ঐ পাশের ঘরে কার হাসির উচ্ছ্বাস না? না, ও বাতাসের গর্জ্জন!—ঐ না বাহিরে পাখী ডাকিতেছে? যে ঐ···না, গঙ্গার বুকে ও নৌকার দাঁড় পড়িতেছে! :, ভগবান, ভগবান, এ কি মুহূর্ত্ত!···

..শেষে সত্যই সেই চরম-ক্ষণ আসিল।—অমল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—আলো, আলো ·চপলা, কোথায় তুমি? এসো, আমার কাছে এসো, তোমায় আমি দেখি!

ডাক্তার বাহিরে আসিলেন। তাঁর পয়সা-কড়ি আগের দিন তাঁকে পাঠানো হইয়াছিল। এত দূরে আসিয়াছেন—তিনি আর দাঁড়াইলেন না। কি কয়টা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। ঐ তাঁর মোটরের হর্ণ ·গাড়ী চলিয়া গেল।

পাপিয়ার মনে হইল, গাড়ীটা যেন তার বুকের উপর দিয়া তার বুকের হাড়-পাঁজরা কখানাকে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া দিয়া গেল! তার যেন সব শেষ হইয়া গিয়াছে! মৃত্যু, মৃত্যুর হিম-শীতল স্পর্শ তাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে! ই যে, হাত-পা অবশ! নড়ে না—কে যেন পেরেক আঁটিয়া তাকে এই মেঝের সঙ্গে সাঁটিয়া দিয়া গিয়াছে!

—চপলা—চপলা···! অমলের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর···! রে দুর্ভাগিনী!

অমল বাহিরে আসিল, ডাকিল,—কোথায় তুমি! কোথায় গেলে?

অমল সেই ঘরে আসিয়া পাপিয়ার পাশে দাঁড়াইল। ছিন্নের মত লুণ্ঠিত পাপিয়াকে ধরিয়া তুলিয়া ডাকিল, —চপলা—

পাপিয়া অমলের পানে চাহিল। কি সে মূর্ত্তি! অমল শিহরিয়া উঠিল, কহিল,—তুমি···

পাপিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া আকুল চোখে অমলের পানে চাহিল।

অমল চলিয়া গেল, ঘরগুলা খুঁজিল। কোথায় গেল চপল···?

ক্রোধে ক্ষেপিয়া তখনি সে আবার ফিরিয়া আসিয়া উত্তেজিত স্বরে কহিল—কোথায় সে? চপলা? তাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেচো, বলো···

পাপিয়া কোন কথা কহিল না। নির্জ্জীবের মত উদাস-নেত্রে অমলের পানে চাহিয়া রহিল।

অমল কহিল,—তুমিই তাকে তাড়িয়ে দিয়েচো··· শয়তানী—

পাপিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া অমলের পায়ে হাত দিল, কহিল,—আমায় মাপ করো।

অমল গর্জ্জন করিল,—তাকে কোথায় তাড়ালে, বলো, বলো এখনি···

পাপিয়া কাতর কণ্ঠে কহিল,—তাকে তাড়াইনি!

অমল কহিল—তবে সে কোথায় গেল?

—কে?

—চপলা।

পাপিয়া সজোরে একটা নিশ্বাস ফেলিল; কহিল,—চপলা এখানে ছিল না—কোন দিন সে আসেও নি এখানে!

—আসেনি! অমল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল।···তাও কি সম্ভব!···তার পর কহিল,—মিথ্যা কথা। এই সেবা, এ যত্ন,—আমার অন্ধতায় তার ঐ দরদ—তার পর আমায় সারিয়ে তোলবার জন্য এই চেষ্টা, এই অজস্র অর্থ-ব্যয়···

পাপিয়ার মন অভিমানে ফুলিয়া উঠিল। সে আর মনের আবেগ চাপিয়া রাখিতে পারিল না, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল,—সে আসেনি গো, কোনো দিনই সে আসেনি···

—তবে?

—আমি পোড়ারমুখীই তার ছদ্মনাম নিয়ে, অন্ধ তুমি, তোমার সঙ্গে ছলনা করেচি···বরাবর, এত দিন ধরে! ···সে তোমার জন্য থিয়েটারের টিকিটও পাঠায়নি!··· তারপর তোমায় একটিবার দেখবে বলে সে-রাত্রে মোটর গাড়ীতে তাকে অনেক সেধেচি, সে ফিরেও তাকায়নি! আমিই তোমার তখনকার সেই ব্যাকুল ব্যথিত দৃষ্টি দেখে তার মর্ম্ম বুঝেছিলুম।···কিন্তু···পাপিয়া হাঁফাইতে লাগিল।

অমল কহিল,—ছলনা! ছদ্মনাম! তাহলে চপলা আমার সেবা করেনি? ··তুমি···

—সে আমি, সে আমিই গো!···সেদিন পিছনে হৈ-হৈ শব্দ উঠলো—আমি গাড়ী দাঁড় করিয়ে চাকরকে পাঠালুম। সে যে খপর নিয়ে এলো, আমি স্থির থাকতে পারলুম না! তার পরে যা হলো, সব তুমি জানো। অন্ধ তুমি, কে তোমায় দেখবে, তাই আমি এসেছিলুম। কিন্তু

মামার পরিচয় পেলে পাছে আমার সেবা না নাও, তাই, শুধু তাই গো, তার নামে নিজের পরিচয় দিয়েছিলুম···

অমল কহিল,—কিন্তু এর কারণ জানতে পারি?

পাপিয়া কহিল,—অন্ধ, অসহায় তুমি,···কে তোমায় দখবে?···তাই! তাই শুধু···

অমল কহিল,—তাই···?

পাপিয়া কহিল,—হাঁ।···তার বেশী···সে যে দুরাশা ···তার লোভও হয়েছিল, কিন্তু সে অনেক পরে। প্রথমে সে দুরাশার কথা মনেও ছিল না। তোমার আদরে আর প্রশ্রয়ে ক্রমে তা দেখা দেছে। আজ তুমি সেরে উঠেচো —আজ আর আমার সাহায্য দরকার হবে না। আমি চলেই যাবো। হাসপাতালে থাকতে যদি, কি বাড়ীতেই থাকতে যদি তো একটা দাসী কি চাকরের সাহায্যও তো দরকার হতো···ভেবো, আমি সেই দাসী কি চাকরেরই কাজ করেচি। তুমি যে আজ দৃষ্টি ফিরে পেয়েচো, তাই আমার চূড়ান্ত পুরস্কার।—এর বেশী তোমার কাছে প্রত্যাশা করিনি কিছু, সে কামনার দুরাশাও আমার নেই।···ছলনা করে যে অপরাধ করেচি, তার জন্য মাপ করো। ছলনাময়ী গণিকা আমি, ছলনাই যে আমার ব্যবসা···

অমল স্থির হইয়া সব কথা শুনিল; তারপর ধীরে ধীরে গমনোদ্যত হইল। পাপিয়া কহিল,—কোথায় যাচ্ছ?

অমল কহিল,—চপলার সন্ধানে। তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারলুম না।

অমল চলিয়া গেল।···আর পাপিয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া তাহা দেখিল।

২০

অমল পাগলের মত একেবারে পথে আসিয়া দাঁড়াইল। চলিয়াছে তো চলিয়াছেই! বুকের মধ্যে কি সে চঞ্চলতা! ···বহুদূর আসিয়া সে ভাবিল, তাইতো, এ সে কোথায় চলিয়াছে! চপলা···চপলার বাড়ী তো সে জানে না! সে কোথায় থাকে···কাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াই বা তার ঠিকানা জানিবে!

কিন্তু যে আসিয়া তার সেবায় অমন করিয়া প্রাণ-মন লুটাইয়া দেয়, আজ হঠাৎ তার অন্ধতা ঘুচিলে সে এমন অতর্কিতেই বা চলিয়া যায় কেন? কারণ···?

ঠিক, এ পাপিয়ার কাজ! এই দুর্বৃত্তা নারী আসিয়া নিজের স্বার্থের জন্য নিশ্চয় তাকে এমন কিছু বলিয়াছে বা এমন কোন ভয় দেখাইয়াছে, যার জন্য সে বেচারী এখান হইতে সরিয়া পড়িবার পথ পায় নাই! সে তো জানে, পাপিয়া কি! অমলকে গ্রাস করিবার জন্য কি তার ব্যাকুলতা! প্রলোভনেরও সে কোনো কসুর করে নাই! কি জালই পাতিয়াছিল! সেই আংটী ফেলিয়া যাওয়া—সেই তার ঘরে সেই কাতর মিনতি···!

পাগল! চপলার পাশে পাপিয়া! অমল কি নারীর লাবণ্য, না, তার ভ্রূবিলাস, বা যৌবনশ্রীর জন্যই মুগ্ধ হইয়াছিল? সে গুণের পক্ষপাতী। চপলার মধ্যে সে যা দেখিয়াছে, ষ্টেজে তার অসাধারণ কৃতিত্ব···সেজন্য শ্রদ্ধা তো ছিলই—তার উপর তার এই অসহায় অন্ধতায় নিজেকে বলি দিয়া এই প্রাণপণ সেবা—বিশ্বের ইতিহাসে যে ইহার তুলনা নাই!

অমল তবু চলিয়াছে, চলার তার আর বিরাম নাই! হঠাৎ তার মনে হইল, ঠিক! সে তো পাপিয়ার বাড়ী জানে! সেইখানে গিয়া কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে চপলার ঠিকানা মিলিতে পারে হয়তো!···ঠিক!

অমল গিয়া পাপিয়ার বাড়ীতে উঠিল। সামনেই একটা ভৃত্য বসিয়াছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করিল,—চপলা বিবির বাড়ী জানো?

—জানি। বলিয়া সে একদিকে সঙ্কেত করিল। অমল একটু থামিল। একটা ফিকির তার মাথায় আসিল। সে বলিল,—আমায় পাপিয়া বিবি পাঠিয়েছে একটা দর-কারে,—তুমি চপলা বিবির বাড়ীটা দেখিয়ে দেবে, চলো।

পাপিয়ার কথা শুনিয়া ভৃত্য উঠিল, এবং তার সঙ্গে গিয়া বাড়ী দেখাইয়া দিল।

এই বাড়ী···তার কামনার মন্দির! আঃ! মন তার উত্তেজনায় ভরিয়া উঠিল। চপলা, চপলা, আমি আসিয়াছি, আমি অকৃতজ্ঞ নই! তোমার সেবা, তোমার মহত্ত্বের মূল্য আমি বুঝি—তাই তোমাকে আজ প্রাণের কৃতজ্ঞতা জানাইতে আসিয়াছি!

কম্পিত বুকে সিঁড়ি বহিয়া সে উপরে উঠিল। সামনের একটা ঘরে তখন খুব কলরব চলিয়াছে! উচ্ছ্বসিত আনন্দ বুকে লইয়া প্রদীপ্ত সস্মিত-চোখে অমল সে ঘরে ঢুকিল, ঢুকিয়া ডাকিল—চপলা···

এ কি···একরাশ লোক মদের নেশায় আচ্ছন্ন, তাদের মাঝখানে আলু-থালু বেশে ঐ নারী···চোখ জবা ফুলের মত রাঙা, মাথার কেশরাশি বিস্রস্ত, হাতে কাঁচের গ্লাসে তরল পানীয়,···অমল শিহরিয়া থামিয়া পড়িল,··· এই চপলা···! এই তার ষ্টেজের সেই সীতা···!

চপলা কহিল—কে তুমি চাঁদ?···মাঝ-গগনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লে যে!···চলে এসো···

এ স্বপ্ন, স্বপ্ন, ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন!···না। দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া নিজেকে সে নাড়া দিল! না,···এই তো অমল জাগিয়া—শুধু পায়ের নীচে মেঝেটা ভয়ঙ্কর দুলিতেছে!

সঙ্গীর দল কহিল—কে তুমি বাবা, হতভম্ব হয়ে কি চাও?

তাদের পানে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া চপলার পানে চাহিয়া অমল কহিল,—আমায় চিনতে পারচো না চপলা?

গ্লাসের রঙীন্ তরল পদার্থটুকু গলায় ঢালিয়া আর

ঘূর্ণিত চোখে চপলা কহিল,—না।···কে বট তুমি? বলিয়াই উঠিয়া সুরের ভঙ্গীতে সে কহিল,—

তুমি কে বট হে!
আমারি দুয়ারে কোন্ ছলে এলে
কোন্ শঠ নট হে!

এ কি এ! অমলের চোখের সামনে হইতে বিশ্বের যা-কিছু আলো কোথায় উবিয়া গেল। সমস্ত পৃথিবীর গায়ে কে যেন চক্ষের নিমেষে গাঢ় কালো কালি লেপিয়া দিল!

চপলা টলিতে টলিতে অমলের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল। অমল তীব্র দৃষ্টিতে তাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। খানিক আগাইয়া আসিয়া চপলা কহিল,—না বাবা, প্রণাম করচি, চিনতে পারলুম না···

অমল কহিল,—মনে পড়চে না···? অন্ধ অসহায় আমাকে কাশীপুরের জীর্ণ ঘরে কি সেবায় তুমি আরাম করে তুলেচো!

একটা কুৎসিত কথা বলিয়া চপলা অমলের গালে মৃদু চড় মারিল, পরে কহিল,—

তুমি যাও হে চলে,
ঠাঁই পাবে না এ-মুলুকে,
কোনো ছলে গো, কোনো ছলে!

বলিয়াই এমন অট্টহাসি হাসিল,···সে যেন বাজের হুঙ্কার! তার পর কহিল,—তোমাকে কখনো দেখচি বলে তো মনে পড়ে না!

সঙ্গীর দল সে হাস্যধ্বনিতে ফিরিয়া চাহিল, কহিল,—ব্যাপার কি?

চপলা তাদের পানে ফিরিয়া চাহিয়া কহিল,—ইনি এসেচেন! এঁর কথা শোনো···বলেন, অন্ধ অসহায়, সেবায় সুখী করেচো···

একজন বলিল—অন্ধ অসহায়, তা এখানে কেন, বাবা? অনাথ-আশ্রমে যাও!

এ-কথার পর দম-খাওয়া চেতনাহীন পুতুলের মত টলিতে টলিতে অমল নামিয়া আসিল। আঁধার, আঁধার, চারিদিকে ঘনীভূত আঁধার!···নীচে নামিয়া কোনমতে বাহিরে পথে আসিয়া সে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। আঃ, সে যেন এতক্ষণ একটা জ্বলন্ত গৃহে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, সে আগুনের জ্বালা এখনো তার সর্ব্বাঙ্গে লাগিয়া!

দিক্‌ভ্রান্তের মত সে চলিয়াছিল···হঠাৎ কে ডাকিল,—বাবু—

বাধা পাইয়া অমল থমকিয়া দাঁড়াইল।···কে?

সে কহিল,—আমি আপনাকে হাসপাতাল থেকে কাশীপুরের বাড়ীতে নিয়ে গেছলুম।

অমল সবিস্ময়ে কহিল,—তুমি···?

লোকটা কহিল,—আমি পাপিয়া বিবির চাকর।

পাপিয়া বিবি! অমল ব্যাকুল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তা[র] পানে চাহিল।

লোকটা কহিল,—বিবির কথায় ডাক্তারবাবুকে নি[য়ে] গেছলুম আপনার চোখ সারাতে।

অমল কহিল,—তোমার বিবি কোথায়?

সে কহিল—যতদিন থেকে আপনার অসুখ, তি[নি] তো আপনার ওখানেই। আমিও তাই ছিলুম। [এ]খানে চৌকি দেবে কে—তাই বিবি বললেন, খ[ুব] দরকার পড়লে তুই সেখানে যাস্, নাহলে এখানে থাক্। তাই আছি।···তা আপনি এধারে এসেছিলে[ন] কোথায়? চোখ বেশ সেরেচে তো? আবার কাশীপুরে ফিরচেন?

অমলের মাথা ঘুরিয়া গেল। সে সেবা, সে যত্ন তবে পাপিয়ারই? আর তাকে সে এমন নিষ্ঠুর নির্ম্মমভা[বে] আঘাত করিয়াছে! ওরে অকৃতজ্ঞ, ওরে বেইমান!

কিন্তু পাপিয়া চপলার নাম লইল কেন?···

ঠিক! সে তো জানে, চপলার প্রতি কি অন্ধ অসী[ম] অমলের অনুরাগ! ছি, ছি! চপলা তো ঐ! পাপিয়[া] সত্যই বলিয়াছে···

অমল কহিল—তোমার বিবিও কি এসেচেন?

সে কহিল—না। তিনি তো কাশীপুরে। আপনি···

অমলের মনে আগুন জ্বলিল। সে তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সি ডাকিয়া তাহাতে চড়িয়া কাশীপুরের দিকে ছুটিল। গাড়ীতে উঠিবার সময় লোকটিকে বলিল,—যদি বিবি এর মধ্যে ফেরেন, তাঁকে থাকতে বলো, আমি কাশীপুর হয়ে এখানেই আসবো। তাঁর কাছে দরকার আছে—ভারী দরকার।

লোকটা অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ট্যাক্সি অমলকে লইয়া ছুটিল।

কাশীপুর!···ট্যাক্সি হইতে নামিয়া অমল উর্দ্ধশ্বাসে নিজের জীর্ণ গৃহের পানে ছুটিল। পাপিয়া!···পাগলের মত সে ডাকিল,—পাপিয়া···

ঘরে···সে নাই, নাই!···কোথায় গেল তবে পাপিয়া?···আশঙ্কায় অমলের বুক যেন দশ হাত বসিয়া গেল। সে ক্ষিপ্তের মত বাড়ীর পিছনে নদীর ধারে ছুটিল।···ঐ না···ঐ না কে···? পাপিয়া!—সে চমকিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া ডাকিল,—পাপিয়া···তার পর চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।

—ঐ না,···ঐ···ঐ চাতালে উপুড় হইয়া পড়িয়া···

অমল ছুটিয়া চাতালের ধারে গেল। ঠিক, পাপিয়াই তো···! কিন্তু এ কি মূর্ত্তি! মাথায় রেশমের মত অমন কেশের রাশি···কাটিয়া নির্ম্মূল করিয়া ফেলিয়াছে,—মুখে চোখে কালির রেখা···!

অমল ডাকিল—পাপিয়া…

পাপিয়া ফিরিয়া চাহিল। অমল অমনি একেবারে ার পাশে বসিয়া তার হাত দুইখানা টানিয়া নিজের াতের মধ্যে লইল, কহিল—এ কি করেচো পাপিয়া…

পাপিয়ার চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। সে কি াগিয়া?…হাঁ, জাগিয়াই তো! আর তার সামনে…

অমল কহিল—আমায় মাপ করো। আমি শুধু চোখ ইয়েই অন্ধ ছিলুম না, আমার মনও অন্ধ ছিল। আমার কৃতজ্ঞতার জন্য আমায় মাপ করো, পাপিয়া…

পাপিয়া স্থির দৃষ্টিতে অমলের পানে চাহিয়াই হিল। অমল তার হাত দুইটা চাপিয়া উচ্ছ্বসিত ণ্ঠে কহিল,—এই সেবা, এই যত্ন…কি উপেক্ষারই দলেই তুমি ধরে দেছ!…অন্ধ কাঙালের কাছে কোন-কিছুর প্রত্যাশা না করে, রাজার ঐশ্বর্য্য ঠেলে, ়েই দারিদ্র্য, এই হীনতা বরণ করা…এ যে দেবীও ারে না, পাপিয়া!…আর আমি তোমায় কথার বিষে র্জ্জরিত করেচি, লাঞ্ছনার আঘাতে চূর্ণ করেচি!… লো, বলো, আমায় মাপ করবে? বলো…তার ার মৃদু হাসিয়া কহিল,—জানি, তুমি মাপ করবে। ুমি তো আমায় চেনো। আমি যে অন্ধ!

পাপিয়া কহিল,—এ কথা কেন বলচো…?

অমল কহিল,—কেন বলচি! তুমি ঠিক বলেচো, পলা কত-বড় শয়তানী…

—যাক সে কথা! পাপিয়া কহিল,—এখন আমায় া'হলে হাসি-মুখেই বিদায় দিলে তো…! মিষ্ট কথায়…

—বিদায়!—আবেগে পাপিয়াকে বুকের মধ্যে টানিয়া মল কহিল—তোমায় বিদায় দেবো!—তা হয় না াপিয়া,—আমার অন্ধতার সুযোগ পেয়ে যে-সেবার পর্শে ক্ষণে ক্ষণে আমায় তুমি প্রলুব্ধ বিহ্বল করেচো, াজ দৃষ্টি ফিরে পেয়ে আমি যে তা সব শোধ দেবো। তামার কাছে ঋণী আমি থাকবো না…

প্রশ্ন-ভরা দৃষ্টিতে পাপিয়া অমলের পানে চাহিল।

অমল কহিল,—বুঝচো না?…অর্থাৎ যে-অন্ধকে দৃষ্টি দিয়ে তাকে নতুন মানুষ করে তুলেচো, তাকে দেখার সব ভার এখন তোমারই যে! যত্নে আদরে তোমার উপর আমাকে এমন নির্ভর করতে শিখিয়েচো যে, আশ্রিতা লতার মত তোমার ঐ সেবা-যত্ন ধরেই আমি আজ দাঁড়িয়ে আছি। এ আশ্রয় সরিয়ে নিলে আমি সেই মুহূর্ত্তে পড়ে যাবো!…হেঁয়ালি যাক্, পাপিয়া—এসো, এই নব জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আজ তোমার প্রেমের অভিষেক গ্রহণ করি। আজ থেকে আমরা দুয়ে মিলে এক…

বাধা দিয়া পাপিয়া বলিল—কিন্তু আমি যে কলঙ্কিনী, গণিকা, সমাজের আবর্জ্জনা…

কহিল—সমাজ তোমায় জানে না! যে তোমার প্রাণের পরিচয় পায়নি, সে তোমায় আবর্জ্জনা ভাবতে পারে। কিন্তু যে তোমার এ-প্রাণের পরিচয় পেয়ে সে জানে, তুমি কোহিনূর—সমাজের মাথায় মুকুট-ম হয়ে বসতে পারো…! অতীত কলঙ্ক? সে তো বাই ময়লামাত্র! এ উদারতা, এ সেবাতেও যদি তা ধুয়ে ম না গিয়ে থাকে, তাহলে বুঝবো, পৃথিবীতে সেবায় কে পুণ্য নেই।…বড় বড় মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত আছে, আ তোমার কবেকার-খেয়ালে-করা দুটো তুচ্ছ খেলা,…ও মার্জ্জনা নেই?…কলঙ্ক, পাপ, এ-সব বাইরের জিনিস তোমার এ মহত্ত্বে, চরিত্রের এ মাধুর্য্যে সে-সব বাই ময়লা মুছে সাফ হয়ে তোমার ভিতরকার যে-খাঁটি মানু টিকে আজ সামনে দেখচি…অমল নীরব হইল, দৃষ্টিতে পাপিয়ার পানে চাহিল; পাপিয়া গৌরব লজ্জায় শির নত করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অমল সাদ তার চিবুক ধরিয়া তুলিল, তুলিয়া তাকে বুকের কা টানিয়া বলিল,—তা ঐ গঙ্গার জলের মতই শুভ্র, নির্ম …অমনি পুণ্যে উচ্ছ্বসিত!…

সরমে বাঁকিয়া পাপিয়া কহিল,—ও কি বলচো তুমি —আমি…আমার মত দুর্ভাগিনী যে পৃথিবীতে নেই তাই কেবল ভাবি, এই নারীত্বকে আমি পণ্য ক বাজারে ধরেছিলুম…

অমল কহিল,—সে গ্লানি ধুয়ে সাফ হয়ে গেছে তুমি তোমার মন দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু আমি দেখ পাচ্ছি, নবজীবনের তেজে, পুণ্যে সে মন সমুজ্জ্বল; চিত্তের মতই তা নির্ম্মল!…এখন আমায় ক্ষমা কর যদি তো একটা অনুমতি দাও—

পাপিয়া মুখ তুলিয়া কহিল,—কি?

অমল কহিল,—তোমায় পত্নীত্বে বরণ করে আমা এই অকৃতজ্ঞতার মহা-কলঙ্ক থেকে মুক্তি পেতে দাও…

পাপিয়া কহিল—ছি!

অমল কহিল,—সমাজের ভ্রূকুটির ভয় করচো! বলে তো, সমাজ তোমার কতটুকু জানে! কিন্তু আমি জা তুমি এ-সমাজের মুকুটমণি হবার যোগ্য! তোমায় মাথ নিলে হিংসায় জর্জ্জরিত এই জীর্ণ গলিত পচা সম ধন্য কৃতার্থ হয়ে যাবে!

অমল পাপিয়াকে আবার বুকের মধ্যে টানিয়া ল তার পর তার মাথায় হাত রাখিয়া আবেগ-ভরা মৃদু ডাকিল—পাপিয়া…

পাপিয়ার কাণে সে স্বর স্বর্গের কোন্ অজানা ছন্দে সুরে যে বাজিয়া উঠিল…আনন্দের উত্তেজনায় বুক কাঁপিতেছিল!

মাঝ-গঙ্গায় একখানা পান্সী ভাসিয়া চলিয়াছি আর সেই পান্সীতে বসিয়া কে একজন সৌখীন ছো গাহিতেছে,—

জাগো নবীন গৌরবে
নব-বকুল-সৌরভে
মৃদু মলয়-বিজনে
জাগো নিভৃত নির্জ্জনে!……

অমল মুগ্ধ চিত্তে শুনিল, শুনিয়া আবেগ-কম্পিত রে কহিল,—ঐ শোনো, ও গান আমাদের এই নব-জীবনকেই অভিনন্দিত করচে!…এসো পাপিয়া, আমরাও আজ ঐ গানের সুরে-ভাষায় আমাদের জীবনকে মলিত করি!

পাপিয়া সবলে আপনাকে অমলের বাহুপাশ হইতে ক্ত করিয়া কহিল,—তা হয় না।…আমার মাপ করো। আজ সকালেও ঐ জীবনের প্রচণ্ড লোভ আমায় প্রমত্ত রে তুলেছিল। তার পর তুমি চলে গেলে!…উপেক্ষা নে চলে গেলে!…প্রথমে খুবই বাজলো…তার অনেক ভেবে আমার পথের সন্ধান আমি পেয়েচি। ই-পথই আমার পথ—

অধীর উচ্ছ্বাসে অমল কহিল,—কি সে পথ, পিয়া?…

গঙ্গার তরঙ্গোচ্ছল বারি-রাশির পানে চাহিয়া পাপিয়া ল,—জীবনে অনেককে উপেক্ষায় দগ্ধ জীর্ণ করেচি—ক পাপ করেচি—তার প্রায়শ্চিত্ত করা চাই তো! সে এত সহজে দূর হবার নয়ও।…লোকের সেবায় এ জীবনকে উৎসর্গ করবো, ভেবেচি। পৃথিবীতে গীর, আর্ত্তের সেবার জন্য সেবিকার প্রয়োজন আছে। র কেউ নেই, যারা অসহায়, বেচারা, তাদের সেবাই ার ব্রত হবে। যে-রূপ, যে-দেহ নিয়ে মানুষকে সায় প্রলুব্ধ করে এসেচি এত-কাল, সেই দেহ রোগীর য় ঢেলে দেবো! এ-জন্মে এই প্রায়শ্চিত্তই ঠিক। যে-র গর্ব্বে নারীত্বকে উপেক্ষা করেচি, সে-রূপের চিহ্নও বো না দেহে!…মানুষের মন বড় দুর্ব্বল, পৃথিবীতে লাভনও প্রচুর… আমি দেখতে চাই, সে-প্রলোভনকে করতে পারি কি না।…আমায় বিদায় দাও, আমার খেদ করো না—আমায় প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও…

আর্ত্ত স্বরে অমল ডাকিল,—পাপিয়া…

পাপিয়া কহিল,—অমন করে আমায় ডেকো না। ডাকলে আমি বিহ্বল হয়ে পড়ি…ও-ডাকে আমার বার হওয়া দায় হবে।…অথচ এ কালি মেখে ও থাকতে পারবো না।…

পাপিয়া অমলের পানে চাহিল। অমলের দুই চোখে তখন ছাপাইয়া আসিয়াছে।

অমল কহিল,—আমায় মাপ করবে না…? চিরদিন অকৃতজ্ঞতার পাপ বুকে বয়ে বেড়াবো আমি…? এত ঋণ…

পাপিয়া হাসিল, হাসিয়া কহিল,—ঋণ তোমার নয়, ঋণ আমার। আমায় তুমি যা দিয়েচো, যে-দৃষ্টি, যে-জ্ঞান…তোমার কাছে আমি যা পেয়েচি, তাতে আমার সারা জীবন পাওয়ার সার্থকতায় ভরে গেছে! আর আমার কামনা করবার কিছু নেই. এ-জন্মে! মাঝে-মাঝে শুধু মনে করো, অভাগিনী পিয়ারীকে…তার সেই ঝড়ের মত আসা,…ঝড়ের মত চলে যাওয়া…আর মনের মধ্যে কি ঝড়ই সে বয়ে বেড়াতো!…সে ঝড়ের আজ বিরাম হয়েচে!

পাপিয়া উঠিল, উঠিয়া অমলের পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া প্রণাম করিল; তার পর তার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল, দিয়া কহিল,—দীর্ঘজীবনে যদি এমনি চাওয়াই চাও আমাকে তো আমি জানি, মিলবোই দু'জনে! তবে ইহ-জন্মের জন্য চেয়ো না,…এ দেহ যত তুচ্ছ হোক, তবু তার কালি মনেও ছোপ্ লাগিয়েচে। এ-জন্মে প্রায়শ্চিত্ত করে শুদ্ধ হই, পর-জন্মে নিশ্চয় মিলবো। তখন এই দেহে-মনে কোথাও কালির রেখাও থাকবে না! পাপিয়া থামিল, পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—আগে এ-সব মানতুম না…পাপ, পুণ্য ইহ-জন্ম, পর-জন্ম…এ-সব কথা মনের কোণেও উদয় হয়নি।…আজ পর-জন্ম মানি! বহু দুঃখেই মানুষ মানুষ হয়। যে দুঃখের স্বাদ পায়নি, তার মনুষ্যত্বও ফোটেনি…

অমল কোন কথা কহিল না। পাপিয়া উঠিল, উঠিয়া কহিল,—তোমার চোখের ঐ কাতর দৃষ্টি, তোমার এই মৌন সজল বিদায়-দান আমার পথের সম্বল…এই কালি-মাখা বুকের মধ্যে সোনার রেখার মত জ্বল্‌জ্বল্ করবে! এ যে কত বড় সান্ত্বনা!…এখন গঙ্গায় স্নান করি, স্নান করে…সামনে যখন তুমি রয়েচো…তোমার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে আমার পথে বেরিয়ে পড়বো। একটু থাকো…যাবার বেলায় আশীর্ব্বাদ করো, ব্রত যেন পালন করতে পারি!

পাপিয়া ধীরে ধীরে জলে গিয়া নামিল। অমল পাষাণ-মূর্ত্তির মত তার পানে চাহিয়া তেমনি মৌন বসিয়া রহিল। দূরে কোথা হইতে শুধু একটা ষ্টীমারের বাঁশী গুরুগম্ভীর রবে মাঝে মাঝে বাজিয়া উঠিতেছে! আর সেই পান্সীখানা…ঐ দেখা যায়! জলের বুক বহিয়া তার আরোহীর কণ্ঠে-ঝরা গানের কলি ভাসিয়া আসিতেছিল,

…জাগো নবীন গৌরবে,
নব-বকুল-সৌরভে,
মৃদু মলয়-বীজনে,
জাগো নিভৃত নির্জ্জনে……

কালোর আলো

[উপন্যাস]

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

উৎসর্গ

স্নেহাস্পদ

শ্রীমান্ ভবদেব মুখোপাধ্যায়

ভ্রাতৃবরেষু

সৌরীন্দ্র

৮২।৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা,
পৌষ-সংক্রান্তি, ১৩৩০

কালোর আলো

প্রথম খণ্ড

১

ও-পাড়ার দত্ত-পাড়ার বিবাহ লইয়া পাড়ার পুকুর-ঘাটে মস্ত মজলিশ বসিয়াছিল।

দত্তরা দুই ভাই,—শরৎ আর প্রফুল্ল। বাপ গোপাল দত্ত যখন মারা যান, তখন শরতের বয়স সতেরো বৎসর, আর প্রফুল্ল সাত বৎসরের। বাপ গ্রামে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারী করিয়া দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতেন; তাঁর সাধ ছিল, শরৎকে মেডিকেল কলেজে পড়াইয়া ডাক্তার করিয়া তুলিবেন। এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা শিখিয়া যদি সে হোমিওপ্যাথিটারও চর্চ্চা করে, তবে তারে সুবিধা বিলক্ষণ হইবে, তা ছাড়া গ্রামের দরিদ্র রোগী রোগে এ্যালোপ্যাথি ঔষধ কিনিবার পয়সা পাইবে কোথায়! শরৎ গ্রামের স্কুলে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া কলিকাতার কলেজে পড়িতেছিল। বাড়ী হইতেই ডেলি প্যাসেঞ্জারি করিত। বারুইপুর হইতে কলিকাতা, রেলের পথে আর কতটুকু!

বাপ হঠাৎ এখন চক্ষু মুদিলে দত্তদের সংসার অচল হইয়া পড়িল। রোজ-আনা রোজ-খাওয়া নীতিতে বাঙলার একশোর মধ্যে নিরানব্বইটা সংসার চলে,—কাজেই সে-সংসারে কর্ত্তার আকস্মিক মৃত্যু ঘটিলে সংসারটাও সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া পড়ে—তাহাকে খাড়া রাখিবার কাহারো আর সাধ্য থাকে না!

বিধবা মাকে বুঝাইয়া শরৎ বলিল, এ অবস্থায় তার পক্ষে লেখাপড়ার চেষ্টা করিতে যাওয়ার মানে মৃত্যুকে বরণ করা! তার চেয়ে সে একটা চাকরি লইয়া সংসারের ভার যদি মাথায় লয়, তাহা হইলে জোড়া-তালি খাইয়া সংসারটাও একেবারে অচল থাকে না, চলে; এবং প্রফুল্লকে কোনমতে মানুষ করিবারো একটা সম্ভাবনা থাকে!

পড়াশুনায় শরতের ঝোঁক ছিল বিলক্ষণ। সে যে পড়া ছাড়িয়া যা-তা চাকরিতে ঢুকিতে গিয়া আজ কত বড় ত্যাগ স্বীকার করিল, নিজের ভবিষ্যৎকে শুধু এই সংসারের জন্যই ছোট্ট এক-টুকরা ভাইয়ের মুখ চাহিয়া কি-ভাবেই যে পায়ের ঠোক্করে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিল, মা তাহা বুঝিলেন। তাঁর দুই চোখে জল একেবারে উথলিয়া উঠিল। মা চোখ মুছিয়া শরতের পানে ক্ষণেক নির্ব্বাক মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, পরে তাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া তার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন,—তোর এ ত্যাগের দাম যেন ফুলু বোঝে, বাবা! এর বাড়া আর কি বলবো, জানিনে! আমি মা, আশীর্ব্বাদ করি, তোকে যেন কোন অভাবে না পড়তে হয় কখনো!—দীন-দুঃখীর দিনও চলে যায় বাবা, বিধাতার রাজ্যে কিছুই পড়ে থাকে না...

এই গ্রামেরই সাতকড়ি চাটুয্যে শরতের বাপের সঙ্গে ছেলেবেলায় এক ক্লাশে পড়িয়াছিলেন। আজ তিনি হাইকোর্টে ওকালতি করিয়া কলিকাতায় মস্ত বাড়ী ফাঁদিয়া, সেই বাড়ী আর ঐশ্বর্য্যের বহরে অনেকখানি জমকাইয়া বসিয়াছেন, তবু শৈশবের সহপাঠী গোপাল দত্তকে তিনি সম্ভ্রমের চক্ষেই দেখিতেন বরাবর। তার কারণ, গ্রামের আর দশজন দশটা কাজের উমেদারী লইয়া তাঁর দ্বারে আসিয়াছে কতদিন, কিন্তু তেজস্বী গোপাল বন্ধু-প্রীতির টানেই যা এখানে মাঝে মাঝে ঘুরিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁর দীর্ঘ জীবন-কালে কখনো সামান্য একটা-কিছুর অনুরোধ জানাইয়া হাত পাতিতে আসেন নাই। তাঁর ছেলেমেয়েরা কদাচিৎ গ্রামে গিয়া রোগে পড়িলে বন্ধুর মতই তাদের দেখা-শুনায় কোন ত্রুটি কোন দিনই তিনি করেন নাই। তার পর এই প্রফুল্ল যখন হয়, প্রফুল্লর মা তখন মরণাপন্ন রোগে ইহলোকের সহিত সম্পর্ক চুকাইতে বসিয়াছিলেন—বেচারা গোপাল দত্ত পরের কাছে কর্জ্জ করিয়া পত্নীর রোগের পরিচর্য্যার ব্যয় কুলাইয়াছেন, তবু কোনদিন সাতকড়ি চাটুয্যের দ্বারস্থ হন নাই। এর জন্য পরে তিনি অনুযোগ তুলিলে গোপাল দত্ত হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্বই থাক্‌ ভাই। মহাজনী সম্পর্ক পাততে গেলে বন্ধুত্বে চিড় খায়।

এই ছোট্ট কথার মধ্যে কত-বড় জ্ঞানের, কতখানি সূক্ষ্ম বুদ্ধির আর কতখানি তেজের গরিমা ফুটিয়াছিল, সাতকড়ি চাটুয্যে সেইদিনই বুঝিয়াছিলেন। এখন

...কোন দায়ে যে তাঁর হাত উঠিল না, এই জন্ত তাঁর ...একটা কুণ্ঠা সর্ব্বক্ষণ জাগিয়া থাকিত। কিন্তু সাহস করিয়া তিনি কখনো হাত বাড়াইতে পারিতেন না।

গোপাল দত্তর আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া তিনি সেই রাত্রেই মোটর হাঁকাইয়া দেশে আসিলেন ও যখন শুনিলেন, দেনা যেমন তিনি রাখিয়া যান নাই, সঞ্চয়ও তেমনি কিছু নাই, তখন শরৎকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন,—তোমার মাকে বলো, তাঁর পরলোকের কাজ যেমন ভাবে করার সাধ থাকে, তেমনি যেন করেন। তোমার বাবার কিছু টাকা আমার কাছে আছে, তা থেকেই খরচ হবে। বুঝলে বাবা?

শরতের মা কথাটা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। চাটুয্যে মশায়ের কাছে স্বামী টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, আর তিনি সে কথা শোনেন নাই!

সাতকড়ি চাটুয্যে বলিলেন,—এ বেশী দিনের কথা নয়। তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছিল, এখানে একটা ডিস্পেন্সারী খোলবার জন্ত—ভালো ওষুধ-টষুধ এখানেই যাতে লোক কিনতে পারে। আমি বলেছিলুম, আমাদো দেশ তো বারুইপুর—সে ডিস্পেন্সারীতে আমিও কিছু টাকা দেবো। অর্থাৎ দুজনের বখরা-দারীতে সেটা চলবে। তাই তিনি কতকগুলো আসবাব-পত্র, ওষুধ আর বই কেনার জন্ত ও-টাকাটা আমার কাছে রেখে এসেছিলেন। তার পর আমারি গড়ি-মশিতে কিছুই কেনা হয় নি!

এমন করিয়া যিনি টাকা গছাইতে আসেন, তাঁর সঙ্গে জেরা করার শক্তি মেয়েমানুষের নাই। থাকিলেও এ ঠিক জেরা করার সময়ও নয়। শরতের মা অগত্যা থামিয়া গেলেন এবং যথাসময়ে সাতকড়ি চাটুয্যে আসিয়া নগদ পাঁচশো টাকা শরতের মার হাতে গণিয়া দিয়া গেলেন। শরতের মা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়াই টাকাটা হাতে লইলেন। এত টাকা স্বামী জমাইলেন কবে,—এবং তাঁকে এর বিন্দু-বিসর্গ না জানাইয়া বন্ধুর কাছে রাখিতে গেলেনই বা কবে,—ব্যাপারটা তাঁর কাছে হেঁয়ালি হইয়াই রহিল। সেই টাকার কতক ভাঙ্গিয়া স্বামীর শ্রাদ্ধ হইল—আর যা বাকী রহিল, তাহা হইতে সংসার কিছু শুধিয়া লইল; শরতের কলেজের পিছনেও বাকীটা চলিয়া গেল। তার পর সমস্যা দাঁড়াইল, টাকা এখন আসে কোথা হইতে? কাজেই মার কাছে এক দিন চাকরির প্রস্তাব করিয়া শরৎ তাঁর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

চোখের জল মুছিয়া মাকে অনুমতি দিতে হইল—না দিয়া উপায় কি!

শরৎ তখন একদিন কলেজের ফেরৎ সাতকড়ি চাটুয্যের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। প্রকাণ্ড বাড়ী। লোকজন গিস্‌গিস্ করিতেছে। কামানো মাথা গরিবের সাজে এই ছেলেটি গিয়া যখন সেখানে দাঁড়াইল তখন প্রথমটা তাকে কেহ লক্ষ্যও করিল না। বেচারা ফটকের মধ্যে ঢুকিয়া গাড়ী-বারান্দার প্রকাণ্ড থামের পাশেই বই হাতে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক দাঁড়াইয়া থাকার পর মোটর আসিয়া ফটকে ঢুকিল। মোটর হইতে নামিয়া সাতকড়ি বাবু গিয়া প্রথমেই শরতের হাত ধরিয়া প্রশ্ন করিলেন,—কতক্ষণ এসেচো?

শরৎ একটা ঢোক গিলিয়া বলিল,—কলেজের ছুটি হলে।

সাতকড়ি বাবু বলিলেন,—এতক্ষণ এইখানে দাঁড়িয়ে আছ! ভিতরে গিয়ে বসোনি কেন? তার পর একটু থামিয়া বলিলেন,—কেউ বুঝি বসতে বলেনি?

শরৎ অপ্রতিভভাবে বলিল,—আমি তো কাকেও কিছু বলিনি।

—হুঁ! বলিয়া সাতকড়ি বাবু চোখে-মুখে বিরক্তি ঝাঁজ ফুটাইয়া ডাকিলেন,—নিতাই—

ভৃত্য নিতাই তখন গাড়ী হইতে বাবুর ব্যাগ উঠাইতে আসিয়াছিল; বাবুর আহ্বানে সে তাঁর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বাবু সরোষে কহিলেন,—এই বাবু কতক্ষণ এখানে এসেচেন?

নিতাই একটু কাঁচু-মাচু ভাবে বলিল,—কতক্ষণ...

তার কথা শেষ হইল না। সাতকড়ি বাবু ... উঠিলেন,—এঁকে বসতে বলোনি কেন? কিছু বখশিস মিলবে না, ভেবে? পাজী বেয়াদব বেটা, ব্যাগ নিতে এসে দাঁড়িয়েচো!...যাও—তোমার এ কাজ গেল। ... কাল থেকে নবর কাজ করবে; আর নব কাল থেকে খাশে কাজ করবে।

নিতাই শাস্তি পাইয়া কুণ্ঠিতভাবে ব্যাগ হাতে করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। সাতকড়ি বাবু হাঁকিলেন —রাখ্ ব্যাগ গাড়ীতে। নবকে ডাক্—সে ব্যাগ নিয়ে যাবে।—তুই আর আমার কোনো কাজে হাত লাগাবি না। পাজী ব্যাটা, খালি মোটর আর জুড়ির খাতির করতে শিখেচো—দুনিয়ার আর মানুষ নেই,—না?

সাতকড়ি বাবুর কথাগুলায় শরতের মন তাঁর শ্রদ্ধার ভক্তিতে একেবারে লুটাইয়া পড়িল। এত-বড় মন না হইলে মানুষ কি আর অমনি বড় হয়! ... বুকটার মধ্যে এমনি এক পুলকের ঢেউ উছলিত ... উঠিল!

সাতকড়ি বাবু বলিলেন,—এসো আমার সঙ্গে।

বলিয়া শরৎকে লইয়া তিনি দোতলায় গিয়া উঠিলেন, একেবারে নিজের ঘরে। শরৎকে চেয়ারে বসিতে ব...

তিনি সাজ খুলিবার জন্য উদ্যত হইলেন। তখন গৃহিণী আসিয়া সে ঘরে দেখা দিলেন।

সাতকড়ি বাবু বলিলেন,—এটি গোপাল বাবুর ছেলে, শরৎ। ছাখো দিকি তোমার লোক-জনের আক্কেল,—বেচারী একেবারে নীচে ঐ থামের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, তা একবার জিজ্ঞাসাও করে নি যে, তুমি কে গো? কাকে চাও? বসতে দেওয়া দূরের কথা! ছি!

গৃহিণী বলিলেন,—ভারী পাজী হয়েচে লোকগুলো! ঐ যে সেদিন খাঁদুর স্বামী এসেছিল, খাঁদু বেড়াতে আসবে বলে গাড়ী চেয়েছি। তাই গাড়ী কবে যাবে, এই খোঁজে বেচারী এসেছিল— চাকরদের সে বলেও ছিল যে, ভিতরে খপর দে, জামাই সুরেন বাবু এসেছে! তা কে খবর দেয়! বেচারী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলে যায়—গিয়ে খাঁদুকে বলে, বড় লোকের ফটকে মাথা গলাতে চাই না যেমন, তেমনি তোমার জন্য আজ চাকরের অপমান সয়ে আসচি। খাঁদু কত দুঃখ করে লেখে। একেই তো সুরেন-জামাই এ বাড়ীতে আসে না! শেষে আমি নিজে খাঁদুর ওখানে গিয়ে দুজনকে নেমন্তন্ন করে আনি! বেয়াড়া লোক সব!

সাতকড়ি বাবু বলিলেন,—আজ তাড়া দিয়েছি তোমার ভাইকে। সে কাল থেকে নবর কাজ করবে, আর নব ওর কাজ করবে খাশে!...তার পর গৃহিণীকে বলিলেন,—ছাখো এখন, শরতের জলখাবারের বন্দোবস্ত করে দাও গো। একসঙ্গেই খাবো দু'জনে!

গৃহিণী চলিয়া গেলেন। সাতকড়ি বাবু পোষাক ছাড়িয়া শরৎকে লইয়া বাথরুমে গেলেন, হাত-মুখ ধুইয়া শরৎকে হাত-মুখ ধুইতে বলিলেন। তার পর ঘরে আসিয়া গড়গড়ার নল মুখে পুরিয়া বলিলেন,—তার পর তোমরা সব আছ কেমন, বলো? চলছে কি করে?

এই দরদ-ভরা প্রশ্নে শরতের বুক ঠেলিয়া অশ্রু উথলিয়া উঠিল। কিন্তু তেজী বাপের পুত্র সে! চোখের জলকে কড়া শাসনে রুখিয়া ধরিয়া আর্দ্র কণ্ঠেই শরৎ বলিল,—অমনি চলে যাচ্ছে। আমি তাই ভাবছিলুম, সংসার চালিয়ে ছোট ভাইটিকে মানুষ করা খুবই কঠিন! কাজেই আমার পক্ষে এখন স্থির হয়ে পড়াশোনা করলে চলবে না! আপনি কোথাও বলে-কয়ে আমার একটা চাকরি জুটিয়ে দিন...

—চাকরি! সাতকড়ি বাবু শরতের পানে চাহিয়া বলিলেন,—এই বয়সে চাকরি করবে কি! না, না, তুমি পড়ো! এবারে না ইণ্টারমিডিয়েট দেবে তুমি?

শরৎ বলিল,—হ্যাঁ।

সাতকড়ি বাবু বলিলেন,—আমি অবশ্য তোমার মার উপর জোর করতে পারি না। তবে তিনি যদি অনুমতি করেন, তাহলে তোমাদের সংসারের ভার আমার উপরই দাও না, দু'দিন—যতদিন না তোমরা দুই ভাই মানুষ হয়ে ওঠো! তোমার বাবার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ছিল, তোমরা জানো না! আমার তো ইদানীং দেশে যাওয়া বড় ঘটে উঠতো না! যখন এই কাজ-কর্ম্মের ভিড় ছিল না, তখন রবিবারটা আমার কাটতো আমার ঐ দেশের বাগানের পুকুরে তোমার বাবার সঙ্গে, সারাদিন মাছ ধরে!...তা তাঁর সংসার আর আমার সংসার তো ভিন্ন নয়। না-দেখা-দেখির জন্যে আজই এমন হয়েচে! নাহলে আমাদের বাবার আমলে অর্থাৎ তোমার ঠাকুর্দ্দা আর আমার বাবা দুজনে উঠতে-বসতে নিত্য-সঙ্গী ছিলেন। তাঁদের দাবা খেলার গল্প আজ পর্য্যন্ত দেশের বুড়োরা জানে!

শরৎ বলিল,—মার ইচ্ছা, আমি চাকরিতেই ঢুকি!

সাতকড়ি বাবু বলিলেন,—বেশ। আমি তাঁকে বোঝাই আগে—তিনি রাজী হন, তখন নয় তাই করো! ...কিন্তু চাকরিতে কি বা পাবে! তুমি ছেলে মানুষ, তায় সবে এই ম্যাট্রিক পাশ করেচ! একটা কাজের জন্য যেখানে কত বি-এ, এম-এ ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেখানে...সাতকড়ি বাবু একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। পরে বহুক্ষণ স্তব্ধভাবে চিন্তা করিবার পর বলিলেন,—তোমার ছোট ভাই কি পড়চে?

শরৎ বলিল,—সে এই সবে সেকণ্ড বুক শেষ করেছে!...এ যে অনেকদিন লাগবে তার মানুষ হয়ে উঠতে! অল্পদিন হতো, কথা ছিল! এতদিনের জন্য আপনার ঘাড়ে প্রকাণ্ড বোঝা চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা...

সাতকড়ি বাবু বলিলেন,—খুব বেশী দিন বলচো কেন, বাবা? তুমি পাশ করো,—পাশ করে গ্রাজুয়েট হয়ে ল'পড়া সুরু করো, আমার কাছেই আর্টিকল্‌ থাক্‌বে'খন—তখন থেকেই যাতে কিছু রোজগার হয়, সে ব্যবস্থা করে দেবো...

শরৎ বলিল,—বি-এ পাশ করতে এখনো তিন বৎসর! তাও যদি কোন বাধা না পেয়ে ঠিকঠাক পাশ করতে পারি!...কিন্তু নানা বাধা, নানা বিঘ্নও তো ঘটতে পারে এর মধ্যে!

সাতকড়ি বাবু বলিলেন,—আচ্ছা, ও-সব কথা থাক্‌। তোমার মার সঙ্গেই কওয়া যাবে'খন। এখন...ঐ যে খাবার এসেচে...কখন্‌ খেয়ে বেরিয়েচো, আগে কিছু খাও।

গৃহিণী পাচক-সমেত ঘরে আসিলেন। দুখানি রেকাবিতে লুচি, ভাজা, তরকারী। পাচক রেকাবি রাখিয়া চলিয়া গেল; পরক্ষণেই আবার সে আসিল, আর দুইটা রেকাবিতে কিছু কাটা ফল ও মিষ্টান্ন লইয়া।

শরতের আহার শেষ হইলে সাতকড়ি বাবু বলিলেন, —কখন্‌ ট্রেণ?

দেওয়ালে সংলগ্ন ঘড়ির পানে চাহিয়া শরৎ বলিল,—সাতটা চল্লিশ।

সাতকড়ি বাবু বলিলেন,—দেরী আছে। আচ্ছা, এসো আমার সঙ্গে মাঠের দিকে,—তার পর আমি তোমায় গাড়ী করেই ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসবো'খন!

২

সাতকড়ি বাবুর প্রস্তাবে শরতের মা রাজী হইলেন না। অত্যন্ত মিনতি-ভরা স্বরে দ্বারের পাশ হইতে বলিলেন,—আপনি ওর চাকরিই একটা দেখে দিন্।... আর আপনার কথায় রাজী হতে পারলুম না বলে আমার দোষ নেবেন না। এমনি স্নেহই এদের উপর রাখবেন চিরদিন...এ থেকে ওদের বঞ্চিত করবেন না, ঐটুকুই এখন এদের সম্বল!

এই দরিদ্র ঘরের তেজস্বিনী বিধবার কথা শুনিয়া সাতকড়ি বাবুর মাথা নত হইয়া পড়িল। এর কাছে ঐ ষণ্ডামার্ক জোয়ান পুরুষগুলা...যারা দুই বেলা সাহায্য চাহিয়া নিজেদের লজ্জা ইজ্জৎ সব বিসর্জ্জন দিতে আসিতেছে...তারা আসিয়া এই দরিদ্র ঘরের ঘরণীর পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিক্! ভিক্ষার অন্নমুষ্টি? তার তুলনায় মাথায় মোট বহিয়া মুড়ি চিবানোতেও যে কি আরাম, কি সুখ, তার পরিচয় এখানে আসিয়া নিক্ তারা! তাঁর মনে হইল, এ জ্ঞান দেশের লোকের থাকিত যদি, তাহা হইলে কি প্রয়োজন ছিল, ঐ অনাথ-আশ্রমের বা কংগ্রেসে বিলাতী পণ্যের বয়কট-রেজুলেশনে বাধাইবার ঘটা! উমেদারের দল ভিক্ষা-পাত্র ছাড়িয়া বনের কাঠ কাটিয়া সহরে বেচিলেও পরম সুখে সংসার চালাইতে পারিত যে!

শরতের মাকে অবিচল দেখিয়া সাতকড়ি বাবু বলিলেন,—বেশ, তাহলে শরৎ যেন রবিবারে আমার কাছে যায়! আমি দেখবো, এক সাহেব আছে,—তার বোধ হয় লোকের দরকার। একজন বিশ্বাসী খাটিয়ে ছোকরা সে চায়। নতুন ব্যবসা করতে এসেচে এখানে,...

শরতের মা গদ-গদ কণ্ঠে বলিলেন,—আপনার দয়া কখনো ভুলবো না!

সাতকড়ি বাবু এ কথায় একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন; অনুযোগের সুরে বলিলেন,—ও-সব বড় বড় কথা বললে আমি কিছুই পারবো না কিন্তু। আপনার নিজের ভাইয়ের কাছে যে-ভাবে এ কথা বলতেন, ঠিক সেই ভাবেই যদি বলেন, তাহলে এ কথা মাথায় করে নেবো! আপনি তো জানেন, গোপালের সঙ্গে আমার কি ভাব ছিল—সে আমার কে ছিল, আর আমিই বা তার কে ছিলুম! এই স্নেহের সম্পর্কের মধ্যে পয়সা-কড়ির ব্যাপার যদি আনতে না চান তো দয়া-মমতার কথাই বা আনেন কেন!

শরতের মা অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিলেন। ঠিক এত বড় দরাজ ছাতি যার, এমন দরদ, এতখানি মমতা যে দেখাইতে আসিয়াছে, এ কথায় তাহাকে অপমান করা হয়, সত্য! তিনি বলিলেন,—আমি মেয়েমানুষ, কি বলতে কি বলে ফেলেচি! আমায় ক্ষমা করবেন।

সাতকড়ি বাবু বলিলেন,—তাহলে আমি চললুম। যখনি দরকার বোধ করবেন, শরৎকে পাঠাবেন আমার কাছে—নয়তো একটা চিঠি ছেলেদের দিয়ে লেখাবেন, তাহলেই হবে!

তার পর সাতকড়ি বাবুর চিঠি লইয়া শরৎ মিষ্টার বোমণ্ট সাহেবের সঙ্গে একদিন দেখা করিল। সাহেব এখানে কি সব গাছ-গাছড়া হইতে নানাবিধ ঔষধ তৈয়ার করিতে আসিয়াছেন; ঘুরিয়া-ঘুরিয়া সেই গাছ সংগ্রহ করার কাজে শরৎকে তিনি চান্। কাজটার গোড়ায় আশার কিছু দেখা না গেলেও সাহেব বুঝাইয়া দিলেন, এই গাছ-গাছড়া বিলাতে পাঠাইতে পারিলে তাহা হইতে অনেক ঔষধ তৈয়ার হইবে, এবং এ-কাজে অনেক টাকা লাভ হইবে। সাহেব একজন ভালো কেমিষ্ট—এবং তিনি নানা দেশে ঘুরিয়া এদেশে আসিয়াছেন ঐ গাছের সন্ধানে। শরৎ তার কাজের জন্য গাড়ী ভাড়া স্বতন্ত্র তো পাইবেই, তাছাড়া মাসে মাহিনা পাইবে আপাততঃ ত্রিশ টাকা। ভালো কাজ করিতে পারিলে উন্নতির বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, সাহেব এমন ভরসাও দিলেন। সাহেব বলিলেন,—[illegible] বাবু, তুমি আর আমি এই দুই জোড়া হাত আর দুই দেহ লইয়া কাজে নামিলাম। তুমি যদি বুঝিয়া কাজ করিতে পারো তো দুই জনের হাত সোনায় মুড়িয়া যাইবে!

একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে কাজ পাইয়া শরৎ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। সাহেব অফিস খুলিয়াছেন কলিকাতায়, হাইকোর্টের কাছে হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে। ছোট একখানা ঘর, দুইখানা চেয়ার, একটা বেঞ্চ, দুইটা টেবিল আর কতকগুলা খাতা ও কাগজ, ইহাই সে অফিসের যা-কিছু আসবাব।

কাজের কথা পাকা করিয়া শরৎ ছুটিল হাইকোর্টে সাতকড়ি বাবুর কাছে। সব কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন,—সাহেবকে পাগল ভেবো না! বেশ পণ্ডিত লোক, তবে খেয়ালী বটে। ওর বাপের পয়সা ছিল বিস্তর, বিলাত থেকে এখানে এসেচে—কি ঐ সব গাছ-গাছড়ার সন্ধানে, বাঙলা দেশের জঙ্গলে! কি হবে, জানি না। তবে সাহেবের স্বপ্ন যদি সত্য হয়, তবে পয়সার ভাবনা ভাবতে হবে না কখনো।...বোঝো একবার সাহেবের কাণ্ড। ও গাছগুলো নেহাৎ বুনো—আমরা তার কোন সন্ধানও রাখি না। আর ও বই পড়ে জেনেচে, বাঙলা

বনে-জঙ্গলে ঐ গাছ অজস্র জন্মায়, অমনি কেতাবে পড়েই সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে এখানে এসেচে এই মরীচিকার পিছনে। উদ্যমটা দেখেচো একবার!

শরৎ বলিল,—বড় কি কোন জাত অমনি হয়! আবার বড় যখন হয়, তখন বুদ্ধিও তার নানা দিকে খোলে!

সাতকড়ি বাবু বলিলেন,—ঠিক কথা!...তাহলে তুমি রোজ অফিসে আসবে ঠিক ঘড়ির কাঁটা ধরে বেলা সাড়ে দশটায়—আর এখানকার কাজ সারা হলে পাঁচটার অফিস বন্ধ হলে আবার পৃথিবীর পানে ফিরে চাইবার অবকাশ পাবে। ঐ সাড়ে দশটা থেকে বেলা পাঁচটা অবধি তুমি আর কারো কেউ নয়, ঐ সাহেব মনিবের কাছে তোমার হাত-পা অর্থাৎ শরীর মন সব একেবারে বাঁধা রইলো। এই হাজিরার সময়ে কখনো ঢিলে দিয়ো না। মনে করে রাখো, এই ক'ঘণ্টা তোমার জীবন থেকে ছিটকে এসে অফিসের ঘরে মনিবের কাছে বাঁধা পড়েচে। সময়ের দাম যে বোঝে, তাকে কখনো পস্তাতে হয় না!

সাতকড়ি বাবুকে প্রণাম করিয়া শরৎ গৃহে ফিরিল।

৫

পরদিন হইতে অফিসে নিয়ম-মত আসায় সে কোন ত্রুটি রাখিল না। মেঘ ঝড় জল, প্রকৃতির রুদ্র লীলা কোনদিন তাকে ঘরের কোণে আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই। শরীরের অসুস্থতাও কখনো তাকে বিশ্রাম-সুখের কোমল শয্যায় টানিয়া ফেলে নাই! সাতকড়ি বাবুর কথামত তার জীবনের এই কয়টা ঘণ্টা অফিসেই সে ন্যস্ত করিয়াছিল! সাহেবও কাজের দাম বুঝিতেন—মাহিনার প্রতি রক্ত যে প্রাণের দরদ, তাহা তিনি এই বিদেশী বালকের শিরে স্বচ্ছন্দ মনেই ঢালিয়া দিয়াছিলেন!

এক বৎসরে উন্নতিও দেখা গেল। মাসের মাহিনা ত্রিশ হইতে পঞ্চাশে গিয়া দাঁড়াইল এবং বৎসরের হিসাব-নিকাশ হইলে সাহেব তাকে দুই শত টাকা বখশিস দিলেন। শরতের সেদিন কি আনন্দ!

কিন্তু এ আনন্দের আলোর উপর কোথা হইতে মেঘ আসিয়া জমিতেছিল, কাজের গোলে শরতের সেদিকে নজর পড়ে নাই! শেষে একদিন সেই মেঘ প্রচণ্ড আকার ধরিয়া সমস্ত পৃথিবীকে আঁধারের আবরণে ঢাকিয়া দিল। চাকাইয়া শরৎ চাহিয়া দেখে, এ মেঘ কাটিবার নয়!

পিতার মৃত্যুর পর হইতেই অবহেলা আর চিন্তার আঘাতে মার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। নিত্য একটু জ্বর হইত—মা সেদিকে নজর দিতেন না। তার উপর স্নানাহার যেমন চলিবার তেমনি চলিতেছিল। শেষে একদিন সেই জ্বর হুড়মুড় করিয়া ঘাড়ে পড়িয়া তাঁকে কাবু করিয়া ফেলিল। শরৎ কাতর চক্ষে ডাক্তারের কাছে ছুটিল। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া যে-কথা বলিলেন, তাহাতে তার বুকের রক্ত হিম হইয়া গেল।

ডাক্তার বলিলেন, মাকে কাশ রোগে ধরিয়াছে। এ রোগ সারিবার নয়—শাস্ত্রও এ রোগের ঔষধ জানে না। এ রোগে রোগীর ভুগিয়া-ভুগিয়া মৃত্যু—ইহাই নিয়ম!

শরতের পায়ের তলায় পৃথিবী দুলিয়া উঠিল। দুই চোখের সামনে সূর্য্য নিবিয়া প্রকাণ্ড একটা কালো গোলার মত ঘুরিতে লাগিল! হায়রে, কার জন্য আর এই ছুটাছুটি, এ মত্ত যুদ্ধ!...

কিন্তু প্রফুল্ল? তার সব ভার যে শরতের হাতে। মা রোগের কথা সবই বুঝিতেন। মা ধরিয়া বসিলেন,—তোর বিয়ে দি। নাহলে আমি চলে গেলে সংসারটা একেবারে এমনি ধ্বসে যাবে যে কোনদিন আর তাকে টেনে তোলা যাবে না।

শরৎ বলিল,—তোমার পায়ে পড়ি মা, ও চিন্তা রেখে দাও।

মা বলিলেন,—তাও কি হয়, বাবা! একটু বাঁধন দিয়ে যাই—তাই থেকে আবার সব গড়ে উঠবে। না হলে ছুটিতে কোথায় পথে-পথে ভেসে বেড়াবে—চিরদিনের মত সংসারটা যাবে, তোমাদেরো এ-জন্মটাই বৃথা হবে!

মা আরো বলিলেন, মেয়ে তাঁর দেখা আছে। তাঁর ছেলেবেলার সই তারামণি, মগরায় ভালো ঘরেই তাঁর বিবাহ হইয়াছিল। সই নাই—তবে একটি মেয়ে তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। সইয়ের স্বামীর পয়সা-কড়ির সঞ্চয় আছে, মেয়েটি ডাগর হইয়াছে। তাঁর সাধ, ঐ মেয়েটিকে ছেলের হাতে সঁপিয়া দেন। সইয়েরও এমনি সাধ ছিল। সই এমন লক্ষ্মী যে ছন্ন-ছাড়া স্বামীর ঘরে পা দিতেই স্বামীর ঘরে লক্ষ্মী একেবারে উথলিয়া উঠিলেন। ভাঙ্গা ঘর কোটায় পরিণত হইল, তা ছাড়া সোনাদানাও সইয়ের অঙ্গে চড়িয়াছিল। সেই মার মেয়ে! নগদ এমন কিছু নাই, তা না থাক—শরৎ এখন ভগবানের কৃপায় উপার্জ্জন করিতেছে! তার সাহেব বাঁচিয়া থাকুক, তাঁর ঘরে লক্ষ্মী অচঞ্চল হউন্, শরতের কোনদিন পয়সার অভাব ঘটিবে না! ওদিকে যখন আশাও দেখা গিয়াছে, তখন আর ভাবনা নাই। মার সেখানে ডাক পড়িয়াছে, তিনি একলা রহিয়াছেন, মাকে যাইতেই হইবে! তাই যাইবার পূর্ব্বে এই মেয়েটিকে আনিয়া সংসারে তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে চান্। তাঁর এমন আশা খুব আছে যে, এই মেয়েটিকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁর ভাঙ্গা ঘর আবার একদিন দিব্য শ্রীতে ভরিয়া গড়িয়া উঠিবে!

শরৎ আপত্তি তুলিল। মা কিন্তু সব আপত্তি মধুর স্নেহে উড়াইয়া দিলেন। শরৎ বলিল,—এই বয়সে সবাই চলে গিয়ে আমার ঘাড়ে কি দায়িত্ব চাপাচ্ছ মা! এর উপর বাহিরের বোঝাও আনো যদি...

হাসিয়া মা বলিলেন,—এ বোকা নয় বাবা,—দেখো, এ যা দিয়ে যাচ্ছি—এ মার আশীর্ব্বাদ! এরই কল্যাণে চোখে দীপ্তি পাবে, মনে বল পাবে। সারাদিন কাজে ঘুরে শ্রান্ত হয়ে এসে এরই কাছে সে শ্রান্তি ঘোচাবার অমৃত পাবে! তাছাড়া তুমি কাজে বেরিয়ে গেলে ফুলু আমার কার কাছে থাকবে—তাকে কে দেখবে? সব দিক ভেবে আমি এ ভালো ব্যবস্থাই করচি, বাবা।

৩

মা আদর করিয়া বধূ বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। বধূর নাম উমারাণী। এই ভাঙ্গা ঘরে উমারাণী কৈলাস-বাসিনী উমারাণীর মতই শরতের স্নিগ্ধ আনন্দ ও শান্তি বহিয়া আনিল। উমারাণীর হাতের সেবায় মার রোগ-পাণ্ডুর মুখে কিসের যেন একটা দীপ্তি ফুটিল।

উমার ডাগর চোখে ভবিষ্যৎ-সুখের একটা উজ্জ্বল আভাস যেন জ্বলজ্বল্ করিত! চাঁপার মত বর্ণে তার মাদকতা ছিল না; সে বর্ণ শান্ত শ্রীতে সমুজ্জ্বল। মুখ-খানিতে এমনি স্নেহ-ভরা লাবণ্য ঢলঢল করিতেছিল যে, বৌটির মুখের পানে চাহিয়া পাড়ার মেয়েরা বলিল,—ভারী চটক কিন্তু মুখখানিতে!

উমারাণীর বাপ আসিয়া বেহানকে বলিল,—গচ্ছিত ধন আপনার পায়ে রেখে আমার মন হাল্কা হলো আজ!···আপনার অসুখ, উমা এইখানেই থাকুক, সেবা করবে। বিষয়-সম্পত্তি যা আছে, তার ব্যবস্থাও এই কাগজখানিতে লিখে রেখে গেলুম, শরৎকে আপনি দেবেন। আমি এখন দিন-কতক ছুটি নিচ্ছি, তীর্থে-তীর্থে একটু ঘুরবো, সাধ আছে।

মহেন্দ্র বাবুকে ধরিয়া রাখা গেল না। একটু পীড়াপীড়ি করিতে তাঁর চোখ আর্দ্র হইয়া উঠিল। ভারী গলায় তিনি বলিলেন,—আর গিট ধরে বসে থাকবো না, বেয়ান্। থাকলে বিস্তর সইতে হয়। এই যা দেখলুম, এই আনন্দ! এই দেখার আনন্দকেই বুকে বয়ে বেরিয়ে পড়ি। বুকে আর কাঁটা ফুটতে দেবো না। যেখানেই থাকি, ভাববো, এমনি আনন্দেই এখানে আছে সব। এর পরে এ-ধার পানে চাইতেও নাহলে ভয় করবে!

বেয়ান বলিলেন,—কিন্তু আমারো যে ডাক এসেচে, ভাই। তখন এদের দেখবার আর কে থাকবে?

হাসিয়া মহেন্দ্র বাবু বলিলেন,—মানুষ কি কাউকে দেখতে পারে, না, দেখেচে কখনো? এই তো সবাইকে দেখে আসচি চিরকাল—কাউকে আগ্‌লে ধরে রাখতে পেরেচি? দেহেরও সে জোর নেই—মনেরো সে শক্তি নেই। ভগবান দেখবেন। তাঁর দেখার উপর নির্ভর করে নিজের চোখ সরিয়ে নেওয়াই ঠিক, বেয়ান্।

মহেন্দ্র বাবুর অন্তরখানা স্ত্রী-বিয়োগের পর হইতেই এমনি বৈরাগ্যে ভরিয়া ছিল। কোনমতে কর্ত্তব্য করিবার জন্যই তিনি সংসারে পড়িয়া ছিলেন। আ কেন? সে কর্ত্তব্য তো সারা হইয়াছে! ইহার থাকিয়া খাওয়ার নামে গণ্ডী বাড়াইবার দুশ্চেষ্টা! তাব খারাপ হয়, যদি? বিধাতা সকলেরই জীবনে একটা গ টানিয়া দিয়াছেন, ছুটাছুটি দৌড়-ঝাঁপ এই অবধি! বেশী আগাইতে গেলে অন্ধ নিয়ম-শৃঙ্খলায় কোন্ দিয়া যে টান্ পড়িবে, ব্যথা বাজিবে, কে জানে!

বেয়ানকে শেষে তিনি সান্ত্বনা দিলেন,—আপ যাবার দিন খপর পেলে একবার আসবো। তখন এরা দরকার বোধ করে, আমার কাছে কোন হা পেতে, তা দেবো বৈ কি!···কিন্তু বেয়ান, তুমি সংসা চিন্তা ছাড়ো। এরা নিজের পথ দেখুক। তুমি শুধু ক'দিন আছ, ঐ খুঁটির মত পড়ে থাকো—প্রাণহী নির্জ্জীব খুঁটি। এর মধ্যে যদি দরকার পড়ে, ওরা হাঁপি ওঠে, তোমায় ধরে একটু জিরিয়ে নেবে! তুমি আর এ মধ্যে এসো না। ওদের ঠেকে শিখতে দাও জীবনে তাহলে আর কখনো ওদের অনুতাপ করতে হবে না! তুমি এখন চিন্তা ধ্যান সব মিশিয়ে দাও গোপালবা স্মৃতির পায়ে! তাঁকে ধ্যান করতে করতে তো শেষ নিশ্বাস বাতাসে মিশিয়ে দাও···দেখবে, তি তোমাকে হাত ধরে নেবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন!···ফুলু? তার ভার শরতের!

কথাগুলা শরতের মার প্রাণে ভালো করিয়াই আ দিল। ঠিক তো! তাঁর জীবন তো সেইদিনই হইয়াছে! এখনো ঘর-সংসার ভাবিয়া কেন মিছা বি শেষের চিন্তাকে জর্জ্জরিত করিয়া তোলেন! মা মানুষকে দেখিতে পারে কখনো, না, দেখিয়া কেহ কখ কাহাকেও সামলাইতে পারিয়াছে! ভগবানই দেখি মালিক! মানুষ তাঁর ভার নিজের হাতে তুলিয়া লই সব দিকে কেমন জোট পাকাইয়া ফেলে। তাই না দুঃ পায়! তা না করিয়া মানুষ যদি ভগবানের উপরই ভার সঁপিয়া দিত! তাহা হইলে অনর্থক নৈরাশ্যের আঘা প্রাণটাকে বেদনার হাত হইতেও রক্ষা করিতে পারিত

মহেন্দ্র বাবু চলিয়া গেলেন।

উমারাণী অল্পদিনেই তার মনের দরদ দিয়া, দিয়া, ভক্তি দিয়া, সেবা দিয়া এই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন সংসারটি এমন পরিপাটী করিয়া সাজাইয়া তুলিল যে, বাহি কেহ আসিয়া ধরিতেও পারিল না, এ সংসারে কোন্ ফাট্ ধরিয়া তার অস্তিত্বকে শঙ্কাকুল করিয়া তুলিয়াছি এই ছোট্ট মেয়েটিকে কাছে পাইয়া শরতের মার ও সাধও মনে জাগিত, আরও কিছুদিন থাকিয়া যাই! অ এদের এই প্রাণঢালা আদর আর যত্ন, সেটাকে এ সার্থক হবার অবকাশ দিই!

কিন্তু তা ঘটিল না। ও-পারের ডাক অত্যন্ত আর্ত্ত আকুল হইয়া দেখা দিল এবং এক জ্যোৎস্না-রাত্রে বাড়ীর তুলসী-তলায় হরিনামের মালা হাতে জড়াইয়া শরতের মা স্বামীর পথে যাত্রা করিলেন। বাড়ীতে শোকের রোল উঠিল।

৪

মাকে শ্মশানে রাখিয়া ছোট ভাইটিকে লইয়া শরৎ যখন ঘরে ফিরিল, তখন সে বুঝিল, এই মেয়েটি পরের ঘর হইতে আসিয়াছে—নিজেকে সে না দেখুক, তবু ইহাকে ঠেলিয়া রাখা চলে না! শোকের আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া ঘরের কোণে পড়িয়া থাকিলে ভাইটিই বা মানুষ হয় কি করিয়া! তার উপরই যে এখন সব ভার! বাপ যেদিন চলিয়া যান, সেই দুর্দ্দিনের কথা মনে পড়িল। সেদিন অত-বড় ঘা খাইয়াও মা তাদের দুই ভাইয়ের মুখে আহার গুঁজিয়া দিয়াছেন, তাদের ধরিয়া খাড়া করিয়াছিলেন! আজ তারো সেই ভূমিকা অভিনয়ের পালা! যেমনই সে শোকে মুষড়িয়া এক কোণে গিয়া আশ্রয় লয়, অমনি মার দুই চোখ সাম্‌নে একেবারে জ্বল্‌জ্বল্ করিয়া ওঠে! সে চোখের দৃষ্টিতে কি সান্ত্বনা ...লিয়া মা যেন স্পষ্ট বলিতেছেন, ছি বাবা, ও-দুটির ...েয়ে তুমি উঠে দাঁড়াও!

শরৎ মন হইতে সব শোক ঝাড়িয়া ফেলিল; তিন ...নের দিন গিয়া অফিসে হাজিরা দিল। সে অবাক হইয়া ...ল, এই ছোট মেয়েটি, যার মুখে কথা শুনা যায় না—সে কেমন নিঃশব্দে উঠিয়া আহারের জোগাড় করিয়া দিতেছে, ছোট্ট হাত দুইখানি নাড়িয়া এই সদ্য-ভগ্ন সংসারটিতে জোড়া-তালি লাগাইতেছে! কয়েকমাস পূর্ব্বে কোথায় ছিল সে, দূরে কোন্ অজানা ঘরে—আজ সে একবারে তাদের পাশটিতে দাঁড়াইয়া কেমন নিঃশব্দে তাদের দুঃখ বুকে তুলিয়া তাদের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে!

সেদিন গৃহে ফিরিয়া শরৎ দেখিল, পাড়ার রমণীবৃন্দ বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতেছে। উহাদের মধ্যে আন্না ঠাকুরাণীও ছিলেন। আন্না ঠাকুরাণী পাড়ার মাথা! ...র শাণিত বচনের এমন শক্তি ছিল যে তিনি মুখ খুলিলে পাড়া এমন নিস্তব্ধ মূর্ত্তি ধারণ করিত যে, দেখিয়া মনে হইত, এদেশের লোক চিরদিনই বুঝি ...রুদ্ধ হইয়া আছে!

দ্বারের কাছে শরৎকে দেখিয়া আন্না ঠাকুরাণী বলিলেন,—কি বৌই হলো বাবা! একটা বছর ঘুরলো না, মাকে খেলে!

নিরাপদ পথে অসতর্ক পথিক সহসা চোট্ খাইলে যেমন থমকিয়া বেদনার ঘা প্রথমটা বুঝিতে পারে না, শরতের অবস্থাও ঠিক তেমনি দাঁড়াইল! তার... ব্যাপারটা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ! ইনি বুঝি আ... এই কথাটাই দরদ করিয়া জানাইতে আসিয়াছিলেন কিন্তু এই বৌটিকে আনিবার পূর্ব্ব হইতেই যে মা... কাল-রোগে ধরিয়াছিল, এবং সে রোগের আক্রমণে মা চলিয়া যাইবার কথা সুস্পষ্ট প্রকাশ হওয়ার দরুণই... এই মেয়েটিকে ঘরে আনিয়া রাখিয়াছেন, উহাকে কে... করিয়া বিশৃঙ্খল সংসার আবার ভরিয়া উঠিবে, এ... আশায়, এই ভরসায়! তবু তাঁহার সঙ্গে কথা কাটাকা... করার প্রবৃত্তি হইল না—তাই সে নিঃশব্দে তাঁহাকে প... ছাড়িয়া দিয়া ঘরে ঢুকিল।

উমারাণী দাওয়ায় বসিয়াছিল, স্তব্ধভাবে, আকাশে... পানে চাহিয়া,—আর তার পাশে ভাইটি বসিয়া ছল-ছ... চোখে বৌদিকে লক্ষ্য করিতেছে। শরৎ আসিতেই প্রফু... বলিল,—বৌদি কাঁদচে, দাদা···। প্রফুল্ল কাঁদিয়া ফেলিল; কাঁদিয়াই বলিল,—ওরা কেন বৌদিকে বকলে! কেন বক্‌লে,—বালক একেবারে হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া তার প্রাণের রুদ্ধ বেদনাকে উৎসারিত করিয়া দিল।

শরৎ আসিয়া দেখিল, উমার দুই চোখে জল—মুখ-গাল বহিয়া সে জল গড়াইয়া পড়িতেছে। সে বলিল,—কাঁদচো কেন উমা?

উমা কোন কথা বলিল না—রুদ্ধ বেদনায় তার ঠোঁট ফুলিয়া উঠিল! তাকে চাপিতে গিয়া অশ্রু আরো বেগে ছুটিয়া আসিল। শরৎ তার পাশে বসিয়া তার মুখখানি তুলিয়া ধরিল, ধরিয়া বলিল,—কাঁদচো কেন, বলো?

উমা এ আদরের স্বরে একেবারে লুটাইয়া পড়িল, তার পর ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল,—আমায় কেন আনলে তোমরা?···আমার জন্যই মা চলে গেলেন!···

শরৎ তা বুঝিয়াছিল। ঐ আন্না ঠাকুরাণীই নির্ম্মম বিষাক্ত কথার ঘায়ে উমাকে আহত জর্জ্জরিত করিয়া গিয়াছেন।

শরৎ বলিল,—ছি, কেঁদো না। ওদের কথাও মানুষ কানে তোলে! তাছাড়া তুমি তো জানোই, মার অসুখ অনেক দিনের—তোমায় আনবার অনেক আগে থেকেই তাঁকে কাল রোগ ধরে! সারবার কোন আশা ছিল না বলেই এ সংসারে তাঁর আসনখানিতে তোমায় বসিয়ে দিয়ে গেছেন! তবে?

প্রফুল্ল বলিল,—ওরা এসেই বৌদিকে বক্‌তে লাগলো! কেন ওরা বকবে? তুমি বারণ করে দাও দাদা···মা এলে মাকে আমি বলে দেবো।

বেদনাহত দেবরকে বুকের মধ্যে চাপিয়া অজস্র চুম্বনে তার মুখ ভরাইয়া দিয়া উমারাণী বলিল,—ছি, কেঁদো না ভাই, চুপ করো। এই তো আমিও চুপ করেচি।"

শরৎ বলিল,—এদের কথায় কখনো কান্ দিয়ো না!

জানো, মাকেও কত দিন কথা শুনিয়ে গেছে? দরদ ওদের কথা শোনাবার বেলায়! এই-সব মেয়ে-মানুষ-গুলো দেশের বুকে কাঁটার মত ছড়ানো আছে! আমার মনে পড়ে, বাবা মারা যাবার পর, তাঁর কাজের সময়, তখন আমাদের কি দুর্দ্দশা—বাবা তো একটি পয়সাও রেখে যান নি—সাতকড়ি কাকা কিছু টাকা দেন। তা মা বলেন, ঐ টাকা থেকে বাবার কাজে যেটুকু না করলে নয় তাঁর পরলোকে সদ্গতির জন্য, সেইটুকুই করবো—আর বাকী টাকায় তোমাদের যাতে চলে, তাই করতে হবে। তা ঐ আন্নাঠাকুরাণী এসে বললেন, অত-বড় মানুষটা গেল, তা তার জন্য ঘটার শ্রাদ্ধ করো, হ্যান্ করো, ত্যান্ করো—মা বললেন, এ তো ঘটার কাজ নয় দিদি, এগুলোকে মানুষ করা আগে চাই তো! তা আন্নাঠাকরুণ তার জবাবে বলেছিলেন,—এমনিই তোর ভক্তি-ছেদ্দা বটে! স্বামীর কাজ দিল-দরিয়া হয়ে করবি, পাঁচজনে ধন্যি ধন্যি করুক্—তা না পুঁটলি বাঁধচিস্! তোর বাবার ঘরে বুঝি এমনি ব্যবস্থা,…ঐ দারুণ সময়ে ভাবো একবার কথার রকমখানা! আমার তখনি মনে হয়েছিল, মারি মাগীর মাথায় এক ঘুসি! মা আমার মন বুঝে দুই চোখে এমন নিষেধ তুলে তাকিয়ে ছিলেন! তার পর বুঝিয়ে বলেন,—ওদের কথায় কখনো কান দিয়ো না! ওরা ভালো বোঝেও না—বোঝাতে গেলে গালাগাল দিয়ে অনর্থক একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করবে! …সেই অবধি আমি ওদের কথায় কখনো কান দিই না! কোন জিনিষকে সত্যকার দৃষ্টি দিয়ে দেখবার শক্তিও ওদের নেই! নিজেদের কুসংস্কারে ভরা ছোট মন, ছোট-স্বার্থ, তাই নিয়েই দুনিয়াকে দেখে, আর তার বিচার করে! স্বার্থই ওদের সব—অপর মানুষের যে প্রাণ আছে, মন আছে—তা বোঝবার শক্তিও ওদের নেই!… এখন মাথার উপর মা নেই—তোমাকেই এখন সব ঝক্কি পোহাতে হবে…তার জন্য মনে দুঃখ করো না। ওদের মুখে ভালো কথা কখনো শুনবে না,…মন্দ কথা রাশ-রাশ শোনবার জন্য তৈরী থাকতে হবে!…তাতে কান দিয়ে মনকে ক্ষত-বিক্ষত করা ঠিক নয়!

তার পর তিনজনে মিলিয়া কাজের গল্পের মধ্য দিয়া সংসার চালাইয়া চলিল। মনে-প্রাণে এমন অন্তরঙ্গতা, এমন মিল দেখা যায় না। সাতকড়ি বাবু দুই-একবার আসিয়া দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—ছোট্ট সংসারটিতে লক্ষ্মী যেন বসে হাসচেন…যে কেউ চেয়ে দেখবে, সেই মুগ্ধ হয়ে যাবে।

প্রফুল্ল পল্লীর স্কুলে ভালো করিয়াই পড়াশুনা করিতে-ছিল—ক্লাশে সে সবার সেরা। ফার্ষ্ট প্রাইজ সে প্রতি-বৎসরই পায়; মাষ্টার মশায়রা তাকে খুবই স্নেহের চক্ষে দেখেন। আর শরৎ? শরতের চোখে সে তার ভবিষ্যতের আশা, সংসারের গর্ব্ব, গৌরবের বস্তু। আর উমা… কাছে প্রফুল্লর যা কিছু আবদার, মান, অভিমান—… উমার মত দরদী বন্ধু তার আর জগতে নাই। প্রাণে… কথা খুলিয়া বলিবার এই একটি মাত্র লোক! প্রফুল্ল… কোন কথা, মনের কোন সাধ উমার অজানা ছিল না।

প্রফুল্ল তখন ডাগর হইয়াছে,—সেবারে ম্যাট্রি… দিবে। বৌদিকে প্রফুল্ল বলিল,—দাদা এই বয়সেই যে… কত বুড়ো হয়েচে! দাদা কতক্ষণই বা বাড়ীতে থাকে… কেবল খাটুনি! আমি এবারে স্কলারশিপ নেবোই… দাদার খরচ যদি কমাতে পারি, বৌদি—

উমা বলিল,—তুমি স্কলারশিপ পাবেই ভাই! কি… তার পর? এখানে আর পড়া চলবে না তো! তুমি যাবে কলকাতার কলেজে পড়তে! আমি তখন একলা… সারা দিন কি করে যে থাকবো! দুজনকে দূরে রে… আমার দিন কি করে কাটবে, আমি শুধু তাই ভাবি!

প্রফুল্ল বলিল,—স্কলারশিপ পেলে সেই টাকা… প্রথমেই কি করবো, জানো বৌদি?…একটু থামিয়া… হাসিয়া সে আবার বলিল,—বলো দিকি!

উমা বলিল—একটি টুকটুকে রাঙা বৌ কিনে এ… আমার হাতে দেবে!

—ধেৎ! বলিয়া প্রফুল্ল তিন পা পিছাইয়া গেল… উমা চোখে-মুখে হাসি ভরিয়া বলিল,—তবে কি?

প্রফুল্ল বলিল,—তোমার খালি ঐ এক ঠাট্টা! … খালি বৌ, আর বৌ!…যাও, আমি বলবো না… কখখনো বলবো না!

উমা বলিল,—বলো না ভাই, লক্ষ্মীটি! ছি, রাগ ক… কি! আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ……

প্রফুল্ল বলিল,—হ্যাঁ, মুখ্যুই তো! তুমি মুখ্যু… আমায় শুভঙ্করী কে শিখিয়েচে গো? বাঙলার মাস্ট… জন্য আজো তোমার স্বারস্থ হই যে!

হাসিয়া উমা বলিল,—থামো, থামো, তুমি ভা… লেকচার দিতে শিখেচো!

প্রফুল্ল বলিল,—সত্যি, তুমি এখনো পড়াশোনা করে… —না?…আচ্ছা, কখন্ পড়ো বৌদি, বলো না?

উমা বলিল,—হ্যাঁ পড়ি! তুমি ইস্কুলে গেলে মেয়ে… ইস্কুলের গাড়ী এসে আমায় নিয়ে যায়, বুঝলে!

হাসিয়া প্রফুল্ল বলিল,—আমি কিছু জানি না, বটে… —ঐ যে তোমার বালিশের তলায় সেদিন একখা… ফার্ষ্ট বুক ছিল! বুঝেচি, আমি ঘুমোলে তুমি পড়ো—না… রাত্রে দাদার কাছে, খুব চুপিচুপি?

অধরে সলজ্জ মৃদুহাস্য—উমা বলিল,—হ্যাঁ, তু… দেখেচো!

উমা সত্যই লেখা-পড়া ছাড়ে নাই। বাপের কা… সে লেখা-পড়া লইয়াই থাকিত! এদিকে তার ঝোঁক

ছিল প্রচুর। এখনো দুপুরবেলা কেহ বাড়ী না থাকিলে নিজের ঘরে সে বই লইয়া বসে—যেগুলা বুঝিতে না পারে, রাত্রে প্রফুল্ল ঘুমাইলে শরতের কাছে জানিয়া বুঝিয়া লয়। শরৎ কতদিন বলিয়াছে, প্রফুল্লর কাছে ভালো করেই না হয় পড়ো। এ তো ভালো কথা! প্রফুল্লও কত খুশী-মনে পড়াবে। এতে লুকোচুরি কিসের! কিন্তু উমার মুখ রাঙা হইয়া ওঠে—ঠাকুরপোর কাছে পণ্ডিতানীর মত বই লইয়া বসিবে! মাগো, সে কথা মনে করিতেও লজ্জা হয়!

উমা বলিল,—বাজে কথায় আসল কথা গুলিয়ে দিলে চলবে না,—বলো, কি দেবে?

প্রফুল্ল বলিল,—থাক, এখন বলবো না। যদি পাই, তখন দেখো। এখন থেকে মিছে বলে দোষী হবো কেন! শেষে যদি স্কলারশিপ নাই পাই!

এমনি হাস্তে-রঙ্গে গল্পে-স্বপ্নে আদরে-আব্দারে দিন কাটিতে লাগিল। এবং যথা-সময়ে পরীক্ষা দিয়া প্রফুল্ল পাশ করিল ও য়ুনিবার্সিটিতে সে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিল। গেজেট দেখিয়া শরতের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। আজ যদি মা থাকিতেন! তাদের বড় আশার ধন প্রফুল্ল—সে আজ পাশ দিয়া নাম কিনিয়াছে! চোখের সামনে ভবিষ্যৎ এক সুন্দর মূর্ত্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিল।

এবারে কলিকাতায় পড়িবার পালা। শরৎ বলিল,—জলপানি তো পাচ্ছ! প্রেসিডেন্সি কলেজেই পড়ো।

প্রফুল্ল বলিল,—কোন দরকার নেই দাদা। পনেরো টাকা মাহিনার কলেজে গেলে বিদ্যেটা তো আর সেই মাপে বাড়বে না। সিটি কি রিপনেই ভর্ত্তি হবো। ষ্টেশনের কাছে, বেশী হাঁটতে হবে না।

শরৎ বলিল,—আই-এস-সি পড়বে বলচো—তা প্রেসিডেন্সিতে যন্ত্রপাতি আছে—শেখার সুবিধে।

প্রফুল্ল বলিল,—বেশী ভড়ং-এ আবার গুলিয়ে যেতেও পারে।

প্রফুল্ল রিপনে ভর্ত্তি হইল। বাড়ী হইতে সে ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করে। যেদিন স্কলারশিপের টাকা পাইল, সেদিন সেই টাকা আনিয়া বৌদির পায়ের কাছে রাখিয়া প্রণাম করিল। বৌদি বলিল,—এ কি!

প্রফুল্ল বলিল,—তোমায় প্রণামী।

উমা বলিল,—বেশ, এই টাকা নাও, আমি দিচ্ছি। এতে নিজের জামা-কাপড় কিছু কিনে এনে আমায় কাছে দিয়ো দিকি!

প্রফুল্ল বলিল,—তাই বৈ কি! কখ্খনো না!

উমা বলিল,—আমি তো দিচ্ছি এ টাকা—এ তো এখন আমার!

প্রফুল্ল বলিল,—হ্যা গো হ্যা, পরের ধনে দান-খয়রাতি হচ্ছে! ও-টাকায় আমায় কিছু দান করলে তার ফল পাবে না! তার চেয়ে…

উমা বলিল,—তার চেয়ে…কি?

প্রফুল্ল বলিল,—আচ্ছা, টাকা দাও।

প্রফুল্ল টাকাটা হাতে লইল এবং পরদিন ঐ টাকায় বৌদির জন্ম রূপার সিন্দুর-কৌটা ও একজোড়া ভালো লাল পাড় শাড়ী কিনিয়া আনিল।

আনন্দে উমার দুই চোখ ভরিয়া উঠিল। গাঢ় স্বরে সে বলিল,—এ শাড়ীর একখানি পরবো, আর একখানি তুলে রাখবো। যেদিন তোমাদের বাড়ী থেকে চলে যাবো, সেদিন এই কৌটোর সিন্দুর আমার মাথায় দিয়ে এই শাড়ীখানি পরিয়ে আমায় নিয়ে যাবে—কেমন?

প্রফুল্ল রাগিয়া চেঁচাইয়া একশা করিয়া দিল। শাড়ী দুইখানা লইয়া ধূলায় ফেলিয়া ধূলা মাখাইয়া সে বৌদির গায়ের উপর ছুড়িয়া দিল; বলিল,—এই নাও, এই নাও, এ নিয়ে তোমার লোহার সিন্দুকে তুলে রাখোগে! …বেশ, পরো না—তুমি যদি এ দুখানা না পরো, তাহলে দেখো, প্রফুল্ল কখনো জীবনে নতুন কাপড় পরে কি না!

উমা তাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া সস্নেহে বলিল,—লক্ষ্মী ভাইটি আমার, পাগলামি করে না! পরবো বৈ কি ভাই। তোমার রোজগারের টাকায় কেনা কাপড়, এ যে আমার হীরে-জহরতের চেয়েও বেশী দামী! এ আমার মাথার মণি!…এদের কি অবহেলা করতে পারি! তুমি পাগল,—আমি তামাসা করছিলুম!

প্রফুল্ল বলিল,—এ-সব নিয়ে তামাসা! যাও তুমি ভারী এ…

৫

ছোট্ট একটি বৌ—দত্তদের এই নূতন সংসারে সে এমন শান্তির প্রদীপ জ্বালিয়া ধরিয়াছে, এমন স্নেহে তাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে যে, সারাদিন বাহিরে কাটাইয়া দুই ভাই গৃহে ফিরিয়া দেখে, এক নিমেষে এ এক মায়ার রাজ্যে আসিয়া পৌছিয়াছে! এখানে পথের ধূলি ধুইয়া দিবার জন্ম আছে প্রাণের দরদে স্নিগ্ধ-করা 'ফটিক জল,' শ্রান্তি ঘুচাইতে আছে ঐ ছোট্ট পরীর হাতে হীরা-পান্না-মুক্তায় গাঁথা সোনার কাঠি! কাহারো মুখে একটা ছোট্ট নালিশ নাই, একটা মিথ্যা কলরব তুলিয়া এই শান্তি চিরিয়া দিতে কেহ নাই। শুধুই শান্তি!

উমাকে দেখিয়া, উমাকে পাইয়া শরৎ বার-বার ডাকে, মা, মা, মাগো…উমাকে বলে,—তোমার এ গুণের কোন পরিচয় না পেয়েই মা চলে গেলেন,—এই বড় দুঃখ, উমা। তোমার এ পরিচয় যদি তিনি পেতেন, তাহলে আরো একটু নির্ভাবনায় যেতেন…

এ আদরে, স্বামীর মুখের এ প্রশংসায় উমার ডাগর চোখে জল ছাপাইয়া আসিল। উমা বলিল,—আমার

প্রথম দিনে মা যে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন, সে একেবারে বিদ্যুতের মত আমার বুকে আঁকা রয়েচে। কিন্তু তুমি অত বাড়িয়ে বলো না,—যদি বিগড়ে যাই, ভয় হয়!

শরৎ বলিল,—মা কি বলেছিলেন, উমা?

উমা বলিল,—সে আমার ইষ্ট-মন্ত্র, তা কি বলতে আছে!

শরৎ কহিল,—স্বামীকে বলতে আছে বৈ কি!

উমা বলিল,—সেই খুব গভীর রাত্রে তোমরা ঘুমিয়ে পড়লে, আমি জেগে তাঁর পানে চেয়ে বসেছিলুম। মা আমার হাতখানি নিজের হাতে চেপে ধরে ডাকলেন,—মা... তাঁর চোখের কোলে জল টল্‌টল্ করছিল! আমি তাঁর মুখের কাছে মুখ নামিয়ে বললুম,—কি চাই মা? মা বললেন,—কিছু না মা! আমার ফুলু·· ও কিছু পেলে না, কিছুই জানলে না! ওটিকে তোমার পেটের সন্তান বলেই মনে করো মা। তোমায় পেয়ে যেন ওর সব পাওয়া হয়। আমিও বলেছিলুম,—তাই হবে মা! মা তখন আশীর্ব্বাদ করলেন,—চিরসুখী হও···তাঁর সে আশীর্ব্বাদ কখনো মিথ্যা হবে না।

শরৎ বলিল,—বিশেষ তোমায় দিয়ে!

উমা বলিল,—কথার মানে?

শরৎ বলিল,—মানে আবার কি! ঐ আশীর্ব্বাদ-টুকুকে তুমিও অমন মন্ত্রের মত নিতে পেরেচো, তাই না! তুমি যদি ও আশীর্ব্বাদ কথার-কথা বলে উড়িয়ে দিতে চাইতে, তাহলে?···এমন তো অনেকে দিয়েও থাকে!

উমা বলিল,—যাক্, ও-সব কথা নিয়ে তর্ক তোলে না, তুল্‌তে নেই। এখন বলো দিকি, ঠাকুরপো বলছিল, পাশ হলে তাকে বোধ হয় বাড়ী ছাড়তে হবে,—সেটা বন্ধ করা যায় কি করে?

শরৎ বলিল,—হ্যাঁ, ওর সাধ, পাশ হয়ে ও এঞ্জিনিয়ারীং পড়ে। সে তো শিবপুরে থাকতেই হবে, উমা। মাসে দু'তিনবার করে যা আসতে পাবে!

উমা বলিল,—কোন্ মুখে তুমি এ কথা বলচো! ও যে আমায় এখনো খেতে বসে বলে, মাছের কাঁটা বেছে দিতে! রাত্রে এখনো ঘরের বাইরে যেতে হলে আমায় ডাকে, বৌদি, দাঁড়াবে, এসো! ও গিয়ে শিবপুরে থাকবে, আমায় ছেড়ে?

শরৎ গম্ভীর হইয়া রহিল। এ কথাটা সে বেশীক্ষণ ভাবিতে পারিত না। ভাবিতে গেলেই আসন্ন বিচ্ছেদের মস্ত বড় বেদনা একেবারে পাহাড়ের প্রকাণ্ড পাথরের মত গড়াইয়া বুকের উপর চাপিয়া বসে! তার নিশ্বাসও তাহাতে বন্ধ হইয়া আসে!

কিন্তু এ-সব উদ্যোগ সত্ত্বেও প্রফুল্ল আই-এস্-সি পাশ করিল—শুধুই পাশ করিল না, এবারে সে ফার্ষ্ট হইল! যেদিন খবর বাহির হইল, উমার সেদিন কি আনন্দ! তখনি দোকান হইতে মিষ্টান্ন আনাইয়া গ্রামের [illegible] মায়ের মন্দিরে শীর্ণী পূজা পাঠাইয়া দিল; দুই-চারি ব্রাহ্মণ-বাড়ীতেও আম-সন্দেশ পাঠাইয়া দিল, ঠাকুরপো পাশের প্রণামী বলিয়া।

পাড়ার সকলে আসিয়া দুই ভাইয়ের কাছে আন[ন্দ] প্রকাশ করিয়া গেল। শরৎ একান্তে একটা নিশ্বাস ফেলি[য়া] ভাবিল, ভাগ্যে সে নিজের পড়া ত্যাগ করিয়াছিল, [ত]া না হইলে আজ এমন নিশ্চিন্ত মনে প্রফুল্ল কি পড়াশু[না] করিতে পারিত! তাই তো সংসারের সর্ব্বরকম দুশ্চিন্[তা] হইতে ভাইকে সে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল।

সংসারে বাহিরে দুইটা পথ গিয়াছে—একটি সরস্বতী কমল-বনের দিকে, মরালীর মতই শুভ্র মসৃণ কোমল— আর-একটি ঐ লোকের ভিড়ে ভরা হাট-বাজারের বিকি কিনির কলরবের বুক চিরিয়া। এ পথটায় নিজে ঢুকিয়া ভাইকে সেই কমল-বনের পথেই ছাড়িয়া রাখিয়াছিল বলিয়া দিয়াছিল,—ঐ পথ ধরিয়া চলো তুমি। আশে পাশে ফিরিয়া চাহিতে গিয়া মনকে ভারাকুল করি[য়া] কাজ নাই, ভাই!

আজ প্রফুল্লর কৃতিত্বে তার এ দুশ্চর তপস্যা সার্থক বলিয়া শরতের মনে হইল। কিন্তু না, এখনো না— চলো, চলো প্রফুল্ল—ঐ পথে আরো আগাইয়া চলো! সারা বাঙলা দেশ তোমার চলার ভঙ্গী দেখিয়া [মুখ] তুলিয়া তোমার পানে শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে চাহিয়া থাকুক!

সত্যই যখন কাগজে কাগজে এ খবর ছাপা হই[য়া] গেল যে প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত পরীক্ষায় নম্বর যা পাইয়াছে সে একেবারে ইউনিভার্সিটির রেকর্ড ছাড়াইয়া—অর্থা[ৎ] সে শুধু সব-চেয়ে উপরেই যায় নাই, নম্বর এত বেশী পাইয়াছে যে, তেমন নম্বরে ঘেঁষ দিতে কেহ কোনদি[ন] পারে নাই, তখন মার কথা ভাবিয়া শরতের বুক হা-হু করিয়া উঠিল।

এইবার বাড়ীতে মস্ত সমস্যা উঠিল, তাকে বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে হইবে—এই কথায়!

উমা বলিল,—মন তোমায় শিবপুরে পাঠাতে চায় না ঠাকুরপো! এই পড়াই এমনি তুমি করে যাও ভাই এখান থেকেই যাওয়া-আসা করবে।

প্রফুল্ল হাসিয়া কহিল,—কিন্তু বৌদি, এঞ্জিনিয়ারিংয়ে দিকেই যে আমার ঝোঁক বরাবর।

উমা বলিল,—আমাদের জন্য সে ঝোঁক ত্যাগ করো

প্রফুল্ল কহিল,—তার পর?

উমা কহিল,—তার পর আবার কি!

প্রফুল্ল কহিল,—এ ঝোঁক কি শুধুই ঝোঁক, বৌদি এদিকে বি, এস্ সি পড়বো, তার পরে এম, এস, সি আ[র] আইন, অর্থাৎ মামলার শামলা এঁটে গাছতলায় ফ্যা-ফ্যা করে বেড়ানো তো! ডাক্তারি? তুমি তো জানোই

লোকের রোগ দেখলে আমি কেমন মুষড়ে ভেবড়ে যাই! ওদিকে আমার ঝোঁকও নেই! তাছাড়া মাষ্টারী, প্রোফেসরী,—এ-সবে মুরুব্বির জোর চাই। আর এঞ্জিনিয়ারিংএ গেলে আমার চাকরির ভাবনা থাকবে না। সেধে তারা চাকরি দেবে—এ পথে মোটে ভিড় নেই! তারপর দাদাও যে চিরকাল চাকরি করবে এই মাইনেয়, তার কি মানে আছে! দুই ভাইয়ে কণ্ট্রাক্‌টারী করবো—বেশ হবে, না?

উমা বলিল—হ্যাঁ, যাও। সে কবে কি হবে, তার হিসেব চাইনে আমি। ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হয়ে থাকবে কি করে? তোমার দাদা তো আপিস থেকে এসেই ডাকেন, ফুলু! ফুলুও অমনি শত কাজ ফলে 'দাদা' বলে ছোটো! দুই ভাইয়ে কত কথা, কত গল্প হয়। তোমার সঙ্গে কথা না কইলে ওঁর জিরুনো হয় না! আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে রান্নাবান্না করি। তুমি চলে গেলে উনি পাগল হয়ে যাবেন, কথা কইতে না পেয়ে!…তাছাড়া মাছের কাঁটা বেছে দেবে কে সেখানে? আজো যে কাঁটা বেছে মাছ খেতে শিখলে না, ভাই! তুমি যদি শিবপুরে গিয়ে থাকো, তাহলে আমাকেও সেখানে গিয়ে থাকতে হবে যে! হাসিয়া শরতের দিকে চাহিয়া উমা বলিল,—কি বলো গো? তোমার খোকা ভাইটির সঙ্গে আমাকেও তাহলে শিবপুরে পাঠাচ্ছ তো?

শরৎ কোন কথা বলিল না। ভাবী বিচ্ছেদের চিন্তায় তার মন কেমন মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়িয়াছিল; এ সব কথা-সঙ্গে ঠিক সে সাড়া দিতে পারিল না।

প্রফুল্ল বলিল,—দাদা তাহলে কি বলো? শিবপুরে দরখাস্ত দেবো, না, এমনি পড়ে যাবো?

তাও কি হয়! নিজের এই অদর্শনের কষ্ট? সে কষ্ট এত-বড় কখনো হইতে পারে না যে তার জন্য প্রফুল্লর ভবিষ্যতের দ্বার চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া যাইবে! শরৎ বলিল,—না ফুলু, তোমার যে-লাইন সুবিধা মনে করো, সেই লাইনেই তুমি যাবে, এ কাজে কারো কোন আপত্তি থাকতে পারে না!…তবে এদের কষ্ট হবে—! তা এ-সব সেণ্টিমেণ্ট ধরে কাজের পথে বাধা তোলা ঠিক নয়!

উমা বলিল,—তোমরা পুরুষ মানুষ! সত্যিই তো, আমাদের দুঃখ-কষ্ট কি মনের কথা নিয়ে মাথা ঘামানো ঠিক নয়, আর তার উপর নির্ভর করে নিজের ভালো দেখবে না, সে উচিতও হবে না। আমরা কোন কথা বললেই বা তা শুনবে কেন! আমরা তো চিরকালই অবুঝ!

প্রফুল্ল ভাবিল, এটা অভিমান, না—

সে বলিল,—কোন ভয় নেই, বৌদি! শনিবার-শনিবার বাড়ী আসবো তো। আর শিবপুর কতদূরই বা! উমা বলিল,—তা নয় ভাই। তবে আমাদের ভয় কি হয়, জানো,—আমাদের চোখের আড়ালে তোমরা থাকলে কেবলি ভাবনা হয়, কি কষ্ট হচ্ছে! বুঝি কি অসুখ হলো—এই আর কি!

প্রফুল্ল বলিল,—তুমি তো জানোই, অসুখ হলে তোমার আঁচলের তলাই আমার একমাত্র আশ্রয়!

উমা হাসিয়া বলিল,—অসুখের কথা ছেড়ে দিলুম। সুস্থ শরীরে রাত্রে বেরুবার দরকার পড়লে সেখানে কে দাঁড়াবে ভাই?

প্রফুল্ল বলিল,—রাত্রে বেরুবো না।

এমনি নানা আলোচনায় বিচ্ছেদকে আগে হইতেই চেষ্টা করিয়া বুকের মাঝে উমা থিতাইতে দিল না। রোজই শিবপুরের কথা পাড়িয়া তার মনে এমন একটা ধারণাও জন্মিয়া গেল যে শিবপুর দূরে নয়,—কাছে—যেন ষ্টেশনের কাছে ঐ হাটতলাটা পার হইলেই সেখানে পৌঁছানো যায়!

৬

প্রফুল্লর শিবপুরে যাইবার দিন ক্রমে আগাইয়া আসিল। আগের রাত্রি হইতেই নিদ্রা ছাড়িয়া গোপনে কাঁদিয়া চোখ মুছিয়া উমা তার দুই চোখ এমন রাঙা করিয়া তুলিল যে, তার দুই চোখে যেন দুই জবাফুল ফুটিয়াছে! ঘুম তো হইতেই ছিল না—তার উপর ভোরের আলো রাত্রির আঁধারের আড়াল ঠেলিয়া একটু উঁকি দিবার চেষ্টা করিতেই উমা ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িল তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুইয়া সে পুকুরে স্নান করিয়া আসিল এবং উনানে আগুন দিয়া পূজার জন্য ছোট একখানি নৈবেদ্য সাজাইতে বসিল।

বঁটি লইয়া সে আথ ছাড়াইতেছিল, আর তার দুই চোখ দিয়া একেবারে বন্যার ফুলন্ত নদী গলিয়া-ঝরিয়া পড়িতেছিল। হাঁটুতে চিবুক রক্ষা করিয়া সে কেবলি কাঁদিতেছিল। যত মনে হইতেছিল, এ শুভদিনেও এমন করিয়া কাঁদিতে আছে কি? ছি! তবু প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও এ কান্নাকে সে কিছুতেই থামাইতে পারিল না।

ঘুম ভাঙ্গিলে বাহিরে আসিয়া প্রফুল্ল দেখে, অত ভোরেই বৌদি স্নান সারিয়া যাত্রার উদ্যোগে লাগিয়া গিয়াছে। হাসিয়া সে বলিল,—আমায় বিদায় করবার জন্য রাত থাকতে আয়োজন সুরু করে দেছ, বৌদি!

এই অলুক্ষণে কথায় উমার বুক একেবারে প্রকাণ্ড হাহাকারে ফাটিয়া পড়িল। দুই চোখে অভিমান আর ভর্ৎসনা ভরিয়া সে প্রফুল্লর পানে চাহিল; কিন্তু সে অভিমান ও ভর্ৎসনার পিছনে অশ্রুর স্তম্ভিত নির্ঝর এমন সুস্পষ্ট প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, প্রফুল্ল বেদনাহত

মনে তার পাশে আসিয়া বসিল এবং কুণ্ঠিত স্বরে বলিল,—কাঁদচো বৌদি!

—সত্যি, আমারো বড্ড মন কেমন করচে। সারা রাত কাল ঘুম হয় নি।···কি করে সেখানে থাকবো, তোমাদের ছেড়ে?

এ কথায় কোথায় গেল উমার মনের অত ধৈর্য্যের কঠিন বাঁধ! তার দুই চোখে জল অমনি ছাপিয়া উঠিল। অশ্রুরোধের প্রবল চেষ্টায় দুই ঠোঁট এমন কাঁপিয়া উঠিল যে, তা দেখিয়া প্রফুল্লর প্রাণ নিমেষে কাতর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

প্রফুল্ল কোন কথা বলিতে পারিল না; উমার পানে চাহিয়া রহিল। উমা আথ রাখিয়া তেমনি নিবিষ্ট মনে পেঁপে ছাড়াইতে উদ্যত হইল।

প্রফুল্ল বৌদির হাত ধরিয়া বলিল,—তোমরা যদি এমন ব্যাকুল হও বৌদি, তাহলে আমার যাওয়া হয় না। আমি যাবো না।...তারপর একটু থামিয়া আবার বলিল, —তুমি কোথায় আমায় বল দেবে,—তা না কাঁদচো! ছি! তুমি যে সব সহ্য করতে পারো বৌদি!···এই যে লোকে বিলেত যাচ্ছে পড়তে, ভাবো দেখি সে কতদূরে— সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে। সেখানে চিঠি যেতে কত দিন সময় লাগে! আর এ শিবপুর ঘরের কাছে! তুমি আমায় কলেজে পাঠিয়েও তাহলে এমনি করে কাঁদবে নাকি!

উমা তবু মুখ তুলিল না। অনেক কষ্টে সে চোখের জলটুকু আটকাইয়া রাখিয়াছিল।

প্রফুল্ল আবার বলিল,—ছি, কাঁদে না। এই তো প্রায়ই আমি বাড়ী আসবো।···একটু শক্ত হও বৌদি। তোমার এ জল-ভরা চোখ দেখে আমি তো সেখানে গিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবো না, কাজে আমার মন লাগবে না!···সত্যি বৌদি, এই তোমার পা ছুঁয়ে বলচি ···বলিয়া সে একেবারে উমার পায়ে হাত দিল। উমা তাড়াতাড়ি পা সরাইয়া লইল।

প্রফুল্ল বলিল,—তোমার পা ছুঁয়ে বলচি, রোজ চিঠি দেবো। আর একটু অসুখ হলেই চলে আসবো—একেবারে তোমার এই কোলের কাছটিতে এসে পড়বো। কেঁদো না, লক্ষ্মী বৌদি···তুমি কাঁদলে আমার যাওয়া হবে না—আমি যাবো না।

উমা অতি-কষ্টে মুখ তুলিয়া চাহিল এবং জোর করিয়া ঠোঁটে হাসি আনিয়া বলিল,—যাও, কাঁদচি আবার কোন্‌খানটায়!

শ্রাবণ-দিনে বৃষ্টির গায়ে রৌদ্রের হিল্লোল পড়িলে তাহা যেমন চোখে মধুর ঠেকে, বৌদির অশ্রুভরা চোখে হাসির আলোও তেমনি শোভায় চিক্‌মিক করিয়া উঠিল, তেমনি মাধুর্য্যের সৃষ্টি হইল! প্রফুল্ল বলিল,—মা কি, তা কখনো জানিনি। তোমার কোলটুকুতে যা আমার জ্ঞান হলো। তোমাদের সুখী করবার জন্য আজ তোমাদের ছেড়ে যেতে চাইছি···দাদা যে এ হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খাটচে—কোন্ সকালে ছুটি খে[য়ে] বেরিয়ে যায়,—সারাদিন হেথা-হোথা ঘুরে কাজ সে[রে] রাত্রে বাড়ী ফেরে···দুজনের চেষ্টায় এ কষ্টেরও কত লাঘব হতে পারে···

উমা হাসিয়া বলিল,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমায় আ[র] লেক্‌চার দিতে হবে না! থামো।···যাও, মুখ-হাত ধো[ও] গে। এক-ফোঁটা ছেলে, উনি এলেন সংসারের কথা কথা কইতে···

প্রফুল্ল হাসিল; হাসিয়া উমার পায়ে টিপ্ করি[য়া] প্রণাম করিয়া বলিল,—ঠিকই তো,—উনি আদ্যিকালে[র] বদ্দিবুড়ী···বুড়ী বাসুকির মত সংসারটা পিঠে চাপি[য়ে] নড়চেন-চড়চেন, ওদিকে আর কারো এগোবার সা[ধ্যি] আছে!···আমি কচি খোকা,—আর তুমি ঐ শোলে[র] মুড়ী চাঁদের বুড়ী—না?

এমনি হাস্য-কৌতুকের ঝাপ্‌টায় উমার মনে মধ্যকার বিচ্ছেদের মেঘ সরিয়া গেলেও এ কথা কাঁটার মত বুকে বিঁধিতেছিল যে,—এই হাসি, এই খে[লা] —এ আর কতটুকু সময়ের জন্যই বা! এ-সবগুলা কুড়াই[য়া] লইয়া প্রফুল্ল একটু-পরেই চলিয়া যাইবে···আর এই [শূন্য] ঘরে একা সে পড়িয়া থাকিবে, অতীতের স্মৃতির স্তূপে[র] তার বেদনা প্রাণকে একেবারে ছেঁচিয়া কুটিয়া [...] করিয়া দিবে যে!

ওধারে প্রভাতের আলো পাখা মেলিয়া বাড়ীর আঙি[-] নায় আসিয়া ঝরিয়া পড়িল—চারিদিক এক নবীন ছ[ন্দে] ভরিয়া উঠিল—সান্ত্বনার একটা তরঙ্গও ভাসিয়া আসিল।·

শরৎ ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিল,—কি হচ্ছে তোমাদের?

দুই জনেই চাহিয়া দেখে, শরতের মুখে একরাশ মে[ঘ] জমাট বাঁধিয়া স্তব্ধ দাঁড়াইয়া আছে। প্রফুল্লর বুক ব্যথা[য়] টন্ টন্ করিয়া উঠিল। এই ঘরে আমোদের কি মেল[া] সাজাইয়া সকলে বসিয়া ছিল, তার মাঝখান হইতে [সে] আজ সরিয়া দূরে চলিয়া যাইতেছে! তার বিচ্ছেদ ও-দুটী প্রাণীর বুকে খুবই বাজিবে···আর তার বুক? কথাট[া] মনে হইতে প্রফুল্লর বুক ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল। কিন্তু সে পুরুষ মানুষ—বসিয়া এ-সব দুঃখগুলাকে বাড়িতে দিলে চলিবে না তো! এগুলাকে সরাইয়া চাপা দিয়া সংসারের ক্ষেত্রে খালি বাধা ঠেলিয়া বীরের মত তাকে চলিতে হইবে।

তার পর যথাসময়ে যাত্রার ক্ষণও আসিল। উমা ভাবিতেছিল, এই ক্ষণটাকে যদি তার প্রাণ দিয়াও সে ঠেকাইয়া দূরে রাখিতে পারিত!···কিন্তু সে অসম্ভব!

উমা শরতের কাছে বায়না লইল, সে ষ্টেশন অবধি গিয়া ঠাকুরপোকে বিদায় দিয়া আসিবে। শরৎ বলিল,—অবুঝ হয়ো না, উমা! তোমার এখন গাড়ীতে চড়া ঠিক হবে না!···

উমা চুপ করিল। ঠিক! বুকে তার নূতন অতিথির পায়ের পরশ বাজিতেছে—সে যে মা হইতে চলিয়াছে। আর দু'দিন বাদে সর্ব্বংসহা মা-বসুমতীর মতই ধৈর্য্যশীলা হইবে সে! তার জীবনে এখন হইতেই ত্যাগের বাঁশী বাজিতে সুরু করিয়াছে! নিজেকে বিসর্জ্জন দিয়া কেবলি এখন অপরের মুখ চাহিয়া অপরের জন্যই এ জীবন-তরীখানি তাকে বাহিয়া চলিতে হইবে। কি চাঁদনী-রাতে, কি ঝড়ের দোলায়, সংসারের এই ভরা নদীতে কোনমতে উজানে তাকে চলিতে হইবে! নিজের পানে চাহিবার মুহূর্ত্তগুলা সব শেষ হইয়া আসিতেছে!

একান্তে গিয়া সে চোখ মুছিল। তার পর বিদায়ের হুড়াহুড়ি···শরৎ ছোট ভাইটির জন্য নূতন বিছানা-পত্র তৈয়ার করাইয়াছিল—প্রফুল্লর পোষাক-পরিচ্ছদ কিনিয়া আনিয়াছিল। নিজের সেই সব মোট-ঘাট গাড়ীতে উঠাইয়া প্রফুল্ল আসিয়া ডাকিল,—বৌদি···তার স্বর গাঢ়!

উমা তখন মঙ্গল-ঘট আর বটের ডাল দেখাইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল,—প্রণাম করো ভাই।

প্রফুল্ল প্রণাম করিলে উমা তার ললাটে দইয়ের ফোঁটা আঁকিয়া দিল ও কতকগুলা শুকনো ফুলের পাপড়ি আর বিল্বপত্র মাথায় ছোঁয়াইয়া সেগুলা তার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল,—বাবা-ঠাকুরের ফুল, বুকপকেটে রাখো। সাবধান, পায়ে না পড়ে!

তারপর বন্যার জল যেমন এক-নিমেষে বাড়িয়া উঠিয়া তীরের যা-কিছু খড়-কুটা সমস্ত ভাসাইয়া সরিয়া যায়, তেমনি এই বিদায়ের ক্ষণটা এক-নিমেষে জাগিয়া উঠিয়া এ-ঘরে উমার একমাত্র শান্তি আর সুখটুকুকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। উমা প্রথমটা স্তম্ভিত মূর্চ্ছিতের মত দোরের কপাটে মুখ বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; দাঁড়াইয়া দেখিল, মাথায় মোট চাপানো ভাড়াটে গাড়ীখানা পিছনে এক-রাশ ধূলা উড়াইয়া ধীরে ধীরে মোড় বাঁকিতেছে··· গাড়ীটা চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হইল। উমা দুই চোখে আঁচল চাপিয়া একেবারে আসিয়া ঘরের মেঝেয় লুটাইয়া পড়িল।

৭

সময়ে সকলি সয়। তা যদি না হইত তো আদরের পুত্রকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিয়া মা কি সংসারে টিঁকিয়া থাকিতেন, না, অপর ছেলেরা মাকে পাইত, মানুষ হইত! উমাও ক্রমে এই বিচ্ছেদের বেদনা গায়ে সহিয়া লইল!

সকাল-বেলাটা শরতের জন্য কাজ-কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়া কাটিবার পর স্বামী বাহির হইয়া গেলে সমস্ত দিনটার কথা পাহাড়ের মত ভারী বোঝা হইয়া তার বুকের উপর চাপিয়া বসিত। এই সময়টায় সে অস্থির থাকিত··· কাজে মন লাগিত না,—আকুল চোখে ঘরের চারিধারে চাহিত···মনে হইত, ঠাকুরপোর হাসির বিদ্যুৎ আবার কবে এ ঘরে আলোর ফিনিক্ ফুটাইবে? কবে? সে কবে?

শেষে সে ভাবিল, সত্যই তো—পুরুষ-মানুষ উহারা, জীবন-পথে চিরদিনের জন্যই তো ছুটিতে থাকিবে! বাহিরের প্রকাণ্ড পৃথিবী সর্ব্বক্ষণই যে উহাদের চাহিতেছে! আর সে? নারী মাত্র। একান্তে বসিয়া তাদের ফেরার পথ চাহিয়া ঘর-গৃহস্থালী সাজাইয়া রাখিবে —কর্ম্মশ্রান্ত পুরুষ গৃহে ফিরিলে কথা দিয়া হাসি দিয়া তাদের সে শ্রান্তি ঘুচাইবার ভার নারীর। সে যদি কাঁদিতেই থাকে, তবে এ কাজগুলা করিবে কে? পুরুষ শ্রান্ত হইয়া ফিরিলে কি দিয়া নারী তার শ্রান্তি দূর করিবে? তার জন্যও নিজেকে প্রস্তুত রাখা চাই তো!

সারা দুপুর বেলা বসিয়া সে নবীন অতিথির অভ্যর্থনার জন্য ঘর সাজাইতে লাগিল। পৃথিবীর বুকে নামিয়া তার চাই শয্যা, তার চাই কত আসবাব— সেগুলা ঠিক করিয়া রাখিতে সে মনঃসংযোগ করিল।

তার পর প্রথম শনিবার আসিয়া যেদিন প্রভাতে চোখ মেলিয়া চাহিল, উমার প্রাণের ধৈর্য্য সেদিন আর বাঁধ মানে না! কখন ঐ পূবের সূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িবে, কখন্ তার এ স্নিগ্ধ আলো তীব্র হইয়া ফুটিয়া আবার মলিন হইয়া পৃথিবী ঢাকিবে, সন্ধ্যা আসিবে···

অপরাহ্ণে হঠাৎ একখানা গাড়ী আসিয়া দ্বারে থামিল এবং বাহিরে প্রফুল্লর ডাক শুনা গেল,—বৌদি···

এত শীঘ্র···সূর্য্য যে এখনো মাঝ-গগন ছাড়িয়া পশ্চিমে ঢলিয়া পড়ে নাই! সে কাঁথা সেলাই করিতেছিল—তাড়াতাড়ি উঠিয়া হাতের কাজগুলা তালগোল পাকাইয়া ঠেলিয়া রাখিয়া আঙ্গিনায় গিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইতেই প্রফুল্লর হাসি-ভরা দুই চোখের সহিত তার চোখের দৃষ্টি মিলিল। এ কয়দিনের বিচ্ছেদে শীর্ণ-মন তার অমনি ফুলের মত দল মেলিয়া কি পূর্ণ শোভায় যে ভরিয়া উঠিল!

তার পর মেঘলা দিনে চপলার ক্ষণিক লীলা···প্রফুল্ল এ ঘরে ঠিক তেমনি বিদ্যুৎ ফুটাইয়া শিবপুরে চলিয়া গেল।

আবার যে-মেঘ সেই মেঘ আসিয়া বাড়ীটার সঙ্গে সঙ্গে উমার মনকে নিবিড় কালিমায় ঘিরিয়া ফেলিল।

এমনি মেঘ আর বিদ্যুতের চমকের মধ্য দিয়া অনেকগুলা দিন কাটিয়া গেল। শেষে একদিন শাঁখের রোলে

এ গৃহে নবীন অতিথির আগমন-বার্ত্তা দিকে দিকে রটিয়া গেল।

উত্তেজনা ও আতঙ্কের মুহূর্ত্তগুলা কাটিলে উমা চোখ মেলিয়া দেখে, তার বুকের কাছে ফুলের কুঁড়ির মত একটি শিশু! আবেগে তার বুক উথলিয়া উঠিল। সে শিশুকে চুম্বন করিল।

সে শনিবারে প্রফুল্ল আসিয়াই প্রথম কথা কহিল এই শিশুকে অভ্যর্থনা করিয়া! কাপড়-চোপড় না ছাড়িয়াই একেবারে গিয়া শিশুকে সে বুকে তুলিয়া লইল এবং চুমায় তার ছোট মুখ ভরাইয়া তাকে কাঁদাইয়া তবে ছাড়িল। উমা হাসি-মুখে বলিল,—মা গো, কি মানুষ হয়েচো তুমি দু'দিন বাইরে গিয়ে! আঁতুড় মানা নেই! ঐ সব জামা-কাপড় পরে একেবারে আঁতুড়ের মধ্যে! যাও, সব খুলে রাখোগে। ক্ষীরির মা কেচে আনবে।

প্রফুল্ল বলিল,—রেখে দাও তোমাদের আঁতুড়! বাড়ীর ছেলে, একজন নতুন অতিথি এসেচে, কত আদরে তাকে অভ্যর্থনা করবো! না, তার বিছানা অস্পৃশ্য, অশুচি! এর চেয়ে শুচি আর কেউ আছে! ডেকে আনো তোমার ঐ আচায্যি ঠাকুরকে কিম্বা টোলের পণ্ডিতকে—মনে ময়লা ভরা! একখানা নামাবলী গায়ে ঝুলিয়ে সব শুচি দেখাচ্ছেন!

উমা বলিল,—থামো বাবু, আঁতুড় মানতে হবে না তোমায়! আর অনর্থক তুমি বামুন-পণ্ডিতদের গাল দিয়ো না।

শিশুর হাতে একখানা গিনি গুঁজিয়া দিয়া প্রফুল্ল বলিল,—এটা ওর হাত থেকে নিয়ে রাখো, বৌদি।

উমা বলিল,—এ কি, শুনি! লৌকিকতা হচ্ছে!···ও, এখন দূরে আছো কি না, কুটুম-মানুষ,—না··· ?

প্রফুল্ল বলিল,—সোনা দিয়ে মুখ দেখতে হয় যে বৌদি ···তাহলে সোনার দৃষ্টি হয়, এও তোমাদের শাস্তরের কথা! এ শাস্তর জানো না, জানো শুধু তার অশুচির খপরটুকু! বটে! এ গিনি আমার স্কলারশিপের টাকায় কেনা! এ ব্যাটা প্রথম টাকা হাতে নিলে স্কলারশিপের। ওকেও স্কলারশিপ পেতে হবে কি না!

উমা বলিল,—সে তোমার ভাইপো, তুমিই জানো! আমি তো দায়ে খালাস। ওর সব ভার তোমারই!

প্রফুল্ল বলিল,—বাড়ীতে একটা ছেলে না থাকলে কি মানায়!···এবার থেকে বাড়ী আসতে আমার আরো চাড় হবে, দেখো।

উমা বলিল,—সে তো ঠিক! আমরা তো বাড়ীর কেউ নই!···বড্ড পুরোনো হয়ে গেছি, না?

প্রফুল্ল বলিল,—তা বৈ কি! তুমি তো তোমার ঘরসংসার নিয়েই আছো। আমি খেলুড়ি পাই কোথায়, বলো তো! এমন একটি খেলুড়ি পেলুম, কেমন খোকা!

* * * *

আরো কয় মাস কাটিবার পর একদিন প্রফুল্ল ব আসিয়া বলিল,—ভারী মজা হয়েচে বৌদি। কলে দেখচি আর নিস্তার নেই। রাজ্যের ঘটক এসে আম এমন জ্বালাতন করে, বলে, মেয়ে দেখতে চলো। দূর করে যত তাড়াই, তত তারা আরো ছেঁকে ধ এমন বেয়াদব যে, গাল দিলেও ছাড়ে না!···

উমা বলিল,—নিজের সম্বন্ধ নিজেই করচো ওখা

প্রফুল্ল বলিল,—ধেৎ, তাই বুঝি!···শোনো না ব্যা —ঘটক গিয়ে ক'দিন ধরে এক ভদ্রলোক এখন যাও আসা করচেন। লোকটির নাম ভূপাল মিত্তি আটশো টাকা মাইনের ডেপুটি। হাওড়ায় কাজ করে তিনি গেজেট দেখে খোঁজ-খপর নিয়ে কলেজে হাজির। তাঁর সে কি সাধ্য-সাধনা! একদিন নেম করেছিলেন, ক্লাশের আর দুটি ছেলের সঙ্গে যেতেই হ গেলুম, তখন তাঁর মতলব বুঝিনি। খাবার পর ন রকমের কথাবার্ত্তা হলো। শেষে এক মেয়েকে এনে হ করে দিলেন। মেয়েটি ডাগর—দেখতেও···তা স বলচি, মন্দ নয়। শেষে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়ে? তখনো তাঁর মতলব বুঝিনি। মেয়ে গা শোনালে—শেষে খাওয়া-দাওয়ার পর বললেন, পছন্দ হয়েচে? আমি তো অবাক! তখন ভদ্রলোক বসলেন, এটিকে তোমার হাতে দিতে চাই। আমি রেগে উঠলুম—বললুম, আমি তো বাড়ীর কর্ত্তা মশায়, আমার দাদা আছেন, তাঁর কাছে যান, তাঁর গিয়ে কথাবার্ত্তা কন্; তিনি যা বলবেন, তিনি করবেন, তাই হবে!···তখন তিনি বললেন,—ব মেয়ে তোমার পছন্দ হোক্, তার পর তাঁর কাছে বৈ কি। আমি একটু ঝেঁজে উঠেই বললুম,—অ পছন্দ পছন্দই নয়। তখন দাদার নাম-ঠিকানা। রাখলেন—বোধ হয় কাল রবিবারে তাঁরা এসে হবেন'খন।

উমা বলিল,—বেশ তো, তোমার যদি পছন্দ বিয়ে হোক্ না বাপু। এতে রাগারাগি করতে কেন? তোমার সব বাড়াবাড়ি!

প্রফুল্ল বলিল,—না বৌদি, এটা আমার ভাল ল না। একটা হাকিমী কাজ করেন, অথচ তাঁর বিবেচনা নেই যে দাদাকে ঠেলে প্রথম কথাবার্ত্তা করতে আসেন আমার সঙ্গে!···আরো দু'দিন নে করেছিল, আমি যাইনি, শরীর খারাপ বলে কাটিয়ে

উমা বলিল,—সে কথা ঠিক!···তবে তাতে বা কি! তুমি কাছে আছো, তাই তোমার কাছে গে

চারীর কন্যা-দায়—! তার উপর এমন ছেলে—একটু রীতে যদি হাত-ছাড়া হয়ে যায়···

প্রফুল্ল বলিল,—তা নয়! আসল কথা এর মধ্যে যে, এই-সব বড় লোকগুলো টাকার গরমে সম্পর্ক ল যায়। ভাবে, টাকা-ওলা মানুষ, ছেলেটাকে য়ের চেহারার চটকের বঁড়শীতে যদি গাঁথা যায়, হলে ছেলেও অমনি প্রেমে পড়বে, বলবে, বিয়ে বো! বাড়ীর লোককে ভেড়াতে তখন বেগ পেতে ব না!···এই ছেলে ধরার নীচ ভঙ্গীকেই আমি া করি। এটা ভারী নীচতা! এর একটা গোপন হয় এই যে, আঁট-সাঁট বাড়ীর মধ্যে বিচ্ছেদের তার লিয়ে তাকে তাঁরা আল্‌গা করে দেন্‌।

কথাগুলার অর্থ উমা বুঝিল, বুঝিয়া শিহরিয়া উঠিল। -সাঁট বাড়ীতে তার চালাইয়া তাহাতে ফাট ধরানো! প্রফুল্লর পানে চাহিল। এই ঠাকুরপো যদি আলাদা া যায়, একটা বৌকে উপলক্ষ করিয়া··? তার অসহ্য বেদনায় টাটাইয়া উঠিল—উঃ—না, না, সে হইলে মরিয়া যাইবে, মরিয়া যাইবে, একদণ্ড বাঁচিবে আর স্বামী?···পাগল, তিনি একেবারে পাগল যাইবেন!

পরদিন দুপুরবেলা ভূপাল মিত্র সত্যই সপারিষদ য়া হাজির হইলেন। শরৎকে আগে হইতেই বলা হইয়াছিল। কথাটা শুনিবামাত্র তার বুক-মুহূর্ত্তের জন্য ধ্বক্‌ করিয়া উঠিল! তাকে বাদ দিয়া মই প্রফুল্লকে পাকড়াইতে যাওয়া···এটুকু তার ও ভারী বেমানান্‌ ঠেকিতেছিল!···পরক্ষণে মনে , দোষই বা ইহাতে কি!···বড়কে ঠেলিয়া ছোটর যাওয়া···সে হাসিল। এ কি তার অন্ধ দর্প! য় বড়য় ভেদ যখন নাই, তাছাড়া প্রফুল্লই বিবাহ বে, সে ডাগর হইয়াছে, লেখা-পড়া শিখিয়াছে—র ছন্দ বলিয়াও তো একটা জিনিষ আছে, ···না, এ ঠিক নয়!

পাত্রের বাড়ী-ঘর দেখিয়া ভূপাল মিত্র এ সম্পর্কের টাকে ইহারা যে খুবই কৃপার দান বলিয়া মনে ব, ইহা একেবারেই স্থির করিয়া ফেলিলেন। কথার মুরুব্বিয়ানা বজায় রাখিয়া তিনি শরৎকে বলিলেন, াপনি কি কাজ-কর্ম্ম করেন?

শরৎ খুলিয়া পরিচয় বলিল। ভূপাল মিত্র বলিলেন, আমার মেয়েকে আপনার ভায়ার পছন্দ হয়েচে খন মশায়ের সঙ্গে শেষ কথাবার্ত্তা ক'বার জন্যই । প্রফুল্ল তাই বললে কি না যে, আপনার মত লে বিয়ে হবে না!

কথাগুলা অত্যন্ত বিশ্রী ঠেকিল! পছন্দ-টছন্দ সব গিয়াছে. এখন দর কষা-মাজার জন্যই তাকে একবার জিজ্ঞাসা করা! তার মন বলিল, এ ভাবটা মোটেই ভালো নয়, ভদ্র-গোছও নয়। এ জায়গায় একটা সম্পর্ক গড়া কি ঠিক হইবে!

একজন পারিষদ বলিয়া উঠিল,—মস্ত মুরুব্বি পাবেন, মশায়! সংসারে একটা হিল্লে লাগবে!

কথা শুনিয়া শরতের আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। সে যে-বাপের ছেলে, তাতে পরকে ধরিয়া হিল্লা লাগানোর ইচ্ছাও তার মনে কোনদিন উদয় হয় নাই, হইতে পারে না। সে-মনকে হাতুড়ি পিটিয়া ছেঁচিয়া দিবার শক্তি সে রাখে!···কিন্তু প্রফুল্ল পছন্দ করিয়া আসিয়াছে···! যদি সে ভাবে, দাদা তার জীবনের মস্ত বড় সুখের পথে বাধা দিল!...

ওই অভদ্র কথার উত্তরও কাজেই দেওয়া যায় না! যত বড় অপমান তার মধ্যে থাকুক, তবু এঁরা তার গৃহে অতিথি! কাজেই সে উদ্ধত জবাবকে চাপিয়া ধরিয়া শান্ত স্বরে বলিল,—মেয়ে যদি ওর পছন্দ হয়ে থাকে, তাহলে আর বাধা কি! দিন স্থির করুন।

ভূপাল মিত্র বলিলেন,—আপনি কি চান্‌, সেটা না জানলে···

বাধা দিয়া শরৎ বলিল,—আমি কি চাই!···একটা কড়া জবাব মুখে আসিল; কিন্তু কড়া কথা জীবনে সে কাহাকেও বলে নাই, কোনদিন না, তাই এখানেও বলিল না। একটু থামিয়া সে বলিল,—দেখুন, বিয়ে ব্যাপারটা প্রাণের সম্পর্ক, বাজারের হিসেব কষা নয়। আপনার মেয়ে, আপনার জামাই—আপনি যা করবেন, তাই হবে। আমি তো ভাইকে নিলামে চড়াতে বসিনি।

ভূপাল মিত্র একটু বক্র দৃষ্টিতে পারিষদের পানে চাহিলেন; তারা সে চাহনির ইঙ্গিত বুঝিল। একজন পারিষদ বলিল,—দেখুন, এটি ওঁর মেজো মেয়ে। বড়টির বিয়ে দিয়ে জামাইকে সেক্রেটারিয়েটে ঢুকিয়ে দেছেন। এটির বিয়ে দিয়ে জামাইকে বড় অফিসারও করে দিতে পারেন, ওঁর সে ক্ষমতা আছে। মেয়েগুলি ছাড়া ছেলেও আছে তিনটি—কাজেই পয়সা-কড়ি খুব যে দেবেন, তা নয়। তবে জামাইয়ের হিল্লে লাগিয়ে দেবেনই। সেটা কি কম লাভ মশায়, আজ-কালকার দিনে? তা ছাড়া আপনিও একজন মস্ত মুরুব্বি পাবেন।

তপ্ত রৌদ্রের চেয়ে রৌদ্র-তপ্ত বালির তেজ সত্যই অসহ্য। এ কথাটা যে কতখানি খাঁটি, এই পারিষদের কথার ভঙ্গীতে শরৎ তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিল। তার ঘৃণা হইল। এ কথার সে জবাবও দিল না। সে শুধু বলিল,—দিন ঠিক করুন। তবে হ্যাঁ, ফুলুকে আমি একবার জিজ্ঞাসা করি।

শরৎ গিয়া উমাকে কথাটা খুলিয়া বলিল। উমা প্রফুল্লকে বলিল,—কি জবাব দেওয়া যায়?

একটু ভাবিয়া প্রফুল্ল বলিল,—দাদাকে বলো, আমরা একটু ভেবে-চিন্তে শেষে কথা জানাবো। আস্চে রবিবার নাগাদ খবর পাবেন।

তাহাই হইল। শরৎ গিয়া বলিল, প্রফুল্ল এক সপ্তাহ সময় চায় তার মন জানাইতে।

ভূপাল বাবু বিদায় লইবার জন্ম উঠিলেন। শরৎ বলিল,—একটু জল-টল না খেয়ে…

পারিষদবর্গ বলিল,—উনি যেখানে-সেখানে খান্ না তো…

শরৎ একটু কুণ্ঠিতভাবে বলিল,—এ তো আর যেখানে-সেখানে নয়। ওঁর জামাইয়ের বাড়ী…

ভূপাল মিত্র একটু চিন্তিতভাবে বলিলেন,—তা আপনি আসুন। এখানে খাবো বৈ কি!

দুই-চারিটা মিষ্টান্ন মুখে দিয়া ভূপাল বাবু সপারিষদ গাত্রোত্থান করিলেন।

তাঁরা চলিয়া গেলে শরৎ গম্ভীর হইয়া রহিল। মনের সঙ্গে ব্যাপারটাকে কিছুতেই সে খাপ খাওয়াইতে পারিতেছিল না।…এই আড়-আড় ছাড়-ছাড় ভাব, বাহিরের লোকের এই-সব কথাবার্তা…এগুলা এমন কর্কশ ঠেকিতেছিল…এই যে দুই ভাই মিলিয়া সংসার-টিকে ভরিয়া রাখিয়াছে…ইহারা ইহার মধ্যে সেই দুই ভাইকে আলাদা করিয়া ভাবে কি বলিয়া? দুইজনে মিলিয়া এখানে যে এক…প্রফুল্ল পছন্দ করিয়াছে! শরতের মনে হইল, প্রফুল্ল এ কথাগুলা শুনিলে এখনি উহাদের উপর চটিয়া যাইবে!…কিন্তু এ কথাগুলা তাকে বলা ঠিক হইবে কি!…এগুলা হয়তো ওঁরা কালের গতিক বুঝিয়াই বলিয়াছেন! সে হয়তো মন হইতে তার এমনি বিশ্রী অর্থ গড়িয়া লইতেছে! না, এ কথা প্রফুল্লকে বলা যায় না! বেচারা ভাবিবে, দাদাকে উহারা মনের মত মানে নাই, বা গুছাইয়া দাদার সঙ্গে তেমন করিয়া কথা কহিতে পারে নাই, তাই দাদা যা-তা ভাবিয়া উহাদের প্রতি অবিচার করিতেছে! সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, এ-সব ছোট কথাও মনে স্থান পায়! আশ্চর্য্য! সেগুলাকে পা দিয়া সে মাড়াইয়া ধরিল।

উমা ওদিকে ঠাকুরপোকে লইয়া ক্ষেপাইয়া তুলিয়া-ছিল। প্রফুল্ল বিছানায় শুইয়া ছিল। উমা বলিল,—বলো না ঠাকুরপো, মেয়েটি দেখতে কেমন? তার নামটি কি বললে…আহা কি যে,—বেশ নামটি, ভুলে যাচ্ছি। বলো না ভাই…

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া প্রফুল্ল বলিল,—সিন্ধুবালা।

উমা বলিল,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সিন্ধুবালা।…তুমি থাকো কোন্ সিন্ধু-পারে ওগো বিদেশিনী!

প্রফুল্ল বলিল,—বা বৌদি, তুমি এখন রবিবাবুর গান শিখচো বুঝি! একলাটি থাকো…ভারী সুবিধে হয়ে না? গাও না বৌদি, গাও লক্ষীটি…

উমা একেবারে লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল; অপ্রতি-ভাবে বলিল,—হ্যাঁ, তাই বৈ কি! আমি গান গা-কে বললে!

প্রফুল্ল বলিল,—যেটা বললে, ওটা তো গান, র-বাবুর লেখা।

উমা বলিল,—লেখা নয়, কে বলচে? পড়ি…ত মনে আছে। ও সব বই আমায় কে এনে দেছে মশাই আপনিই না? তবে…?

প্রফুল্ল বলিল,—বেশ তো, আমি এনেছি, স্বীক করি। কিন্তু আরো বই তো এনেচি। সেগুলো ছে-ওখানিই পড়া হয় কেবল…কেমন!

উমা বলিল,—তা বাবু যাই বলো, রবিবাবুর লে-পড়ে আর কারো লেখা পড়তেও ইচ্ছা করে না একেবারে মনের ভিতরকার কত লুকোনো কথাই তিনি জানেন, আর কি নিখুঁৎ করেই যে বলেন… ওঁর লেখার কাছে অন্য লোকের লেখা কেমন গো-বোঁচা-মত ঠেকে।

হাসিয়া প্রফুল্ল বলিল,—বাঃ, তুমি একজন ম-লিটারারী ক্রিটিক হয়ে উঠেচো যে!

উমার মুখখানা আবার লজ্জার উচ্ছ্বাসে র-হইল। সে বলিল,—কি, কি বললে?

প্রফুল্ল বলিল—সাহিত্যের সমালোচক হয়ে… তুমি…মস্ত সমালোচক…তাই বলচি।

উমা বলিল,—তাই ভালো! আমি ভাবলুম কি-কি গাল দিলে মুখ্যু মানুষ বলে…

প্রফুল্ল চুপ করিল। তার মন তখন উধাও হই-ছুটিয়াছিল, সেই হাবড়ায় বড় রাস্তার ধারে সেই বাড়ীটার সজ্জিত বাহিরের ঘরে। বই-ভরা বড় আলমারি, চেয়ার, টেবিল কৌচ সাজানো! সে গি-বন্ধুদের সঙ্গে সেখানে বসিল। নানা আলোচনার ম-দিয়া চায়ের পেয়ালা আসিল, তার পর রূপে বিদ্-ফুটাইয়া সরমে নত-মুখী বালিকা আসিয়া পেয়ালায় ঢালিয়া দিল। তার পানে চোখ পড়িতেই প্রফুল্লর চোখ একেবারে সজাগ হইয়া উঠিল! বারবার তাকে সে দেখিতে চায়! জোর করিয়া চোখের সে উদ্দাম গ-সে ফিরাইতে গিয়াছিল, তবু কি তাকে বশে অ-যায়!…সন্ধ্যার বিচিত্র বর্ণরাগে বালিকার মুখখ-ফুলের মত ফুটিয়া যেন ঢলঢল করিতেছিল! কৃষ্ণপল্ল-তলায় তার দুই চোখ কি চঞ্চলতায় না কাঁপিয়া কাঁপি-উঠিতেছিল…! তার পর সে নিজের হাতে পেয়-আনিয়া প্রফুল্লর হাতে দিল। লজ্জায় প্রফুল্লর হ-কাঁপিয়া খানিকটা গরম চা গায়ে পড়িল, খানিকটা

াপড়েও ছিটকাইয়া গিয়া লাগিল। প্রফুল্ল অপ্রতিভ ইল—সে কিন্তু বেশ হেলার ভরেই এত বড় অপরাধকে ুচ্ছ করিয়াই এক কোণে গিয়া বসিল। তার পর···নাম :নিল, সিন্ধুবালা। প্রফুল্লর প্রাণ অমনি সে স্বরে িন্ধুর কি তরঙ্গোচ্ছ্বাসেই না কানায়-কানায় ভরিয়া ঠিল! তার মনের তটে সিন্ধুর কল্লোলভরা উচ্ছ্বাসের াকলী আসিয়া মিশিল···জীবনে সে এক পরম মুহূর্ত্ত··· া মুহূর্ত্ত একেবারে তার সমস্ত অতীতকে যেন ঢাকিয়া য়াছে!

সেই সন্ধ্যার কথাগুলা, তারি স্নিগ্ধ স্মৃতি—ফুলিয়া াপিয়া প্রফুল্লর মনকে এমন ছাইয়া ধরিল যে, মনের তরটা কাঁপিয়া অসহ্য উল্লাসে অপূর্ব্ব মাদকতায় দুলিয়া ঠল! সে তখন উমাকে ধরিয়া সেই সন্ধ্যার বিচিত্র াহিনী খুলিয়া বলিল। বলিবার সময় কল্পনার তুলি য়া তাতে প্রাণের রঙ মিলাইয়া এমন একখানি রঙীন বি সে গড়িয়া তুলিল যে ছবিটার লতায়-পাতায়, সমস্ত- া প্রেম-বিহ্বলতা ভারী জ্বলজ্বলে হইয়া ফুটিয়া উঠিল।

উমা বলিল,—বেশ ভাই, এই মেয়েটিকেই চাই! গল্পের মত তোমাদের দেখাশোনা—যেন বইয়ের তায় পড়চি তোমাদের এই প্রেমের কথা!

৮

বিবাহ হইয়া গেল। বধূ আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিলে া একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। তাকে সে কোথায় খবে, কি দিবে···কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল । নিজের গহনাগুলা সব খুলিয়া বধূর গায়ে পরাইয়া া, বাপের দেওয়া টাকা হইতে ভাল পার্সী শাড়ী সে ৎকে দিয়া কিনিয়া আনাইয়াছিল। বৌ-ভাতের দিন ই কাপড়-খানি সিন্ধুকে পরাইয়া দিয়া তাকে টানিয়া কবারে ঠাকুরপোর কাছে আনিয়া হাজির করিল, এবং ুর মুখের ঘোমটা খুলিয়া প্রফুল্লকে দেখাইয়া বলিল— :খো দিকি মুখ! অনেক তপস্যা করেছিলে ভাই, তাই লক্ষ্মীর হাতের মালা গলায় দিতে পেরেচো!···লক্ষ্মী কবারে যেন তাঁর কমল-বন থেকে উঠে এসেচেন! রূপ, কি শ্রী···চোখ চেয়ে ছাখো একবার!

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল,—তুমি একেবারে পাগল হয়ে ল যে! এ দুদিন আমাদের পানে চেয়েও ছাখনি··· া সিন্ধু, আর সিন্ধু!

উমা বলিল,—ঠিকই তো! বেচারী একলাটি ছিলুম া তো চোখে ছাখওনি বাবু! এখন দোসর মিলেছে, :বানে কেমন থাকবো!···নাই বা দেখলে!

হাসিয়া প্রফুল্ল বলিল,—আমরা ভেসে যাবো এবার ট···

উমা বলিল,—ভেসে নয় ভাই, ভেসে নয়···সিন্ধুর কাছে তুমি বিন্দুটি—কাজেই তলিয়ে গেছ। কথাটা বলিয়া উমা হাসিয়া উঠিল, বলিল,—সিন্ধু, শুনচো ভাই··· ঠাকুরপো এবার কেমন শিবপুরে থাকে, দেখবো! এঁর মায়ায় ঘরের কোণ ছাড়া দায় হবে।

যেদিন বৌ-ভাত, সেইদিনই ফুলশয্যা! রাত্রে বর ও বধূকে শয্যায় পাঠাইয়া উমা আপনাকে বড় একা বলিয়া অনুভব করিল। পাড়ার মেয়েরা তাকে টানিয়া বধূর ঘরের পাশে আনিয়া দাঁড় করাইল, আড়ি পাতিতে হইবে! এই মধু-যামিনীর স্মৃতি সকলের মনে এমন কুহক বিস্তার করিয়া আছে যে, সকলের প্রাণেই একসঙ্গে কোন্ হারানো বসন্তের পুষ্প-গন্ধ, কুহু-তান এক নিমেষে জাগিয়া শুষ্ক নীরস প্রাণগুলাকে মধুময় পুষ্পময় করিয়া তুলিয়াছিল। উমারও কৌতূহল জাগিল, ইহাদের প্রথম মিলন-রাত্রি কি স্বপ্নের মধ্য দিয়াই না জাগিয়া উঠিবে! সে স্বপ্ন, সে কুহক কেমন করিয়া দুইজনের চিত্তে পরশ বুলাইয়া যাইবে···নিজের হাতে গড়া ঠাকুরপো, আর ঐ তার খেলার পুতুল সিন্ধু···এ মিলন-সুধার একটু ঝলক পান করিবার জন্য তার প্রাণ অ কুল অধীর হইয়া উঠিল। পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে সে [illegible] ায়া দ্বারের কাছে কাণ পাতিল।

বোসেদের বাড়ীর মালতী জ [illegible] ার ছোট্ট ফাঁকে দুই চোখ পাতিয়া তার দৃষ্টিটাকে গলাইয়া আলোর ধারার মত ঘরের মধ্যে প্রেরণ করিয়া দিল···

প্রফুল্ল খাটে বসিয়াছিল—সিন্ধুকে বুকের উপর টানিয়া। মৃদু স্বরে সে কি বলিতেছিল। আর সিন্ধু···? সে তো প্রেমের রঙ্গে মৃদু-তরঙ্গ-ভঙ্গে তাহ বুকে লুটাইয়া পড়িতেছে না—ঝড়ের দোলায় ও যে সিন্ধুর রুদ্র তরঙ্গোচ্ছ্বাস! সে কেমন ঝাঁকিয়া উঠিতেছিল।

চারিধার ক্রমে স্তব্ধ হইয়া আসিল। প্রফুল্লর স্বর কাণে শুনা গেল। সে বলিল,—বৌদির কাছে থাকবে ওঁর ছায়া হয়ে···আমি শনিবার শনিবার আসবো···

সিন্ধু ঝাঁজিয়া জবাব দিল,—হ্যাঁ, বয়ে গেছে আমার এখানে থাকতে! মা গো, না আছে আলো, না আছে কিছু। সন্ধ্যা হলে শেয়ালের ডাকে বুক কেঁপে ওঠে! তাছাড়া ঐ পচা পুকুরে চান করা, গা ধোওঁয়া··· তাহলে আমায় আর বাঁচতে হবে না···

প্রফুল্লর আশা-ভরা হাসি-ভরা মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল। সে বলিল,—আমরা থাকতে পারি এখানে···

সিন্ধু বলিল,—থাকো গে যাও···

প্রফুল্ল বলিল,—বৌদি তোমায় ভালোবাসে এত··· নিজের গা থেকে সব গহনা খুলে তোমায় দেছে··· নিজের বলে কিছু রাখেনি···

সিন্ধু মুখ বাঁকাইয়া বলিল,—আমি তো চাইতে যাইনি! আর তোমার বৌদির ভালোবাসার চোটে প্রাণ

আমার যায়-যায় হয়ে উঠেচে। বুড়ো মাগী আমি, কেবল চুমু আর চুমু—ভারী অসভ্য!

এ কথাটা উমার বুকে যেন ধারালো ছুরি বসাইয়া দিল। তার বুক ছিঁড়িয়া রক্তের ফোয়ারা ছুটিল। মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল···চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী একেবারে ঝাপ্‌সা অস্পষ্ট হইয়া আসিল। সে দ্বারের পাশ হইতে সরিয়া গেল; সরিয়া মেঝেয় বসিয়া পড়িল। মালতী, ট্যাপা, টগর, তারাও থ হইয়া তাকে ঘিরিয়া বসিল।

টগর বলিল,—মা গো, নতুন বৌয়ের মুখে কথা শোনো একবার!

ট্যাপা বলিল,—যেন চড়বড় করে খই ফুটচে। বড় জা, নিজের সর্ব্বস্ব দিয়ে দিলে, তা ঐ ভাবে নেওয়া!

মালতী বলিল,—হোক্ বাপু বড় লোকের মেয়ে, হাকিমের মেয়ে—বড় লোক তো আরো আছে···কত কত জমিদারের মেয়েও দেখলুম। ঐ সাগর-দার বৌ···অত বড় জমিদারের মেয়ে···তা মুখে কথাটি নেই, একেবারে মাটীর পুতুল!···এ কি বৌ, বাবা! পাড়া-গাঁ,—এখানে শেয়াল ডাকলে ওঁর বুক কাঁপে···কনে-বৌ, তার মুখে কথা শোনো!

উমা কোন কথা বলিল না। তার মুখে কে যেন নীল রঙ মাখাইয়া দিয়াছে! মুখ একেবারে বিবর্ণ। এ সব মন্তব্য মাঝে মাঝে তার প্রাণে গিয়া বিঁধিতেছিল। কথা-গুলা বড় বিশ্রী—কিন্তু এর প্রতিবাদ করাও চলে না।···মনে হইল, এ কি হইয়া গেল! এ কি সত্যই সে ও কথাগুলা শুনিয়াছে, না, এগুলা দুঃস্বপ্ন?···কেন সে আড়ি পাতিতে গিয়াছিল? তাহা হইলে এত বড় যে আশার কুঞ্জটিকে ফুলে ফুলে সাজাইয়া তুলিয়াছে, সে-কুঞ্জ তো আর ঐ কঠিন কথার প্রচণ্ড আঘাতে এমন হুড়মুড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িত না!·· আকাশের পানে উদাস নেত্র মেলিয়া সে চাহিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে শরৎ আসিয়া ডাকিল,— উমা, শোবে এসো···

উমার চমক ভাঙ্গিল। সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চাহিয়া দেখে, পাড়ার মেয়েরা চলিয়া গিয়াছে। তার হাত-পা কাঁপিতেছিল; সে পড়িয়া যাইতেছিল, শরৎ তাকে ধরিয়া বলিল,—তোমার মুখ বড্ড শুকনো, দেখচি। সারাদিন খাটুনি···তুমি কিছু খাওনি বুঝি?

স্বামীর বাহুর আশ্রয় পাইয়া উমা যেন বর্ত্তাইয়া গেল। নিজেকে এমন অসহায় এমন দুর্ব্বল মনে হইতেছিল...

শরৎ আবার বলিল,—তুমি খাওনি কি?

উমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

শরৎ বলিল,—সে কি, উমা! এসো, আমার ঘরে তোমার খাবার নিয়ে। এমনি করে পৃথিবী-পদ্ম কর তুমি, তবেই হয়েচে!

উমা বলিল,—খাবার ইচ্ছে মোটে নেই···

শরৎ বলিল,—তাও কি হয়! কিছু মুখে দেবে এসো···কাল তো আবার রণাঙ্গনে নামবে!

উমা মৃদু হাসিল, হাসিয়া বলিল,—আমি বুঝি রণ-রঙ্গিনী...

শরৎ হাসিয়া তার গালটা টিপিয়া দিয়া বলিল,—সব সময় নয়! এখন তুমি আমার বক্ষ-পিঞ্জরে বিহঙ্গিনী বন্দিনী···

উমা বলিল,—এই যে, তুমিও কথা জানো, দেখচি

শরৎ উমাকে লইয়া নিজের শয়ন-কক্ষে আসিল নিজের হাতে একটা পাতে তার জন্য কিছু মিষ্টান্ন তুলিয়া উমার সামনে ধরিয়া বলিল,—খাও···

এ সোহাগ, এ আদর পাইয়া উমা বিহ্বল হইয়া উঠিল। কিসের দুঃখ তার,···এমন প্রাণ-ঢালা ভালো বাসা যখন তার সম্বল আছে, সহায় আছে, তখন ও-সব ছোট্ট কথা ছোট ব্যাপারগুলাকে যদি তুচ্ছ করিয়া সে উড়াইয়া দিতে না পারে, তবে তো তার এ নারী জন্মেই ধিক্!

রাত্রের এই কথা লইয়া সেদিন পুকুর-ঘাটে মজলিস বসিয়াছিল। ট্যাপা মালতী—এই সব রিপোর্টারের মুখে রিপোর্ট শুনিয়া বর্ষীয়সী জুরির দল রায় দিলেন, উমা বৌটা সং—এমন করিয়া নিজের সর্ব্বস্ব ঐ হাকিমের মেয়ের হাতে তুলিয়া দেয়!···যেমন ঘর, তেমনি ঘর হইতে বৌ আনিলেই ভালো হইত···এ হাকিমের মেয়ে, আইন-বাজ···চুল চিরিয়া বিষয় ভাগ করিবে···দত্তদের সংসারে এই যে ফাট ধরিল, এ ফাট বাড়িয়া একদিন দুই ভাইয়ের মধ্যে যে সাগর-প্রমাণ ব্যবধান গড়িয়া তুলিবে, ভবিষ্যতের সে ব্যাপারের আভাস যেন তাঁরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন!

৯

যথাকালে সিন্ধু গিয়া পিত্রালয়ে উঠিল। তার পরেই যে ব্যাপার উমা ও শরতের মনে প্রচণ্ড আঘাত হানিল, সেটা এই প্রফুল্লর শনিবারে এখানে আসা লইয়া। শুক্রবার প্রফুল্লর চিঠি আসিল বৌদির কাছে। সে লিখিয়াছে,—

বৌদি,

এ শনিবারে বাড়ী যাওয়া ঘটিবে না। হাবড়া হইতে ওঁরা ভারী পীড়াপীড়ি করিতেছেন, ওখানে যাইতেই হইবে। কি যে করি—কিছুতেই হঠাইতে পারিতেছি না! দাদাকে বলিয়ো, তিনি যেন অনুমতি দেন। পরের শনিবারে নিশ্চয় বাড়ী যাইব এবং তোমাকে এ শনিবারে আমি

আগাগোড়া রিপোর্ট দিব। কেমন? আমার প্রণাম লইয়ো, দাদাকে জানাইয়ো। ইতি স্নেহের ঠাকুরপো।

ছোট্ট চিঠি—কোথাও কোন প্যাঁচ নাই, গোল নাই। তবু উমার বুকে পাথরের মত এই চিঠিখানা প্রচণ্ড আঘাত দিল। তার মনে হইল, সিন্ধুর বাবার উচিত ছিল, এজন্য শরৎকে চিঠি লেখা! তা না করিয়া জামাইকে ধরিয়া কাজ সারা···এ একেবারে নূতন কাণ্ড! বাঙালীর ঘরে এমন তো ঘটে না! মাথার উপর বড় ভাই রহিয়াছে, তাকে ঠেলিয়া জামাইকে সব ব্যাপারে কর্ত্তা বলিয়া মানা...এ কি ঠিক?

নিজের কথা মনে পড়িল। বিবাহের পর যে কয়দিন বাপের কাছে ছিল, তার মাঝে শরৎ শ্বশুর-বাড়ী গিয়াছিল, দুই-চারিবার। তার বাপ আসিয়া শাশুড়ীর কাছে মিনতি জানাইয়া তবে শরৎকে নিজের কাছে লইয়া গিয়াছিলেন· জামাইকে চিঠি লিখিয়া কাজ সারেন নাই! আরো পাঁচ বাড়ীতে সে এমনি দেখিয়াছে!

রাত্রে শরৎ বাড়ী আসিলে উমা প্রফুল্লর চিঠি দেখাইল। শরৎ চিঠি পড়িলে উমা বলিল,—তাকে অনুমতি দেবে জেনে এর জবাব আমিই আগে লিখে ডাকে দিয়েচি। আমার দোষ হয়েছে?

শরৎ কোন জবাব দিল না। সে স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। এ চিঠির কথায় দোষের কিছু নাই···এক তরুণ প্রাণ, তরুণীর আহ্বানে ছুটিয়া চলিয়াছে···এইটুকু! কিন্তু তার পিছনটায় শরতের নজর পড়িল। এই পিছনে নিয়তির একটা ক্রূর খেলা চলিয়াছে, তার চক্র এমন বিপুল বিক্রমে নিঃশব্দে ঘুরিয়া চলিয়াছে যে তার তলায় শরতের প্রাণটা পাক্ খাইয়া চূর হইয়া যাইতেছে!

তাহাকে স্তব্ধ দেখিয়া উমা বলিল,—ঠাকুরপোর শ্বশুরের উচিত ছিল এজন্য তোমায় লেখা! চিঠি··· জানে না···

এ কথাটা উমাও ধরিয়া ফেলিয়াছে! তার দুর্ব্বল চিত্তে যে ঈর্ষার আগুন জাগিয়াছে···শরৎ ভাবিল, ঈর্ষাই তো! তাকে না মানিয়া এই সব কাণ্ড চলিয়াছে···তার জন্য এ তো ঈর্ষাই তার! এ ভাবটার অন্য কোনো নাম দেওয়া যায় না, অন্য অর্থও তো খাপ খায় না! ছি!

ধিক্কারে লজ্জায় শরতের মন ভরিয়া উঠিল। দুই হাতে মনের গলা টিপিয়া শরৎ বলিল—খবর্দ্দার! তুমি না বয়সে বড়, তুমি না দাদা! বড় গাছেই ঝড় লাগে। বড় গাছকে অনেক সহিতে হয়—নহিলে বড় বলিয়া তার কিসের বড়াই!

উমা বলিল,—ঠাকুরপোও বলতে পারতো, দাদাকে এ-সম্বন্ধে চিঠি লিখবেন। কথাটা বলিয়াই তার মমতা হইল। তার অতি-স্নেহের ঠাকুরপো, ছোট ভাইটি··· যাকে উমা নিজের বুক দিয়া মানুষ করিয়াছে—তার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগও মন আজ তুলিতে চায়! তাড়াতাড়ি সামলাইয়া লইয়া উমা বলিল,—ঠাকুরপো ছেলেমানুষ, এ-সব জানে না, তার ঘাড়ে বরাত চাপানো ঠিক হয় নি!

নিজের মনের কালো ছায়াটা পাছে জমাট বাঁধিয়া ওঠে, এই ভয়ে শরৎ শিহরিয়া উঠিল। দুই হাতে সে-ছায়াকে ঠেলিয়া দিয়া শরৎ বলিল,—এতে আর কি হয়েচে? সে কাছে আছে! তুচ্ছ ব্যাপার! এর জন্য আবার আমায় কি লিখবে! তাই···

কথাটা বাধিয়া গেল। প্রচণ্ড অভিমান আসিয়া মুখ চাপিয়া ধরিল।

উমা বলিল,—যাক্। ছেলেমানুষ···কিন্তু সিন্ধুকে শীগ্‌গির এখানে আনাতে হবে বাবু, নেহাৎ তো কচি মেয়ে নয়! আমারও একলা থাকা ঘোচে। তাছাড়া সিন্ধু এখানে থাকলে ঠাকুরপোরও বাড়ী আসার কামাই হবে না···

শরৎ বলিল,—তাঁরা পাঠাবেন কি, এই বড় ভয় হয়, উমা। বড়লোকের মেয়ে···

উমা বলিল,—বড়লোকের মেয়েরা বুঝি শ্বশুর-ঘর করে না! তোমাদের ঐ কেমন কথা!

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই উমার মনে পড়িল, সে-রাত্রের কথা! নারীর জীবনের পুরুষের জীবনের সেই কাম্য মধু-যামিনী, সেই বাঞ্ছিত রজনী···পৃথিবী যেদিন তার কাজ-কর্ম্ম সরাইয়া, ভিড় সরাইয়া শুধু আলো হাসি আর গানের আবরণে দু'খানি তরুণ চিত্তকে ঢাকিয়া একেবারে পাশাপাশি আনিয়া দেয়, সেই মধুময় রজনীর সেই চরম মুহূর্ত্তে আলো-হাসি-গানের সে বিচিত্র আবরণ ঠেলিয়া দি· যে মনের ঝাঁজ প্রকাশ করিয়াছিল···

উমার বুক টন্‌টনিয়া উঠিল—তার বুকে বড় বেদনা বাজিয়াছিল। সে বেদনা আজো সে কিছুতে ভুলিতে পারে নাই! আড়ি পাতা লইয়া ঠাকুরপোকে কত পরিহাস করিবে ভাবিয়াছিল,—কিন্তু পরের দিন সকালে ঠাকুরপোর হাসি-ভরা মুখের পরিবর্ত্তে যে-মুখ দেখিয়াছিল, তা দেখিয়া সে সম্বন্ধে কোন কথাই উমার মুখে ফুটিতে পারে নাই! নিবিড় মেঘে-ভরা মলিন মুখ!

শরৎ বলিল,—সাতকড়ি কাকা এখানে বিয়ে দিতে গোড়াতেই মানা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই হাকিমগুলো বেশীর ভাগই বিদেশে-বিদেশে চাকরিতে ঘুরে বেড়ায়, লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা কম করে, তাদের চাকরির মান বজায় রাখতে। সে জন্য বেশীর ভাগ লোকই কেমন আত্মগর্ব্বে হয়ে ওঠে! তাই মনে হয়···

উমা আকুল চোখে স্বামীর পানে চাহিল, বলিল,—কেন তবে মত করলে?

শরৎ বলিল,—আমারো তেমন মত ছিল না…

অনুযোগ-ভরা স্বরে উমা বলিল,—তবে—?

শরৎ বলিল,—ফুলুর যে খুব পছন্দ ছিল, উমা…

ঠিক! এই মেয়েটির কথা বলিতে গিয়া ঠাকুরপোর দুই চোখে হাসির কি লীলাই ফুটিত! সে একেবারে বিভোর উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিত, আর-সব ভুলিয়া যাইত, তার বিহ্বল উচ্ছ্বসিত স্বরে শুধু এক- উদ্দাম আকর্ষণের বেগ ঝরিয়া পড়িত…উমাই কি তাহা লক্ষ্য করে নাই? কিন্তু…

হায় রে, এই কিন্তুই এ জগতে যত বিশৃঙ্খলা, যত জঞ্জালের সৃষ্টি করিয়া তোলে! ভগবান যদি এই কিন্তু-টার সৃষ্টি করিয়া বিশ্বে তাকে না পাঠাইতেন!

শরৎ উঠিয়া গেল। উমা সেইখানেই বসিয়া রহিল! এই শুক্রবারের রাত্রিটা হইতেই সে তার ছড়ানো ভাঙ্গা মনটা লইয়া আবার তাকে গুছাইতে বসিত! কাল ঠাকুরপো আসিবে—আজ বাদে কাল এ ঘরে, এই নির্জ্জন নিরানন্দ পুরীতে আবার আনন্দের বিচিত্র ছন্দ ফুটিবে!…কাল শনিবার এই প্রথম এ পুরী শূন্য থাকিয়া যাইবে!

এর পরের শনিবারও প্রফুল্ল আসিল না। কোন খবর নাই। উমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তার কি হইল, কেন আসিল না? কোন অসুখ করিল কি? ঠাকুরপো কেন আসিল না? অনেক রাত্রে ট্রেণের সকল সম্ভাবনা যখন লুপ্ত হইয়া গেল, তখন উমা আসিয়া ঘরে ঢুকিল। শরৎ কাগজ-পত্র লইয়া অফিসের কি হিসাব-নিকাশ করিতেছিল। উমা আসিয়া সেই মাদুরের একপাশে বসিয়া বলিল,—একটা খপর নিলে না গা? ঠাকুরপো কেন এলো না?

অশ্রুর সাগর তার বুক ফাটিয়া ঠেলিয়া দুই চোখে আসিয়া দেখা দিল।

শরৎ কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়া বলিল,—কেন ভাবচো? হয়তো তার শ্বশুর-বাড়ীতে তাকে ধরে নিয়ে গেছে…

উমা ক্ষণেক স্তব্ধ রহিল। এ কথাটা তার বুকেও যে তীরের মত বিঁধিতেছিল! নূতন শ্বশুর-বাড়ী যাইয়া তার সেই ঠাকুরপো ঘর ভুলিল, বৌদিকেও ভুলিয়া গেল,—যে বৌদি তার তিলেক অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া ওঠে! ওগো, না, না, সে শ্বশুর-বাড়ী যায় নাই! যদি গিয়া থাকে, তবু তুমিও ঐ নির্ম্মম সত্য কথাটা বলিয়া উমার মনে আরো আঘাত দিয়ো না। তুমি মিথ্যা স্তোক দিয়াও তার মনের এ-চিন্তাটাকে চাপিয়া দাও, চাপিয়া দাও!

উমা কোন কথা বলিল না; তার দুই চোখে দর দর ধারে অশ্রুর ধারা নামিল।

এমন সময় খোকা কাঁদিয়া উঠিল। শরৎ বলিল,—দ্যাখো গে উমা, খোকা কাঁদচে।

উমা উঠিয়া বিছানায় গেল। খোকাকে বুকে টানিয়া আদর করিয়া তাকে ভুলাইতে বসিল। অল্প চাপড়াইতেই কান্না থামাইয়া খোকা ঘুমাইয়া পড়িল। উমাও তার পাশে তখন শুইয়া পড়িল—ঘুম, এসো ঘুম! সে ঘুমাইতে চায়। ঘুমের সাগরে মনকে ডুবাইয়া সে এই সব বেদনা-কষ্টের হাত হইতে তাকে রক্ষা করিতে চায়! জাগিয়া থাকিলেই ঐ চিন্তা নানা মূর্ত্তিতে সামনে আসিয়া দাঁড়ায়—হাতে তাদের লোহার ডাণ্ডা—নির্ম্মম ভাবে উমার মনে তারা প্রহার করে! উমা সে আঘাত আর সহিতে পারে না গো!

রবিবার সকালে প্রফুল্ল আসিয়া দেখা দিল। উমা উনানে রান্না চাপাইয়া মনকে অজানা সেই হাবড়ার বাড়ীতে প্রেরণ করিয়াছিল! সিন্ধুর সেই ঝাঁজালো দৃষ্টি তার সামনে ঠাকুরপো মিনতির সুর তুলিয়া দাঁড়াইয়া! এমন সময় চোরের মত ধীর পায়ে নিঃশব্দে প্রফুল্ল আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া মৃদু স্বরে ডাকিল,—বৌদি…

উমার দেহ উত্তেজনায় কাঁপিয়া উঠিল! ফিরিয়া সে চাহিয়া দেখে, ঠাকুরপোই! ঠাকুরপোর দুই চোখে অপরাধীর দৃষ্টি—তাহাতে মার্জ্জনার মিনতি একেবারে ভরিয়া আছে!

প্রফুল্ল বলিল,—দাদা কোথায়?

উমা বলিল,—ওপাড়ায় গেছেন। [illegible]দের বাড়ীতে তারা ডেকে নিয়ে গেছে, তাদের কোথায় বাগান আছে—ওঁর আপিসের গাছ-গাছড়ার জন্য বিক্রি করতে চায় তারা…

প্রফুল্ল বলিল,—যাক্, দাদার সামনে দাঁড়াতে ভয় হচ্ছিল।

—ভয়! উমা বলিল,—ভয় কিসের জন্য ঠাকুরপো?

প্রফুল্ল বলিল,—কাল আসিনি বলে। তার পর একটু থামিয়া সে আবার বলিল,—কাল আসবো বলে বেরুচ্ছি, এমন সময় শ্বশুরের বড় ছেলে গিয়ে হাজির। শ্বশুরের কে মামা এসেচেন, আমায় দেখতে চান…দেখেন নি। তিনি আবার সেই রাত্রেই চলে যাবেন। আমি যাবে না, তারাও ছাড়বে না—ভারী মিনতি সুরু করলে আমি কত বললুম যে, আর-শনিবারে বাড়ী যাইনি… তা বল্লে, তাঁরা বড় দুঃখ করবেন, আশা করে আছেন…! তাই কি করি, ওদের ওখানে যেতে হলো …তবে আজ ভোর হতেই পালিয়েচি…

উমা কোন কথা বলিল না—তার মনে আর সে উচ্ছ্বাস নাই। কালিকার আঘাতে মন এমন জর্জ্জরিত ছিল যে এখনো যেন সে ঝিমাইয়া রহিয়াছে।

উমা বলিল,—বেশ, কাপড়-চোপড় ছাড়ো। আ

তোমার রান্না চাপিয়ে দি। তোমার জন্য কোন আয়োজনই করিনি তো!...ক্ষীরির মাকে পাঠাই, মাছের চেষ্টা দেখুক।

প্রফুল্ল সে কথা কাণে না তুলিয়াই বলিল,—দাদা কিছু বলেচেন?

উমা বলিল,—আমার ভাবনা হয়েছিল, বুঝি, কোন অসুখ করেচে। ওঁকে বললুম, খপর নিতে। তা উনি বললেন, অসুখ হলে খপর দিত! বোধ হয়, তার শ্বশুর-বাড়ীতে তাকে ধরে নিয়ে গেছে!

ছি! ছি! কথাটা প্রফুল্লর কাণে অত্যন্ত বিশ্রী ঠেকিল। দাদা ভাবিয়াছেন, শ্বশুর-বাড়ীতে তরুণী প্রিয়ার জন্য প্রাণ তার এমন অধীর আকুল হইয়া উঠিয়াছিল যে বাড়ীর কথা মনেও ছিল না! ছি, দাদার সামনে সে এখন মুখ দেখাইবে কি করিয়া? বৌ তার দুই দিনে এত বড় হইয়া উঠিয়াছে, মনে তার এমন বিস্তারিত আসন পাতিয়া বসিয়া গিয়াছে যে,দাদা-বৌদি দুইজনকেই সে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে!...তার চেয়ে তার অসুখ হইল না কেন? তাহা হইলে সে কেমন হাসি-মুখে আসিয়া দেখা দিয়া দাদার সে চিন্তাকে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিত!

উমা বলিল,—ওঠো, কাপড়-চোপড় ছাড়ো।

প্রফুল্ল বলিল,—যাই।

প্রফুল্লর মুখের অপ্রতিভ ভাব উমার চোখে পড়িল। তারি একটু আনন্দ হইল। ঠাকুরপো তবে মন হইতে তাদের দূর করিয়া দেয় নাই!

উমা বলিল,—যাও, মুখ-হাত ধুয়ে তৈরী হয়ে নাও —আমিও চান করে এসে কিছু আনাজ কুটি। কুটতে-কুটতে তোমাদের গল্প শুনবো।

প্রফুল্লর উদ্বেগের ভাব এ কথায় কাটিয়া গেল। সে মুখ-হাত ধুইতে গেল। তার পর মুখ-হাত ধুইয়া খোকাকে বুকে তুলিয়া লইয়া বৌদি যেখানে বসিয়া আনাজ কুটিতেছিল, সেইখানে গিয়া বসিল; এবং সলজ্জ হাসির ছটার মধ্য দিয়া তাদের তরুণ চিত্তের অমর কাহিনী পাড়িয়া বসিল!

সে যেন আগাগোড়া স্বপ্ন! আরব-রজনীর এক মদির-বিহ্বল কাহিনীর মতই স্বপ্নে রচা! মাদকতার সুরে ভরা যেন সে এক গানের কলি! তার কোথাও বাহিরের ছোপ লাগে নাই! পাখীর গান, চাঁদের জ্যোৎস্না, আর বসন্তের গন্ধে-বর্ণে ভরপুর। বাহিরের কোলাহল তাকে ঘা দিতে পারে না, কর্ম্ম-চক্রের বেসুরো ধ্বনি তার মাঝে একটুও প্রবেশ করে না, পৃথিবীর যত কিছু দুশ্চিন্তা তার পাশ দিয়া চলিতে পারে না! সে যেন কবির কাব্য-গ্রন্থের একটা সজীব পৃষ্ঠা—তেমনি গানের উচ্ছ্বাসে ভরা, তেমনি নানা-রঙে রঙীন্! তাকে ছোঁয়া যায় না, তাকে দেখা যায় না—পুষ্প-গন্ধের মত সে শুধু একটা অনুভূতি!

শুনিতে শুনিতে উমার মনে হইল, সে যেন ছবি দেখিতেছে, নানা রঙের নানা ফুলে ভরা বিচিত্র কুঞ্জ—সে কুঞ্জের গাছে গাছে পাতায় পাতায় কেবলি রঙের খেলা! তারি ফাঁকে ফাঁকে নানা পাখী সুরের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছে! আর সেই কুঞ্জের মাঝখানে ফুলের শয্যায় বসিয়া সিন্ধু! ফুলের রাণী সাজিয়া সে বসিয়া আছে! এই অবধি আসিয়া কল্পনা খা খাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। এ তো সিন্ধুর সঙ্গে মেলে না! আর, ও কি, সিন্ধুর চোখে ও তো হাসি নয়—একটা তীব্র স্ফুলিঙ্গ আগুনের শিখার মত দপ্ দপ্ করিতেছে! তার সেই ফুলশয্যার রাত্রির বাস্তব ছবিখানা মনে ফুটিয়া কুঞ্জের ছবিটুকুকে একেবারে ঢাকিয়া মুছিয়া দিল!

সে প্রফুল্লর পানে চাহিল,—তার মুখে-চোখে তখন কি দীপ্তিই ফুটিয়াছে! প্রফুল্ল সমস্ত বাহিরের চিন্তা বিলুপ্ত করিয়া তার প্রেমের বিচিত্র কাহিনী বলিয়া চলিয়াছে! যেমন তার রঙীন ছন্দ, তেমনি তার রঙীন সুর। উমা একটা নিশ্বাস ফেলিল। তার দুঃখ হইল, হায়রে, সে-রাত্রির কথাটুকু যদি সে ভুলিতে পারিত! সে ভগবানকে ডাকিল, বল দাও ঠাকুর, সে রাত্রির কথা আমায় জোর করিয়া ভুলাইয়া দাও! মনকে আমার এমন আঁধার স্তূপে আর ফেলিয়া রাখিয়ো না!

১০

খাওয়া-দাওয়ার পরে প্রফুল্ল নিজের ঘরে বিছানায় শুইয়া রবীন্দ্রনাথের কাব্য পড়িতেছিল। কাব্যের বিচিত্র ভাব ও ছন্দ সেই হাওড়ার এক [illegible] গৃহের এক তরুণীকে কেন্দ্র করিয়া এমনি থরে থরে পদ্মের পাপড়ির মত ভরিয়া উঠিতেছিল, যে কাব্য পড়িয়া এমন আনন্দ সে জীবনে আর কখনো উপভোগ করে নাই!

সে পড়িতেছিল—

ঐ জানালার কাছে বসে আছে
করতলে রাখি মাথা—

ঠিক! সে যেদিন কলেজের পর বৈকালে ঐ পথে বেড়াইতে গিয়াছিল—আগে হইতে চিঠি লিখিয়া দিয়াছিল, ওধারে বৈকালে যাইবে! তার প্রতীক্ষায় কি অধীর মন লইয়া সিন্ধু জানালায় বসিয়া ছিল—মোড় বাঁকিতেই প্রফুল্ল চোখ তুলিয়া দেখে, জানালায় বসিয়া সিন্ধু! তাকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া উঠিয়া গিয়া সে জানালার কপাটের আড়ালে দাঁড়াইল। তার মুখে হাসির বিদ্যুৎ-ছটা! বইয়ের পাতায় ছাপানো নানা ছন্দের এই লীলার আড়ালে সিন্ধু এমন নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল যে প্রফুল্ল তার কাপড়ের খস্ খস্,

হাতের চুড়ির ঠিন্‌ঠিনি সঙ্গীত-রব স্পষ্ট কাণে শুনিতে-ছিল। তার কেশের গন্ধ বাতাসকে মদির করিয়া তুলিয়াছে, তার পায়ের চুট্‌কির ঝিন্‌ঝিনি রাগিণীটুকু অবধি আকাশ ভরাইয়া দিয়াছে! তার এই তরুণ প্রাণে নব প্রেমের ইন্দ্রজাল ব্যাধের বাঁশীর-সুরে লুব্ধ মৃগের মত মুগ্ধ হইয়া উঠিল। সে স্বপ্নবিহ্বল ভাবে সে-আনন্দ উপভোগ করিতেছিল! প্রাণ তার সিন্ধুর পরশে সরস মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল।

সহসা বৌদি আসিয়া কাছে বসিল; বলিল,—ভাব-সাব কেমন হলো ঠাকুরপো?

প্রফুল্ল সে কথায় উদ্বেল হইয়া উঠিল। এক-গাছ শিউলি ফুল একটু বাতাসের দোলা পাইলে যেমন ঝরিয়া পড়ে, বৌদির দরদের পরশ পাইয়া প্রফুল্লর মনের মাঝে সিন্ধুর প্রেমের যে নানা কথা বিচিত্র ফুলের বর্ণে-গন্ধে দীপ্ত মাদকতায় ফুটিয়া ছিল, সেগুলাও তেমনি দোলা পাইয়া এক-নিমেষে ঝরিয়া পড়িল! উমা লক্ষ্য করিল, সে সব কাহিনী বলিতে প্রফুল্লর দুই চোখ এমন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, তেমন আলো সে-দুই চোখে পূর্ব্বে সে আর কখনো দেখে নাই।

গল্প শুনিয়া উমা বলিল,—আমি ভাই, সিন্ধুকে দু'দুখানা চিঠি লিখলুম, সে তার জবাব দিলে না কেন, বলো দিকি?

প্রফুল্লর স্নিগ্ধ হাসি-ভরা মনটায় অমনি একখণ্ড কালো মেঘ আসিয়া তার সে শুভ্রতা কতক ঢাকিয়া দিল। সে বলিল,—ঠিকানা ভুল হয় নি তো?

উমা বলিল,—বা, ভুল কেন হবে! তুমি লিখে দিয়ে গেছ— বাবু ভূপালচন্দ্র মিত্র, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, হাওড়া—তাই দেখে লিখেচি। ভুল অমনি হলেই হলো!

প্রফুল্লর মুখে আর কথা সরিল না। বৌদির সঙ্গেও সে ছলনা করিতে বসিয়াছে! হায় রে, এক স্ত্রীই তার এমন সর্ব্বস্ব হইয়া দাঁড়াইল যে তার জন্ম যে বৌদির স্নেহের সুধায় সে বড় হইয়াছে, ঐ স্ত্রীকে পাইয়াছে, সেই বৌদিকেই সে কথার চাতুরীতে আজ ভুলাইতে চায়! তার মনে পড়িল, সিন্ধু বলিয়াছিল, উমা তাকে চিঠি দিয়াছে—কিন্তু তার কি জবাবই বা সে দিবে! শ্বশুর-বাড়ীতে জাকে চিঠি লিখিতেছে, লোকে এখনি তামাসা করিবে! তা ছাড়া ভাব-সাব তেমন নাই; লিখিবারও যখন কিছু নাই, তখন অনর্থক এ ফ্যাসাদ বাধানো কেন! কিন্তু সে কথা বৌদিকে খুলিয়া বলিতে তার বাধিতেছিল! সিন্ধুর সম্বন্ধে বৌদি কি ভাবিয়া বসিবে! তা ছাড়া বৌদির প্রাণে আঘাত লাগিতে পারে, অভিমানও যে না জাগিবে, এমন বলা যায় না! কথাটা তো ভালো নয়!

বৌদি বলিল,—আমার বড় কষ্ট হয়েছে, ভাই তাকে অত করে লিখলুম, একটু জবাব দিলো…

প্রফুল্ল আর গোপন না করিয়া তখন আধখা কথাই খুলিয়া বলিল,—বুঝেচি বৌদি…তার লজ্জা করে,—সে বলছিল!

উমা বলিল,—বরকে লিখতে লজ্জা করে না? বৌ সে আপন-লোক বলে,—না? কথাটা বলিয়া উ নিজেই জিভ্ কাটিল! ছি, ছি, এ কি কথা বলিতে সে! সেই ফুলশয্যার রাত্রি সে-কথা শুনিয়া যে-অভিমা তার মনে জাগিয়াছিল, এ যে তারই পাল্টা জবাব ছি, সে না বড় জা, বড় বোন্! তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলাইয়া লইয়া উমা বলিল,—তুমি তাকে বলো ভা আমায় যেন চিঠি লেখে! না হলে আমার মনে ভারী ক হয়…একলাটি থাকি…তার চিঠি পেলে সেখানি ত পড়বো, তার জবাব লিখবো—তাতে করে আমার দিনে বেলার নিঃসঙ্গ সময়টুকু অনেক সুখে ভরে উঠবে!

আনন্দের রাগিণীর এই বিচিত্র সুর কেমন কাটি গেল! প্রফুল্ল নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী ভাবিয়া এম কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল! অথচ সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না, এর মধ্যে তার অপরাধ আবার কোন্‌খানে তবু কোথা হইতে কি একটা দুশ্চিন্তা এমন কাঁটার ম মনটাকে বিঁধিতে লাগিল…

উমা বলিল,—তাকে কবে এখানে আন্‌চো বল দিকি …নেহাৎ ছেলে মানুষও তো নয়, ভাই! আমি এর চেয়েও ছোট বয়সে তোমাদের ঘরে এসেছিলুম…

প্রফুল্ল ভারী বিপদে পড়িল। এ কথায় এমন মে মনের উপর ঘনাইয়া আসিল যে, তার চোখের সামনে স্নেহের যে এই উজ্জ্বল আলো আপনার পরিপূর্ণতা জাগিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেটা একেবারে মান নিষ্প্র হইয়া গেল। এ কথায় কত মধুযামিনীর সুখ-কাহিনী মধ্যে গাঁথা বেদনা-জড়ানো কি স্মৃতিই যে মিশিয়া আছে …প্রেমের কূজনে মিলন-রাত্রিগুলা যখন মুখর, বিভো তখন সে তারি মধ্যে এই সব মোটা কথা পাড়ি কি জবাব পাইয়াছিল—সেগুলা তার সজীব কদর্য্য লইয়া চোখের সামনে জাগিয়া উঠিল। সে বসন্তের পুষ্প-বনে কালো কালো দৈত্যের মতই বি ভয়ঙ্কর!

প্রফুল্ল বলিয়াছিল; আমাদের বাড়ী কবে যাবে, ব তো সিন্ধু—সেখানে তোমায় পাবার জন্ম বৌদি পাগল আর এ কথায় সিন্ধু একেবারে মিলনের বাহু-পাশ ঠেলি ছিট্‌কাইয়া সরিয়া গিয়া বলিয়াছিল,—মাগো, সেখা যাচ্ছে কে! আমার বয়ে গেছে, আমি যাবো না…ে পুকুরে চান করা, গা ধোয়া…লোকের সামনে গা খু সাবান মাখা…তাছাড়া পিসীমের সেই মিটমিটে আলো

াগো, কি অন্ধকার যে ভূতের মত সামনে এসে দাঁড়ায় ...আমায় কেটে ফেললেও আমি সেখানে যাবো না...

এ কথায় প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া মন তার মূর্চ্ছিত ইবার মত হইলেও প্রফুল্ল প্রবল শক্তিতে তাকে খাড়া াখিয়া কত মিনতি জানাইয়াছে, তার বিহ্বল প্রাণের রুণ নিবেদন তুলিয়াছে...কিন্তু কিছুতেই তার তরুণী ায়িকার মন সে ফিরাইতে পারে নাই! সে কত ভিমান করিয়াছে,—তবু তার সে অভিমান-বিমুখ ায়িকা-চিত্তকে এতটুকু কায়দা করিতে পারে নাই!... তবার তার মনে হইয়াছে, এমন প্রেমভরা প্রাণে এ বতৃষ্ণাও জন্মিতে পারে!...তার পর নিজের মনের সঙ্গে বস্তর তর্কাতর্কি করিয়া এই বলিয়া সে সান্ত্বনা লাভ রিয়াছে যে, সিন্ধু বয়সে ডাগর হইলে কি হয়, মন তার খনো শিশুর মত—এগুলা নিছক ছেলেমানুষী—প্রাণের ধ্যে এদের শিকড় গজাইয়া উঠে নাই! এ ঐ মুখের থায় তুচ্ছ শ্যাওলার মতই গজাইয়া উঠিয়াছে। এগুলা মেয়ের...একটু বয়স হইলেই এ-সব কথা জড়-সমেত কাইয়া মরিবে! এবং এইভাবে সান্ত্বনা সংগ্রহ করিয়া জেই সাধিয়া ক্ষমা চাহিয়া মিলন-রাত্রির শেষ মুহূর্ত্তগুলা াবার সুখস্বপ্নের বিভোরতায় সে কাটাইয়া শেষ রিয়াছে!

বৌদি আবার বলিল,—তার কি আসবার ইচ্ছা হয় া এখানে?

একটা ঢোক গিলিয়া প্রফুল্ল বলিল,—তার আর কি! াসবে বৈ কি! তবে তার শরীরটা এখন খুব ভালো য় কি না, তাছাড়া একটু গান-বাজনাও শিখচে—এখন া ছেড়ে এলে ও-বিদ্যাটা আর শেখা হবে না!

উমা আর কোন কথা বলিল না। অতি-গোপনে ব বেদনা মন্থর চরণে আসিয়া তার মনের উপর লুটাইয়া াড়িতেছিল, সেটাকে তেমনি নিঃশব্দে আশ্রয় দিয়া উমা ানালার মধ্য দিয়া বাহিরে আকাশের পানে উদাস েত্রের করুণ দৃষ্টি প্রেরণ করিল।

ইহার কিছুদিন পরে এক ঘটনা ঘটিল।

প্রফুল্লর শ্বশুর-বাড়ীতে শ্বশুরের এক নব-কুমারের ন্নপ্রাশন-উপলক্ষে একটা উৎসব ছিল। সেই উৎসবে মন্ত্রণ করিয়া শরতের নামে এক ছাপানো পত্র আসিয়া পস্থিত হইল। শরৎ তখন বাড়ীতে। চিঠি পড়িয়া ন উমার কাছে সে-চিঠি আনিয়া দিল।

চিঠি পড়িয়া উমা শরতের পানে চাহিল। শরৎ ন্যদিকে তাকাইয়া ছিল—অত্যন্ত গম্ভীর তার মুখ! েন কি এক বেদনা মনের উপর জোর করিয়া উঠিয়া াসিতে চায়, আর শরৎ প্রাণপণ বলে তাকে ঠেলিয়া লিতে উদ্যত!

উমা বলিল,—আজ রাত্রেই তো নেমন্তন্ন!...যাচ্ছো?

শরৎ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

উমা বলিল,—যেয়ো। কুটুম-বাড়ী থেকে নেমন্তন্ন করেচে—না গেলে ভালো দেখাবে না।

শরতের রুদ্ধ অভিমান এ-কথায় নিমেষে গর্জ্জিয়া উঠিল। সে বলিল,—তাঁরা আমার মানটা কোথায় রাখলেন, উমা? কুটুম্ব-হিসেবে তাঁর বাড়ীতে এই আমার প্রথম নেমন্তন্ন। তাঁদের উচিত ছিল নাকি,একজন এসে আমায় বলে যাওয়া? আমি গরীব বলেই না! তাঁরা এই ব্যাগার-ঠ্যালা একটা উড়ো চিঠি পাঠিয়ে কাজ সেরে-চেন, আর আমি তাই পেয়ে কৃতার্থ হবার জন্য একটা কুকুরের মত গিয়ে সেখানে দাঁড়াবো?...কথাগুলার সঙ্গে সঙ্গে শরতের দুই চোখের কোলে জল ছাপাইয়া আসিল।

উমা বলিল,—ঠাকুরপোর মনে কষ্ট হবে, তুমি না গেলে...

শরৎ কোন জবাব দিল না। হঠাৎ উঠিয়া অধীর-ভাবে সে পায়চারি করিতে লাগিল। উমা কাঠ হইয়া দ্বারের চৌকাঠের উপর বসিয়া রহিল।

শরৎ বলিল,—তাঁরা মনে করেন, আমাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করে আমাদের একেবারে কৃতার্থ করে দেছেন! কিন্তু তিনিই আমার দোরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, আমি গিয়ে তাঁর দোরে উপযাচক হয়ে দাঁড়াই নি...

উমা সব কথাই বুঝিল। কিন্তু ঠাকুরপো? সে বেচারা কি মনে করিবে! সেও যে একটা চিঠি লিখিয়াছে তাকে...প্রফুল্ল লিখিয়াছে,—

"...সেই জন্যই শনিবারে যেতে পারচি না। তোমা-দেরো ওঁরা আনাবেন। তাহলে হাবড়াতেই দেখা হবে'খন। তোমরা এসো..."

এইটুকু কাজের কথা লেখার পরই নিজের প্রাণের শত সুখ, বিচিত্র আনন্দের কথা সে একেবারে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছে চিঠির ছত্রে...তার চারিখানি পৃষ্ঠা ভরিয়া!

শরৎ আবার বলিল,—আমি যাবো না, উমা...

উমা মিনতি করিয়া বলিল,—তাঁরা যদি এ-সব ব্যাপার না জানেন, জেনে তাঁরা যদি অভদ্রতাই করেন ...তুমিও তাই বলে...

কথাটা উমা শেষ করিতে পারিল না। তার বুকের মধ্যেও বেদনা ঠেলিয়া আসিয়া তার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। অশ্রুরুদ্ধ দুই চোখের অধীর দৃষ্টি লইয়া সে শরতের পানে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ চেষ্টার পরে ঘাড় নাড়িয়া শরৎ বলিল,—বেশ, যাবো আমি।

অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া শরৎ বলিল,—তোমার কথায় গিয়ে অপমান হয়ে এলুম, উমা।

উমা শরতের পানে চাহিল। শরৎ বলিল,—সন্ধ্যার পরই সেখানে গেছলুম। সে গান-বাজনা আমোদ-প্রমোদের কি ধুমই চলেছে! আমি গিয়ে বসলুম,—তা কেউ কথাও কইলে না। তার পর যেই এক দল লোকের ডাক পড়লো, সকলে খেতে গেল—আমি সরে এলুম।

উমা বলিল,—ঠাকুরপোর সঙ্গে দেখা হলো?

শরৎ বলিল,—সে আমায় দেখেনি। আমি দেখেচি তাকে। যেখানে গান-বাজনা হচ্ছিল, সেই ঘরে সে বসে ছিল। শরতের চোখ ছলছল করিয়া উঠিল।

উমা একটু চুপ করিয়া রহিল; তার পর স্বামীর পানে চাহিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—খাওনি, তা ভালোই করেচো! বলিয়া একেবারে শরতের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কাতর কণ্ঠে উমা কহিল,—আমায় মাপ করো। আমার জন্মই তো তুমি গিয়েছিলে! কি করবো? তোমার নাম করে তারা যে দোষ দেবে, এ আমার প্রাণে সহ্য হতো না, তাই তোমায় যেতে বলে-ছিলুম...তার পর আঁচল দিয়া শরতের চোখ মুছাইয়া বলিল,—আর কখনো তোমায় যেতে বলবো না...

তার পর একটু থামিয়া আবার সে বলিল,—কেউ তোমায় দেখতে পায়নি?

শরৎ বলিল,—ফলুর শ্বশুর দেখেছিলেন। তিনি শুধু বললেন, এই যে...ব্যস্! একবার মুখের কথা খসিয়ে বসতেও বললেন না!...শরৎ স্তব্ধ হইল—তার পর অনেকক্ষণ বাদে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—সাতকড়ি কাকা বলেছিলেন, বড় মানুষের সঙ্গে কুটুম্বিতা করে সুখ পাবে না। কুটুম্বিতা হয় সমানে-সমানে...

উমা বলিল,—না বাবু, তা যাই বলো, সবাই অমন নয়।

দুইজনে বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। উমা ভাবিতে-ছিল, সেই ফুলশয্যার রাত্রির কথা। তার পর দু'খানা চিঠি লিখিয়াও সে সিন্ধুর জবাব পায় নাই...এগুলা তো যথেষ্টই বুঝাইয়া দিয়াছে যে, ও-ঘরের শিক্ষাই আলাদা ধরণের!

শরৎ হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—এসো দিকি, কিছু খেতে দেবে। পেট জ্বলে যাচ্ছে...

উমা স্বামীর পানে চাহিল। এই যে মেঘ কাটিয়া গিয়াছে—ও-মুখে আবার সেই হাসির জ্যোৎস্না ফুটি-য়াছে! সেই স্নেহ প্রেম প্রীতির হাওয়া বসন্তের মলয় হাওয়ার মতই ভাসিয়া উঠিয়াছে! স্বামী তাহা হইলে মনটাকে আবার হাল্কা করিয়া ফেলিয়াছেন! আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া উমা তাড়াতাড়ি খাবার আনিতে গেল।

১১

পরের দিন দুপুরবেলা প্রফুল্ল আসিয়া বাড়ীতে উপস্থিত হইল। মুখ তার অভিমানে ভরা। সে আসিয়া নিঃশব্দে নিজের ঘরে ঢুকিল এবং জামা খুলিয়া আল্‌নায় ঝুলাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

সঙ্গে সঙ্গে উমা আসিয়া ঘরে ঢুকিল; বলিল,—এমন চুপি চুপি এসে শুয়ে পড়লে যে?

প্রফুল্ল গম্ভীর স্বরে বলিল,—হুঁ।

উমা বলিল,—শ্বশুর-বাড়ী নেমন্তন্ন খেয়ে পে[ট] এমন ভরে গেছে যে হাসি-কথা সব চাপা পড়ে আছে এখনো?

প্রফুল্ল উমার পানে চাহিয়া বলিল,—কাল তোমরা গেলে না যে? তার স্বরে অনুযোগের সুরও একটু মিশানো ছিল! উমা তাহা লক্ষ্য করিল!

উমা বলিল,—তোমার দাদা তো গেছলেন!

প্রফুল্ল উঠিয়া বসিল, বসিয়া বিস্মিতভাবে বলিল,—গেছলেন?

উমা বলিল,—হ্যাঁ। তোমার শ্বশুরের সঙ্গে তাঁ[র] দেখাও হয়েছিল! যে-ঘরে গান-বাজনা হচ্ছিল, তুমি সেই ঘরে ছিলে...তাই তোমাকে আর ডাকেন নি।... তার পরে চলে আসেন...উনি বাড়ী ফিরলেন, রাত তখন সাড়ে দশটা।

প্রফুল্ল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তবে যে সিন্ধু বলিল, তার শ্বশুরবাড়ীর সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছে যে লোক আসিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া যায় নাই বলিয়াই বুঝি এখান হইতে অভিমান করিয়া কেহ নিমন্ত্রণে যায় নাই! চিঠি পাঠানো হইয়াছে...তাছাড়া হাবড়া হইতে লোক আসা কি সহজ কথা ঐ অজ-পাড়াগাঁয়ে! কেই ব[া] আসিবে? শ্বশুরের কাছারি, সম্বন্ধীরা বয়সে ছোট... তাহাতে সেই বড়-মুখ করিয়া বলিয়াছিল, নাই গে[ল] লোক—চিঠি দিলেই হইবে! দাদা নিশ্চয় আসিবেন ...অথচ দাদা আসিল না বলিয়া তাঁরা যখন কথা তুলিলেন, তখন তাদের কাছে প্রফুল্লর মুখখানা কত ছোট হইয়া গেল! সে-ও ভাবিয়াছিল, দাদার অন্যায় হইয়াছে, মুখ ফুটিয়া একটি জবাব সে তাদের মুখের উপর দিতে পারে নাই...কিন্তু এ কি! দাদা গিয়াছি-লেন, শ্বশুরের সঙ্গে দেখাও হইয়াছিল,—তবু তাঁরা বলি-লেন, কেহ আসে নাই!

উমা বলিল,—কেন, ওখানে কেউ বলেচে না কি যে উনি যান্ নি?

প্রফুল্লর মুখে হঠাৎ কোন কথা জোগাইল না। সে কি ভাবিতেছিল! উমার পানে চাহিয়া বলিল,—না, তা ঠিক নয়। তবে ওঁরা লক্ষ্য করেন নি, তাই অ[মন] কি...

উমা বলিল,—তাই, কি···?

প্রফুল্ল বলিল,—তাই, বলছিলেন, তোমার দাদা এলেন না তো,—লোক যায় নি বলে বুঝি এলেন না? তা এ একটা আমোদের কাজ, এ তো ঠিক সমাজিক ব্যাপার নয়, তাই লোক আসে নি।

উমার বুকটা ধ্বক করিয়া উঠিল। সে বুঝিল, ঠাকুরপো তাদের পক্ষই লইয়াছে—নহিলে এ কথা কখনই মুখে আনিতে পারিত না। তীব্র উচ্ছ্বাসে তাদের সঙ্গে সে তর্ক তুলিত, কেন লোক আসিবে না? আমার দাদার কি মান-ইজ্জৎ নাই যে বড়লোক তু করিয়া ডাকিলেই তিনি ছুটিয়া আসিবেন! মুহূর্ত্তের জন্য স্থির দৃষ্টিতে প্রফুল্লর পানে সে চাহিল, পরে বলিল—ওঁর প্রাণে বড্ড লেগেচে। উনি কাল বলছিলেন, আমরা গরিব, ওঁরা বড় লোক, তাই বুঝি গ্রাহ্য করে দুটো কথাও কেউ কইলেন না!

প্রফুল্লর মুখ সাদা হইয়া গেল। এ কথাটা তার মনেও যে দুই-একবার উদয় হয় নাই, এমন নয়! কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবিয়া দেখিয়াছে, কৈ, তার সঙ্গে ব্যবহারে এই ধনি-গরিবের পার্থক্য তো কোনদিন ফুটিয়া ওঠে নাই! সে তো প্রায়ই সেখানে যায়, অনিমন্ত্রিত ভাবেই যায়,—তার আদর-আপ্যায়নে কোন ত্রুটি, কোন অবহেলা তো কোনদিন সে লক্ষ্য করে নাই! বাড়ীর সকলে তাকে লইয়া একেবারে তন্ময় হইয়া থাকে! একটু সর্দ্দি-কাশী দেখা দিলে শাশুড়ী একেবারে তখনই ডাক্তার ডাকিয়া ঔষধ আনাইয়া তাকে সে-ঔষধ খাওয়াইয়া তবে নিশ্চিন্ত হন্। তাছাড়া সম্বন্ধীরা প্রায়ই তার ওখানে বেড়াইতে যায়, এমন ভাবে প্রাণ খুলিয়া, মন খুলিয়া মেশামেশি···তার কোনখানে ধনের অহঙ্কার একটুও উঁকি দেয় না! তবে···? এ কথা প্রফুল্লর মনেও উঠিল না যে সে জামাই,···তার কথাই আলাদা। তার উপরই মেয়ের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে পূরা মাত্রায়! শ্বশুর-বাড়ীর স্বার্থ সেখানে ষোল আনা।

তবু সমস্ত ব্যাপারগুলা তার মনের মধ্যে এমন ঝড়ের সৃষ্টি করিয়া তুলিল যে যা-কিছু কাব্য সেখানে সঞ্চিত ছিল, সে-সব তার ঝাপ্টায় আহত মূর্চ্ছিত হইয়া লুটাইয়া পড়িল।

বৈকালে দাদার সঙ্গে দেখা হইলে দাদার পানে মুখ তুলিয়া সে চাহিতেও পারিল না, উমাকে বলিল,—আজ সন্ধ্যার সময়ই আমায় যেতে হবে। কাল সকালে আমরা পশ্চিমে যাচ্ছি, কলেজের প্রোফেসরের সঙ্গে।

উমা বলিল,—কদিন থাকবে?

প্রফুল্ল বলিল,—তাঁবু ফেলে বনে-বনে ঘুরতে হবে।

উমা বলিল,—চিঠি লিখো···আমাদের মন সেখানে তোমারি পিছনে পিছনে ঘুরবে ভাই···

প্রফুল্ল বলিল,—চিঠি লিখবো বৈ কি! তবে চিঠি না পেলে ভেবো না। ভালো থাকলে চিঠি লেখা তেমন ঘটে না তো! অসুখ-বিসুখ হলেই মানুষ খপর দেয়। ···চিঠি দেবো, তবে যদি চিঠি না পাও, মন্দ ভেবো না। ভেবো, যে আমি ভালোই আছি, তাই চিঠি দিই নি।

উমা হাসিয়া বলিল,—তুমি তো বলে-কয়ে খালাস। মন কি সে কথায় চুপ করে থাকে, ভাই? সে কেবলি কু গড়ে।···তা যা হোক, ওঁকে বলেছ?

প্রফুল্ল বলিল,—দাদাকে? না বৌদি, তুমি বলোগে —দাদার সামনে দাঁড়াতে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে!

উমা হাসিয়া বলিল,—ও মা, সে আবার কি কথা। কেন, কি করেচো তুমি···

প্রফুল্ল বলিল,—দাদা দেখে [illegible], কাল শ্বশুর-বাড়ীতে গান-বাজনা আমোদ-আহ্[illegible] করচি আমি, অথচ দাদা এলেন কি না, তার খোঁজও [illegible]ম না!

উমা বলিল,—তাতে লজ্জা কি[illegible] শ্বশুর-বাড়ী গেছ —নতুন জামাই, তুমি তো চোরে[illegible] সেখানে বসেই থাকবে! তুমি আবার সব অভ্য[illegible] করে বেড়াবে না কি?

প্রফুল্ল এ কথায় খোঁচা অনুভব [illegible]। সে উমার পানে চাহিল, উমার মুখে-চোখে হাসি[illegible] জ্বল করিতেছে! সে বলিল,—না, [illegible] নয়। [illegible] কি জানি, কেমন···

উমা আবার হাসিয়া বলিল,—[illegible] গো, বেশ, আমিই বলচি গিয়ে—

উমার মুখে এ সংবাদ শুনিয়া শরৎ আসিয়া বলিল, —কালই যাচ্ছ? তোমাদের যেতে হয় বটে, শুনেছি! তা কোথায় যাচ্ছ?

প্রফুল্ল বলিল,—পুরুলিয়া অবধি যাবো। কাল মাঝামাঝি একটা জায়গায় আস্তানা পাতবো—তবে কোথায়, সেটা কলেজে গিয়ে জানতে পারবো!

শরৎ বলিল,—সাজ-সরঞ্জাম সব আছে তো? বিদেশ যাচ্ছ···

প্রফুল্ল বলিল,—হ্যাঁ, শ্বশুর মশায় একটা হোল্‌ড-অল্ দিয়েছেন সেদিন···

শরৎ একটু স্তব্ধ হইল। শুর দিয়াছেন! সে প্রফুল্লর পানে চাহিল। পরে ছোট একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—তাঁর কাছ থেকে নিলে কেন? আমি কিনে দিতে পারতুম তো···

প্রফুল্ল কোন কথা বলিল না। শরৎ বলিল,—যাক্, তাতে আর কি! শ্বশুর পিতৃতুল্য···তবে ওঁরা না ভাবেন,

পারবো কি না···এই অবধি বলিতেই তার চমক ভাঙ্গিল, এ কি! সে এ কি বলিতেছে! কাল রাত্রের সেই অবহেলার অভিমানের ঝাঁজ এখনো তার মনের উপর আধিপত্য করিতেছে! ছি! সে উমার পানে চাহিল। উমা যেন শিহরিয়া রহিয়াছে! শরৎ একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। এ তো ভারী অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে সে! এত ছোট তার মন! শ্বশুর আদর করিয়া একটা উপহার দিয়াছেন···ছি, ছি,—তার মন একেবারে কুণ্ঠায় ভরিয়া যেন মরিয়া গেল।

মনটাকে ঝাড়িয়া খাড়া করিয়া শরৎ বলিল,—কদিন থাকবে বিদেশে?

প্রফুল্ল বলিল,—বোধ হয়, একমাস।

শরৎ বলিল,—চিঠি-পত্র লিখো। না হলে বড্ডই ভাববো—বিশেষ তোমার বৌদিকে তো জানো!

প্রফুল্ল উমার পানে চাহিল। উমা হাসিয়া বলিল,—বটেই তো, যত দোষ বৌদির! মেয়েমানুষ কি না! আর নিজে যে সে-শনিবারে ঠাকুরপো এলো না বলে ঘর আর বার করে বেড়ালেন! শুতে যেতে পারলেন না! রাত্রে ঘুম হয় না···সে কথা বলতে লজ্জা হয়, বুঝি?

শরৎ স্থিরভাবে কিছুক্ষণ উমার পানে চাহিয়া থাকিয়া পরে প্রফুল্লর পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল,—ফুলু...

প্রফুল্ল চমকাইয়া শরতের পানে চাহিল। শরৎ বলিল,—মা-হারা এতটুকু তোমায় বুকে তুলে নিয়েছিলুম, আর বরাবর এই বুকেই রেখে আসচি···আজ তোমার উপর অপরের অধিকার এসে পড়েচে বলে সেখানে অভিমানের বেদনা টন্‌টনিয়ে ওঠে মাঝে-মাঝে! সেজন্য কিছু হিংসার ভাব যদি আমার মনে তুমি কোনদিন লক্ষ্য করে থাকো, তাহলে মনে করো ভাই, আমি বড় ভাই! বড়র মনে কি যে হয়···

শরৎ একটা নিশ্বাস ফেলিল; তার পর কোনমতে দুই পা টানিতে টানিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

প্রফুল্ল ও উমা দুজনে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অনেকক্ষণ এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর উমা বলিল,—ওঁর যেন কি হয়েচে!···উনি কি ভাবেন, জানো?

প্রফুল্ল কোন জবাব না দিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে উমার পানে চাহিল।

উমা বলিল,—উনি কেবলি ভাবেন, দুই ভাইয়ের মধ্যে যদি কোনদিন কোন ব্যবধান এসে পড়ে, তাহলে উনি সেই মুহূর্ত্তে মরে যাবেন!

প্রফুল্ল স্থিরভাবে শয্যার উপর বসিয়া পড়িল। পাশেই জান্‌লা খোলা ছিল, সেই জান্‌লা দিয়া বাহিরে অনেকখানি আকাশ দেখা যাইতেছিল—আকাশে একটা চিল উড়িতেছে,—কি স্বচ্ছন্দ অবাধ তার গতি, কি সরল সহজ ভঙ্গী। মনের মধ্যে বেদনার ধার ধারে না—কোনদিন কোন ব্যাপারে কাতরও হয় না! ভাবিবার কিছু নাই···কি সুখী ঐ আকাশ-পথের যাত্রী ছোট্ট পাখীটি!

উমা বলিল,—তুমিও যে ধ্যানস্থ হলে···

প্রফুল্ল বলিল,—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, জবাব দেবে, বৌদি?

উমার বুক দুলিয়া উঠিল। সে বলিল,—কি কথা?

প্রফুল্ল বলিল,—শ্বশুর-বাড়ীর সঙ্গে আমি যে এ[illegible] ঘনিষ্ঠতা করচি—এটা কি খারাপ হচ্ছে?

উমা বলিল,—না, খারাপ কি! তাঁরা আপন-জন মেয়ে দিয়েচেন কত বড় বিশ্বাসে! আর সেখানে যা[illegible] বৌয়ের কাছে—এতে দোষের তো কিছু নেই, ভাই হঠাৎ এ কথা যে?

প্রফুল্ল বলিল,—তারা আমাদের মানে না, গরিব ঘ[illegible] ঘৃণা করে, তাই···?

এ কথার জবাবের জন্য তিলমাত্র অপেক্ষা না করি[illegible] সে বলিল,—কিন্তু আমরা তো তাদের বাড়ী থেকে মে[illegible] আনবার জন্য সেধে যাইনি···তাঁরাই এসেছিলেন।

উমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে কথা ঠিক তো!

প্রফুল্ল বলিল,—তবে এ রকম গোলমাল ওঠে কে[illegible] বলো তো?···আমি কি করেচি! আমি কি তোমাদে[illegible] সেই ফুলু নই···? ওরা যদি বড় লোকই হয়, আমি সে[illegible] সে জন্য কোন অপরাধ করিনি বৌদি...

প্রফুল্ল কাঁদিয়া ফেলিল। উমা তার চোখের জ[illegible] মুছাইয়া দিয়া বলিল,—ভালো দুই পাগলের পাল্লা[illegible] পড়েচি! নাও, এখন বড় হয়েচো, গোঁফ বেরিয়েচে, এ[illegible] আর এ কান্না মানায় কি ভাই? সে তো কত কেঁদেচো সেই যে অসুখ করেছিল সেবার, একটু ঝাল-তরকারী জন্যে মাথা কোটাকুটি করেও যখন আমার কাছ থে[illegible] তা আদায় করতে পারো নি, তখন কেঁদে রসাতল বাধিয়ে ছিলে—মনে নেই? তোমার মনে না থাকতে পারে—আমি ভুলিনি। দু'খানি আলু মুখে দিতে তবে তোমা[illegible] কান্না থামে! এ কি ভোলবার কথা ভাই! সে [illegible] গাঁথা রয়েচে এইখানে···বলিয়া উমা নিজের বু[illegible] হাত দিল।

ইহার প্রায় দুই মাস পরে উমার পীড়াপীড়িতে শর[illegible] খুব বিনয় প্রকাশ করিয়া এক পত্র লিখিল হাবড়ার ডেপু[illegible] ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে, তাঁর কন্যা তাদের ঘরের আদরে[illegible] বৌ; সেই বৌকে আট-দশ দিনের জন্যও যদি তাদে[illegible] কাছে ডেপুটি বাবু পাঠাইয়া দেন, তবে তারা পর[illegible] পরিতোষ লাভ করিবে এবং কৃতার্থও হইবে। চিঠি[illegible] শেষে এটুকুও লেখা রহিল, বৌমাই এ ঘরে সর্ব্বম[illegible] হইবে—কাজেই এখন হইতে মাঝে মাঝে দেখা-শু[illegible]

রিয়া নিজের ঘর নিজের জনকে চিনিয়া লওয়ার যোজন খুবই দেখা যায়। শেষে এমন আশাও সুদৃঢ়-াবে ব্যক্ত করিল যে, বৌমাকে পাঠাইতে তাঁদের চিন্তার রণও থাকিতে পারে না; যেহেতু এখন দেশে রোগ-লাই মোটে নাই, শীতের হাওয়ায় দেশ যেন হাসিতেছে! ছাড়া পুকুরে স্নান করা বা গা ধোওয়ার ভয়ও নাই—তালা জল গরম হইলে বৌমা তাহাতেই স্নানাদি রিবেন।

ডেপুটী ভূপাল মিত্র চিঠি পড়িয়া গৃহিণীকে দেখিতে লেন; গৃহিণী সে চিঠি পড়িয়া কন্যা সিন্ধুবালার হাতে য়া বলিলেন,—কি রে, যাবি তো?

নাক-মুখ সিঁটকাইয়া সিন্ধু বলিল,—বয়ে গেছে মার যেতে!

সেইদিনই মহা-সমাদরে প্রফুল্লকে আনা হইল। শুড়ী বলিলেন,—এটুকু বয়সে আমার মেয়েরা কখনো শুর বাড়ী ঘর করতে যায় নি, বাবা। ওঁর ইচ্ছে, তুমি সুখ হয়ে উঠে ওকে নিয়ে যাও। তাছাড়া বাজনা-জনাগুলো শিখচে!

প্রফুল্ল একটু স্তব্ধ রহিল। শাশুড়ী বলিলেন,—র উপর আমি ওকে ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে রবো কি বাবা? আরো কি জানো, ও বলছিল, থানে চান করবার ঘর-টর নেই, খোলা জায়গায় খুলে ওরা স্নান করতে পারেও না! সে রকম অভ্যাস ওদের কখনো নেই! তা···তোমার কি মত, বলো বা? তুমি যদি জেদ করো···

প্রফুল্লর তখন মুস্কিল বাধিল। চট্ করিয়া মত কাশ করিতে কে যেন তার বুক চাপিয়া ধরিল। আর চ দিন পরেই একটা ছুটী ছিল। সে ভাবিয়াছিল, ন্ধুকে ও শ্যালীদের লইয়া শিবপুরের বাগানে চড়িভাতি রতে যাইবে···দেশে গেলে এত-বড় আমোদটা বাদ ড়িয়া যায়। তবু দাদার চিঠি, বৌদির ইচ্ছা···সে বিল, সিন্ধুর সঙ্গে একবার কথা কহিয়া, তাহাকে রাজী রাইয়া লইবে, পাঁচ-সাত দিনের জন্য ঘুরিয়াই আসুক! ইলে ওদিকে দাদার মনে বৌদির মনে বড় বেদনা জিবে! প্রফুল্ল বলিল,—আচ্ছা, আমি ভেবে দেখি—

রাত্রে সিন্ধুর কাছে প্রফুল্ল কথাটা পাড়িয়া বসিল। ন্ধু সে কথা শুনিবামাত্র দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, একেলা কিছুতেই সে সেখানে কিতে পারিবে না। প্রফুল্ল থাকিলেও নয় দেখা যাইত। ফুল্ল থাকিবে এখানে কলেজে, আর সে একা অজানা রে কত রকম অসুবিধার মধ্যে গিয়া বাস করিবে, তা হয়? কার সঙ্গে মনের কথা কহিবে? নেহাৎ একা, সঙ্গ মুহূর্ত···তার পর সন্ধ্যা হইলে আঁধার নামিয়া ন পৃথিবীকে ঘিরিবে—উঃ, সে কথা মনে হইলে প্রাণ তার হাঁফাইয়া ওঠে! সিন্ধু সাফ জবাব দিল, তাকে মারিয়া ফেলিলেও সে এ কাজ করিতে পারিবে না।

প্রফুল্ল মিনতি করিল,—আমি শনিবার বেলা তিনটের মধ্যেই যাবো তো—একবার মত করো সিন্ধু। নাহলে আমার দাদার মনে, বৌদির মনে বড় কষ্ট হবে! এই দাদা আর বৌদিই আমায় মানুষ করে তুলেচেন; তাঁদের ঋণ শোধবার নয়। যদি তাঁদের একটু সুখ হয়···

সিন্ধু জবাব দিল,—তোমার দাদার সুখ, আর বৌদির সুখটাই বড় হলো! আমার অসুবিধা, সেটা কিছু নয়? জানি গো জানি, তাঁরাই তোমার সব। আমি পরের মেয়ে···সিন্ধু দুই চোখে জলের ধারা নামাইল।

প্রফুল্ল তাহা দেখিয়া বিচলিত হইল। সে বলিল,—বেশ, তবে ওঁদের লিখে দিতে বলো যে তোমার যাওয়া হবে না। এমন একটা কারণ দেখিয়ো, যাতে তাঁরা দুঃখ না পান্!

কথার সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের মধ্যে যেন কে ছুরি টানিয়া দিল। সে আজ এত বড় ছলনায় তাঁদের অতখানি সাধে, অত বড় আগ্রহে এ কি আঘাত দিতে চলিয়াছে! এই মিথ্যা দিয়া তাঁদের বুকের উচ্ছ্বসিত হাসি সে এক নিমেষে ম্লান করিয়া দিতে বসিয়াছে!

কি করিবে—এধারে সিন্ধু যে কাঁদিয়া সারা, তাছাড়া ···নিজের মনের অতল কোণে সন্ধান লইয়া সে দেখিল, সিন্ধু যদি চলিয়া যায়, তবে তার এখানকার আকাশ-বাতাস তার অদর্শনে এমন ভারী হইয়া উঠিবে যে কলেজে থাকাও প্রফুল্লর পক্ষে দুঃসহ হইবে! এই যে প্রতিদিন বৈকালে সে এখানে আসিতেছে,—সুধার ঝলক পরশে নিজের শ্রান্তি ঘুচাইয়া প্রাণে অপূর্ব্ব পুলক লাভ করিতেছে, সে পুলক একেবারে উবিয়া যাইবে!···সে ভাবিল, সে তো তাঁদের অমান্য করে নাই! সিন্ধু তো সেখানে যাইবেই, তবে আজ না গিয়া দু'দিন পরে যাইবে!

সে-শনিবার বাড়ী যাইবার সময় প্রফুল্লর মনের কুণ্ঠা এমন বাড়িয়া উঠিল যে, সে প্রতি পদে তাকে কম্পিত শঙ্কিত করিয়া তুলিল। খোকার জন্য সে প্রচুর খেলনা কিনিল এবং খোকাকে ঘুষ দিয়া সে ঠিক করিল, দাদাকে ও বৌদিকে বুঝাইবে যে তাঁদের ফুল্ তাঁদেরই আছে,—এবং জীবন-বসন্তের এই হাসি-গানের প্রাচুর্য্যের মাঝেও তাঁদের কথা সে এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়া যায় নাই! ···তবু এ কথাও কাঁটার মত প্রাণে বিঁধিতেছিল যে ঘুষ, ঘুষ! কত বড় প্রাণের জিনিষকে কি তুচ্ছ খেলনা দিয়াই সে চাপা দিতে চলিয়াছে! হায়রে, যৌবনের এ উদ্দাম আনন্দের মাঝে কেন যে ওধারে এ কর্ত্তব্যের ডাক এমন কড়া বাজিতে থাকে!

বাড়ী গিয়া বৌদির কাছে সে অতি কুণ্ঠিত মন লইয়াই নীরবে দাঁড়াইল। উমা কিন্তু কোন অনুযোগ

লিল না। তাকে দেখিয়া সে অধীর আবেগে বলিল,—
। কেমন আছেন, ঠাকুরপো ?

প্রশ্ন শুনিয়া প্রফুল্ল কেমন হতভম্ব হইয়া গেল। সে লিতে যাইতেছিল, কেন, বেশ ভালোই আছেন ! কিন্তু ট্ করিয়া মনে হইল, তার পরামর্শেই এখানে হয়তো াবড়া হইতে আরো কি মিথ্যা বলিয়া কি পত্র াসিয়াছে ! তার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল ; সে ছু বলিতে পারিল না, বৌদির পানে শুধু চাহিয়া রহিল।

উমা বলিল,—সিন্ধুকে আনবার কথা লেখা হয়েছিল কে না, তাই এঁর কাছে চিঠি এসেচে যে তোমার াশুড়ীর অসুখ,—সিন্ধুই সেবা করচে। তার দিদি কাছে নই, সেই জন্যই তাকে এখন পাঠানোর পক্ষে একটু অসুবিধা ঘটলো।···তা কি অসুখ তাঁর ?

প্রফুল্লর মাথায় কে যেন প্রকাণ্ড লাঠী মারিল। তার াথা নত হইয়া পড়িল। তার পর বহু চেষ্টায় মনের সে াব সরাইয়া সে বলিল,—হ্যাঁ, ও সে নানান্ অসুখ। া সারতে বেশী দিন লাগবে না···

উমা বলিল,—ভেবেছিলুম, সাত-আট দিন অন্ততঃ ুই জায়ে একসঙ্গে থাকবো···তা হলো না ! উমা নিশ্বাস ফলিল।

প্রফুল্ল বলিল,—খোকা কোথায় ?

উমা বলিল,—ক্ষীদির মার কাছে। সে বুঝি তাদের াড়ী নিয়ে গেছে, তার মেয়ে এসেচে, দেখবে বলেছিল···

প্রফুল্ল বলিল,—ত'র জন্য খেলনা এনেচি।··· তাইতো সে ঘরে নেই···তা কথা-টথা বলতে শিখলে কছু ?

উমা বলিল,—বলে বৈ কি। বা-বা—দা-দা, কা-কা ···মা···সব বলতে শিখেচে।

প্রফুল্ল বলিল, আমার বড় দুঃখ রইলো যে তার ভাতে কিছু করতে পারলুম না। অসুখ হলো তার···অথচ তোমাদের শাস্ত্র বলে বসলো তখনি ভাত দেওয়া চাই...

উমা বলিল,—তাতে কি হয়েচে ভাই ! এ তো লৌকিকতা নয় ! ঘরের ছেলে···

প্রফুল্ল বলিল,—তবু পাঁচজনকে খাওয়ানো হতো···

উমা বলিল,—আমার ও-সব সাধ হয়ও না ! সিন্ধুকে চিঠি লিখলুম, খোকার ভাতে আসতে হবে, তা সে চিঠির জবাবও দিলে না সে। তাই মন খিচড়ে গেল—ভাবলুম, দূর হোক্ গে ছাই, সে আসবে না, কাকে নিয়েই বা আমোদ ! অর্থাৎ এখন তাকে পাশটিতে না পেলে আমার কিছুই ভালো লাগচে না !

সিন্ধু, সিন্ধু, সিন্ধু। প্রফুল্ল বুঝিল, স্নেহের কি প্রচণ্ড পিপাসা এই সিন্ধুর জন্য বৌদির প্রাণে আকুল উচ্ছ্বাসে জাগিয়া উঠিয়াছে। হায়রে, সে পিপাসা মিটাইবার জন্য সে-ও তো কিছুই করে নাই ! সিন্ধুর উপর রাগ হইল ! এত কঠিন তোমার প্রাণ যে ··· ছাড়িতে পারো না !···তার মনে হইল, এ ··· তাহাকেই তুচ্ছ করিতেছে ! স্বামী, স্বামী ঘর, ··· স্বজন, তারা তোমার কেহ নয় ? তাদের তুমি আমোল দিবে না ! বাপের বাড়ীটাকে আঁকড়াইয়াই পড়িয় থাকিবে ?···এই ঘর, এই ঘরে আনন্দের কি সহজ স্ব আপনা হইতে উৎসারিত থাকিত, সিন্ধু আসা অবধি সে স্বর একেবারে কোথায় যে মিলাইয়া গিয়াছে !

রুদ্ধ অভিমান গর্জ্জিয়া উঠিয়া সমস্ত প্রাণটায় এ দারুণ কোলাহল জাগাইয়া তুলিল। এই পল্লীগৃহে সরল স্নেহের এই মিনতির আহ্বান···তাকে উপে করিয়া সেখানে পিতার গৃহে ভোগ-বিলাসের মধ্যে ডুবিয়া থাকাটাই তোমার এত কাম্য··· বেশ, সে-ও আ ওখানে তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না। তোম বড়লোক আছ, তোমরাই আছ—আমাদের সঙ্গে এম ব্যবধানই যদি রাখিতে চাও, তবে আমিই বা কেন ব্যবধান ঘুচাইতে সেখানে ছুটিয়া যাইব ? কি বলি যাইব ? সে ঠিক করিল, সে এর শোধ তুলিবে, সে এখ কিছুদিন ও-ধার মাড়াইবে না !

১২

একটা সপ্তাহ প্রফুল্ল শ্বশুর-বাড়ীর ধার মাড়াই না। সম্বন্ধী আসিয়া জানাইল, তোমার অদর্শনে মা ব আকুল ! প্রফুল্ল বলিল, পড়ার বড় বেগ বাড়িয়াছে- সামনে একটা পরীক্ষা ! সিন্ধুর চার-পাঁচখানা চিঠি আসি —তুমি এসো, তুমি এসো ! উদ্যত অধীর মনকে শাসাই সে দাবাইয়া রাখিল। প্রাণের দ্বারে তরুণী প্রিয়ার অশ্রু বাষ্পে-ভরা করুণ ছল-ছল দুই চোখ মিনতি ভর ভিখারীর মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, জোর করিয়া প্রাণে দ্বার সে চাপিয়া বন্ধ রাখিল। না, এ দ্বার খোলা হই না ! তার মন এ সংগ্রামে আহত ক্ষতবিক্ষত হই গেল, তবু সে নিজেকে বিমুখ, বিরূপ রাখিল !

এই যে কর্ত্তব্য-জ্ঞানকে সচেতন করিয়া তুলিয়া আপনার পুরুষত্বকে জাগাইয়া রাখিয়াছে, এ কথা ভাবি মনে মনে অনেকখানি গর্ব্বও সে অনুভব করিল।

কিন্তু হায়রে, এ গর্ব্ব এক-নিমেষে ধূলিসাৎ হই গেল, যখন সম্বন্ধী আবার দুইদিন পরে আসিয়া জানাই সিন্ধুর বড় অসুখ !

প্রফুল্ল সমস্ত মন গর্ব্বের খোলশটাকে টানিয়া পদ ঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিল। মনকে সে তার এ কাঠিন্যে জন্য চাবকাইয়া তখনি ছুটিল—সিন্ধু, সিন্ধু···প্রি প্রিয়া···আমার নির্ম্মম ব্যবহারে তোমার মন ভাঙ্গি গিয়াছে, তুমি রোগের কবলে পড়িয়াছ !

তার পর মান-অভিমানের বারি-ধারার মধ্যে স্নিগ্ধ শান্ত হইয়া আবার সে প্রিয়াকে বুকে তুলিয়া লইল! প্রিয়া, প্রিয়া, বুকের ধন আমার···

সামনেই বড় দিনের ছুটী! হাবড়ার বাড়ীতে পরামর্শে স্থির হইয়া গেল, এই ছুটীটায় সিন্ধুকে লইয়া একবার কোথাও বেড়াইয়া আসা যাক! সিন্ধুর অসুখের খবর শুনিয়া শরৎ নিত্য একবার করিয়া অফিসের ফেরৎ হাবড়ায় আসিয়া সংবাদ লইয়া যাইত! অসুখ সারিতে কদিন সে বলিয়া গিয়াছিল যে ছুটীটা ওখানে কাটাইলেই ভালো হয়! কিন্তু এও কি একটা কথা! অসুখের পর লোকে পশ্চিমেই হাওয়া খাইতে যায়, পাড়াগাঁয়ে কে কবে গিয়াছে! কথাটা লইয়া প্রফুল্লর খেয়ালে বেশ একটু হাসি-তামাসাও চলিয়াছিল। গৃহিণী বলিয়াছিলেন, এ সব জানে না তো।

তার পর সিন্ধুকে লইয়া পুরী যাইবার কথা উঠিল। প্রফুল্লরও সঙ্গে যাওয়া চাই, নহিলে সিন্ধুর হাওয়া খাওয়া একেবারে নিষ্ফল হইতে পারে। সে যে প্রফুল্লর জন্য সারাটা উদাস করিয়া ভাবিতে থাকিবে···! প্রফুল্ল তখন এদিকে ধরিল, দাদা যেন ইহাতে অমত না করেন! কি করিবে সে? আর যে কোন উপায়ও নাই!

শরতের অমত করিবার কোন কারণ ছিল না। উমা বলিল,—ভেবেছিলুম, এ ছুটীটায় ঠাকুরপো সিন্ধুকে এনে এখানে থাকবে!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শরৎ ছোট্ট একটু জবাব দিয়া গেল,—সে কথা মনেও এনো না, উমা···অনর্থক বেদনা পাবে!

তারপর দুই চোখের উদ্যত অশ্রু পাছে ধরা পড়ে, এই ভয়ে শরৎ সরিয়া গেলে, উমা মেঝের উপর পড়িয়া বড় কান্না কাঁদিল! হায়রে, তার ভবিষ্যতের সমস্ত আশা— আজ আকাশ-কুসুমে পরিণত হইল! কি বালির বাঁধ দিয়াই সে ভবিষ্যতের ঐ প্রবল ঢেউ বাঁধিতে চায়! তো বাঁধা পড়িবে না, বাঁধা পড়িবার নয়ও!

বাহির হইতে প্রফুল্ল ডাকিল,—বৌদি···

উমা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া বসিল। প্রফুল্ল ঘরের মধ্যে ঢুকিল। বলিল,—এবারে পুরী থেকে ফিরে ও এখানে আসবে, এ কথা একেবারে পাকা হয়ে গেছে। আমি পুরী যেতে রাজী হয়েচি, শুধু এই সর্ত্তে!

উমা কোন কথা বলিল না। সে উদাস নেত্রে প্রফুল্লর পানে চাহিয়া রহিল। আহা, বেচারা প্রফুল্ল! ওর ঐ বিশুষ্ক মুখ, ঐ কুণ্ঠিত ভাব অন্তরের সব কথা যে প্রকাশ করিয়া দিতেছে! সিন্ধুকে এখানে আনিবার জন্য ও-ও যে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, তা কি উমা বোঝে না! কি করিবে, প্রফুল্ল যে কতখানি নিরুপায়! বড়লোকের মেয়ে বলিয়া যে-গর্ব্ব আজ সিন্ধুর প্রতি পদ-ক্ষেপকে রুখিয়া ধরিতেছে, সে গর্ব্ব. প্রফুল্ল লেখা-পড়া জানে, সে কি আর ধরিতে পারে নাই? হাজার হোক, প্রফুল্ল তো তাদেরই একজন···এই অবহেলা এ উপেক্ষা কি তার প্রাণেও বিঁধিতেছে না? যে প্রফুল্লর মুখে হাসি ও কথায় বান ডাকিত, সে প্রফুল্ল আজ কতখানি কুণ্ঠায় এমন স্তব্ধ থাকে—ভাবিয়া উমার মন সমবেদনায় ভরিয়া উঠিল। নিজের উপর রাগ ধরিল, তার মনের এই অতি-ক্ষুদ্র অভিযোগটাকেই বড় করিয়া ঠাকুরপোর উপর সে অভিমান করে! এটুকু সহিবার শক্তি যদি তার না থাকে, তবে কেন সে বাঙালীর ঘরে মেয়ে-জন্ম লইয়াছিল! নিজের মনকে প্রবল আঘাতে অভিযোগ-গুলার মাঝ হইতে ছিনাইয়া তুলিয়া উমা প্রফুল্লকে বলিল,—তাই করো ভাই! ছেলেমানুষ, প্রথম প্রথম এখানে আসতে লজ্জা হচ্ছে কি না! দু' চারবার এলে-গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তখন দেখো, এখান থেকে নড়তেও আর চাইবে না।

প্রফুল্ল বলিল,—তুমি জানো না বৌদি, এটা আমার কি অসহ্য ঠেকে! আমাদের বাড়ীর বৌ হয়ে আমাদের বাড়ী আসবে না!···সময় সময় এমন রাগ হয় যে ভাবি, ওধার আর মাড়াবো না। বড়লোক তোমরা, দেখি, টাকার পাহাড়ে বসে কত সুখ পাও!

উমা জিভ কাটিয়া বলিল,—ছি, ছি, এমন পাগলামি করে না! তারা ভাববে কি? ভারী তো ব্যাপার, এ নিয়েও এত ভাবনা! সে যে ভারী ছেলে-মানুষী হবে! তাঁরা কুটুম মানুষ—ভাববেন, এদের মন ভারী ছোট তো!

তার পর আবার সেই বহুকালের মতই হাসি-গল্প-পরিহাসের ডালি পাড়িয়া, দুইজনে মিলিয়া খোকাকে আদর করিয়া, নাচাইয়া তুলিল। তার পর বৌদির কাছে তাদের প্রেম-যামিনীর সবিস্তার কাহিনী বলিয়া ও বৌদির মুখে সহস্র পরিহাস উপভোগ করিয়া প্রফুল্ল নিজের মনটাকে হাল্‌কা করিয়া তুলিল। উমাও নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল—মনের উপরকার মেঘ সাফ হইয়া গেল! এ যে কি আরাম, কি সুখ!

··· ··· ··· ···

পুরী হইতে ফিরিবার পর প্রফুল্ল সত্যই সিন্ধুকে দেশে লইয়া আসিল। সিন্ধুর সঙ্গে আসিল, বাড়ীর পুরানো ঝী মানি। উমার মনে আমোদ আর ধরে না! প্রফুল্লকে সে বলিয়া দিল,—তুমি কলেজ থেকে একহপ্তা ছুটী নাও, ভাই। এ কদিন সকলে মিলেমিশে থাকি···

প্রফুল্ল গম্ভীর মুখে জানাইল, তা হইবার নয়! সামনে একজামিন। তাছাড়া সিন্ধুর কড়ার, এখানে এ দফায় সে তিনদিন মাত্র থাকিবে!

উমার মুখ শুকাইয়া উঠিল। বাতাসের নাড়ায় ছর ফুল যেমন ঝরিয়া মাটীতে পড়ে, তার মনের কিছু উল্লাস, তাও তেমনি এ কথায় নাড়া পাইয়া য়া পড়িয়া গেল। প্রফুল্ল তাহা লক্ষ্য করিয়া ল,—ফাল্গুন মাসের গোড়াতেই ও আসবে, আর া ফাল্গুন মাস এখানেই থাকবে। শাশুড়ীকে স্পষ্ট এসেচি···তার পর একটু থামিয়া আবার বলিল, শাশুড়ী অনেক করে বললেন, তোমার বৌদিকে া বাবা, এই প্রথম যাচ্ছে, তিনদিনের বেশী হলে মিও বড় আকুল হয়ে উঠবো, কখনো ওকে ছেড়ে কিনি!

উমা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—তা তো বটেই! যাক, তবু তো তিনটা দিন আনন্দে কাটিবে। উমা বাধাইয়া দিল, পুকুরে জাল ফেলো—সব-চেয়ে বড় ছটা ধরা চাই। স্বামীকে ফরমাশ করিল, বাড়ী সিবার সময় ভীম নাগের দোকান হইতে সেরা সন্দেশ নিতে হইবে। কালু ডোমের কাছে ক্ষীরির মাকে ঠাইয়া হুকুম দিল, পাঁঠা কাটো! তারপর নিজের তে সিন্ধুর ট্রাঙ্ক খুলিয়া দশবার দশখানা কাপড় বাহির বিয়া দশ রকম করিয়া সিন্ধুকে সাজাইয়াও তার আর ধ মেটে না! পাড়ার ছেলে কেষ্টকে ধরিয়া এ বাগান হতে ও বাগান হইতে সে রাশীকৃত ফুল আনাইল, জের হাতে মালা গাঁথিয়া সিন্ধুকে পরাইয়া দিল,—জের হাতে আলতা ঘষিয়া সিন্ধুর দুই পা রাঙা করিয়া লিল! আর ঠাকুরপোর কাছে দশবার তাকে লইয়া ণ রকমে ঘুরাইয়া দেখাইয়া বলিল,—ছাখ দেখি, যেন তিমাখানি—নয় কি?

রাত্রে প্রফুল্ল সিন্ধুকে বুকের মধ্যে টানিয়া চুম্বনে ার মুখখানি ভরিয়া দিয়া বলিল,—বৌদির কি আনন্দ াজ, বলো দিকি। তোমায় নিয়ে যেন রাজ্য পেয়েচে।

নাক সিঁটকাইয়া সিন্ধু বলিল,—মাগো, যেন সং জাচ্ছে! তোমার রাগ হবে বলে আমি বাবু কথাটি ই না! না হলে এমন বিশ্রী লাগে!

প্রফুল্লর মনের উপর ছুরির ফলা পড়িল। এ আদর, অনুরাগ,—তাতেও তোমার এমন বিরাগ! কি ঠিন প্রাণ তোমার, সিন্ধু! প্রফুল্লর মন এক নিমেষে কুঁকড়াইয়া এতটুকু হইয়া গেল! সে কোন কথা লিল না।

তা দেখিয়া সিন্ধু ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিল,—অমনি াগ হলো!···বেশ বাবু, বেশ, আমারি অপরাধ হয়েচে! ার কখনো কিছু বলবো না।

প্রফুল্ল বলিল,—অপরাধ তোমার নয়, সিন্ধু, অপরাধ আমার! কেন তোমায় বিয়ে করে ছিলুম! বড় লোকে আর গরিব লোকে যে পার্থক্য, তা দেখচি, ঘোচবার নয়—প্রাণ দিলে ঘোচে না, মন দিলেও ঘোচে না!···এ যে সেই মৃণ্ময় পাত্রের সঙ্গে কাংস্যপাত্রের মিলন! মৃণ্ময় পাত্র এ মিলনে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাইবে। তবু তুমি একবার যদি মনে করতে,—একবার যদি তোমার ঐ গর্ব্বের উচ্চ আসন থেকে একটু হাসির দৃষ্টি নীচেয় ঝরিয়ে ফেলতে···সে একটা নিশ্বাস ফেলিল।

সিন্ধু বলিল,—ঘাট হয়েচে আমার, বলচি,—তবু হবে না? তার পর মাকে গিয়ে লাগিয়ো যে ওর বড় চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা!

গম্ভীর মুখে প্রফু বলিল,—এ লাগালাগির কথা নয়, সিন্ধু। তারপর আরো কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া সে বলিল,—যাক্, ও মিছে ভেবে কি হবে! যা পাবার নয়, তার আশা করলে দুরাশার ব্যথা পাওয়াই সার হবে। প্রফুল্ল শুইয়া পাশ ফিরিল। সিন্ধু অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া লেপটা টানিয়া গায়ে মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল, বলিল,—এতেও যদি রাগ করো তো নাচার!

পরদিন সকালে মানিকে ডাকিতে সে বলিল,—না বাপু, আমি আজই চললুম। কাল অবেলায় পুকুরে গা ধুয়ে জ্বর হয়েচে! পোড়া ম্যালারি ধরলো, দেখচি। আমি আর থাকবো না!

উমা একেবারে কাঠ হইয়া গেল। এই ঝীটিকে সে নিজের মার চেয়েও উঁচু আসনে রাখিয়া চলিতেছিল। তার খাওয়ার সময় বসিয়া তাকে খাওয়ানো এমন কি, তার উচ্ছিষ্ট অবধি তাকে পাড়িতে দে নাই। ক্ষীরির মাকে দিয়া উচ্ছিষ্ট পাড়াইয়াছে, বাস মাজাইয়াছে—তোলা জল গরম করিয়া দিয়া এই দাসীর স্নানের জন্য। তবু তার মুখের টিপ্পনী এমন ঝাঁজালো বেশে ছিট্‌কাইয়া পড়িতেছে যে, প্রা সে-তাপে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়! এ ঝাঁজ উ গ্রাহ্যও করে নাই! কাল যখন বৈকালে মানি গ ধুইতে যায়, তখন সে কতবার নিষেধ করিয়াছে ওগো, তুমি পুকুরে যাইয়ো না, গা ধুইতে চাও ত বসো, জল গরম করিয়া দিই! নিজে সে উনানে য পাড়িয়া জল বসাইয়াছিল, তা ঝী হাসিয়া পুকুরে গেল সে সে-মানা শোনে নাই···এখন সকালেই তার মু এই ঝাঁজালো কথা শুনিয়া উমা অস্থির হইয়া উঠিল

প্রফুল্ল বিছানার উপর স্তব্ধভাবে বসিয়াছিল। ওধা সিন্ধুও উঠিয়াছে। উমা তার মুখ ধুইবার জল গ করিয়া বাহিরের রোয়াকে রাখিয়াছে—সে মুখ ধুইতে ক্ষীরির মা কাপড় লইয়া তার কাছে দাঁড়াইল! অবসরে মানি সিন্ধুর কাছে পুকুরের দোষ দিয়া নিজে অসুখের কথা বলিতে চলিল।

উমা বলিল,—একটা ওষুধ আনিয়ে দাও

ঠাকুরপো—মানির জ্বর হয়েচে। না হয় গিয়ে শিবু ডাক্তারকে ডেকে আনো। উনি বেরিয়ে গেলেন, বড় মাছ আনাবেন কোথাকার কাদের পুকুর থেকে···

প্রফুল্ল বলিল,—কি, হয়েছে কি?

উমা বলিল,—কাল অত মানা করলুম যে, মানি, এই সন্ধ্যার সময় পুকুরে গা ধুয়ো না, অভ্যাস নেই, অসুখ করবে। তা না শুনে গা ধুতে গেল। আজ বলচে, হয়েচে···সে এখনি হাবড়ায় যেতে চায়।

প্রফুল্ল রাগিয়া উঠিল, কহিল,—ওঃ, নবাব! চৌবাচ্চাতে গিয়ে থাকুন্ গে! মাগীর আস্পর্দ্ধা এমন যে আমার বৌদিকে চোখ রাঙায়! দেখি, সে কত বড় বড় লোকের বাড়ীর ঝী···

গায়ের লেপটা টানিয়া ফেলিয়া তড়াক করিয়া শয্যা হইতে লাফাইয়া প্রফুল্ল ভূমে নামিল। উমা তার হাত ধরিয়া মৃদু-স্বরে বলিল,—কিছু বলো না ভাই, আমার মাথা খাও—ছি, কুটুম-বাড়ীর লোক, দুদিনের জন্য এসেচে। কি মনে করবে!

বেশ ঝাঁঝিয়াই প্রফুল্ল বলিল,—না, বলবে না! সাতপুরুষের কুটুম এসেচেন! কোথায় সে মাগী...

প্রফুল্ল তড়্‌তড় করিয়া একেবারে বাহিরের রোয়াকে আসিয়া দাঁড়াইল। উমা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তার সঙ্গে বাহিরে আসিল। জামাই বাবুকে দেখিয়া মানি বলিল,—আমি বাড়ী যাবো, জামাই বাবু। ম্যালারি ধরেচে বুঝি আমার, বাবা! কি জল গো···তোমরা এ জলে চান করো কি করে···

প্রফুল্ল দেখিল, সিন্ধু এ সব কথাগুলার প্রতি এতটুকু কান করিল না! তাহাতে তার রাগ আরো বাড়িয়া গেল। সে বেশ তীব্র স্বরেই বলিল,—না, আমরা ছোট লোক, আমাদের শরীর তোমাদের মত ননী দিয়ে গড়া নয় তো! তা বেশ, যেতে চাও, এখনি যাও। রেলের গাড়ী ফেলে দিচ্ছি···কেউ গিয়ে ষ্টেশনে পৌঁছে দেবে'খন। যাও, চলে যাও।

মানি একেবারে অবাক! জামাই বাবু এমন কথা বলিলেন! দুই চোখে জল বাহির করিয়া সে বলিল,—বাবা, তুমি অমন কথা বললে, জামাই বাবু! আমার মনিবও যে এমন করে বলেনি কোন দিন গো! আমার বরাতে এই ছিল! তোমাদের পুকুরে নেয়ে অসুখ হলো···

প্রফুল্ল বলিল,—বেশ তো, এ দেশ তোমাদের সহ্য হবে না—তোমরা বিলেতে থাকো, সেই বিলেতেই যাও। আমরা এদেশের লোক, এখানেই পড়ে থাকতে হবে আমাদের···

কাঁদিয়া বকিয়া মানি নিমেষে একেবারে কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। উমা প্রফুল্লকে টানিয়া ঘরের মধ্যে বসা দিল। মানিকে গিয়া সাধিল,—ভারী দোষ ঠাকুরপোর। না ভাই, তুমি থাকো। লক্ষ্মীটি! আমি এখনি ডাক্তার আনাচ্ছি, ওষুধ খেলেই অসুখ সেরে যাবে···

মানি তবু ঝঙ্কার ছাড়ে—না বাপু, না, আমি এখানে এমন অপমান সহিয়া কখনই থাকিব না···জামাই বাবু অমন করিয়া বলিলেন! কেন, কিসের জন্য! সে কি এখানে অমনি আসিয়াছে, না, তার মনিবের ঘরে ভাত নাই যে···ইত্যাদি।

অতি-কষ্টে খোসামোদ করিয়া পায়ে ধরিয়া সাধিয়া উমা মানিকে শান্ত করিল। তার পর মুস্কিল বাধিল, সিন্ধুকে লইয়া। সে সকালে গোঁ ধরিয়া বসিল, জল-খাবার কিছুতেই খাইবে না। তার আবার কি হইল? উমা ভয়ে কাঠ হইয়া গেল। কত সাধ্য-সাধনা করিল, মিনতি করিল, সিন্ধু মুখ বাঁকাইয়া বলিল,—আমার পেট ভার হয়ে রয়েচে, তবু খেতে হবে! এ যে অনাসৃষ্টি আব্‌দার!

অত্যন্ত কোমল জায়গায় প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া উমার মুখ চূণ হইয়া গেল। এ আদর সত্যই অসহ্য?··· তার মাথা ঘুরিতে লাগিল, পায়ের তলায় সমস্ত মাটী দুলিয়া উঠিল। পাছে পড়িয়া যায়, এই ভয়ে সে উঠিবার চেষ্টাও করিল না। বুকের উপর কোথা হইতে একরাশ অন্ধকার আসিয়া ভারী পাথরের মত চাপিয়া বসিতে-ছিল। কি ভীষণ তার চাপ! উমার নিশ্বাসও বুঝি তাহাতে এখনি বন্ধ হইয়া যাইবে। শূন্য মনে চুপ করিয়া রোয়াকেই সে বসিয়া রহিল। সে ভাবিল, বড় সাধ করিয়াই সিন্ধুকে সে আনাইয়াছিল—সে সাধ তার খুব মিটিয়াছে!···এত করিয়াও তার মন পাওয়া গেল না!

উমার মনে বেদনার পাহাড় ঠেলিয়া অশ্রুর সাগর উথলিয়া উঠিল। দুই চোখে তার তরঙ্গ ঠেলিয়া আসিল। উমা তখন সেইখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল—সমস্ত বাহিরের পৃথিবী সে অশ্রুর বন্যায় কোথায় ভাসিয়া গেল, তার কোন চিহ্নও রহিল না!

অনেকক্ষণ পরে স্বামীর স্বর কানে গেল,—কোথায় গো, এই মাছ এনেচি, দ্যাখো··

উমা ধড়মড়িয়া উঠিয়া চোখের জল মুছিল, তার পর মনের ভাব প্রাণপণে দাবিয়া সহজ হইয়া স্বামীর কাছে গেল। মাছ দেখিয়া বলিল—বেশ বড় মাছটি তো!

শরৎ বলিল,—হ্যাঁ। বহু-কষ্টে পাওয়া গেছে। কোনো ব্যাটা কি জলে নামতে চায়? কত খোসামোদ! এখন নাও, আমায় একটু চট্‌পট যা-হয় রেঁধে দাও। আমার আবার আজ একটু তাড়া আছে। চালানীর মাল বন্দোবস্ত করতে হবে।

উমার তখন হুঁশ হইল, তাই তো, সব কাজ যে পড়িয়া আছে! এ কি তার দুঃখ করিবার না অভিমান

করিবার সময় ! সে ঝীরির মাকে ডাকিয়া বলিল,—মাছটা কুটে দে ভাই, আমি রান্না চড়াতে যাচ্ছি। কথাটা বলিয়াই উমা গিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল।

সকাল সকাল স্নানাহার সারিয়া শরৎ অফিসে বাহির হইয়া গেল। এতক্ষণ কাজের মধ্যে ডুবিয়া থাকিবার দরুণ উমার কোনদিকে চাহিবারও অবসর ছিল না। শরৎ বাহির হইয়া যাইতেই তার মন একেবারে উমার চুলের মুঠি ধরিয়া একটা দিকে হিঁচড়াইয়া লইয়া চলিল। সর্ব্বনাশ, এখন যে মস্ত মান ভাঙ্গিবার পালা!

রোয়াকের একধারে হাবড়ার ঝী মানদাসুন্দরী মুখ একেবারে হাঁড়ি করিয়া বসিয়া আছে! সে তাড়াতাড়ি দুইটা ভালো সন্দেশ আনিয়া বলিল,—দেরী হয়ে গেল ভাই! এটুকু মুখে দাও, দিয়ে একটু জল খাও।

মানদাসুন্দরীর হাঁড়ি মুখ আরো ফুলিয়া উঠিল। সে ঝঙ্কার দিয়া কহিল,—আমার কি মুখে আর কিছু রুচবে! আমি খাবো না। এখানকার খাবার, ও আমার বিষ! মেজদা'মণিকে বলি, বলে তার পর চলেই যাই। ইষ্টিসানটা কোন্‌দিকে, একবার কাকেও দেখিয়ে দিতে বল না গো…

উমা একেবারে মচকাইয়া ভাঙ্গিয়া সেখানে মানির সামনে বসিয়া পড়িল, বসিয়া কাকুতি-ভরা স্বরে বলিল,—আমার মাথা খাবে, এটুকু যদি না মুখে দাও! ছি, এতে রাগ করতে আছে কি ভাই! লক্ষ্মী দিদি আমার, খাও।

চোখে শ্রাবণের ধারা ঝরাইয়া মানদা বলিল,—এমন অপমান! আমার বাপের কালে এত কথা শুনিনে কোথাও! গতর খাটিয়ে খাচ্ছি এত কাল…

উমা সভয়ে চারিদিকে চাহিল, ঠাকুরপো নাই তো? তার পর অনেকখানি চাপা গলায় মানির দুই হাত ধরিয়া অজস্র মিনতি করিয়া কহিল,—ওর উপর রাগ করো না, ভাই—ছেলেমানুষ!

মানির ঝঙ্কার তবু থামে না! সে বলিল—এমন অপমান…

উমা দারুণ বিপদে পড়িল। বড় লোককে পার পাওয়া যায়, কিন্তু বড় লোকের বাড়ীর ঝী…সে যে রৌদ্রের তাপে তপ্ত বালি—একেবারে অসহ্য!

তবু হাল ছাড়িলেও চলে না, সে মানির হাতে ধরিয়াও যখন দেখিল, তার দুর্জ্জয় অভিমান ভাঙ্গে না, তখন তার পায়ের কাছে হাত দিতে গেল—লক্ষ্মী ভাই, ঠাণ্ডা হও,—আমার মাথা খাবে, মরা মুখ দেখবে—এবং কথার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজে হাতে করিয়া দুইটা সন্দেশ মানির মুখে গুঁজিয়া দিল। মানি আর কোন আপত্তি করিল না!

মানিকে জল খাওয়াইয়া পাণ দিয়া উমা গেল সিন্ধুর উদ্দেশে। ঘরের মধ্যে সে একেবারে তাড়িয়া ব… আছে। উমা গিয়া তাকে একেবারে বুকের মধ্যে চা… ধরিল, বলিল,—এখনো কিছু মুখে দাওনি? যা… তোমার খাবার পাঠালুম, তা'ও তো পড়ে অ… দেখ্‌চি। খাওনি কেন সিন্ধু? কাজের ভিড়ে আ… পারিনি…

সিন্ধু কোন জবাব দিল না, অন্য দিকে মুখ ফিরাই…

উমা বলিল,—বড় বোনের উপর অভিমান হয়ে… ছি…এ অভিমান কি করতে আছে! তোমায় পে… যে আজ আমার আনন্দ রাখবার ঠাঁই নেই! লক্ষ্মী দি… আমার, এসো, কিছু মুখে দেবে এসো দিকি! কি করব… ভাই, তোমার বড় ঠাকুরের আপিসের তাড়া ছিল, ত… আগে আসতে পারিনি…

উমার বুক প্রচণ্ড ক্ষোভে দুলিয়া উঠিল। এ মন… পাইবার নয়? কেন সিন্ধু তার পানে ফিরিয়া চায় না… তার এই বুকঢালা স্নেহ…তার এ আদর, এ ভালোবাসা… সিন্ধুকে যে উমার কিছুই অদেয় নাই! পাছে তার পা… বেদনা বাজে, এজন্য তার চলার পথে উমা বুক পাতি… পড়িয়া থাকিতে পারে…তার বুকের উপর দিয়া সি… চলিয়া যাক্! হায়রে, ছোটর জন্য বড়র প্রাণ যত দুলিয়া ওঠে, ছোট তার কি বুঝিবে! তার বুকের ভিত… অশ্রুর পাথার একেবারে উথলিয়া উঠিল।

অভিমানও যে তার না হইল, এমন নয়!… ভাবিল, অন্যায় করিয়াছি, নিজের আনন্দ নিজের সুখে… জন্য তোমায় এ জঞ্জালের মধ্যে টানিয়া আনিয়া অপরা… করিয়াছি—আর কখনো এমন স্পর্দ্ধাও প্রকাশ করিব না …তবু এ তো তোমারো স্বামীর ঘর, শ্বশুরের ভিটা… উমা আবার বহু সাধ্য-সাধনা করিল, আদরে মিনতিতে সিন্ধুকে ভরিয়া দিল—তবু সিন্ধুর দুর্জ্জয় অভিমান ভাঙ্গে… জানে না!

উমা এ বিপদ কাটাইবার কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া যখন একান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, তখন প্রফুল্ল আসিয়া ঘরে ঢুকিল এবং সহজ ভাবেই বলিল,—কি হচ্ছে তোমাদের?

উমার বুকে যেন তীক্ষ্ণ তীর গিয়া বিঁধিল! সে একটা ঢোক গিলিয়া বলিল,—সিন্ধু এখনো জল খায়নি! কোন অসুখ করেচে কি না, কে জানে! বলচেও না কিছু!

অসুখ! প্রফুল্ল চমকাইয়া উঠিল! সে যে সেখানে কথা দিয়া আসিয়াছে, সিন্ধুকে সে খুব সাবধানে রাখিবে, তার কোন অসুখ হইতে দিবে না…! সে কথা ব্যর্থ করিয়া সিন্ধু অসুখে পড়িলে তার যে বড় মাথা হেঁট হইয়া যাইবে সেখানে! সে আসিয়া একেবারে সিন্ধুর কপালে হাত দিয়া বলিল—…

সিন্ধু মুখ বাঁকাইল। প্রফুল্ল বলিল,—কি অসুখ হয়েচে তোমার সিন্ধু? ম্যালেরিয়া নয় তো?

সিন্ধু একটু গর্জ্জনের স্বরেই বলিল,—অসুখ কেন হতে যাবে!

প্রফুল্ল বলিল,—তবে?

সিন্ধু বলিল,—আমি হাবড়া যাব। আমার মন কেমন করচে।

প্রফুল্লর আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল, এ সেই মানিকে তিরস্কারের জবাব! কিন্তু সিন্ধু না তার স্ত্রী? সে কোথায় তাহারি দিক লইয়া মানিকে তার স্পর্দ্ধার জন্য ভর্ৎসনা করিবে, না, সেও মুখ বাঁকাইয়া বসিয়াছে! তার সমস্ত ভবিষ্যৎ এ ব্যাপারে ফাঁশিয়া একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল!

উমা বলিল,—ভালো কথা, মানির অসুখের কি ব্যবস্থা করলে?

প্রফুল্ল বলিল,—কলকাতায় টেলিগ্রাম করলুম, সাহেব ডাক্তার আসচে।

উমা বলিল,—ছি, এ নিয়ে কি ঠাট্টা-তামাসা করে! সত্যি, শিববাবুকে আনাও ভাই! পাড়াগাঁয়ে থাকা তো ওদের অভ্যাস নেই। যদি ম্যালেরিয়াই ধরে···

প্রফুল্ল বলিল,—তুমি আর আস্কারা দিয়ো না, বৌদি। বিলেত থেকে এসেচেন সব! এই অজগর বিজন বনে, তাই অসুখ করেচে! আস্পর্দ্ধার কথা শুনলে গা জ্বলে যায়! তবু যদি হাবড়ায় না থেকে খাশ্ কল্‌কাতায় থাকতেন!

উমা রাগিয়া উঠিল, রাগ করিয়া বলিল,—বিলেত থেকেই আসুক আর যেখান থেকেই আসুক, তোমার বাড়ীতে এসে যখন অসুখ করেচে, তখন তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করাবে তুমি! তা না করে ঠাট্টা-বিদ্রূপ!

প্রফুল্ল স্থির দৃষ্টিতে বৌদির পানে চাহিল। বৌদি তো কখনো তাকে এমন তিরস্কার করে নাই—কোনদিন না! সে বৌদির পানে চাহিতেই উমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। কত বড় বেদনায়, আত্ম-মর্য্যাদায় কতখানি আঘাত পাইয়া উমা তাকে তীব্র স্বরে এ কথা বলিয়াছে, পাছে তা ধরা পড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় উমা বেশীক্ষণ প্রফুল্লর পানে চাহিয়া থাকিতেও পারিল না, ধীরে ধীরে চোখ নামাইল!

প্রফুল্লর বুকে কে যেন চাবুক মারিল! সে বুঝিল, তার ঐ কঠিন কথার আঘাত মুছিতে বৌদি বুকের রক্ত দিতে আজ উদ্যত হইয়াছে! মানি যে কুটুম-বাড়ীর লোক, তাকে অমন ভাবে কড়া কথা বলা তার উচিত হয় নাই···কিন্তু অমন করিয়া বৌদিকে যে অপমান করিতে যায়, তাকে যে কোনমতেই সে মার্জ্জনা করিতে পারে না!

সে ডাক্তারের বাড়ী ছুটিল; এবং তার পর মান-অভিমানের উপর মিনতির বৃষ্টি-ধারা ঝরাইয়া কোন-মতে এ যাত্রা পরিত্রাণ পাওয়া গেলেও আনন্দ-পুলকের সে সহজ সুরটুকুর আর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। সেদিন রাত্রে সিন্ধুর সেই অভিমানে-রুদ্ধ মনের দ্বারে মাথা কুটাকুটি করিয়াও এই সহজ কথাটুকু প্রফুল্ল কোন-মতেই প্রবেশ করাইতে পারিল না যে যত বড় লোকের মেয়েই তুমি হও, এ বাড়ীর বৌ তুমি···এ বাড়ীরই চির-কালের আপন-জন তুমি···এ বাড়ীর উপর তোমার রাগ সাজে না, আক্রোশ সাজে না! সে-বাড়ীর মেয়ে হইলেও সে বাড়ী আজ তোমার কেহ নয়, কিছু নয়! দুই দিন পরে সে-বাড়ী একেবারে পরের বাড়ীর মত হইয়া উঠিবে। সিন্ধু এ কথায় এতটুকু টলিল না। সে তার বিরূপতার গাম্ভীর্য্য লইয়া তেমনি গুম্ হইয়া রহিল।

হতাশ হইয়া প্রফুল্ল ভাবিল, বাজে দম দিয়া যতই সে তার ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করুক, সে স্বপ্ন, শুধুই স্বপ্ন! সত্যের সঙ্গে তার কোথাও মিল নাই, মিল হইবেও না কোনদিন!

দ্বিতীয় খণ্ড

১

সাত-আট বৎসর পরের কথা।

শরতের আরো চারটি সন্তান হইয়াছে। তার ব্যবসায়ে লাভ অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। আরো কয়-জন ইংরাজ এ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়ায় বাজারে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা ঘটিতেছে। অথচ সংসারে খরচ বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না! প্রফুল্ল পাশ করিয়া চাকরি লইয়া বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তারও তিনটি ছেলে-মেয়ে।

উমার দুঃখ ঘোচা দূরের কথা, দুঃখ বাড়িয়া চলি-য়াছে। ঠাকুরপোকে প্রাণের পাশে রাখিয়া বুক দিয়া সে বড় করিয়া তুলিয়াছিল, যার অদর্শনে সংসার তার শূন্য ঠেকিত, নারী-হৃদয়ের সেই প্রচণ্ড স্নেহ যার উপরে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছিল, সে আজ সুদূরের! সিন্ধু ভুলিয়াও এদিকে ঝোঁক দেয় না! চাকরিতে ছুটি-ছাটা মিলিলে সিন্ধু সকলকে লইয়া বাপের বাড়ী গিয়া ওঠে। তারি ফাঁকে প্রফুল্ল দুই-চারি ঘণ্টার জন্য দেশে বেড়াইয়া গিয়াছে, সকলের সঙ্গে দেখাশুনা করিয়াছে।

সেবারে সিন্ধুকে ও ছেলেদের শ্বশুর-বাড়ীতে রাখিয়া প্রফুল্ল দেশে আসিল দাদার ও বৌদির সঙ্গে দেখা করিতে। সেদিন রবিবার। শরৎ বাড়ীতে ছিল। ঠাকুরপোকে একা আসিতে দেখিয়া উমা বলিল,—ছেলেদের একবার আনলে না কেন ভাই? তাদেই সেই কবে দেখেছি, খোকার ভাতে, ওখানে গিয়ে। সেও চার বছর হয়ে গেল। কাকেও চোখে দেখতে পাইনে! এর পর তারা যে চিনতেও পারবে না!

প্রফুল্ল একটু স্তম্ভিত হইল। ঠিক কথাই তো! একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল,—তাদের শরীর খারাপ; একটার না একটার অসুখ লেগেই আছে।

শরৎ গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না।

উমা বলিল,—কতদিন ওখানে আছো এবার?

প্রফুল্ল বলিল,—আমি দিন পনেরো আছি। তারপর শ্বশুর হাবড়াতেই বাড়ী করাচ্ছেন কিনা, ওখানেই কিছুদিন ওদের রেখে যেতে বলচেন। গৃহ-প্রবেশ হবে। বলছেন, একসঙ্গে নতুন বাড়ীতে যাবেন...দেখি...

উমা বলিল,—তারা যদি না আসে, বেশ, আমাকেই নয় একদিন নিয়ে চলো, সব দেখে শুনে আসি! সিন্ধু তো আমাদের কথা ভাবেও না যে বড় জা বলে একটা জানোয়ার এখানে পড়ে আছে...

প্রফুল্লর রাগ হইল। সিন্ধুর এ অন্যায়! এত বড় অন্যায় যে তার আর পরিমাপ য় না! সে কতদিন বলিয়াছে, বৌদিকে চিঠি লেখো, বৌদি পর নয়। সিন্ধু জবাব দিয়াছে, চিঠি লেখা তার আসে না, কোন কালেই। সে কথায় প্রফুল্ল জবাব দিয়াছে, নিজের বোনদের বেলা চিঠি লিখিতে পারো ত! সিন্ধু রাগিয়া মুখ ভার করিয়া সরিয়া গিয়াছে।

কথাগুলা ছোট হইলেও এর পিছনে কত-বড় একটা চাকা ঘুরিতেছে, যার আঘাতে সমস্ত সংসার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া ধ্বসিয়া পড়ে! এবং কথাগুলা ছোট বলিয়াই প্রফুল্ল তাদের লইয়া বেশী নাড়াচাড়া করিতে সাহ পায় না। কেন না, এ সব কথার আন্দোলনে বুক এমনি ব্যথায় ভরিয়া ওঠে, সমস্ত জগৎটাই তা চোখের সামনে হইতে একেবারে সরিয়া যায়। তা সে মনে মনেই সমস্ত সহ্য করে; নিজের কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে সচেতন করিয়া বাড়ীতে দাদার কাছে বৌদির কা ঘন ঘন পত্র লিখিতে বসে। কিন্তু এটুকু সে খুব বো যে সংসারকে ভরাট রাখিতে গেলে তার একার চে নিতান্তই ব্যর্থ নিষ্ফল!

আজ বৌদির এই কথায় সিন্ধুর সঙ্গে কতদিনক এই সব নির্ম্মম আলোচনাগুলা একেবারে মহা-কল্লো প্রফুল্লর বুকের উপর উঠিয়া নৃত্য বাধাইয়া দিল। বু তার টল্‌মল্‌ করিতে লাগিল। নিশ্বাস ফেলিয়া তাড় তাড়ি সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল,—তাদের ক আর তুলো না বৌদি! তাদের ব্যবহারে আমার এ একবার মনে হয়, আত্মহত্যা করি।

উমা শিহরিয়া উঠিল, বলিল,—বালাই, ষাট!

তারপর আবার পাছে ঐ প্রসঙ্গ ওঠে, এই ভ প্রফুল্ল বলিল,—ভালো কথা, আমি বলছিলুম কি, আম হাতে কিছু পয়সা জমেচে। তা আমাদের বাড়ী আগাগোড়া মেরামত করাতে চাই। দাদাকে তা বলতে এসেচি। কতকগুলো ঘরও তৈরী করি—বে জানলা খড়খড়ি বসিয়ে এর ভোল ফিরিয়ে দি। ছেলে পিলেদের জন্য ব্যবস্থা করা এখন থেকেই আমাদে উচিত। মানুষের শরীরের কথা বলা যায় না।

শরৎ তবু তেমনি স্তব্ধ বসিয়া রহিল। এ-সব যে কাজের কথা! কোথায় সে প্রাণের কথা, খোলা মনে সে তীব্র অধীর উচ্ছ্বাস! ভাইকে পাইয়া ভাইয়ের বুে যে স্নেহ উথলিয়া ওঠে, তার সে সহজ সুর—কোথায়, তারি একটু পরশ পাইবার জন্য শরতের প্রাণ যে একে বারে ক্ষুধিত, তৃষিত রহিয়াছে!

প্রফুল্ল বলিল,—আমার একটি বন্ধু এ-সব কাজ ভাল বোঝে। তার মিস্ত্রী কাজ করবে, আর আমি হপ্তায় দু-তিনবার এসে দেখিয়ে শুনিয়ে দেবো। তুমি এই কাজগুলোর বন্দোবস্ত করো—যা লাগে, আমার কাছে বিল পাঠালেই চুকিয়ে দেবো! তোমারো সময় নেই—কাজেই আমার সেই বন্ধুটিকে এ-সব দেখা-শোনার ভার দিচ্ছি। এখন পরামর্শ করা যাক্, এসো, কোথায় কি করিতে হবে।

দুই ভাইয়ে তখন পরামর্শ করিতে বসিল। কাকা আসিয়াছে, ছেলে-মেয়েদের আনন্দ আর ধরে না! তারা কাকার কাছ হইতে নড়িতে চায় না। প্রফুল্লকে ঘিরিয়া সব বসিয়া রহিল। উমা প্রফুল্লর জন্ম লুচি ভাজিতে গেল।

পরামর্শ হইলে প্রফুল্ল ছেলেদের বলিল,—তোরা চ' আমার সঙ্গে, আজ সব ওখানে থাকবি, তারপর কাল আমিই আবার নিয়ে আসবো।

উমা আসিলে প্রফুল্ল বলিল,—এদের নিয়ে গেলে একটা রাত এদের ছেড়ে তুমি থাকতে পারবে, বৌদি?

উমা বলিল,—এখন সব পারি ভাই, সব সয়। একদিন তোমার অদর্শনও তো সয়েচি—সেই যে-সময় শিবপুরে পড়তে যাও! মনে আছে—আমি কাঁদছিলুম, তুমি এসে বোঝাতে বসলে? তা'ও সয়ে ছিল! তার বাড়া আর কি আছে বলো যে সহ্য হবে না! অতীত স্মৃতির পরশ লাগিয়া উমার চোখ ছলছলিয়া উঠিল।

প্রফুল্ল বলিল,—না, তামাসা করচি না। ওদের আজ নিয়ে যাই, কাল আবার আমিই রেখে যাবো। কাল তো আসচি আমি, আমার সেই বন্ধুটিকে নিয়ে।

উমা বলিল,—একটা সাধ হচ্ছে, বলবো?

প্রফুল্ল বলিল,—তুমি যে কট্‌স্থিতা করছো! কথা বলবে, তার জন্মে আবার অনুমতি চাইচ! বেশ!

উমা মনে মনে বলিল, এখন এ অনুমতি চাহিতে হয়। তুমি এখন কত দূরে সরিয়া চলিয়াছ···কিন্তু না, ছি! সে বলিল,—সিন্ধুকে আর ছেলেদের একবার আনো না ভাই, চক্ষে দেখি। আবার সেইদিনই নিয়ে যেয়ো।

একটু ভাবিয়া প্রফুল্ল বলিল,—বেশ, একদিন আনবো'খন। সকালে এসে সারা দিন থেকে রাত্রের গাড়ীতে না হয় ফিরে যাবে।

উমার প্রাণের উপর দিয়া পুলকের শিহরণ বহিয়া গেল। সে ভাবিয়াছিল, প্রফুল্ল বুঝি বলিবে, দুদিন থাকিয়া যাইবে, কিন্তু···যাক্, এক বেলা থাকিবে, এও যে বস্তু ভাগ্য!

প্রফুল্ল ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে লইয়া গেল—এবং পরদিন তাদের লইয়া যখন ফিরিল, তখন সঙ্গে আসিল, তার বড় ছেলে, প্রশান্ত। প্রশান্তর বয়স ছয় বৎসর। ভারী সুন্দর ছেলেটি।

প্রফুল্ল বলিল,—এই ভাখ্‌রে ছানু, আমাদের বাড়ী—আর এই তোদের জ্যাঠাইমা। চিন্‌তে পারিস্? সেই যে খোকার ভাতের সময় দেখেছিলি, মনে নেই?

উমার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া প্রশান্ত বলিল,—জানি।

উমা প্রশান্তকে কোলে লইয়া চুমায় তার ছোট মুখখানি ভরাইয়া দিল। তার বড় ছেলে অরুণ তখন রেশ-গেম খেলা পাতিয়া অধীর ভাবে প্রশান্তকে ডাকিতেছিল,—এসো না ভাইটি, খেলবে আমার সঙ্গে।

উমা বলিল,—ও কি রে?

উৎফুল্লভাবে অরুণ বলিল—এ একটা খেলা, এর নাম রেশ-গেম। কাকা কিনে দিয়েচে। সাহেবদের ছেলেরা খেলে। সব্বাইয়ের খেলা হয়েচে,—ভুলুর হয়েচে মোটর গাড়ী, মেনির একটি পুতুল—মট্‌রুর ইঞ্জিন, আর ছবির জন্ম কাকা কেমন বাঁশী কিনে দেছে—দেখেচো মা?

উমা বলিল,—সকলের হয়েচে, ছানুর কি হলো?

প্রশান্ত বলিল,—আমার ও-সব আছে। আমায় বাবা পিং-পং খেলা কিনে দেবে বলেচে।

উমা বলিল,—তুমি কি পড়চো বাবা?

প্রশান্ত বলিল,—দ্বিতীয় ভাগ পড়ি। প্রথম ভাগ আমার কবে শেষ হয়ে গেছে। আমি এখন রুক্মিণী বানানের পাতাটা পড়চি।

উমা তার মুখে চুমা খাইয়া বলিল,—লক্ষ্মী ছেলে। বাবার মত বিদ্বান হয়ো।

প্রশান্তকে পাইয়া উমা বর্তাইয়া গেল। তার মনে পড়িল, প্রফুল্লর শৈশবের কথা। তার চেয়ে আর একটু ডাগর ছেলে—নূতন বধূর বেশে আসিয়া এ-বাড়ীর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইতে সে একেবারে ছুটিয়া আসিয়া এই বুকে উঠিয়াছিল—তারপর এই বুকের উপরই সে বড় হইয়া উঠিল...সে যেন কালিকার কথা! উমা একটা নিশ্বাস ফেলিল।

ছেলেদের খাওয়াইয়া পরাইয়া উমা মনের গাঢ় অন্ধকারকে এক নিমেষে দূর করিয়া দিল। দুর্দ্দিনের ব্যথা-ভরা স্মৃতি এ আনন্দের হাওয়ায় কোথায় যে উড়িয়া গেল!

শরৎ ও প্রফুল্ল দুই ভাইয়ে প্রফুল্লর কণ্ট্রাক্টর বন্ধুর সঙ্গে ঘুরিয়া ফিরিয়া সমস্ত প্ল্যান পাকা করিয়া ফেলিল। পরদিন সকালে শরৎ ইট-কাঠের বন্দোবস্ত করিবে, ঠিক হইল; এবং পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই কাজ আরম্ভ হইবে, এমন ব্যবস্থাও পাকা হইয়া গেল।

প্রফুল্ল বলিল,—আমি থাকতে থাকতে কাজটা আরম্ভ দেখে যেতে চাই।

বন্ধু বলিল,—তা হবে'খন। মিস্ত্রী তো হাতেই আছে, রমজান—সে হুঁশিয়ার লোক—তার পাকা হাত।

সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে প্রফুল্ল প্রশান্তকে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিল। শরৎ বলিল,—তোমার একারই বা খরচের ভার নেবার দরকার কি। হাতের পুঁজি সব বার করবে কেন? যা লাগে তার অর্দ্ধেক না হোক, কাছাকাছি আমি দিতে চাই।

প্রফুল্ল বলিল,—কি দরকার দাদা! এটা আমার travelling থেকে জমিয়েচি—আলাদা, এই কাজের জন্য...

শরৎ বলিল,—তা হোক...

প্রফুল্ল গাঢ় স্বরে বলিল,—আমার টাকা কি তোমারো টাকা নয় দাদা?...এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করো না।

শরতের চোখ বাষ্পময় হইয়া উঠিল। প্রফুল্লকে বুকের মধ্যে টানিয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে সে বলিল,—ফুলু, ফুলু—আর কথা বাহির হইল না!

যাইবার সময় উমা ছানুকে ধরিয়া বারবার বলিয়া দিল,—আবার এসো বাবা। তোমার মা-বাবা আমায় ভুলতে চায়, ভুলুক। তুমি তোমার জ্যাঠাইমাকে ভুলো না, মাণিক! যখনি বাবা আসবে, তখনি তার সঙ্গে এসো ধন।...কিছুতেই বাবাকে ছেড়ো না! তারপর প্রফুল্লকে বলিল,—এটিকে আনবে তো ভাই, সঙ্গে?

প্রফুল্ল বলিল,—আনবো। তাতে আর অসুবিধে কোথায়!

২

বাড়ীতে মিস্ত্রী খাটানো উপলক্ষ করিয়া প্রফুল্ল প্রায়ই আসিতে লাগিল। কয়দিন সকালে আসিয়া এখানেই সে খাওয়া-দাওয়া করিল। উমা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়া বর্ত্তাইয়া গেল। তার আর আনন্দ ধরে না! ছেলেরাও কাকা বলিতে অজ্ঞান! কাকা নূতন কাপড় কিনিয়া দিয়াছে, জুতা কিনিয়া দিয়াছে, কত খেলনা। তা ছাড়া কাকার সঙ্গে আরো একদিন হাবড়ায় গিয়া সেখান হইতে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় কত জন্তু-জানোয়ার দেখিয়া আসিয়াছে।

আগের দিন ছেলেরা হাবড়ায় গিয়াছিল; প্রফুল্লর সঙ্গে সেইদিন ফিরিয়া ছিল। প্রফুল্ল চলিয়া গেলে উমা অরুণকে ডাকিয়া বলিল,—হ্যাঁ অরুণ, তোর কাকিমা কি বললে রে?

অরুণ বলিল,—কাকিমা...তারপর ছোট মুখে বিষাদ মাখাইয়া বলিল,—কিছু তো বলেনি মা!

উমা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—কিছু বলেনি! সে কি রে? কাকিমা কথা কয়নি তোর সঙ্গে?

অরুণ বলিল,—তা কয়েচে। বললে, সবাই ভালো আছো তো?

উমা বলিল,—তোদের চানটান্ করিয়ে কে সাজিয়ে দিলে?

অরুণ বলিল,—কাকা।

উমার বুকে একটা আঘাত লাগিল। হায়রে, মনের আড়াল তুলিয়া সিন্ধু চিরদিনই দূরে রহিল! তা থাকুক,—এরা ছোট শিশু, এদেরও কি দূরে রাখিতে হয়! অথচ এ আড়াল কিসের জন্য তোলা!

রাত্রে শরৎ জিজ্ঞাসা করিল,—কাল ছোট বৌমা আসবেন। শুনেচো?

উমা বলিল,—কৈ, না—কে বললে? ঠাকুর-পো?

শরৎ বলিল,—হাঁ, এমনি বলছিল। মিস্ত্রীর কাজ হচ্ছে কি না, তাই দেখতে আসবে একদিন, ফুলু বলছিল। তার পর বললে, দেখি, কাল যদি আসে।

উমা চুপ করিয়া রহিল। সে যদি আসিতেই চায় তো সে কথা উমাকে ঠাকুরপো বলিল না কেন? মনে তার বেদনা বাজিল। কিন্তু স্বামী পাছে তার আভাসও জানিতে পারেন, তাই সে সে-ভাব খুব সতর্কভাবে গোপন করিল।

পরদিন সকাল হইলে সে একটু বিশেষ ভাবেই আয়োজন সুরু করিল, যদি সিন্ধু আসে!

বেলা তখন দশটা, উমা পাঁচ ব্যঞ্জন তৈয়ার করিয়া ফেলিয়াছে—আর একটা কি বাকী ছিল—এমন সময় প্রফুল্ল আসিয়া দেখা দিল। উমা রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখে, সে একা—সিন্ধু আসে নাই। উমা বলিল,—সিন্ধু?

প্রফুল্ল বলিল,—সকালে উঠে দেখি, খোকাটার খুব সর্দ্দি হয়েচে। তাই তার আসা হলো না।

মুখে সে এ কথা বলিল বটে, কিন্তু মনে পড়িল রাত্রির সেই বকাবকি! সিন্ধু বুঝাইতে আসিয়াছিল, এই যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া পয়সা উপার্জ্জন করা হইতেছে, সে পয়সা ঐ পাড়াগাঁয়ের ভাঙ্গা ইটের স্তূপে গুঁজিয়া দিলেই কি পয়সার চতুর্বর্গ ফললাভ হইবে! তার চেয়ে তার বাবা পরামর্শ দিয়াছিলেন, এই হাবড়ায় জমি এখনো শস্তা, এইখানে শ্বশুরের বাড়ীর পাশে ঐ যে প্রকাণ্ড জমি পড়িয়া আছে, ওটা কিনিয়া তাহাতে প্রকাণ্ড বাড়ী তৈয়ার করো যে হাঁ, একটা সম্পত্তি হইবে। তা সে বুদ্ধি না লইয়া দেশের ঐ এজমালি বাড়ীটায় টাকা ঢালি[illegible]কার কম অপব্যয় হইতেছে! তা ছাড়া ওখানে থা[illegible] করবে কে! ছেলেদের লেখাপড়া আছে, তাদের মানুষ করা চাই তো। বাপের ভিটা বলিয়া সেখানকার মাটী কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিলেই তো কাজকর্ম্ম চলিবে না।

এ-কথায় চটিয়া প্রফুল্ল বলিয়াছিল, এজমালি! বটে! বাপের ভিটা ছাড়িয়া শ্বশুরের বাড়ীর পাশে বাড়ী তুলিলেই একেবারে বাঞ্ছিত সম্পদকে আয়ত্ত করা [illegible]

পড়িবেন! তবুও সে-ভাব কিছুমাত্র প্রকাশ না করিয়া সে বলিল,—আমরা দেশের বাড়ী থেকেই মানুষ হয়েচি, ...ঝলে! মানুষ যে হয়, সব জায়গা থেকেই সে হয়। ওটা কেবল জায়গা-বিশেষের কায়েমি দাবী নয়।

উত্তরে সিন্ধু বলিয়াছিল,—তা হলেও ওখানে কে থাকবে? আমি তো থাকচি না।

প্রফুল্ল বলিল,—তুমি এই বাপের বাড়ীতেই থেকো। ভাইয়ের আদরে সোনার অন্ন মুখে তুলো। আমার ভাই, ভাইপো, আমি, আমার ছেলেরা, আমাদের সেই ...রেই স্বর্গ।

ঠিক এই ব্যাপারগুলাকে উপলক্ষ করিয়াই এবার ...টিতে আসিয়া বাড়ীর উন্নতির দিকে প্রফুল্ল মনের এত ঝোঁক অর্পণ করিয়াছিল। সত্যই তো, এ দিকে তার খেয়াল ছিল না—আশ্চর্য্য! এবারের ছুটিতে এখানে আসিবার পূর্ব্বেই শ্বশুর পত্র দিয়াছিলেন, তাঁর বাড়ীর পাশে ঐ জায়গায় অনেকটা জমি আছে এবং দামও ...া। প্রফুল্ল যদি কেনে, তাহা হইলে বেশ বাড়ী তৈয়ার করানো যায়! এ কথায় সিন্ধুর মনও ...সম্ভব টলিয়া ওঠে! তাই সে প্রফুল্লকে পীড়াপীড়ি ...ক করে।

সিন্ধুর এই সস্মিত ভাব দেখিয়া প্রফুল্ল বলিয়াছিল, ...ক্ক আমার যে ঘর নেই, এমন তো নয়। কাজ কি ...মার জমি কেনায়···নিজের বাড়ীর উন্নতি তো করতে ...রি। আমার দাদা, বৌদি, এঁরা থাকবেন ভাঙ্গা ...ড়েয়, আর আমি শ্বশুর-বাড়ীর পাশটীতে প্রাসাদ তুলে ...জভোগ খেয়ে আরাম করবো! বটে! এমন মন ...মার নয়!

এ কথার যা-কিছু ঝাঁজ গিয়া একেবারে সিন্ধুর ...ম সাধটিকে পুড়াইয়া দগ্ধ করিয়া দিল। সমস্ত বুক ঝাঁজে তাতিয়া উঠিল। সে গুম্ হইয়া বসিয়া ...হিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া প্রফুল্ল বলিল,—আর কল্পনাতেই এত বিভোর তুমি যে প্রাণে আর আনন্দ ...র না! হাবড়া হলো মস্ত সহর, আর আমার সে গাঁ, ...কবারে জঙ্গল, সুঁদর-বন! সেখানে মানুষ বাঁচে না, ...খানে মানুষ থাকে না, যত জানোয়ারের বাস ...খানে,—না?···

সিন্ধু এ কথার অর্থ না বুঝিয়া প্রফুল্লর পানে চাহিয়া ...হিল। প্রফুল্ল বলিল,—আমার বাড়ীতে তুমি পায়ের ...লা দেবে, এর জন্য আমার বৌদি—যাঁকে আমি মা ...ল মানি, মা বলেই জানি, যাঁর স্নেহ না হলে আমি ...চতেও পারতুম না, মানুষও হতুম না, এই পয়সারো ...দেখতুম না—সেই বৌদি মাথা কুটে মরচেন, তাঁর সাধটুকু রক্ষা করতে তুমি আমার বাড়ীর মাটি ছুঁতে ...য়ো না!···আমি নেহাৎ বেহায়া, তাই এখানে তোমার বাপের বাড়ী এসে থাকি, পরম সুখে থাকি—আর সেখানকার অন্ন ও রাজভোগ বলে মুখে তুলি···

সিন্ধু বলিল,—কেউ কিছু বলেচে কোনদিন?

প্রফুল্ল বলিল,—কারো বলা না বলার কথা নয়। আমি পুরুষ মানুষ, পাছে ওঁরা কিছু মনে করেন, তাই আমি কোন দিকে কিছু বলি না। বল্‌বোই বা কি! এ তো বাইরের লোকের সঙ্গে তর্ক নয়, মান-অভিমান নয়, নিজের স্ত্রী সঙ্গে বোঝাপড়া। যে-স্ত্রী স্বামীর মনের পানে ফিরেও তাকায় না, নিজের মন নিয়ে একান্ত ব্যস্ত থাকে, তার কাছেও দুঃখ জানাতে আসি, হায়রে! ···স্ত্রীর দরদ যে পায় না, স্ত্রীর সহানুভূতি যে পায় না, তার মত বেচারা আর কে আছে!

কথায় কথায় কথা আরো বাড়িতেছে এবং কোথায় গিয়া এ কথার শেষ হইবে, কে জানে! পাছে হীনতার ছোঁয়াচ মনে লাগে, এই ভয়ে প্রফুল্ল কথা বন্ধ করিয়া গম্ভীর হইয়া রহিল। এমন কলহ প্রায়ই হইত। সিন্ধু রাগ করিয়া বসিয়া থাকিত, আর প্রফুল্ল নিশ্বাস ফেলিয়া একটা কোন কাজ হাতে টানিয়া লইত।

৩

এবারে হাবড়ায় আসিয়াও একদিন প্রফুল্লর সঙ্গে সিন্ধুর কলহ হইয়া গেল। বাপ-মার পরামর্শে সিন্ধু স্বামীকে ধরিয়া বসিল, তুমি আমাদের এই নতুন বাড়ীর পাশে যে জমি আছে ঐটে কেনো গো! এ তোমায় কিনতেই হবে। কিনে ঐ জমির উপর বাড়ী করো। বাড়ী তো চাই সত্যি। ছেলেপিলে বড় হলে তাদের নিয়ে দেশে দেশে ভেসে বেড়ানো তো চলবে না। তাদের মানুষ করতে হবে!

আবার সেই পুরানো কথা! তবে এবার সিন্ধুর স্বরে জিদের অনেকখানি প্রাবল্য দেখিয়া প্রফুল্ল সিন্ধুর পানে চাহিল। এখানে আত্মীয়-স্বজনে পরিবৃত সুসজ্জিত দুর্গে বসিয়া শক্তি তার আরো দুর্জ্জয়, বটে—সিন্ধু নিশ্চয় এমনি একটা কথা ভাবিয়া লইয়াছে! প্রফুল্ল স্থির দৃষ্টিতে সিন্ধুর পানে চাহিয়া রহিল; পরে বলিল,—এখানে জমি আমি কিনবো না। এ কথা তো অনেকদিন আগেই বলেচি তোমায়। আবার এ কথা কেন?

সিন্ধু গর্জ্জিয়া উঠিল, কহিল—একটা মাথা গোঁজবার ঠাই চাই তো।

প্রফুল্ল কহিল,—আমি নিরাশ্রয় নই তো। দেশের বাড়ীতে আরামে মাথা গুঁজে বেশ থাকা যাবে। আমার বড় ভাই, আমার ভাইপোরা সেখানে আরামে বাস করচে! ম্যালেরিয়া তাদের গ্রাস করেনি! আমি দেশের বাড়ী ঘর-দোর বাড়াবো—তাহলে কারো কষ্ট হবে না। সে আমার পৈতৃক ভিটে!

সিন্ধু বলিল,—তা হতে পারে, কিন্তু আমার ছেলেরা সে বাঁশ-বনে থাকতে পারবে না, তা আমি বলে রাখচি।

প্রফুল্ল বলিল—তা না থাকতে পারে, সেখানে থাকবে না! তাদের জন্য তুমি অন্য ব্যবস্থা করতে পারো। সে বাড়ী ভালো করবার পর যদি আরো পয়সা থাকে, তখন এধারে বাড়ী করার কথা মনে আনতে পারি। তা পারলেও হাবড়ায় করবো কেন! খাশ্ কল্‌কাতায় করবো, যদি কাজের সুবিধার জন্যই করতে হয়⋯

এইখানে প্রফুল্লর এই কথায় আসিয়া সিন্ধুর যা-কিছু অনুযোগ, মিনতি, উপরোধ এমন ঘা খায় যে তার বেদনায় সে একেবারে মরিয়া যায়! নারীর কাকুতি, প্রিয়ার অশ্রু—সব একেবারে নৈরাশ্যের ঘায়ে জর্জ্জরিত হইয়া ফিরিয়া আসে! প্রফুল্ল তা গ্রাহ্য করে না! এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল।

প্রফুল্ল সে চোখের জল লক্ষ্য করিল না। সে জামা-কাপড় ছাড়িয়া বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সিন্ধু চোখের জল মুছিয়া প্রশ্ন করিল,—কোথায় বেরুনো হচ্ছে?

গম্ভীর কণ্ঠে প্রফুল্ল কহিল,—দেশে যাচ্ছি।

সেই দিনই প্রফুল্ল বাড়ী আসিয়া ঘর-দ্বার তৈয়ার করিবার সঙ্কল্প দাদার কাছে প্রকাশ করিল এবং সেইদিন হইতেই এ কার্য্যে পরম উৎসাহে সে লাগিয়া গেল।

ইহার কিছুদিন পরে শরতের ছেলেদের জন্য কয়েকটা ভালো জামা তৈয়ার করাইয়া দিবার জন্য প্রফুল্ল দামী কাপড় কিনিয়া আনিল। অরুণ সেদিন ছানুর সুট্ দেখিয়া তার প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। বালকের সেই প্রশংসমান দৃষ্টি এমন মিনতি ভরিয়া প্রফুল্লর প্রাণে লাগিয়াছিল যে, তার সুর একেবারে মর্ম্মে বিঁধিয়াছিল। সে ভাবিল, তাই তো, দাদা তার জন্য অকুণ্ঠিত হস্তে একদিন কত খরচ করিয়াছে, আর সেই দাদার ছেলে-মেয়েদের নানা সাজে না সাজাইয়া সে বেশ নিশ্চিন্ত আছে তো। বৌদি যে একদিন তার গায়ের সমস্ত গহনা খুলিয়া সিন্ধুর গায়ে পরাইয়াও আজ অবধি নিজে নিঃসম্বল হইয়া আছে! আর প্রফুল্ল ভুলিয়া ওদিক পানে চাহিয়া দেখিবার অবসর পায় নাই! সিন্ধুর গা গহনার পর গহনা দিয়া ভরাইয়া দিয়াছে! ধিক্কারে প্রফুল্লর মন হাহা করিয়া উঠিল। সে তখন এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি যত দূর পারে সারিয়া লইতে উদ্যত হইল।

ভাইপোদের জন্য দামী জামার কাপড় কিনিয়া আনিয়া প্রফুল্ল প্রশান্তকে বলিল—ছানু, কাল দাদাদের আন্‌তে যাবি রে?

সিন্ধু সেই ঘরে বসিয়া সেলাইয়ের কলে ছোট ভাইঝীর জন্য ফ্রক সেলাই করিতেছিল, আর প্রশান্ত ওরফে ছানু কাছে বসিয়া সেলাই দেখিতেছিল। ছানু পিতার কথায় লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—যাবো বাবা।⋯এবার এব ছিপ দিতে হবে আমায়, গিয়ে পুকুরে মাছ ধরবে দাদার মত আমার ছিপ চাই।

সিন্ধু পুত্রের পানে চাহিয়া একটু ঝাঁজালো স্ব বলিল,—সেখানে গিয়ে খালি পুকুর-ধারে ঘোরা হ বুঝি!⋯তুমি যেতে পাবে না এবার।

ছানু ছলছল চোখে বলিল,—আমি যাবো।

সিন্ধু বলিল,—না, যাবে না।

ছানু অভিমান-ভরা স্বরে বলিল—হ্যাঁ, আমি যাবে সে তো আমাদের বাড়ী—কেন যাবো না?

কথাটা খুব সামান্য। কিন্তু ইহা লইয়া মাতা-পুত্রে তর্ক গিয়া প্রফুল্লর গায়ে ঠেকিল, এবং তাহারি একটা ধরিয়া সিন্ধু প্রফুল্লকেও দুটা কড়া কথা শুনাইতে ছাড়ি না। মাঝে হইতে সিন্ধু রাগিয়া কাঁদিয়া ঘর হই পলাইয়া গেল এবং প্রফুল্লও ছানুকে লইয়া সেই দ বারুইপুর যাত্রা করিল।

সেখানে কয় ঘণ্টা কাটাইয়া ভাইপোদের সঙ্গে ল প্রফুল্ল যখন হাবড়ায় ফিরিল সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ-প্রা প্রফুল্ল অরুণকে লইয়া উপরে আসিতে শাশুড়ী বলিলে —তুমি নাকি রাত্রে খাবে না বলেচো! ঠাকুর বলছি যে জামাই-বাবু আর তাঁর ভাই-পোরা এখানে খাবে না

প্রফুল্ল বলিল,—না, আমাদের নেমন্তন্ন আছে সেখানে খেয়ে ছেলেদের নিয়ে একবার বায়োস্কোপ দেখ যাবো। ফিরতে বোধ হয় রাত এগারোটা বাজবে।

প্রফুল্লর মুখে অভিমানের একটা কঠিন ছাপ সু লক্ষ্য করিয়া শাশুড়ী একটু উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি গি সিন্ধুর কাছে সে কথা বলিলেন।

সিন্ধু কহিল,—যা ইচ্ছা হয় করুক, তুমি কেন মি ভাবচো?

শাশুড়ী বলিলেন,—তোর সঙ্গে বুঝি ঝগড়া হয়েছে কিছু বলেছিস, বুঝি?

সিন্ধু বলিল,—কি আবার বলবো! সেখানে গি ছেলেরা পুকুরধারে ঘোরে, যদি জলে-টলে পড়ে য তাই আর কি বলেছিলুম, ছানুর সেখানে যাওয়া হবে ন আমি যেতে দেব না। তাই রাগ! ছেলের সাম আমায় এ অপমান করা নয়? আমার কথা ঠে ছেলেকে নিয়ে যাওয়া⋯এর পর ছেলে আমায় মানবে বলবে কে ও দাসী, না বাঁদী⋯সিন্ধুর চোখে জ উথলিয়া উঠিল।

মা বলিলেন,—আর এ তুচ্ছ কথা নিয়ে কেনই তুই ঝগড়া করিস বাপু! ওর ছেলে, ওর কি বো নেই⋯?

সিন্ধু বলিল,—হ্যাঁ উনি কি আর ছেলের পিছনে পিছনে পুকুরধারে চৌকি দিতে যাবেন।⋯সে পাড়া

া, তাদের দাপট কত! এরা কি সে-ভাবে মানুষ
ে, না, ও-সব পারে। যা ভালোবাসি না, তাই!
যে সেদিন ওখান থেকে এলো, অমন দামী ভেল-
ের পোষাকটা ছিঁড়ে ফেলেচে,—তা কিছু বললে!
বললুম, এমন দামী পোষাক ছিঁড়ে এসেচিস! তা
হলো কি, যে, আর বকোনা গো—ও মাঠে দৌড়ুতে
লো, পড়ে গিয়ে ছিঁড়ে ফেলেচে! কথা শুনলে গা
যায়!

মা বলিলেন,—বেশ তো বাপু, না হয় ছিঁড়েই
চে। ও কিনে দেছে, ও বুঝবে। তুই কেন তা নিয়ে
া করে মরিস!

সিন্ধু বলিল,—ছেলে দোষ করলে কিছু বলবো না? আমি দাসী, না বাঁদী…?

মা বলিলেন,—এতে দুঃখ করলে চলবে না তো মা। মানুষকে চিরদিন স্বামীর মন জুগিয়ে চলতে হয়। র মনের ঝোঁক বুঝে ঠিক সেই পথে স্ত্রীর মনকেও ত হবে।

সিন্ধু কাঁদিয়া বলিল,—এমন বাঁদীগিরি আমার দ্বারা বে না…আমার বাপ তো সে-ভাবে মানুষ করেনি য়! বাবা কখনো অত কড়া শাসনে রাখেনি, আজ…

মা বলিলেন,—একে বাঁদীগিরি বলে না। আর বাঁদী বা কি! আর কারো বাঁদী নোস্ তো, স্বামীর …স্ত্রী তো চিরদিনই স্বামীর বাঁদী…

সিন্ধু কহিল,—কখনো নয়! স্বামীরও যেমন মন আছে, স্ত্রীরও তেমনি এক আলাদা মন ,স্বামীর যেমন সুখ-দুঃখ স্ত্রীরও ঠিক তেমনি। মানুষ, স্ত্রীও মানুষ, সে জানোয়ার নয়। উচিত, স্ত্রীর মন বুঝে নিজের মনকে একটু সুধরে । স্ত্রীকে বনিয়ে বুঝে স্বামী তাকে মেনে চলবে, তুমি স্বামী বলে রাজসিংহাসনে বসে দিবারাত্রি ালাবে, আর স্ত্রী খালি তোমায় কুর্নিশ করবে আর কুম মেনে চলবে, নিজের মনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে… সম্পর্ক স্বামি-স্ত্রীর হতে পারে না…

মেয়ের মুখে নূতন রকমের কথা শুনিয়া মা আতঙ্কে য় উঠিলেন। হতাশভাবে মেয়ের পানে চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিলেন, এবং একটু পরে বলিলেন,—নয় মা…। তোর জন্য ও কি না করচে, বল্ এই যে, তার বাড়ীতে তুই গেলিই না…এত পু…

সিন্ধু বলিল,—ঐ এক কথা তোমার! আমি সেখানে মা, সেখানে যেতে পারবো না। আমার ভালো না—এর উপর কথা আছে! সেখানকার হাওয়া আমার সহ্য না হয়! সবাইয়ের কি সব ভালো লাগে!

সিন্ধু ধড়মড় করিয়া চলিয়া গেল। মা গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। এ তো তাঁর দোষ! মেয়ের বিবাহ দিয়া চিরকাল অন্ধ-মায়ার বশে তাকে আপনার কাছেই তিনি আঁটিয়া টানিয়া রাখিয়াছেন। সেখানে পাঠাইবার কথা উঠিলে, মেয়ের আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় আহত মলিন মুখখানির পানে চাহিয়া মায়া যে তাঁর উথলিয়া উঠিত! এই মেয়েকে অত দূরে কোন্ অজানা ঘরে অজানা লোক-জনের মাঝে পাঠাইতে তাঁর বুক ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইত… মনে হইত, পাড়া গাঁ, গরিবের ঘর—মেয়ের কত কষ্ট হইবে! মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া তার বেদনা ভাবিয়া মা তখন শিহরিয়া উঠিতেন, …কেন সে সময় জোর করিয়া তিনি মেয়েকে সেখানে পাঠান নাই! তাদের সঙ্গে মেলামেশা না করিলে মন কখনো তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়! সে মেলামেশার সুযোগ ঘটিলেও তিনিই তাহাতে বিপুল উৎসাহে বাধা দিয়া আসিয়াছেন; বাঙালীর মেয়ের সত্যই কিছু স্বামীই সব নয়…ভাসুর, দেওর, জা, ইহারা সকলেই সংসারটিকে ঘিরিয়া আছে!

আজ এত দীর্ঘ কাল পরে এ কথা তাঁর মনে জাগিল—এত দিন জাগে নাই! তিনিই তো এ ব্যবধান রচিয়া আসিয়াছেন! এ কথা আজই কি তাঁর মনে আসিত! তবে এবারে প্রফুল্ল এখানে আসিয়া এই ব্যাপার লইয়া বাড়ীতে কতদিন অনুযোগ তুলিয়াছে! সেদিনও দেশের বাড়ীতে যাইবার কথা তুলিলে সিন্ধু একেবারে বাঁকিয়া বলিল,—সে যাইবে না! প্রফুল্ল অমন ভালোমানুষ, এ ব্যাপারে কতখানি বেদনায় মুখ ফুটিয়া সে সেদিন নালিশ রুজু করিয়াছিল, শাশুড়ী তা বুঝিয়া ছিলেন! তার সেই মলিন মুখ…আহা! কিন্তু যে একরোখা মেয়ে—পাছে এ লইয়া অনুরোধ করিতে গেলে কি করিয়া বসে—এই জন্য মা তাকে অনুরোধ করেন নাই! কিন্তু সত্যই তো, প্রফুল্ল মন্দ কথা কিছু বলে নাই! কেনই বা সেখানে যাইবি না? বাস করিতে না পারিস, একবেলা বেড়াইতে যাওয়াও দোষের? মেয়ের সকলি অনাসৃষ্টি!

স্বামীর উপর রাগ ধরিল। তিনি বলিলেন কি না, তা না যায়, না যাবে! ব্যস্! এ ভাবে আস্কারা দিলে মেয়ে কখনো ঠিক পথে চলিতে পারে? না, চলিবার তার বুদ্ধি যোগায়?

৪

মা মেয়েকে বুঝাইলেন, একবার সেখানে যা, ও যদি খুশী হয়…কথাটা রাখ্ই না, বাপু!

মেয়ে বলিল,—তুমি তো জানো না, সেখানকার ব্যাপার! সেখানে দেশ-শুদ্ধ লোক এসে বাড়ী চড়াও

হয়—কত রকম যে তাদের কথাবার্ত্তা, কত রকম যে টিপ্পনী! একটু ভব্যতা জানে না, আলাপ না থাকলেও এমন গায়ে এসে পড়ে যে দেখলে গা জ্বলে যায়! তাছাড়া সেই মুদি-কৈবর্ত্তর মেয়েরা অবধি 'কি লো বৌ' বলে এসে গায়ে ঢলে পড়ে! এ-সব সয়ে সেখানে তাদের সঙ্গে বসে গল্প করতে হবে,—তারা যে কিসে খুশী হবে, আর কিসে না হবে, তা তাদের ভগবানই ঠিক করতে পারেন না, আমি কোন্ ছার! মাথায় ঘোমটা দিয়ে কলা-বৌ সেজে দিন-রাত থাকো! তা যদি না করো তো নিন্দে! মাথার ঘোমটা সরে গেলে নিন্দে! জানো না তো সেখানকার ধরণ! ভারী সেধে-গায়ে-পড়া লোক সব! দু'দণ্ড যে ঘরের কোণে বসে একখানা বই পড়বো, তার জো অবধি নেই! বল্বে, বিবি-বৌ!…এ সয়ে কি মানুষ থাকতে পারে!

মা বলিলেন,—কেন বাপু, তোর তো কোন কষ্ট নেই, নাইবার কি হাত ধোবার জল অবধি তারা জুগিয়ে ছায়!…আর সেখানেই থাকতে যদি হতো বারো মাস? প্রফুল্ল যদি জেদ ধরে?

সিন্ধু কোন জবাব দিল না, গুম্ হইয়া রহিল।

জামাইয়ের কাছে গিয়া শাশুড়ী বলিলেন,—একবার সিন্ধুকে নিয়ে বাড়ীটা ঘুরে এসো বাবা। বাড়ী-ঘর তৈরি হচ্ছে, ওরও তো দেখবার সাধ হয়!

শুনিয়া প্রফুল্ল অবাক হইয়া গেল, সিন্ধুর মত হইয়াছে, তার দেশের বাড়ীতে যাইবার জন্য! সিন্ধুকে সে জিজ্ঞাসা করিল,—এ কি সত্যি?

সিন্ধু বলিল,—কি, সত্যি? তার মুখের ঘোরালো ভাব তখনো পর্য্যন্ত একটুও কাটে নাই! প্রফুল্ল তার পানে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

সিন্ধু বলিল,—তোমাদের কি চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হবে আমায় সেখানে নিয়ে গিয়ে, তা তোমরাই জানো! চলো…

প্রফুল্ল ভাবিল, এ তার মনের কথা নয়, শাশুড়ী হয়তো খোঁচা দিয়াছেন, তারি ফলে…কিন্তু এ তো ঠিক নয়। সেখানে বৌদির সামনে কতবার অপরাধের বোঝা কাঁধে তুলিয়া সে গিয়া দাঁড়ায়, আবার চলিয়া আসে! পাছে এই বিশ্রী আব-হাওয়ার ছোঁয়াচে বৌদির মন ভারী হইয়া ওঠে, বিষাদে মুষড়াইয়া যায়, এজন্য সে বেশীক্ষণ সেখানে থাকিতেও সাহস করে না! আর এখন সিন্ধুকে জোর করিয়া সেখানে লইয়া গেলে কথার ঝাঁজে সিন্ধু যখন বৌদির মনটাকে পুড়াইয়া দিবে, …তখন যে তার আর সেখানে মুখ দেখাইবারও উপায় থাকিবে না! তার চেয়ে সিন্ধু যেমন আছে, তেমনই থাকুক্! সে তো বৌদির পরিচয় লইতে কোনদিনই আগ্রহ করিল না। যদি পরিচয় লইত, যদি মিশিত, তাহা হইলে দেখিত, কি উদার মন, কি স্নেহের সা[গর] সে বুকের মধ্যে!

প্রফুল্ল ধীর স্বরে বলিল,—তোমায় যেতে হবে ন[া] যেতে তো আমি বলিনি…

সিন্ধু ঝঙ্কার দিয়া বলিল,—আবার কি করে বলা হয়! মার কাছে লাগানো হয়েছে, মা আমায় বাধ্যে তাই করলে!

প্রফুল্ল বলিল,—লাগানো স্বভাব আমার নয়। পাড়[া]গেঁয়ে হলেও তেমন শিক্ষা কখনো পাইনি যে কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনদিন তাকে কোন কাজ কর[তে] বলবো! আর তাঁরাও তুমি না যাওয়ার দরুণ সত্যি হেদিয়ে মরবেন না! তুমি গেলে তাঁরা কিছু সশরীরে স্বর্গেও যাবেন না…

সিন্ধু এ কথায় উত্তপ্ত হইয়া বলিল,—কে যেতে চায়! আমি কি তোমায় বলেচি যে ওগো, সেখানে আমায় নিয়ে চলো—নাহলে আমি মরে যাবো!

প্রফুল্ল বলিল,—তা সাধোনি, তবে সাধা উচি[ত] ছিল। স্ত্রীলোকের নিজের ঘরই হলো তার স্বামী[র] ঘর। বাপের বাড়ীতে যত আদরই থাক্, সেটাতে স্ত্রী[-] লোকের অধিকার থাকে না। আজ যদি আমি মা[রা] যাই, তাহলে এই বাপের বাড়ীতে পড়ে থাকলে বুঝতে পারবে যে, এ ঘর তোমার কত আপনার! নিজের লোক কে, তুমি তা আজও চিনলে না, চেনবার চেষ্টা করলে না কোনদিন। আমি জামাই এসে শ্বশুর[-] বাড়ীতে বাস করতে পারি, আর তুমি সে-ঘরের [বৌ] হয়ে সেখানে বাস করতে পারলে না! আশ্চর্য্য!

সিন্ধু এ কথায় কিছুমাত্র বিচলিত হইল না—রা[গে] তার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। সে চুপ করিয়া জানলা[র] ধারে গিয়া বসিয়া রহিল।

এই সে জানলা! প্রফুল্লর মনে হইল, এই জানলাতেই [ঐ] তরুণী নায়িকা সাজিয়া সিন্ধু বসিয়া থাকিত, আর পথে [সে] পথিক বেশে সে আসিয়া দেখা দিত! কি স্বপ্নচ্ছন্দে [না] না প্রাণ একদিন নাচিয়া উঠিত! এই কুহকে মজি[য়া] সে বৌদির প্রাণঢালা ভালোবাসা উপেক্ষা করিয়াছে, দাদার সুগভীর স্নেহ ভুলিয়া এইখানেই মিলন-রা[ত্রি] কাটাইয়া সুখে বিভোর হইয়াছে! আর আজ? [সে] অপরাধের শাস্তি পাওয়া চাই তো! খানিকক্ষণ সিন্ধুর পানে চাহিয়া কাঠ হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপ[র] মনে অত্যন্ত অনুতাপ জাগিল—এতদিন সবই য[দি] নীরবে সহ্য করিয়াছে তো আজ সহসা এমন অধী[র] হইয়া জ্বলিয়া উঠিল কেন? ছি ছি, সে ভারী ছেলে[-] মানুষী করিয়াছে!

সে তখন সিন্ধুর পাশে গিয়া বসিল, বলিল,—আমা[য়] মাপ করো সিন্ধু…

সিন্ধু ঝাঁজালো দৃষ্টিতেই তার পানে চাহিল, অমনি নর মধ্যে বিজয়ের রাগিণী ঝম্‌ঝম্‌ করিয়া বাজিয়া ঠল। ঈষৎ হাসিয়া সে মুখ ফিরাইল, বলিল,—মাপ াবার কিসের!

প্রফুল্ল বলিল,—এ কথা নিয়ে তোমার সঙ্গে জীবনে খনো বাদানুবাদ করবো না ভেবেছিলুম, আজ দৈবাৎ র ফেলেচি, তারই জন্য! তোমার দোষ নেই, এ কথা াচি না!

সিন্ধুর মনের লুপ্তপ্রায় অভিমান আবার মাথা ঝাড়া া জাগিয়া উঠিল। সে বলিল,—সব দোষ আমারই। মি হিংসুটে মানুষ। বেশ তো বাবু, আমার হিংসা য় আর কারো ঘাড়ে পড়চি না তো। সেজন্য আবার া কিসের কথা! কা ঁ কথার ধার আমি ধারিনে…

প্রফুল্লও রাগিয়া উঠিল। সে বলিল,—তা তো ই! প্রবল-প্রতাপান্বিত ব্যক্তি… মুখে আরো কঠিন া আসিতেছিল, কিন্তু এই বাদানুবাদ আবার পাছে নরূপ ইতর ইঙ্গিতের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, সেই ভয়ে ল মনের রাশ টানিয়া ধরিয়া চুপ করিল এবং ক্ষণেকের সেখানে দাঁড়াইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

সেই দিনই আহারের পর প্রফুল্ল যখন বিছানায় -ভার লুটাইয়া দিল, চিন্তার তরঙ্গ আসিয়া তার কে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। এই জীবনই মে প্রভাতে কি বর্ণ-রাগে, কি বিচিত্রোজ্জ্বল বেশেই দেখা দিয়াছিল—তারপর ধীরে ধীরে ঘটনার পর না আসিয়া দাঁড়াইল—তাদের সংস্পর্শে কোথায় াইয়া গেল সে রঙের হিল্লোল! এই সব বাঁধন থা হইতে আসিয়া আষ্টে পৃষ্ঠে তাকে এমন কড়াক্কড় য়া বাঁধিয়াছে যে, এ বাঁধন হইতে পরিত্রাণের আশা কোন উপায়ও নাই! এ বাঁধন কাটিতে গেলে চাড় লাগে, ব্যথা বাজে, অথচ বাঁধনের চাপে ণও যায়-যায় হইয়া উঠিয়াছে!

তাছাড়া এ বাঁধন টানিয়া ছিঁড়িতে গেলে চারিদিকে ন কলরব উঠিবে যে সমস্ত সংসার তীব্র কৌতূহল-ভরা খ তুলিয়া তার পানে চাহিয়া দেখিবে! তখন আর াকালয়ে বাস করাও সহজ হইবে না! এ বাঁধন কাটিবার উপায় আছে একটি—মৃত্যুর শাণিত কৃপাণ—এ বাঁধন কাটিতে পারে!

কিন্তু তা হইবার নয়! জীবনে তার অনেক কর্ত্তব্য আছে…এমন করিয়া নিজের পানে চাহিয়া সেগুলা না সারিয়া চলিয়া যাওয়া সম্ভব নয়! সেটা উচিতও হইবে না!

হঠাৎ সিন্ধু একরাশ জামা লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—দর্জী তৈরী করে এনেচে, দিলে। ছেলেদের গরম জামা রয়েচে, আবার দুম্‌ করে খরচ করে বসলে যে!

প্রফুল্ল বলিল,—হ্যাঁ, ও জামা ছানুদের নয়—অরুণের, মেনির, ভুলুর, মটরুর।

সিন্ধু বলিল,—তাই ভালো! আমিও ভাবছিলুম, আবার এত দরদ উথলে উঠলো হঠাৎ ছেলেদের জন্য…

প্রফুল্ল বলিল,—তার মানে…?

সিন্ধু বলিল,—মানে, এই বাড়ী-ঘর তৈরী করতে এত খরচ হচ্ছে, এর ভিতর ভাইপো-ভাইঝীদের জন্য এত টাকা খরচ করে জামা না হয় নাই হতো! তারা তো আর আদুড় গায়ে ঘুরচে না যে তোমার জামা অঙ্গে না চড়ালে শীতে মরে যাবে! আর কুটুমও নয় যে লৌকিকতা করচো! তোমার সব বাড়াবাড়ি!

প্রফুল্ল সগর্জ্জনে ডাকিল,—সিন্ধু…

সিন্ধু সচকিত হইয়া উঠিল। এমন ডাক স্বামীর কণ্ঠে সে কখনো শোনে নাই! সে স্বামীর পানে মুখ তুলিয়া চাহিল।

প্রফুল্ল বলিল,—আজ আমার ভাইপো-ভাইঝীদের দুটো জামা দিচ্ছি বলে এ-খরচ তোমার গায়ে ভারী বেজেচে, না! কিন্তু মনে পড়ে, মুঙ্গেরে থাকতে শাল-ওয়ালার কা ় থেকে ভালো কাপড়-চোপড় কিনে যখন তোমার বা ়ের বাড়ীর সকলকে জামার হরির লুট দিয়েছিলে, তখন তো এ কথা ভাবো নি যে, তোমার যেমন ভাই, ভাইপো, ভাজ সব আছে, আমারো তেমনি একটা বড় ভাই আছে, ভাইপো-ভাইঝী আছে, একটা ভাজ আছে—যে-ভাজ তোমার স্বামীকে বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করেচে! এঁদের কথা কখনো তুমি মনে করেছিলে? …যেদিন সেই মখমলের থান কিনে…যাক্‌ সে কথা! মিছে কথা-কাটাকাটি করে কোনো ফল নেই—নিজেই শুধু নিজের মনকে ক্ষতবিক্ষত করবো বৈ নয়।…ও সব কথা থাক্—তবে এতদিন আমি শুধু চোখেই সব দেখে এসেচি! এবার থেকে হাতে-কলমে কিছু করতে চাই। তুমি যেখানে যা ত্রুটি রেখেচো, সেই সেই দিকে সে-সব ত্রুটি আমি সারবো, যতখানি পারি…

সিন্ধু বলিল,—আমার ভাই-ভাইপোকে কবে একটা কি দিয়েচি, তাই নিয়ে খোঁটা দিচ্ছ! তা তারা তো তোমার দেওয়া কাপড়ের জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে ছিল না! মানুষের মত মানুষ হয়েচো, তোমার ইজ্জৎ হবে ভেবে তাদের দিয়েচি—তখন তো হাসি-মুখেই তাতে মত দিয়েছিলে…তোমারই তাতে মান বেড়েছিল—আমার নয়! যে হ্যাঁ দিয়েছ—আমার মানের জন্য দিইনি।…তখন বারণ করলেই পারতে!

সিন্ধুর দুই চোখে জল ছাপাইয়া আসিল।

প্রফুল্ল বলিল,—শুধু ঐটেই ধরচো কেন! কখনো তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেচি আমি? তবে, সেদিন বড় দুঃখ হয়েছিল, যে, তোমার ভাই-ভাইপোর

কথা যেমন তোমার মনে পড়েচে, আমার ভাই-ভাইপোর কথাও যদি তেমনি একবার মনে করতে !

সিন্ধু বলিল,—কেন, পূজোর সময় তোমার ভাই-ভাইপোর কাপড়-চোপড় যে আমি নিজের হাতে কিনেচি। তা ছাড়া আমি পরের মেয়ে, আমার দরদ না হতে পারে, তুমি তো দরদী ছাওর ছিলে, দরদ করে কেনোনি কেন ?

মৃদু হাসিয়া প্রফুল্ল বলিল,—তোমার মহত্ত্ব অসাধারণ ! কিন্তু এটুকুও স্বীকার করো যে এখানে পূজার উপহার যে রকম কাপড়-চোপড় কিনে দিতে, তার চেয়ে সেগুলো নিরেসও হতো, আর দামেও কম হতো···

উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন-বেগ রোধ করিয়াই সিন্ধু বলিল,—তোমার পয়সা, তুমি কেন আপত্তি করোনি সে সময় ?

প্রফুল্ল বলিল,—এ সবে একটিও কথা কইনি, তার কারণ, এ সব ব্যাপারের আলোচনা করতে গেলে তার ভিতরকার অত্যন্ত বিশ্রী বীভৎস মূর্ত্তি প্রকাশ হয়ে পড়ে—এইজন্য ···

সিন্ধু আর কোন কথা বলিল না,—মেঝেয় লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

প্রফুল্ল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল···ভাবিল, না, এ সব কথা আর নয়। এ-সব চিন্তার ছিটাও সে আর মনে থিতাইতে দিবে না! তবে এই যে ভাব,···তার দাদা, তার বৌদি, ইহাদের মানুষ বলিয়াও ইহারা ভাবে না, ভুলিয়াও এ-বাড়ীর সম্বন্ধে একটা প্রশ্নও কেহ তোলে না যে, ওরে তারা কেমন আছে ? তারা বাঁচিয়া আছে তো ?—এইটাই তার সব চেয়ে অসহ্য ঠেকিতেছিল। অথচ বৌদি··· প্রতি বার সে বাড়ী গেলেই তাঁর প্রথম প্রশ্ন কি, না, বাড়ীর সকলে ভালো আছে ? সিন্ধু ? ছেলেমেয়েরা ? মা ? বাবা···? আর সেই বৌদি, সেই দাদা তারা কি অপরাধ করিয়াছে যে তাদের কথা মুখে উচ্চারণ করিতে ইহাদের এতখানি বাধে! একটা মুখের কথা বই তো নয়···

প্রফুল্ল ভাবিল, এ আর কিছু নয়, তারা গরীব, তার দাদা বড় চাকুরে নয়, কাজেই ইহাদের সভায় তারা মানুষ বলিয়া ধর্ত্তব্যের মধ্যে আসে না!

কিন্তু এ লইয়া তর্ক করা চলে না! সেই তো দায়ী, সেই তো এভাবে আস্কারা দিয়াছে। সে কেন এই ছুটীর সময়টা এখানে পড়িয়া থাকে! সিন্ধু নাই গেল সঙ্গে, সে তো বাড়ী গিয়া স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে!

প্রফুল্ল চিন্তার রাশ উদ্দামভাবে ছাড়িয়া দিল। ভাবিল, না, তাও হয় না। সেও যে ভারী বিশ্রী ঠেকিবে। তখন বৌদিই সহস্র প্রশ্ন তুলিবে, বুঝি কি বিবাদ, বুঝি কি মনান্তর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এ মনান্তর কেন ?...এ কথার জবাব প্রফুল্ল প্রাণ গেলেও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিবে না! তার চেয়ে বৌদি যদি ইহাই ভাবিয়া রাখে যে স্ত্রীকে ছাড়িয়া প্রফুল্ল থাকিতে পারে না,···তাহা সহ্য হইবে!···অথচ হায়রে, বৌদি তো জানেও না, স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন মধুর, কতখানি প্রীতিতে পরিপূর্ণ!

৫

পরের দিন শাশুড়ীর পীড়াপীড়িতে সিন্ধুকে লইয়া প্রফুল্ল হঠাৎ দেশে গিয়া হাজির হইল।

উমা তো তাহাদের দেখিয়া অবাক! উমা তখন আহারাদি সারিয়া যেখানে মিস্ত্রীরা কাজ করিতেছিল, সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিল। ছেলেরা স্কুলে গিয়াছে। এমন সময় বাড়ীর দ্বারে গাড়ী আসিলে উমা সেদিকে এতটুকু কৌতূহল লইয়া উঁকি পাড়িতে আসে নাই! তাদের এখানে আবার গাড়ী করিয়া কে আসিবে? মিস্ত্রীরা একটা দেওয়ালে খড়খড়ি বসাইতেছিল, সে নিবিষ্ট মনে তাহাই দেখিতেছিল! এমন সময় বাহিরের দিক হইতে ডাক শুনা গেল,—বৌদি···

ঠাকুরপো! উমা ধড়মড়িয়া বাহিরের উঠানে আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল! ঠাকুরপো আর ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে··· ও কে? সিন্ধু! ছুটিয়া সে গিয়া সিন্ধুকে বুকে জড়াইয়া ধরিল, হাসিয়া বলিল,—মনে পড়েচে ভাই এতদিনে নিজের ঘর-দোর!

সিন্ধু প্রণাম করিয়া উমার পায়ের ধূলা মাথায় লইল। উমা তার ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া চুম্বন গ্রহণ করিল।

সিন্ধু বলিল,—আসতে পারিনি, তার মানে, একটা না একটা ব্যাঘাত লেগেই আছে। তাছাড়া মা-বাপের কাছে ক'দিনের জন্য একটু আসি বৈ তো না, তাঁরাও ছাড়তে চান্ না!

কথাগুলার মধ্যে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র থাকার একটা সুর সাড়া দিলেও উমা তাহা লক্ষ্য করিল না। সে বলিল,—যাক্, আজ যে মনে পড়েচে, এ কি কম ভাগ্যি, ভাই! কত চিঠি লিখে পথ চেয়ে বসে থেকেচি, জবাবও মেলেনি তার!

সিন্ধু বলিল,—আমার কথা আর বলো না। চিঠি লেখা যেন বাঘ হয়ে দাঁড়িয়েচে···তা ছেলেরা কোথায়?

উমা বলিল,—ইস্কুলে গেছে। অরুণ এবার ফার্ষ্ট হয়েছে ক্লাশে, বুঝলে ঠাকুরপো! মাষ্টারেরা তাকে বলেচে, কাকার মত তোমায় ভালো ছেলে হতে হবে। তারও তাই সাধ। কেবলি আমায় বলে, কাকার ছেলেবেলার গল্প বল মা, আমি কাকার মত হবো।

প্রফুল্ল কহিল,—[illegible]

সব-কটাই আমি চাই। এর মধ্যে দোতলার দেওয়াল-গুলোও সারা হয়ে যাক! আমার আর দিন-কুড়ি ছুটী আছে, তার মধ্যে ছাতটা উঠে গেলেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরতে পারি।

উমা বলিল,—তোমার দাদা তো আজ এদের তাড়া দিয়ে গেছেন। আমি ভাই, দুপুরবেলাটা এইখানেই হাজির থাকি—ওরা বসে গল্প না করে, কাজে ফাঁকি না দেয়! তা কাজ বেশই হচ্ছে, নয় কি?···ভালো কথা, তুমি যে দুদিন এলে না, আসবার কথা ছিল···

প্রফুল্ল সিন্ধুর পানে একবার চাহিল; সিন্ধুও সেই সময় স্বামীর পানে চাহিতে গিয়া দুইজনে চোখাচোখি হইল; এবং স্বামীর দৃষ্টির সহিত মিলিতেই সিন্ধুর দৃষ্টি এক-নিমেষে কঠিন হইয়া উঠিল। প্রফুল্ল ভাবিল, আসি নাই তার কারণ, আসিতে পারি নাই, আর না পারার মূলে ঐ স্ত্রীটি! সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—হ্যাঁ, ভালো কথা—ওগো, ছেলেদের জামাগুলো বার করে দাও তো···

উমা সবিস্ময়ে কহিল,—জামা?

প্রফুল্ল কহিল,—হ্যাঁ, অরুণের সখ সাহেবদের পোষাক পরবে, ঐ ছানুর মত সুট—তাই সেদিন ওদের মাপ নিয়ে এগুলো তৈরী করিয়ে দিছি। তারপর সে সিন্ধুর পানে চাহিয়া বলিল,—কোথায় গা সেগুলো?

ভ্রূকুটি-ভরা দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিয়া সিন্ধু বলিল,—কেন, ঐ হোল্ড্অলের মধ্যে আছে। তোমার সামনেই তো লছমন পূরে দিলে!

প্রফুল্ল সিন্ধুর এ ভাব দেখিয়া বিরক্ত হইল। সে চাহিয়াছিল, সিন্ধু এ কথায় একটু আগ্রহের ভাব দেখা-ইয়া জিনিষগুলা তাড়াতাড়ি বাহির করিয়া দিবে, আর তার সে আগ্রহ দেখিয়া বৌদি বেচারীও তবু মনে একটু শান্তি পাইবে যে অরুণদের প্রতি কাকিমার টান আছে সত্যই! কিন্তু···

প্রফুল্ল বিরক্ত হইল, বলিল,—কোথায় হোল্ড-অল?

সিন্ধু বলিল,—গাড়ীর মাথায় ছিল।

প্রফুল্ল আগাইয়া গিয়া হোল্ড্-অল আনিয়া সেই-খানেই সেটা খুলিয়া ফেলিল।

উমা বলিল,—আচ্ছা, হবে'খন ভাই। আগে একটু জিরোও···

সিন্ধু মৃদু স্বরে বলিল,—সবতাতেই বাড়াবাড়ি!

পোষাক দেখিয়া উমা কহিল,—ছি, ভাই, এত খরচ-পত্র করে কি দরকার ছিল এখন এ-সব পোষাক করাবার? এ পরে কোথায়ই বা যাবে,—এই ত দেশ! তাছাড়া এই বাড়ী-ঘরে এত টাকা খরচ হচ্ছে, এর উপর কেন এ বাজে খরচ!

হাসিয়া প্রফুল্ল কহিল,—বাড়ী-ঘর করাটা যদি বাজে না হয়ে কাজের খরচ হয়, তাহলে এগুলোই বা নয় কেন? পরবে না এই বয়সে? জানো বৌদি, অল্প বয়সেই আমাদের বাপ-মা মারা যান্। সৌখীন সাজ কাকে বলে, তা জানতুম না! এখন আজ যদি ভগবান তার সুযোগ দিয়েচেন তো ছেলেদেরু সাজিয়ে চোখে সে সাজ দেখি দু'দিন!

সিন্ধু গুম্ হইয়া রহিল। এই জামা তৈয়ারীর ব্যাপার লইয়া উমা যে কথাগুলা বলিল, সেও তো ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছিল—অথচ উমাকে কি হাসি-ভরা জবাবই না দেওয়া হইল! আর এর জবাবে সে যা পাইয়াছিল··· সে ভীষণ কথা মনে করিতে তার বুক এখনো কাঁপিয়া ওঠে!

রাত্রে শরৎ আসিয়া দেখে, উমা তখনো বসিয়া প্রফুল্লর সঙ্গে গল্প করিতেছে। সে বলিল,—ফুলু এখনো এখানে যে!

উমা বলিল,—সিন্ধু এসেচে গো ছেলেমেয়েদের নিয়ে। তারা ঘরে শুয়েচে····

এ কথায় শরতের কি আনন্দ যে হইল! সে জামা-কাপড় না ছাড়িয়াই সেইখানে বসিয়া পড়িল। এ যে এ জীবনে সে আশাও করিতে পারে নাই! ভাইয়ে-ভাইয়ে কতদিন পরে আবার আজ প্রাণের পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! তার বুকখানার মধ্যে এতদিন দারুণ শূন্যতা হা-হা করিতেছিল, একটা শুষ্ক মরু তার ধূ-ধূ প্রান্তর লইয়া বসিয়াছিল,—সে জায়গায় উমার কথা এক-নিমেষে ফুলে-ভরা বিচিত্র কুঞ্জের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। শূন্য প্রাণ এক নিমেষে বসন্তের গন্ধে-বর্ণে রঙীন উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিল!

পরের দিন সকালে প্রফুল্লর পুত্র ছানু জেঠামশাইয়ের সঙ্গে এমন আলাপ জুড়িয়া দিল যে জেঠামশায় যথা-সময়ে অফিসে বাহির হইবার সময় তাকে কিছুতেই সরাইয়া রাখিতে পারে না! সে বায়না ধরিল, জেঠা-মশাইয়ের সঙ্গে যাইবেই যাইবে! জেঠামশায় তাকে কত করিয়া ভুলাইয়া তবে বাহির হইতে পায়!

আহারাদি সারিয়া ছেলেরা গিয়া বাড়ীর সামনের মাঠে খেলা করিতে ছুটিল। মাঠে একটা কুলগাছ আপনার মাথা ঝাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া—তাহাতে অজস্র টোপা কুল পাকিয়া এমন শোভা বিস্তার করিয়াছে যে, ছেলেরা বলিয়া উঠিল, গাছে ছোট ছোট ফানুস ঝুলিতেছে!

অরুণ গিয়া গাছে চড়িল; তার দেখাদেখি ছানুও উঠিতে অগ্রসর হইল। অরুণ নিষেধ করিল, কুলগাছে ভারী কাঁটা, ছানুর গাছে চড়া অভ্যাস নাই, কাঁটার ঘায়ে গা ছড়িয়া যাইবে। কিন্তু ছানু সে কথা গ্রাহ্যও করিল না। অরুণ মগ্ডালে উঠিয়া কুল পাড়িতে লাগিল আর ছানু হাতের নাগালে যে কয়টা পায়, তাহাই ছিঁড়িয়া বিজয়-গর্ব্বে মাতিয়া উঠিল। নীচে ছোট

দল মহা কলরব জুড়িয়া দিল, কুল দাও, কুল! অরুণ গোটাকয়েক কুল নীচে ছুড়িয়া দিল, ছোটরা মহাউল্লাসে কুড়াইয়া মুখে পুরিল। ছানুও তখন আরো উৎসাহে গাছের আরো উপর-ডালে চড়িতে উদ্যত হইল। অরুণ বলিল,—আর চড়ো না ভাই, পারবে না! আমি দিচ্ছি কুল…

তাও কি হয়! জয়ের উল্লাসে বালকের প্রাণ তখন চঞ্চল মাতাল হইয়া উঠিয়াছে! এমন কীর্ত্তি দেখাইবার সুযোগ জীবনে সে আর কখনো পায় নাই তো! অরুণের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া সে আরো উপরে চড়িতে গেল। সেখানে গাছের ডালে ছিল মস্ত একটা খোঁচ। যেমন ওঠা, অমনি সেই খোঁচে পা বাধিয়া কাপড় ছিঁড়িয়া ছানু নীচে পড়িয়া গেল।

বিপদ দেখিয়া অরুণ লাফ দিয়া নীচে পড়িল, তখন ছানুর ক্রন্দন সশব্দে চারিধার মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে!

সে ক্রন্দনের রবে উমা ও সিন্ধু দুইজনে ছুটিয়া বাহিরে আসিল। অরুণ তখন ছানুকে ধরিয়া তুলিয়াছে। মাকে দেখিয়া ছানু ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল—সে মার মনে মমতা জাগাইতে কান্নাটাকে আরো বাড়াইয়া তুলিল।

সিন্ধু আসিয়া ছেলেকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার সুরু করিল। উমা ছানুকে সিন্ধুর গ্রাস হইতে ছিনাইয়া টানিয়া লইয়া বলিল,—পড়ে গেছে, তার উপর এ কি শাসন, সিন্ধু! ছ্যাখো, আগে কোথায় কি হলো।

সিন্ধু বলিল,—না, এ সব আমি ভালোবাসি না—শাসনের সময় শাসন করতে দাও, বলছি।

সে তীব্র তীরস্কার গ্রাহ্য না করিয়াই উমা বলিল,—এখন শাসনের সময় নয়। আগে দেখি, কোথায় লাগলো। তারপর শাসন করো।

সিন্ধু গর্জ্জিয়া উঠিল,—না, না, আমি দেখতে চাই না। ছেলের শাসন, তাও করতে পাবো না! তাতেও বাধা! ছেলে বেয়াড়া হলে তোমায় তার ফল ভুগতে হবে না, ভুগবো আমি!…ডানপিটেমি ছ্যাখো না,…এই জন্যেই তো আমি আসতে চাই না। তোদের এ সব গোঁয়ার্ত্তুমি সাজে কখনো!

উমা সে কথায় ব্যথা পাইলেও কথাটা গায়ে মাখিতে দিল না, অরুণকে প্রশ্ন করিল—কি হয়েছিল রে?

অরুণ সভয়ে সমস্ত ব্যাপার মার কাছে খুলিয়া বলিল। উমা ভর্ৎসনা করিয়া বলিল,—তোমাদের মত গেছো ছেলে নয় তো ওরা, কেন গাছে চড়বার মতলব দেখালে! আজ আসুন উনি, কি সাজা হয় তোমার, দেখো!

অরুণ কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল,—ভাইটিকে আমি গাছে চড়তে বারণ করেছিলুম মা।

উমা বলিল,—তুমি বুড়ো হাতী, তুমি বারণ করে গাছে চড়বে, আর ছোট ভাই দাঁড়িয়ে তাই দেখবে, এ কখনো হয়! এটুকু বুদ্ধি তোমার নেই! কবে বুদ্ধি হবে, পোড়ার বাঁদর?

উমা ছানুকে আগুলাইয়া ছিল, কাজেই তাকে শাসন করা সম্ভব নয়—সিন্ধু তাই ছানুকে লক্ষ্য করিয়া রাগে জ্বলিতে লাগিল। এই ব্যাপারটায় সে যে মনে মনে খুশীও একটু হয় নাই, এমন কথা বলা চলে না। সে এমনি একটা কিছু চাহিতেছিল, যা লইয়া স্বামীর কাছে অনুযোগ চলে, এবং মাথা তুলিয়া বলিতে পারে যে, ছ্যাখো, আমার কথা অক্ষরে-অক্ষরে কেমন ফলিল! এই জন্যই না ছেলেদের লইয়া এখানে আমি আসিতে চাহি না!

ছেলেকে লক্ষ্য করিতে করিতে সিন্ধু পরক্ষণে দেখিল, তার পরণের কাপড়খানা ছিঁড়িয়া ন্যাকড়া হইয়া গিয়াছে। সে গর্জ্জিয়া উঠিল,—হতভাগা ছেলে, অত টাকা দামের জরি-পাড় কাপড়খানা ছিঁড়ে কানি করে ফেলেচো! নতুন কাপড়—এই পূজোয় কিনে দিছি…নবাব হয়েচো বটে! কে কিনে দেবে আবার…কে তোর সাতপুরুষের কুটুম আছে কোন্‌খানে বল্ দিকিনি…

উমা বলিল,—তুই থাম্ তো ভাই সিন্ধু…ওর গাটা যে বেঁচেছে, এই ঢের! তা না, একখানা কাপড় ছিঁড়েচে, তাই নিয়ে ছেলেকে বক্‌চিস্! ছেলে গাছে চড়েছে…বক্ —আর চড়বে না। তা না ও-সব কি! কাপড় ছিঁড়েচে, বেশ, আমি কিনে দেবোখন ঐ রকম কাপড়!

সিন্ধু মুখ ঘুরাইয়া বলিল,—কিনে অমনি সবাই দ্যায়। মিছে তর্ক করো কেন! ওর দাম কত, জানো? ফরমাশ দিয়ে কাপড় আনানো…বড়-দা কত চিঠি করে আনিয়ে দেছে…

এ কথার মধ্য দিয়া সিন্ধুর মনখানা বিদ্যুতের হল্‌কার মত উমার মনের মধ্যে ফুটিল। সে শিহরিয়া উঠিল। তার দারিদ্র্যে সিন্ধু এমন আঘাত দিল…তার নিজের জা!…আশ্চর্য্য!

ছানু উমার আড়ালে থাকিয়া মাকে লক্ষ্য করিতেছিল। মার তিরস্কারের ভয়ে ছড়ার জ্বালা সে ভুলিয়া গিয়াছিল। স্বামীর উপর রাগে আর অভিমানে সিন্ধুর বুক এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে তার দুই হাত নিশপিশ করিতেছিল, ছেলের পিঠের উপর দিয়া কখন সে রাগের ঝাল তুলিয়া লইবে! এই অধীরতা এমন বাড়িয়া উঠিল যে সে উমার পাশ হইতে হঠাৎ ছানুকে ছিনাইয়া তাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার সুরু করিয়া দিল। উমা ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে ছানুকে জোর করিয়া ছাড়াইতে গেল; কিন্তু সিন্ধুর প্রহার দুই-চারি ঘা নিজের অঙ্গে

পারিল না। তার প্রহার যখন দিক্‌বিদিক ভুলিয়া সমানে চলিয়াছে, তখন সেই গোলমালের মাঝে প্রফুল্ল আসিয়া দাঁড়াইল। প্রফুল্ল আসিয়াই ছান্নুকে সবলে টানিয়া দূরে লইয়া গেল, এবং সহজ ভাবেই কহিল,—হয়েচে কি?

উমার মুখে কথা ফুটিল না, সিন্ধুও কিছু বলিল না। প্রফুল্ল তখন অরুণকে প্রশ্ন করিল—কি হয়েচে রে?

অরুণ ভয়-চকিত স্বরে ব্যাপারখানা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া প্রফুল্ল বলিল,—এর জন্যে ছেলেটাকে মেরে ফেলবে! গাছে চড়েছিল, তা কি হয়েচে! আমরা অমন আঙুরের বাক্সয় ছেলেকে তুলো চাপা দিয়ে রেখে মানুষ করতে চাই না! ছেলে মুঙ্গেরে গাছে চড়তে যেতো না? সব তাতে বাড়াবাড়ি!

দারুণ অভিমানে সিন্ধু বলিল,—আমার ছেলেকে আমি নিজের মনের মত মানুষ করতে চাই।

প্রফুল্ল বলিল,—ছেলে তোমার একলার নয়…

এই কথায় তর্ক কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিয়া উমা ডাকিল,—ঠাকুরপো…

প্রফুল্ল বলিল,—ছাখো না কাণ্ড! ছেলে চিরকাল ছেলেই। তোমার মত সভ্য-ভব্য সেজে বসে থাকবার বয়স যখন ওর আসবে, তখন না হয় সেই রকম হয়েই থাকবে! তা বলে…

ইহাদের কাছে এমন কড়া কথা বলিয়া অপমান! সিন্ধুর বুক অভিমানে আরো উচ্ছ্বসিত হইল এবং দুই চোখ ঠেলিয়া জলের স্রোত দেখা দিল।

উমা গিয়া সিন্ধুকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া ডাকিল,—সিন্ধু…

প্রবল ঝাঁকানিতে সিন্ধু তাহাকে সরাইয়া দিয়া বলিল,—যাও, এ সোহাগ আমার ভালো লাগে না… বলিয়াই সে মাটীতে বসিয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

উমা বলিল,—ওঠো ভাই, এখানে পথে পড়ে এমন করে কাঁদে না—লোকে দেখলে বলবে কি!

সিন্ধু বলিল,—বলুক গে, যার যা বলবার।

উমা তার পাশে বসিয়া স্নেহের স্বরে বলিল,—ছি ভাই, ওঠো। তুচ্ছ কথায় এত রাগ করে কি! বিশেষ, ওঁর ওপর!

সিন্ধু সগর্জ্জনে কহিল,—তোমাদের কাছে তুচ্ছ হতে পারে, আমার কাছে নয়।…তার পর স্বামীর পানে চাহিয়া পুনরায় কহিল,—আমায় এখনি পাঠিয়ে দাও—আমি এখানে একদণ্ড থাকবো না।…হয়েচে তো, তোমার মনের সাধ মিটেছে এবার? ধরে-বেঁধে এনে এমন করে পায়ে থেঁৎলে অপমান…ক্রন্দনের আবেগে সে আর কিছু বলিতে পারিল না।

প্রফুল্ল এ ব্যাপারে অত্যন্ত চটিয়া উঠিয়াছিল। সে ক্রুদ্ধ কম্পিত স্বরেই কহিল,—যাও, এখনি বাপের বাড়ী যা… বাপের আদরে, ভায়েদের আদরে…

উমা ছুটিয়া আসিয়া তার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল—কি ও-সব কথা ঠাকুরপো! তুমি না লেখাপড়া শিখেচো। তুমি না জ্ঞানী…এই ছেলেমেয়েগুলো সামনে—এ কি এ, ছি!

তার পর সিন্ধুকে বহু সাধ্য-সাধনা করিয়া বহু মিনতি করিয়া এক রকম তার পায়ে ধরিয়াই উমা তাকে লইয়া বাড়ীর মধ্যে আসিল।

কিন্তু বাড়ীর মধ্যে আসিয়া সিন্ধু এমন বাঁকিয়া বসিল যে, তাকে সিধা করা সহজ নয়! সে ধরিয়া বসিল, এখনি সে চলিয়া যাইবে, যেমন করিয়া পারে! তাকে পাঠাইয়া দাও—নহিলে সে এমন কাণ্ড করিয়া বসিবে…

উমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। তার পায়ের তলায় সমস্ত পৃথিবীখানা প্রচণ্ডভাবে ঘুরিতে লাগিল। সে প্রফুল্লর কাছে ছুটিল; প্রফুল্ল তখন ঘরের মধ্যে গুম্ হইয়া বসিয়া আছে। এই এক-বাড়ী লোক—মিস্ত্রির দল—ছি ছি!

উমা আসিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল,—উপায় করো ঠাকুরপো।

প্রফুল্ল বলিল,—উপায় আবার কিসের! তুমিও যেমন…

উমা বলিল,—না ভাই, আমার ভয় করচে! তুমি ওকে নয় নিয়েই যাও…

প্রফুল্ল একটা নিশ্বাস ফেলিল, তার পর উমার পানে চাহিয়া ডাকিল,—বৌদি…

উমা প্রফুল্লর পানে মুখ তুলিয়া চাহিল।

প্রফুল্ল বলিল,—ও কি মানুষ, না, মানুষের সঙ্গে বাস করবার যোগ্য! আজ বুঝেচ বৌদি, আমি কি সুখে আছি! তোমরা হয় তো ভাবো, এমন বেইমান লক্ষ্মী-ছাড়া যে ঐ স্ত্রীকে নিয়ে তোমাদের ভুলে আছি! এখন দেখচ তো আমি কেমন আছি!…আমার মত হতভাগা জগতে আর কেউ নেই বৌদি!

প্রফুল্লর দুই চোখে জল টলটল করিয়া উঠিল। তার গলার স্বর ভারী হইয়া ঝিমাইয়া পড়িল। সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিল।

উমা গিয়া তার হাত সরাইয়া দিল এবং আঁচলে তার চোখের জল মুছিয়া দিয়া বলিল,—ছি ভাই, কাঁদচো কি! তুমি না পুরুষ মানুষ। কাতর হয়ো না। পুরুষ মানুষকে অনেক সইতে হয়! এও তোমায় সইতে হবে। মানিয়ে বনিয়ে চলতে হবে তো—উপায়ও যে নেই ভাই!

প্রফুল্ল বলিল,—কল্পনায় কি জগৎ আমি গড়ে রেখে-ছিলুম বৌদি! ধনের কাঙাল কোনদিন ছিলুমও না।

আমাদের এই ছোট্ট ঘর, ছোট্ট সংসার আগাগোড়া শান্তিশ্রীতে ঝল্‌মল্‌ করবে, তারি স্বপ্ন আজীবন দেখেচি!…এর মধ্যেও যদি পরস্পরের মনের ভিতরে কথায়-কথায় ছুরি-ছোরা চলে, তাহলে একে শান্তির নীড় করে তুলি কি করে! পরস্পরে যেখানে পরস্পরকে মেনে পরম শান্তিতে থাকবো, বাহিরের দ্বন্দ্ব-কোলাহল ভুলে দু'দণ্ড যেখানে জুড়োতে আসবো, সেখানে যদি দিবারাত্র এমনি ছল্‌-ছুতো ধরে ছুরি শাণানো চলে, তাহলে তো সংসার সংসার থাকে না, সে যে প্রকাণ্ড অস্ত্রশালা হয়ে ওঠে; রীতিমত বারুদখানা!

প্রফুল্ল স্তব্ধ হইল; তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অশ্রু-রুদ্ধ কম্পিত স্বরে বলিল,—আজ যদি আমার সর্ব্বস্ব দিলেও সেই পুরোনো দিনের পুরোনো সরল জীবনে ফিরতে পারতুম!…তার পর ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া সে আবার বলিল,—তা হবার নয়, হবার নয়!

তার সে স্তব্ধ গম্ভীর মুখ দেখিয়া উমার মন বেদনায় একেবারে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু এখন কাতর হইবার সময় নয়, কাতর হইলে চলিবে না!

উমা বলিল,—ছি, ওঠো,—না হয় ওদের নিয়ে তুমি হাবড়াতেই যাও…পৌঁছে দিয়ে আবার এসো।

প্রফুল্ল বলিল,—তাই যাই। কিন্তু ওদের রেখে আমি এখানেই এখনই ফিরবো। ও আবহাওয়া থেকে যে কটা দিন আর ছুটী আছে, সে কটা দিনও মুক্ত থাকতে পারি যদি…

উমা বলিল,—না, তা হবে না। অমন কাজ করো না। শেষে একটা কেলেঙ্কারী হবে। বুঝচি ভাই, তুমি কত সহ্য করচো! তুমি মুখে বলবে কি—তোমার যেদিন এবার প্রথম দেখি, সেইদিনই তোমার শুক্নো মুখ আমায় সব কথা বলে দেছে,স্পষ্ট বলে দেছে, যে তোমার মনের ভিতরে কি প্রচণ্ড বেদনা, কি তুষের আগুন জ্বলচে! কোথায় তোমার সে হাসি, সে অফুরন্ত কথা!…এখন ওঠো, একটা উপায় করো।

প্রফুল্ল উঠিল, উঠিয়া একটা মজুরকে ডাকিয়া বলিল, —ষ্টেশনে যাবার একটা গাড়ী আন্‌তো রে!

গাড়ী আসিলে সিন্ধু ছেলেমেয়েদের লইয়া গাড়ীতে গিয়া বসিল। উমা তাকে বুকে জড়াইয়া বারবার মিনতি করিল,—এ বিশ্রী ব্যাপার ভুলে যাস্‌ ভাই, লক্ষ্মী দিদি আমার,—এর জড়ও মনের মধ্যে রাখিস্‌নে। যদি দোষ করে থাকি তো বড় বোন্‌ বলে আমায় মাপ করিস্‌…

সিন্ধু গম্ভীর হইয়া বলিল,—এর আর মাপ করাকরি কি! আমি বদ্‌ লোক—তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারি খনো! তোমরা থাকো ভাই সব সুখে-স্বচ্ছন্দে—আমি ষর হাওয়া কেন তার মধ্যে ঢুকি, বলো!

উমা এ কথা শুনিয়া কাঠ হইয়া রহিল। তার পর প্রফুল্ল আসিয়া উমাকে প্রণাম করিয়া তার প… মাথা রাখিয়া বলিল,—মাপ করো বৌদি!…

উমা তাড়াতাড়ি সরিয়া গিয়া হাত ধরি… বলিল,—ছি ছি, এ কি পাগলামি করচো! ও… কি তোমার উপর রাগ করেচি কখনো যে, এ… রাগ করবো! তবে বড় দুঃখ হয় এই যে তুমি… বড় বেচারা ঠাকুরপো…উমার দুই চোখে জল আসিল। চোখ মুছিয়া উমা বলিল,—ভগবানে… প্রার্থনা করি, তুমি শান্তি পাও, সুখী হও ভা… কাছে যে দরদ পায় না, শান্তি পায় না…ওঃ…

কথাটা সম্পূর্ণ বলা হইল না। প্রচণ্ড নিশ্বা… উমার ক্ষীণ স্বর কোথায় ভাসিয়া গেল।

৬

হাওড়ায় ফিরিয়া প্রফুল্ল একবার নিজের মনের তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিল, কি, এ হইয়াছে কি… জন্য এমন কাটাকাটি মারামারির ঝড় তুলিয়া জীব… এমনভাবে আজ ক্ষতবিক্ষত করিতে হইতেছে! তার গৃহে থাকিতে চায় না! তার সঙ্গে সিন্ধুর বিবাদ-বিসম্বাদই নাই! তার যারা আপন, তার… তার বৌদি,—ইহাদের পাশে তাকে ভিড়াইতে গে… সিন্ধুর মন তাতিয়া ঝাঁজিয়া উঠিয়া বিষম বিশৃঙ্খলার করিয়া তোলে! অথচ দাদা বা বৌদি সিন্ধুকে একদি… জন্য অযত্ন বা অবহেলা করে নাই। তাহা দূরে থাকুক, অত্যন্ত আদরেই ঘিরিয়া থাকিতে চ… এই যে দু'ঠাঁই থাকিবার জন্য সিন্ধুর চেষ্টা, এর… হিংসাই বা আসিল কোথা হইতে! দাদা কিছু… তাহার রোজগার হইতে এক-পাই ভাগ চাহিতে… না, বা তাহাতে ভাগ বসাইবার ধারও ধারে না! পয়… দাবী-দাওয়া থাকিলেও নয় এ বিরক্তি, এ বিরূপত… একটা কারণ বুঝা যাইত। তা যখন নাই, তব… …সিন্ধুর এত ঝাঁজ ফোটে কেন? নিজের বাপের বাড়ী… বেলায় সিন্ধুর বুক যেমন দরাজ হইয়া উঠে, হাতও ঠি… তেমনিভাবে দানের মহিমায় ভরিয়া যায়। ভাইকে ও… কিনিয়া দাও, ভাজের জন্য ভালো সাড়ীখানা, ব্লাউস… —ভাইপো-ভাইঝীদের জন্য নানা জিনিষ—সেদিকে তা… অদেয় তো কিছু নাই-ই, বরং খুশী মনে প্রচণ্ড উৎসাহেই… সে খরচ করিতে বসে! অথচ প্রফুল্লর দাদা বা ভাইপো… ভাইঝিদের কিছু দিতে গেলেই সিন্ধুর সমস্ত অন্তর দা… বিদ্রোহে গর্জ্জন করিতে থাকে! যে পয়সা-ব্যয়টাই… সিন্ধু নিজের বাপের বাড়ীর বেলায় প্রয়োজনীয় ব… মনে করে, প্রফুল্লর সম্পর্কিত দাদার সংসারের বেলায়, তা… পয়সা-ব্যয় অপব্যয়ে গিয়া দাঁড়ায়! এই যে …

র মূলে একটা কথাই প্রচণ্ডভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়! কথাটা এই যে, সিন্ধুর বাপের বাড়ীর সকলে তার আপন-জন, আর প্রফুল্লর দাদা প্রভৃতি···? তারা পর! আশ্চর্য্য!

আর কোন দিক না দিয়া হোক অন্ততঃ সিন্ধুর আপন-জনকে প্রফুল্লকে দিয়া আপনার বলিয়া স্বীকার করাইতে গেলে সিন্ধুর তো এটাও উচিত, প্রফুল্লর বাপের বাড়ীর লোককে আপন বলিয়া স্বীকার করা! এই সহজ নিয়মটা কেন যে তার মাথায় ঢোকে না, ইহা ভাবিয়াই প্রফুল্ল বিস্মিত হইল।

তখনি কিন্তু মনে পড়িল, এই স্বীকার করানোর ব্যাপোর সে-ই বা কতখানি আয়োজন করিয়াছে এত কাল!···কিছু করে নাই! নিজের প্রতিদিনকার ব্যবহারে সে হাওড়ার বাড়ীকে এতখানি ঘেঁষ দিয়া আসিয়াছে যে সিন্ধুর মনে গোড়া হইতে এমন দ্বিধা লাগিতেও পারে নাই, প্রফু সিন্ধুর বাড়ীর লোকদের আড়ালে ঠেলিয়া চলিতে চায়। সে যখনি সিন্ধুকে চাহিয়াছে, তখনই এই বাড়ীর সঙ্গে সঙ্গেই তাকে পাইয়াছে এবং সেই ভাবেই তাকে পাইয়া আসিয়াছে! অথচ তার নিজের বাড়ীতে সিন্ধুকে লইয়া গিয়া সেখানে তাকে এমন ভাবে বসায় নাই, যাহাতে সিন্ধুর প্রাণের শিকড় সেখানকার সকলকে আঁকড়াইয়া আপনাকে আরো সজীব সচেতন করিয়া বাড়িতে পারে! তরুণ যৌবনের সেই উচ্ছ্বাস—গুলার মাঝখানে ওদিকটাতেই যে সিন্ধুকে সে পা বাড়াইতে দেয় নাই! তখন সে-বিরাগকে মনের একটা ক্ষণিক খেয়াল বলিয়া গ্রাহ্যও করে নাই! সেই বিরাগ আজ প্রবল হইয়া মস্ত প্রাচীর তুলিয়া ধরিয়াছে! তখন বিরাগকে সে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে!···প্রশ্রয়? দিয়াছে বৈ কি! নিজে ছোটখাট অবসরগুলা পাছে প্রেম-কুহকের রঙীন পরশ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে, এই ভাবনায় চিরদিন তার মন সিন্ধুকে এখানে আটকাইয়া রাখিতেই ব্যস্ত ছিল, দুইদিনের জন্যও সেখানে পাঠাইয়া মেলামেশার সুযোগ দিতে চায় নাই! তাই আজ অবহেলার ফাঁকে সে বিরাগ এমন ঘন হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, ইহারি ঝাঁজে তার নিশ্বাস মাঝে মাঝে বন্ধ হইয়া আসে!···এ তো সে নিজের হাতে এ ব্যবধান গড়িয়া তুলিয়াছে! কেন সময় থাকিতে এ ব্যবধান ঘুচাইবার জন্য চেষ্টা করে নাই! আজ সে ব্যবধান মনকে পিষিয়া পিষিয়া প্রাণের মধ্যে দারুণ হাহাকার তুলিয়া দিয়াছে বলিয়াই না তার এই কাতর বেদনা!···তখন তার স্বার্থ দেখিয়া এদিকে যেমন অবহেলা করিয়াছিল, তেমনি তার ফল ভোগ করিতেছে!···প্রফুল্ল একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া গুম্ হইয়া রহিল।

পর-মুহূর্ত্তেই প্রফুল্লর মনে হইল, তার দাদার পয়সার জোর নাই, তাই সিন্ধু তাদের মনের মধ্যে স্থান দিতে নারাজ! কিন্তু সিন্ধুর বাপও এমন কিছু আমীর-লোক নন্ বা তাঁর কাছে দাদা কি প্রফুল্ল এক পয়সার প্রত্যাশী হইয়াও হাত পাতে নাই কোনদিন! তবে···? বৌদির দেওয়া গহনাই বরং সিন্ধুকে অনেকখানি গর্ব্বে স্ফীত করিয়া তুলিয়াছে! সেই বৌদিকে তার প্রতিদানে সিন্ধুও যদি কিছু দিত, তাহা হইলেও নয় কথা ছিল!··· সিন্ধুর মনের মধ্যে কি এ তবে, যা' তাকে এমন বিরূপ করিয়া তুলিয়াছে! টাকার গর্ব্ব? বাপের টাকায় সিন্ধুর কি অধিকার আছে! তার যা কিছু পোষাক গহনা, তাহা প্রফুল্লই সংগ্রহ করিয়াছে তার রোজগারের টাকায়! সে টাকা প্রফুল্ল গতর খাটাইয়া রোজকার করিয়াছে, শ্বশুরের কাছে ভিক্ষা পায় নাই! তার মনে পড়িল, পূজায় পার্ব্বণে দাদা সিন্ধুকে ও ছেলেদের যে কাপড়-চোপড় উপহার প্রভৃতি কিনিয়া দেন—সিন্ধু সেগুলিকে তেমন প্রাণের সহিত গ্রহণ করে নাই—কোনদিন না!

সেবার দাদার দেওয়া পূজার কাপড় সিন্ধু ঠেলিয়া আলমারির একধারে গুঁজিয়া রাখিয়াছিল। প্রফুল্ল যখন বলিল,—দাদার দেওয়া কাপড় ছেলেদের পরালে না পূজোয়? তাহাতে নাক সিঁটকাইয়া সিন্ধু তখন বলিয়াছিল, না—ও পরে যখন হোক পরবে'খন। এতগুলো জরি-পাড় কাপড় রয়েচে, সুট রয়েচে, এর একখানা করে রোজ পরলেও অন্য পোষাকের দরকার হবে না। বড়দা দিয়েছে, বাবা দিয়েচে, তুমি কিনে দেছ···কত কাপড় পরবে!

দাদার কাপড়ের অপরাধ, তার পাড়ে জরির লাইন বোনা ছিল না! কিন্তু জরি না থাক্! সে যে প্রাণের পরশে কতখানি সজীব, সিন্ধু তার কি বুঝিবে! দাদার রোজগার কম—সকলকে খুব-সেরাটি কিনিয়া দিবার সামর্থ্য নাই, তবু সকলকে খুঁটিয়া কাপড় দেন তো! প্রফুল্লকেও যে এখনো নিত্য স্মরণ করিয়া পূজা-পার্ব্বণে কাপড়-চোপড় কিনিয়া দিতেছেন! কৈ, সিন্ধু নিজের বৌদিকে সেবার যখন ভালো শিল্কের কাপড় কিনিয়া দিল, তখন এ কথা তার মুখ দিয়া একবারও বাহির হইল না তো যে প্রফুল্লর বৌদি, তার নিজের বড় জা—তার নিজের জন্যও একখানা কিনিয়া দাও! মনের খাতিরে না হোক্, চক্ষুলজ্জার খাতিরেও তো একবার বলিতে পারিত, তাঁর জন্যে একখানা নেবো কি? প্রফুল্লর যে কোথাও কেহ আছে, এ কথাটা সিন্ধুর ব্যবহার দেখিয়া সে-ও কেমন ভুলিয়া যায়।···

কিন্তু প্রফুল্ল তখন হুঙ্কার দিয়া কেন বলে নাই, তোমার বৌদিকে যে কাপড় দিতে চলিয়াছ, সে কা[illegible] আমিও একখানা কিনিতে চাই, আমার বৌদির [illegible] তাহাতে তার চোখও তো সে খুলিয়া দিতে [illegible]!

কিন্তু সে তা করে নাই! করে নাই এই জন্য যে এই শ্রদ্ধার উপহারের মাঝখানে পাছে ঐ হিংসার ছোট্ট একটু টুকরা মিশিয়া এ জিনিষটাকেই বিষাইয়া তোলে!…

তবে না, আর এ-সব সে ঘটিতে দিবে না! যখনই এবার সিন্ধু তার বাপের বাড়ীর জন্য কোন উপহার কিনিবে, তখন প্রফুল্লও নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিবে না, —সেও তার সঙ্গে পাল্লা দিবে; দিয়া বুঝাইবে, তোমার বাপের বাড়ীর কথা তোমার মনে সর্ব্বাগ্রে যেমন উদয় হয়, আমার বাপের বাড়ীর কথায় আমিও তেমনি সজাগ আছি সর্ব্বক্ষণ! এমনি করিয়া টক্কর দিয়া সিন্ধুকে সে এদিকে আজো যদি সচেতন করিয়া তুলিতে পারে তো সে তার চেষ্টা করিবে। এদিকটায় সে এতটুকু অবহেলা করিবে না!

কিন্তু হায়রে, এমনি করিয়াই কি জীবনের বাকী পথটুকু যুদ্ধ করিয়াই চলিতে হইবে! নিজের স্ত্রীর সঙ্গে কেবলি ঠোকাঠুকি করিয়া ঘা খাইয়া আর ঘা দিয়া জীবন বহিতে হইবে! তার চেয়ে এ জীবনের পাড়ি শেষ করিয়া ফেলাই যে ঢের সুখের, ঢের আরামের! বাহিরের রণক্ষেত্রে খাটিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত শির লইয়া ঘরে ফিরিয়া দেখিবে, সেখানে না আছে শান্তি, না আছে আরাম, কেবলি উদ্যত অস্ত্র লইয়া সতর্ক থাকো,—একটা আঘাত পাইলে তখনি আঘাতে তার শোধ দাও—এ কি জীবন!…

কিন্তু উপায় নাই, উপায় নাই! নীড়-ছাড়া পাখী সন্ধ্যায় নীড়ে ফিরিয়া দেখিবে, হিংসার সাপ প্রকাণ্ড ফণা তুলিয়া বসিয়া আছে,—লাঠি তুলিয়া তার সে উদ্যত ফণাকে প্রহারে ভাঙ্গিয়া জর্জ্জরিত করিয়া দিতে হইবে, —আরামের আশায় না ফিরিয়া, সেই সাপকে কি করিয়া কি ভাবে প্রহার দিবে, তাহারি চিন্তা বুকে ধরিয়া বাসায় ফিরিতে হইবে, অর্থাৎ শ্রান্ত দেহ শয্যায় লুটাইতে গিয়া প্রফুল্ল দেখিবে, শিয়রের উপাধান শাণিত শরে রচিত!…হা ভগবান্, এর চেয়ে দুর্ভাগ্য মানুষের আর কি হইতে পারে!

উমাও ঠিক এই সব চিন্তা লইয়া সেদিন আহত জর্জ্জরিত হইয়া ভাবিতে বসিয়াছিল। নিজের মনের সঙ্গে তর্ক করিয়া সে বুঝিল, তারই অন্যায়! ঠাকুরপোকে সে একদিন মানুষ করিয়াছিল, সত্য! তখন গণ্ডী ছিল ছোট আর ঠাকুরপোর চতুর্দ্দিকে আর কোন বস্তুর আকর্ষণও ছিল না! তাই সরল পথে সহজভাবে জীবন-তরী সে-প্রভাতে সকলে বাহিয়া চলিয়াছিল! তার পর জীবন-মধ্যাহ্নের পূর্ব্বক্ষণেই ঠাকুরপোর বিবাহ হইল, স্ত্রী আসিল। স্ত্রীরও তো একটা আকর্ষণ আছে,—সেও একজন মানুষ! সেও চায়, তার স্বামীকে শত দিক হইতে বাহু মেলিয়া আঁকড়িয়া ধরিতে, পরিপূর্ণভাবে স্বামীকে পাইতে! তার মধ্যে অপরের অধিকার বিস্তার করিতে যাওয়া—এ যে মূঢ়তা! তার অধিক অব্যাহত না রাখিবে কেন? ঠাকুরপো আজ যে শুধু দাদার ভাইটি মাত্র নয়—সে সিন্ধুর স্বামী যদি তাকে সর্ব্বগ্রাস করিতে চায় তো তাহাতে কা[illegible] বলিবার আছে! সেই বা কোন্ অধিকারে সেখানে বাড়াইতে যায়! কি বলিয়াই বা যায়! সে তো নিজের স্বামি-পুত্র লইয়া বেশ সংসার পাতিয়া বসি[illegible] এত পাইয়াও উমার পরের অধিকার হইতে ছি[illegible] আরো পাইতে চাওয়া, এ যে মস্ত বড় লোভ লইয়া [illegible] গ্রাস করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা! তার এ লোভ অপ[illegible] করিবে কেন? তাছাড়া ঠাকুরপোর যে এখন অন্য আছে, অপরকে দেখিবার, অপরকে গ্রাহ্য ক[illegible] তাহারি ফাঁকে তোমার পানে যেটুকু চায়, সেইটু[illegible] যথেষ্ট—তার উপর অতি-লোভ করিলে প[illegible] হইবেই তো!

উমা ভাবিল, কিন্তু এ তো তা নয়। [illegible] ঠাকুরপো পূর্ণগ্রাস করিতে চায় না! স্নেহ [illegible] দাও! ত[illegible] বলিয়া সে স্নেহ লইয়া অপরের গণ্ডীর পা দিয়ো না, সে স্নেহে অত্যাচার তুলিয়া অ[illegible] ব্যথিত ক্ষুণ্ন করিয়ো না! সে অধিকার কাহারো না[illegible]

না থাকুক, সে অত্যাচার সে করিতেও চায় না! শুধু চায়, তোমাদের ঐ উচ্চ রাজমঞ্চ হইতে তার একটু দরদ-ভরা দৃষ্টিতে চাহিয়ো গো—উপেক্ষার তাকে বিঁধিয়ো না! যদি এ স্নেহে লোভাতুর হইয়া দ[illegible] ক্ষুধা জাগাইতে চায় তো সেটুকুর পানে ক্ষ[illegible] দৃষ্টিতে চাহিয়ো! তার এ বিরাট স্নেহের ক্ষুধায় সহ[illegible] ভূতির একটু ধারা বর্ষণ করিয়ো—তাহা হইলে বর্ত্তাইয়া যাইবে, তার সব পাওয়া হইবে! এর বেশী প্রত্যাশাও করে না! শুধু হিংসা আর উপেক্ষা হা[illegible] তার এ স্নেহের গায়ে প্রচণ্ড নির্ম্মম আঘাত করিয়ো [illegible] এই শুধু তার মিনতি!

৭

এমনি-ভাবে যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া চলিতে চলি[illegible] প্রফুল্লর মন এমন শ্রান্ত হইয়া পড়িল যে, শরীরও সে[illegible] সঙ্গে বেদনায় মূর্চ্ছিত হইবার উপক্রম করিল। পশ্চি[illegible] চাকরির ব্যাপারে ঘোড়ায় চড়িয়া প্রফুল্ল বাসা ছাড়িয়া সেদিন সাত ক্রোশ দূরে গিয়াছিল কি একটা কাজে তদারকে! চারিদিকে জরীপ্ চলিতেছিল। তখন বেহার গভর্নমেণ্ট বাঙলার বাহুপাশ ছাড়িয়া আলাদা হইয়া দাঁড়াইয়াছে উড়িষ্যার সঙ্গে। অফিসারদের কোয়ার্টার হইবে, অফিস হইবে—কাজের আর অন্ত ছিল না! তা[illegible] মনে বেদনার পাহাড়। মাথার উপর প্রচণ্ড রৌদ্র, তা[illegible]

পর বিনিদ্র রজনীর দুশ্চিন্তা ও কায়িক শ্রম—সবগুলা মিলিয়া প্রফুল্লর চোখের দৃষ্টি হইতে সহসা আলোর রেখা-টুকু একদম মুছিয়া লইল। দিনের আলো সহসা নিবিয়া পাহাড়-প্রমাণ অন্ধকার আসিয়া প্রফুল্লর শরীর-মন ছাইয়া ফেলিল। সে ঘোড়ার পিঠ হইতে মূর্চ্ছিত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল।

ধূ-ধূ মাঠ। নিকটে লোকালয়ের চিহ্ন নাই। বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্রে চারিদিক তাতিয়া গন্ গন্ করিতেছে। প্রফুল্লর সঙ্গে ছিল তার ওভার-সীয়ার আর আরদালি। তারা অতি-কষ্টে প্রফুল্লকে ঘোড়ার পিঠে করিয়াই বহিয়া তিন ক্রোশ চলিয়া একটা ডাক-বাঙলায় আসিয়া উঠিল। মুখে চোখে জল দিতে প্রফুল্লর মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল, কিন্তু সে কথা কহিতে পারিল না। সঙ্গীরা বিপদ বুঝিয়া তার করিয়া দিল, ডাক্তারের জন্য। চব্বিশ ঘণ্টা পরে ডাক্তার আসিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে কহিলেন, এ্যাপোপ্লেক্সি হইয়াছে! প্রাণ যাইতে পারিত, সেটা যে বাঁচিয়াছে, এ বহু ভাগ্যে!

তার পর বহু চেষ্টায় ডুলি যোগাড় করিয়া প্রফুল্লকে বাসায় আনা হইল। সিন্ধু স্বামীর অবস্থা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। সে তখনি বাপের কাছে তার পাঠা-ইল সংবাদ দিয়া; এবং ডাক্তারের পায়ে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া পড়িল,—বাঁচিয়ে দিন্, আমার যা আছে, সব আপনাকে দেবো।

ডাক্তার গম্ভীর মুখে সান্ত্বনা দিলেন,—ব্যস্ত হয়ো না, মা···

সিন্ধু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ডাক্তারের পানে চাহিয়া রহিল। ডাক্তার বলিলেন,—কলকাতায় নিয়ে যান্, যত শীগ্‌গির পারেন!

সিন্ধু বলিল,—বাবাকে টেলিগ্রাম করেচি সে জন্য।

যথাসময়ে সিন্ধুর বড়দা আসিয়া পৌঁছিল, এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই রেলের কামরা রিজার্ভ করিয়া বহু কষ্টে প্রফুল্লকে হাবড়ার বাড়ীতে আনিয়া ফেলা হইল।

প্রফুল্লর শ্বশুর-শাশুড়ী তখন সেখানে ছিলেন না; তাঁরা গিয়াছিলেন পশ্চিমে, তীর্থ-ভ্রমণে। সিন্ধুর বড় দাদা নৃপাল কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনাইলেন। মহা-সমারোহে চিকিৎসা সুরু হইল। ডাক্তারেরা নানা রকমে নানাভাবে রোগীকে ফুঁড়িয়া চিরিয়া ঔষধ দিয়া রায় দিলেন, মাথার শির ছিঁড়িয়া গিয়াছে—এবং মাথার মধ্যেই রক্তস্রাব হইয়াছে; বাঁচা শক্ত। কোন গতিকে বাঁচিতে পারিলেও জন্মের মত বাক্‌রোধ হইয়া রোগী জড়ভস্বের মত থাকিয়া যাইবে!

বাকরোধ! হোক্! তবু তো তার সামনে প্রাণটা লইয়া চলিবে ফিরিবে! সিন্ধু চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল! স্বামী—তার সব গর্ব্ব, সব সুখ—সবই যে তার সঙ্গে আজ বিসর্জ্জন হইতে চলিয়াছে! তবু এত গোলমাল আর বিপুল সমারোহের মধ্যে এ কথা কাহারো মনে হইল না যে প্রফুল্লর দাদা আছে, শরৎ! সেই শরৎকেও একটা খবর দেওয়ার দরকার আছে।

সাত-আট দিন পরে প্রফুল্ল একবার চোখ মেলিয়া চাহিল, এবং ঘরময় তার ব্যাকুল দৃষ্টি ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার মুদ্রিত হইল। তার পর চোখ মেলিয়া সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, ডাকিল,—দাদা···

সে কথা সিন্ধুর কাণে গেল। স্বামী কথা কহিয়াছে—আঃ! ডাক্তার বলিয়া গিয়াছে, কথা-বার্ত্তা একবার যদি কহিতে পারে, তবে জীবনের সম্ভাবনাও জাগিতে পারে! সেই স্বামী চোখ মেলিয়া চাহিয়াছে! কথা কহিয়াছে! কিন্তু ও চোখ আর কাহাকেও আজ খুঁজিল না, তাকেও না—কথা যা কহিল তাও দাদাকে ডাকিয়া, যে-দাদাকে সিন্ধু কোনদিন আমোল দেয় নাই!—মন ইহাতে আহত হইলেও সে আঘাত সিন্ধুর গায়ে লাগিল না! সে আশ্বস্তই হইল।

সেদিন রাত্রে প্রফুল্ল আরো দুই-চারিটা কথা কহিল—দাদা কোথায়? দাদা···

ঘর-শুদ্ধ লোক বিস্মিত হইল, তাদের এ সেবা প্রফুল্ল অনুভবও করিল না—সে চায় তার দাদাকে! এই উপেক্ষা সকলের প্রাণে মৃদু একটু দোলা দিল। কিন্তু···আহা, বেচারা প্রফুল্ল! তার ঐ রোগশীর্ণ ম্লান কাতর মুখ দেখিয়া অভিমান কি জাগিতে পারে এখন!

সিন্ধু তার দাদার পানে চাহিল, ডাকিল,—দাদা···

সে চাহনির অর্থ নৃপাল বুঝিল; বলিল,—কাল তাঁকে একটা চিঠি দেবো'খন।

সিন্ধু বলিল,—দিয়ো। কথাটা বলিতেই তার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। কেন এ চিঠি, কিসের জন্য এ চিঠি!··· সে তো কোন আশা করে না—তবু তিনি আসিয়া দাঁড়া-ইলে যদি তার পানে চাহিয়া স্বামী সারিয়া ওঠেন!

সেই রাত্রে প্রফুল্ল নৃপালকে ধরিল, একটা উইল সে করিয়া যাইতে চায়। এ যাত্রা সে যে আর উঠিবে না, তাহা সে স্পষ্ট বুঝিয়াছে—তাই এ কাজটার জন্য সে এত ব্যাকুল! তার যে অনেক ঋণ আছে, অনেক কর্ত্তব্য!···অত্যন্ত করুণ আর্ত্ত স্বরে সে বলিল,—কেউ পারো যদি তো দাদাকে একবার আনো—আর বৌদিকে!

অতি-কষ্টে থামিয়া থামিয়া প্রফুল্ল তার মনের বাসনা জানাইল। তার দুই চোখের কোণে জল গড়া-ইয়া পড়িল।

সিন্ধু কাঠ হইয়া বসিয়া ছিল; স্বামীর শিয়রে, তার মুখের পানে চাহিয়াই সে বসিয়া ছিল! স্বামী তো তার

মুখের পানে চাহিল না! তাকে একটা কথাও বলিল না! তার নাম ধরিয়া একবারও ডাকিল না তো! সিন্ধুর বুক ফাটিয়া যাইবার মত হইল। মনে হইল, অভিমান! তার জীবন-ভোর অপরাধের এ শাস্তি? বেশ!...আবার মনে হইল, স্বামীর পায়ে ধরিয়া চোখের জলে তাঁর পা ধোয়াইয়া সে ক্ষমা চায়, ওগো, মাপ করো, আমায় যেখানে যেভাবে রাখিতে চাও, রাখো! শুধু তুমি ভালো হও গো, ভালো হও! তুমি কথা কও! ওগো, তোমার সিন্ধুর আর কোনো দিন তুমি কোনো দোষ পাইবে না!

প্রফুল্লর জল-ভরা চোখ দেখিয়া নৃপালের চোখে জল আসিল। সে প্রফুল্লর পানে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। প্রফুল্ল তার দুই হাত টানিয়া বুকের উপর রাখিয়া উদাস নেত্রে তার পানে চাহিয়া বলিল,—উইল...

সিন্ধু দাদার পানে চাহিল। নৃপালের বুকের মধ্যে বিপুল বেদনা তরঙ্গোচ্ছ্বাসে ফুলিয়া দুলিয়া উঠিল। সে শুধু প্রফুল্লর কপালে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, —হবে'খন ভাই, ব্যস্ত হচ্ছ কেন! আগে সেরে ওঠো —সেরে নিজের হাতেই লিখো।

প্রফুল্ল বলিল,—আর সারা! এ তো সারবার রোগ নয়, ভাই! তার চোখের কোণ বহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সে বলিল,—আমার দাদাকে খপর দাও— বৌদিকে নিয়ে তিনি যেন আসেন। বৌদির কোলেই আমি মানুষ হয়েচি! তিনি তো শুধু বৌদি নন, আমার মা...আর যে দেখা হবে না! বৌদির বড় বাজিবে... আর দাদা! দাদা পাগল হয়ে যাবেন।

নৃপাল বলিল,—খপর দেবো ভাই, সকাল হোক্।

প্রফুল্ল চোখ বুজিল। নৃপাল সিন্ধুর পানে একবার চাহিয়া দেখিয়া সে-ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সকালে কয় ভাইয়ে ডাক্তারদের লইয়া পরামর্শ করিতে বসিল, ডাক্তাররা একটুও আশ্বাস দিলেন না, গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—এ জ্ঞান কিছু নয়! উইল লিখবেন বলে ভারী অস্থির হয়েচেন দেখচি...

নৃপালের মেজো ভাই মহীপাল নূতন উকীল—প্রাণটা তার এখনো কঠিন হয় নাই। সে বলিল,—এর মধ্যে ও-সব জঞ্জাল আর কেন! যদি প্রাণটাই না থাকে, তাহলে উইল হলেই বা কি, আর না হলেই বা কি!

ডাক্তার বলিলেন,—ঝোঁক যখন অত, আর উইল না হলে ঠাণ্ডাও হবেন না যখন, তখন একটা যা হয় করুন্। আমরা আশা মোটে দিই না। তবে যদি রক্ষা পান তো দ জোর বরাত!

মহীপাল বলিল,—একটা যা-তা কাগজ ধরোগে মুনে, ধরে বলগে, এই উইল!

এমনি কথা-বার্ত্তার মাঝে শুষ্ক মুখ আর কা মন লইয়া বাহিরের ঘরে সহসা শরৎ আসিয়া দেখা দি তাহাকে দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। শরৎ আ বলিল—ফুলুর খুব অসুখ না কি...?

নৃপাল চিন্তিতভাবেই ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

মহীপাল বলিল,—আপনাকে খপর দেবার ব হচ্ছিল এই মাত্র!

শরৎ বসিয়া পড়িল। তার মুখ এক নিমেষে সা হইয়া গেল। কণ্ঠ এমন শুকাইয়া উঠিল যে স্বর বাহি হইল না! অর্থহীন দৃষ্টিতে নৃপালের পানে কিছুক্ষ চাহিয়া কোনমতে সে বলিল,—তাহলে ঠিক শুনেচি আজ সকালে আমাদের দেশের একটি ছোকরা, সে আমায় গিয়ে বললে,খবরের কাগজে সে পড়েচে যে ফু খুব অসুখ করে সেখান থেকে চলে এসেচে। শুনে আমি আর থাকতে পারলুম না...আমার স্ত্রীও জো ধরলেন, আমায় নিয়ে চলো। তা আমি বলে এসেছি আগে খপর নিই, তার পর যেয়ো!

এ কথাগুলি নৃপাল বা মহীপাল গ্রাহ্যও করিল না। নৃপাল আপন-মনে বকিয়া চলিল,—বাবা মা এখানে নেই—তাঁরা এখন কাশীতে। কাল তাঁদের টেলিগ্রাম করে দিছি।

শরৎ বলিল,—কি অসুখ?

নৃপাল মহীপাল শরতের পানে চাহিল, বলিল,—নাম বললে আপনি কি বুঝবেন! তবে অসুখ খুব শক্ত। তার পর ডাক্তারের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল,—এঁরা তো যথাসাধ্য করচেন, তবু আশা তো দিচ্ছেন না এখনো!

আশা নাই? তার প্রাণের ফুলু! শরতের বুকের উপর যেন বাজ পড়িল—চারিদিক ধোঁয়ার মধ্যে মিলাইয়া গেল! সে স্তম্ভিত নির্ব্বাক দৃষ্টিতে নৃপালের দিকে চাহিয়া রহিল।

নৃপাল বলিল,—ইদানীং অত্যন্ত পরিশ্রম করছিল। অমন পনেরো-ষোল মাইল পথ এই রোদে ঘোড়ায় চড়ে জরীপ করে বেড়ানো...এ্যাসিষ্টাণ্ট অত রয়েছে, তবু নিজের সব করা চাই! শরীরকে মেরে এ পয়সা রোজগার করবার দরকারই বা কি ছিল!...নৃপাল একটা নিশ্বাস ফেলিল!

এ কথাগুলা দূরগত কতকগুলা অস্পষ্ট ধ্বনির মতই শরতের কাণে আসিয়া বাজিল! তার ফুলু,তার জীবনের গর্ব্ব, গৌরব, তার বংশের প্রদীপ ফুলু...যাকে বড় করিয়া তুলিবার জন্য সে জগতের মস্ত রাজপথ হইতে একদিন এক নিমেষে নিজেকে সরাইয়া লইয়া গেল, তার সেই ভাই—তার জীবনের আজ আশা নাই! সে আজ বিদায় লইতে বসিয়াছে! আর শরৎ এখনো বাঁচিয়া!

এ'ও সম্ভব! প্রচণ্ড আগুনের গোলার মত এই কথাটা তার বুকের মধ্যে এমন তাল পাকাইয়া উঠিল যে শরতের চেতনা বিলুপ্ত হইয়া গেল।

চেতনা ফিরিতে সে বলিল,—একবার তাকে দেখবো। কথাটা বলিতে তার প্রাণ ভাঙ্গিয়া গেল। তার ভাই ফুলু কঠিন পীড়ায় শয্যাগত—তাকে দেখিবার অনুমতিও তাকে চাহিতে হইতেছে, এমন নত মুখে, এত কুণ্ঠিত-ভাবে! হায় রে!

এমন সময় ভিতর হইতে লোক আসিয়া খবর দিল, ডাক্তার বাবুকে এখনই দরকার; জামাইবাবু অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন!

নৃপাল মহীপাল ডাক্তার-বাবুকে লইয়া তখনই ভিতরে ছুটিল। আর শরৎ সেইখানে থ হইয়া বসিয়া রহিল। বিনা আহ্বানে ইহাদের অন্দরে সে যায় কি বলিয়া? অথচ তার ব্যাকুলতা যে ইহাদের চেয়ে ঢের বেশী! ইহারা তো প্রফুল্লকে এই কয় বৎসর মাত্র পাইয়াছে! আর শরৎ? সে যে প্রফুল্লর ভাই, এক মার পেটে জন্মিয়াছে! একই রক্ত দু'জনের শিরায় শিরায় বহিয়া চলিয়াছে—মন-প্রাণ দুই জনের একই ধাতুতে গড়া—শরীর দুটাতেই যা শুধু তফাৎ!

বহুক্ষণ বিমূঢ়ের মত শরৎ সেইখানেই বসিয়া রহিল; পরে তার ব্যাকুলতা এমন বাড়িয়া উঠিল যে, সে এক-পা এক-পা করিয়া গিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। উপরকার ঘরে তখন কান্না ও সান্ত্বনার একটা মিশ্র গুঞ্জন-কলরব জাগিয়া উঠিয়াছে। সেই কলরব লক্ষ্য করিয়াই সে গিয়া দোতলায় উঠিল। ওধারে ঐ একটা ঘরেই যা-কিছু কলরব! ঘরের সামনে বাড়ীর রমণীরা জটলা পাকাইয়া বিমর্ষ মলিন মুখে দাঁড়াইয়া। সে সব গ্রাহ্য না করিয়াই শরৎ গিয়া ঘরের দ্বারে দাঁড়াইল। ঘরের মধ্যে উঁকি পাড়িয়া দেখে, শয্যায় পড়িয়া শীর্ণ রেখার মতই প্রফুল্ল, আর তাকে ঘিরিয়া চারিদিকে ডাক্তার, এবং বাড়ীর পুরুষের দল; সিন্ধু চোখে আঁচল চাপিয়া কাঁদিতেছে।

শরৎ অতি সন্তর্পণে ঘরের মধ্যে পা দিতেই ছানু কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাকে জড়াইয়া ধরিল, তার দুই চোখ অশ্রুতে রাঙা! শরৎ তাকে দেখিয়া নিমেষের জন্য আপনাকে ভুলিয়া গেল। দুই হাত বাড়াইয়া ছানুকে টানিয়া কোলে তুলিয়া চুমায় তার মুখ ভরাইয়া শরৎ ডাকিল,—ছানু, বাবা···

ছানু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—বাবাকে ভালো করে দাও জ্যাঠাবাবু···বাবা কথা কইচে না, আমাদের সঙ্গেও নয়···

শরতের বুকের মধ্যে কে মুগুর মারিতেছিল! ওধারে তার সব যাইতে বসিয়াছে—ইহকালের যা-কিছু সব! সে ছানুকে নামাইয়া দিয়া প্রফুল্লর শয্যার দিকে অগ্রসর হইল। প্রফুল্লর চেতনা সঞ্চার করাইবার জন্য ডাক্তার তখন তার গা ফুঁড়িয়া ঔষধ পুরিয়া যন্ত্র-পাতি লইয়া আরো কি প্রক্রিয়া চালাইতেছেন। চিঠি লেখা, ছুটাছুটি, চারিধারেই একটা প্রচণ্ড চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিয়াছে। শরৎ প্রফুল্লর মুখের পানে চাহিতেই তার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল! এই তার সেই ফুলু! এ যে একখানা চামড়ায় ঢাকা হাড়ের পাত বিছানায় পড়িয়া আছে! শরৎ আসিয়া তার বিছানার প্রান্তে চোরের মত কুণ্ঠিতভাবে বসিয়া পড়িল। তার মাথা ঘুরিতেছিল। হঠাৎ নৃপাল চারিধারে চাহিয়া বলিল—এ ঘরে এত ভিড় কেন! ভিড় ছাড়ো, ভিড় ছাড়ো—ওকে বাঁচতে দাও! তার পর শরতের পানে চাহিয়া বলিল,—আপনি বাইরে একটু বসুন এখন। জ্ঞান হয়ে হঠাৎ আপনাকে দেখলে রোগী ভারী চঞ্চল হয়ে উঠবে···তাতে বিপদ ঘটতে পারে!

বিপদ! তাকে দেখিয়া তার ভাই ফুলুর বিপদ! প্রাণের শঙ্কা! এ ঘর ছাড়িয়া যাওয়া তো তুচ্ছ কথা—সে শঙ্কা কাটাইবার প্রয়োজন হইলে শরৎ সংসার ছাড়িয়া, পৃথিবী ছাড়িয়া কোন্ অজানা লোকেও এক মুহূর্ত্তে জন্মের মত সরিয়া যাইতে পারে!

শরৎ চোরের মতই নিঃশব্দে কুণ্ঠিত পায়ে উঠিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। এক-ঘর লোক, ইহারা ও-ঘরে জড়ো হইয়া থাকিলে কোন দোষ হয় না, আর সে বড় ভাই···সে থাকিলেই যত গোল! এই কথাটা মনের মধ্যে পাক খাইয়া আর সব চিন্তাকে কোথায় যেন তলাইয়া দিয়াছিল। শরৎ আসিয়া বাহিরের ঘরেই তার পূর্ব্বস্থান দখল করিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। তার মনে হইতেছিল, এ সব স্বপ্ন··· এই ঘর, ঐ বাহিরের মুক্ত রৌদ্র-কিরণ, ঐ লোক-জনের কলরব, এ সব স্বপ্ন—এদের কোন চেতনা নাই, অস্তিত্বও নাই! ঘরের দেওয়ালে বড় ঘড়িটা এক-ঘেয়ে টক্‌টক্ শব্দ করিয়া চলিতেছিল···শরৎ তার সে শব্দটার মাঝেই নিজের মনকে ডুবাইয়া ধরিয়া নিশ্চেতনের মত বসিয়া রহিল। ঘড়ির পেণ্ডুলামটা দুলিয়া দুলিয়া শব্দ করিয়া ন'টা, দশটা, এগারোটা বাজাইতেছিল, শরতের সেদিকে খেয়ালও ছিল না! থাকিয়া থাকিয়া তার মনে হইতেছিল, এ জগতে তার করিবার যা কিছু কাজ ছিল, তা সব সারা হইয়া গিয়াছে; আর কিছু করিবার নাই! এখন—একেবারে ছুটী মিলিয়াছে! সে যেন কোথা হইতে কার একটা ডাকের জন্য এমনি বসিয়া আছে···সে ডাকটি কাণে আসিয়া বাজিলেই চলিয়া যায়!···কিন্তু কোথায় যাইবে, কে জানে! তবে সে যেন, সে যেন···সেখানকার সমস্ত-টাই অজানা—পথ-ঘাট লোক-জন কাহাকেও সে জানে না! তার নিজের যে কোথাও কেহ আছে, এ কথাও শরৎ ভুলিয়া গিয়াছিল!

হঠাৎ একটা কথায় তার চেতনা হইল। ঘরের বাহিরে লোকজন বলাবলি করিতেছিল,—মানুষের শরীর তো, এ বিবেচনাও নেই!···বড় ভাই গিয়ে বসেছিল, তা তাকে উঠিয়ে দিলে—সবই আশ্চর্য্য, বাপু!

এই কথাটাকে কেন্দ্র করিয়া শরতের চিন্তা আবার পাক খাইতে লাগিল। হঠাৎ মনে হইল, তাই তো, সেও এমন! এই যে মৃত্যু আসিয়া তারি ভাইয়ের পাশে দাঁড়াইয়াছে তাকে গ্রাস করিতে—তার সে কঠিন গ্রাস ছাড়াইতে শরৎ একটুও যুঝিবে না? তার প্রাণের সকল শক্তি লইয়া সে যদি একবার যুঝিতে পারে, তাহা হইলে বোধ হয় মৃত্যুকে হঠানো যায়! উহারা যুঝিতেছে,—সে কথা সত্য! তবু তার যোঝার সঙ্গে উহাদের যোঝায় প্রভেদ বিস্তর! সে বড় ভাই—সে যে কি শক্তি লইয়া যুঝিবে···

শরৎ উঠিল; অস্থির পদক্ষেপে সে আবার গিয়া উপরে উঠিল—ঘরের মধ্যে ঝড়ের মত গিয়া পড়িল। ডাক্তার তখন যন্ত্র-পাঁতি রাখিয়া ঘাড় নাড়িয়া উঠিয়া পড়িতেছেন, ঘর-শুদ্ধ লোক ব্যাকুল দৃষ্টিতে ডাক্তারের পানে চাহিয়া। ডাক্তার আবার ঘাড় নাড়িলেন। উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের স্বরে সিন্ধু বলিল,—দেখুন ডাক্তারবাবু, ভালো করে দিন্ আপনি!

কি ব্যাকুলতা তার সে উচ্ছ্বসিত স্বরে! ডাক্তার স্থির অকম্পিত চরণে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শরৎ একেবারে পাথরে গড়া মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া—দুই চোখের সামনে এ যেন এক স্বপ্ন-লোকের করুণ অভিনয় চলিয়াছে! ঐ মৃত্যু, ঐ অশ্রু,—এ অভিনয়ে তার যেন কোন ভূমিকাই নাই,—সে শুধু নিঃসম্পর্কিত মূক একজন বাহিরের দর্শকমাত্র!

ডাক্তারকে নিরুত্তর দেখিয়া সিন্ধু তাঁর পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল। নৃপাল অশ্রু-ভরা চোখে বোনকে টানিয়া তুলিয়া বলিল,—অধীর হয়ো না সিন্ধু···ছেলে-মেয়েদের মুখ চেয়ে বুক বাঁধো! আর কি করবে—আমাদের বরাতে সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে!

সর্ব্বনাশ! হুম্ করিয়া যেন বাজ পড়িল! এ কি কথা! শরতেরও তাহা হইলে সব গিয়াছে! এ কি ঝড় উঠিল যে তার বুক ছিঁড়িয়া প্রাণ ছিঁড়িয়া তার সর্ব্বস্ব আজ এ ঝড়ের মুখে উড়িয়া গেল!

সিন্ধু দাদার মুখের পানে চাহিল, উত্তেজিত স্বরে ডাকিল,—দাদা···

নৃপাল লুটাইয়া পড়িয়া বলিল,—সব শেষ হয়ে গেছে বোন···

সিন্ধুর আর্ত্ত ক্রন্দন বাজের মত নিমেষের জন্য বাজিয়া উঠিল, তার পর তার নিজের দেহ-ভার সেইখানে সে লুটাইয়া দিল। ঘরে কান্নার প্রবল রোল উঠিল। শরৎ তবু নির্ব্বাক নিঃশব্দ সেখানে দাঁড়াইয়া—সমস্ত জগৎ তার সামনে হইতে মুছিয়া গিয়াছে। অ[illegible] ঘন-ঘোর অন্ধকার···রাশীকৃত অন্ধকার আসিয়া শ[illegible] আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

৮

তার পর মা-বাপ আসিয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহ[illegible] শত আদরে সহস্র সান্ত্বনায় এ জ্বালা জুড়ায় কথা[illegible] সিন্ধু গুমিয়া গুমিয়া শোকের আগুনে পুড়িতে লাগি[illegible] যার পাশে দাঁড়াইয়া অমন তেজে সে জ্বলিয়া উঠিয়া[illegible] আজ সে নাই! তার দর্প, তার তেজ আজ নির[illegible] হইয়া একেবারে আহত সর্পের মত মাটীর মধ্যে গুঁজড়াইয়া শুইয়া পড়িয়াছে! তার চোখের সা[illegible] প্রদীপ্ত আলোর রশ্মি নিবিয়া গিয়া সংসারটা একেব[illegible] কালোয় কালো করিয়া দিয়াছে। প্রফুল্লর জীব[illegible] সঙ্গে সঙ্গে তার অস্তিত্বও যেন বিলুপ্ত হইয়া গে[illegible] চিরদিনের মত।

আর শরৎ? তার জীবনের উপর দিয়া মস্ত [illegible] বহিয়া গিয়াছে। সাজানো বাগানে নানা ফুল ফু[illegible] ছিল, হঠাৎ একরাত্রির ঝড় সব ফুল ঝরাইয়া, সব গ[illegible] উপড়াইয়া দিয়া তার একটা বিশ্রী বীভৎস স্মৃতি ম[illegible] জাগাইয়া রাখিয়াছে! ঐ একটা দিনের প্রচণ্ড আঘা[illegible] শরতের বয়স যেন ত্রিশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে! ত[illegible] দেহ-মন সব দুমড়াইয়া তাকে একেবারে নূতন মা[illegible] রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছে! তবুও সংসারে থাকি[illegible] সংসারকে চালাইতে হয়···এত বড় দুর্ভাগ্যকেও হঠা[illegible] যায় না, তাই সংসার চলিতেছে···সে যেন স্রোতের বে[illegible] হাল-ভাঙ্গা দাঁড়ি-মাঝিহীন নৌকার চলা! তাতে চে[illegible] নাই—যে দিকে যায়, যাক,—তা সে তীরের পানে[illegible] হোক, আর অকূলের উদ্দেশেই হোক!

ভূপাল মিত্র বিষয়ী লোক; সারা জীবন মানুষে[illegible] অন্যায় শুধরাইয়া আসিয়াছেন! দয়া-মায়া বিসর্জ্জ[illegible] দিয়া আইনের নিক্তি ধরিয়া লোকের বিচারই করিয়াছে[illegible] চিরকাল,—কাহারও প্রাণের পানে, মনের পানে চাহি[illegible] দেখেন নাই। সংসারের বেদনা বা কাতর অশ্রু তাঁ[illegible] চিত্তে থিতাইতে পারিত না, পিছলাইয়া ঝরিয়া পড়িত[illegible] তাই এ ক্ষেত্রেও শোকটাকে বাঁ হাতে ঠেলিয়া রাখিয়[illegible] ডান হাত দিয়া তিনি প্রফুল্লর বিষয়-সম্পত্তির বন্দোবস্ত[illegible] করিতে লাগিলেন। নাবালক ছেলে-মেয়ে, সিন্ধুকে দিয়[illegible] কাগজ সহি করাইয়া পেশ করিয়া সংসারের বাঁধনগুলাকে[illegible] শক্ত করিয়া কায়েমী করিয়া তুলিতে লাগিলেন। [illegible] নিঃশব্দে যন্ত্র-চালিতের মত সহি-সনাক্ত করিয়া চলি[illegible] কি সহি, কেন বা সহি, সে সম্বন্ধে একটা প্রশ্নও তুলি[illegible] না। বাপ বলিলেন, সহি কর—সিন্ধু সহি ক[illegible]

জন সহি ? এ প্রশ্ন তুলিলে এখনি নানা কথা উঠিবে—হাতে বুকের মধ্যে আঘাত-লাগা জায়গাটা নূতন ায় আবার টন্‌টনিয়া উঠিবে ! কাজ কি ! সে কোন । তুলিল না।

এমনিভাবে সহির মধ্য দিয়া বেড়া টানিয়া প্রফুল্লর চানো টাকা-কড়ির বাণ্ডিলটা টানিয়া ঘরে তুলিয়া ভূপাল ও প্রফুল্লর দেশের বাড়ীর পানে নজর ফিরাইলেন। ড়ীর নূতন ঘর-দ্বার তৈয়ার করায় প্রফুল্লর অনেক া ব্যয় হইয়াছে ! তার ভাগাভাগি করিয়া ফল নাই ! অংশটা বিক্রয় করিয়া নগদ টাকায় সেটা রূপান্তরিত রতে পারিলে সিন্ধুর ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের হিল্লাটুকু কা করা যায় !

তখন তিনি লোক-জন ডাকিয়া তাহার ব্যবস্থার কে মনঃসংযোগ দিলেন। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের বাড়ী—আর সখ করিয়া তা কিনিতে চাহিবে ! বিশেষ, মালির বাড়ী—তাহাতে শরতের অংশ আছে ! এদিকে ান উপায় করিতে না পারিয়া একদিন তিনি শরৎকেই ক পত্র লিখিলেন যে, তিনি তো সংসারের সহিত সম্পর্ক াইয়া পরলোকে যাত্রার জন্য তৈয়ার হইয়া ভব-নদীর রে বসিতে গিয়াছিলেন—কখন্‌ ডাক আসে ! কিন্তু ফুল্ল এমন অসময়ে অতর্কিতে চলিয়া গিয়া তাঁর দুই য়ে আবার শিকল আঁটিয়া টানিয়া তাঁকে সংসারে খিয়া দিয়া গেল। তবুও সংসার তাঁর আর ভালো গে না, তাই প্রফুল্লর নাবালক ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ-ক পাকা করিয়া গড়িয়া দিয়া তিনি আবার সেই রণীর তীরে গিয়াই পড়িয়া থাকিবেন,—এমনি তাঁর া ! তাই যাইবার পূর্ব্বে আর সব দিক আঁটিয়া দিলেও টা জায়গায় এখনো ত্রুটি আছে, সেটা দেশের ঐ বাড়ী য়া। সে কাজটুকু না সারিলে নয় ! প্রফুল্লর খাতা-পত্র য়া তিনি হিসাব করিয়াছেন যে, দেশের বাড়ীর ারে ও পরিবর্দ্ধনে প্রফুল্লর রোজগারের কড়ি হইতে ৭৷/১৫ ব্যয় হইয়াছে—তার উপর জমির এবং পুরানো ীর মূল্য-বাবদ্‌ আরো ৫৬৭২১৷৴৫ অর্থাৎ মোট দশ ার টাকা মাত্র শরৎ চুকাইয়া তাঁর হাতে দিলে ঐ ী-ঘর জমি-পুষ্করিণীতে শরতের ষোল আনা স্বত্ব বে,—প্রফুল্লর অংশটা শরৎ কিনিয়া নির্ব্যূঢ় খোস মেজাজে পুত্র-পৌত্র-ওয়ারীশন-ক্রমে ভোগ-ল করিতে থাকিবে আর কি ইত্যাদি···এবং বিষয়ে শীঘ্র মতামত জানাইলে ভালো হয়,—কারণ, বোলা লিখিবার পূর্ব্বে নাবালকদিগের অভিভাবিকা রূপে সিন্ধুবালাকে দিয়া আদালতে দরখাস্ত করাইয়া হইতে একটা অনুমতি লইবার প্রয়োজন আছে···

শরৎ চিঠি পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। তার বুকে কে ছুরি বিঁধিয়া শোকাহত মূর্চ্ছিত মনটাকে নিমেষে আবার জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল। দুই চোখে জল ঠেলিয়া আসিল। অশ্রু-ভরা চোখে সে গিয়া উমার কাছে দাঁড়াইল। উমা সবিস্ময়ে কহিল,—কি গা ?

শরৎ চিঠিখানা তার হাতে দিল। চিঠি পড়িয়া উমার মাথা ঘুরিয়া গেল। ঠাকুরপোর বাড়ীর অংশ, জমির অংশ—আজ সেখানে পরের কুঠার পড়িয়া সেটাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে চায় ! জমির গায়ে এ কুঠার যত বাজুক আর না বাজুক, এ কল্পনা যে তার চেয়েও ধারালো ! কুঠারের আঘাত শরতের মনকে খোঁচাইয়া ছিঁড়িয়া আজ কতখানি জর্জ্জরিত রক্তাক্ত করিয়া তুলিয়াছে—উমা তাহা সুস্পষ্ট অনুভব করিল। কিছুক্ষণ কাহারো মুখে কথা সরিল না। সংসারের চতুর্দ্দিক হইতে স্নেহ, মায়া, রক্তের সম্পর্ক মুছিয়া দিয়া সেখানে যেন আজ টাকার পাহাড় চাপিয়া বসিয়াছে—আর তারি তলে তলে অপরের কুঠার চলিয়াছে—তীক্ষ্ণ কুঠার, যেমন তার কঠিন চাপ, তেমনি তার শাণিত ধার ! আর সেই কুঠারের পিছনে কশাইয়ের তীব্র হাসি ! মানুষের প্রাণ যে তাহাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যায়, বেদনায় অভিভূত হইয়া পড়ে ! প্রফুল্লর বিষয়-সম্পত্তি,—সে কি ভাগ করিবার জিনিষ ? সে সব যে প্রাণের কোন্‌ অসীম তল অবধি শিকড় চালা-ইয়া রহিয়াছে ! সেখানে কুঠার হানিতে গেলে প্রাণের তলা হইতে প্রাণকে ছিঁড়িয়া তারো শিকড় তুলিতে হয় যে !

শরৎ জবাব দিল, দশ হাজার টাকা সে চক্ষেও কখনো দেখে নাই ; এবং নাবালকদের সম্বন্ধে ভূপালবাবুর চিন্তার কারণ নাই—তাদের হক হইতে তারা এক-তিল ফাঁকিতে পড়িবে না ! প্রফুল্ল শরতের কে ছিল, ভূপাল বাবু না জানিতে পারেন,—প্রফুল্লর ছেলেমেয়েরা যে শরতের কাছে তার নিজের ছেলে-মেয়ের চেয়েও ঢের আদরের বস্তু,—এ কথা সর্ব্ব-দেবতার নাম লইয়া সে শপথ করিয়া বলিতে পারে।

ভূপালবাবু জবাব দিলেন,—বাহিরের লোকের কাছে প্রফুল্লর অংশ বেচা ঠিক হইবে না, এইজন্যই তিনি শরৎকে তাহা কিনিতে বলিয়াছিলেন। শরৎ যদি কিনিতে না পারে, তাহা হইলে তাঁকে পরের কাছেই তাহা বিক্রয়ের জন্য দাঁড়াইতে হইবে ! তাহা করিলে শরতেরই অসুবিধা, কেন না, বুকের উপর কোথা হইতে কে অজানা লোক আসিয়া আস্তানা পাতিয়া বসিবে !···কিন্তু কি করেন ? তিনি নিরুপায়। তাঁর একটা নৈতিক কর্ত্তব্যও তো আছে। নাবালকদের চারিদিক দিয়া কায়েমী করিয়া রাখিয়া যাওয়া চাই—অতএব, ইত্যাদি।

শরৎ এ চিঠি পাইয়া বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিল ; উমাও এমন কথা খুঁজিয়া পাইল না, যাহা দিয়া স্বামীর মনে এতটুকু সান্ত্বনাও গড়িয়া তুলিতে পারে। এত

শোকের উপর এ নির্মম আঘাত, এ যে কশাইয়ের ছুরির চেয়েও নৃশংস! হায় রে, তাঁরও প্রাণে কি মমতা জাগিল না—প্রফুল্ল শরতের ভাই হইলেও তাঁহারো জামাই তো! এ শোকের আঘাত যে তাঁর প্রাণেও এমনি বাজিয়াছে!

৯

দুই বৎসর চলিয়া গেল। বিষয়ের বন্দোবস্ত তেমন পাকা হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। পাড়াগাঁয়ে অত টাকা দিয়া কেহই জমির বা বাড়ীর অংশ কিনিতে ছুটিয়া আসিল না। কাজেই ভূপাল মিত্রকে ভবসিন্ধুর কিনারা ছাড়িয়া এই সংসারের মোহাবর্ত্তে বহুকাল পড়িয়া থাকিতে হইল।

শরৎ ইতিমধ্যে কতবার হাবড়ায় আসিয়া প্রফুল্লর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা করিয়া গিয়াছে। ছানু পড়াশুনা করিতেছে ভালো। জ্যাঠাবাবুর কাছে কত বার সে আব্দার করিয়াছে,—দাদার কাছে যাবো! নিয়ে চলো, জ্যাঠাবাবু···

শরৎ বালককে এতটুকু আশ্বাস দিতে পারে নাই। তার প্রাণটাও যে এ কথায় কতখানি দুলিয়া উঠিত! কিন্তু উপায় কি? এখানে ও-কথা তুলিতে গেলে এখনই এমন টিট্‌কারীর সৃষ্টি হইবে যে, সে কথা মনে হইলেও শরতের প্রাণ কাঁপিয়া ওঠে। সে আসিয়া ছেলেমেয়েদের কোলে-পিঠে করিয়াই খুশী—তাদের পরশে ছোট ভাই প্রফুল্লর পরশ! সে ইহাদের মধ্য দিয়াই তাহা অনুভব করে। এইটুকুই তার পরম-সান্ত্বনা! এর বেশী চাহিবার সাহস তার হয় না! সে যেন চোর···তেমনি কুণ্ঠা মনে লইয়া সে আসে!···যদি ইহারা কোনদিন এ দেখাশুনায় আপত্তি করে? শরৎ ভাবনায় দিশাহারা হইয়া পড়ে!

ভূপাল মিত্র অবশেষে এক খরিদদারকে লইয়া একদিন চলিলেন বারুইপুরে, বাড়ী দেখাইতে। সেখানে গিয়া তিনি দেখিলেন, বাড়ীর নূতন পরিবর্দ্ধিত অংশটা চাবি-বন্ধ। কেহই সে অংশ ব্যবহার করে না—অথচ ঝাড়-পোঁছ যে নিত্য হয়, তাহা সে অংশের তকতকে ঝকঝকে শ্রী হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। দেখিয়া তিনি খুশী হইলেন।

পূজার সময়। সারা দেশে উৎসব-আনন্দের ভাব জাগিয়াছে—ছেলেদের উল্লাসের আর সীমা নাই। হাবড়ায় প্রফুল্লর ছেলে-মেয়েরা মামার বাড়ী হইতে কাপড়-চোপড় পাইল। সিন্ধু দেখিল, ভাইপো ভাই-ঝীদের জন্ম বেশ দামী ও ফ্যাশনের পোষাক আসিয়াছে, আর তার ছেলে-মেয়েদের জন্ম সাধারণ কাপড়, আর দোকান হইতে কেনা ছিটের পাঞ্জাবি ও ফ্রক। তার বুকে যেন কে পাথর ছুড়িয়া মারিল। এ পার্থক্য তো আগে ছিল না, প্রফুল্ল যতদিন বাঁচিয়া ছিল! সে এক নিশ্বাস ফেলিল—কার কাছেই বা সে এখন অনুযো[গ] তুলিবে! স্ত্রীলোকের যা-কিছু অনুযোগ স্বামীর কা[ছে] —আজ সে স্বামী তার নাই! মন তার নূতন করি[য়া] আজ আবার স্বামীর বিচ্ছেদ অনুভব করিল—সমস্ত প্রা[ণ] অমনি হাহাকার করিয়া উঠিল। ছানু যখন আব্দা[র] তুলিয়া বলিল,—ও কাপড় আমি পরবো না—কখখনে[া] পরবো না! আমার পরতে বয়ে গেছে! দাওয়া ব্লাউ[জ] স্যুট পরে বিসর্জ্জন দেখতে যাবে, আর আমি যাবো [এ] কাপড় পরে ··তুমি আমায় ভালো স্যুট কিনে দাও মা!

সিন্ধু বলিল,—দেবো'খন কিন্‌তে! এখন তে[া] বিসর্জ্জনের দেরী আছে, বাবা···

সেইদিনই সিন্ধু মার কাছে গিয়া বলিল,—আম[ায়] *কিছু টাকা দিতে হবে, আমার হিসাব থেকেই চাইছি*—পূজোয় খরচ করবো!

মা মেয়ের পানে চাহিলেন। সিন্ধু ক্ষুব্ধ অভিমা[নে] বলিয়া ফেলিল,—ছানু তোমার ও কাপড় পরবে না—কাপড় পরে ভাসান্ দেখতে যাবে না, বলছিল।

মা বলিলেন,—কি করবো, বলো মা! অনেক টাক[া] খরচ হচ্ছে চারিধারে,—নতুন জামাইয়ের তত্ত্ব করতে হবে—তাতে বিস্তর খরচ হয়ে গেল—তারা বড় লোক, না হলে মান থাকবে কেন!

ঠিক কথা! সিন্ধু ভাবিল, তারা, ঠিক!—নূতন বড় লোক কুটুম্ব হইয়াছে কি না, তাই আজ তাহাদের তৃপ্তি দিতে ইহাদের মাথার টনক নড়িয়াছে কতখানি! অথচ তার বেলায়···সিন্ধু ভাবিল, এজন্য আজ অনুযোগ চলে না রে! সেই তো নিজের শ্বশুর-বাড়ীকে অবহেলা করিয়া তাঁদের প্রতি ইহাদের এ অবহেলা শিখাইয়াছে! সে যদি তার ছোট বোন্ অমলার মত শ্বশুর-বাড়ীর পক্ষ লইয়া এমনি ভাবে লড়িতে বসিত···!

আজ চোখের উপর এ পার্থক্য দেখিয়া সে বুঝিল, ওদিকে অবহেলা দেখাইয়া নিজের উপরেই সে মা-বাপের অবহেলা টানিয়া আনিয়াছে—তাই না ইহারা তাকে মানিতে চায় না! কিন্তু যতদিন প্রফুল্ল ছিল...এমন চিন্তা তাঁর তৃপ্তির জন্য কখনো দেখা যায় নাই তো!···গিয়াছিল। সে করে? যখন প্রফুল্ল অনেক টাকা রোজগার করিতেছে, যখন সে বড় চাকুরে! টাকা দিয়াই ইহারা মানুষের মাপ করিয়াছেন, দরদ জানাইয়াছেন!···

সিন্ধুর মনে পড়িল শরতের কথা, উমার কথা! তারা কোন পার্থক্য করে না, করেও নাই! এই যে প্রফুল্লর মৃত্যুর পর এটা-ওটা নানা জিনিষ কিনিয়া ছেলেমেয়েদে[র] উপহার দিতেছেন! শরৎ যে প্রায়ই এই ছানুদের দেখিতে আসেন, তাঁকে ডাকিয়া কেহ একটা কথা বলে না,—একটু জল অবধি আগাইয়া দেয় না, একটা পানও না—

তবু, তো তিনি ভিখারীর মত আসেন! এ অবহেলা, এ উপেক্ষা গ্রাহ্যও করেন না! আর উমা? প্রায় চিঠি লেখে। জবাব পাক্, না পাক্—তবু লিখিয়া খবর লইবার আগ্রহ তার কতখানি! আর এখানে? বাড়ীর ছেলেমেয়েদের পড়ার জন্য দুই বেলা মাষ্টার আসিতেছে, আর তার ছেলে-মেয়েরা কোনমতে তাদের পড়ার ফাঁকে পড়া সারিয়া লয়! তাদের পড়াশুনা কেমন হইতেছে, কেহ তার উদ্দেশও লয় না! ভাইপোরা পড়ে জিলা স্কুলে—আর ছানু আর একটা কোন্ স্কুলে! সব-তাতেই পার্থক্য! …যখন প্রফুল্ল ছিল, তখন কি যত্ন, কি খাতির!…

এ সব কথা যত তার মনে পড়িতে লাগিল, ততই বুকের মধ্যে বেদনার তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বুকটা হা-হা করিতে লাগিল। এ ইঙ্গিত প্রফুল্ল দিয়াছিল অনেক দিন আগে…আজ এই ছেলেদের পূজার কাপড় দেখিয়া সে বুঝিল, সে এখানকার কেহ নয়, তার ছেলে-মেয়েরা এখানকার কেহ নয়…কিন্তু এ জ্ঞান তার জন্মিল বহু দিন পরে, বড় দীর্ঘ কাল পরে!

সেইদিনই সন্ধ্যার সময় শরৎ আসিল, ছানুদের পূজার পোষাক নিজে ঘাড়ে করিয়া। ছানুর জন্য ভালো গরদের পাঞ্জাবি, জরি-পাড় দামী ধুতি, ভালো জুতা; অন্য ছেলে-মেয়েদের জন্য সাহেব-বাড়ী হইতে কেনা খুব দামী ব্লাউজস্যুট, সিল্ক ফ্রক, জুতা।

ছেলেরা আনন্দে মাতিয়া উঠিল। সিন্ধুর দুই চোখ অশ্রুময় হইল। হাসিয়া মা বলিলেন,—তোর ভাসুর কুটুম্বিতা জানে, দেখচি রে! তা আজো আর জানবে না? আমাদের সঙ্গে মিশচে যখন…

সিন্ধু গর্জ্জিয়া উঠিল,—মা…

একটা কড়া কথা মুখে আসিয়াছিল, কিন্তু সে থামিয়া গেল। মা মেয়ের কণ্ঠস্বরে শিহরিয়া উঠিলেন। এতে রাগের কি আছে! মেয়ের সবই কেমন! মা স্তম্ভিত বিস্ময়ে চলিয়া গেলেন। ছানুরা তখন জ্যেঠামশাইকে লইয়া মত্ত! সিন্ধু উঠিল; উঠিয়া একটা দাসীকে ডাকিল, ডাকিয়া তার হাতে পয়সা দিয়া বলিল,—ভালো সন্দেশ-রসগোল্লা কিছু কিনে আন্ ভাই, শীগ্‌গির, লক্ষ্মীটি…

দাসী চলিয়া গেলে তাড়াতাড়ি সে পাণ সাজিতে বসিল।

তারপর দাসী খাবার আনিয়া দিলে নিজের আলমারি খুলিয়া প্রফুল্লর ব্যবহারের শ্বেত পাথরের রেকাবিখানি বাহির করিয়া সেখানি ধুইয়া মুছিয়া তাহাতে সিন্ধু জল-খাবার সাজাইল, নিজের হাতে গ্লাসে জল ভরিয়া ঘরের মেঝেয় প্রফুল্লর সেই আসনখানি পাতিল; পাতিয়া দাসীকে বলিল,—ছানুকে শীগ্‌গির ডেকে দে তো ভাই…

সিন্ধু সেই আসনের পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল —কতদিনকার পুরানো স্মৃতি তার বেদনাহত মনের উপর ছায়া মেলিয়া ধরিতেছিল—আর সেই কাতর স্বর …প্রফুল্ল বলিত,—আমার দাদা, আমার বৌদি, তাঁরা আমার দেবতা, সিন্ধু! একটু তাঁদের মানো তুমি…

পোড়ারমুখী সে, কেন সে কথা শোনে নাই!…আজ শরতের পায়ের কাছে সে আপনাকে ফেলিয়া দিবে, তাহাতে যদি সে পাপের একটু প্রায়শ্চিত্তও হয়!

বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়াও যখন ছানু আসিল না, তখন সে বাহিরে আসিল। বড় বাবুর জন্য কেটলি করিয়া একটা চাকর চায়ের জন্য গরম জল লইয়া যাইতে-ছিল, বড় বাবু বাড়ী ফিরিয়াছেন! সিন্ধু ব্যাকুল কণ্ঠে তাকে বলিল,—ছানুকে একবার ডেকে দাও তো নবু… বলো, মা ডাকচে, ভারী দরকার, শীগ্‌গির শুনে যাও… আর…

সিন্ধু বলিতে যাইতেছিল, শরৎকেও ডাকিয়া আনিবার জন্য! কিন্তু পরক্ষণে মনে হইল, না, ইহাদের চাকরকে দিয়া ডাকাইয়া তাঁর অপমান সে করাইবে না। ছানুকেই বলিবে, তোমার জ্যাঠাবাবুকে ডেকে আনো বাবা…

ছানু আসিল। ছানু আসিলে সিন্ধু বলিল,—তোমার জ্যাঠাবাবুকে ডেকে আনো ছানু। এখানে জল-খাবার খাবেন। বলো, মা ডাকচেন…

ছানু বলিল,—জ্যাঠাবাবু যে চলে গেছে মা!

চলিয়া গিয়াছেন! সিন্ধুর পায়ের তলায় মাটী দুলিয়া উঠিল। তার এ পূজার আয়োজন তবে নিষ্ফল, ব্যর্থ! …ঠিক, এই তো হওয়া উচিত! এতদিনকার সঞ্চিত অপরাধ—এক-নিমেষে এমনি করিয়া তার হাতে পার পাইবি…এমন ভাগ্যও তোর হইবে, পিশাচী!

সিন্ধু পাগলের মত ঘরে আসিয়া খাবারগুলা লইয়া জানালা দিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল; তার পর আসন-খানার উপর বুক দিয়া লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

১০

সে দিন বিজয়া-দশমী। বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে ছানুও ভাসান দেখিয়া বাড়ী ফিরিল। রাত্রি তখন প্রায় নয়টা। ছানু আসিয়া দেখে, জ্যাঠাবাবু অরুণদের লইয়া বাহিরের ঘরে বসিয়া আছেন। সে জ্যাঠাবাবুকে প্রণাম করিল, অরুণকে প্রণাম করিল। শরৎ বলিল,—তোমার দাদাকে আর ভাই-বোনদের মার কাছে নিয়ে যাও তো বাবা—প্রণাম করে আসবে।

সিন্ধু তার ঘরে কাঠ হইয়া বসিয়াছিল—বাপের সঙ্গে একটু পূর্ব্বে জমি ও বাড়ী বিক্রয় লইয়া বকাবকি হইয়া গিয়াছে। বাপ একজন খরিদ্দার ঠিক করিয়াছেন, সেই কথাটা তিনি বলিতে আসিয়াছিলেন। কোর্ট খুলিলেই সিন্ধুকে কোর্টের একটা অনুমতি লইতে হইবে, তাহার লেখাপড়া শেষ করিয়া তিনিও কাশী যাইবেন।

সিন্ধু বলিল,—আমার ভাসুরের মত আছে ?

ভূপাল মিত্র বলিলেন,—তার আবার মতামত কি ! বিষয় প্রফুল্লর, তার নয়। তাছাড়া আমি তাকেই লিখেছিলুম নেবার জন্য, তা সে নেবে কোত্থেকে ! তার টাকা নেই···তাইতো আমি অন্য খদ্দের দেখলুম···

সিন্ধু অবাক হইয়া গেল। তাকে না জানাইয়া তলে তলে ওদিকে এমন ভাবে চাকা ঘুরিতেছে ! ভাসুরকে ওধারে এঁরা অপমান করিতেছেন, আর সে তারি মাঝে এখানে তাঁকে জলখাবার খাওয়াইবার জন্য সেদিন আসন পাতিয়া বসিয়াছিল ! আজো চন্দ্র-সূর্য্য উঠিতেছে—আজো দিন-রাত্রি হইতেছে ! এত বড় পাপের মাঝখানে বসিয়া সে তরিয়া যাইতে চায় ! ইহা কি সম্ভব !

সিন্ধু বলিল,—আমায় এ কথা জানিয়ে তাঁকে এ সম্বন্ধে লিখলেই ভালো করতেন ! এ ভালো কাজ হয় নি বাবা। তাঁর ভদ্রাসনের উপর পাঁচিল তুলে কে-একজন অপর লোক এসে বাস করবে···

বাপ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন,—তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে বিষয় চালাতে হবে ! এত দূর কাণ্ড-জ্ঞান-বর্জ্জিত আমি হইনি আজও !···বকিয়া ঝকিয়া ভূপাল মিত্র চলিয়া গেলেন। সিন্ধু গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল।

এমন সময় ছানু আসিল অরুণদের সঙ্গে লইয়া। অরুণ, ভুলু সকলে আসিয়া কাকিমাকে প্রণাম করিল। সিন্ধু তাদের বুকের কাছে টানিয়া লইল। কাকিমার আদরে অরুণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সিন্ধু তাদের জন্য জলখাবারের বন্দোবস্ত করিতে গেল।

ছানু বলিল,—তোমার পূজোর কাপড় পরোনি দাদা ? আজ যে পুরোনো কাপড় পরতে নেই !

অরুণ বলিল,—পূজোয় এবার কাপড় হয়নি।

ছানু আশ্চর্য্য হইয়া গেল, বলিল—হয়নি কেন ?

অরুণ বলিল,—বাবা বললে, পয়সার টানাটানি। কাকাবাবু তো নেই, তাই তোমার কাকাবাবুর ছেলে-মেয়েদের ভালো পোষাক কিনে দিতে হবে কি না ! তারা ছোট ভাই-বোন, তোমরা না হয় এ-বছর, নাই নিলে তাদের দি—কেমন ? তা আমরা বললুম, তাই দাও বাবা !

এমন কথা ছানু কখনো শোনে নাই ! সে অবাক হইয়া গেল। তার পর সিন্ধু ঘরে আসিলে ছানু বলিল, —মা, দাদাদের এবারে পূজোর কাপড় হয়নি।

সিন্ধু বলিল,—হয় নি ! কেন অরুণ ?

অরুণ তখন আবার তার কারণ খুলিয়া বলিল। শুনিয়া সিন্ধুর দুই চোখে জল ছাপাইয়া উঠিল ! এই আপন-জনকে ঠেলিয়া বাপের আদরে ভাইয়ের আদরে সে দুনিয়া ভুলিয়া ছিল ! আর একটু আগেই এই ভাসুরের স্নেহের মাঝে বাপ কি ভীষণ ছুরি কি নির্ম্মভা[illegible] না চালাইতে চলিয়াছে ! তার সমস্ত প্রাণ কেমন ঝাঁ[illegible] উঠিল। সিন্ধুর মনে হইল, সে বুঝি পাগল হ[illegible] যাইবে ! জোর করিয়া মনের সে চাঞ্চল্য চাপা[illegible] সে অরুণকে বলিল,—তোমার বাবা কোথায় ?

ছানু জবাব দিল,—বাহিরের ঘরে।

সিন্ধু বলিল,—আমি তাঁকে প্রণাম করে আ[illegible] চলো···

বিদ্যুতের গতিতে সিন্ধু বাহিরের ঘরের পানে ছুটি[illegible]

বাহিরের ঘরে ভূপাল মিত্র তখন আসিয়া জমকাই[illegible] বসিয়াছিলেন; শরৎকে বলিতেছিলেন,—তুমি [illegible] বাড়ীর অংশ আর দেশের জমিটুকু নিলে না, কাজে[illegible] আমায় অন্য খদ্দের দেখতে হলো ! একজন বা[illegible] আছে, আট হাজারে সব কিন্‌তে চায়। তাই বলছিলু[illegible] ও-কাজটুকু পূজোর পর সেরে নেওয়া যাক্।

শরৎ এ কথা শুনিয়া স্তম্ভিত বসিয়া রহিল। [illegible] ভাবিতেছিল, জগতে টাকাটাই সব-চেয়ে বড় হইল[illegible] তার পাশে পৈতৃক ভিটার মায়া···শরতের মুখ দিয়া কো[illegible] কথা বাহির হইল না।

ভূপাল মিত্র বলিলেন,—কি বলো তুমি ! এ কাজ[illegible] না হলে আমিও কাশী যেতে পারচি না কি না···বলি[illegible] তিনি শরতের পানে চাহিলেন, তার উত্তরের প্রতীক্ষায়[illegible]

শরৎকে কোন উত্তর দিতে হইল না। সিন্ধু ঝ[illegible] করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—এ সব কি কথা বলছে[illegible] বাবা ?···প্রাণপাত পরিশ্রমে যে বাড়ী তিনি তৈরী[illegible] করালেন, সে বাড়ী অপরে কিনবে !···তাঁর এ অপমা[illegible] কখনোই আমি ঘটতে দেবো না !···তোমরা আমার ভালোর জন্য অনেক করেচো, তার জন্য ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবেন ! কিন্তু আর না ! আমার ভালো, আমার ছেলেমেয়েদের ভালোর ভার তোমাদের নয়ও—সে ভার আমার ভাসুরের, তাঁর দাদার !

ভূপাল মিত্র চমকিয়া উঠিলেন। ব্যাপারটা স্বপ্নের মত মনে হইল। তাঁর মেয়ে সিন্ধু বৈষয়িক ব্যাপারে কথা কহিতে আসে···তাঁর মুখের উপর ! বিশেষ স্বেচ্ছায় যেখানে সে ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছেন !

সিন্ধু বলিল,—কে বল্লে তোমাদের এ বন্দোবস্ত করতে ! ও বাড়ী বেচা হবে না। আমার ছেলেমেয়েরা মাথা গুঁজে থাকবে কোথায়, শুনি, ও বাড়ী বেচলে ?

ভূপাল মিত্র অবাক হইয়াই বলিলেন,—কেন, যেখানে আছে...

সিন্ধু বলিল,—এখানে ! বলিয়া মুহূর্ত্তের জন্য থামিল, তার পর ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিল,—অনুগ্রহাৎ ভিখারীর মত ! তার দরকার নেই ! আমি সব সহ্য করতে[illegible] পারি, কিন্তু এই স্নেহভিক্ষা অসহ্য ! এখানকার সব ব্যা[illegible]

দেখে-শুনে আমি অবাক হয়ে গেছি! এই পূজোয় আমার ছেলেমেয়েদের জন্য একখানা ভালো কাপড় কিনে দিতে আমাদের পয়সায় টান ধরলো! নতুন জামাইয়ের তত্ত্ব যাবে,—তার জন্য! তোমার বাড়ীর ছেলেমেয়েদের কোনোখানে কোন অভাব ঘটলো না তো! আর আমার ভাসুর···নিজের ছেলেমেয়েকে বঞ্চিত করে ওরা যা' চিরদিন পরতো, সেই পোষাক কিনে দিলেন! দরদ আলাদা জিনিষ বাবা, মমতা আলাদা জিনিষ—পয়সায় তার মাপ হয় না।···হিংসের এ কথা বলচি না আমি··· তবে ছানু যখন সেদিন কেঁদে এসে বললে, মা, ও কাপড় আমি পরবো না—আমার বুক তখন ফেটে গেল! এ ভাব আগে ছিল না বাবা, যতদিন তিনি ছিলেন,—যতদিন তাঁর রোজগারের টাকার উপর আমরা বসেছিলুম ···সিন্ধুর সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। শরৎ ও ভূপাল মিত্র উভয়েই থ হইয়া বসিয়া রহিলেন। এ কি এ, সিন্ধুর এ কি-মূর্ত্তি আজ চোখের সামনে···

সিন্ধু তখনি শরতের দিকে অগ্রসর হইল। তার পর তার পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিল, —আমি আপনার সঙ্গে যাবো—এখনি, ছেলেমেয়েদের নিয়ে! এখানে আর একদণ্ড থাকবো না। এখানকার বাতাস ভারী হয়ে রয়েচে, বিষিয়ে রয়েছে—তার মাঝে আমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমি থাকতে পারবো না, মরে যাবো। আপনি উঠুন, গাড়ী আনুন—আমিও তৈরী হয়ে নি। আমার নিজের ঘর রয়েচে, দোর রয়েচে, আপন-জন রয়েছে—তাদের মাঝে গিয়ে আমি থাকতে চাই। এখানে ভিখিরীর মত, এঁদের দয়া চেয়ে ···না, না!—আপনি উঠুন,—আমি ছানুদের নিয়ে তৈরী হয়ে আসি!

কথাটা বলিয়াই সিন্ধু ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেল। শরৎ তেমনি স্তম্ভিত—ভূপাল মিত্রও নির্ব্বাক। কাহারো মুখে কথা নাই···

কিছুক্ষণ এমনিভাবে কাটিলে সিন্ধু আবার ফিরিয়া আসিল—ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লইয়া; এবং আসিয়া বেশ অকম্পিত স্বরে বলিল,—এঁদের স্নেহে ইহকালটা সবই নষ্ট করেচি—তাঁর মন থেকে ক্রমেই সরে যাচ্ছিলুম—সে পাপের এখন প্রায়শ্চিত্ত করবো! যদি পরকালে তাঁর মনের পাশে আবার এগুতে পারি···আপনারা আমায় সেই আশীর্ব্বাদই করুন্!···তার পর ভূপাল মিত্রের পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া বলিল,—আমার অপরাধ নিয়ো না বাবা। তোমরা আমার ভালোর চেষ্টাই করেচ চিরদিন,—কিন্তু সে ভালো কালো মূর্ত্তিতেই প্রকাশ পেয়েচে চিরকাল! সে কালো অন্ধকারের মাঝে পড়ে প্রাণ আমার হাঁপিয়ে উঠেচে, এক ফোঁটা আলোর জন্য! আলো···একটু আলো! যে সংসারে স্নেহ নেই, দরদ নেই, কেবলি তেজারতির কারবার চলে, সে সংসারে ছেলেমেয়ে নিয়ে বিধবা থাকতে পারে না! আজ তাই দরদের জন্য, মায়ার জন্য, মমতার জন্য প্রাণ আমার ব্যাকুল হয়ে উঠেচে। এ আর সহ্য হয় না, এই তেজারতি! তার পর থামিয়া শান্ত হইয়া শরতের পানে চাহিয়া কহিল,—আপনি একটা গাড়ী দেখুন। আমরা তৈরী।

শরৎ মন্ত্র-চালিতের মত উঠিয়া ধীরে ধীরে ঘর ছাড়িয়া গাড়ীর উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল।

ঘর স্তব্ধ; শুধু দেওয়ালের গায়ে বড় ঘড়িটা টক্‌টক্ শব্দে সে স্তব্ধতার বুক চিরিয়া চলিতে লাগিল।

বিনোদ হালদার

(উপন্যাস)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রীতিভাজন

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

করকমলেষু

বন্ধু,

ডায়েরি নিয়েই তোমার কাজ। ডায়েরির জন্য তোমার নাম দেশে-বিদেশে কে না জানে! তাই বেচারা বিনোদ হালদারকে তার ডায়েরি-সমেত তোমার কাছে পাঠালুম। এ'র সঙ্গে আলাপ করে তুমি খুশী হবে, নিশ্চয়; এবং আর কারো কাছে আদর না পেলেও তুমি যে বেচারাকে সাদর আতিথ্যে তৃপ্ত করবে, এ বিশ্বাস আমার প্রচুর।

প্রীতিমুগ্ধ

সৌরীন্দ্র

বিনোদ হালদার

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাহিত্য-সূচনা

বাপ মার্চেন্ট অফিসে চাকরী করেন; মাহিনা মোটা; শ্রী গণেশ হালদার। কলিকাতায় বাড়ী আছে, এবং ...স্ব পিতার সঞ্চিত কিছু কোম্পানির কাগজও বর্ত্তমান। ...গাছালো পরিবার। অভাব-অনাটন নাই। সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন চলিয়া যায়।

বিনোদ তাঁর পুত্র। একমেবাদ্বিতীয়ং; আদরের মাত্রা বেশী; কারণ, চার কন্যার পর পুত্র। সুতরাং সকণ্ড ক্লাশে পৌঁছিবামাত্র সৌখীন কাব্য-রোগে তাকে পাইয়া বসিল।

এই কাব্য-রোগের ব্যাসিলি বহিয়া আনে শিবরাম। শিবরাম পাড়ায় থাকে; বিনোদের সঙ্গে এক ক্লাশে পড়ে। তার বাপ একখানা বাংলা দৈনিকে ইংরাজী সংবাদের বাংলা তর্জ্জমা করে এবং সম্পাদকের ব্যাধি ঘটিলে বা তাঁর পত্নী পূর্ব্ববঙ্গের ওধারে পিত্রালয়ে গেলে তাঁকে স্বগৃহে আনিতে যাইবার কালীন অফিস হইতে ছুটী লইলে সম্পাদকীয় নিবন্ধাদিও লিখিয়া থাকেন। এই হেতু তাঁর ঘরে বাণী দেবীর একটু যাতায়াত আছে; এবং একদিন কি করিয়া তাঁরি প্রসাদে শিবরাম সহসা ইংলিশ টেক্সটের 'বোডিসিয়া' কবিতার পদ্যানুবাদ করিয়া ফেলিল।

টেক্সটে আছে;

> When the British warrior Queen
> Bleeding from the Roman rods

শিবরাম তার অনুবাদ করিল,—

> যখন ব্রিটন-রাণী নাম বোডিসিয়া
> রোমানের অস্ত্রাঘাতে রক্তাক্ত হইয়া...
> ... ...

বাকী ছত্রগুলা পাওয়া যায় নাই। শিবরামের বাপ ... বদল করিয়াছেন, সেই গোলমালে খোয়া গিয়াছে। ...বিতা লইয়া সে আসিল বিনোদের কাছে। তখন এস্, সি, বোসের এ্যালজেব্রা খুলিয়া ফ্যাক্টর ...

শিবরাম কহিল,...

কিন্তু এত সবিস্তারে সে কথোপকথনের বৃত্তান্ত বলিয়া লাভ নাই। সেই কবিতানুবাদ দেখিয়া বিনোদের মাথায় চিন্তা জাগিল। সে চক্ষু মুদিল। মুদিত চোখের সামনে মাইকেল, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের ছবির মুখগুলি ভাসিয়া উঠিল। সে ভাবিল, ঠিক, দুনিয়ায় আসিয়া একটা নাম যদি না রাখিয়া গেলাম, তবে এ দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম গ্রহণের কি প্রয়োজন ছিল। সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুর, ছুঁচার মত খাইয়া দাইয়া নাচিয়া কাঁদিয়াই জীবন-লীলা শেষ করিয়া দিব? কেরাণীর ছেলে আমি—লেখাপড়া যা হইতেছে, তাহাতে বড় জোর দুটা নয় তিনটা পাশ করিলাম! গেজেটে বিশেষ ভালো জায়গায় নামটুকু ছাপা হইবার আশা আদৌ নাই—তার চেয়ে এই লেখনীর মারফৎ...

সাহিত্য-সাধনাই নাম-সাধনার একমাত্র উপায়। দেশে মাসিকপত্রের অভাব নাই; সুতরাং ভবিষ্যতে একদিন নাম ছাপা হইবার আশাই বা নাই কিসে! ওই তো...

একরাশ নাম মনে পড়িল। এদের নাম তো লোকে জানে! এবং তা জানে শুধু এরা মাসিকে সাপ্তাহিকে লেখে বলিয়াই না!

সে কহিল,—বেশ বলেচো শিবু... ...নে মিলে লেখা প্র্যাকটিশ করা যাক, এসো...

শিবরাম কহিল,—বাবা আমায় মাঝে মাঝে ইংরাজি খবরের কাগজ থেকে খবর ট্রানস্লেট্ করতে দেয়! এই আজ সকালেই একটা করে দিছি...আমার এখনো মনে আছে...

A house colapse গৃহ-পতন। জাঁকেরিয়া ষ্ট্রীটে একটা পুরোনো বাড়ী পড়ে গেছে। কালকের 'বঙ্গাননে' ছাপা হবে।

বিনোদ কহিল,—তোমার লেখা?

শিবরাম কহিল,—হ্যাঁ।

বিনোদ কহিল,—বাঃ! মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে শিবরামের পানে চাহিয়া রহিল।

শিবরাম কহিল,—ধেৎ! ও আবার লেখা! তা নয় তার চেয়ে কবিতা, গল্প, কিম্বা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ কি চলতি খবরের কাগজের গালাগাল এই সব লিখতে পারলে!

দাসী মিছরির শরবৎ আনিয়া দিল।

গৃহিণী কহিলেন—জিরিয়ে স্নান করে নাও, ভাত চড়েছে। নতুন হাঁড়ি-কুড়ি আনাতে হলো। কোথাকার পথের কে ঘরে এসে মলো! কি যে হবে, বাবু? আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠচে!

—ছেলেমেয়েরা?

গৃহিণী কহিলেন,—তাদের ন'দার ওখানে পাঠিয়ে দিছি! তুমি এখন এসো—সেই কোন্ সকালে এক পেয়ালা চা খেয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়েচো!...পেটে আর কিছু পড়েনি, তায় এই ধুকুনি! সাধ করে মাংস চড়ালুম, দুটো ইলিশ মাছ আনালুম...সব ছরকোট্ হলো, কারো মুখে গেল না! এমন গেরো!

মনের বেদনায় গৃহিণী প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। বিনোদের মনটাও অশ্রুর বাষ্পে ভিজিয়া যাইবার মত হইল! সে ভাবিল, হায় রে, গজেনদার বাড়ীর কচুরিগুলাও যদি তখন খাইয়া লইতাম! ছুটির দিনটা সে আরামে কাটাইবে, ভাবিয়াছিল, না, কি এ অপ্রত্যাশিত দুর্ভোগ! কল্পনার অগোচর!

পাড়ার গৃহে গৃহে তখন শাঁখ বাজিতেছে। গৃহিণী কহিলেন,—ওরে জগা, ওরে আকুলু, আয় বাবা, একটু করে মিছরির শরবৎ দু'জনে আগে মুখে দে!...আহা, বাছারে!

—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নাট্য-প্রচেষ্টা

১

মধুপুর
বুধবার

বন্ধু হে,

এখানে এসে আছি ভালো। একখানা নাটক ফেঁদেচি—রাজপুতানার এক কাহিনী নিয়ে। তুমি বলবে, মামুলি জিনিষ নিয়ে নাড়াচাড়া আর কেন? রাজপুতানা তো বাঙলাকে গিলে খেয়েচে! তা হোক্, আমার এ বইয়ে modern ideas খুব ঢোকাচ্ছি। পদ্মিনীকে যখন ভীমসিংহ বলেছিলেন, তোমায় আলউদ্দিন দেখতে চায়, আয়নার সামনে দাঁড়াবে; পদ্মিনী রাজী হয়ে গেছলেন। আমি কিন্তু সে মামুলি পথ ছেড়ে পদ্মিনীকে দিয়ে বলাবো—কি! আমি তোমার স্ত্রী বলে তুমি এমন প্রস্তাবে আমার নারীত্বের অপমান করতে চাও? অর্থাৎ she would be a modern woman, through and through. লিখি আগে, তার পর দেখে বিচার করো, নাটক কেমন দাঁড়ালো। এ-সব idea না দিলে নাটক জমবে না গেল মতটা!'

গোপন করবো না বন্ধু, নিঃসঙ্গতা সময় বুকে ভারী বাজচে! কিন্তু অতি প্রচণ্ড নির্লিপ্ততা—সে কথা মনে হলে প্রা ওঠে! এই বয়সেই সন্ন্যাসী হতে হলে আপশোষ! কথাটা একটু খুলে বলি!

স্ত্রীর সঙ্গে প্রতি ব্যাপারেই ইদা চলছিল, জানো তো! আমি পাগল, সংসারে উদাসীন! নভেল-নাটক লেখার নেই—ও চেষ্টা আমার পক্ষে অশোভন, সব অনুযোগ স্ত্রীর মুখে শুনলে, কার মন পারে! কাজেই আমি পালিয়ে এসে চাই যে তিনি ধনীর কন্যা হলেও আমি করে থাকতে পারবো না। আমার স্বামিত্ব আছে! স্ত্রী যদি স্বামীর সুখ- বোঝে, তাহলে বেচারী স্বামীর পক্ষে জীব দুঃসহ হয়। যাই হোক, তাঁকে ছেড়ে লাভ হয়েচে এই যে, ঝগড়া-কলহের নী থেকে মুক্তি পেয়েচি; এবং সাহিত্য-সাধ চালাবার সুযোগ মিলেচে। তার জন্য তো ভাগ্যে তুমি তোমার মধুপুরের এই থাকবার অনুমতি দেছ!

ছেলেপিলেগুলো? মিছে ভাবা। যাঁ তাঁর কাছেই তারা আরামে থাকবে। ভাবা। আজ এই অবধি থাক্। একটা সেটা শেষ করা যাক। ইতি

শ্রীবিনো

২

বন্ধু হে,

একটা বিভ্রাট ঘটেচে। আজ তিন খালি বাংলায় লোক এসেচে। এক নাকি মিসেস্ পদ্মাবতী দেবী—কোন্ গান মিষ্ট্রেস্, না, কি! তাঁর গান গাওয়ার ঘুমের ভারী ব্যাঘাত হচ্ছে। নারী-কণ্ঠে সঙ্গীত শোনা যায় না! তাছাড়া তোমা আর পাশে তাঁদের বাংলার মধ্যে যে পাঁচিলটির মাঝখানে বেশ রন্ধ্র তৈরী হয়ে দুর্বৃত্ত চাকর-বাকরে বোধ হয় এ কীর্ত্তি ক বাংলার রসালো পেয়ারার লোভে!

ভাড়া উঠিল পাঁচ টাকা ছ'আনা। শ্যামাদাস ব্যাগ লিয়া ভাড়া দিতে যাইতেছিল। কিন্তু ভালো দেখায় না! বিনোদ নিজেই তাহা দিল। গা কর্‌কর্ করিয়া উঠিল। কিন্তু উপায় নাই! শ্যামাদাস আপত্তি তুলিল, হিল,—ও কি করচেন কাকাবাবু? না, না···

হাসিয়া বিনোদ কহিল,—আমি যে কাকা হই···

হষ্টেলের ঘরে বিছানা পাতিয়া জিনিষপত্র রাখিয়া শ্যামাদাস কহিল,—চলুন কাকাবাবু···

—কোথায়?

—সার্কাসে।

—আজই? চলো। কিন্তু জলটল কিছু খাবে না? তার চেয়ে এখন আমার সঙ্গে আমার ওখানে চলো! সার্কাস আর একদিন হবে।

শ্যামাদাস কহিল,—না কাকাবাবু, ওদিকে কলেজ আছে। একাও আমি যেতে পারবো না তো···

···বেশ।

দুজনে বাস ধরিল। বাসে চড়িয়া এস্প্লানেড। তার পর সেখান হইতে খিদিরপুরের বাসে উঠিয়া একেবারে সার্কাসের সামনে। বিনোদ টিকিট কিনিল; কিনিয়া সার্কাস দেখিতে ঢুকিল। ম্যাটিনী প্লে।

সার্কাস ভাঙ্গিলে শ্যামাদাসকে লইয়া সে ইম্পীরিয়ালে গেল। বেলা তিনটা হইতে ঘুরিতেছে। ছেলেমানুষ, বেচারী।

ভাগ্যে সেদিন সকালে হরীতকী-বাগানের ভাড়াটিয়া ভাড়ার দরুণ সত্তর টাকা নগদ দিয়া গিয়াছিল; এবং তারাচাঁদ পরশুরামের দোকানে পাছে এই টাকা কয়টা লইয়া যায়, এই ভয়ে বাক্সজাত না করিয়া পকেটেই সে টাকাটা রাখিয়াছিল। অবশ্য গৃহিণীর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে! বাক্সর চাবি গৃহিণীর আঁচলেই থাকে কি না।

ইম্পীরিয়াল হইতে বাহির হইয়া সে ট্যাক্সি ধরিল। রাত হইয়া গিয়াছে, তায় নূতন হষ্টেল। সেখানকার আইন-কানুন জানা নাই!

হষ্টেলে পৌঁছিয়া শ্যামাদাস কহিল—কাল কিন্তু সীতা দেখাতে হবে, কাকাবাবু···কাল রবিবার। ম্যাটিনী আছে।

অগত্যা!···বিনোদ কহিল,—আচ্ছা। কাল আমার বাড়ীতেও তার পর নিয়ে যাবো।

শ্যামাদাস কহিল,—হ্যাঁ, কাকিমাকে বলবেন, আজই আমি যেতুম, তবে আজ সব ঠিকঠাক করতে হচ্ছে কি না!

তথাস্তু!

পরের দিন সকালে চুপিচুপি নাট্যমন্দিরে গিয়া দু'খানা ফার্ষ্ট ক্লাশ টিকিট কিনিয়া সে সীট রিজার্ভ করিয়া আসিল। 'সীতা' নাকি খুবই ভালো হইয়াছে। সকলে দেখিয়াছে, শুধু বিনোদের দেখা হয় নাই! শিশির ভাদুড়ী রামের পার্টটায় নাকি ভারী কেরামতী খেলাইয়াছে। দেখা যাক···

গৃহে এ কথা অপ্রকাশ রহিল। প্রায় একমাস পূর্ব্বে গৃহিণী বলিয়াছিলেন,—তাঁর ভগ্নী ও ভগ্নীপতি আসিয়াছিলেন—তাঁদের 'সীতা' দেখাইতে হইবে।

অফিসের কাজ, না, এমনি কি একটা ওজুহাত তুলিয়া বিনোদ সে খরচ বাঁচাইয়াছিল। তার জন্য কত মুখ-ভার, কত কি···এখন এ কথা প্রকাশ করিলে কি হইবে, সে জানে না! তবে কি যে হইবে না, তা অনুমান করা শক্ত নয়!

বেলা চারিটায় সে হষ্টেলে গেল। সেখান হইতে শ্যামাদাসকে লইয়া নাট্যমন্দিরে। অভিনয় ভারী জমিয়া উঠিয়াছিল। শম্বুকের মৃত্যু-দৃশ্যে দুই চোখে জল ঠেলিয়া আসিল। নিশ্বাস বন্ধ হইবার জো! ড্রপ পড়িলে সে বাহিরে আসিল। বিমলের সঙ্গে দেখা···কথা হইতেছিল! অভিনয়ের কথা। তা ছাড়া তারা নাকি বায়োস্কোপের ছবি তুলিতেছে! হঠাৎ বিনোদ দেখে, মহীন। মহীন তার ছোট সম্বন্ধী। মহীন কহিল,—এই যে আপনিও এসেচেন! বাঃ, ভালোই হলো। দিদিদের তা হলে নিয়ে যাবেন···

দিদিদের! বিনোদ যেন আকাশ হইতে পড়িল! মহীন কহিল,—কাল বিকেলে গেছলুম আপনার ওখানে। আপনি ছিলেন না। তা বড় বৌদি এসেচেন কি না, তাঁকে নিয়েই গেছলুম। সীতা দেখবেন বলে ধরলেন—শুনে দিদিও বললেন, হ্যাঁ, তাঁরো সীতা দেখার সাধ। বললেন, তোরা এইখেনে আসিস, একসঙ্গে যাবো। তার পর থিয়েটার ভাঙ্গলে দিদিদের নামিয়ে বৌদিকে নিয়ে বাড়ী ফিরবো, কথা আছে।

বাড়ীর অর্থ খিদিরপুর। কিন্তু তাই তো···দিদিদের লইয়া বলে যে! গৃহিণী সীতা দেখিতে আসিবেন, এ কথা তো তাঁকে বলেন নাই! মহীন কহিল,—আপনি আসবেন জানলে···

বাধা দিয়া বিনোদ কহিল,—আমার আসবার কি কোনো ঠিক ছিল, ছাই! হঠাৎ একজনের পাল্লায় পড়ে···

মহীন কহিল,—যাই হোক, এসেচেন যখন, তখন দিদিদের নিয়ে যাবেন···আমি তাঁকে বলে পাঠাচ্ছি···

এ কথার প্রতিবাদ নাই। প্রতিবাদ চলে না। সুতরাং···

মহীন কহিল—কেমন দেখচেন?

বিনোদ কহিল—খাশা!

মহীন কহিল—আমি এই ফিফ্‌থ্ টাইম দেখচি। আর যত দেখচি, ততই শিশির ভাদুড়ীর শক্তি···ওঃ, grand অর্থাৎ he is a creator of characters,

বেশ্যা হইয়াছে। আপনার নিদ্রার ···

বলিয়াই সে আবেগোচ্ছ্বাসে গ্যারিক, আচাকভ্ না কাচালফ এমনি কতকগুলা নাম বকিয়া গেল। সে সব কথা বিনোদের মনের দ্বারেও পৌঁছিল না। সে তখন গৃহিণীর কাছে কি কৈফিয়ৎ দিবে, কল্পনার তুলি ধরিয়া তার ছবি বিচিত্র ভঙ্গীতে গড়িয়া তুলিতেছিল!

থিয়েটার ভাঙ্গিলে শ্যামাদাস ও গৃহিণী সকলকে লইয়া সে গৃহে ফিরিল। গৃহিণী নির্ব্বাক। বিনোদও তদ্বৎ। কথা কহিবার মুখ তার ছিল না! যেন ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কে চুরি করিতে ঢুকিয়া সিঁধ-কাঠি-সমেত সে ধরা পড়িয়া গিয়াছে!

শ্যামাদাস উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল,—এসে অবধি কাকিমা, কাকাবাবুকে ভারী জ্বালাতন করচি। কাল আমায় সার্কাস দেখিয়েচেন, ইম্পীরিয়ালে খাইয়েচেন, তার পর আজ সীতা দেখালেন। তাও ফার্ষ্ট ক্লাশের টিকিট কিনে! বললুম, ফার্ষ্ট ক্লাশের কি দরকার! মিথ্যে বাজে খরচ! তা কাকাবাবু বললেন, হোক্‌গে! দেখুন তো, অন্যায় নয়?

গৃহিণী বহু স্নেহ দেখাইলেন,—মায়ার উৎস খুলিয়া দিলেন! বাঙালীর ঘরের মেয়ে...যতখানি মায়া-মমতা তাঁর বুকে আছে,—অজস্র...সবটুকু যেন উজাড় করিয়া দিলেন! এইখানে তাঁর মনখানি সত্যই নারীর মন বলিয়া চেনা গেল! তাকে বার-বার তিনি বলিয়া দিলেন,—অবসর পেলেই আসবে বাবা, নাহলে ভারী রাগ করবো...

শ্যামাদাস কহিল—নিশ্চয় আসবো, কাকিমা, মাও বলে দেছে।

রাত প্রায় দশটা বাজে; শ্যামাদাস বিদায় লইল। বিনোদ একা...গৃহিণীর সামনে! সার্কাসের তাঁবুর দ্বারে saleএর একটা বিজ্ঞাপন সে পাইয়াছিল। কি নভেলটী ষ্টোর্সের বিজ্ঞাপন। সেটা পকেটে ছিল। অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া একান্তে বসিয়া সেই বিজ্ঞাপনের কাগজে সে চোখ বুলাইতেছিল।

গৃহিণী খড়খড়ির ধারে নীরবে দাঁড়াইয়া...এ কি ঝড়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের স্তম্ভিত গম্ভীর ভাব? কে জানে, কি ঘটিবে!

মনে সাহস সঞ্চয় করিয়া বিনোদ কহিল,—ঢ্যাখো গো, তুমি বলেছিলে না, দুটো জিনিষের কথা? জল গরম করবার দরুণ একটা ইলেকট্রিক কেট্‌লি, আর জামাটামা ইস্তিরি করবার একটা ইলেট্রিক আয়রণ...তা দেখে এসেচি। আজ কিনতে গেছলুম তোমার জন্য! খেয়াল ছিল না যে, আজ রবিবার। গিয়ে দেখি, দোকান বন্ধ। কাল অফিস থেকে আনিয়ে নেবো। সন্ধ্যার সময় পাবে।

অপ্রসন্নতা, অভিমান, না অভিযোগ...যে কারণেই হোক, গৃহিণীর যে-মুখ এতক্ষণ অত্যন্ত বিরূপ ছিল, সে-মুখে সহসা প্রসন্নতার দীপ্তি ফুটিল! চোখে হ[illegible] জ্যোৎস্না! তিনি কহিলেন,—দশটা বাজে যে! খাবে কখন্? সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরেচো, খাবারও খাওনি, নিশ্চয়...

বিনোদ বলিল,—না, ঠাকুরকে দিতে বলো। [illegible] খাই।

ঠাকুর আহার্য্য আনিয়া দিলে বিনোদ খা[illegible] বসিল। গৃহিণী পাশে বসিলেন, কহিলেন—[illegible] কেমন দেখলে?

বিনোদ কহিল—খাশা! বলিয়াই জিভ কাটি[illegible] পরক্ষণে অত্যন্ত নির্লিপ্ত ভাব দেখাইয়া কহিল— আমার বাবু ও-সব ভালো লাগে না...রামায়ণ পড়ে[illegible] তৃপ্তি পাই, তার সিকিও...হুঁঃ, থিয়েটারে সীতা! সোনার পাথরবাটী!

গৃহিণী কহিলেন,—আমার কিন্তু ভারী ভ[illegible] লেগেচে। চমৎকার! যাক, মহীনের দৌলতে [illegible] হলো তবু। এমন লোক নেই যে সীতা দেখেনি, খরচের জন্য আমারি...যাক, তা...

বাধা দিয়া বিনোদ কহিল,—ঢ্যাখো, শ্যামাদা[illegible] নিয়ে সার্কাসে গিয়ে কাল দেখলুম, বেশ হয়েচে [illegible] তা তোমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে শনিবারের ম্যাটি[illegible] যাবো, ভাবচি। তুমি যাবে?

গৃহিণী কহিলেন,—তুমি বলো যদি তো কেন [illegible] না? তোমার যখন ইচ্ছা হয়েচে, বেশ! কবে [illegible] তোমার কথায় "না" বলেচি! আরো কি জানো [illegible] সব কাচ্ছা-বাচ্ছা নিয়ে তুমি কি সামলাতে পা[illegible] ভারী জ্বালাতন করবে তোমায়। কাজেই...তাছাড়া বাবার সঙ্গে ছেলেবেলায় কবে সার্কাস দেখেচি, এখ[illegible] রকম হয়েচে...

মস্ত ভূমিকা...বিনয়ের গিল্টিরও অভাব [illegible] বিনোদ কহিল,—বেশ তো, তুমিও সঙ্গে চলো শনিবারে!

গৃহিণী কহিলেন—আর দু'খানা লুচি দেবে? দেখে লুচি খানকতক আরো আনুক! গৃহিণী হাঁকি[illegible] —ঠাকুর...অমনি একটু আচারও দি, বসে খাও।

ঠাকুর লুচি আনিতেছিল। গৃহিণী উঠিয়া [illegible] আনিয়া পাতে দিয়া কহিলেন,—কাল [illegible] জিনিষ দুটো ভুলো না গো। দেখো দিকিন, কত হবে। তোমারি সংসার! সত্যি, আমি কিছু সঙ্গে আসিনি, আর সঙ্গে নিয়েও যাবো না।

ঠিক! বিনোদই যেন সব সঙ্গে আনিয়াছে, সঙ্গে আবার লইয়া যাইবে!...

এই যত্ন-আদরের মধ্যে তার বুকে ফুটিতেছিল কথা...কাঁটার মত! সেই শ্যামাদাসের ট্যাক্সি ভাড়া,

ভুতীয়ার দিন রাত্রের প্যাসেঞ্জারে বিনোদ সপরিবারে না হইল। সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিটই লইতে হইল। ত্রে গৃহিণী বুঝাইলেন—ইণ্টারের সঙ্গে প্রভেদ সামান্যই এ এক-ভাড়ায় যাওয়া-আসা। তাছাড়া ইণ্টার ক্লাশে জার্ভ পাওয়া যাইবে না; তার উপর সেকেণ্ড ক্লাশে রাম ঢের—এবং হাওয়া খাইবার জন্য খরচ করিতে সিয়া দু'চার টাকার মায়ায় দৃষ্টি-কৃপণতা করিতে নাই!

চক্ষু মুদিয়া ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছার উপরই সব ফেলিয়া দিয়া বিনোদ নিশ্চিন্ত হইল।

বেলা প্রায় সাতটায় ট্রেণ আসিয়া যথারীতি গোমোয় নামিল। ষ্টেশনে ফিরিওয়ালা হাঁকিতেছিল—পুরী-মিঠাই ...গরম চা...কেলা—ভ্যালা কেলা...

সেদিকে নজর না দিয়া বিনোদ চটপট নামিয়া পড়িল। শনের ত্রিসীমানায় কোনো রিক্শ গাড়ীর চিহ্নমাত্র ই! অজ্ঞাতে সে কেমন শিহরিয়া উঠিল।

ষ্টেশনে সংবাদ লইল, পাট্রা ভিলা কোন্ দিকে?

তারা হাঁ করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! শ্রীদুর্গা স্মরণ করিয়া বিনোদ যাত্রা করিল। পূজা আসন্ন; মর্ত্ত্য-ধামে দেবী এখন পা দিয়াছেন নিশ্চয়! দেখা যাক্, যদি তিনি দয়া করেন! একটা কুলি কহিল, সে জানে, পাট্রা ভিলা কোথায়। কিন্তু সে বহুৎ দূরে!

বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল, বেশী দূরে নয়। কিন্তু দূরত্বের আইডিয়া সকলের সমান নয়,—বিনোদ তা জানিত। কাজেই কুলির কথায় তার আশঙ্কা জন্মিল না!

প্রায় দু'ঘণ্টা হাঁটিয়া কুলি-সমেত আসিয়া সে এক প্রান্তরে দাঁড়াইল। অদূরে একটা বাংলার কঙ্কাল...ভাঙ্গা ফটক...সামনে একরাশ জঙ্গল। বাংলাটার ছাদ ভাঙ্গা—ঘরে জানালা নাই, একদিককার দেওয়াল বেমালুম ধসিয়া কাদা দেখা যাইতেছে!

কুলি কহিল—ওহি কোঠী বাবু...

ও কি কোঠী! হয়তো এককালে ছিল...সেই আকবর বাদশার আমলে! তার পর মাথার উপর দিয়া কত প্রচণ্ড ঝড়, এবং কয় বৎসর পূর্ব্বে সিপাহী বিদ্রোহ চলিয়া গিয়াছে! লক্ষ্ণৌয়ের রেসিডেন্সিই ফাঁক, তা এ তো একটা ক্ষুদ্র বাংলা,...তার পরও এই তো সেদিন জর্ম্মাণ য়ার গেল! কোঠী হয়তো তাদের চাপেই...

গোয়ালার বস্তী কি,—তিন মাইলের মধ্যে কেহ একটা মানুষের মুখ দেখে নাই! জঙ্গলের ধারে একখানা গাড়ীর ভাঙ্গা চাকা...বোধ হয়, সেই রিক্শর শেষ-স্মৃতি-রেখা!

কুলি বাড়ীর মধ্যে আসিল—বিনোদ সস্ত্রীক তার অনুসরণ করিল। ছেলেমেয়েরা পায়ের ব্যথায় অনড়! দিয়া বকিয়া জ্বালাইয়া তারা সেই শূন্য প্রান্তরের প্রান্তে কেহ বসিয়া, কেহ বা শুইয়া পড়িল! গৃহিণীকে লইয়া বিনোদ অগ্রসর হইল।

কুঠির মধ্যে এখানে-সেখানে পোড়া কাঠ, মস্ত ক'টা হাড়ের টুকরা,...এবং আরো কত কি আবর্জ্জনা! ইঁদারার জল কালো—মাকড়সার জালে জটিল পর্দ্দা রচিয়া রাখিয়াছে! চমৎকার! আলো-হাওয়া প্রচুর, এ কথা সত্য!

গৃহিণী কহিলেন—টাকা সব দিয়ে দেছ?

সভয়ে বিনোদ কহিল—হাঁ। ভাড়া আগাম নিয়েচে।

গৃহিণী তার পানে তাকাইলেন। সে কি দৃষ্টি! মানুষের চোখে তেমন দৃষ্টি জীবনে বোধ হয় কেহ কখনো দেখে নাই! তিনি কহিলেন—তুমি না পুরুষ মানুষ? বাড়ী দেখা নেই, শোনা নেই...ফশ্ করে টাকা দিলে! ...এখন উপায়?

বিনোদের চোখের সামনে ধূম্র পাহাড় মুহূর্ত্তে সরিশার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইয়া গেল...চারিদিকে সে হরিদ্রা-বর্ণের সরিশা-পুষ্প দেখিতে লাগিল!...তার পর তার চেতনা ধীরে ধীরে যেন বিলুপ্ত হইয়া আসিল।

যখন চেতনা ফিরিল, তখন সে চাহিয়া দেখে, ছেলে-মেয়েরা পা ছড়াইয়া বসিয়া লুচি, আলুর দম আর হালুয়া খাইতেছে। কুঁজা উপুড় করিয়া শেষ জল-বিন্দুটুকু তাদের কণ্ঠতালু সরস ও আর্দ্র করিবার জন্য গৃহিণী ঢালিয়া দিতেছেন!

তাদের আহারাদির পর গৃহিণী কহিলেন—ফেরবার ট্রেণ কখন্?

বিনোদ কহিল—জানি না।

—জানি না কি! টাইম-টেবিল ছাখো...

সেটা বিছানার মধ্যে বাঁধা হইয়া গিয়াছিল। দেখিতে হইলে বিছানার মোট খুলিতে হয়!...

মাথার উপর আকাশ কালো করিয়া মেঘ জমিয়া উঠিতেছিল। দেখিয়া গৃহিণী কহিলেন—ষ্টেশনে চলো। ওরে কুলি...

আবার সেই দীর্ঘ পথ। ঝম্ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিল। সকলে ভিজিয়া একশা!

মেজো মেয়ে কহিল—বাংলায় যাবে না মা?

গৃহিণী কহিলেন—না।

মনে মনে বিনোদ কহিল, সোনার বাংলা দেশ থাকিতে মানুষ মানুষের তৈরী ভাঙ্গা বাংলায় ঢুকিতে চায় কি সুখে!

সেজো মেয়ে বলিল—কোথায় যাচ্ছি বাবা?

মনে মনে বিনোদ কহিল, বানপ্রস্থে...

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া বিনোদ দেখে, পশ্চিমের হাওয়ার ফল ফলিয়াছে...সকলের শারীরিক উন্নতি ঘটিয়াছে,—অর্থাৎ পা ফুলিয়া এতখানি! ছেলেমেয়েরা জুতা খুলিয়াছে। গৃহিণী নাগরা খুলিয়াছেন, তাঁর দুই পায়ে এমন এমন ফোস্কা! কিন্তু এইখানেই শেষ নয়! এই

পরও⋯থাক্, সে দুর্দ্দশার কাহিনী আর বলিতে চাহি না। যাঁরা এ-কাহিনী পড়িতেছেন, তাঁদের কেহ যদি বিনোদের মত খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিয়া আগাম টাকা দিয়া কোথাও বাংলা ভাড়া লইয়া থাকেন⋯ কেন তাঁদের প্রাণে ত্রাসের সঞ্চার করি!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অনধিকার-চর্চ্চা

সেদিন কি-একটা ব্যাপারে অফিসের ছুটি ছিল। বুধবার। দুপুর বেলা। মাসকাবারের হিসাব-নিকাশ দেখিয়া বিনোদ হালদার গৃহিণীকে কহিল,—খরচটা বড্ড বেশী হচ্ছে, ফুলু⋯জলখাবার রোজ দশ আনা করে? অর্থাৎ টাকা যদি বাঁচে, তাতে তো তোমারি লাভ! আমার আর কি, বলো?

গৃহিণী ফুলু ওরফে প্রফুল্লবালা মেজেয় বসিয়া রৌদ্রের দিকে ভিজা চুল মেলিয়া দিয়া একখানা বাংলা মাসিক-পত্রের পাতা উল্টাইতেছিলেন। কথাটা প্রফুল্লর প্রাণে পাটকেলের মত বেশ একটু বাজিল। ঝাঁজালো সুরেই তিনি কহিলেন,—এর চেয়ে কমে কে করতে পারে, নিয়ে এসে তাকে ভার দিয়ে একবার ছাখো না! বলে, যে করে আমি চালাই⋯

বিনোদ দেখিল, গোড়াতেই বিদ্রোহের সুর! অত্যন্ত সতর্ক না হইলে একটা বিপ্লব বাধিয়া যাইতে পারে! পত্নীর মেজাজ এবং এ-সব পূর্ব্বলক্ষণ তার বিলক্ষণ জানা আছে!

কাশিয়া গলা একটু সাফ করিয়া সে কহিল,—আহাহা, বুঝচো না, কথাটা তো তা নিয়ে উঠচে না! আমার এ যা রোজগার করা, এ ঠিক তো আমার জন্যে নয়⋯ তোমাদেরি জন্য। তা⋯

গৃহিণী কহিলেন,—বেশ তো, আমরা যদি এতই অসহ্য হয়ে থাকি, আমাদের না হয় খিদিরপুরে নির্ব্বাসন দিয়ে এসো। দিয়ে এসে তুমি একলা এখানে রাম-রাজত্ব করো। খুব কমখরচে চলে যাবে'খন।

এ সুর প্রত্যাশা করিলেও গোড়াতেই এমন আচম্বিতে এ সুর উঠিবে, বিনোদ তা ভাবে নাই। একটু রসিকতার চেষ্টা করিয়া সে কহিল,—সে কথা মন্দ নয়। তাই বরং চলো। জানো কি না, আমাকেও তাহলে খিদিরপুর-ঘর করতে হবে। হবেও ভালো, একটু মুখ বদলানো যাবে!⋯

গৃহিণী কোনো জবাব দিলেন না; ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চুলগুলা আঙুল দিয়া নাড়িয়া কুলাইতে লাগিলেন।

বিনোদ কহিল,—বলি, তুমি যেখানে, জানো তো আমিও সেইখানে⋯ঐ অঞ্চলের নিধি হয়ে⋯

স্বামীর উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া গৃহিণী কহিলেন,—থা[ক] ঢের হয়েচে। তোমার যা ভালোবাসা, আমার তা [বে]শ জানা আছে! এখন বুড়ো হয়েচি, এখন তো আ[মার] হাসিতে গোলাপ ফুল ফোটে না⋯সামনে দাঁড়ালে চো[খে] সর্ষে-ফুল ছাখো!

বিনোদ কহিল,—ও হাসিতে গোলাপ ফুল ছা[ড়া] আর কোনো ফুল ফুটতে পারে কখনো? কি যে বলে[া]

গৃহিণী কোনো কথা কহিলেন না, চুপ করি[য়া] রহিলেন।

বিনোদ হিসাবের খাতা ফেলিয়া চিরাচরিত প্রথা[য়] মানভঞ্জনের ব্যবস্থা করিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক প[রে] গৃহিণীর মান ভাঙ্গিলে বিনোদ কহিল—দুটো চাকরে[র] জায়গায় যদি একটা রাখো? ধরো, একটা চাক[র] রইলো, তাকে নয় দু' টাকা মাহিনা বেশী দেবে⋯মা[সে] ছ'টা টাকা বাঁচবে, তাছাড়া তার খোরাকির বাবদ[ে] আট-দশ টাকা...এই চোদ্দটা টাকা নয় তুমিই নিয়ো⋯ তোমারি টাকা বাঁচবে⋯লক্ষ্মীটি, কথাটা বুঝে ছাখো [!]

গৃহিণী কহিলেন,—আমি ও ঢের বুঝেচি! ও[দের] একটু জিরেন তো চাই⋯তোমার বাড়ী খাটতে এসে[ছে] বলে জান দিতে পারে না তো! সত্যি, ওরা মানু[ষ] জন্তু নয়, যন্তর নয়!

বিনোদ কহিল,—বলেই ছাখো না⋯যেমন খাটে[বে] দু'টাকা তেমনি বেশী পাবে।⋯তার পর এই জলখাবার⋯ বিকেলে ছেলেপিলেদের যদি বাজারের খাবার [না] খাইয়ে মুড়ি দাও, নারকোল দাও⋯খুব স্বাস্থ্যকরও হয়⋯ নারকোলে ভিটামিন আছে। আর ডাক্তাররা বলে[ন] এই ভিটামিনেই মানুষের জীবন। বাজারে-খাবারে[র] মানে কতকগুলো ভ্যাজাল্ ছাই-পাঁশ।

গৃহিণী কহিলেন,—ঐটি বলো না⋯বাছাদের পে[ট] মেরে আমি পয়সা বাঁচাতে পারবো না। লোকের বাড়ী[র] ছেলেমেয়েরা পাঁচ রকম কত কি খাচ্ছে⋯আর আমা[র] বাছারা⋯

বাছাদের দুর্ভাগ্যের স্মৃতি মনে সহসা উদয় হইব[া] মাত্র প্রফুল্লর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল; কথা তাঁর শে[ষ] হইল না।

বিনোদ কহিল,—আচ্ছা, বেশ, মুড়ি না দাও, সময়ে[র] ফল। ফলে লিভার ভালো থাকে।

গৃহিণী কহিলেন,—তা বাছারা পায় কৈ? না হ[য়] এই বোশেখ-জষ্টিমাসে কালো জাম, জামরুল, আনার[স] আঁব, তালশাঁস—কত ফল,⋯তা কি বাছারা কো[নো] দিন প্রাণ ভরে খেতে পায়? তোমার তো বাজ[ার] খরচ বরাদ্দ পাঁচ সিকে⋯এর মধ্যে এত কাণ্ড[বা] কোত্থেকে, বলো দিকিন? আমি যা মেয়ে, তাই ও[ই] এক রকমে মানিয়ে-বনিয়ে চালিয়ে নি⋯

বিনোদ কহিল,—তা কি আমি জানি না ফুলু! তোমার মত লক্ষ্মীর হাতে সংসার আছে বলেই না আমায় কোনো দিক দেখতে হয় না। তা বলছিলুম কি, খরচটা আরো কমানো যায় না? দু'পয়সা হাতে থাকে ...রাণীটা ডাগর হয়ে উঠচে, ক' বছর বাদে ওর বিয়ে দিতে হবে...

কন্যার বিবাহের আসন্ন ছবি কল্পনা করিয়া গৃহিণীর মন একটু আর্দ্র হইয়া আসিল। তিনি কহিলেন,—তা তো জানি।...তা বেশ। কি করতে হবে... কোন্‌দিক দিয়ে আর কি করণ-কম্ভি করবো, বলো... ...আমি তো দেখেচো, তোমার সংসারে মাথা আর গতর দিয়ে পড়ে আছি...সেই ভোর পাঁচটায় উঠি, আর রাত্রে শুতে আসি বারোটায়। এর উপর একটা চাকর যদি কমাও তো আমারি ধকল বাড়বে...তা বাড়ুকগে। মরুক না হয়...তাতে যদি দু'পয়সা সুসার হয়! এই যে বাজারের চুরি...সকালে পাঁচটা বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আড্ডা না জমিয়ে তুমি যদি বাজারে নিজে যাও, তাহলে এ চুরি বাঁচে। দু' তিন আনা করেও যদি বাজার খরচ কম হয়...সে কি কম লাভ? রোজ দু' আনা বাঁচলে মাসে যাট আনা। যার মানে, তিন টাকা বারো আনা...

বিনোদ কহিল,—ঠিক বলেচো...তাই করবো। আচ্ছা, বেশ, এ মাসটা তুমি গট্ হয়ে বসে থাকো, তোমার সংসার-ঘানি আমার হাতে ছেড়ে দাও, আমি চালিয়ে দেবো।

হাসিয়া গৃহিণী কহিলেন,—তা আর হয় না গো। তা যদি হতো, তাহলে তোমাদের মত পুরুষ-মানুষে বিয়ে করতো না।

বিনোদ কহিল—বিয়ের আগে সংসার বলে আমাদের কোনো জঞ্জালের চিহ্নও থাকে না...ও-বস্তুটাকে তোমরাই এনে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দাও...

গৃহিণী কহিলেন—বেশ, ও কথা থাক...কাল থেকে তুমি সংসার দেখবে...আমার ছুটি! আমি কিছু দেখবো না কিন্তু...

বিনোদ সদম্ভে কহিল—আচ্ছা। তাহলে কাল সকালেই ভৃত্য জগার বিদায় তো? আকলুই শুধু বাহাল থাকবে...?

গৃহিণী কহিলেন,—তোমার খুশী। তুমি দেনেঅলা, আমি তো হুকুম তামিল করি শুধু। কথায় বলে, কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম!

বিনোদ হাসিয়া জবাব দিল,—তথাস্তু! কিন্তু আমার অফিস আছে...

গৃহিণী কহিলেন,—তা থাকুক, সংসারের ব্যবস্থা করে অফিস যাবে। যে রাঁধে, সে কি আর চুল বাঁধে না?

পরের দিন। বেলা সাড়ে ছ'টা বাজিয়া গিয়াছে। বিনোদ তখনো বিছানায় পড়িয়া এ পাশ ও পাশ করিতেছে। ছেলেমেয়েরা ক্ষুধার জ্বালায় প্রচণ্ড কলরব জুড়িয়া দিয়াছে। গৃহিণী আসিয়া কহিলেন—হয়েচে! এমনি করেই তুমি সংসার দেখবে তাহলে! সাড়ে ছটা বেজে গেছে, তুমি এখনো বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছ...!

বিনোদের হুঁশ হইল। ঠিক কথা...আজ হইতে সংসারের চার্জ্জ সে হাতে লইয়াছে। সে উঠিয়া পড়িল, এবং মুখ-হাত ধুইয়া জামাটা গায়ে চড়াইয়া ডাকিল,—জগা...

গৃহিণী কহিলেন,—জগা ঝাঁটপাট দিচ্ছে।

বিনোদ কহিল,—তবে বাজারে যাবে কে আমার সঙ্গে?

গৃহিণী কহিলেন,—তেমন কোনো কথা তো ছিল না! তাছাড়া জগার গেলে চলবে না...সে এর পর বাটনা বাটবে, বাসন মাজবে, উনুনে আগুন দেবে...

বিনোদ কহিল,—কেন, আকলু?

গৃহিণী কহিলেন—তাকে একবার খিদিরপুরে পাঠাবো ভাবচি। মহীনের অসুখ; খপর আনবে।

বিনোদ কহিল,—তাহলে আমি যাই। একটা ঝাড়ন দাও, বেশ বড় দেখে...আনাজ-তরকারী তো তাতে আসবে। তার পর মাছ? সেটা তো একসঙ্গে এই ঝাড়নে আনা ঠিক হবে না।...আচ্ছা, একটা খপরের কাগজ...ওরে বিনু...

বিনু ওরফে বিনয় জ্যেষ্ঠ পুত্র; বয়স দশ বৎসর। পিতার আহ্বানে বিনু আসিয়া দাঁড়াইল। পিতা কহিল,—একটা পুরোনো খপরের কাগজ দে তো শীগ্‌গির...

বিনু কহিল,—কি খাবো বাবা? মাকে বললুম, তা মা বললে তোমায় বলতে...

বিনোদ কহিল—তোরা এখনো খাবার খাস নি?

বিনু কহিল—না।

বিনোদ কহিল—বেশ, আগে তোদের খাবার আনি। তা তোরা সকালে কি খাস্?

বিনু কহিল—দুধ আর মিষ্টি।

বিনোদ কহিল—দুটোই! তা, দুধ তো এসেচে...

বিনু কহিল—এসেচে তো কি। শুধু দুধ খাবো বুঝি? বা রে...

বিনোদ কহিল—দোষ কি! তার পর এখনি তো ভাত খাবি...

বিনু কহিল—না, শুধু দুধ খেলে পেট গড়গড় করবে...

নেপথ্যে আরো পাঁচটি ছেলেমেয়ের কলরবের মাত্রা বাড়িয়া উঠিল। ছোট-খাটো সে এক বর্গীর হাঙ্গামার ব্যাপার!

বিনোদ কহিল—থাক বাবা, থাক,—তর্কে কাজ নেই। বলিয়া সে খাবারের দোকানে ছুটিল।

গণিয়া বাছিয়া যে খাবার লইল, তার দামের হিসাব করিয়া দোকানী বলিল,—আট আনা···

আট আনা! সর্ব্বনাশ! এ তো এক বেলার··· আবার ওবেলার জলখাবার আছে···সেও কোন্ আট আনার কম হইবে! দশ আনার জায়গায় এক টাকা··· তা বলিয়া খাবার লইয়া দোকানীকে তো তাহা হইতে কিছু ফিরাইয়া দেওয়াও চলে না! ভালো দেখায় না!

বিনোদ ভাবিল, যাক, বাজারের খরচে কাটান্ দিলেই চলিবে।

খাবার লইয়া গৃহে ফিরিতে গৃহিণী কহিলেন,—কত খাবার গো?

বিনোদ কহিল,—যা আছে, ভাখো। আমি এখন বাজারে চললুম,—বলিয়া সে প্রস্থানোদ্যত হইল।

গৃহিণী কহিলেন,—হ্যাঁ, শোনো, কি আছে, না আছে, দেখে গেলে না?

বিনোদ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পত্নীর পানে চাহিল।

গৃহিণী কহিলেন,—মানে, রান্নার মশলা ফুরিয়েচে··· এবেলা চলবে, ও-বেলার কিছু নেই। তোমায় চার্জ্জ বুঝিয়ে দিচ্ছি, তাই বলচি, নাইলে বলতুম না। তার পর পাণ সাজার জন্ম খয়ের আনতে হবে। আর এমনি বাজার—তেমন-তেমন কোনো কিছু···

বিনোদ কহিল,—রান্নার মশলার মানে তো হলুদ, লঙ্কা, ধনে, সর্ষে?

গৃহিণী কহিলেন,—হ্যাঁ।

বিনোদ কহিল,—বেশ।

বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। বাহির হইয়া একেবারে বাজারে।

এ এক অজানা রাজ্য—এই বাজার! কি ভিড়! ঠেলাঠেলি-হুড়াহুড়ির এখানে আর অন্ত নাই! বিনোদ হালদার বহু মিটিং এ্যাটেণ্ড করিয়াছে, বাংলা থিয়েটারে নূতন নাটকের প্রথম অভিনয়-রাত্রেও হাজির হইয়াছে বহুবার, তাছাড়া চিত্রায় বায়োস্কোপ দেখিতে গিয়া ভিড়ও বহুৎ ঠেলিয়াছে। তা বলিয়া বাজার!— এ ভিড়ের উপমা সে তার দৃষ্ট বা শ্রুত বা পঠিত কোনো ব্যাপারের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না!

দাসী-চাকরের দল গায়ে ধাক্কা দিয়া চলিয়াছে— তাদের ময়লা কাপড়ের দুর্গন্ধে প্রাণ বাহির হইবার জো!

বিনোদ হালদার ভাবিল, রামচন্দ্র, এদের সঙ্গে একাসনে বসিয়া আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া এদের জাতে তুলিয়া সাম্য-প্রতিষ্ঠার কল্পনাও আবার মানুষে করে! দুর্গন্ধে পাশে একদণ্ড তিষ্ঠিবার জো নাই!

কিন্তু বাজার করিতে আসিয়া এদের ছোঁয়াচ্ হইতে আপনাকে বাঁচাইতে গেলে বাজার করা হয় না অগত্যা রোগী যেমন করিয়া কুইনিন-মিকৃশ্চার গলাধঃ করণ করে, তেমনি ভাবে নাক টিপিয়া নিশ্বাস বন্ধ করি[illegible] বিনোদ কোনো-মতে পয়সা ফেলিয়া আলু-পটল, এ[illegible] আনাজ-তরকারী বিস্তর কিনিয়া ডাঁই করিয়া দেখিল— ঝাড়নে কুলায় না! ঝাঁকা মাথায় একটা কুলি অদূ[illegible] দাঁড়াইয়া ছিল; তাকে ডাকিয়া তার মাথায় আনা[illegible] তরকারী চাপাইয়া মৎস্য-লোকে আসিয়া সে ফাঁপ[illegible] পড়িল। পোনা মাছের দর বলে, পাঁচসিকা সের— চিংড়ির দরও তথৈবচ।···অথচ কত কেনা যায়? ক'সে[illegible] কিনিলে সকলের কুলায়? মানে, অপব্যয় যেমন হ[illegible] না, তেমনি খাইতে পাই নাই বলিয়া কোনো দিক হইতে কোনো অনুযোগও না ওঠে!···

বহুক্ষণ ভাবিয়া-চিন্তিয়া পোনা মাছ এক সের আ[illegible] চিংড়ী আধ সের সে কিনিয়া ফেলিল; কিনিয়া দাম দি[illegible] গিয়া দেখে, চমৎকার! ভিড়ের মধ্যে কে যেন [illegible] পাতিয়া ছিল! পকেট হইতে মনি-ব্যাগটি সাফ সরাই[illegible] লইয়া তাকে দায়মুক্ত করিয়া ছাড়িয়াছে। এ ক[illegible] প্রকাশ করিলে বেকুবির পরিচয় নাকি চূড়ান্ত দেওয়া হ[illegible] কাজেই সে কুলিকে কহিল,—ওরে, টাকা আছে তে[illegible] কাছে? দে তো বাবা দামটা···আমার কাছে দশ টাক[illegible] নোট আছে। খুচরো যা আছে, তাতে কুলোবে না· বাড়ী গেলে তোকে দিয়ে দেবো···

কুলি মোট বহিয়া খায়—তার পুঁজিপাটা ব্যাঙ্কে [illegible] না, ট্যাঁকেই মজুৎ থাকে। কাজেই সে মাছের দ[illegible] চুকাইয়া দিল। তার পর বিনোদ কহিল—আয় এবার·

মনে পড়িল, খয়ের আনিবার কথা আছে, তাছা[illegible] রান্নার মশলা—অথচ এই তরী-তরকারী আর মাছে অ[illegible] প্রায় চার টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে! চাকরদের [illegible] আনা চুরি বাঁচাইতে আসিয়া এ যা ঘটিয়াছে···ছে[illegible] বেলায় শোনা সেই প্রবাদ-বাক্য মনে পড়িয়া গেল- শস্তায় কিস্তি পাইয়া ফরাক্কাবাদ-যাত্রা! তার আজিক[illegible] এ বাজার করার চেয়ে ফরাক্কাবাদ যাত্রা করিলেও বে[illegible] হয় কম খরচায় সে ব্যাপার নিষ্পন্ন হইয়া যাইত!

গৃহে ফিরিয়া অন্দরে ঢুকিয়া বিনোদ ডাকিল,- ওগো···

কিন্তু কোনোদিক হইতেই 'ওগো'র কোনো সা[illegible] মিলিল না। বিনোদ হাঁকিল,—জগা···

জগা আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। বিনোদ কহিল· এই মোটটা নামিয়ে নে···

জগা আদেশ-মত কার্য্য করিলে বিনোদ কহিল,· তুই দাঁড়া···ওর পয়সা এনে দি।

ড্রয়ার খুলিয়া মাছের দাম আর কুলির ভাড়া বাব[illegible] দু'টাকা···

তার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু কার উপর সে রাগ করিবে? নিজের হাতেই সে এ খাল কাটিয়াছে!

কুলিকে বিদায় দিয়া বিনোদ কাগজ-পেন্সিল লইয়া হিসাব কষিতে বসিল,—

থাবার—৷৷৹ আট আনা
আলু এক সের—৷৹ চার আনা
পটল এক সের—৸৹ বারো আনা
বেগুন এক সের—৶১০ চৌদ্দ পয়সা ইত্যাদি—

যোগ করিয়া দেখে, মাছ-সমেত একুনে ৪৸১৫ চার টাকা তেরো আনা তিন পয়সা। এখনো ছেলেদের বৈকালের জলখাবার বাকী! তা ছাড়া হলুদ, লঙ্কা, ধনিয়া এবং খয়ের।

জগাকে প্রশ্ন করিল,—তোর মা-ঠাকরুণ কোথায় রে? ডাক্ তো একবার···

জগা কহিল,—পাশের বাড়ীতে ওদের মেয়েকে পাকা দেখতে এসেচে কি না,—ওরা মাকে তাই ডেকে নিয়ে গেছে মেয়ে সাজাতে। মা বলে গেছেন, তাঁর তো কোনো কাজ নেই আজ···

তাও বটে! বিনোদ ভাবিল, থাক্ এ সংসার এইখানে পড়িয়া—হিমালয়ের পথ কি এমনি দুর্গম হইয়াছে···

সহসা দোতলায় প্রচণ্ড আর্ত্তনাদ উঠিল। ব্যাপার কি? কিনু ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, খাটের উপর তিনু আর ভুতি নৃত্য করিতেছিল। সেই অবসরে দু'জনে মারামারি বাধাইয়া দেয়; এবং ভুতি তিনুকে এমন ঠেলা দিয়াছে যে খাট হইতে মেঝেয় পড়িয়া তিনুর দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং রক্তারক্তি ব্যাপার!

—ওরে জগা, একটা রিক্শ ডাক্—বলিয়া বিনোদ দোতলায় ছুটিল; এবং তিনুর মুখে-চোখে জল দিয়া তাকে কোলে তুলিয়া পরক্ষণেই নীচে নামিল। জগা ততক্ষণে রিক্শ ডাকিয়া আনিয়াছে। তিনুকে লইয়া সেই রিক্শয় চড়িয়া বিনোদ দীনেশ চক্রবর্ত্তী ডাক্তারের বাড়ী ছুটিল।

কথায় বলে, তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে! গ্রহের ফের আর কাহাকে বলে! ডাক্তারের বাড়ী গিয়া বিনোদ শুনিল, ডাক্তার গৃহে নাই, call-এ বাহির হইয়াছেন। এত বেলায় পশার-ওয়ালা কোনো ডাক্তারই ঘরে বসিয়া থাকে না! নেহাৎ যার পশার নাই, সেও লোক দেখাইবার জন্য বাড়ীর বাহির হইয়া এস্প্লানেডে বিলাতী দোকানগুলার ধারে ধারে ঘুরিয়া বেড়ায়, নয় তো গা-ঢাকা দিয়া থাকিবার পক্ষে উৎকৃষ্ট স্থান যে গড়ের মাঠ, সেইখানেই কোনো বেঞ্চে বসিয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে দুনিয়ার উপর রাগে ফুলিতে থাকে! কাজেই এ-দোর ও-দোর ঘুরিয়া কাহারো দেখা মিলিল না; তখন পটলডাঙ্গার হাসপাতালে ছুটিতে হইল। তারা দেখিয়া শুনিয়া ব্যবস্থা দিয়া বলিল—ভয় নেই। ছোট ছেলে, এমন পড়ে জখম হয় ঢের। তা হোক—কিন্তু এ জখমের ফলে পকেটে কতখানি টান পড়ে, দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তারবাবুরা তার খপর তো রাখেন না!

বাড়ী ফিরিয়া ঘড়ি দেখিয়া বিনোদ শিহরিয়া উঠিল, সর্ব্বনাশ, সাড়ে দশটা বাজে! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, আজ বৃহস্পতিবার—অফিসে মেল-ডে।

সদ্য সে অফিসের চালানি বিভাগের বড়বাবু হইয়াছে,—এখনো তিন মাস হয় নাই—তা'ও গরম্যান সাহেবের বিশেষ জবরদস্তিতে···মার্কলু সাহেবটা তো এ জায়গায় হারাধনকে বসাইবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছিল, এবং মার্কলু ইস্ত-নাগাদ তার কাজে ত্রুটি ধরিবার জন্য রুখিয়া আছে!

স্নান মাথায় উঠিল। মুখে একটু সাবান ঘষিয়া ভিজা গামছায় গা মুছিয়া সে হাঁকিল,—ঠাকুর, আমার ভাত বাড়ো···

ঠাকুর কহিল—আজ্ঞে, ঝোলটা এখনো নামেনি।

বিনোদ হুঙ্কার তুলিল,—ঝোল নামেনি? তার মানে? এত বেলা হলো, আর—

কুণ্ঠা-বিজড়িত স্বরে ঠাকুর কহিল,—বাজার দেরীতে এলো কি না।

বিনোদ কহিল—কুছ পরোয়া নেই। যা হয়েচে, তাই দাও। তার পর জল আছে, চিনি আছে, আর একটা লেবু কেটে দাও···

ঠাকুর কহিল—আজ্ঞে, লেবু তো বাজার থেকে আজ আসেনি···তার স্বর তেমনি কুণ্ঠা-বিজড়িত।

বিনোদ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—কিছুই হয়নি?

ঠাকুর কহিল—আলু-ভাজা আছে, আর ডাল, বেগুন ভাজা—

বিনোদ বাধা দিয়া কহিল—ব্যাস্, ব্যাস্, ব্যাস্—তাতেই হবে···শীগ্গির। একটুও দেরী নয়। বলিয়া একটা আসন পাতিয়া সেই আসনে সে বসিয়া পড়িল। ঠাকুর ভাতের থালা ধরিয়া দিল। বিনোদ আহারে বসিল; দু' এক গ্রাস মুখে তুলিয়াছে—গৃহিণী আসিয়া কহিলেন,—জানি, একটা হুলস্থূল বাধবে। তাও একবেলার ছুটী···তা, ও হচ্ছে কি? বলি, এঁ্যা, আমার মাথা আর মুণ্ডু···?

বিনোদ রাগে গুম্ হইয়া ছিল, তবু মুখ ফুটিয়া সে রাগ প্রকাশ করিবে না মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কাজেই শুধু কহিল—কি হয়েচে?

গৃহিণী কহিল,—ও একগাদা আনাজ-তরকারী এনে

কি সাশ্রয়টা হলো? এই মাগ্‌গির বাজারে একসের পটল? বাবাঃ! এক পো করে আনিয়ে আমি চালাই…

বিনোদ কহিল—ঐ পটল তো! তা ভাবনা নেই। ও পটল আমিই উৎপাটন করবো'খন!

গৃহিণী কহিলেন—সে তখন দেখা যাবে…তারপর ঐ এক গাদা শুকনো শাক! ও শাক গরুতেও মুখে দেয় না। আমার ছ্যাঙ্কয় দিয়ো।…আর এ কি খাওয়া হচ্ছে? ঠাকুর,…তোমার কি একটু আক্কেল নেই? ঝোল হয়নি, তা বাবুকে কোন্ মাছ ভেজে দিলে চট করে। সব শুনচি ওপর থেকে…

বিনোদ কহিল,—তুমি তো বাড়ী ছিলে না…

গৃহিণী কহিলেন—কি করবো! পতির আদেশ! হিন্দু-মহিলা যখন, তখন থাকবার তো কথা নয় আমার! আজ সংসার থেকে ছুটী মিলেচে, তোমার সংসার তুমি দেখবে… আমি কতকগুলো আজে-বাজে খরচ করাই বৈ তো না।

বিনোদ কোনো কথা কহিল না, একরাশ ভাতের উপর গ্লাস হইতে জল ঢালিতে যাইতেছিল, গৃহিণী হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন,—থাক, ঢের হয়েচে। দীনুর পাকা দেখা—ওরা চিংড়ি মাছের কালিয়া আর দই-সন্দেশ তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেছে…তাই দিয়ে খাও। আমি বাড়ী ছিলুম না, কিন্তু খপর সব রাখছিলুম তো! ছুটীর কি জো আছে? ছুটী মিলবে সেই দিন, যেদিন একেবারে ছ'চোখ বুজবো!… কিছু আর তখন দেখতে আসতে হবে না।

আহারাদি সারিয়া দোতলার ঘরে আসিয়া বিনোদ অফিসের পোষাক পরিতেছিল, গৃহিণী পাণ লইয়া আসিলেন, হাসিয়া কহিলেন—নাও, পাণ খাও। খয়ের নেই কিন্তু—কারণ, তুমি আনোনি…

বিনোদের অন্তরাত্মা ক্ষোভে দুঃখে কাঁদিয়া উঠিল। গৃহিণীর হাত ধরিয়া বিনোদ কহিল,—আমার ক্ষমা করো, দেবী…তোমার সংসারের চার্জ্জ তুমি ফিরিয়ে নাও। আজ এই এক বেলাতেই আমার যে হাল হয়েচে, ফিরে এসে বলবো। বেশী কথা কি, সংসারের বাহিরে আমি যদি কোনোদিন থাকতে চাই তো তুমি আদালত থেকে আমার গার্জ্জেন হবার দরখাস্ত পেশ করে আমাকেও তোমার চার্জ্জে ধরে রেখো। পুরুষের মত এত-বড় অসহায় কোনো জীব আর নেই এ-জগতে। ভাগ্যে তোমরা আছো—নাহলে এ দুনিয়া কোন্‌দিন সাহারা মরুভূমির মত খাঁ-খাঁ করতো…

হাসিয়া গৃহিণী কহিলেন—আজ না অফিসে মেল-ডে…আর তুমি এম্‌নি মস্করা করচো!

বিনোদ কহিল—আজ চারদিকেই ফেল আমি, ইস্তক গোটা দশ-বারো টাকা-সমেত মণিব্যাগটা অবধি বাজার করতে গিয়ে পকেট-মারার হাতে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেচি… দর্প আমার খর্ব্ব হয়েচে, মানুচি! করুণা হবে না তোমার?

গৃহিণী সস্নেহে স্বামীর হাত ধরিয়া হাসি-মুখে কহিলে —যাও গো অফিস যাও। সত্যি, দেরী হয়ে গেছে ফিরে এসো, তার পর করুণার নির্ঝর-ধারায় তোম একেবারে পরিস্নাত করে দেবো'খন…তবে এই অনধিক চর্চ্চার প্রবৃত্তি…

বিনোদ কহিল—শিরসি মা লিখ মা লিখ… কথা এ প্রবৃত্তি আর দেখবে না। ধন্যবাদ…গৃহলক্ষ্মী! আর বলবো? এতদিনে বুঝচি, সংসারাশ্রমে ঢোকব মুহূর্ত্তে বাপ-মা ছেলেদের বিয়ে দেন কেন,— না হলে…

গৃহিণী মৃদু রোষের ভঙ্গীতে কহিলেন,—আবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেচো কি? ঐ শোনো…

দেওয়ালের ঘড়ির পানে চাহিয়া বিনোদ দেখে ওঃ! না, আর দাঁড়ানো চলে না। সে কহিল—জগা বলো একটা ট্যাক্সি ডাকুক—খরচের বন্যা বয়ে যাক আজ আমি দাতাকর্ণ হয়েচি!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রবাসের দুঃখ

গোমোয় হাওয়া বদলাইতে যাইবার দু' তিন বছ পরের কথা।

অফিস হইতে ফিরিয়া বিনোদ ডাকিল,—ওগো…

'ওগো' তখন দোতলার বারান্দায় ষ্টোভ জ্বালি মটনের ষ্টু তৈরী করিতেছেন। এমন সুবাস বাহির হ যাছে যে পাশের বাড়ীর করালীচরণ হোটেলে ছুটিব উপক্রম করিতেছে! জবাব না পাইয়া বিনোদ আব ডাকিল,—শুনচো?…

আকলু ছিল কলতলায়, বাবুর সাড়া পাইয়া কহিল,— মা ওপরে আছেন।

বিনোদ দোতলায় উঠিয়া ভোজের সমারোহ দেখিয় কহিল,—ইস্, তাই বলো! আমি ভাবছিলুম, পাশে বাড়ীতে বুঝি মাংস রান্না হচ্ছে! তা নয়…

গৃহিণী কহিলেন—তা তো ভাববেই! কখনো যে ভালো জিনিষ করে তোমায় খাওয়াই না!

বিনোদ কহিল—আহা, তা নয়…তবে আজ রবিবা নয় কি না…তা, মটন্ আনালে কাকে দিয়ে?

গৃহিণী কহিলেন—আকলুকে ট্রামের পয়সা দিলুম মিউনিসিপ্যাল মার্কেট থেকে মটন, পুদিনা আর পাশরি নিয়ে এলো।…

বিনোদ কহিল—এই তো চাই…আমার উপর ভার যে কেন দাও!

গৃহিণী কহিল,—ঠেকে শিখেচি ঢের বলেই না… কি খাবে ওর সঙ্গে? লুচি, না, রুটী, না পাঁওরুটি?

বিনোদ কহিল—তুমি যা সুষ্ঠু বিবেচনা করবে! তা কথা ছিল একটা…

গৃহিণী কহিলেন—কি কথা ?

বিনোদ কহিল—আমাদের অফিস পশ্চিমে সেই এলাহাবাদের কাছে একটা মস্ত কারখানা কিনেচে। সেখানকার হাওয়া ভালো···তা ছাড়া অফিসের নিজের বাংলো আছে, মায় কলের জলের বন্দোবস্ত অবধি। আমায় সেখানে বড় বাবু হয়ে যেতে বলচে সাহেব। মাহিনা মাসে পঞ্চাশ টাকা বাড়বে—তোফা রাজার হালে থাকা যাবে। কি বলো ? মত দেবো ?

গৃহিণী কহিলেন—কতদিন থাকতে হবে ?

বিনোদ কহিল—হয়তো আমরণ···যদি পছন্দ করি। নাহলে ছ'মাস পরে চলে আসতে পারবো। তবে ফিরে এলে আবার পুনর্মূষিক! থাকবো ভালো। এখন তোমার মত হলেই 'হাঁ' বলে দি।

গৃহিণী কহিলেন—আমরা কোথায় থাকবো ?

বিনোদ কহিল—আমি কি একা যাবো না কি ? তা না। সকলে গো—

গৃহিণী কহিলেন—এ বাড়ী ?

বিনোদ কহিল—ভাড়া দিয়ে যাবো।

গৃহিণী কহিলেন—এত জিনিষ-পত্তর ঘাড়ে করে যাবো ? সে কি হয় কখনো ?

বিনোদ কহিল—ভারী জিনিষ-পত্তর একটা ঘরে নয় চাবি বন্ধ করে রেখে যাবো—সেটা আমাদের তাঁবে থাকবে। ও-সব আমি ভেবে রেখেচি। এখন শুধু তোমার মতের ওয়াস্তা।

গৃহিণী কহিলেন,—কবে তাহলে যেতে হবে ?

বিনোদ কহিল,—দিন পনেরো বাদে···মানে, ১লা এপ্রিল থেকেই সেখানে জয়েন করা চাই। আজ তো ১৫ই মার্চ্চ।

গৃহিণী কহিলেন—ইচ্ছে তো খুব করে, কলকাতার এই ধোঁয়া-জঞ্জাল ছেড়ে বাহিরে গিয়ে কোথাও থাকি। এত সুবিধা যখন হচ্ছে—পয়সার ঢের সুসারও···

বিনোদ কহিল—নিশ্চয়। পঞ্চাশ টাকা বেশী মাহিনা, তার উপর এ-বাড়ীটাও ভাড়া দিলেও কম করে একশো-খানি টাকা তো উপরি লাভ হবে। এ টাকাটা সঞ্চয় হবে।

গৃহিণী কহিলেন,—তোমার মত উড়নচণ্ডীর হাতে আবার পয়সা জমবে ! তাহলে আর ভাবনা ছিল কি ?

বিনোদ ভাবিল, তাই বটে ! তার জন্যই খরচের কিছু বহর ! দর্জীর বিল, সখের বিল,—তাছাড়া আর খুঁটিনাটী ! কোথাও যাইতে হইলে ট্যাক্সি না হলে কার চলে না—তার, না, গৃহিণীর ? সুদূর খিদির-পুরে মাসে দুবার তো বেড়াইতে যাওয়া আছেই ! বাপের বাড়ী !—নিষেধ চলে না। তা এই দীর্ঘ পথ ট্যাক্সি ভাড়ায় কি টাকাটা বাহির হইয়া যায়, সে কথা গৃহিণী কোনদিন ভাবিয়া দেখিয়াছেন ? বিনোদ নিজে তো ট্রামেবাসে চাপিয়াই যাতায়াতের পালা সারে ! তা সে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্রে বাস তাতিয়া থাকুক, বা বৃষ্টির জলে কলিকাতার রাস্তা ডুবিয়া যাক—কিন্তু এ-সব তর্ক তোলা চলে না ! বিশেষ করিয়া আজ, এখন—তাহা হইলে মাংসর ষ্টু তো অখাদ্য হইবেই, তার উপর পশ্চিমে যাওয়ার সঙ্কল্প···!

এই সঙ্কল্প কার্য্যে যথাসময়ে পরিণত হইতে ত্রুটি ঘটিল না। এবং বিনোদ সপরিবারে প্রবাসে আসিয়া আস্তানা পাতিল।

দেখিয়া শুনিয়া গৃহিণী কহিলেন,—সুবিধা ঢের··· বাড়ীভাড়া দিতে হয় না। অফিসের সরকারী বাংলা মিলিয়াছে। মস্ত হাতা। খোলা জমিতে তরী-তর-কারীর ফশল খুশী-মত ফলানো চলে ! ঘরগুলি ঝরঝরে। সামনে একটু ফুলের বাগানও আছে······

সুবিধা ঢের, তবে মাসখানেক পরেই অসুবিধা যা ঘটিয়াছিল, সেই কথা এখানে খুলিয়া বলা প্রয়োজন।

দেশটা গরম—বাংলার গরম এখানকার গরমের পাশে দাঁড়াইতে পারে না ! বৈশাখ মাস। জলের জন্য প্রাণ একেবারে টা-টা করিতে থাকে ; তা জলের কল আছে। বেশ মোটা তোড়ে জল পাওয়া যায়। কলিকাতা কর্পোরেশন নয় যে মোটা টাকা ট্যাক্স দিয়া জলের নল নিংড়াইলেও এক ফোঁটা জল মিলিবে না ! গৃহিণী যখন-তখন বলিতেন,—কলকাতায় আর যায় না বাবু। এখানেই বরাবর থাকো। ওখানকার বাড়ীর ভাড়াটা লাভ, তাছাড়া এখানে মাহিনা বেশী, খরচ কম। দু'পয়সা বাঁচচে। মেয়ের বিয়ের সংস্থানও তো চাই ! তাছাড়া কেমন খোলা হাওয়া, ধোঁয়া নেই—খাশা !

বিনোদ বলিল—বেশ !

সকালে এই কথা ! বিধাতার সেদিন বুঝি তেমন কোন কাজ ছিল না—এ কথা শুনিয়া অন্তরালে তিনি হাসিলেন ! তাঁর মাথায় কি ফন্দী খেলিয়া গেল !

সন্ধ্যায় বিনোদ গৃহে ফিরিতে গৃহিণী কহিলেন,—নাও, কলের নলে মুখ দিয়ে টানোগে—এক ফোঁটা জল নেই ! পাতকোও ছাই নেই যে জল তোলাবো !···

বিনোদ কহিল,—ব্যাপার কি ?

গৃহিণী কহিলেন,—এবেলায় কলে একদম জল আসেনি।

দুই বেলা স্নান বিনোদের চিরকালের অভ্যাস। কাজেই চমকিয়া সে বলিল,—বলো কি ! স্নান করবো কোথায় ?

গৃহিণী কহিলেন—ওই মোড়ের হাউসে যাও···ছিটে ফোঁটা জল পাইনি। কলকাতা ছেড়ে যেমন বনবাসে এসেচি !

হায় নারী ! তুমি কি দুজ্ঞের্য় হেঁয়ালি ! ওবেলায় তুমিই এ-দেশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছিলে !

এধারে প্রতিবেশী ভদ্রলোকও কেহ নাই। আশে-পাশে

বললেন, ঘরের ব্যাপার নিয়ে বাইরে কেলেঙ্কারী করে না। তুমি একটু পরামর্শ দাও বাবাজী, নিত্য যদি এমন মারামারি চলে আর তার সাজা না হয় তো আমাদের পক্ষে লজ্জার কথা !…

রাখাল কহিল—ওদের তুলে দাও! গাঁ ছেড়ে চলে যাক।

অন্নদা কোন জবাব দিল না, নিঃশব্দে এই সংবাদ শুনিল। তার মনের মধ্যে যে এক টুকরা কালো-মেঘ উদয় হইয়াছিল, সে মেঘ নিবিড় হইয়া জমিয়া উঠিল।

রাখাল কহিল—একটু চা-টা চট্‌পট্ ফরমাশ করো। কেমন সর্দ্দির মত হয়েচে। আমার পেয়ালায় আদার রস করে একটু দিতে বলো…

অন্নদা কহিল—বলি, সত্য আসুক…

রাখাল কহিল—কেন, সত্য গেল কোথায় ? এই যে দেখলুম…

অন্নদা কহিল—তলিদের বাড়ী পাঠিয়েচি এদের আন্‌তে।

চাটুয্যে কহিল—হ্যাঁ, বেশ করেচো। যা হয়ে গেছে…কুরুক্ষেত্তর কাণ্ড! আমাদেরি গা কাঁপে—বৌমার ওখানে না যাওয়াই ভালো। ছোটলোক, মাতালের মুখ…ফশ্‌ করে একটা অপমানের কথা যদি বলে ফেলে ?

গোবর্দ্ধন কহিল—তবে আর ছোটলোক বলেচে কেন ?

কণ্ঠস্বর তীব্র করিয়া চাটুয্যে কহিল—ঠিক !…ওদের তুলে দাও…কালই। ভেতরে কিছু গোলমাল আছে, নিশ্চয়—নাহলে জামাইটে যখনি আসে, তখনি ঠ্যাঙাবে কেন ? সোমত্ত বয়সের বৌ…একটু মমতা হবে না ? এই তো আমরাও এককালে ও-জিনিষ খেয়েচি। তা পরিবারকে কখনো—কি বলো ভায়া—ঠেঙিয়েচি বলে তো মনে পড়ে না ! বরং ভয়ই করেচি চিরদিন !

কথাটা বলিয়া সগর্ব্ব দৃষ্টিতে চাটুয্যে সমবেত মণ্ডলীর পানে চাহিল।

অন্নদা কোনো কথা কহিল না—আঁধারের আব্‌-ছায়ায় খোলা জানলার মধ্য দিয়া আকাশের যেটুকু দেখা যাইতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অবিনাশ উঠিয়া শেলফের উপর হইতে দাবা-বোড়ের ছক পাড়িয়া ডাকিল—এসো হে রাখাল, বিলম্ব কেন ?

রাখাল কহিল—দাঁড়াও, চা-টা খেয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসবো'খন…

অবিনাশ কহিল—সত্য ফিরুক…তার আগে চা পাবে কেন ?

রাখাল কহিল—তা বটে ! তবে পাড়ো ছক্…

চাটুয্যে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া ডাকিল—ওরে মোনা…

মোনা ভৃত্য; চাটুয্যের ডাকে আসিল। চাটুয্যে কহিল—তামাক সাজ্‌ বাবা—বেশ ভালো করে…তাওয় চড়াবি, বুঝলি !

মোনা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, বুঝিয়াছে।

চাটুয্যে কহিল—লক্ষ্মী বাপ আমার, একটু তোয়াজ করে সাজিস্…তোর বাবুর এখানে তামাকটা ভারী সু-তার পাই, একটু তারিয়ে খাই…এই আর কি…

মোনা তা জানে! চাটুয্যে তামাকের যম…এবং এখানে আসিলে তার তামাকের সখ চতুর্গুণ হইয়া ওঠে !

চাটুয্যের পানে চাহিয়া মোনা কহিল—সেজে আনচি।

চাটুয্যে ফিরিয়া আসিয়া তক্তাপোষে বসিল, কহিল,—আমার সে কথাটার কি হলো বাবাজী ?

অন্নদা কহিল—কোন্ কথা ?

চাটুয্যে কহিল—গিন্নী ভারী জ্বালিয়ে তুলেচেন… তাঁর ভাইয়ের জন্য সেই চাকরিটা…! বোটান সাহেবকে বলেছিলে ?

অন্নদা কহিল—না, বল্‌তে পারিনি। ছোকরা ইংরিজি দরখাস্ত যা লিখেছিল, তার যেমন বানান, তেমনি গ্রামার, আর হাতের লেখাও তেমনি! কেরাণীগিরিতে ঢোকানো শক্ত হবে…

চাটুয্যে কহিল—ছোঁড়াটাকে ঢুকিয়ে দিতেই হবে, বাবা—নাহলে আমার পক্ষে…জানো তো সব—তুমি ধরলে বোটানের বাবা না বলতে পারবে না।

অন্নদা কহিল—কিন্তু আমার বলার রাস্তা একটু থাকা চাই তো!

চাটুয্যে কহিল—সাহেবদের সঙ্গে মিশতে মিশতে ইংরিজি ঠিক হয়ে যাবে। ওরা বাবা টেক্-টেক্ নো-টেক্-টেক্—ইংরিজির জোরে অত বড় সংসারটা চালিয়ে গেছে তো।

মৃত্যুঞ্জয় এতক্ষণ একখানা খবরের কাগজ লইয় তুনিয়া ভুলিয়াছিল…কাগজখানা ফেলিয়া রাখিয়া সে কহিল—আহা, সে ছিল এক কাল…চাকরির সত্য যুগ… তখন ভাঙা মচ্‌কানো ইংরিজিই ছিল সাহেবদের কাছে মস্ত সার্টিফিকিট !

চাটুয্যে কহিল—সে কথা মিথ্যা নয়!

দ্বারপ্রান্তে সত্য আসিয়া দাঁড়াইল। অন্নদা কহিল—কি খপর রে ?

সত্য চকিতের জন্ম চুপ করিল, তারপর অত্যন্ত জড়োসড়ো ভাবে কুণ্ঠিত স্বরে কহিল,—আজ্ঞে…

অন্নদার বুকের মধ্য দিয়া একটা তীব্র বিদ্যুৎশিখা বহিয়া গেল। অন্নদা কহিল—আজ্ঞে…কি ?

সত্য কহিল—মা-ঠাকুরুণ এখন আসতে পারবেন না, বললেন।

অন্নদা কহিল—কেন…?

দুনিয়াটা হঠাৎ যেন দুলিয়া উঠিয়াছে…অন্নদার সর্ব্ব শরীর দুলিয়া উঠিল, তার আর বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না!

রাখাল কহিল—এই যে সত্য…ওরে সত্য, ফিরেচিস! আঃ, এবার চা তৈরী কর্ বাবা! এ যে কি মৌতাত ধরিয়েচে তোর বাবু…সন্ধ্যা হলে আর কোথাও থাকবার উপায় নেই। চট্ করে দিস্…আমার পেয়ালায় আদার রস একটু দিস্ বাবা। সর্দ্দি হয়েচে।

সত্য অন্নদার পানে চাহিয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল…তারপর মনিবের দিক হইতে কোনো সাড়া উঠিল না দেখিয়া ধীরে ধীরে গিয়া চায়ের কাপ, চা-দানি, ষ্টোভ প্রভৃতি পাড়িল। এ-ব্যাপারে তার স্বার্থ আছে… বাবুদের সঙ্গে নিজেও দু'চার পেয়ালা পান করে!… রাখাল বাবু খাঁটি কথা বলিয়াছেন. এ যে কি মৌতাত… সত্যও তা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে।

অন্নদা নির্ব্বাক বসিয়াছিল; চাটুয্যে কহিল—তুমি গুম্ হয়ে রইলে যে!

অন্নদা কহিল—কি যে এদের কাণ্ড! রাত হতে চললো, এখনো সেই নোংরা ছুঁচোর গর্ত্তে philanthropy হচ্ছে! রুদ্ধ আক্রোশে অন্নদা একটা নিশ্বাস ফেলিল।

রাখাল কহিল—অন্যায়—তাতে কোনো সন্দেহ নেই! তবে কি জানো, তোমার স্ত্রী হলেন শিক্ষিতা—একটা পাশও করেচেন—আমাদের ঘরের মেয়েদের মত নন্ তো!

কলিকা আনিয়া মোনা তাহাতে ফুঁ দিতেছিল। চাটুয্যে পরম হৃষ্টচিত্তে তাওয়া-চড়ানো কলিকাটি হুঁকায় বসাইয়া টান দিয়া কহিল—তোমার বাবাজী, একটু দৌর্ব্বল্য আছে…তা স্পষ্ট কথা বলবো। কি বলো হে মৃত্যুঞ্জয়?

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—নিশ্চয়! মেয়েজাতটাকে কখনো নাই দিতে নেই! জানো তো সেই শাস্ত্র-বচন,—সেই যে, নারী যত্র প্রশাসিতা তৎ-গৃহং ক্ষয়মাপ্নোতি ভার্গব-ইদমব্রবীৎ।—তোমার অবশ্য তা হবার কথা নয়… তুমি মানুষটা সেকালের হলেও একালের স্ত্রী বিবাহ করেচো কি না!

একটা নিশ্বাস অন্নদার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিয়া উঠিল। অন্নদা কোনো কথা বলিল না।

রাখাল কহিল—হ্যাঁ, তবে এই যে আমাদের ওখানে গেছলেন… বুড়ী প্রসব হলো, বৌমা গিয়ে ছেলেকে নাইয়ে দিলেন, কি মাখালেন,…বিলিতি ফুড-মুড তৈরী করে বুড়ীকে খাওয়ালেন—বই খুলে দেখে কি সব বললেন,…এর মানে বুঝি। ভদ্র ঘরে সেবা-শুশ্রূষা… বেশ। তা না, ছোটলোকের ঘরে এত দরদ, ঐ মায়া…

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—ধরো, ঐ মাতাল জামাইটা ক্ষপ্ করে একটা বেফাঁশ কথাই যদি বলে ফেলে…?

হুঁকায় টান দিয়া চাটুয্যে কহিল,—ঐ কথা! একবার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়লে তার তো আর চারা থাকে না! শাস্ত্রে বলে, 'শব্দ ব্রহ্ম'!…তাছাড়া হাত-খানাই যদি নেশার ঝোঁকে ধরে?

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—আর ঐ নোংরার মধ্যে…বৌমা নিজে বলেন, নোংরাতেই যত রোগের জড়। একটা গরীব রেয়ৎ…খাজনা নিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক…তার জন্য অত মাথা ব্যথা…

অন্নদা হাঁকিল,—সত্য…

সত্য তখন পাশের ঘরে ষ্টোভের উপর চায়ের জল চাপাইয়াছে,—মনিবের ডাকে উঠিয়া আসিল।

অন্নদা কহিল,—তুই আবার যা…এখনি। বল্‌গে যা, বাবু রাগ করচেন, আপনাকে এখনি বাড়ী যেতে হবে। অন্নদার স্বরে ঝাঁজ!

সত্য কহিল—চা তৈরী করে…

অন্নদা তাকে ধমক দিয়া কহিল—না থাক্ চা। আগে তুই সেখানে যা। মা-ঠাকুরুণকে নিয়ে তবে ফিরবি!…বুঝলি?

সত্য বুঝিল এবং আরো বুঝিল, আজ দিব্য দুধ দিয়া চায়ের সেবা বোধ হয় অদৃষ্টে ঘটিবে না!

রাখাল কহিল—সত্য গেল বুঝি?

অন্নদা কহিল—হুঁ।

রাখালের চিত্তে অস্বাচ্ছন্দ্য। ষ্টোভের উপর জলে ফুট্ ধরিয়াছিল! আহা! আর দু'মিনিট পরে চা মিলিত! সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তি ধরিল। সে কহিল,—তোমার কিন্তু এটা বাড়াবাড়ি হলো, অন্নদা। এই মাত্র সত্য ফিরে এলো—না হয় আর আধ ঘণ্টা পরেই পাঠাতে!

অন্নদা কহিল—না। আজ যা-হয় একটা বিহিত করবো। কার ঘরে কোথায় কি হলো, না হলো… চাকর-বাকরের উপর ভার দিলে চোকে…তা না, নিজে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়া…এ শুধু নাম কেনার আগ্রহ!

চাটুয্যে কহিল—এই! এরা কখনো এর দাম বুঝবে? না, কদর করবে? দূর, দূর! তা, ভালো কথা, ঐ মোধো বাগ্দীর মেয়ে তোমার জমিটে দখল করে রইলো…তার বিহিত যা বলেছিলুম, বাবাজী…

বাধা দিয়া অন্নদা কহিল,—মামলা করা তো? ঐ পাঁচ কাঠা জমির জন্য হাঙ্গাম পোষায় না! এঁরা বলেন, গরীব বাস করচে…করুক।

অপ্রতিভ হইয়া হুঁকায় টান্ দিয়া চাটুয্যে কহিল—একেই বলে স্ত্রীবুদ্ধি। তা ছাড়া তোমার জমি বাবাজী, তোমার মর্জ্জি! তবে ছোট লোকের আস্পর্দ্ধা ওতে

কুলির বস্তী।···দূরে ওপাড়ায় অপর কেরাণী ও ভদ্রলোকের বাস। ছুটো কলসী-সমেত ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া তাঁদের একজনের বাড়ী গিয়া বিনোদ উপস্থিত হইল। তখন কলের জল চলিয়া গিয়াছে। তাঁদের চৌবাচ্ছা হইতে ছু কলসী জল আনা হইল। বিনোদ ভাবিল, রাত্রির মত তো বাঁচোয়া, কিন্তু কাল এ দশা থাকিলে উপায় ?

গৃহিণী কহিলেন—উপস্থিতের মত তো কাজ চুকলো, কাল এমন থাকলে···

সে কথা বিনোদের বুকেও কাঁটার মত ফুটিতে ছিল। এই বাঁধা রুটিনে জীবন-যাত্রা! কোনো অশান্তি ছিল না, তার মধ্যে কি এ দুর্ভোগ! বিনোদ ভাবিল, তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে! বঙ্গ সে ছাড়িয়া আসিয়াছে, কপাল তবু তাকে ছাড়ে নাই! মুখে আশ্বাস দিয়া সে বলিল,—কাল জল পাবে গো···

গৃহিণী কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই চলিয়া গেলেন।···

সকালেও কল বিগড়াইয়া রহিয়াছে, জল আসে না। তাড়াতাড়ি বিনোদ একটা মিস্ত্রী ডাকিয়া আনিল : সে কহিল, এ-কাজে সে হাত দিতে পারে না। সরকারী বাড়ী; অফিস-সরকারে এত্তেলা দিতে হইবে।

দরখাস্ত লিখিয়া তখনি বিনোদ তা অফিসে পাঠাইল। এবার নিশ্চিন্ত! তারপর গাড়ীভাড়া করিয়া সপরিবারে সুদূর নদীতে গিয়া স্নান করিয়া আসিল। কিন্তু এই গ্রীষ্মে তৃষ্ণার জল···ভৃত্যের অন্য কাজ আছে ঢের, সময় নাই! নগদ আট আনায় একটা ভারী ডাকিয়া জল আনানো হইল।

তারপর বিনোদ অফিসে গেল। তাগিদ দিয়া খবর পাইল, তার চিঠি বিল্ডিং ডিপার্টমেণ্টে জমা হইয়াছে এবং তাহা সে-ডিপার্টমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। (matter is receiving attention)

নিশ্বাস ফেলিয়া বিনোদ ভাবিল, তবে আর কি! ওবেলার মধ্যেই···

ব্যস্! কিন্তু পরদিনও চুপ-চাপ। সরকারী তরফ হইতে কোনো সাড়া নাই! অথচ এই গ্রীষ্মে প্রাণরক্ষার প্রধান উপায় জল···প্রতীক্ষা করা ছাড়া গতির্নাস্তি।

তিনদিন পরে বেলা আটটায় ছুই মিস্ত্রী আসিয়া হাজির; একজন ফিরিঙ্গি, একজন বেহারী। তারা আসিয়া এর প্যাঁচ খুলিয়া, ওর প্যাঁচ আঁটিয়া বহু কশরৎ করিল; সঙ্গে বিস্তর যন্ত্রপাতি। অফিসে যাইবার সময় বিনোদ প্রশ্ন করিল,—কদ্দূর ?

ফিরিঙ্গি কহিল—ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দেখি···

নিশ্বাস ফেলিয়া বিনোদ বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যায় ফিরিয়া সে দেখে, গৃহিণী ছিন্নমস্তার রূপ ধরিয়াছেন! তাঁর মুখ রথ-চক্রের মত সুগোল, এবং ছুই গাল বিবফোড়ার মত রাঙা! কাব্যচর্চ্চার ঝোঁক বিনোদের সুদূর প্রবাসে আসিয়া ইদানীং কাটিয়া গিয়াছে, তাছাড়া এখানে চাকরির গুঁতো খুবই! জন্মে পত্নিকে দেশেই সে রাখিয়া আসিয়াছে। একটা প মনে পড়ে না! কাজেই সে প্রমাদ গণিল।

তবু সভয়ে প্রশ্ন তুলিল,—জল পেয়েচো গা ?

গৃহিণী কহিলেন,—হ্যাঁ, খুব পেয়েচি। মিস্ত্রীরা একটু খুট-খাট্ করে সেই যে সরে গেছে দেখাটি নেই! আকলুকে দিয়ে বলালুম, কি হবে ? ত বলে গেছে, বড় মিস্ত্রীকে আনতে হবে·

বিনোদ কহিল—তবে আর কি! কালই···

কথা শেষ হইল না। প্রবল ঝড়ে গাছে ঝরিয়া যেমন উড়িয়া যায়, তার মুখের কথাও গৃহিণীর ঝঙ্কারে উড়িয়া গেল!

গৃহিণী কহিলেন,—আমি কাল সকালের খিদিরপুর যাচ্ছি; বিপিনকে সঙ্গে করে সকলকে এই গরমে সব সহ্য হয়, জলকষ্ট সহ্য হয় না! থেকে পাশ আনিয়ে দাও···সত্যি বলচি···এর নড় না। পাশ না মেলে যদি তো পয়সা খরচ করেই

খিদিরপুরে গৃহিণীর পিত্রালয়। বিপিন ভাইপো; বিনোদের কাছে আসিয়াছে কলেজের হাওয়া বদলাইতে এবং পিশিমার আদর খাইতে!

রাত্রেই বিনোদ চিঠি লিখিয়া ফেলিল, অফি কষ্টের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া; এবং পাশ পাশ আসিল···মনোযোগের কি হইল, জানা গে

গৃহিণীর রাগ কিন্তু পড়িল না। দুর্জ্জয় মান! ট্রেণে তিনি সকলকে লইয়া কলিকাতা যাত্রা ক একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বিনোদ ভাবিল, হায়রে হায় আর্য্য-রমণীর পতি-পরায়ণতা! স্বর্গে তাঁদে অশ্রু ঝরিতেছে নিশ্চয় একালের পত্নীর এ ঘোর স্ব দেখিয়া! বাংলায় রহিল শুধু বিনোদ আর ভৃত্য

তাঁরা চলিয়া গেলে আকলু কহিল—খাবার ি বাবু ?

বিনোদ কহিল—এই নে তোর পয়সা। আ থেকে কিছু কিনে খাবো···

জলের জন্য চিঠি ছাড়িয়া পায়ে হাঁটিয়া বিনোদ সুরু করিল। একে জলকষ্ট, তার উপর এ বয়সে বিরহ! জগৎটা তার বেবাক্ শূন্য মনে হইে শেষে গিয়া সাহেবের সঙ্গে কথা কহিল, সবিন করিল—সেই মিস্ত্রী দুজন ? মিষ্টার পিক্রজ আর সিং ? তাদের কোনো অসুখ-বিসুখ হইল না তো·

সাহেব তার মুখের পানে চাহিলেন,—তোমার জল! ওঃ! ওয়াটার-ডিপার্টমেণ্ট···সেখানে সন্ধান

সেইখানেই সে ছুটিল। প্রশ্ন করিল, মিষ্টার আর গুলজান্ সিং ? তারা রেলে কাটা পড়ে নাই তাদের বাড়ীর খপর ভালো ?

সে ডিপার্টমেন্টের বড়বাবু গোপাল সিং। সব
নিয়া তিনি কহিলেন,—আপনার ফাইল তাদের
ছে। ফাইল না পেলে তো কিছুই হবে না।…

চমৎকার! বিনোদ প্রশ্ন করিল,—আমার উপায়?
নকষ্টে গৃহিণী পিত্রালয়ে। আমার খাওয়ার বন্দোবস্ত
য়াছে ষ্টেশনে, ডবল খরচা দিয়া! আর কতদিন এমন
রিয়া…?

তার বুকের মধ্যটা বেদনায় ফাটিয়া যাইবার মত হইল!

গোপাল সিংয়ের মনে করুণার উদ্রেক হইল। তিনি
কিলেন,—মিট্টু…

একজন বেয়ারা আসিল। গোপাল সিং কহিলেন,—
ই বাবুকে ধরমচাঁদ বাবুর কাছে নিয়ে যাও…

মিট্টুর সঙ্গে বিনোদ ধরমচাঁদের কাছে গেল। সব
নিয়া তিনি কহিলেন—পিদ্রুজ ব্যাটা ভারী পাজী…
নি রিপোর্ট করচি! মদ খেয়ে কোথায় আর কি…

বিনোদ কহিল—সে কথা মিথ্যা নয়! তারপর…?

ধরমচাঁদ কহিলেন—আর একটা দরখাস্ত দিন…

সেইখানে বসিয়াই আবার সে দরখাস্ত দিল।
চাঁদ তার উপর লাল কালিতে লিখিয়া দিলেন,
ent, জরুরী! তারপর দরখাস্ত যে কোথা দিয়া
থায় চলিয়া গেল মিট্টুর হাতে উঠিয়া…

আরো পাঁচ দিন। জল নাই! এক-একবার
নাদের মনে হইতেছিল, ছুটী লইয়া খিদিরপুরেই
। কিন্তু এখানে নূতন সাহেব! একটা প্রোমোশনের
বনাও প্রাণে উঁকি দিতেছে…কাজেই দারুণ গ্রীষ্মে
না খাইয়াই সে দিন কাটাইতেছিল…

গৃহিণীর চিঠি আসিয়াছিল। তাঁর মেজাজ
কাতার কলের জলেও ঠাণ্ডা হয় নাই! তিনি
খিয়াছেন,—জল না এলে যাবো না।

বন্ধু শ্রীশ আসিয়া উপস্থিত—রাত তখন ন'টা।
পেয়ালা চা চাহিল। বিনোদ কহিল,—দেওয়া
ব না। বাড়ীতে কেউ নেই। তার উপর যে আল-
রিতে চায়ের টিন আছে, গৃহিণী তার চাবি সঙ্গে নিয়ে
ছন…চা দিতে হলে চায়ের টিন কিনে আনাতে হয়।
রাত্রে দোকান কি খোলা পাবো?

শ্রীশ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চাহিল।
নাদ সব কথা তাকে খুলিয়া বলিল।

শ্রীশ কহিল—এই ব্যাপার? আচ্ছা, আমি কাল
করে দিচ্ছি…

শ্রীশ এখানকার রেলোয়ের স্কুলে মাষ্টারী করে।
কহিল,—এর জন্ত অফিসের মুখ চাইলে বারো
মাসে থাকতে হবে।

পরদিন সকালে শ্রীশ আবার আসিল, সঙ্গে একজন
মিস্ত্রী…মিস্ত্রী যন্ত্র লইয়া নলের প্যাঁচ খুলিল, আবার
আঁটিল, তারপর পনেরো মিনিট পরে কি তোড়ে জল…
যেন ভগীরথ আসিয়া মহাদেবের জটা ছিঁড়িয়া মা গঙ্গাকে
সজোরে হিঁচড়াইয়া নামাইয়া দিয়াছে!

বিনোদ কহিল—কি হয়েছিল রে?

মিস্ত্রী কহিল—কালাগ হয়েছিল।

কালাগ! শ্রীশ হাসিয়া কহিল—নলের মুখ বন্ধ
হয়ে গেছলো। ক্লগ…

ওঃ!…

গৃহিণীকে তৎক্ষণাৎ সে টেলিগ্রাম করিয়া দিল।

পরের রাত্রে সদলে তিনি আসিয়া উপস্থিত…
চৌবাচ্ছায় জল টল-টল করিতেছে। বিনোদ কহিল—
আগে কল-ঘরে যাও, গিয়ে নেয়ে-ধুয়ে সাবান মেখে
রেলের কালি মুছে এসো…

গৃহিণী হাসিলেন, হাসিয়া কহিলেন—যাও, বুড়ো
বয়সে আর রঙ্গ করতে হবে না…

রাত্রে আহারাদির পর গৃহিণী কহিলেন—সরকারের
টনক নড়লো?

বিনোদ কহিল,—না, এ সরকারী মিস্ত্রী নয়।
শ্রীশ একটা মিস্ত্রী ধরে এনেছিল…

সাত দিন পরে সরকারী মিস্ত্রী সেই জরুরী ছাপ-মারা
কাগজ লইয়া হাজির। জলের সে কষ্ট বাড়ীর সকলে
তখন ভুলিয়া গিয়াছে! খুশী হইয়া বিনোদ তাদের
বলিল—এমন কাজের লোক তোরা—এই ছাতুর দেশে
পড়িয়া আছিস কেন? কলিকাতায় যা! সেখানকার
কর্পোরেশন একটা বিরাট ব্যাপার! জলের কষ্টও লাগিয়া
আছে, কাগজে পড়ি! তোদের মত লোক পাইলে
তারা লুফিয়া লইবে! সোনায় সোহাগা মিশবে!

এ উপদেশ তারা পালন করিয়াছিল কি না, জানা
নাই! তবে বিনোদের শিক্ষা হইয়াছে ভালো রকম।

ছাদে এখন জল পড়িলে বা কোথাও এমনি কিছু
অসুবিধা ঘটিলে সরকারের কাছে সে এত্তেলা পাঠায়
না—নিজের পয়সায় সকল অসুবিধা সে সারিয়া লয়।
পয়সা খরচ হয় বটে, কিন্তু একটা লাভ এই হয়
যে অগ্নিমূর্ত্তি ধরিয়া বিরহের অনলকুণ্ডে তাকে ফেলিয়া
গৃহিণী খিদিরপুরে ছোটেন না! তবে তিনি প্রায়ই এখন
বলেন—আর ক'টা মাস কাটলে কলকাতাতেই চলো।
দু'পয়সা এখানে বেশী মাহিনা হলেও এ বন-দেশে
শেয়াল-রাজা হয়ে থাকা বিড়ম্বনা!

সাপ্তাহিক কাগজগুলার শোক বিনোদের হাড়ে হাড়ে
গাঁথা। অভয় পাইয়া সে কহিল,— যা বলেচো। তাই হবে।

ইতি

শান্তি

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সুর-শিল্পী

শ্রীমান্ পঙ্কজকুমার মল্লিক

অনুজ-প্রতিমেষু—

কলিকাতা
১৫ই ভাদ্র, ১৩৩৭

সৌরীন্দ্র

শান্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইতর-ভদ্র

ইছাপুর ষ্টেশন হইতে সোজা পথ গিয়াছে পশ্চিমে বারুদখানার দিকে; সে পথ বাঁকিয়া ডাহিনে যে-শাখা বিস্তার করিয়াছে, এই শাখা-পথ আঁকিয়া-বাঁকিয়া বাঁশঝোড়, পুকুর, বাগান প্রভৃতির পাশ দিয়া গ্রামে ঢুকিয়াছে। এই পথের প্রান্তে গঙ্গা। গঙ্গার ধারে মস্ত দোতলা বাড়ী—হাল-ফ্যাশনে তৈরী। চট্‌ করিয়া দেখিলে মনে হয়, বুঝি পাট-কলের কোনো সাহেবের আস্তানা।

আসলে কিন্তু তা নয়। বাড়ীর ফটকে সাদা মার্ব্বেল পাথরে লেখা আছে—আরাম-নীড়।

এই আরাম-নীড়ের মালিক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ গাঙ্গুলি। অন্নদার বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর।

অন্নদাচরণের মস্ত কারবার। কলিকাতায় বড় বড় মার্চেণ্ট অফিসে সে বিবিধ মালপত্র সরবরাহ করে; কলিকাতায় স্বতন্ত্র অফিস আছে—তার উপর সাতগাছি মোটর সার্ভিসের সে ম্যানেজিং ডিরেক্টর; শ্যামনগর ফ্যাশিয়ারির মালিক; অর্থাৎ তার আর্থিক অবস্থা খুব ভালো।

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়াছে। ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া অন্নদা একেবারে দোতলায় নিজের ঘরে গিয়া উঠিল। জামা-কাপড় ছাড়া হইলে ভৃত্য ছোট একখানা রেকাবি আনিয়া পাথরের ছোট গোল টেবিলের উপর রাখিল। রেকাবিতে জাম, জামরুল, লিচু, আম প্রভৃতি।

অন্নদা ভৃত্যের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—তোর ঠাকরুণ কি করচে রে?

ভৃত্য সত্য কহিল,—তিনি বাড়ী নেই।

অন্নদা কহিল,—কোথায় গেছেন?

সত্য কহিল—তলিদের বাড়ী।

তলিদের বাড়ী! অন্নদা ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত করিল, কহিল,—আচ্ছা, তুই এক গ্লাস জল দে···দিয়ে তোর ঠাকরুণকে খপর দিয়ে আয়। বলবি আমি এসেচি। ঢের রাত হয়ে গেছে···বন-বাদাড় ভেঙ্গে রাত্রে যা···একটা হারিকেন জ্বেলে নিয়ে যা।

ভৃত্য চলিয়া গেল। অন্নদা ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া দু' মিনিট স্তব্ধ বসিয়া রহিল, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া জলযোগে মনোনিবেশ করিল।

হারিকেন-হাতে সত্য ফিরিল, ফিরিয়া কহিল—রাখালবাবু এসেচেন নীচে···

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া অন্নদা কহিল,—তুই এখনও ঘুর-ঘুর করচিস্···

সত্য কহিল—যাচ্ছিলুম। রাখালবাবু বললেন, খপর দিতে···

অন্নদা কহিল—আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। তাঁকে বস্‌তে বল্‌। আর দেরী করিসনে···শীগগির যা।

সত্য বিনা-বাক্য-ব্যয়ে চলিয়া গেল।

জলযোগান্তে অন্নদা দোতলার ঘর ছাড়িয়া বাহিরের বৈঠকখানায় আসিয়া বসিল। সেখানে তখন রাখালবাবু এবং পাড়ার আরো চার-পাঁচটি ভদ্রলোক নিত্যকার মত আসিয়া সমবেত হইয়াছেন।

চাটুয্যে কহিল,—এই যে বাবাজী তাহলে এসেচো··· আজ এক কাণ্ড ঘটে গেছে তোমার ঐ তলির বাড়ী। আঃ, জ্বালাতন!

তলি অন্নদার এক-ঘর রাইয়ৎ। চাটুয্যের কথায় অন্নদা তার পানে চাহিল।

চাটুয্যে কহিল—তলির এক জামাই আছে না? বারুদখানায় কাজ করে। বয়াটে। আজ বেলা তখন তিনটে, মদ খেয়ে লক্ষ্মীছাড়া এসে হাজির···তলির মেয়ে দাক্ষে তখন একরাশ গাব সেদ্ধ করছিল। জামাইটে এসেই কোনো কথা নেই, বাত্রা নেই, তাকে ধরে দুম্‌দাম্‌ ঠ্যাঙানি···মারের চোটে মেয়েটা চোখ কপালে তুলে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। হৈ-হৈ ব্যাপার! আমি তখন ঘোসেদের বাড়ীর রোয়াকে বসে তাওয়াটি সবে চড়িয়েচি! ছুটে গেলুম। গিয়ে দেখি, রক্তগঙ্গা!···বললুম, পুলিশে খপর দে। তলি শুনলো না···লোকজন পড়ে জামাইকে ধরে পিছ্‌মোড়া করে বেঁধে ফেললে। তারপর এখান থেকে বৌমা গেলেন, গিয়ে দাক্ষের সেবা শুশ্রূষার ভার নিলেন।

গোবর্দ্ধন কহিল—জামাইটাকে পুলিশে দিলে না?

চাটুয্যে কহিল—না। আমি বলেছিলুম, আমার জানা ঐ ভোলা মোক্তার আছে, খাশা মাথা···জামাইটার হেস্ত-নেস্ত করে দিত। তা বৌমা মানা করলেন···

বাড়ে, আর পাঁচজনে আস্কারা পায়, তাই আমার বলা! হাঙ্গাম আর কি? কাছারিঘর আমিই করতুম… ও সব আমার বেশ জানা আছে!…তা যাক্, তোমার যখন ইচ্ছা নেই…

চাটুয্যে হতাশ চিত্তে হুঁকায় টান্ দিল।

—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তরুণী ভার্য্যা

রাত প্রায় এগারোটা। বন্ধু-বান্ধব বিদায় লইয়াছে। অন্নদা অন্দরে আসিয়া ভোজন শেষ করিয়া নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। রাগে তার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল…পুষ্প এখনো বাড়ী ফিরিল না!—সত্যকে ফিরাইয়া দিয়াছে, বলিয়াছে, তুই যা, আমি পরে যাইব! ছোট লোকের ঘরে নাম কিনিবার সাধ! অন্নদা সারাদিনের কাজের শেষে গৃহে ফিরিয়াছে…তার কোথায় কি দরকার, সেদিকে তিলমাত্র লক্ষ্য নাই—তাকে এতখানি অবহেলা, এমনভাবে তুচ্ছ করা—কি এ!

ঘরের একধারে একখানা ইজি-চেয়ার। ইজি-চেয়ারের পাশে ছোট টেবিলে রাজ্যের বাঙলা বই,—কাব্য, উপন্যাস, মাসিকপত্র, স্বরলিপি—কি নাই?—স্ত্রী পুষ্পমঞ্জরী যখন যা চাহিয়াছে, অন্নদা তাই দিয়াছে! এই পল্লীগ্রামের বদ্ধ সংস্কারের মধ্যে একালের হাওয়া প্রবেশ করিতে ভয় পায়, তবু পুষ্পর মনোরঞ্জনের জন্য টেব্‌ল্-হার-মোনিয়ম, গ্রামোফোন্…কোনো দিকে কোনো অভাব অন্নদা রাখে নাই। এত দিয়াও পুষ্পকে সে আয়ত্ত করিতে পারিল না! সে যা ভালোবাসে, সেটুকু করিতে পুষ্পর এত বাধে কেন? তার প্রতি পুষ্পর সব কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গিয়াছে? আশ্চর্য্য!

ইজি-চেয়ারে বসিয়া উদাস মনে সে একখানা স্বর-লিপির বই টানিয়া তার পাতাগুলায় চোখ বুলাইতেছিল …সহসা একটা গানের ছত্রে নজর পড়িল—

তবু তোমায় পাই না কেন মন?
আমার বুকের ব্যথা
মুখের ভাষায় করি নিবেদন!…

অন্নদার সমস্ত চিত্ত বেদনায় যেন ফাটিয়া পড়িবে! সে কি না নিবেদন করিয়াছে! পুষ্পর যখন যে সাধ, যে খেয়াল হইয়াছে, তখনই তাহা পরিতৃপ্ত করিয়াছে! নিজের যদি কোথাও বাধে, সেদিকে দৃক্‌পাত মাত্র করে না! এজন্য পাড়ার লোকে আড়ালে কত ব্যঙ্গ, কত টিট্‌কারীই না রচিয়া তোলে! তার কাণে কি কিছু যায় না? পুষ্পর কাছে কৌতুক-ভরে সে-কথাও সে বলি-য়াছে,—শুনচো পুষ্প, ওরা আমায় কি বলেচে তোমার সে ব্যাপার নিয়ে? হাসিয়া পুষ্প তার জবাব দিয়াছে,—ভালোই তো! স্ত্রীকে খুশী করবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আশ্রিত ইন্দ্রর সঙ্গেও যুদ্ধ করেছিলেন গো সেই পারিজাত-হরণের ব্যাপার…মনে নেই? তা, এরা তবু আশ্রিত নয়, তোমার বন্ধু!…

এই পল্লীগ্রামে এ-বয়সে যে-সংস্কারের হাওয়া বহাইয়া চলিয়াছে, সে কার জন্য? শুধু পুষ্পর খেয়াল… আর সেই পুষ্প…ভালো না বাসো, একটু কৃতজ্ঞতাও কি প্রাণে থাকিতে নাই?

সহসা বাহিরে পুষ্পর কণ্ঠস্বর শুনা গেল। পুষ্প চাকরকে ডাকিয়া বলিতেছে—শোন্ রে, এই থার্ম্মো ফ্লাস্কে আমি হরলিক্স ভরে দিচ্ছি…তুই তলিদের ওখানে নিয়ে যা…কাঁচের গ্লাস একটা নিয়ে যাবি এই সঙ্গে…তুই নিজে ফ্লাস্ক থেকে হরলিক্সটুকু কাঁচের গ্লাসে ঢেলে দিবি। বল্‌বি, কোনো ভয় নেই। আজ রাতটা কাটুক, বৌমা কাল সকালে দাক্তেকে এখানে নিয়ে আসবে!…

সত্য জবাব দিল—এ বোতল সেখানে রেখে আসবো?

পুষ্প কহিল—না। ফ্লাস্কটা নিয়ে আসবি—কাঁচের গ্লাসটা ফেরত নাই আনলি।…আর তুই একবার সদুকে ডেকে দিয়ে যা—ওপরের বাথরুমে আমার কাপড়-সেমিজ এনে দেবে…আমি গা ধুতে চললুম।

অন্নদা রাগে গুম্ হইয়া রহিল…দ্বারে কাণ পাতিয়া। …এইবার…ঐ বুঝি পুষ্প আসিতেছে…

কিন্তু আশা মিটিল না। পুষ্প ঘরে আসিল না। অন্নদা স্বরলিপির বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল, উদাস মনে,—কোনো গানের ছন্দে মন অবলম্বন পাইতেছিল না!…শেষে একখানা বই লইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া অন্নদা ইজি-চেয়ারে পড়িয়া চক্ষু মুদিল। চক্ষু মুদিয়া সে ভাবিয়া স্থির করিল, এখন হইতে রাশ আর আল্‌গা দিবে না—একটু কঠিন হইবে, স্বামীর দল যেমন হয়…!

প্রায় দশ-পনেরো মিনিট পরে পুষ্প আসিয়া ঘরে ঢুকিল।…পুষ্প কহিল,—এখনো ঘুমোওনি তুমি?…

শুষ্ক কণ্ঠে অন্নদা কহিল—না।…

পুষ্প আসিয়া ইজি-চেয়ারের হাতায় বসিয়া কহিল—তোমায় এর একটা বিহিত করতে হবে—সত্যি…

অন্নদা পুষ্পর পানে চাহিল। পুষ্প কহিল,—তুমি শোনোনি কাণ্ড?

অন্নদা কহিল,—কি কাণ্ড?

পুষ্প কহিল—ঐ তলির মেয়ের কথা…! আজ সেই হতভাগা মাতাল জামাইটা মদ খেয়ে এসে তাকে চোরো মার মেরে গেছে বিনাদোষে…

অন্নদা পুষ্পর পানে চাহিয়া শুধু বলিল,—হুঁ…

পুষ্প সেদিকে লক্ষ্য মাত্র না করিয়া বলিল—স্বা

বলে, পুলিশে দাও।···আমি মানা করে বললুম, এমন সর্ব্বনাশ করিস্ নে রে, যদি সাজাই হয়ে যায়···তখন মেয়ের উপায় কি হবে? এ তো খ্রীষ্টানের বিয়ে নয় যে ডাইভোর্স চলবে! সাজা দেওয়ালে ও-মেয়েকে জামাই আর নেবে কখনো? তবে থামে। ওদের দোষ দিতেও পারি না। ও ব্যাপারে মানুষের মাথা ঠিক থাকতে পারে না। তুমি কিন্তু বিহিত করো—তোমার প্রজা··· গরীব···তুমি না দেখলে কার কাছে যাবে?

পুষ্পর সহসা দৃষ্টি পড়িল আনলার দিকে···আনলায় অন্নদার গেঞ্জি ঝুলিতেছিল। পুষ্প সেটা টানিয়া লইয়া কহিল—এই গায়ে-দেওয়া গেঞ্জি টাঙ্গানো রয়েচে—কাচতে নিয়ে যায় নি! এত করে বলে দিছি—নাঃ! দেখচি!··· ওরে অ সদু···

সদু বাথ-রুমে পুষ্পর ছাড়া শাড়ীখানা কাচিতেছিল; আহ্বান শুনিয়া কহিল—কেন বৌমা···?

পুষ্প কহিল—ডাক্ তো মোনাকে···বাবুর গেঞ্জি আনলায় ঝুলচে—কাচে নি। অথচ পই পই করে বলে দিছি! নিয়ে যা তো···তাকে দে—আজ আর তুই কাচবি নে···ওর আস্কারা বেড়ে যাবে তাতে···

গেঞ্জিটা সদুর হাতে দিয়া পুষ্প আবার ঘরে ফিরিল; এবং কোনো রকম ভূমিকা না ফাঁদিয়া কহিল—রাত হয়ে গেছে খুব—মিছে বসে থাকে না। শোবে চলো··· হ্যাঁ, আর কাল ঐ তলির মেয়েকে আমি এ বাড়ীতে আনচি—দু'দিন এখানে দেখাশুনা করি। মেয়েটা ভয়ে একেবারে সিটিয়ে আছে। মাথায় বেশ চোট্ লেগেচে।

অন্নদা অবিচল স্থির দৃষ্টিতে পুষ্পর পানে চাহিয়া··· সে ভাবিতেছিল, পুষ্পর মুখে কোনো কৈফিয়ৎ নাই? এত রাত্রি অবধি বাড়ী ছাড়িয়া থাকার জন্য একটু কুণ্ঠা? তাও না···আশ্চর্য্য! আক্রোশের একটা জ্বালা বুকের মধ্য দিয়া বহিয়া গেল—বিদ্যুতের শিখার মত। তার একটু পুষ্পর মনে···এ লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিল না।

অন্নদা কহিল—কটা বেজেচে, জানো? তার স্বর গম্ভীর।

পুষ্প সে গাম্ভীর্য্য লক্ষ্য করিয়া একেবারে কাঠ হইয়া দাঁড়াইল। দৃষ্টি স্বামীর মুখে নিবদ্ধ···সে কোনো কথা বলিল না।

অন্নদার রোখ চড়িল। অন্নদা কহিল—ঘর-সংসার ফেলে এমনি সেবা করতে নিত্য যদি ছোটো, তা হলে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম কি দোষ করলে?

পুষ্প অবাক! সে কহিল—আমায় বলচো?···কি করবো বলো?

অন্নদা কহিল—এ রাতটুকু সেখানে পরিচর্য্যা নিয়ে থাকলে ভালো হতো না? ঘরের কথা মনে পড়লো যে···!

পুষ্প বুঝিল, এ শ্লেষ! সে কহিল—এর আগে আসবার উপায় ছিল না। একটু ভালো দেখে আসবো তো—গেছি যখন?···এই অবধি বলিয়া সে কহিল,— তা ছাড়া বুঝতুম না যে, লোকের বিপদে গিয়ে দাঁড়ালে দোষ হয়!

অন্নদা পণ করিয়াছিল, রাশ আলগা করিবে না— কড়া রাখা চাই! তাই সে কহিল—আর পাঁচজনে পাঁচ কথা বলবার সুযোগ পায় এতে···তাই আমার বলা। এ হলো পাড়াগাঁ···এখানকার লোকজনের মন দ্রুত অগ্রসর হয় নি চ্যারিটির পথে। আমার বন্ধু-বান্ধবরা যে এ নিয়ে দু'কথা বলে···

পুষ্প তাচ্ছল্য-ভরে কহিল—তোমার ঐ বন্ধু-বান্ধবরা? ওঃ···তাই বলো!

পুষ্প জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। অন্নদা কহিল—আমার বন্ধু-বান্ধবরা কি তাচ্ছল্যের বস্তু? তাদের কথা কাণে তোলবার মত নয়?

পুষ্প কহিল—থাক্! তারা যদি মানুষের মত মানুষ হতো, তাহলে এক অসহায় মেয়েকে যখন-তখন তার মাতাল স্বামী এসে পাড়ার বুকে চড়ে এমন প্রহার পীড়ন করে যেতে পারতো না! বলে, পুলিশ ডাকো! এর প্রতিকারে নিজেদের মুরোদ নেই, এরা হলো পুরুষসিংহ···

পুষ্পর চোখের দৃষ্টিতে আগুনের হল্কা বহিয়া গেল! সে দৃষ্টির সামনে অন্নদা কেমন এতটুকু হইয়া পড়িল। তাই হয়···ঐ তেজোদ্দীপ্ত ভঙ্গী পুষ্পকে এমন মানায়! ও ভঙ্গী অন্নদার ভালোও লাগে! আবার ঐ ভঙ্গীর সামনে তার মনের মধ্যকার আদিম বর্ব্বরতা নিজের মূর্ত্তি ধরিয়া মাঝে মাঝে উদয় হইয়া নিজের হীনতার লজ্জায় জড়োসড়ো হইয়া পড়ে! তবে আজ না কি মনে মনে সে পণ করিয়াছে, রাশ কড়া করিবে···! তাই কহিল,—আমার বন্ধুদের কথা তো তোমায়, আমি শিরোধার্য্য করতে বলি না বা নিজেও তা শিরোধার্য্য করে চলি নি আজ পর্য্যন্ত···তা যদি করতুম, তাহলে তোমায় কি এতখানি স্বাধীনতা দিতে পারতুম?

পুষ্প চমকিয়া কহিল—স্বাধীনতা! তার মানে?

ভাবিয়া কয়েকটা দৃষ্টান্ত অন্নদা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল—পুষ্পর স্বাধীন বেপরোয়া ভাবের কয়েকটা অকাট্য দৃষ্টান্ত। পুষ্পর প্রশ্নে সে সব ফাঁসিয়া গেল—ঝড়ের মুখে টুকরা মেঘের মত। সে একটা ঢোক গিলিয়া কহিল—মানে, এই যে তুমি যেখানে খুশী যাচ্ছো-আসচো, যা খুশী হচ্ছে, করচো···

পুষ্পমঞ্জরী কহিল—কি যা খুশী করচি, কোথায় যেখানে খুশী যাচ্ছি?—তোমার বন্ধু-বান্ধব তার দৃষ্টান্ত দিতে পারে?

অন্নদা কহিল—তা ঠিক নয়। মানে, কথা হচ্ছে

পুষ্প অন্নদাকে ধরিল। অন্নদা সেই রাত্রেই আসিয়া চাটুয্যের স্ত্রীকে ডাকিল—খুড়িমা···

চাটুয্যে-গৃহিণী কহিল,—এসো বাবা···

অন্নদা কহিল,—মধুরাকে হাওয়া বদলাতে নিয়ে গেলেন না? ডাক্তার বললে···

চাটুয্যের গৃহিণী নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—পয়সা কোথায় পাবো বাবা?···

অন্নদা কহিল,—সে কি! পয়সার অভাবে ছেলেটা রোগে ভুগবে?···আপনি ব্যবস্থা করুন, আমি পয়সা দেবো। একমাস বৈ তো নয়···একশো টাকা আপনার কাছে কাল দিয়ে যাবো। বদ্দিনাথে আমার এক বন্ধুর বাড়ী আছে। বাড়ী-ভাড়া লাগবে না। আপনি পাঁজি দেখে দিন স্থির করে ফেলুন···

পরের দিন টাকাটা হাতে পাইয়া চাটুয্যে গ্রাম-সভায় তাহা জানাইয়া কহিল—চমৎকার ছোক্‌রা, আর তেমনি বৌ! বৌ-মাই ব্যবস্থা করিয়েচেন, শুনলুম···

হিংসায় ফাটিয়া হরশঙ্কর কহিল,—থামো···ও ঢের জানা আছে। এ হলো চাল···হয়তো কোথাও কোনো গোল আছে···পয়সার চার ফেলে বশ করতে চাচ্ছে আমাদের। মেয়েরা কেউ যায় না—মেশবার আগ্রহ খুব। নিশ্চয় গোল আছে! আমার মূলোজোড়ের এক যজমান বলছিল, পশ্চিমে এমন অনেক ঘর আছে,—যাদের মেয়েরা বিকোয় না। কেন? সে খবর রাখো?···

হরশঙ্কর একটা বক্র হাসি হাসিল। সে হাসিতে কি ইতর ইঙ্গিত, এই সমাজের লোকগুলি তা ভালো করিয়াই বোঝে! চাটুয্যে ছাড়া আর সকলে সে হাসিতে তেমনি হাসি মিশাইল।

চাটুয্যের হাতে নাকি সদ্য-পাওয়া নগদ একশো টাকা। তাই সে জিভ্‌ কাটিয়া কহিল,—ও কথা নয়—এ বৌমা সতীলক্ষ্মী···

ভট্টাচার্য্য কহিল,—উনি হতে পারেন! কিন্তু ওঁর মা কেমন ছিলেন, কার মেয়ে, সে সব খবর জানো বাপু?···

চাটুয্যে কহিল—তাঁর হাতের রান্না তো সপরিবারে মুখে তুলেচো! তখন তো কোনো আপত্তি করোনি!

একটা ঢোক গিলিয়া ভট্টাচার্য্য কহিল,—আতুরে নিয়ম নাস্তি—শাস্ত্রেই লেখা আছে। রোগে বিলিতি মিকশ্চার খেতে হয় না? এও তাই। আমি খবর নিচ্ছি। যা-তা বলে চলে যাবে এখানে? এই হরশঙ্কর ভট্টাচার্য্য বেঁচে থাকতে?···সেটি হবে না বাপু···

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্বামী ও স্ত্রী

পাঁচ-সাত দিন পরের কথা। সকালে চা [illegible] করিয়া দোতলার ঘরে বসিয়া অন্নদা একখানা ক্যাটা[illegible] খুলিয়া নিবিষ্ট মনে কি দেখিতেছিল···পুষ্পমঞ্জরী [illegible] দূরে বসিয়া বালিশের ওয়াড়ের মাপ লইয়া থান কাটি[illegible] ছিল। অন্নদা ডাকিল—শুনচো পুষ্প···

ফ্যাঁশ্‌ করিয়া থানের টুকরা ফাঁড়িয়া [illegible] কহিল,—কি?

অন্নদা সাদরে কহিল,—কাছে এসো। এই ক্যাটা[illegible] ছাখো—তবে তো কথাটা বুঝবে।

পুষ্প কহিল,—তুমি বলো না। আমি এ[illegible] থেকে ঠিক শুনতে পাবো। তুমি তো হিব্রু ভাষায় [illegible] কবে না!

অন্নদা কহিল—তা না কই, শ্রোতার মন যদি[illegible] দিকে থাকে, তা হলে বক্তার উৎসাহ থাকে না।

পুষ্প কহিল—তাহলে একটু অপেক্ষা করতে হ[illegible] ওয়াড়গুলো কাটা হলেই উঠবো। আজ দুপুর [illegible] এগুলো সেলাই করে ফেলবো···

অন্নদা কহিল,—তা করো...দু'মিনিট আমার [illegible] এসে কথাটা শুনলে ওয়াড়-কাটায় এমন কিছু ব্যা[illegible] ঘটবে না।

পুষ্প কহিল—আমার স্বভাব তো জানো! হা[illegible] কাজ শেষ না হলে আমি অন্য কোনো বিষয়ে মন [illegible] পারি না!

অন্নদা এ কথার কোন জবাব না দিয়া ক্যাটাল[illegible] পাতা উল্টাইতে লাগিল। পুষ্প কৌতুক-ভরে স্বা[illegible] পানে চাহিল···স্বামীর ঐ উদাস ভাব, ও কি···অ[illegible] মান? তা হোক্‌ একটু অভিমান···এইখানেই জীব[illegible] বৈচিত্র্য!···

ওয়াড়ের কাপড় কাটা হইলে পুষ্প আসিয়া স্ব[illegible] কাছে বসিল, কহিল,—কি বলছিলে, বলো···

তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম···শিথিল কবরী-চ্যু[illegible] মুক্ত চূর্ণ অলক কপালের উপর পড়িয়া ঘামে আঁ[illegible] গিয়াছে। পুষ্পর পানে চাহিবামাত্র অন্নদার অভিম[illegible] চূর্ণ হইয়া গেল। অন্নদা ক্যাটালগের পাতা উল্টাই[illegible] একখানা ছবির দিকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল,—জিনিষটা কেমন, বলো তো···পছন্দ হয়?

পুষ্প দেখিল, দেখিয়া কহিল—মোটর-বোট! কি [illegible]

অন্নদা কহিল—ধরো, যদি কিনি?

পুষ্প কহিল,—কিনে কি হবে?

অন্নদা কহিল,—দুজনে এই গঙ্গার বুকে বেড়াবো সেই বোটে চড়ে···

মুখে-চোখে হাসির দীপ্তি ভরিয়া পুষ্প সকৌতুকে হিলখইস্, সকালেই যে কাব্য একেবারে উৎসারিত হয়ে উঠলো…!

অন্নদা কহিল—এ-জীবনে কাব্যসুখ আমি উপভোগ করবো—সে আশা কখনো ছিল না! বাপ-মা-মরা, অসহায়, নিরাশ্রয়…আমার দিন যে করে কেটেচে! জীবনকে মনে হতো, একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে বদ্ধ… দারিদ্র্য আর অভাবের সীমায় ঘেরা। তার পর দুর্দ্দিনের মেঘ কেটে যেতে দেখি, একেবারে আলোয় আলো…! এত আরাম দুনিয়ায় ছিল!

পুষ্পর বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। বেদনায় ঈষৎ দুলিল। চোখের সামনে অস্পষ্ট আবছায়ায় ঢাকা নিজের অতীতটুকু ফুটিয়া উঠিল। সমবেদনার একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে স্বামীর পানে চাহিল, আহা!

অন্নদা কহিল—তোমায় পাবার আগে ভাবতুম, এ হাত দুটোর সৃষ্টি হয়েচে শুধু কঠিন কাজের জন্য। বিরাম-হীন কাজ…কুড়ুল আর কোদাল ধরে বন কেটে মজুর যেমন প্রশস্ত রাজপথ বানিয়ে চলে, এ দুই হাতে এ-জন্মে তেমনি জীবনের দীর্ঘ পথ তৈরী করেই চলতে হবে!…অন্নদা আবেশ-ভরে পুষ্পর পানে চাহিল, একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—তোমায় পেয়ে বুঝলুম, এ হাত শুধু কোদাল ধরবার জন্য ভগবান তৈরী করেন নি! তোমার কণ্ঠে মালা পরানো হলো এ-হাতের চরম সার্থকতা…

সকালের স্নিগ্ধ বাতাসে কোন্ অমর-লোক হইতে পুলকের রাগিণী ভাসিয়া আসিতেছিল…সে সুরে কি আহ, কি সুধা…! পুষ্প বিমুগ্ধ চিত্তে আকাশের পানে চাহিল।…

বাহিরে বারান্দা হইতে ভৃত্য মোনা ডাকিল,—মা…

মায়া-লোকের স্বপ্ন টুটিয়া গেল! পুষ্প মর্ত্তে নামিল; চাহিল,—কি রে?

বারান্দা হইতে মোনা কহিল,—পুঁটির মা এসেচে।

—যাচ্ছি! তাকে বসতে বল্। বলিয়া পুষ্প স্বামীর পানে চাহিল।

অন্নদা কহিল—এ আবার কোন্ রাগিণী?

পুষ্প কহিল—ওর মেয়েকে নিয়ে একটু গোল বেধেচে! পুঁটি এখানে এসেছিল শ্বশুর-বাড়ী থেকে… নাইতে গিয়ে সেদিন কানের একটা মাকড়ি হারিয়েচে। তা, সামনের সোমবারে আবার শ্বশুরবাড়ী যাবে…একটা মাকড়ি গড়িয়ে দিতে হবে। গরীব… কোথায় পয়সা পাবে? আমি বলেছিলুম, গড়তে দিস, যা লাগে, বাবু দেবেন…

অন্নদা কহিল—তুমি দাতব্য আশ্রম খুলেচো দেখচি!

পুষ্প এ কথায় থ হইয়া দাঁড়াইল, কহিল,—তোমার আপত্তি আছে? যদি আপত্তি থাকে, থাক্, তা হলে আমি এ-ভাবে খরচ করতে পারি না! পয়সা তোমার— আমার নয়! তুমি সে অধিকার দিয়েচো বলেই না…

পুষ্পর দুই হাত ধরিয়া একেবারে বুকের কাছে তাকে টানিয়া অন্নদা কহিল,—ছি! অধিকারের কথা তুলো না! তোমার অধিকার আমারি মতন। তা কেন, আমার চেয়েও বেশী তোমার অধিকার। কথায় বলে, স্ত্রী-ভাগ্যে ধন—আমার যে এ টাকা-কড়ি, এ তোমার ভাগ্যে…

পুষ্পর মন অন্নদার এ স্নেহের স্পর্শে আর্দ্র হইল। সে কহিল,—বা রে, তা কেন! আমি আসবার আগেই তো তুমি কুবেরের ভাণ্ডার আয়ত্ত করেচো!…

অন্নদা কহিল,—সে তোমার ভাগ্যে। তা না হলে তোমায় পাবার আশাও যে থাকতো না! তোমার অদৃষ্টে বিধাতা লিখেছিলেন, পয়সা হবে, আর আমার সঙ্গে বিয়ে হবে, তাই আমায় কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গিয়ে তিনি পয়সা-কড়ি দিলেন!…নাহলে আমার নিজের বরাতে নির্ভর করতে হলে ঐ পোর্ট-কমিশনরের জেটি-সরকারী করেই দিন কাটাতে হতো!…সে কথা তুলচি না। আমি শুধু বলছিলুম, গ্রামের লোকের স্বভাব তুমি জানো না। ওদের মন নেই,—যার উপকার করো, সেই তোমার প্রধান শত্রু হবে, জেনে রেখো। এরা মা-মা করে পায়ের তলায় লোটায় শুধু স্বার্থের খাতিরে, ভক্তি বা স্নেহ-ভরে নয়। তার পর সে স্বার্থ চুকলেই মিথ্যা অপযশ গায় হাজার জিভ বার করে! দেখে শুনে আমার বিরক্তি ধরে গেছে।

পুষ্প কহিল—তাই বাইরের ঘরে আসর ক্রমে অতিরিক্ত ফুলে পরিপুষ্ট হচ্ছে দিন দিন…

অন্নদা কহিল—তার আসল অর্থ আমি কিছু বুঝি না? বুঝি… সেজন্য এবার একটু হুঁশিয়ারও হয়েচি। ঐ তিনু হালদার—তার মেয়ের বিয়ের জন্য টাকা ধার চাইতে এসেছিল। মনে মনে জানে, এ ধার কখনো শোধ দিতে তো হবে না। ভোগা দিয়ে যা পারি…

পুষ্প কহিল—তুমি কি বললে?

অন্নদা কহিল—আমি বললুম, টাকা-পয়সা আমি ধার দিই না। তবে সাহায্য-হিসাবে পঞ্চাশ কি একশো দিতে পারি।

পুষ্প কহিল—দিলেই পারতে। তুমি একদিন গরীব ছিলে, পয়সার কষ্ট কি, তা জানো! তাই, ভগবান যখন তোমার হাতে পয়সা দিয়েচেন, তখন সে পয়সায় যতখানি সম্ভব, পরের দুঃখ-কষ্ট দূর করবার চেষ্টা করো।

অন্নদা কহিল—তা বলে পরে ভোগা দিয়ে যাবে? স্পষ্ট ভাষায় সাহায্য বলে চায় না কেন?

পুষ্প কহিল—গরীব হলেও ভদ্রলোক তারা মুখ ফুটে ভিক্ষা চাইতে পারে না,…তাই একটু ঘুরিয়ে

বলে। অভাবের তাড়নায় লোকের মতি স্থির থাকে না। মিছে কথা যা বলে, তা ঠকাবার মতলবেই শুধু নয়। তুমি জানো না তো, বাবা মারা গেলে আমাদের কি দশা হয়েছিল! পরের কাছে হাত পাততে মাথা কাটা যেতো। আমার মনে হতো, একটা চাকরি মেলে তো করি!

অন্নদা কহিল,—পাগল হয়েচো! বাঙালীর মেয়ে, কোথায় কার বাড়ী কি চাকরি করতে! রাঁধুনিগিরি, নয় দাসীবৃত্তি···?

পুষ্প কহিল—তা কেন! নার্সগিরি, মাষ্টারী···এমনি কিছু···

অন্নদা কহিল—ও-কথা মনে হলে আমার আতঙ্ক হয়। বাঙালীর মেয়ে বড় অসহায়, পুরুষ বড় নীচ,··· থাক্ ও-কথা। তুমি তাহলে পুঁটির মার পরিচর্য্যা করো গিয়ে। তবে যাবার আগে যা বলছিলুম···

পুষ্প কহিল— কি?

অন্নদা কহিল—ঐ মোটর বোট···কিনবো? বড্ড সখ হয়েচে।

পুষ্প কহিল—না। মিছিমিছি একটু সখের জন্ত ও বাজে খরচ কেন? বিলাস বাড়িয়ো না। তাছাড়া এটা আহাম্মকি! চড়ার সখ হয় তো ভাড়া করে চড়ো!··· তিনু হালদারের কন্যাদায়ে দু'শো টাকা দিতে হাত উঠলো না···আর এই বোটে···? সখ মানুষের দুদিনেই মেটে গো!···

অন্নদা কহিল—তা কেন? বরাবর যদি সখ থাকে···?

পুষ্প কহিল—ও সখে কাজ নেই। তার চেয়ে ঐ যে সেদিন তোমাদের কথা হচ্ছিল, গ্রামের স্কুলটা যাতে ভালো হয়, কি খাবার জল যাতে ভালো হয়···এ সম্বন্ধে কোনো ব্যবস্থা!···এমন কিছু করো, যাতে পাঁচজনের উপকার হয়—খরচ সার্থক হবে!

অন্নদা কহিল—হুঁ···আচ্ছা, তোমার কথা ভেবে দেখবো···

পুষ্প কহিল—আমি আসি। পুঁটির মাকে বিদায় করি···

কথাটা বলিয়া পুষ্প চলিয়া গেল।

অন্নদা তার পানে চাহিয়া রহিল! হায় নারী, তোমার একটু হাসি, একটু দরদ—তার লোভে অন্নদা কি না সহিতে পারে! তুমি তার পিপাসু বুকে কি অমৃত-নির্ঝর জাগাইয়া তুলিয়াছ!···অন্নদার উপেক্ষিত অব-হেলিত যৌবনকে তুমি কোন্ হারা পথ হইতে, কি ধূলি-জঞ্জালের মধ্য হইতে যে ফিরাইয়া আনিয়াছ!···

কিন্তু দুঃখ এই যে, তোমায় বেশীক্ষণ কাছে ধরিয়া রাখা যায় না! তোমাকে কত কথা বলিবার সাধ হয়··· কত কথা শুনিবার বাসনা—এ বাসনার পরিতৃপ্তি কি কোনো দিন ঘটিবে না? তুমি পরের হইয়া এমনি ভাবে দিন কাটাইবে?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পল্লী-চক্র

বস্তিতলীর পাশ দিয়া উত্তরমুখে যে গলি গিয়
সেই গলির মধ্যে একখানি জীর্ণ এক-তলা বাড়ীতে
বিধবা সম্প্রতি আসিয়া বাস করিতেছেন—জয়মণি দে
স্বামী পঞ্চানন পশ্চিমে চাকরি করিতেন; দেশের
বহু কাল সম্পর্ক উঠিয়াছিল। স্বামীর মৃত্যু ঘটিলে
কন্তা ও স্বামীর যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চয় এবং জীবন-বী
দু'হাজার টাকা লইয়া জয়মণি আসিয়া বহুকাল
পরিত্যক্ত শ্বশুরের ভিটায় আশ্রয় লইলেন।

তাঁর আগমনে পাড়ার দু'-একটি গৃহে চাঞ্চল্যের
হইল। এমন হয়। চিরাভ্যস্ত জীবন-যাত্রায় ন
উপসর্গ ঘটিলে চাঞ্চল্য জাগিবেই। পরিত্যক্ত গৃহ
গৃহ-সংলগ্ন বাগান-পুকুর জ্ঞাতি কেশবের যত্নে একটি
একেবারে গো-চারণের মাঠে ও ডোবায় পরিণত
নাই। কেশব এই আকস্মিক আগমনকে অত্যাচা
সামিল ভাবিয়া বিশেষ অপ্রসন্ন হইল। এ-অপ্রস
রীতিমত বিরক্তিতে দাঁড়াইলে কেশব আ
চাটুয্যে মহাশয়কে কহিল,—তুমি এর বিহিত ক
দাদা···

চাটুয্যে কহিল,—কি হয়েচে?

কেশব কহিল,—বড় বৌ কোথা থেকে এতদিন ব
হুম্ করে এসে বাগান পুকুর সব দখল করে বসলো··
পুকুরে মাছ ছেড়েচি কত, তোমরা জানো তো। তাছা
গোপালে থোপা আমের দশটা কলমে বিশ-ত্রিশ টা
ব্যয় করেচি···

চাটুয্যে হুঁকায় টান্ দিয়া কহিল,—বটেই তো! তু
সে কথা তাঁকে বলেছিলে···?

কেশব কহিল,—বলেছিলুম বৈ কি!

চাটুয্যে কহিল,—তিনি কি বললেন?

কেশব কহিল,—হেসে জবাব দিলেন, এতদিন তি
এর একটি পয়সা উপস্বত্ব ভোগ করেননি। এখন থেকে
নিজেই সব দেখাশুনা করবেন, আর গাছের মাছের দা
দেবেন।

হুঁকায় টান দিয়া চাটুয্যে কহিল—বটে! এতদিন
তুমি দেখাশুনা করলে, তার কোনো দাম নেই?

কেশব প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া উঠিল, কহিল—বল
তো দাদা···

চাটুয্যে কহিল,—তাঁর সহায় কে?

কেশব কহিল,—কাকেও তো দেখি না। তবে
নিজের ভারী প্রখর দৃষ্টি চারিদিকে···দু'চার ঘর
আছে, তাদের বাগিয়ে নিয়েচে···গাছের ফুল্ গেঁপে
পাকলো, না পাকলো, সে-দিকেও কি নজর!

চাটুয্যে কহিল,—হুঁ। ওদের বেয়ত ঐ মহীশ্বর জেলে, রত্না, আর নন্দ…না?

কেশব কহিল,—হ্যাঁ।

চাটুয্যে কি ভাবিল; ভাবিয়া কহিল,—তোমার ভাবনা নেই। কিনারা হবে। রত্না ব্যাটার তো দেনায় মাথা বিকিয়ে আছে সিঙ্গী মশায়ের কাছে। আর নন্দ…? জানো তো…চারিদিকে চাহিয়া কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া কেশবের কাণের কাছে মুখ লইয়া চাটুয্যে নন্দর বিধবা মেয়ের নামের সঙ্গে আর একটা কার নাম গুঁজিয়া দিল।

বৈদ্যুতিক ক্রিয়া বলিয়া বিজ্ঞানে একটা কথা আছে। চাটুয্যের কথায় সেই বৈদ্যুতিক ক্রিয়া ঘটিয়া গেল; এবং চাটুয্যে ও কেশব—দুজনের মুখে-চোখে নিমেষে অমনি আলোর দীপ্তি ফুটিল!

কেশব কহিল,—তোমার উপরই আমার ভরসা, দাদা! বড় বৌ আবার লেখাপড়া জানেন,—দু'পাতা ইংরেজী পড়েচেন…তার ঝাঁজ মনে জেগে আছে বিলক্ষণ।

চাটুয্যে কহিল,—হুঁ! ইংরিজি শিখিয়েই এরা মেয়েদের তেজ বড় বাড়িয়ে তুলচে। ঐ ছাখো না আমাদের অন্নদার পরিবার…ধরাকে সরা দেখে বেড়াচ্ছে। বৌ-মানুষের খিঙ্গিপানা দেখে অবাক হয়ে গেছি!…অন্নদার পয়সার জোর আছে। নাহলে কি আমি এ-সব বরদাস্ত করি? আমাদের চোখের উপর…

কেশব কহিল—নিজেদের বাড়ীর মধ্যে ওরা যা খুশী করুক, দাদা। আমার মোদ্দা বাঁচাও…

চাটুয্যে আশ্বাস দিয়া কহিল,—তুমি দুদিন সবুর করো। এমন চাল চালবো—যে, পঞ্চাননের পরিবার দেশ ছেড়ে পালাতে পথ পাবেন না!

ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া হুঁকায় আর-একটা টান দিয়া চাটুয্যে কহিল,—বাড়ীতে পুরুষ মানুষ কেউ আছে?

কেশব কহিল,—শুধু একটা হিন্দুস্থানী চাকর।

চাটুয্যে কহিল,—মাঝে মাঝে গান শুনি যে হার্মনি বাজিয়ে? গায় তবে কে…?

দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া কেশব কহিল,—তাও জানো না? ঐ মেয়েরা গায়।

চাটুয্যে আবার স্তব্ধ হইয়া কি ভাবিল; ভাবিয়া কহিল,—মেয়েরা? ডাগর মেয়ে?

কেশব কহিল,—ডাগর বৈ কি! মেয়ে ডাগর বলে আমাদের এরা বলেছিল, ও মা, এত বড় মেয়ে…এখনো বিয়ে দাও নি, দিদি? তা বড় বৌ সে কথার জবাবে বললেন, এর মধ্যে বিয়ে কি! ওরা পাশ দেবে; পাশ করে বিয়ে হবে!…

চাটুয্যের হাড় অবধি জলিয়া উঠিল। চাটুয্যে কহিল—পাশ করবে! কেন, পাশ করে চাকরি ক… যাবে নাকি! কথা শোনো একবার! নাঃ, সমাজ… এরা রসাতলে দেবে! ওদিকে ঐ অন্নদার পরিবার, … এদিকে এই পঞ্চাননের গুষ্টি। তা অন্নদার পয়… জোর আছে। তার জোরে সমাজে সে চলে যে… পারে। তোর কি তা সাজে রে বাপু?…কি… অবিনাশ যে…

সহসা অবিনাশ আসিয়া উদয় হইল। অবিনা… কহিল,—এই যে কেশব। পঞ্চাননের বাড়ী সন্ধ্যার প… রোজ গান গায় কে হে? হার্মনিয়া বাজিয়ে…?

চাটুয্যে কহিল,—সেই কথাই হচ্ছিল। এ f… মেলেচ্ছ উপদ্রব শুরু হলো বলো তো গ্রামে! পঞ্চাননে… বিধবা পরিবার ফিরে এসেচেন। তা আসুন—গাঁয়ে বৌ…আমরা পাঁচজন আছি…দেখবো, শুনবো! কি… এ ফিরিঙ্গি চাল তো ঠিক হচ্ছে না…। আমরা… মেয়েছেলে নিয়ে ঘর করি। তারা এতে শাসিত থাকবে কেন?…ডাগর মেয়ে বলচো…গান গায়…ছেলেদের রীত চরিত্তির ভালো থাকবে কেন?

অবিনাশ এ-দিকটা চিন্তা করে নাই…চাটুয্যের কথায় সহসা সমস্তার অন্ধকার দেখিল। ঠিক কথা! দুই চোখ কপালে তুলিয়া সে কহিল,—ভাববার কথা বটে!…পাঁচুর মেয়েরা গায়?

অবিনাশ কেশবের পানে চাহিল। কেশব কহিল,—হ্যাঁ, পাঁচুদার দুই মেয়ে…

চাটুয্যে কহিল,—বৌমাও গান্ নিশ্চয়। তাই জিজ্ঞাসা করছিলুম, এ কি বিধবার আচার? সেখানে নাম লিখিয়ে খিরিষ্টান্ হন্নি তো? কি বলো হে কেশব?

কেশব চতুর্দ্দিকে চাহিয়া যেন কিসের সন্ধান করিল। নিমেষের জন্য! তার পর কহিল,—…পাঁচুদার শ্রাদ্ধ করলে কাশীতে…

অবিনাশ কহিল—তুমি সেবারে তীর্থ করতে গিয়ে ওদের বাসায় উঠেছিলে না? এসে সুখ্যাতি করলে, কি আদর-যত্ন!

কেশব ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল—রেখে দাও আদর-যত্ন! আমি কি ধর্ম্মশালায় থাকতে পারতুম না? ও খাতির হলো শুধু পয়সা দেখাবার জন্য…ভড়ং। তাছাড়া পুকুরের খপর, বাগানের খপর…

চাটুয্যে হুঁকায় মরণ-টান্ দিয়া কহিল—নিশ্চয়!…

কেশব কহিল,—যাক, মোদ্দা আমার একটা উপায় করে দিয়ো। ঐ বাগান-পুকুর…ও হলো আমার প্রাণ—নারকোল গাছও অনেকগুলো। তাছাড়া লিচু গাছ, জাম গাছ,—নবাবগঞ্জের বাজারে পাঠিয়ে দু'পয়সা হতো। ও ছাড়তে হলে আমি মরে যাবো।

অবিনাশ কহিল—কিন্তু ও বাগান পাঁচুর তো ?

চাটুয্যে কহিল—পাঁচুর হলেও দখল তো সে ছেড়ে দিয়েছিল। আজ প্রায় বারো বছরের উপর কেশব দেখাশুনা করচে—ওর দখলে আছে। কেশবের স্বত্ব এখন। এ আইনের কথা। এখন ভালো কথায় তিনি না ছাড়েন, কেশবকে মামলা রুজু করতে হবে।

কেশব শিহরিয়া উঠিল। মামলা! কেশব কহিল—কিন্তু মামলার খরচ জোগাবো কোথা থেকে, দাদা? ছাঁপোষা মানুষ!

চাটুয্যে কহিল—খরচের জন্য ভেবো না। আমাদের হারাধন উকিল আছে। তার অসাধারণ বুদ্ধি। সব সে ঠিক করে দেবে'খন!

কেশব কহিল,—তুমি কিন্তু বড় বৌকে জানো না! তোমার আদালত-ফাদালতের নামে ভয় পাবার লোক নয়। পাঁচুদার কাছ থেকে কে নাকি টাকা ধার করেছিল, দিচ্ছিল না, তা ওখানকার বাস তুলে আসবার সময় তার নামে আদালত থেকে ডিক্রী করে এসেচে,—কোর্ট থেকে মাসে মাসে কিস্তীবন্দীর টাকা আসচে। তার পর জীবন-বীমা করেছিল পাঁচুদা...সে টাকাও তো পাই-পয়সা-সমেত আদায় করে এনেচে।

হুঁকা হইতে মুখ তুলিয়া চাটুয্যে কহিল—আরে, সে হলো ছাতুর দেশ, ছোলার দেশ—তারা আদালতের মর্ম কি বোঝে? আমাদের এ বাঙলা দেশ, এখানকার লোকের কথাই আলাদা। সাক্ষী শিখিয়ে এমন মামলা দাঁড় করাবো...হুঁঃ! বৌমা ঘুঘু দেখেচেন, ফাঁদ দেখেন নি তো...

ভক্তি-সহকারে চাটুয্যের পায়ের ধূলা লইয়া কেশব কহিল—বড় ঘা খেয়েই তোমার কাছে আসচি দাদা। এমন বন্দোবস্ত করে দিতে পারো যদি...যে, বড় বৌ গাঁ ছেড়ে আবার পশ্চিমে ফেরেন?...আমার বড় আশার জমি ওটুকু। ভেবেছিলুম, বেশ হয়েচে, ওটা আমারি আয়ত্তে এলো...ছাখো দিকিন্, কোথা থেকে আমার পাকা ধানে মৈ দিয়ে আমার সে সাধে বাদ সাধচে! পাঁচুদার যদি ছেলে থাকতো, তাহলেও বুঝতুম—এ দুই মেয়ে...বিয়ে দিলে তারা শ্বশুর-বাড়ী চলে যাবে। তখন কোথাকার অজানা জামাইরা এসে বুকের উপর চেপে বসবে!

চাটুয্যে চুপ করিয়া দম লইল, তার পর ভ্রূভঙ্গী-সহকারে কহিল—কেন ভাবচো? চুপ করে বসে ছাখোই না! যা বলি, করো। চিরকাল বৈষয়িক মামলা-মকর্দ্দমা করে এলুম, এই গ্রামে বাস...আর এ সামান্য বিপদে তোমায় সাহায্য করবো না? এও কি কথা হলো?

অষ্ট পরিচ্ছেদ

স্বামীর অধিকার

সেদিন বেলা প্রায় আটটা, কোথা হইতে অন্নদা ডাকিল,—ওরে মোনা...

মোনা আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। অন্নদা ব[...] তোর মা-ঠাকরুণ কোথায় রে? একবার ডাক[...]

মোনা কহিল—মা-ঠাকরুণ বাড়ী নেই।

বাড়ীতে নাই! এই সকালে...? অন্নদ[...] বিস্ময় বোধ করিল, তার পর কহিল,—কোথায় তলিদের বাড়ী নাকি?

মোনা কহিল—না।

অন্নদা কহিল,—তবে?

মোনা কহিল—গাঙ্গুলি মশায়ের বাড়ী [...] সেখান থেকে গাঙ্গুলি মশায়ের মেয়ে এসেছিল...

অন্নদার মেজাজ তিক্ত হইয়া উঠিল। অন্নদা[...] —কেন? সেখানে কার গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা কর[...] পড়লো আবার? ভালো জ্বালায় পড়েচি!... তুই ডেকে দে...

মোনা চলিয়া গেল। অন্নদা গায়ের জাম[...] একটা ইজিচেয়ারে বসিয়া পড়িল। পাশেই জানলা। খোলা জানলার মধ্য দিয়া গৃহ-সংলগ্[...] নের গাছপালা দেখা যাইতেছিল। ঝাঁকড়া লি[...] সবুজ রঙের অজস্র লিচু দেখা দিয়াছে...তা[...] গলায় ছোটো কটা তাল মুণ্ডমালার মত ঝুলি[...] বাগানের ওধারে পুকুর। পুকুরে কারা বাসন মাজি[...] তাদের গল্পের কলরব ভাসিয়া আসিতেছিল। ভাবিতে বসিল, তার দুর্ভাগ্যের কথা। গৃহ-সু[...] ভাগ্যে নাই! পুষ্পর সঙ্গে কথা কহিয়া আরাম[...] এমন অজানা কল্পলোকের পরিচয় সে আলাপে[...] যায়! অথচ তাকে এখন নাগালের মধ্যে পাও[...] অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে...! গ্রামে ফিরিবা[...] অন্নদার সান্নিধ্যই ছিল পুষ্পমঞ্জরীর কাম্য-বস্ত[...] বসিয়া কত কথাই হইত! শুধু কি কাজের কথ[...] কত ব্যাপারের মধ্য দিয়া তার জীবনের এ অপ[...] ফুলের গন্ধে পাখীর গানে কি স্নিগ্ধ নিবিড় ম[...] ভরিয়া উঠিতেছিল! কত জ্যোৎস্না রাত্রে [...] চড়িয়া দুজনের সেই নিরুদ্দেশ ভ্রমণ...সে যে আরব-রজনীর অভিসার-যাত্রার বৈচিত্র্যে ভরপু[...] উঠিত! গ্রামে আসিয়া বসিতে সে কল্প লোকে[...] পরশ কোথায় যে উবিয়া ঝরিয়া গেল! রাজ্যের যত কাজ...পুষ্পমঞ্জরী কোথা হইতে এ-সব আনে! শুধু বহিয়া আনিলেও কথা ছিল, তাকে অন্নদা কাছে পাইত! তা'ও নয়। কোথায়

াড়ীতে কি ঘটিল, আর পুষ্পমঞ্জরী অমনি সেখানে ুটিবে! সময়ের বাচ-বিচার নাই···কিছু না! এ কি রের বৌয়ের কাজ? সাধে কি পাঁচজনে পাঁচ কথা কয়? । যে পাগলের কাণ্ড! অথচ পুষ্প পাগল নয়!···

একটা চিন্তা ধ্বক্ করিয়া বুকে ঘা দিল। তবে কি ন্নদা পুষ্পর মনের মত নয়? তার বয়স হইয়াছে, সে ্তি-ব্যস্ত কাজের লোক বলিয়াই পুষ্পর মনের গোপন কাণে প্রবেশের অধিকার পায় নাই? তাই সে এমন···

সত্য আসিল, কহিল,—আমায় ডেকেছিলেন?

অন্নদা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উদাস-নেত্রে সত্যর ানে চাহিল, কহিল—হ্যাঁ। তোর মা-ঠাকরুণ বুঝি গাঙ্গুলিদের বাড়ী গেছে! একবার খপর দিতে হবে··· দরকার আছে।

সত্য কহিল,—যাবো?

অন্নদা কহিল,—যাবি বৈ কি।

সত্য কহিল,—মা-ঠাকরুণ এখানকার ব্যবস্থা সব ্ গেছেন। আসতে কত দেরী হবে জানেন না, ই···

অন্নদা সত্যর পানে চাহিল, বিরক্তি-ভরে কহিল,— তর্ক করবে? ওদের বাড়ী কি বৃষোৎসর্গ-শ্রাদ্ধ ্ছে যে, তোমার মা-ঠাকরুণের গিয়ে সভায় না দাঁড়ালে চলবে না! কথাটা বলিতে বলিতে রাগ চড়িয়া । রাগিয়া অন্নদা কহিল,—গিয়ে তোর মাঠাকরুণকে ব, এখনি তাঁকে আসতে হবে। তাঁকে নিয়ে তবে াসবি। যদি তোর মা-ঠাকরুণ না আসেন তো বাড়ী ফিরবি না—বুঝলি?

ত্য সহসা মনিবের ক্রোধ-ভরা কঠিন বচনে বিস্মিত হইল এবং নিরুপায়ভাবেই মা-ঠাকরুণের কাছে াইয়া চলিল।

ন্নদা রাগে ফুলিয়া ঘরে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে । নিজের উপরও রাগ প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। এ তারি দোষ! সে পুরুষ-মানুষ, সে স্বামী··· ্রণের প্রাচুর্য্যে স্ত্রীর কোথাও এতটুকু অভাব বা রাখে নাই, মিষ্ট নম্র ব্যবহারে নিজেকে পুষ্পর পায়ের উপর লুটাইয়া দিয়াছে! পুষ্প তাই হয়। নিজের চলাফেরা অবধি পুষ্পর াপনাকে এতখানি সমর্পণ করিয়া দিয়াছে— এত তেজ, এমন দম্ভ! অথচ বিবাহের পূর্ব্বে অসহায়, যার বুকে কি যাতনার কাঁটা ফুটিয়া ছিল! ভাগ্যে অন্নদা দয়া করিয়া করিল! নহিলে কোথায় কোন্ হতভাগার ্বা দাসীবৃত্তি করিয়া দিন কাটিত! ভালো না জন্য একটু কৃতজ্ঞতাও কি পুষ্পর নাই? নাঃ, বড় বেশী পাইয়াছে। আর প্রশ্রয় নয়!

নিজের স্বামিত্বের অধিকার লইয়া অন্নদা এবার তার দাবী কড়া-ক্রান্তিতে আদায় করিবে! অন্য পাঁচ ঘরে স্বামীর দল যেমন মাথা উঁচু করিয়া থাকে, সেও তেমনি থাকিবে এবং স্ত্রীর কাছ হইতে সেবা-পরিচর্য্যা উশুল করিবে পুরা রকমে। তাহাতে পুষ্পর মনের কোথাও বাধিতেছে কি না, সেদিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া! সে স্বামী, স্বামী···স্বামীর অধিকার পুরাপুরি বিস্তার করিয়া চলিবে,···সংসারের চতুর্দ্দিকে···সকলের উপর, সকল বিষয়ে!···

মোনা আসিয়া বলিল—ইটখোলা থেকে সরকার-মশায় এসেচেন···

অন্নদা কহিল—এখন যেতে বল্···আমার ফুরসৎ নেই।···

মোনা চলিয়া গেল।···

টেবিলের উপর একরাশ মাসিক-পত্র ছিল। তারি একখানা টানিয়া অন্নদা দু'চার পাতা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। সহসা একটা পাতায় মন কেমন আটকাইয়া গেল···একটা গল্প। সে-পৃষ্ঠায় এমনি লেখা ছিল,—

নিমেষ ঘরে ফিরিল,—শুষ্ক, দীন মূর্ত্তি। শীলা একখানা হাতপাখা লইয়া আসিয়া স্বামীর পাশে বসিল। পাখার বাতাস গায়ে লাগিতে নিমেষ মুখ তুলিয়া চাহিল, কহিল—পাখা রেখে দাও শীলা···আমার মত হতভাগা···তার কথা শেষ হইল না—একটা নিশ্বাসের ঝড়ে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। নিমেষের দীর্ঘ চুলগুলা ঘর্ম্মাক্ত ললাটে লেপিয়া ছিল; হাত দিয়া সেগুলা সরাইয়া শীলা কহিল,—একটু জিরোও···কথা এখন থাক্। বাতাসা ভিজিয়ে রেখেচি, আনি, খাও দিকিনি···

শীলা পাখা রাখিয়া উঠিল এবং অচিরে পাথর-বাটিতে বাতাসার শরবৎ আনিয়া স্বামীর মুখের কাছে ধরিল, কহিল,—খেয়ে ফেলো সবটুকু···

শীলার পানে চাহিয়া নিমেষ কহিল,—কোথায় পেলে বাতাসা? বাতাসাও তো ঘরে ছিল না···

শীলা কহিল,—সিঙ্গীদের বাড়ী সত্যনারাণ হয়েছিল কাল···ওরা দিয়েছিল। ফলও আছে···তুমি ঠাণ্ডা হও। এনে দি। তার পর···

নিমেষ কহিল,—অভাগার অন্ধকার বুকে এই আলোর রেখাটুকু ভাগ্যে ভগবান রেখেছিলেন, নাহলে এ দুনিয়ায় বাস করতে পারতুম না!

শীলা কহিল,—ও-সব কথা থাক্ না গো···

শীলা নিমেষের মুখে পাথর-বাটি ধরিল। একটু শরবৎ পান করিয়া নিমেষ কহিল,—আর পারবো না শীলা···তুমি এটুকু খেয়ে ফেলো। আমার মত তোমারও দরকার আছে কিছু মুখে দেবার।

শীলা কহিল,—সে আমি দিয়েচি। এর সবটুকু তুমি খাও—দুষ্টুমি করো না···

নিমেষ কহিল,—দুষ্টুমি কি! তার অধরে মৃদু হাসি।

শীলা কহিল,—শুধু আমায় খাওয়াবার জন্ত—কিন্তু তা হবে না। এটুকু তোমায় খেতেই হবে। আমি ছাড়বো না···

নিমেষ কহিল,—বেশ, আর একটু খাচ্ছি···কিন্তু তার বেশী নয়। তোমায় বাকীটুকু খেতে হবে।··· আমায় ভালো জিনিষ দিতে তোমার যেমন আনন্দ হয়, আমারো তেমনি আনন্দ হয়, শীলা। এটুকু কেন যে বোঝো না ···

নিমেষের কণ্ঠস্বর গাঢ় আর্দ্র হইয়া আসিল। স্বামীর এ প্রীতির স্বরে শীলার বুক দুলাইয়া অমৃতের তরঙ্গ বহিয়া গেল। কিসের দুঃখ তার? স্বামীর এই ভালোবাসা···জগতের সহস্র অভাব-দুঃখ···এ ভালোবাসার কাছে ম্লান-মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। আর নিমেষ কি ভাবিতেছিল? নিমেষ ভাবিতেছিল, এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও এই শীলাকে পাশে দিয়াছ ভগবান, একেবারে তার বুকের উপর—ইহাতে তার দুনিয়ায় সব পাওয়া হইয়াছে! একদিকে শীলা, অপর দিকে সমগ্র পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য-বিলাস···সব···সব···

পড়িতে পড়িতে অন্নদা যেন চেতন-হারা হইল। এ কি স্বর্গ-সুখের ছবি লেখক আঁকিয়াছে! তার বুক ভারী হইয়া উঠিল। এমনি ভালোবাসা···কি, এর সিকির সিকিও যদি তার অদৃষ্টে মিলিত! এই দরদ, এই প্রীতি···ইহার বিনিময়ে সে তার সকল ঐশ্বর্য্য, সব সম্পদ এখনি তুচ্ছ তৃণগুচ্ছের মত ঐ বাতাসের মুখে উড়াইয়া দিতে পারে!···

গল্পের কথা, আর এমনি চিন্তার মধ্যে সে যখন তন্ময়, তখন সহসা একেবারে পুষ্পর কণ্ঠস্বর জাগিল—কি গো, খপর কি—এমন জোর তলব···?

সে স্বরে চমকিয়া অন্নদা পুষ্পর পানে চাহিল। পুষ্পর ললাট ঘর্ম্মসিক্ত···এতখানি পথ দ্রুত হাঁটিয়া আসিয়াছে। সে শ্রমে তার কান্তি আরো কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে!

পুষ্প হাসি-মুখে কহিল—এতখানি বিস্ময় এখনো! আজ প্রথম আমি তোমার চোখের সামনে এসে উদয় হইনি তো! সেই উষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা, আমি অকুন্ঠিতা···

এ-স্বরে বহুদিনকার একটা হারানো স্মৃতি বুকের কোণে ফুল-গন্ধের মত জাগিয়া উঠিল! পুষ্পকে প্রথম দেখার দিনে অন্নদার সত্যই এমনি বিস্ময়-বিভ্রম জাগিয়াছিল···তার পর কত দিন, কত সন্ধ্যা, কত পূর্ণিমা রাত্রি যে সে-বিভ্রম দোলা দিয়া গিয়াছে—এখানে আসিতেই তার বিস্ময় [illegible]

রোমান্স আর কবিতার পাতাগুলা একবার [illegible] ফেলিয়া তার কঠিন নীরস প্রবন্ধ-ছাপা পৃষ্ঠাগুলা আজ তার সামনে মেলিয়া ধরিয়াছে! একেবারে অপাঠ্য যত পৃষ্ঠা!

অন্নদা কহিল,—আমার কাছে আজও তুমি বিভ্রমের তেমনি উৎস হয়ে আছো, পুষ্প···

পুষ্প হাসিল, হাসিয়া কহিল,—কবিত্ব এখন ব্যাপার কি? হঠাৎ আমায় লোক দিয়ে পাঠিয়েচো কেন?

অন্নদা কহিল,—আমায় আজই একবার যেতে হচ্ছে···বিশেষ কাজ। সেখানে পাঁচ-[illegible] দেরী হবে।

পুষ্প কহিল,—এখনি ট্রেণ?

অন্নদা কহিল,—না। তবে এখন কলকাতায় যাচ্ছি[illegible] তাই সেই যে মোটর বোটের কথা বলেছিলুম···[illegible] আমার সঙ্গে যদি যেতে, তাহলে দেখতুম···

পুষ্প কহিল,—না। মোটর বোটের কোন [illegible] নেই। অহেতুক বিলাস!···এইজন্ত ডেকেছি[illegible] তাহলে আমি এখন যেতে পারি?

অন্নদার অভিমান হইল, এবং চকিতে সে অভি[illegible] রোষের রক্ত-শিখায় জ্বলিয়া উঠিল। অন্নদা কহি[illegible] আর কি ঘরে মন বসে না তোমার?

পুষ্প কহিল,—ছেলে-মানুষি করো না, ছি! গা[illegible] দের বাড়ী ওদের বুড়ীকে দেখতে আসচে। এখনি আসবে। বুড়ীর মা অনেক করে বলে পাঠিয়ে[illegible] মেয়েকে সাজিয়ে দেবার জন্ত। সাজাতে সা[illegible] আমি চলে এসেচি···

অন্নদা পুষ্পর হাত ধরিয়া তাকে কাছে বস[illegible] কহিল—তোমার যাওয়া হবে না। যে ডাকবে, বাড়ীতেই অমনি···এই সকালেও? তোমার কি সংসার নেই?

হাসিয়া পুষ্প কহিল,—সেজন্ত তুমি ভেবো[illegible] তোমার সংসারের এবেলার সব কাজ নিষ্পন্ন করে[illegible] আমি গেছি। সে-বিষয়ে কিছু বলতে পারবে না···

অন্নদা কহিল,—কিন্তু সংসারের এই চাকা ঘুরা[illegible] শুধু তোমার কাজ নয়!···

বাহিরে কে ডাকিল—মাসি-মা···

হাত ছাড়াইয়া পুষ্প কহিল,—ছাড়ো, যাই। ভাই এসেচে ডাকতে।···কে? খাঁদু?

বাহির হইতে সে কহিল—হ্যাঁ। মা [illegible] পাঠিয়ে দিলে;

পুষ্প কহিল,—তুমি যাও, বাবা। আমি যাচ্ছি···

পুষ্প কহিল,—আমি এখনি যাচ্ছি, বাবা। তুমি ...গে, চুল তো বাঁধা হয়ে গেছে...আমি গিয়েই ... পরিয়ে দেবো। তার পর পুষ্প স্বামীর পানে ..., কহিল—আসি। তুমি খেয়ে দেয়ে কলকাতায় ...। আমি সব ঠিক করে রেখেছি...যে মুহূর্ত্তে বলবে, ...পাবে।

অন্নদা কহিল—আমি কোথাও যাবো না। অন্নদার ...তীব্র অভিমান।

পুষ্প তা লক্ষ্য করিল, করিয়া কহিল,—ভালোই। ...আমি চললুম, আর দেরী করতে পারচি না।

অন্নদা কহিল,—না, তুমি আমার কাছে বসো। আজ ...বড্ড ইচ্ছা হচ্ছে তোমার কাছে পাবার জন্য...

পুষ্প কহিল,—কলকাতায় যাওয়া?

...ঝালো স্বরে অন্নদা কহিল,—যাবো না। কোথাও ...না আমি।

পুষ্প কাঠ হইয়া দাঁড়াইল; স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর ...চাহিয়া কহিল,—খুব মান হয়েচে, দেখচি। ভালো ...এখন ও-মান ভাঙ্গতে পারচি না...ফিরে এসে ...।

পুষ্প গমনোদ্যত হইল। অন্নদা কহিল,—শোনো...

পুষ্প দাঁড়াইল, কহিল,—কি?

...কহিল—আমার তাচ্ছল্য করে এই যে তোমার ...র-ব্রত-সাধন চলেছে...এ কেন, আমি তা ...

...কোন কথা না বলিয়া স্বামীর পানে চাহিয়া ...অন্নদা এক মুহূর্ত্ত থামিয়া বেশ ক্রোধ-তপ্ত স্বরে ...—এ তোমার নাম কেনবার প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা... ...নী হতে চাও...নাম কিনতে চাও!

...প্রাণে এ কথা বেশ জোরে আঘাত করিল। ...বার চক্ষু মুদিল; তার পর নিশ্বাস ফেলিয়া ...কহিল,—তাই! ঠিক কথা বলেচো!

...কথাটুকু! এটুকু বলিয়া পুষ্প ধীরে ধীরে ঘর ...ক্রান্ত হইল। অন্নদা আহত সর্পের মত রুদ্ধ ...দাঁড়াইয়া রহিল। তার চোখের সামনে ...মুক্ত আকাশ এক নিমেষে পাণ্ডুর বর্ণে ভরিয়া ...

...কম্পিত বক্ষে পথে বাহির হইল। রৌদ্র- ...ত হাস্তে উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে...পুষ্পর ...ক্ষ্য ছিল না। তার কাণে বাজিতেছিল ...সেই স্বর,—তুমি নাম কিনতে চাও...!

...ভাবিল, কথাটা সত্যই বলিয়াছ...কিন্তু যদি. ...তে, এ নাম কিনিতে চলিয়াছি কিসের জন্য... ...! বেদনার নিশ্বাস তার বুকে ছোট-খাট ঝড়ের ...তুলিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

আগুন

রাগ করিয়া অন্নদা বাড়ীতেই রহিয়া গেল। পুষ্প ফিরিল বেলা এগারোটার পর। গাঙ্গুলি-বাড়ীতে যারা পাত্রী দেখিতে আসিয়াছিল, তাদের জল-খাবারের আয়োজনও তাকে করিতে হইল। সব কাজ চুকিলে সকলের কি সাধ্য-সাধনা—লক্ষ্মীটি, এখানে দুটি খেয়ে যাও...

পুষ্প মৃদু-হাস্তে কহিল—আজ থাক, ভাই। আর একদিন এসে খাবো'খন—পাকা দেখার দিন।...আজ আসি, বাড়ীতে একটু কাজ আছে...

পুষ্প চলিয়া আসিল। অন্নদার সেই কথাগুলা তার মনে সারাক্ষণ কাঁটার মত বিঁধিতেছিল।

গৃহে ফিরিয়া পুষ্প দেখে, পাচিকা তখনো বসিয়া আছে। পুষ্প কহিল,—বাবু কখন্ খেলেন?

পাচিকা কহিল—খান্‌নি...

—খান্‌নি! পুষ্প সবিস্ময়ে কহিল—তাঁর বেরিয়ে যাবার কথা যে...না খেয়েই বেরিয়েছেন?

পাচিকা কহিল—বাবু তো বেরোননি...মোনা যে এই জল নিয়ে গেল মা, এই একটু আগে...

পুষ্প আর সেখানে দাঁড়াইল না; দোতলায় নিজের ঘরে আসিয়া দেখে, অন্নদা ঘরে নাই। পুষ্প মোনাকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিয়া জানিল, অন্নদা বাড়ীতেই আছে; বাহিরের ঘরে খেলার আসর বসিয়াছে।

পুষ্প কহিল—বাবুকে বল্ গে যা, এসে খেয়ে যেতে...

মোনা আদেশ-পালনে ছুটিল। পুষ্প আসিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল।...

মোনা তখনি ফিরিল, ফিরিয়া কহিল—বাবু বললেন, তাঁর শরীর ভালো নেই, খাবেন না। আপনাকে খেতে বললেন...

পুষ্প কহিল—হুঁ...আচ্ছা, তুই যা...

মোনা কহিল—বামুন-মাকে বলবো, আপনার খাবার দিতে?

পুষ্প বেশ সহজ সুরেই কহিল—না। তোরা খেগে যা। আমার খাবার দিতে হবে না। আমি ওদের বাড়ী থেকে খেয়ে এসেচি। মোনা চলিয়া গেল।...

পুষ্পর সারা চিত্ত দুলিয়া উঠিল। রাগ! কিসের রাগ? কি অপরাধ সে করিয়াছে, যার জন্য...অন্যায়! এ অন্যায় রাগের প্রশ্রয় সে কখনো দিবে না! কিন্তু... বিপদ এই যে, এ লইয়া চেঁচামেচি করা চলে না! একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে জানালার ধারে বসিয়া পড়িল— এবং শুম্ হইয়া রহিল...বাহিরে আকাশে তখন রৌদ্রের উপর কোথা হইতে দু'চার টুকরা মেঘ আসিয়া কালো আবরণ টানিয়া দিতেছিল।

টী পার্ট দিয়া বাংলা নাটকের যবনিকা-পাত করিলেন। ভগ্নীর জন্ত তিনি যাহা করিলেন, তিনি বলেন, বাংলা সাহিত্যে তা কীর্ত্তিত থাকা উচিত। দেখি, আমি কোন লিখিয়ের কাছে কথাটা খুলিয়া বলিব।

ইতি

বিনোদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইজ্জৎ-রক্ষা

পোষ্যের সংখ্যা, বাজার-দর, সংসারের ব্যয় হইতে সুরু করিয়া কলিকাতায় মোটর-গাড়ীর নম্বর অবধি হু-হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে! বাড়ে না শুধু বিনোদের আয়! এই কথাটাই আকারে-ইঙ্গিতে গৃহিণীকে সে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু গৃহিণী পণ করিয়াছিলেন, কিছুতেই বুঝিবেন না! আজও সেই কথা উঠিয়াছিল। মাঝে হইতে অফিসে যাইবার সময় গৃহিণীর চোখের একরাশ অশ্রু আর মুখের ভর্ৎসনা তাকে ভোগ করিতে হইল।

ট্রামে বসিয়া সমস্ত ব্যাপারটাকে আগাগোড়া সে ভাবিয়া দেখিল,—গৃহিণীর মনে তার সম্বন্ধে যে ধারণাগুলা জন্মিয়াছে, তার অর্থ সংক্ষেপে এই দাঁড়ায় যে, বিনোদ ঘোর স্বার্থপর, নিষ্ঠুর, ইতর, নীচ ও কৃপণ! এই যে বিশেষণগুলা গৃহিণী তার প্রতি প্রয়োগ করিলেন, এগুলি দৃষ্টান্তদ্বারা প্রমাণ করিয়া দিতেও তিনি ছাড়েন নাই! শুধু তাই নয়। অপর স্ত্রী-পুরুষের প্রসঙ্গে বিনোদ বহুবার স্বামি-স্ত্রীর সাম্যের ইঙ্গিত করিলেও কাজের বেলায় নিজে যে সেই সনাতন পথে চলিয়া থাকে, অর্থাৎ স্ত্রীর স্বাধীন সত্তা নাই, স্বামীর সে ছায়ামাত্র—এ কথাও গৃহিণী প্রচুর অশ্রু-বর্ষণের মধ্য দিয়া পুনঃপুনঃ প্রকাশ করিলেন। কবে তাঁর ছোট খুকীর জন্ত নাকি এক বোতল হরলিক্স মিল্ক আনাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন, সে কথা বিনোদ কাণে তোলে নাই, তার ফলে দুর্ভাগ্যের পরাকাষ্ঠা-স্বরূপ তাঁর রুগ্না খুকীকে বার্লির জল পান করিতে হইয়াছিল; আর একবার তাঁর ছোট ছেলের জন্ত একটা সিল্কের পাঞ্জাবি চাহিয়া চাহিয়াও যখন পান নাই, তখন অগত্যা সে বেচারীকে একটা জীর্ণ পুরাতন সাটিনের কোট পরাইয়া বন্ধু-গৃহে নিমন্ত্রণে লইয়া গিয়াছিলেন; তার উপর ছেলে মেয়েরা বায়োস্কোপ দেখিবার জন্ত কাঁদিয়া বায়না লইলে বিনোদ তাদের কখনো বায়োস্কোপ দেখায় নাই; তপসী মাছের দিনে ছুটো তপসী মাছ তারা খাইতে পায় না; ল্যাঙড়া আম যে অমন শস্তা গেল, লোকের বাড়ীর দাসী-চাকরদেরও আম খাইয়া ল্যাঙড়ায় অরুচি ধরিল — বাচ্চারা অথচ [illegible]

[illegible] সখ মিটাইতে…নয়নের অশ্রু প্রচুর বেগে প্রবাহিত তাঁর বক্তব্যটুকুকে শেষ করিতে দেয় নাই।

ট্রামে বসিয়া বিনোদ সেই সব কথাই ভাবিতে আয় তো ঐ কাট্‌থোট্ কোম্পানির অফিসে মাসক মাহিনা, একশো পঁচাত্তরটি টাকা! এই টাকায় বামুনের মাহিনা আছে, একটা চাকর, তার উপর লাইফ-ইনসিওরেন্স…আর যখন-তখন ঔষধ-পথ্য! মেয়েদের সংখ্যাও অল্প নয়! প্রায়ই একটি করিয় অতিথির আবির্ভাব ঘটে! বিনোদ বুঝাই প্রথমটীকে মানুষ করার বেলায় যতখানি সমারো গিয়াছিল, এখন তা করা সম্ভব নয়। বয়সও বাড়িয়া চলিয়াছে। কেবলি মনে হয়, মেয়াদ বুঝি ফুরাইয়া আসিল! কবে ডাক প তার উপর সামনেই বড় মেয়েটি দশ বছরে পা দিয় তার পানে চাহিলে আতঙ্ক হয়! বড় জোর তিনটে বছর। তার পর……

তার পর যে কি, সে কথা ভাবিতে বিনোদের অঙ্গ শিহরিয়া ওঠে! ছেলে[illegible] স্কুলের মাহিনা, বেথুনের গাড়ীভাড়া ও মাহিনা। কি করিয়া চাল সে-ই জানে। ইদানীং লুকাইয়া কর্ম্মকার কো অফিসে সে সন্ধ্যার সময় গিয়া খাতা পাড়িয়া ক্রেডিটের অঙ্ক ফাঁদিয়া মাসে আরো চল্লিশটি জোগাড় করিয়া লইয়াছে। বাপের নাম বজা বাহিরের ঘরে সকালে চায়ের আসরও পাড়িয় হয়! বাদলার সন্ধ্যায় চিঁড়ে-ভাজা, ফুলুরি, পাঁপর এ বিলাইতে হয়! চিনির দাম চড়া! ব্রুক বণ্ডের দাম বাড়িয়াছে…তবু ইজ্জৎ বাঁচাইবার দায়ে সেগু করিয়া দিতে পারে না! বামুন ঠাকুরকে মাস বারো টাকা গণিয়া দিবার সময় বুকের পাঁজর ভাঙিয়া মড়মড় করিয়া ওঠে! তাকে বিদায় দিবা মনে কতখানি যে প্রবল হয়…এ কথাও সে না গৃহিণীর কাছে পাড়িয়া দেখিয়াছে! স্বাস্থ্যহ সমেত পাচকের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তু ভিতরের সূক্ষ্ম অর্থ না বুঝিয়া গৃহিণী সঝঙ্কারে জ দিয়াছেন,—বাপ রে, থাক্, ওকে কিছু বলো ন আছে, তবু সব দিকে ছাতা ধরচে! ছেলেমেয়ে গল্প বলে খাওয়ানো, দেখা-শোনা,…রাঁধ বাজারে ছুটচে!…ও গেলে হাঁড়ি ধরবে কে কচিকাচা দেখা-শোনা আছে। আমার দ্বা চলবে না।

এই অবধি শুনিয়াই বিনোদ ভয়ে মরিয়া উপর এ কথা বলা চলে না [illegible]

...াই সে ভাবে, স্বার্থপর বটে আমরা এই পুরুষের ! কত খাটিয়া, কত দুশ্চিন্তা বুকে বহিয়া তোমাদের ...পন গৃহকোণে কি আরামে রাখিয়াছি, তা তো এক-... ভাবিয়া ছাখো না! তর্ক তুলিতে পারো এই ...যে, অন্তদের গৃহিণীর অনেক গহনা আছে, মিত্র-...র রকমারি সৌখীন শাড়ীর অন্ত নাই; আর ...! ...তাহা হইলে সে কথার কি-বা উত্তর দেয়? ...র দিতে গেলে শ্বশুর-মশায়ের দূর-দৃষ্টিহীনতার ...রিতে হয়! আর তা করিলে সুফলই বা কি ...!

...স্তার জাল গুটাইয়া আজিকার ঘটনার উপর সে নিক্ষেপ করিল। এই যে এতখানি অশান্তি আর ...ন্তি...এর কারণ? অতি তুচ্ছ ব্যাপার!

শ্রীমতী শৈলবালা গুপ্তা গৃহিণীর বাল্যসখী; এক ...জনে পড়িতেন। আজ তিনি ব্যারিষ্টার অমল গুপ্তর ... আর তিনি...? কিন্তু এটা নিছক অদৃষ্টের কথা! ...া বিনোদের শ্বশুর মহাশয় জাতিতে বৈদ্য নন্; ...। অমল গুপ্ত বৈদ্য। বিনোদের শ্বশুর মহাশয় ...ইলেও নয় অদৃষ্টকে টানিয়া আনিয়া দু'টা অভিযোগ ...া চলিত!

শ্রীমতী শৈলবালার কন্যা প্রীতির বিবাহ হইবে এই ...মাসে। বিনোদ আহারে বসিলে গৃহিণী বলিলেন, ...র বিয়ে গো। আমি একখানা গহনা দিতে চাই কিম্বা ব্রেশলেট, বা এমন কিছু, যার দাম অন্ততঃ ...টাকার কম হবে না!

...য়া সে শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু সে ভাব গোপন ... বিনোদ বলিল,—আচ্ছা, হবে'খন। এত তাড়া ...!

...হিণী বলিলেন—তোমায় দিয়ে হওয়ানো তো! ...র ভরসা করি না আমি! তেরো মাসে বছর হয় ...ল,— তা তোমায় আর কিছু করতে হবে না, শুধু ...টুকু ...। আমি ন-দাকে দিয়ে হরিদাসের কিম্বা ...র হইতে থেকে কতকগুলো গহনা আনিয়ে তার মধ্যে ...ছন্দ করে নেবো। একশো টাকার বেশী তোমার ...না। তার বেশী যদি কিছু চাই তো...গৃহিণী ...থ করিলেন।

...ত বলিল—ছাখো, কেন ফ্যাসাদ বাধাচ্ছো! ...র রাজী শাড়ী-টাড়ী দিয়ো। তাতে কিছু খারাপ ...ছিল তোমার বন্ধু তোমাদের অবস্থা জানেন। ...র,—র ব্যারিষ্টার নই!

...বিল, বলিলেন—না। তা বলে আমি অত লোকের ...এ টে হতে পারবো না। শ্বশুরের নাম-ডাক একটা ...তো। তার উপর প্রীতি যখন আমার মাসীমা বলে, ...তুলিল।

বিনোদ বলিল—কিন্তু একশো টাকা...চট্ করে আমি এখন পাই কোথায় বলো দিকিন...?

গৃহিণীর স্বর অভিমানে ভরিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—টাকা চাইলেই তোমার যত ওজর! তবুও নিজের জন্য কিছু চাচ্ছি না...কখনো চেয়েছি? বলো... লোকে তাদের স্ত্রীদের কত কি যে দেয়...গৃহিণীর চোখ সজল হইল। তিনি একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

বিনোদ প্রমাদ গণিল; কহিল,—বড্ড টানাটানি যাচ্ছে এখন...হরতকী-বাগানের বাড়ীর ভাড়া দু'মাস পাইনি। ভাড়াটে ভারী জ্বালাচ্ছে। নিজেই তাগাদায় বেরুচ্ছি...তাছাড়া দুদিন বাদে লাইফ-ইন্সিওরান্সের টাকা দিতে হবে...

আর বলিতে হইল না। গৃহিণী তাঁর সুদীর্ঘ বিবাহিত জীবনের ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলিয়া বাছা বাছা লাইন তুলিয়া বিনোদকে দেখাইয়া দিলেন, যখনি তিনি সামান্য কিছু খরচের ফর্দ্দ বিনোদের কাছে দাখিল করিয়াছেন, তখনি একটা না একটা ওজর তুলিয়া তাঁকে হঠাইয়া সে কাতর জর্জ্জরিত করিয়াছে! দু'একটা প্রতিবাদ তুলিবামাত্র তাঁর স্বর তপ্ত হইল, চোখে অশ্রু ঝরিল!...সে-ও নিরুপায় নিশ্চিন্ত মনে অন্নের গ্রাস ঘন ঘন মুখে তুলিয়া অপ্রিয় আলোচনার পথ বন্ধ করিয়া দিল এবং ভোজন সারিয়া অফিসের অভিমুখে যাত্রা-কল্পে নিঃশব্দে বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল। দুঃখ হইতেছিল এই ভাবিয়া যে একশো টাকার দাম এক গরীব কেরাণীর পক্ষে যে কতখানি, তা গৃহিণীকে কোন দিনই বুঝাইতে পারিল না। গৃহিণী সদাই অপ্রসন্ন! রবিবাবু কোথায় যে সেই লিখিয়াছেন, 'অপ্রসন্ন প্রেয়সীর মুখ সব সুখ সব হাসি লুপ্ত করি দেয়।' কথাটা কত সত্য, হাড়ে হাড়ে তার মত আর কেহ বুঝিয়াছে বলিয়া সে জানে না! গৃহিণীর বুকে এটুকু সমবেদনা যদি না জাগে তো...

কিন্তু তা বলিয়া গৃহ ছাড়িয়া বানপ্রস্থ অবলম্বনও তো সহজ ব্যাপার নয়! বিশেষ সে পথের সঠিক সংবাদ যখন বিনোদের জানা নাই!

ট্রাম লালদীঘির ধারে পৌছিল। নামিয়া সে অফিসে চলিল। সেখানে কাজ, কাজ, কাজ। কাজ আছে বলিয়াই বাঙালীর ছেলে স্ত্রীর গঞ্জনা খাইয়াও গৃহের অশান্তি ভুলিয়া কোন মতে নিজেকে সামলাইয়া লইবার অবসর পায়! না হইলে গল্প বা উপন্যাসের নায়কের মত নিষ্কর্ম্মা হইলে সংসারে আজ বাঙালীর টিকিও দেখা যাইত না! সুদূর হরিদ্বারের ওদিকে টিকির জঙ্গল গজাইয়া উঠিত!

রাজ্যের ফাইল ঘাঁটিয়া আগুল্প লিখিয়া মনটাকে সে

৬

রবিবার

মাননীয়া

শ্রীযুক্তা পদ্মাবতী দেবী মহাশয়া সমীপেষু

দেবি,

আপনি লক্ষ্য করিয়াছেন কি না, জানি না—কিন্তু আপনার উপদেশ-মত আমি মিস্ত্রী ডাকাইয়া পাঁচিলের রন্ধ্র মেরামত করাইয়াছিলাম। অনুমতি করেন তো আমি মিস্ত্রীকে সাক্ষ্য ডাকিতে পারি। আমার দুর্ভাগ্য, মেরামত-করা পাঁচিলে আবার সেই রন্ধ্র পূর্ব্ববৎ প্রকাশ পাইয়াছে। ভৌতিক উৎপাতে আমি বিশ্বাস করি না। আশা করি, আপনিও শিক্ষিতা মহিলা, আপনিও তাহা বিশ্বাস করেন না। আমার বাংলার সদর ফটক সর্ব্বক্ষণ বন্ধ থাকে—যেহেতু আমি বেড়াইতে বড় একটা বাহির হই না। দরিদ্র বাংলা সাহিত্যের সেবক আমি—একটু-আধটু সাহিত্য-সেবা করিয়াই আমার অবসর যাপন করি। আমার পক্ষে প্রত্যহ মিস্ত্রী খরচ করিয়া পাঁচিল মেরামত কঠিন হয়।

তাছাড়া একান্ত মিনতি-ভরে একটি নিবেদন আছে—আপনার ভগ্নীর মানসিক ব্যাধির কথা শুনিয়া চিন্তিত আছি। রাত্রি জাগিয়া সঙ্গীত-সাধনায় সে ব্যাধি বাড়িতে পারে। সুনিদ্রা মানসিক ব্যাধির উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক! দু'রাত্রি তাঁকে সঙ্গীত-সাধনা হইতে বিরত রাখিয়া সুনিদ্রা-সাধনার চেষ্টা করিতে উপদেশ দিয়া দেখিবেন, তাহাতে তাঁর ব্যাধির উপশম হইবে নিশ্চয়!

আমার এ পত্রে স্পর্দ্ধার পরিচয় পাইলে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইব। কারণ, স্পর্দ্ধা জিনিষটা আমার ধাতে মোটেই খাপ খায় না। ইতি

বিনয়াবনত

শ্রীবিনোদলাল হালদার

৭

মহাশয়

আপনার সদুপদেশের জন্য ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু সম্প্রতি সে উপদেশ-গ্রহণের কোনো প্রয়োজন দেখিতেছি না।

আপনি সাহিত্যিক, এ কথা বিশ্বাস হইতেছে। আমরা দুটী নিঃসঙ্গ মহিলা। আমাদের সুখ-দুঃখের মধ্যে একজন অপরিচিত পুরুষের এভাবে অযাচিত প্রবেশ করিতে আসা একটু বিসদৃশ ঠেকে—অন্ততঃ আমাদের কাছে। আপনি বাঙলা সাহিত্যের সেবা করেন, লিখিয়াছেন—সেজন্য মনের ... কোন ...

কোনো পরিচয়ের সম্ভাবনা যদি জাগিয়া থা... হইলে তাকে প্রশ্রয় দিবেন না। মধুপুরের হা... গজায়, ফুল ফোটে, স্বাস্থ্য ফেরে। তা বলিয়া মানসিক বৃত্তিও যে গজাইবে—এমন ভাবি... আমার তরুণী ভগ্নীর মানসিক ব্যাধির প্রতিষেধ... আপনার উপদেশ-দানের চেষ্টা—এ'ও আপনার ... প্রকাশ! তিনি রূপসী, স্বীকার করি। কিন্তু কোনোদিন চর্ম্ম-চক্ষে দেখিবেন, এমন কথা যদি ... থাকেন তো সে ভুল!

যাই হোক—আপনার পাঁচিল সম্বন্ধে আর কথা লিখিয়া আমাদের অখণ্ড অবসরটুকুকে ... করিবেন না। ইতি

শ্রীপদ্মাবতী

৮

মাননীয়াসু

বাধ্য হইয়া আবার পত্র লিখিতে হইল।

কাল রাত্রে আমার লেখা একখানি নাটকের ... লিপি চুরি গিয়াছে। পাঁচিলের ধারেই আপনার ... হাতায় সে খাতার মলাট পাওয়া যাইতেছে। আ... চাকর-বাকরের যে এমন প্রবল সাহিত্যানুরাগ ... তাহা জানা ছিল না। দয়া করিয়া তাদের ... জিজ্ঞাসা করিবেন, পাণ্ডুলিপিখানি তাদের পড়া হ... কি না? যদি পড়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে তা... দয়া করিয়া সেখানি ফেরত দেয়। কেননা, উহা... পাইলে আমার তৃতীয় অঙ্ক লেখা ঘটিতেছে না। তৃ... অঙ্কের লেখা শেষ হইলে তাদের তাহা পড়িবার ... পাঠাইব, অঙ্গীকার করিতেছি।

ঘরোয়া ব্যাপারের জন্য পুলিশের সাহায্য ... আদৌ বাঞ্ছনীয় মনে করি না। ইতি

বিনয়াব...

শ্রীবিনোদলাল হাল...

৯

শুক্রবার

মাননীয়াসু

আমার করুণ মিনতি শুনিয়াও আপনার ... দ্রবীভূত হইল না—আমার দুর্ভাগ্য! কাল ... আপনার বাংলায় সঙ্গীত-সাধনা-কালে আপনা... ভগ্নী যে সঙ্গীতটি গাহিতেছিলেন, সেটি এই... —আমি রচিত—ঐ নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে পদ্মিনীর সখী গান সেটি।

নিজের লেখা ...

তাখানি এখন ফেরৎ পাইতে পারি কি ? নাটক-ভিনয়কালে ও গানটির ঐ সুরই বজায় রাখিব য় করিতেছি। কাল আবার মিস্ত্রী আসিবে। রন্ধ্র ও ভরিবে। অতএব আজ রাত্রে আমার তার মধ্যে খাতাখানি অনায়াসে নিক্ষেপ করা রে। ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। ইতি

বিনয়াবনত

শ্রীবিনোদলাল হালদার

শনিবার

ল একটু ব্যস্ত থাকার জন্য পত্রের উত্তর দিতে পারি একটা কথা ঠিক বলিয়াছেন, আপনার খাতাখানি চাকররাই আনিয়াছিল। দুধ গরম করিবার জন্য জ্বালার প্রয়োজন ছিল—অথচ ঘরে স্পিরিট ছিল াগজও ছিল না। কাজেই আমার চাকর আপনার হইতে মোটা খাতাখানা লইয়া আসে। ঐ গানটা ামতে বাঁচিয়া গিয়াছে। খাতাখানি অগ্নি-সঞ্চারে ড; এবং সে আগুনে দুধ গরম হইয়াছে। সে দুধ রক হওয়ায় মানসিক ব্যাধিগ্রস্তা আমার তরুণী ভগ্নী পানে অনেক-খানি সুস্থ ও সবল হইয়াছেন। ার খাতাখানি যে এমন বলকারক, তা বোধ হয় নিও জানিতেন না! রাজপুতানার বীরত্ব-কাহিনী ! ! যাই হোক, এ কথা আপনি 'প্রশংসা-পত্র'-রূপে ার নাটকের বিজ্ঞাপনে অকুতোভয়ে ব্যবহার করিতে ন।

াজ আমাদের গৃহে ভগ্নীর শারীরিক সুস্থতা-লাভের ক্ষে একটু চা-পানের আয়োজন করিতেছি—আপনি দিলে বাধিত হইব।

আর একটি কথা,—মধুপুরের সুরকি ব্যবহার করিতে-বলিয়াই রন্ধ্র বারবার বে-মজবুত হইতেছে। শুধু ই লেখেন, এ সামান্য সংবাদটুকু জানেন না—র্য্য !

শ্রীপদ্মাবতী দেবী

রবিবার

হে

আমার বাংলা ছাড়িয়াছি কাল রাত্রি হইতে। প্রতি-পদ্মাবতী দেবীর সঙ্গে পরিচয় হইয়া গিয়াছে। ...সম্পর্কীয় নন। সম্পর্কে আমার প্রিয়তমার ...ী হন্‌। নাম কমলা। তিনি pseudo-nym ...লেন, এবং তাহার সুগভীর উদ্দেশ্য ছিল। ... সংগ্রহ করিয়া তাঁকে লইয়া ...

আমি। সেই কলহ-সূত্র ধরিয়াই অবশেষে পূর্ব্ব-কলহে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি!

আমার নাটকখানি তিনিই আত্মসাৎ করেন। ঐ রন্ধ্র-পথে প্রত্যহ তিনি আমার গৃহে আসিতেন। আমি এ কথা জানিতে পারি নাই।

নাটক-চুরির কথা তোমাকে পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। এ তাঁরই কীর্ত্তি। তিনি আমার লেখা সেই গান গাহিয়া প্রথমে আমার হৃদয়ক্ষেত্রকে সরস ও উর্ব্বর করিয়া তোলেন—তার পর চা-পার্টিতে নিমন্ত্রণ! আমি সব অপরাধ ভুলিয়া গিয়াছি। বাংলা সাহিত্য-সুলভ পরিচয়-লিপ্সা! পদ্মাবতী দেবীর ইঙ্গিত ভারী মর্ম্মান্তিক হে! আমরা পুরুষগুলো ওদিক হইতে অতি মৃদু আন্দোলনেই সাড়া দিতে সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত! নিষ্ঠা—ও একটা কথার কথা! পুরুষ-চিত্তের মস্ত দুর্ব্বলতা এইখানে!

যাই হোক—গান শুনিয়া গায়িকার প্রতি আমার মন সরস হয়। তিনি যে কোনো উপন্যাসের নায়িকা নন, আমারই হৃদয়-বিহারিণী বিনোদ-কায়িকা,—ইহাতেই পরম আশ্বস্ত হইয়াছি! না হইলে complications-এর আর অন্ত থাকিত না! প্রিয়তমা বলিলেন—কথার হুল্‌ এমন গায়ে বিঁধলো যে বিবাগী হয়ে চলে এলে একে-বারে মধুপুরে!...

আসল কথা, আমার সাহিত্য-সাধনায় প্রিয়তমার আদৌ সহানুভূতি নাই! দৈনিকে-সাপ্তাহিকে রাবিশ জড়ো করা ছাড়া আমার আর কাজ নাই! আর আমি যে গল্প উপন্যাস বা নাটক লিখি, এটা তাঁর মনঃপূত নয়। কারণ, লিখিলেই তার সমালোচক জুটিবে; এবং সমালোচকের লগুড় আমার কোমল চিত্তে বড় বেশী বাজিবে, ইহাই তাঁর আশঙ্কা!

তার পর আরো কথা শুনিলাম, তুমি ঠিকানা দিয়াছ এবং পাশের খালি বাংলার জোগাড়ও তোমার মারফৎ! পামর—অথচ এমন নির্ব্বিকার নির্লিপ্তভাবে আমার সঙ্গে পত্র-বিনিময় করিতেছ, সে কথার আভাস মাত্র প্রকাশ করো নাই!...

যাক্‌—দাম্পত্য কলহের পরিণতি সেই একই ভাবে—বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া! সত্য কথা—আমিও হাঁফাইয়া উঠিয়াছিলাম। নাটক লিখিয়া কোন রকমে মনকে দাবিয়া রাখিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম, ওদিক হইতে একটু মৃদু ইঙ্গিত আসিলেই তাঁবু তুলিব! বুঝি নাই, প্রিয়তমাও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন!

আরো দু'চার দিন এখানে আছি। বেশী দিন এখানে থাকা চলিবে না। নারীর মন এমন! ছেলেমেয়েদের ফেলিয়া আসিলেন কি ...িয়া? আশ্চর্য্য! তা ছাড়

তালগাছের পাতাগুলায় নিমেষে বাতাসের মর্ম্মর জাগিল। পুষ্প ঐ আকাশে আপনার চিন্তার মালা ভাসাইয়া দিল…জীবনের সরল প্রবাহ সকল বাধা কাটাইয়া কি স্বচ্ছন্দ গতিতে বহিয়া চলিয়াছিল! প্রথম দু'বৎসর প্রেমের কুঞ্জে বসিয়া আদর-প্রীতি-সোহাগের অজস্র মধুর রাগিণী…সে রাগিণীর রেশ্ বুকে বহিয়া এখানে এই সংসার-যজ্ঞশালায় ব্রতচারিণীর মত সে আসিয়া দাঁড়াইল। দিকে দিকে কুসংস্কারের আঁধার…তার বুকে দরদের দীপশিখাটুকু এ আঁধার ঘুচাইবার কি বাসনায় উজ্জ্বল প্রদীপ্ত করিয়া কত বড় আশা সে গড়িয়াছিল! কি কু-বচন আর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ চতুর্দ্দিকে হা-হা করিয়া উঠিল—সে তা গ্রাহ্যও করে নাই! স্বামীর দ্বিধাহীন একান্ত প্রেমের আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া অবিচল নির্ভীক চিত্তে সে-বিদ্রূপ—সে কু-বচন দু'হাতে ঠেলিয়া প্রসন্ন হাস্যে জগতের পথে চলিয়াছিল…আজ কোথা হইতে কি তুচ্ছ খেয়াল লইয়া স্বামী তার স্বচ্ছন্দ জীবন-প্রবাহে এ বিরোধের বাঁধ তুলিয়া ধরিতে চান্!…এ প্রবৃত্তি তাঁর কোথা হইতে জাগিল!

সহসা একটা কথা মনে উদয় হইল, ঐ অলস বেকার সঙ্গীর দল…মানুষের যারা ভালো দেখে না, ভালো করে না—কোথাও কেহ ভালো কিছু কাজ করিলে, তার একটা বিশ্রী কদর্থ বাহির করিয়া দুনিয়ার আলোকে কালো করিয়া দেয়! এখানে আসিয়া নিত্য ঐ জটলা করে…তাস, পাশা, দাবা, আর সেই সঙ্গে তামাক…এ ছাড়া দুনিয়ায় আর কোথাও কিছু আছে বলিয়া মনে ভাবে না!

দাসী হাবুর মা আসিয়া কহিল,—ও মা, সর্ব্বনাশ হয়েছে গো…

পুষ্প চমকিয়া উঠিল, কহিল—কি রে? কি হয়েছে?

দাসী কহিল,—ঐ ও-পাড়ায় বেজায় আগুন লেগেচে গো মা! বেম্মা ঠাকুরের কি ক্ষিদে, বাবা! কি আগুনই লেগেচে গো…সবাই ছুটেচে হুড়হুড় করে…

পুষ্প কহিল,—সত্য? মোনা?

দাসী কহিল—ঐ যে ভাত ফেলে ছোটবার নেগে…

দাসীর কথা শেষ হইল না। পুষ্প কহিল,—শীগ্‌গির ডাক্ ওদের…

দাসী তখনি হাঁক পাড়িল—অরে অ মোনা, অ সত্য, শুনে যা, মা ডাকচে…

সত্য ছুটিয়া আসিল, কহিল,—কি মা?

পুষ্প কহিল,—কোথায় চলেছিস্?

সত্য কহিল,—ঐ বত্তা জেলেদের পাড়ায় ভারী আগুন লেগেচে, মা…দেখতে যাচ্ছি।

পুষ্প কহিল,—মজা দেখতে যাচ্ছিস! লজ্জা করলো না বলতে?…

সত্য অবাক! পুষ্প কহিল,—যা, তোরা যে ক'জন আছিস…কলসী, বালতি…যা পাস্, নিয়ে যা শীগ্‌গির আগুন নিবোতে যা। যে নিবুতে পারবে, সে বখশিস পাবে আমার কাছে…

সত্য খুশী-মনে ছুট দিল। পুষ্প কহিল,—হাবুর মা, তুমি শীগ্‌গির তলিদের বাড়ী খপর দাও…যে ক'জন পুরুষ-মানুষ আছে, সবাই যেন এখনি আগুন নিবুতে যায়…বলো গিয়ে, বৌমার হুকুম! শীগ্‌গির যাও…

—যাই মা…বলিয়া দাসী চলিল তলির গৃহের উদ্দেশে।

পুষ্পও স্থির থাকিতে পারিল না। ব্লাউশ খুলিয়া রাখিয়াছিল, তাড়াতাড়ি সেটা গায়ে পরিয়া সে-ও সদরের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। বাহিরের ঘরে খেলা তখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে…সে জয়-নাদ তার কাণে বাজিল…যেন বাজের শব্দের মত! মূঢ় অলসের দল এখন খেলায় মত্ত…আর ওদিকে এক গরীবের যথা-সর্ব্বস্ব যাইতে বসিয়াছে! সে একবার থমকিয়া থামিল, তার পর বেশ রুদ্র তালে পা ফেলিয়া বৈঠকখানার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। খেলার উন্মত্ততার মধ্যেও রাখালের দৃষ্টি পড়িল পুষ্পর পানে। অন্নদার গায়ে ঠেলা দিয়া রাখাল কহিল,—ওহে, বৌমা বুঝি ডাকচেন…

ঠেলা পাইয়া অন্নদা চোখ তুলিল, চোখ তুলিবামাত্র দেখে, দ্বারের সামনে দাঁড়াইয়া পুষ্প…

পর্দ্দা না মানিলেও পুষ্প বৈঠকখানার আসরে কোনো দিন আসিয়া দাঁড়ায় নাই। আজ তাকে এখানে আসিতে দেখিয়া অন্নদা বিস্মিত হইল, কহিল,—খপর কি? তুমি এখানে?

বেশ শান্ত সহজ স্বরে পুষ্প কহিল—ও-পাড়ায় খুব আগুন লেগেচে আর তোমরা এখন আসরে বসে খেলা করচো! একবার উঠে গেলে বোধ হয় ভালো হয়…গরীবদের যথাসর্ব্বস্ব যেতে বসেচে…

অন্নদা কহিল—আগুন লেগেচে?…কোন্ পাড়ায়?

পুষ্প কহিল—কে বত্তা আছে, তাদের ঘরে…

রাখাল কহিল—কোনো চিন্তা নেই, বৌমা…অনেক লোক আছে—নিবোবে'খন। গাঁয়ে অমন লাগে।

তার মুখের কথা লুফিয়া অবিনাশ কহিল—পাড়া-গাঁয়ে খোড়ো ঘরে আগুন লাগা নিত্যকার ব্যাপার, বৌমা…তার জন্ত আপনি ব্যস্ত হবেন না!…

এ কথায় রাগে পুষ্পর আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া গেল। কাপুরুষ, অলস, চাটুবাক্যই সব সার করিয়াছে! [illegible] তার স্বামী?…

স্বামীর পানে চাহিয়া পুষ্প কহিল—তুমি এ[illegible] দেখবে না?

অন্নদা কহিল—আমায় বলচো?

পুষ্প কহিল—হ্যাঁ।

অন্নদা কহিল—তা, আমি কি দেখবো? চাকর-বাকরকে পাঠিয়ে দাও না···এতক্ষণে তারা আগুন নিবিয়ে ফেলেচে, বোধ হয়! এ-কাজে এরা পাকা···

এই তার স্বামীর কথা! শুনিয়া পুষ্পর চিত্ত একেবারে মর্মাহত হইয়া পড়িল। সে বিনা বাক্য-ব্যয়ে সে স্থান ত্যাগ করিল।

রাখাল কহিল—ভালো হলো না হে। বৌমা নিজে নিজে গেলেন, বোধ হয়!

অবিনাশ কহিল—ইংরিজী-পড়া মেয়েদের সবতাতেই তাহাহুরি নেবার ইচ্ছা। এ কিন্তু পুরুষালি চাল, অন্নদা···তা ভাই স্পষ্ট বলবো—হাঁ।

হারাণ কহিল—কোন্ দিন ছাখো, ঐ কংগ্রেসে বক্তৃতা দিতে না ছোটেন!···একটু রাশ টেনে চলো হে অন্নদা···বাঙালীর ঘর, বাঙালীর সংসার!

অন্নদা কাঠ হইয়া রহিল—নিমেষের জন্য; তার পর কহিল—থ্যালো, থ্যালো···

অবিনাশ একটা টিপ্পনীর লোভ ছাড়িতে পারিল না, কহিল—শাস্ত্র-বাক্য ঠেলবার নয়। সেই যে কথা আছে, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা···অন্নদার তাই হয়েচে!

অন্নদা এ-কথার জবাব দিল না; পাশা কুড়াইয়া দান ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিল—এই লাগে! পেচে বারো···

বৈঠকখানায় খেলা আবার জমিয়া উঠিল।

পুষ্প ঘৃণা ভরে সদরে আসিয়া দাঁড়াইল। সদরে চাটুয্যের সঙ্গে দেখা···চাটুয্যে বিড়-বিড় করিয়া বকিতে-ছিল—ব্যাটা ছোটলোক···কেমন হয়েচে!···

এইটুকু বলিয়ামাত্র সামনে চাহিয়া দেখে, পুষ্প···ভয়ে আর কথা আর বাহির হইতে পারিল না। পুষ্প চাটুয্যের পাশ কাটাইয়া পথে আসিল।···

ঐ যে···অদূরে আকাশ একেবারে সঘন ধূমে আচ্ছন্ন! পটাপট্ বাঁশ ফাটিতেছে···চকীপাকে জ্বলন্ত বংশখণ্ড ছড়াইয়া আকাশে উঠিতেছে! এই দিন-দুপুরে এ কোন্ মহাকালী আতস-বাজীর সমারোহে দেওয়ালির অগ্নি-লীলায় মাতিয়া উঠিয়াছে! এই দিনে দুপুরে···ধ্বংসের, সংহারের এ কি প্রলয়-নৃত্য! লক-লক লেলিহান অগ্নি-শিখার এ কি রুদ্র লীলা!···

পুষ্প আসিয়া দেখে, পথে বেশ ভিড় জমিয়াছে। ইতর লোকেরা কেহই দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখিতেছে না···যেমন সাধ্য, জল আনিয়া চালে দিতেছে। জ্বলন্ত চালার উপর দাঁড়াইয়াছে দুই-চারিজন—তাদের হাতে কলসী···মায়া ত্যাগ করিয়া নীচে হইতে লোকে জল-ভরা কলসী উপর দিকে ছুড়িয়া দিতেছে, তারাও সে কলসী তেমনি তৎপরতায় ধরিয়া লইতেছে!···বাঁশ-ফাটার শব্দ, লোকের কোলাহল, নারী ও শিশুর আর্ত্তনাদ···চারিদিকে বিষম বিশৃঙ্খলা।

পুষ্প দেখিতে আসিল···মোনা? সত্য? তারা কোথায়?···তাদের খুঁজিতে তার দৃষ্টি পড়িল, জলন্ত চালার কাছে তিনটি নারীর উপর···সুন্দরী! একজন বিধবা, শুক্লবসনা, আর দুটি তরুণী···

পুষ্প আসিয়া তাদের পাশে দাঁড়াইল। একজন জুয়ান পুরুষ বড় জল-ভরা বাল্‌তি তুলিয়া চালে দিল···পুষ্প তাকে ডাকিল,—ক্ষীরোদ···

লোকটিকে পুষ্প চেনে···তলিদের বাড়ী সেদিন তাকে দেখিয়াছিল, চটকলে কাজ করে। ক্ষীরোদ কহিল—কেন বৌমা?

পুষ্প কহিল,—সত্য, মোনা—তারা আসেনি?

ক্ষীরোদ কহিল—দেখেছি মা···তারা জল বইচে। সার-বন্দী লোক দাঁড় করিয়ে দিয়েচি থাকে-থাকে···হাতাহাতি জল চালান করচি···পুকুরটা একটু দূরে কি না!

পুষ্প কহিল—আমি কিছু করতে [illegible] না···?

হাসিয়া ক্ষীরোদ কহিল—পারো বৈ [illegible]! গরীবের মাথার যে ছাউনিটুকু গেল, তা আবার [illegible] দিয়ো···তাহলেই সব করা হবে।

ক্ষীরোদ বালতি লইয়া ছুটিল···পুষ্প দাঁড়াইয়া রহিল, আর তার চোখের সামনে আগুনের সঙ্গে মানুষের এই দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রাম চলিতে লাগিল।

বিধাতা সহসা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। সেই যে ছোট মেঘের টুকরা জমিতেছিল, সেগুলা কখন যে জোট বাঁধিয়া মাথার উপর ঘন কালো হইয়া উঠিয়াছে, এ [illegible]যোগে কেহ তা লক্ষ্য করে নাই! তবু মেঘেরা [illegible]র কাজ করিয়া চলিয়াছিল। সেই মেঘ অজস্র ধা[illegible] জল ঢালিতে সুরু করিল! মস্ত ঐরাবত যেন শুঁড়ের সাহায্যে মন্দাকিনীর ধারা ছিটাইল! আগুন সে-জলে শক্তি রক্ষা করিতে না পারিয়া নৈরাশ্যের ধূমে দিগন্ত আচ্ছন্ন করিয়া নিবিয়া গেল···

সেই বিধবা আসিয়া পুষ্পর হাত ধরিলেন, কহিলেন,—এসো মা···জলে ভিজো না···

সে স্পর্শে কি মমতা, কি দরদ! মার স্মৃতি পুষ্পর বুকে ভাসিয়া উঠিল। পুষ্প নিরাপত্তিতে বিধবার সঙ্গে চলিল।···

জীর্ণ গৃহ···কিছু কিছু সংস্কার হইতেছে; তার উপর কুশলীর হাত···জীর্ণ বাড়ী দীর্ঘ অযত্ন অবহেলার পর স্নেহের স্পর্শ পাইয়া যেন প্রসন্নতায় ঝলমল্ করিতেছে!

বিধবা পুষ্পর পরিচয় লইলেন—নিজের কথাও সংক্ষেপে বলিলেন, এ দুটি তাঁর মেয়ে···বড়র নাম হেমলতা, ছোট স্নেহ!

হেমলতা কহিল—গঙ্গায় নাইতে যেতে আপনাদের বাড়ী দেখেছি···অমন বাড়ী এ-গ্রামে নেই।

সস্নেহে পুষ্প কহিল,—যেয়ো ভাই আমাদের ওখানে···আমি একা থাকি। আমিও আসবো তোমাদের বাড়ী।

এমন সময় হাউ-হাউ করিয়া রতা জেলে আসিয়া ডাকিল,—মা···

বিধবা কহিলেন,—কে? রতন! কিছু রক্ষা করতে পারলি বাবা?

রতা ক্রোধে হুঙ্কার তুলিল—তুমি আমায় মাপ করো মা···আমি কিন্তু এর শোধ নেবো। এ ঐ চাটুয্যে বামুনের কাজ। বামুন বলে পরিচয় দেয় পাজীটা! কেশব ঠাকুর তার শরণ নিয়েচে···

বিধবা বাধা দিয়া কহিলেন—বামুন মানুষ রে···অমন দুর্ব্বাক্য বলিস্ নে···পাপ হবে।

কেশব কহিল,—বামুন, না, চামার! এ যে আমি জানি, মা···আমায় শাসিয়েছিল, বলেছিল, তোর মা-ঠাকরুণকে হঠাৎ আজ মাথায় তুলেচিস যে! চিরদিন খাজনা জোগালি কেশব ঠাকুরকে—আর আজ? তা আমি বলুম, মালিকের হাতে তুলে দি। তাতে বললে—কিসের মালিক! দখলী-স্বত্বে এ সবের মালিক কেশব ঠাকুর। এ নাকি আইনের কথা···

বিধবা কহিলেন,—এখন থাম্ বাবা। পরে আমি সব শুনবো।

রতন কহিল,—না মা, এখন শোনো। না বললে পরাণটা আমার ঠাণ্ডা হবে না। আমি বলুম, ও-সব আমি জানি না ঠাকুর মশায়—মাকেই আসল মালিক জানি। তেনাকে পেয়েচি যখন, তখন তেনার হাতেই দেবো। তা আমায় বললে, আচ্ছা বেটাচ্ছেলে, তোর ভারী তেজ হয়েচে, ও তেজ ভাঙ্গচি···

বিধবা কহিলেন,—তাতেই তুই এত-বড় কথা বলিস, বামুন মানুষের নামে?

রতন কহিল,—তুমি জানো না, ওনার কাজই ঐ। এখন আবার বল পেয়েচে ঐ গাঙ্গুলি-বাড়ীর পয়সায়। ওখানে ওনার বোটুকখানায় মোসাহেবি করে বেড়ায়···দু'চার পয়সা হাতে পায়···

এ-কথা শুনিয়া পুষ্প ঘরের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল, কহিল,—আমায় সব বলো তো। এ চাটুয্যে মশাইয়ের কাজ···?

পুষ্পকে দেখিয়া রতন কণ্ঠস্বর শান্ত করিল, কহিল,—হ্যাঁ বৌ-মা···

পুষ্পর মনে হইল, ঠিক! বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় চাটুয্যেকে সে দেখিয়াছে তো তারি গৃহে প্রবেশ করিতে! সে-ই তবে···? কিন্তু মানুষ এমন দুর্বৃত্ত হইতে পারে? ভদ্র বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া···?

পুষ্প কহিল,—এখন তুমি একটু ঠাণ্ডা হও। তোমা[...] যা লোকসান হয়েচে, আমায় বলো। আর ঐ চাটুয্যে[...] যদি এ-কাজ করে থাকে, জেনো, তার প্রতিকার হবে[...] গ্রামে সত্যি কি মানুষ নেই?

রতন কাঁদিয়া কহিল,—মানুষ কোথায় বৌ-ঠাকরুণ[...] চিরটা কাল গরীবদের মাড়িয়ে পিষে দিন কাটিয়ে চলেছে[...] সকলে!

হেমলতা কহিল,—থানা-পুলিশ নেই রতন? [...] তো ইংরেজের রাজত্ব...পাঠান-মোগলের নয়···

রতন কহিল—থানা-পুলিশ কি গরীবের জ[...] দিদিমণি?

পুষ্প কহিল,—তুমি স্থির হও। তবে এ কথা ব[...] না যে গাঙ্গুলি-বাড়ীর বল পেয়েচে!

হেমলতা কহিল,—তোর ছেলেপিলেদের কোথা[...] রেখে এলি? আমাদের এখানে নিয়ে আয়। যা বলচি[...] এ যদি চাটুয্যে মশায়ের কাজ হয়, তাহলে সাবধা[...] হওয়া দরকার।

পুষ্প কহিল,—ঠিক কথা।

রতন কহিল,—ওদের ডেকে দি। তোমাদের চা[...] ধরেই আছি···গরীব মানুষ, থানা-পুলিশ জানি [...] মা। আমার আশ্রয় ঐ ছিচরণ, ভরসাও ঐ···

বিধবা কহিলেন,—বৃষ্টি থামলে ওদের নিয়ে আস[...] তুই ওদের কাছে এখন যা।

রতন চলিয়া গেল। পুষ্পর পানে চাহিয়া বি[...] কহিলেন,—এসো মা, তোমার সঙ্গে দুটা কথা ক[...] দেশ এমন হয়েচে যে কোনো দিকে তাকানো যায় ন[...] যেন, দেশে এসে মস্ত অপরাধ করেচি!···

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অশান্তির বীজ

বৃষ্টি থামিল প্রায় দু'ঘণ্টা পরে। বৃষ্টি থামিতে [...] কহিল,—তাহলে আজ উঠি। আবার আসবো।

জয়মণি কহিলেন,—এসো মা। এখানে এসে [...] নির্ব্বান্ধব বাস করচি! কারো কাছে কোন অ[...] করিনি, তবু কেউ ভুলেও তত্ত্ব নিতে আসে না কখ[...] ···এই সব গরীব বেচারারা আছে, তাই। নাহলে [...] হতো, জেলখানায় বাস করচি।

পুষ্প কহিল,—আমায় আর ও-কথা বলবেন [...] আমিও পশ্চিমে কাটিয়েচি ছেলেবেলা···এখানকার হ[...] ···এসে দেখি, কি বিষিয়েই আছে! এক এক [...] ভাবি, এই কি আমাদের সোনার বাঙলা!

হেমলতা কহিল,—যাদের ছোট লোক বলি, এ[...]

...াদেরই দেখি, তবু যা প্রাণ আছে...নাইলে ভদ্র ...য়ুন-কায়েত? সর্ব্বক্ষণ খুঁৎ ধরচে, মনে সদাই ...সন্তোষ...কি যেন সব চায়, তা যেন আর কিছুতে ...াচ্ছে না!

পুষ্প হাসিল, হাসিয়া কহিল—যা বলেচো ভাই। ...া, তোমরা আমার ওখানে যাবে তো?

হেম ও স্নেহ দু'জনেই ঘাড় নাড়িয়া কহিল,—যাবো ...নিশ্চয়...

পুষ্প বিদায় লইয়া গৃহে ফিরিল।...বাহিরের ঘরে বাবুদের কলরব চলিয়াছে। সত্য কাঠের ট্রে বহিয়া ...সিয়াছিল...

পুষ্প কহিল—কি রে?

সত্য কহিল,—বাবুদের চা দিয়ে এলুম...

পুষ্প কহিল,—বটে।...আচ্ছা, যা...

সত্য চলিয়া গেল। পুষ্প গিয়া একেবারে বৈঠকখানা-...রে দাঁড়াইল। অন্নদার সামনে চায়ের পেয়ালা...সে ...টি লইয়া চাল দিতেছে, চাটুয্যে হুঁকা হাতে বসিয়া ...বিষ্টমনে চাল দেখিতেছে—রাখাল চায়ের প্লেটে চা ...লিতেছে...পুষ্প কোনো ভূমিকা না ফাঁদিয়া একেবারে অস্পষ্ট ভাষায় কথা কহিল, বলিল,—আপনারা সবাই ...আছেন এখানে, দেখচি। আপনাদের কাছে আমার ...একটা নালিশ আছে।

অন্নদা এ-কথায় একেবারে পাথরের মূর্ত্তির মত ...নিস্পন্দ!

চাটুয্যে মুখ তুলিয়া চাহিল, কহিল,—কি নালিশ, ...বৌমা?...

রাখাল কহিল—চাকরদের দিয়ে বলে পাঠালেই তো। কষ্ট করে...

পুষ্প কহিল—সে কষ্ট আমি বুঝবো'খন। আমার ...ালিশ...

অবিনাশ কহিল—বলুন, কি নালিশ...?

পুষ্প কহিল—আমার নালিশ এই চাটুয্যে মশায়ের ...ম। ওঁর বয়স হয়েচে, মানী লোক...উনি ঐ সামান্য ...পাবা গরীব রতনের ঘর জ্বালাতে গেলেন কি কারণে, ...নারা বলতে পারেন?

চাটুয্যে স্তম্ভিত! আমৃতা আমতা করিয়া কহিল,— ...? আগুন? কোথায়...?

অবিনাশ কহিল—আগুন লাগলো কোথায়?

রাখাল কহিল—কখন?

...প কহিল,—এখন...এই বৃষ্টির ঠিক আগে। আমি ... থেকে আসচি। সব কথাই শুনে আসচি! ...কও আসতে বলেচি। এর বিচার চাই আমি, আর ...নার আপনাদের করতে হবে।

...টুয্যের বুকখানা ভয়ে ধড়াশ্‌ করিয়া উঠিল। পুষ্পর পানে চাহিয়া সে দেখিল, এ যেন প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি

চাটুয্যে কহিল—অহেতুক এ কি অপবাদ!

অন্নদা কহিল—সত্যই তো...চাটুয্যে মশায় এ... রয়েচেন...

চাটুয্যে কহিল,—বলো তো দাদা...

পুষ্প কহিল—উনি এখানে এসেচেন আগুন লাগ... পর। খবর পেয়ে আমি বাড়ী থেকে বেরুচ্ছি...স... ওঁর সঙ্গে আমার দেখা। এক্ষেত্রে অন্য সাক্ষী ডাক... কোনো প্রয়োজন দেখি না...

চাটুয্যের পানে চাহিয়া অবিনাশ কহিল—এ-কি ক... হে চাটুয্যে?

চাটুয্যে কহিল—এ ঐ রতা বেটাচ্ছেলের কারসাজি সেদিন বাজারে পচা মাছ নিয়ে গেছলো, আমি সে মা... ফেলে দিয়েছিলুম। তাই লাগিয়েচে।

পুষ্প কহিল—মিথ্যে কথা বলবেন না। তা তে... নয়। রতন আপনার কথা ঠেলে পাঁচুবাবুর বৌকে রেয়তী জমির খাজনা দিয়েছিল, কেশববাবুকে না দিয়ে; কেশববাবু আপনার শরণ নেন, আপনি রতাকে ভয় দেখিয়ে তাই বলেন, পাঁচু বাবুর বৌকে আর মেয়েদের মেনে চললে তাকে মজা দেখাবেন।

চাটুয্যে কহিল,—তার ঘরে আগুন দেবো বলে শাসিয়েচি?

পুষ্প কহিল,—তা ঠিক নয়। আগুনের কথা স্পষ্ট খুলে বলেননি...তা বলবার দরকারও ছিল না তো। তবে আপনার ও-বিষয়ে হাতযশ আছে বলেই...আর বাকী প্রমাণ রতনের মুখে সকলে শুনবেন, তাকে আমি বিকেলে আসতে বলেচি।

কথাগুলা চাটুয্যে মনোযোগ-সহকারে শুনিল, শুনিয়া ডাকিল,—অন্নদা...

অন্নদা গুম্‌ হইয়া বসিয়া ছিল; কোন জবাব দিল না।

পুষ্প কহিল,—এর প্রতিকার যদি আপনারা না করেন, তাহলে আমিও কিন্তু চুপ করে থাকবো না। এ অত্যাচার চলতে পারে না। প্রতিকার আপনারা না করেন, থানা-পুলিশ আছে। গরীব সত্যি এত অসহায় হয়ে বাস করতে পারে না!...আপনারা আশ্রয় না দেন, আপনারাও যার আশ্রয়ে বাস করচেন, বাধ্য হয়ে তাদের দোরেই আমি রতনকে পাঠাবো।...

চাটুয্যের বুক কাঁপিয়া উঠিল।...রাখাল কহিল,—এ কিন্তু অন্যায়!—এ যদি সত্য হয়, চাটুয্যে...

চাটুয্যে উচ্চ কণ্ঠে কহিল,—এ রতার বদমায়েসি... আমার উপর অকারণ বিরোধ। ওকে জানো না? বাঃ!

পুষ্প কহিল—সে সবের বিচার আপনারা করবেন। আমি মোদ্দা আশ্চর্য্য হচ্ছি যে, মানুষ এমন হীন হতে

পারে—এমন করেও একটা লো'কের সর্ব্বনাশ করতে পারে!...তবু এটুকু কৃপা করেচেন যে, রাত্রে আগুন লাগান নি, দিনে লাগিয়েচেন! রাতে হলে হয়তো দু-চারটে প্রাণও যেতো...

চাটুয্যে কহিল—আমার যদি রাগ থাকবে আর এ যদি আমারই কাজ হবে তো এই দিনের বেলায় ঝুঁকি মাথায় নিয়ে এ-কাজে লাগি? এটুকু বুদ্ধি আমার ঘটে নেই? কি বলো হে তোমরা? কথাটা বলিয়া চাটুয্যে সগর্ব্বে সকলের পানে চাহিল।

পুষ্প কহিল—দয়া করে আপনারা বিকেল বেলায় এখানে থাকবেন। গরীবের সাহায্যও তো করা চাই। এই যে সে নিরাশ্রয় হলো...

এ-কথা বলিয়া কাহারো উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া পুষ্প ধীরে ধীরে বিদায় লইল।...

খেলার আসরে খেলোয়াড়ের দল নির্ব্বাক! উৎসবের দীপ্ত সমারোহের মধ্যে একটা মহা-অনর্থ ঘটিয়া গিয়াছে! চাটুয্যে সকলের পানে চাহিল—তারপর নিঃশব্দে উঠিয়া জুতাজোড়ায় পা ঢুকাইতে উদ্যত হইল।

অবিনাশ কহিল—কোথায় যাও চাটুয্যে...?

চাটুয্যে কহিল,—কেশবকে ডাকতে। তার ব্যাপার নিয়েই তো এ অপবাদ আমার নামে, এই বৃদ্ধ বয়সে!... তার মুখে শোনো তোমরা সব কথা!...বৌমাকে কে কি লাগিয়েচে, তাই শুনে উনি এসে আমায় পাঁচ কথা বলে গেলেন...

পুষ্প যতক্ষণ এখানে ছিল, ততক্ষণ তার সামনে চাটুয্যে এ জবাব খুঁজিয়া পায় নাই। এখন পুষ্প চলিয়া গেলে সনাতন যুক্তি এবং প্রচলিত কৈফিয়ৎগুলা মনের উপর ভাসিয়া উঠিল।

রাখাল কহিল—তোমার কিন্তু উৎপীড়ন করা রোগ আছে, চাটুয্যে...

চাটুয্যে রাগিয়া উঠিল, কহিল—তা বলে এমন অহেতুক! রতা থাকলে-গেলে আমার কি লাভ-লোকসান, বলো? না, কেশব রাজ্য পেলেই আমায় সে-রাজ্যের সে মন্ত্রী করবে? এ আইন-পুলিশের দিন... আমার কি বেইজ্জতীর আশঙ্কা নেই? আমি এত বড় অর্ব্বাচীন!

অন্নদা কহিল—আপনি চুপ করুন চাটুয্যে মশাই। মেয়ে-মানুষ একেই কাণ-পাৎলা...কে কি বলেচে...

চাটুয্যে এ-কথায় ভরসা পাইল, কহিল,—তুমিই বলো ভাই অন্নদা...আমার তো দেখচো এ্যাদ্দিন...অমন স্বভাবের কোনো পরিচয় পেয়েচো?

অন্নদা অপ্রতিভ হইয়াছিল, পরের কথা লইয়া তারি গৃহে একজনকে এতক্ষ অপরাধী সাব্যস্ত করা! আর তা'ও তার স্ত্রী নিজে আসিয়া বলিল! অন্নদা কহিল,—

আপনি বি... সমস্ত ব... যখন ...

অন্নদা ...

থাকি না... তদ্বির করায় ... করিয়ে আমার ঘাড়ে তার ... যে মান বাঁচিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরেচি ... পথে? নাকে খৎ দিয়েচি!

মৃদু ইঙ্গিত! এ-ইঙ্গিতে অন্নদা বুঝিল, ... মহাশয়ের বিচক্ষণতা কতখানি! তিনি কত বড় ... পার্টিশন-মামলার খবর তার জানা ছিল না।

রাখাল কহিল—হাকিমের কাছেও নাক-কাণ ... ছিলে না?

রাখালের স্বরে তীব্র কৌতুক! সে কৌতু... আগুনে চাটুয্যে জ্বলিয়া উঠিল।

চাটুয্যে কহিল—আরে, ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছিল... হাকিম বলে, তদন্ত করবো। কে সে কাজ করে... জানতুম তো...এক গোত্র...কাজেই নিজের ঘাড়ে ... নিয়ে বললুম, এই নাক-কাণ মলচি, হুজুর। ব্যা... চুকিয়ে দিন। হাকিম তাই আমার মান রেখে...

অন্নদা উঠিল, কহিল—আপনারা বসুন। ... এখনি আসচি...

অন্নদা চলিয়া গেল।

চাটুয্যে কহিল—এ পয়সার গরম। এক ... মেয়ে...তাও কাছাকোঁচা দিয়ে কাপড় পরেন না! ... ওঁর শ্বশুরের বয়সী। আমার মুখের উপর অমন ... বলেন! আচ্ছা, দর্পহারী মধুসূদন আছেন...গরী... ডাক আজো তিনি শোনেন! চাটুয্যে যদি দু'... বিশুদ্ধ খাঁটি মন্ত্রে সন্ধ্যাহ্নিক করে থাকে...আর গ... স্নান...তাহলে আমিও দেখবো, এ অপমানের ... হয় কি না...

চাটুয্যে গমনোদ্যত হইল। অবিনাশ কহিল... সব কি বকচো হে! যার খাও, তারি মন্দ করবে... ফন্দী আঁটচো!

চাটুয্যে কহিল—এ অপমান যদি তোমার কর... বুঝতে!...ঐ রতা বেটাকে এনে বিচার চালাবে? ... কাছারির হাকিম নাকি তোমরা? ওঃ!...

অবিনাশ কহিল—তোমার যদি এতে হাত না ... তো ব্যস্ত হচ্ছো কেন? এ আস্তানাটিতে মোদ্দা আর... আছো!

চাটুয্যে কহিল—থামো! তোমাদের মত ... জানি না। আদর করতো, তাই আসতুম। ...

রতা বেটার সামনে আসামী হয়ে দাঁড়াবো? কেন? আমার মান-ইজ্জৎ নেই?

রাখাল কহিল—থানা-পুলিশ করবে রতা…শুনলে তো!

চাটুয্যে কহিল—ছোট লোকের আস্পর্দ্ধার বাড়…নাহলে এমন কথা বলে। পিছনে আশ্রয় আছে…ঐ গাঁচুর বৌ। ও মেয়ে কম নন্! পশ্চিমে কাটিয়েচেন…চাখোনি আগাগোড়া বাইজী-প্যাটান্! অত বড় ধেড়ে মেয়েরা গান গায়! এর পর কার ছেলে ধরতে বেরুবে, দ্যাখো! সতর্ক করে দিলুম। গ্রামে কি শাসন আছে? তোমরা কি মানুষ? বুড়ো হয়েচি। নাহলে…ঐ রতার সঙ্গে কিসের পরামর্শ চলে বোঝো না তো! এতে চাটুয্যের হাত থাকলে এই দিনে-দুপুরে আগুন লাগতো না…এত কাঁচা কাজ চাটুয্যের নয়!…তোমরা তো বোঝো না, কেশবের আপত্তির প্রধান কারণ…

কথায় রহস্যের রসাভাস! রাখাল কহিল,—কি কারণ? শুনি…

চাটুয্যে কহিল—একটি হৃষ্টপুষ্ট জোয়ান ছোকরা আছে পিছনে। তাকে নিয়ে হাসাহাসি, গান-গল্প…রাত এগারোটা-বারোটা অবধি…জানো?

অবিনাশ কহিল—অন্নদাকে বলো। সে আসুক।

চাটুয্যে কহিল,—না। কি দরকার? অন্নদা! বালাই না হয় হয়েচে…বুদ্ধি কিছু আছে? নাহলে পুরুষ এমন আঁচল-ধরা হয়ে থাকে! পরিবার যা করবে, বলবে…শিরোধার্য্য! আর কি এই বৌ! বাবা! সকালে রণচণ্ডী হয়ে বৈঠকখানা-ঘরে হাজির! এ মেয়ে-মানুষ আখেরে ভালো হয় না, দেখে নিয়ো। মুখো পুরুষ ওদের দু'চক্ষের বিষ! আমার ঢের আছে…ঐ তো লেখাপড়া-জানা ইংরিজি চালের সব…

রাখাল শিহরিয়া কহিল,—তোমার মুখ বড় আল্‌গা, চাটুয্যে! যার বাড়ী বসে আছো, তারই…

হুঙ্কার দিয়া চাটুয্যে কহিল,—থামো, থামো…অত রেখে আমি চলতে শিখিনি। আমার পষ্ট কথা! না দু'পেয়ালা চা খেতুম…এই তো…! না হয় চা খাবো না! নশে বেণের দোকানে এখনো দু'পয়সায় প্যাকেট কিনতে পাওয়া যায়। সাধ হয়, তাই পাথর বাটীতে ঢেলে…

গজ্‌গজ্ করিতে করিতে চাটুয্যে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত গেল। ঘরের লোকগুলি অবাক হইয়া মুখ-চাওয়ি করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

মেঘ-খণ্ড

ব্যাপার ক্রমে যা দাঁড়াইল, চাটুয্যের পক্ষে তা সুবিধার নয়। অন্নদার গৃহ হইতে আস্ফালন-সহ সেই যে সেদিন সে বাহির হইল, তারপর দু' তিন তার আর কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। অনি সত্ত্বেও অন্নদাকে এ ব্যাপারে সালিশীর ভার লইতে হই সালিশ করিতে গেলে আসামী-ফরিয়াদী উভয় প উপস্থিতি প্রয়োজন—এক্ষেত্রে আসামী ফেরার।

ফরিয়াদী রতন গর্জ্জন করিয়া উঠিল—আপ যদি হুকুম করেন, তা হলে চাটুয্যে ঠাকুরকে আমি ঘণ্টার মধ্যে এনে হাজির করিয়ে দিতে পারি।

রাখাল, অবিনাশ ও অন্যান্য প্রতিবেশীরা পরস্প দৃষ্টি-বিনিময় করিল। অন্নদা কহিল,—তাঁর অপ না করে তাঁকে আনতে পারো? বেশ, অনুমতি দিচ্ছি

রতন তখনি ছুটিল চাটুয্যের সন্ধানে। অবি কহিল,—ভালো কাজ হচ্ছে না। চাটুয্যেকে আ সকলে রীতিমত ভয় করে চলি, অন্নদা…

অন্নদা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অবিনাশের পানে চাহি অবিনাশ কহিল—লোককে পীড়ন করতে ওর এত র ফন্দী-ফিকির কল-কৌশল জানা আছে—আর সে পীড় যে কোন্ দিক থেকে সুরু হবে, তাও কিছু বো যায় না…

মনোযোগ-সহকারে অন্নদা অবিনাশের কথা শুনিল শুনিয়া কি ভাবিল, ভাবিয়া কহিল,—তাই তো! ত এ কথা আমায় আভাসে কেউ বলো নি…

রাখাল কহিল—জানালে আমাদের বিশেষ উৎকণ্ঠি থাকতে হতো। কেন না, ও এখানে তোমায় আপ্যায়িত করতে আসতো…এসে যদি দেখতো প্রবেশে কোথা বাধা ঘটচে, তখনি সন্ধান নিত, এবং সন্ধানে সে সংবা জানতে পারলে…

অন্নদা কহিল,—বুঝেচি।…তোমরা বসো…আমি ইতিমধ্যে স্নানটা সেরে নি।

বাহিরের ঘরে যখন এমনি আলোচনা চলিয়াছে অন্দরে পুষ্পর কাছে তখন এক নারী আসিয়া আপনার দুঃখের কাহিনী সবিস্তারে বলিয়া কৃপা-প্রার্থনায় চোখে অশ্রুর বান ডাকাইয়া দিয়াছে।…দুঃখের কাহিনীটুকু মামুলি! জামাই মাতাল দুশ্চরিত্র, বাড়ীতে থাকে না, বাড়ীর কোন খবরও রাখে না; দৌহিত্রীর বিবাহের কথা পাকা হইয়া গিয়াছে…যা-কিছু পুঁজি-পাটা সব খোয়াইয়া এ ব্যবস্থা করিয়াছে। শুধু সাত ভরি রূপা ও একটি গিল্টি আংটি…এ দুটি বস্তুর জোগাড় না হইলে বিবাহ ঘটিবার উপায় নাই। কাজেই গ্রামের করুণাময়ী

ভগবতীর পায়ে আসিয়া সে দাঁড়াইয়াছে, এ দায়ে রক্ষা পাইবার জন্ত।

অশ্রুর বহর দেখিয়া পুষ্প বিগলিত হইলেও তার মনে কেমন একটু দ্বিধা জাগিল। পুষ্প কহিল—তোমার বাড়ী কোথায় ?

নারী কহিল—আমার নাম বিন্দুবাসিনী···এ গাঁয়ে সবাই আমায় জানে, মা। মেয়েটার মুখ চেয়ে আমায় চাকরি করতে হয়—ঐ পাট কলে। থাকি আমি সেই যে খালের পুল আছে, সেই পুলের পাশে।

পুষ্প কহিল—আচ্ছা। আমি খপর নেবো'খন···তুমি কাল এসো।

বিন্দু কহিল—খপর আর কি নেবে মা? আমি গঙ্গার দিকে মুখ করে কি মিছে কথা বলচি ?

পুষ্প কহিল—তাহলেও বাবুকে বলি। তাঁর যদি মত হয়! আমি তো টাকা-পয়সার মালিক নই।

বিন্দু কহিল—আমার বরাত, মা! টাকাটা আজ পেলে ভালো হতো। ঘেচির মা রূপোর চারগাছা মল বিক্রী করতে চাইছে, সাত-আট ভরি···আর আংটিও তার কাছে একটা বাঁধা আছে। তা বেশ, তাই আসবো, কালই আসবো। আমার দায় যখন...বিন্দু চলিয়া গেল।

এগুলা টুকরা মেঘ···এগুলার পানে দুর্য্যোগের সংশয়-শঙ্কা লইয়া কেহ কোনদিন ফিরিয়া তাকায় না! ওদিকে রতনের গৃহে ঐ আগুন লাগা, চাটুয্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ, চাটুয্যের পলায়ন, তার সন্ধানে রতনের বাহির হওয়া··· বিক্ষিপ্ত স্বতন্ত্র ঘটনার কয়েকটা টুকরা মাত্র···এগুলার কি-বা শক্তি! সংসারে এমন কত-শত ঘটনা ঘটিয়া চলিয়াছে প্রতি মুহূর্ত্তে···বিস্তীর্ণ আকাশে বিক্ষিপ্ত ছোট মেঘ এখানে-ওখানে দেখা যায়···তার কতটুকু শক্তি! কিন্তু যদি এই টুক্‌রা-মেঘগুলা হাওয়ার পরশ পাইয়া মিশিয়া জোট বাঁধে, তাহা হইলে নিমেষে আকাশ কাঁপাইয়া ভীম-গর্জ্জনে এমন ঝড় বহাইয়া তোলে, যার দাপটে দুনিয়ায় রীতিমত কাঁপন জাগে, বহু নীড় আশ্রয়-তরু হারাইয়া ধূলায় লুটায়! কাজেই ছোট মেঘের টুকরাগুলা উপেক্ষার বস্তু নয়!...

স্নানান্তে অন্নদা আসিয়া দেখে, রতন তখনো ফেরে নাই। বেলা ওদিকে দশটা বাজিতে চলিয়াছে। অন্নদা কহিল,—আমি আর বসতে পারবো না...আজ আমার payment-এর দিন। বেলা একটার মধ্যে কলকাতায় পৌঁছুনো চাই।

রাখাল কহিল—ওবেলায় দেখা যাবে। কিন্তু আমাদের এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকা ভালো বুঝচি না...

অন্নদা কহিল,—কেন ?

রাখাল কহিল,—চাটুয্যে এই যে নিরুদ্দেশ হয়ে [illegible]

কিছু কন্দী গড়ে তুলচে। ওকে আমরা বিল...
করে চলি...সাক্ষাৎ মা মনসা!

অন্নদা হাসিল, হাসিয়া কহিল,—এই আইন-পুলিশে দিনে নির্ব্বিবাদে কেউ অত্যাচার করে চলতে পা কখনো ?

অবিনাশ কহিল,—ওকে চেনো না বলেই এ-ক বলচো! আইন-পুলিশের নাগালের ঊর্দ্ধে ওর স্থান!...

বেলা পাঁচটায় গৃহে ফিরিয়া অন্নদা শুনিল, এ-বা হুলস্থুল বাধিয়া গিয়াছে। রতন গিয়াছিল মূলাজোড়ে পথে...কামিনী নাপিতানীর গৃহে। চাটুয্যের আরা কুঞ্জ সেই গৃহে। রতন ভীম-গর্জ্জনে তাকে তার আরা কুঞ্জ হইতে তুলিয়া টানাটানি করে—তখনি তা ইছাপুরে লইয়া আসিবে, মামলার সালিশীর জন্ত নিজেকে তার গ্রাস হইতে ছিনাইতে গিয়া চাটুয্যে মাথা চালের খুঁটিতে ঠুকিয়া যায় এবং কাটিয়া রক্ত পড়ে ওধারে যখন অমন সংগ্রাম চলিয়াছে, কামিনী সে অবকাশে ছুটিয়া থানায় গিয়া খবর দেয়। চাটুয্যে সঙ্গে থানার 'জান্‌-পছান' আছে,—পুলিশ খবর পাই তখনি রঙ্গস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং রতনে গ্রেপ্তার করে। কামিনী নালিশ লেখায় যে, ত সোনার নথ ও দুটা মাকড়ি রতন চুরি করিয়াছে।...

রতন পুলিশের কাছে সব কথা খুলিয়া বলে চাটুয্যে জবাব দেয়,—শোনো কথা! ব্যাটা নিজের চা আগুন লাগিয়ে আমার নামে...হ্যাঃ, আমার ঘু লোক কি না...তাই আমি গেছি ওর সঙ্গে লাগতে!

রতন বলে,—তার সাক্ষী আছে। চাটুয্যে বা ও-পাড়ার হানিফের সঙ্গে পরামর্শ করে। হানিফ আ ধরায়। বদনের বৌ, আর বদন—এরা স্বচক্ষে দে য়াছে! হানিফ জলন্ত টীকা ছুড়িয়া চালে ফেলিয়া চাটুয্যে তখন তার সঙ্গে ছিল।

পুলিশ আসিল তদারকে। গ্রামে হুলস্থুল বাধি গেল। জয়মণি দেবী সাক্ষ্য দিলেন; তাঁর মে রাও; কেশবকে ডাকা হইল। কেশব সাফ বলি দিল, তার সঙ্গে দু'হপ্তার মধ্যে চাটুয্যের দেখা হয় না চাটুয্যে কহিল, যখন আগুন লাগে, সে তখন অন্নদ গৃহে বসিয়াছিল।

পুলিশ আসিল অন্নদার গৃহে। পুষ্প সংবাদ পাই পুলিশের কাছে প্রকাশ করিল, এ ব্যাপারের যতটু সে জানিত; চাটুয্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলি চাটুয্যে যা বলিয়াছিল, তাও বলিল; কোনো ক গোপন করিল না।

শুনিয়া দারোগা চিন্তা করিয়া কহিল,—এ কেশ দেখচি। কিন্তু মা-লক্ষ্মী, রতন থানায় খব না কেন ?

পুষ্প কহিল—আমাদের কাছে বলেচে।

দারোগা কহিল,—ঠিক কথা, মা-লক্ষ্মী। কিন্তু আমরা তার উপর কেশ্‌ করতে পারি না। বিশেষ ও এখন আসামী।

পুষ্প কহিল,—এখন যদি রতন নালিশ করে? পোড়া ঘর তো রয়েচে।

দারোগা কহিল,—আমরা তদারক করবো। কিন্তু রতন এখনো নালিশ লেখায় নি,—তাছাড়া ও চুরির আসামী—সাফাই দেবার জন্ম যে মিথ্যা নালিশ করচে না, তা প্রমাণ করা শক্ত হবে না? আগুনের সাক্ষী ঐ বদনের বৌ, বদন। তারা আসামীর দলের লোক। তাদের সাক্ষীর উপর কি মামলা টেঁকবে?

পুষ্প কহিল—রতনকে আমুন, আমি বলচি, নালিশ লেখাতে।

দারোগা কহিল—সে চুরির আসামী—হাজতে আছে। আপনি কেন এ নোংরা ব্যাপারে হাত দিচ্ছেন মা? আদালতের কাণ্ড।

পুষ্প কহিল,—তা বলে একটা নিরীহ লোক শাস্তি পাবে? রতন চোর নয়। রতন ওঁকে খুঁজতে গেছলো।

চাটুয্যে সঝঙ্কারে কহিল—নিরীহ বৈ কি! আমার কপালে এই চোট—এটা কোথা থেকে হলো? আমায় ঠেড়কো পেটা করে দিলে। কামিনী নাপতিনী সাক্ষী আছে। তার ওখানে গিয়ে ছিলুম, সে ছেলের খপর পাচ্ছে না, বিদেশে থাকে—তাই বেচারী কেঁদে আমার কাছে এসে জানায়…

দারোগা হাসিল, কহিল—আচ্ছা, আমি দেখবো। ভালো হয়, করবো। রতন আগুন লাগানোর নালিশ করলে আপনাদের কোর্টে দাঁড়াতে হবে মা-লক্ষ্মী। সেটুকু বিবেচনা করে যা উচিত বোধ হয়…কিন্তু বেইজ্জতী, —ভদ্র ঘরের মেয়ে আদালতে! যত চোর-বদমায়েসের দল। উকিল-মোক্তারে জেরা করবে।

পুষ্প কহিল—সত্য কথা বলবার জন্ম যদি দরকার হয়, কোর্টে যাবো। তাতে কিছুমাত্র বেইজ্জতী হবে না।

দারোগা কহিল—আচ্ছা, সে পরে দেখবো'খন। চলে আসি মা-লক্ষ্মী! বাবুর সঙ্গে দেখা হলো না… এক সময় না হয় আসবো।

বিকালে গৃহে ফিরিয়া অন্নদা এ-সংবাদ অবগত হইল। …? সে কেন এ-সব ব্যাপারে আসিয়া দাঁড়ায়! …র চিত্ত অপ্রসন্ন হইল। অন্দরে আসিয়া সংবাদ …, পুষ্প গৃহে নাই। সে গিয়াছে রতনদের ওখানে। …াগ হইল; সে ডাকিল—সত্য…

…্য আসিলে অন্নদা কহিল,—তোর মা-ঠাকরুণকে …ডেকে নিয়ে আয়। বলবি, বাবু খুব রাগ করচেন। …দা বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল। অবিনাশ কহিল—রতনের গোঁয়ার্তুমি করতে যাওয়া হয় নি।

রাখাল কহিল—চাটুয্যেকে আমরা দেখি ঠিক শীতলা কি ঐ আস্তিকস্ত মুনের্মাতা মনসা… চটলে রক্ষা আছে! হেন কাজ নেই, যা ও হতে পারে না।

অন্নদার বিরক্তি ধরিতেছিল। গ্রামে আসিয়া… ছিল, বিশ্রাম-সুখে জীবনের দিনগুলা কাটাইবে ব… ছুনিয়ার কোনো দিকে চাহে নাই—শুধু সংগ্রাম… আসিয়াছে। কিন্তু এখানে চারিদিকে এ কি বি… সুর! দেশের লোক এমন … কারো মনে এতটুকু… নাই! ছোট ছোট ক… …য়া কত-বড় অশান্তি… গড়িয়া তোলে! তার উপর পুষ্প! এখানে অ… এমন বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ধারায় জীবনকে বহিয়া… চলিয়াছে! কি তার কাজ যে একদণ্ড তার কাছে… মিলনের প্রথম দিনগুলার মত আসিয়া বসিতে পারে… কোথাও সে চলিয়া যাইবে না কি? থাকুক্‌ এ গ্রাম… সুখ-দুঃখ, বিবাদ-বিসম্বাদ লইয়া! প্রলয়-ঘূর্ণিপাকে… সে ছারখার হইয়া! কি তাহাতে আসিয়া যায়! দিন তো এ গ্রাম ছাড়িয়া কোথায় কত দূরে সে পড়ি… ছিল। গ্রামের কেহ তার কোনো সন্ধানও রাখে না… আজ এ গ্রামে ইহাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া তার ল… কি? কোথায়? কোন্‌ দিকে? তার কাছে আক্রি… বোম্বাই যা, ইছাপুরও তাই। সেখানে গায়ে পড়ি… কেহ কলহ করিতে আসিবে না! নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর ম… নির্দ্ধারিত সুখ-দুঃখ লইয়া দিন কাটিবে! এখানে গ… যেমন নাই, সুখ-দুঃখের তেমনি একটা হিসাবও নাই… সুখ কৈ? আরাম কৈ? শান্তি কৈ?

সত্য আসিয়া কহিল—মা এখন আসতে পারচে… না; পাঁচুবাবুর বাড়ীতে আছেন। আপনাকে এখনি একবার যেতে বললেন।

রাগিয়া ঝাঁজালো সুরে অন্নদা কহিল—আমি যেতে পারবো না। পাঁচজনের ঝামেলা বয়ে বাড়ী আনা কেন, তা'ও বুঝি না।

অন্নদা হঠিল না। পুষ্পকে অবশেষে আসিতে হইল।

পুষ্প আসিয়া অন্নদাকে ডাকাইল একেবারে তার দোতলার ঘরে। অন্নদা আসিলে পুষ্প কহিল,—তোমার চাটুয্যের শয়তানীর আর এক কাহিনী শুনেচো?

অন্নদার শুনিবার আগ্রহ ছিল না; তবু কহিল—কি?

পুষ্প কহিল—ঐ পাঁচুবাবুর বিধবা স্ত্রী এখানে তাঁর স্বামীর ভিটের এসেচেন বাস করতে—দুটি আইবুড়ো মেয়ে মাত্র সঙ্গে নিয়ে।—মেয়ে দুটি ডাগর। ওঁর জমি, পাঁচু বাবুর জ্ঞাতি-ভাই কেবল …

াই কেশব তোমাদের চাটুয্যেকে ধরে। চাটুয্যে একদিন ঁদের খুব শাসিয়ে আসে। তার পর আজ কেশব এক কিলকে দিয়ে চিঠি দিয়েচে, ও-জমি উইল লিখে পাঁচুবাবু াকে দিয়ে গেছেন—সে উইলের ওয়া প্রোবেট নিচ্ছে। াই চব্বিশ ঘণ্টার নোটীশ দেছে জমি ছেড়ে দেবার জন্ত। াহলে ফৌজদারী মামলাও করবে।

অন্নদা কহিল,—তা, আমায় কি করতে হবে?

পুষ্প কহিল,—এর বিহিত করো। ওঁরা মেয়ে-ানুষ—এ গ্রামে কেউ সহায় নেই। পাঁচুবাবুর স্ত্রী বলেন,—এ রকম যা-তা বলে তাড়াবে, সে উনি সহ্ন রবেন না! অথচ এমন আশ্রয় নেই, যেখানে বসে এর স্তনেস্ত করেন! কে-বা এখানে তাঁকে দেখে? তাই ামি তাঁকে ভরসা দিয়েচি—অবশ্য তোমার ভরসাতেই ামার ভরসা…

অন্নদা কঠিন দৃষ্টিতে পুষ্পর পানে চাহিল, কহিল—'! কিন্তু তুমি জানো, আমি পরের ব্যাপারে যোগ তে ভালোবাসি না!

পুষ্প কহিল—ওদের এত বড় দায়ে তুমি সাহায্য রবে না? শক্তি থাকতে?

অন্নদা কহিল—না। মামলা-মকর্দ্দমার দায় নিজের াড়ে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হবার মত বল আমার নেই, া-অবসরও নেই।

পুষ্প কহিল—তা বলে অত্যাচারে একজন আর কজনকে হঠিয়ে তার সর্ব্বস্ব গ্রাস করবে?

অন্নদা কহিল,—জগতে সর্ব্বত্র এই অত্যাচার চলছে! ার প্রতিকার করা মানুষের সাধ্যের বাইরে।

পুষ্প কহিল—জানি। জগতের দিকে চাইতে আমি লচি না। তোমার ঘরের কাছে চোখের উপর যে ন্সায় ঘটচে, সে-অন্যায় এমন অনায়াসে ঘটতে দেবে? াতে বাধা দেবে না?

পরিষ্কার অবিচলিত কণ্ঠে অন্নদা কহিল—না।

—আশ্চর্য্য! পুষ্প ব্যথায় কাতর হইয়া পড়িল। তো তার স্বামীর মুখের কথা নয়! তার স্বামীকে সে ানে! সদা-প্রসন্ন, কি দরদে ভরা তাঁর চিত্ত! পুষ্প হিল—আমি যে তাদের ভরসা দিয়েচি তোমার উপর নর্ভর করে…

অন্নদা কহিল—অন্যায় করেচো! বলে পাঠাও, তামার দ্বারা কিছু হবে না—যেহেতু তুমি কাল আমার ঙ্গে বিদেশে যাচ্ছো।

বিস্ময়ে দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া পুষ্প কহিল—বিদেশে!

অন্নদা কহিল—হ্যাঁ, এখানকার এ সব হাঙ্গামে আমি পীড়িত হয়েচি। আমি শান্তি চাই, পুষ্প। ঘরে-বাহিরে যে ঝড় বয়ে চলেছে, তাতে আমি সত্যই অস্থির হয়ে উঠেচি। তাই ভেবে স্থির করেচি, কিছুদিন এলা-হাবাদেই ঘুরে আসি…তোমার জন্মস্থান…

পুষ্প একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—যেতে হয়, তুমি যাও; আমি যেতে পারবো না। আমার উপর বড় আশায় এঁরা নির্ভর করেচেন। এঁদের এ-ভাবে ফেলে আমি এখন স্বর্গেও যেতে পারবো না। তোমার সেবায় আমার ক্রটি ঘটচে, তুমি তা লক্ষ্যও করেচো। তবু আমার মন বলচে, বিপদে আমরা ছাড়া এদের আর কেউ নেই। এরা বড় অসহায়।

অন্নদা কহিল—এদের হয়ে আদালতে মামলা লড়তে দাঁড়াবে না কি?…তুমি কিন্তু ভুলে যাচ্ছো পুষ্প, তুমি উকীল নও…

পুষ্প কহিল,—তা নই। কিন্তু উকীল যাতে ভালো করে ওদের হয়ে লড়ে, সেটুকু আমাদের করতে হবে। তোমার ভরসায় সেই কথাই ওদের বলে এসেচি। তোমার মান আমি রাখবো।

অন্নদা কহিল—অনেক ফিকিরের খেলা এ, পুষ্প—তাছাড়া বহু কঠিন তদ্বির, অনেক পয়সা খরচ…

পুষ্প কহিল—তোমার কাছ থেকে টাকা আমি চাইছি না। আমায় যা ভিক্ষা দিয়েচো, যদি দরকার হয়, সেই ভিক্ষার পয়সাতেই ওদের সাহায্য চলবে—ওরা যদি আপত্তি না তোলে…

কথাটা বলিয়া পুষ্প দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। অন্নদা কহিল—কোথায় যাচ্ছ?

পুষ্প কহিল,—পাঁচুবাবুর বাড়ী।

অন্নদা কহিল—উকিলের চিঠির জবাব দেবে নাকি? তার স্বরে শ্লেষ!

সে শ্লেষ পুষ্পর গায়ে বিঁধিলেও সে তা গ্রাহ্য করিল না। পুষ্প কহিল—পুরুষ মানুষ হয়ে তুমি যদি একজন অনাথার দুঃখে অবিচল থাকতে পারো, তাহলে মেয়েমানুষ হলেও আমাকে যা হোক্ একটা উপায় দেখতে হবে!

এ কথার পর পুষ্প দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল! অন্নদা নিশ্চেতনের মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তার মনে হইল, ঐ দেওয়ালে নিজের মাথা ঠুকিয়া সে চূর্ণ করিয়া ফেলে…এক নারী তাকে এমন তাচ্ছল্য করিয়া চলিয়া যায়! তার এত উপকার? ভালোবাসা না মানো, সে উপকারের জন্ম কৃতজ্ঞতাও কিছু নাই?

—

দশম পরিচ্ছেদ

নারী-বুদ্ধি

সেই রাত্রেই জয়মণির অপর এক রাইয়ৎকে বারাকপুরে পাঠাইয়া মোক্তার আনা হইল এবং রামলাল মাক্তারকে টাকা দিয়া থানায় পাঠানো হইল, রতনের জামিনের জন্ম। মোক্তারটি প্রবীণ। পুষ্প কহিল— আপনি আমাদের বাপের তুল্য…আপনার উপর এ কর্দ্দমার সব ভার। আপনি সব করবেন। পয়সা-কড়ির জন্ম ভাববেন না। এ অত্যাচারের প্রতিকার আপনাকে করতেই হবে।

মোক্তার রামলাল আশ্বাস দিয়া কহিলেন,—এ কাজে পাকালুম, মা! আপনাদের বিশ্বাস অটুট রাখবো— নবেন। আমি চাটুয্যেকে চিনি…যা করবার, বো। তবে জামিন আজ মিলবে না। পুলিশের …আবার এখানকার পুলিশ ঐ চাটুয্যের বশ। তার কারণ আছে, মা…

পুষ্প কহিল—আজ জামিন না মিলুক, কাল তো বে? আর ঐ ঘর-পোড়ানোর প্রতিকার চাই… শ করতে হয়, করবেন।

রামলাল মোক্তার কহিলেন,—করবো। আগে ওকে নে বার করে আনি।

রামলাল মোক্তার বিদায় লইলেন। পুষ্প গৃহে া, ফিরিয়া সত্যকে ডাকিয়া বলিল—পাঁচুবাবুর আজ রাত্রে তোকে চৌকি দিতে হবে। চাটুয্যেকে মোটে বিশ্বাস করি না। সে যে কি ফন্দী আঁটচে… ত্য কহিল,—বাবু চলে গেছেন মা, রাগ করে… খে গেছেন।

া পৃথিবী পুষ্পর পায়ের তলায় কাঁপিয়া উঠিল। া, ভগবান্! এখানে দুর্ব্বল অসহায়ের পাশে ত গেলে এমন কলরব ওঠে! দুঃখী অসহায়েরা র মুখ চাহিবে?

টা নিশ্বাস ফেলিয়া পুষ্প দোতলার ঘরে আসিল। ঠি আনিয়া সত্য তার হাতে দিল। পুষ্প তুই দেরী করিস্ নে, লক্ষ্মী বাবা—ওদের ভয় । দরকার মনে করিস্ যদি তো দরোয়ানকেও । তুই খেয়ে নিয়ে এখনি যা।

চলিয়া গেলে পুষ্প অন্নদার চিঠি বাহির করিয়া অন্নদা লিখিয়াছে,…

> তোমার আমার মধ্যে মস্ত ব্যবধান গড়িয়া অনাবশ্যক-বোধে আমায় তুমি তাচ্ছল্য বেশ, তোমার ঘর, তোমার বাড়ী, তোমার কড়ি—সব তোমার রহিল। আমি দূরে চলিলাম। পরোপকার-ব্রত অবলম্বন করিয়াছ। উত্তম! আমি কিন্তু এ অশান্তি গৃহে ডাকিয়া আনিতে ন যদি কোন দিন বুঝি, আমি ভ্রান্ত, সেদিন ফিরিয়া ত ক্ষমা চাহিব। নহিলে, এই পর্য্যন্ত।
>
> একটা কথা,—সন্ন্যাস লইব না, আত্মহত্যাও ক না। ভবিষ্যতের আশায় চিরদিন জীবন কাট আসিয়াছি; আজো তাই করিব। শুভা অন্ন

চিঠি পড়িয়া পুষ্প আকাশের পানে চাহি চাঁদের আলো-ভরা আকাশে মেঘের স্বচ্ছ আবর পুষ্প একটা নিশ্বাস ফেলিল।

দাসী আসিয়া কহিল,—গা ধোবে না মা?

পুষ্প কহিল,—ধোবো। পুকুরে যাবি?

দাসী কহিল—এত রাত্রে পুকুর…!

পুষ্প কহিল—হ্যাঁ। বেশ ঠাণ্ডা জল আছে জ্যোৎস্নারাত…চ' না…

দাসী কহিল—চলো।

গা ধুইয়া আসিলে দাসী বলিল,—খাবার দিয়ে যেতে বলি…?

পুষ্প কহিল—না রে, খাবার শক্তি নেই। ওদের বাড়ী ধরে বেঁধে কতকগুলো খাওয়ালে…

দাসী কহিল—বাবু কদিন পরে আসবেন, মা?

একটা নিশ্বাস বুক চাপিয়া ধরিতেছিল; পুষ্প সবলে সে নিশ্বাস রুখিয়া কহিল—দু'চার দিন দেরী হতে পারে। বড্ড কাজ পড়েচে।

দাসী কহিল,—তাই তো বলি, মা—তোমার সঙ্গে দেখা করবারও সাবকাশ হলো না! খাওয়া অবধি নয়…

পুষ্পর চোখের সামনে দুনিয়া আবার ঘন অন্ধকারে ভরিয়া গেল। আর—একটা নিশ্বাস বুকের মধ্যে তেমনি তোলপাড় করিয়া উঠিল।

পুষ্প কহিল—কাজের মানুষ, পুরুষ মানুষ…ওদের কত কষ্ট করতে হয় পয়সার জন্ম!

দাসী কহিল,—সেই কথাই ভাবি, মা…কত কষ্ট করলে তবে মা-লক্ষ্মী যে সদয় হন্! বাবুকে এক দণ্ড জিরুতে দেখলুম না কখনো!

পুষ্প কহিল,—তুই যা, খেয়ে-দেয়ে শুগে যা।… আমার বড্ড ঘুম পেয়েচে…ঘুমোবো।

দাসী কহিল—আহা, ঘুম পাবেই তো মা…কি ছুটোছুটিই করচো! তবু ওরা কে? পাড়ার মাগীরা বলে, তোর মা-ঠাকরুণ তো মেমসাহেব, বেহ্মজ্ঞানী… আমিও মা শুনিয়ে দিয়েচি! বলেচি, এই বেহ্মজ্ঞানীর পাদোদক খাও গো, দুঃখ-কষ্ট থাকবে না! বিপদে পড়লে তখন সব ছুটে আসো এই বেহ্মজ্ঞানীর কাছে… আর বিপদ কাটলে আড়ালে টীকা-টিপ্পনী করো…!

পুষ্প কহিল—তুই যা বাপু…আর বড়্ বড়্ করিস্‌নে …যে ঘুম আমার পেয়েচে…

দাসী কহিল—আহা, ঘুমোও মা, ঘুমোও!…তা জল দেবো না?

পুষ্প কহিল—ঠিক বলেচিস রে…এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দিয়ে যা। তেষ্টা পেয়েচে বটে।

দাসী কহিল—সে মা, তোমার মুখ দেখেই আমি বুঝেচি…

দাসী বিদায় লইলে পুষ্প জানালার কপাটে পিঠ দিয়া আকাশের পানে উদাস নেত্রে চাহিয়া রহিল।…

রাগ করিয়া চলিয়া গেছ! কেন গেলে? কি ভুল বুঝিয়া যে রাগ করিয়াছ! পরের ঝামেলা…? আহা, বেচারী! ওরা বড় অসহায়! ওদের পানে একটু দরদের দৃষ্টিতে চাহিলে যদি ওরা একটু শান্তি পায়? তাহাতে কি দোষ? তুমিও শান্তি চাও—আরাম! সকলেই তাই চায়! পরের উপর এটুকু দরদ না রাখিলে শান্তি কি করিয়া মিলিবে? আশে-পাশে যদি ঐ বেদনার সুর বাজে?

গরীব রতন…সে দুর্জ্জনের নিষেধ ঠেলিয়াছিল, তাই তার উপর অমন জুলুম, এই নির্ম্মম অত্যাচার! ঘরে আগুন লাগাইয়া দেওয়া! তার যথাসর্ব্বস্ব গেল—কত দিনের সঞ্চয়…আবার কত দিনে এ-সব সে গড়িয়া তুলিবে!…যদি একটা প্রাণ যাইত? পুষ্প শিহরিয়া উঠিল।…

আবার ভাবিল,—রাগ করিয়াছ, করো,…আমি কোনো অন্যায়, কোন অপরাধ তো করি নাই! তোমার পাশে প্রেমিকার আসনটিতে আসিয়া বসি নাই, তাই তোমার এ অভিমান!…তোমার নিরাপদ আশ্রয়ে বসিয়া কারো দুর্দ্দিনে যদি সহায় হইতে পারি,—তাহাতে কতখানি তৃপ্তি! ওগো, তুমিও কেন আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াও না…ভগবান্ তোমায় অনেক দিয়াছেন, তাঁর সে দেওয়া সার্থক করো!…নহিলে লোকের চাটুবাণী আদায় করিয়া আর যে যত তৃপ্তিই পাক, তুমি তা পাইবে না, জানি। ভগবান তোমায় বড় করিয়াছেন, এমনি বড় থাকিয়া স্নেহের ছায়ায় ছোটদের চিরদিন তুমি রক্ষা করো!

স্নিগ্ধ মৃদু বাতাস! পুষ্পর মাথা তবু দপ্‌দপ্ করিতেছিল! বুকের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া যেন আগুনের হল্‌কা বহিতেছে! কাজের ভিড়ে অন্নদার যে রাগ-অভিমান চিত্তে এতটুকু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিতে পারে নাই, এখন আপনার এই রুদ্ধ-দ্বার কক্ষে একান্ত নিভৃতে-নিরালায় সেই রাগ-অভিমানের চিন্তায় তাঁর সমস্ত চিত্ত বেদনার আগুনে ধু-ধু জ্বলিতে সুরু করিয়াছে! এত রাগ, এমন অভিমান যে, পুষ্পর সান্নিধ্য, পুষ্পর সংস্রবও অসহ্য হইয়া উঠিল! হায় নারী!…

কত গল্প-উপন্যাসের কথা মনে জাগিল। সে পড়িয়াছে, স্বামীর রাগ, স্বামীর মান-অভিমান…স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কতখানি ব্যবধান গড়িয়া তোলে, তুলিয়া কি হাহাকার আনে! কত গৃহ এমনি অভিমানের আগুনে জ্বলিয়া শ্মশান হইয়াছে!…মনে পড়িল রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রাণীর কথা!…রাণীর প্রণয়-সুধাপানে বিভোর রাজা রাজ্য ভুলিয়া প্রজা ভুলিয়া কোথায় চলিয়াছিলেন! রাজ্যে অত্যাচার…সেদিকে তাঁর লক্ষ্য নাই… নিকুঞ্জে বসিয়া প্রণয়-স্বপ্ন রচার আগ্রহ তাঁর ফুরায় না। শেষে রাণী সুমিত্রা নিজে পথে বাহির হইলেন অন্তঃপুর ছাড়িয়া, বিলাস-বিভ্রমের মায়া-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া…কি সে মহিমময়ী জননীর সাজে!

পুষ্প নিশ্বাস ফেলিল…নারীর কাজই যে আর্ত্তের সেবা, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় রচনা…তাই ভগবান্ নারীর বুকে স্নেহ-মমতা-মায়ার পাথর রচিয়া দিয়াছেন! বেদনার অশ্রু দেখিলে নারীর মন তাই অমন গলিয়া পড়ে!…

দিনের আলোয় পুষ্পর মন যেন নব জীবনে জাগ্রত হইয়া উঠিল! যে ঝড় উঠুক, যে বিপ্লব ঘনাইয়া আসুক, কর্ত্তব্য বলিয়া যে-ভার মাথায় লইয়াছে, তা সে নামাইবে না। ঘরের কোণে বসিয়া স্বামীর অন্যায় আদেশ মানিয়া সাধ্বী বনিবার বাসনা তার নাই! বাহিরের বিশ্ব যখন একটু স্নেহের ভিখারী হইয়া আর্ত্ত আহ্বান তুলিবে, তখন ঘরের কোণে বসিয়া স্বামীর বিলাস-লীলায় লীলাময়ী সাজিয়া দুই চোখে বিভ্রমের কাজল-রেখা আঁকা—সে তা পারিবে না! স্বামী যদি দুনিয়ার দুঃখে নিষ্করুণ অবিচল বসিয়া থাকেন তো যেমন করিয়া পারে, স্বামীর সে অটলতা পুষ্প ভাঙ্গিবে!…

সকালে স্নান সারিয়া পুষ্প জয়মণি ঠাকুরাণীর গৃহে গিয়া হাজির হইল। মহীন্দ্র তখন মোক্তার বাবুর গৃহে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে!

পুষ্প কহিল,—এই নাও মহীন্দর, আমি দশ টা… এনেচি। এ টাকাটা সঙ্গে রাখো…যদি কোনো দরকার হয়। মোক্তার বাবুকে বলবে মহীন্দর, আমাদের দেখবার শোনবার কেউ নেই,…তাঁর উপরই সব ভার জামিনে রতনকে আজ বার করা চাই। না হলে শ… হাসবে।

মহীন্দ্র কহিল,—বুঝেচি বৌমা। আপনার আশীর্ব্বাদে আদালতে আগে দু'চার বার আরো গেছি…মামলা জিতেচি।

পুষ্প কহিল,—উকিলের সে চিঠির জবাব দেওয়া হয়েচে?

জয়মণি কহিলেন,—না মা। মোক্তার বাবুকে দেখালুম! উনি বললেন, ভেবে-চিন্তে জবাব দেবেন।

পুষ্প কহিল,—চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশ দেছে বাড়ী ছেড়ে যাবার জন্য…

হেমলতা কহিল,—মেয়ে-উকিল তো হয়েচে মা… তাঁদের কাছে গেলে হয় না ?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া জয়মণি কহিলেন—মেয়েমানুষ কতখানি অসহায়, তা এই বিষয়-কর্ম্ম দেখতে বসলে বোঝা যায় !…

পুষ্প কহিল—এ অসহায়তা যতখানি পারি, আমরা ঘুচোবো। কলকাতা হলে এতখানি অসুবিধায় পড়তে হতো না। সেখানে অলিতে গলিতে উকিলের ছড়াছড়ি। এ হলো পাড়াগাঁ—তাই উকিলের অভাব।

জয়মণি কহিলেন—হেম, ছাখ, মা, মহীন্দ্রের খাওয়া হল কিনা…

হেম কহিল,—স্নেহ তাকে খাওয়াচ্ছে…

মানদা কহিলেন,—ছেলের মতন…আমার উপর কি দয়া! ওদের বিপদ তো অনায়াসে ঘুচতে পারে যদি শব ঠাকুরপোকে মেনে ওরা চলে!…তা ওরা করবে। রতনের যে সর্ব্বস্ব গেল, আমি তাকে বললুম, ওদের ই না হয় যা বাবা। তা বললে, জান্ থাকতে তা বো না, মা। ঢের অত্যাচার সয়েচি, অত্যাচারই চি শুধু! দুঃখী ছোটলোক—মুখের পানে স্নেহ কেউ কখনো চায়নি, মা! তোমাদের কাছে যে পেয়েচি…গরীব হলেও আমরা মা এই স্নেহের !

শ্বাস ফেলিয়া পুষ্প কহিল—আহা!…

কালে রতনকে লইয়া মহীন্দ্র ফিরিল—তার জামিন হ।…

প কহিল,—রুজু করা হয়েচে। হাকিম তদারকের য়েচেন ভাটপাড়ার নরেশ ভশ্চায্যি মশাইকে। হাকিম।

কহিল,—বেশ হয়েচে।

পর মামলার তদ্বির চলিল সজোরে।… ভগবান্ লাইয়া দিলেন।

কাতায় ছিল সুধাংশু…পাঁচুর এক বন্ধুর পুত্র উকিল হইয়াছে। দৈবক্রমে সে একদিন তার য়া ইছাপুরে বেড়াইতে আসিয়া শুনিল, এখান- উৎপাতের কথা। শুনিয়া সে আপনা হইতে ল—আমি মামলার তদ্বির করবো, মাসিমা। আমায় গ কেন খপর দেন নি ?

জয়মণি কহিলেন,—ভুলে গিয়েছিলুম বাবা…

সুধাংশু অভিমান-ভরে কহি—এই আপনার স্নেহ…!

জয়মণি সানন্দে কহিলেন—তা নয়, বাবা। এ-বিপদে বুদ্ধি লোপ পায়।

তদ্বিরের ঘটা দেখিয়া কেশব একদিন জোর করিয় জয়মণির বাড়ীর বাহিরের ঘরগুলা দখল করিয়া বাধা দিতে গেলে সে অভদ্র গালি দিল এবং মা করিবে বলিয়া শাসাইয়া উঠিল।

ব্যাপার দেখিয়া সুধাংশু কহিল—এ যে ব বাধলো, দেখচি। আপনারা কটি স্ত্রীলোক মাত্র…

পুষ্প কহিল,—আমাদের দরোয়ানকে পাঠাই ধরে তুলে দিক্। তাতে আইনে কি বাধবে ?

সুধাংশু কহিল—তা বাধবে না। তবে অ ওরা একটা মামলা রুজু করে দিতে পারে। এ এতগুলো মকর্দ্দমা…

পুষ্প কহিল—নিরুপায়! তা বলে যা-খুশী ব বেপরোয়া হয়ে…?

সুধাংশু কহিল,—সে কথা ঠিক!

একাদশ পরিচ্ছেদ

তরুণ অতিথি

দু'তিন মাস কাটিয়া গেল। চাটুয্যে মহাশয় এ ছাড়িয়াছেন, আস্তানা পাতিয়াছেন সেই কামি নাপিতানীর গৃহে।

অন্নদা গৃহে আসিয়াছে, তবে বাহিরের ঘরে থাকে এ সব ব্যাপারে তার কোনো সংস্রব নাই। রতনে ঘর-জ্বালানির মামলার তদারক হইয়া গিয়াছে। সাক্ষ্যে অভাব—ঘটনাচক্র চাটুয্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেও তা উপর নির্ভর করিয়া চাটুয্যেকে আসামী-তলব করা চলে না! কাজেই সে-মামলা ডিশমিশ হইয়া গেল।

চাটুয্যে সেদিন সন্ধ্যায় গ্রামে আসিয়া অনেকখানি আস্ফালন করিয়া গেল। কেশব সিদ্ধেশ্বরী-তলায় কাঁশর-ঘণ্টা বাজাইয়া পূজা দিল।…তার পর কেশবের সেই মামলায় সমারোহ বাধিল। মামলা আলিপুরে।

জয়মণির তরফ হইতে জবাব দাখিল হইল, ও উইল জাল। রতনের বিরুদ্ধে চাটুয্যের চুরির মামলাও ফাঁশিয়া গেল; কিন্তু মাথায় চোটের জোরে চাটুয্যে মারপিটের মামলা জিতিল। রতনের পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হইল। পুষ্প তখনি জরিমানার টাকা পাঠাইয়া দিল।…

উইলের মামলার তদ্বির চলিয়াছে, এমন সময় একদিন পুষ্প আসিয়া অন্নদার কাছে দাঁড়াইল, কহিল,—এখনো আমার মার্জ্জনা মিলবে না ?

গম্ভীর কণ্ঠে অন্নদা কহিল,—কিসের মার্জ্জনা ?

পুষ্প কহিল,—আমার অপরাধের।

অন্নদা শুষ্ক বচনে কহিল—কি অপরাধ ?

পুষ্প কহিল—এদের এই মামলা-মকর্দ্দমা নিয়ে আছি…

অন্নদা কহিল,—তোমার মর্জ্জি! ভেবে দেখলুম,

আমার রাগ করা বা বাধা দেওয়া অন্যায়! তুমি লেখাপড়া শিখেচো, হিতাহিত-জ্ঞান আমার চেয়ে তোমার বিন্দুমাত্র কম নয়—হয় তো, বেশী। তোমার কর্ত্তব্য বলে তুমি যা বুঝেচো, তা তুমি করচো। আমার কর্ত্তব্য ভিন্ন। কাজেই দু'জনে দু'পথে চলেছি···কৈ, কোথাও তো কারো বাধচে না।

পুষ্প কহিল,—কিন্তু আমায় এ-ভাবে ছেঁটে ফেলে কি তোমার সত্যি কোথাও বাধচে না?

একটা উদ্গত নিশ্বাস রোধ করিয়া অন্নদা কহিল,—আগে বাধতো···এখন কৈ, কোথাও বাধচে বলে তো মনে হয় না!

অন্নদা ইজিচেয়ারে বসিয়া ছিল। পুষ্প আসিয়া অন্নদার পায়ের কাছে বসিল, এবং অন্নদার হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া কহিল,—কিন্তু আমার যে থেকে থেকে ভারী অসহ্য বোধ হচ্ছে।

শুষ্ক কণ্ঠে অন্নদা কহিল,—কেন?

পুষ্প কহিল,—আমি যে নারী। যে কাজই করি আমি···তোমায় ঘিরেই তো।

অন্নদা কহিল,···আমি তা মানি না, পুষ্প। আমায় তো তুমি দূরে ঠেলে দিয়েচো! আমি পয়সা-কীট, আমি দুর্বৃত্ত, আমি পাষাণ···

পুষ্প কহিল,—এমন কথা আমি বলিনি! তবে ঘরের পাশে এত বড় অত্যাচার দেখে এমন অবিচল তুমি থাকো কি করে, তাই ভেবে শুধু অবাক্ হই!

অন্নদা কহিল,—আমার পাষাণ-মন, তাই।

পুষ্প হাসিল, হাসিয়া কহিল,—আমার সম্বন্ধে পাষাণ-মন হয়েচো বটে! একটু সাধ হয় না, ডেকে দুটো কথা বলি? এই যে এরা তোমার কত সুখ্যাতি করে—তা শুনে আমার বুক কি আনন্দে ভরে ওঠে···

অন্নদা কহিল,—আমার সুখ্যাতি? কারণ?

পুষ্প কহিল,—ওদের মামলা-মকর্দ্দমায় তোমার এই টাকার সাহায্য, তার উপর আমায় ওদের কাজে একেবারে এমনভাবে সমর্পণ করেচো···

অন্নদা কহিল—সে তোমার কাজ···আমি তো এ-সবে হাত দিইনি।

পুষ্প কহিল—তারা তো তা জানে না···

অন্নদা কহিল—সে তোমার অন্যায়। ধাপ্পা দিয়ে আমি নাম কিন্‌তে চাই না কোনো দিনই···

দাসী আসিয়া সংবাদ দিল,—রতন এসে নীচে দাঁড়িয়ে আছে মা···

পুষ্প কহিল,—যাচ্ছি···গিয়ে তাকে বল্, দাঁড়ায় যেন।

দাসী চলিয়া গেল। পুষ্প কহিল—আমি এখনি

অন্নদার কোথাও যাইবার ছিল না। তার ভালো লাগিতেছিল, পুষ্পর এই ধরা দিতে আ অন্নদার হাঁটুতে মাথা রাখিয়া পুষ্পর এই মিনতির ভা প্রণয়-গদগদ সোহাগ-বচনের চেয়ে এ সব ম মাধুর্য্য এক তিল কম নয়! কিন্তু আবার ঐ রাগ তার অন্তর রাগে ফুঁশিয়া উঠিল। হাতে এ বাহিরের পুণ্য-কর্ম্ম কিছু ছিল না, তাই···একটু অবসরে খোসামোদে মন ভুলাইতে আসিয়াছিলে!···

অন্নদা কহিল,—না, আমায় এখনি বেরুতে হ কলকাতা হয়ে ঢাকায় যাবো—দু'দিন সেখানে আ থাকতে হবে।

পুষ্প কহিল,—হুট্ বলতে ঢাকা!

অন্নদা কহিল,—কি করবো, বলো? এই যে বলতে তোমার ডাক পড়লো! আমাদেরো ক কখনো তেমন ডাক পড়ে বৈ কি!

পুষ্প স্বামীর পানে চাহিল। অন্নদার ⋅ যে এইমাত্র সরসতার ছায়া পড়িয়াছিল, মুহূর্ত্তে তা ক গিয়াছে! এখন তার মুখ বেশ গম্ভীর, চোখের কঠিন। পুষ্প ও-মুখের পরিচয় ভালো করিয়াই ⋅ তো!

নিশ্বাস ফেলিয়া পুষ্প কহিল,—তোমার অবশ্য থাকে যদি তো বাধা দেবো না। বাধা দেবার (আমি!

তার বুক দুলাইয়া অভিমানের অশ্রু উথ উঠিল। সবলে সে অশ্রুর বেগ সাম্‌লাইয়া সে নামিয়া গেল।

রতন কহিল,—উইলের তদারকে একটি এসেচেন। উকিলবাবু বললেন, তাঁকে ওখানে নিয়ে গিয়ে একেবারে এখানে আনলেই ভালো হয় ও-বাড়ীতে কেশব ঠাকুরের চর ঘুরচে।

পুষ্প কহিল—বেশ। কখন তিনি আসবেন?

রতন কহিল—উকিলবাবু বললেন, ঘণ্টাখা পরেই তিনি ট্রেণে করে এখানে এসে পৌঁছুবে গোয়েন্দা-পুলিশ।···

পুষ্প কহিল—তাঁকে এখানে এনো।

রতন কহিল—ওঁদের বলি গে।

রতন চলিয়া গেলে পুষ্প গিয়া পাক-কক্ষে প্র করিল। বহুদিন এ-সব দিকে সে লক্ষ্য রাখিতে ⋅ নাই। আগে এ-ঘরে তার কত কাজই ছিল। ⋅ কক্ষের পরিচ্ছন্নতা ছিল অপরিসীম। গোময়ে করিয়াই পাক-কক্ষের সংস্কার—পুষ্পর ছিল তা দু'চ বিষ! অন্নপূর্ণার মন্দিরের মত তার কাছে মর্য্যাদা। এ কয়দিন এ দিকে চোখ দেয় নাই। চারি

বলিল,—জিনিষপত্র এমন নোংরা, এমন অগোছালো, এ-সব দেখতে পারো না?...তার পর উপরে আসিয়া দেখে, অন্নদা নাই। আল্‌নায় তার শিল্কের কামিজটাও নাই। পুষ্প ডাকিল,—সত্য...

সত্য আসিল।

পুষ্প কহিল—বাবু কি বেরিয়ে গেলেন?

সত্য কহিল,—হ্যাঁ, মা।

পুষ্প কহিল—গাড়ী জোতালেন না?

সত্য কহিল—না। হেঁটে গেলেন। বললেন, নৌকো হয়ে খাল দিয়ে গিয়ে ষ্টেশনে উঠবেন।...

পুষ্প কহিল—ব্যাগ কি বাক্স কিছু নিয়ে গেছেন?

সত্য কহিল—শুধু তাঁর ঐ হাতব্যাগ নিয়ে গেছেন।

পুষ্প কহিল,—নিজে বয়ে নিয়ে গেলেন?

সত্য কহিল—হ্যাঁ...

পুষ্প ধমক দিল, ভৎর্সনার স্বরে কহিল,—তোমরা টা বয়ে নিয়ে যেতে পারলে না? বাবু নিজে নিয়ে লেন! এমন তোমরা নবাব হয়েচো...

সত্য সবিনয়ে কহিল—নিতে গেছলুম, মা। তা বাবু মা করলেন যে! বললেন,—না, তোদের যেতে হবে। তোর মা-ঠাকরুণের কি দরকার হয়, না হয়...

চূড়ান্ত হইয়াছে! ছোটখাট সমস্ত ব্যাপারে এমনি াত দিবে? বেশ! এ আঘাত দিয়া তোমার যদি হয়...দাও, পুষ্প এ-সমস্তই মাথা পাতিয়া লইবে।...

কিন্তু এ-সব লইয়া ভাবনা-চিন্তা করিবার অবসরও। এখনি সেই কে গোয়েন্দা-পুলিশ আসিবে। বেলা বাজে...তাঁর আহারের উদ্যোগ-আয়োজন চাই। বলায় অজানা ভদ্রলোক আসিতেছেন...পুষ্প গিয়া ালায় ঢুকিল এবং পাচিকাকে যথারীতি উপদেশ ..

চন আসিয়া যথাসময়ে সংবাদ দিল, সে বাবুটি াছেন...বাহিরের ঘরে তাঁকে সে বসাইয়াছে।

প কহিল—কিন্তু মুস্কিল হলো যে রতন,...বাবু নেই...ওঁকে কে অভ্যর্থনা করবে...? তোর ু এলে ভালো হতো রে...

ন কহিল,—তিনি ষ্টেশনেই কথা কয়েচেন। তাঁর আছে, তাই কলকাতায় চলে গেলেন। বললেন, টো নাগাদ ফিরে আসবেন।

কহিল—এ বাবুটি এখানে খাবেন তো?...

কহিল—তা তো জানি না, মা...

কহিল—সে কথা জিজ্ঞাসা করে এসো...আমি করে রাখি। যদি স্নান করতে চান্...তুমি কে নিয়ে যাও। বলো, এতখানি বেলা হয়েচে, চলবে না...

চলিয়া গেল। পুষ্প আলমারি খুলিয়া কোঁচানো ধুতি ও তোয়ালে বাহির করিতেছিল; সত্য ঘরের হইতে ডাকিল,—মা...

পুষ্প কহিল—কেন রে?

সত্য কহিল—সেই বাবু এসেচেন...

পুষ্প কহিল,—শুনেচি। রতন খপর দেছে। স্নান করবেন কি না, জিজ্ঞাসা করেচিস্?

কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া সত্য কহিল,—তিনি এ এসেচেন...ওপরে।

উপরে! পুষ্পর রাগ হইল—কে বাবু আসিয়া তাকে লইয়া একেবারে এই দোতলার ঘরে! যে আক্কেল নাই? সে একটা পুরানো চাকর! এত বেয়াক্কেলের কাজ করিয়া বসিল! এখন ইহাকে ন ঘরে...

বিরক্ত হইয়া আপনাকে সুসম্বৃত করিয়া সে প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল; দাঁড়াইয়া আগন্তুকের চাহিবামাত্র বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া কহিল—তুমি!..

ভূত দেখিলে মানুষ যেমন বিস্ময়ে অভিভূত পুষ্পর ভাবও ঠিক তেমনি! হাসিয়া আগন্তুক কহি হাঁ, আমি।...

পুষ্প কহিল—তবে যে শুনলুম,...

বাধা দিয়া আগন্তুক কহিল,—চুপ!...কোনো ক নয়। বাড়ী ঢুকেই পরিচয় পেলুম—পেয়ে অবাক্ হলু তাই একটু চমকে দেবার লোভ সম্বরণ করতে না পে পরিচয় দেবার আগেই একেবারে বিনা নোটিশে উপ এসে উঠেচি...তোমার চাকর আমার কাণ্ড দেখে অবাক্ এসে অপরাধ করেচি কি?

পুষ্প কহিল,—অপরাধ কিসের! এসেচো, বে করেচো! তা ঘরে এসে বসো ..

আগন্তুক ঘরে আসিয়া বসিল; ক[illegible],—লোকজনদের সরিয়ে দাও...একটু কথা আছে।

পুষ্প কহিল—চান-টান করবে তো?

আগন্তুক কহিল—নিশ্চয়। এবং আহারাদিও...সেটা বলচো না কেন?

পুষ্প কহিল—আগে চান হোক্, তার পর বলবো।...

তারপর সত্যর পানে চাহিয়া পুষ্প কহিল,—যা, বাবুর চানের ব্যবস্থা করে দে এখনি...

সত্য চলিয়া গেলে আগন্তুক কহিল—অন্নদা বাবু কোথায়?

পুষ্প কহিল—বেরিয়েচেন।

—কখন্ ফিরবেন?

—সন্ধ্যার আগে নয়!

—ভালোই হয়েচে। আমাদের পরামর্শ গোপনে তা হলে চলতে পারবে। শুনলুম, বড় হতভাগা তাঁকে ঘিরে এখানে বেশ একটি আশ্রম গড়ে তুলেচে! যে-কাজে

এসেছি, তাতে ভারী গোপনতার দরকার। এঁদের কাছে আত্ম-প্রকাশ সম্বন্ধে ভারী হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

পুষ্প কহিল,—কিন্তু বুঝতে পারচি না, তুমি হঠাৎ···? শুনেছিলুম, কে গোয়েন্দা-পুলিশ আসচে, ওঁদের ঐ জাল-উইলের তদারকে···

আগন্তুক কহিল,—তাই। আমিই সে গোয়েন্দা-পুলিশ। এরা কেউ জানে না যে, তোমায় আমি জানি! অন্নদাবাবুর নাম শুনলুম। আরো শুনলুম, অন্নদাবাবুর স্ত্রী খুব সাহায্য করচেন···শুনে আমি ভাবলুম, তাহলে বেশ হয়েচে।

পুষ্প কহিল—বিয়ে-থা করেচো?

—না।

পুষ্প কহিল,—কেন?

ম্লান দৃষ্টিতে পুষ্পর পানে চাহিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আগন্তুক কহিল,—তুমি তো জানো···! তবু জিজ্ঞাসা করচো!···থাক্ ও কথা···তোমার খপর কি, বলো?

পুষ্প কহিল,—ভালো। কিন্তু তুমি এত কাছে আছো···কলকাতায়···অথচ···

আগন্তুক কহিল—কেন আসি না? অবসর কম। প্রায় বাইরে দৌড়োদৌড়ি করতে হয়! শুনেচি বটে, তুমি ইচ্ছাপুরে আছো!···তাছাড়া আমি ছিলুম ঢাকায়। কলকাতায় এসেচি আজ পাঁচ ছ'মাস।

আগন্তুক মনে মনে কি হিসাব করিল; করিয়া কহিল—হ্যাঁ, ছ'মাসই···অর্থাৎ আর তু'দিন কাটলে ২৮ তারিখ। ২৮ তারিখে আমার ঠিক ছ'মাস পূরবে!···

পুষ্প কহিল,—মাসিমা কেমন আছেন? কোথায় আছেন?

আগন্তুক কহিল,—মা আছেন এখন বেরিলিতে—নীরুর কাছে। নীরুর বড় ব্যামো গেল কি না! পূজোর সময় এখানে আসবার কথা আছে। অবশ্য আমি যদি সে সময় কলকাতায় থাকি!

পুষ্প কহিল,—একটা বিয়ে-থা করো···এমন লক্ষ্মী-ছাড়া হয়ে আর কত দিন বেড়াবে?

আগন্তুক পুষ্পর পানে চাহিল। পুষ্প দেখিল, সে-দৃষ্টিতে অতীত-স্বপ্নের উজ্জ্বল স্মৃতি জলজ্বল্ করিতেছে···মিলায় নাই! পুষ্প কহিল,—দেখাশোনার জন্য একজন কাকেও চাই তো!

আগন্তুক কহিল,—তার অভাব নেই। আমার তুই আর্দ্দালি আছে—রামভজন সিং আর মাতাপ্রসাদ···তারা ভারী যত্ন করে। বলবো কি, তেমন যত্ন বহু সাধ্বী স্ত্রীতেও করতে পারেন কি না, সন্দেহ! এই আজই···না খাইয়ে কিছুতে ছাড়বে না। তা বললুম, ওরে ভাবতে হবে না—

জুটবে। তবু তারা বিশ্বাস করতে চায় না। শেষে আমি রেজায় রেগে উঠলুম, তখন চুপ করে। ভাব-···স্ত্রীর মত নয়?

আগন্তুক হাসিল। ম্লান হাসি! পুষ্প তা ল··· করিল। কহিল—··· কিন্তু তুমি! কবেকার এক··· স্মৃতি···একটা স্বপ্ন—হয় তো ভুলের স্বপ্ন!···তা আঁকড়ে একটা জীবন কাটিয়ে দেবে! ছি!

আগন্তুক ডাকিল,—পুষ্প···তার স্বরে বেদনা··· আভাস।

পুষ্প কহিল,—তার পর এই পুলিশের চাকরিতে ঢুকলে···! তোমার সামনে যে হাজার পথ খোলা ছিল··· বিষ্ণু দা···

আগন্তুকের নাম বিষ্ণু। বিষ্ণু কহিল,—হ্যাঁ।···সে পথ আজো তেমনি খোলা আছে। এই পুলিশে চাক··· নেওয়া? কেমন খেয়াল হলো···! লোকে পুলিশে··· তুর্নাম করে; বলে, পুলিশ অত্যাচারী, পুলিশ ঘুষখো··· পুলিশ দয়ামায়া-হীন ভাবলুম, বটে! দেখি ত··· পুলিশে ঢুকে···এ তুর্নাম ঘুচোতে আমি অন্ততঃ পা··· কি না···

পুষ্প কহিল,—সবতাতেই তোমার পাগলামি··· চিরদিন একরকমে কাটলো!

বিষ্ণু কহিল,—তাই। আর সেইজন্যই বিয়ে কর··· পারচি না! স্বপ্ন বলো আর যাই বলো,···আমি ··· তা সত্য বলে মেনেছিলুম! সত্য হয়েই চিরদিন ··· স্মৃতির স্বপ্ন আমার বুকে বিরাজ করবে···

বিষ্ণু একটা নিশ্বাস ফেলিল; সে নিশ্বাসে কি গভী··· হতাশা, কি মর্মান্তিক বেদনা, পুষ্প তা বুঝিল। বুঝি··· সে নীরব রহিল।···

বিষ্ণু তার ছোট ব্যাগ হইতে কতকগুলা কাগজপত্র আতস কাচ প্রভৃতি বাহির করিল, করিয়া কহিল,··· প্রকাশ্যে আমি আজ ইছাপুর ছাড়চি···কিন্তু সুগভীর ··· আমায় ফিরতে হবে। আমায় একখানি নির্জ্জন ঘর দিবে··· পুষ্প। কতকগুলো নাম পেয়েচি, তাদের উপর ল··· রাখতে হবে। শক্ত কাজ···আমার গতিবিধি যে··· জানবে না···তোমার লোকজনও না। সমস্ত গ্রাম নিস্ত··· হলে রাত্রে গোপনে আসবো। তোমার লোক-জন··· আমার স্বরূপ নির্ণয় করতে পারবে না। অন্নদা বাবুকে··· এখন আমার কথা নাই বললে। চাটুকার এ··· অনুগ্রহার্থীর ভিড় তাঁর গৃহে খুবই হয়, শুনেছি··· তাঁদের কলরব থেকে নিজেকে গোপন রেখে চ··· চাই···

পুষ্প কহিল,—কিছু আশা আছে?

বিষ্ণু কহিল,—ঘটনাবলী যতদূর পর্য্যালোচনা···

পুষ্প কহিল,—আঃ, তাই হোক্। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।...

আহারাদি সারিয়া বিষ্ণু তেতলার নিভৃত কক্ষে গিয়া কাগজ-পত্র পাড়িয়া বসিল। পুষ্প সংসারের কাজ সারিয়া আপনার ঘরে বসিয়া বিষ্ণুর অতীত জীবন-কাহিনীর পাতাগুলা উল্টাইয়া দেখিতেছিল। প্রাণ-খোলা, সরল, সুন্দর বিষ্ণু...ছেলেবেলায় একসঙ্গে দু'জনের কত খেলা, কত হাসি! দুজনে বসিয়া ভবিষ্যতের কত রঙীন্ ছবি আঁকিত।...পুষ্পর মনের সামনে জীবনের কত নব-নব জগতের সন্ধান আনিয়া দিত...সে-জগতে আলোর কি বিচিত্র দীপ্তি! গৃহকোণই নারীর আশ্রয়-ভূমি নয়—নারীর মনের প্রসার কি অবাধ, তার কাজের ক্ষেত্র কতদূর বিস্তৃত! নারীর বুকে যে-দীপ জ্বলে, তার আলোয় সারা বিশ্বের আঁধার ঘুচিতে পারে! সেই নারীকে কি জীর্ণ অন্ধ-কূপেই না বাঙালী ফেলিয়া রাখিয়াছে! জীবনের মুক্ত ধারার পরিচয় পুষ্প প্রথম পাইয়াছে এই বিষ্ণুর কাছে। সেজন্য বিষ্ণুর কাছে আজীবন সে কৃতজ্ঞ থাকিবে...

তারপর সেই একদিন...মনের মধ্যে কি স্বপ্ন গড়িয়া বিষ্ণু হাত বাড়াইল...কিসের দুর্বার লোভে; বুকে বাজের আগুন জ্বলিল! সে আগুনে কি জ্বালা! বিষ্ণুর বুকে-আশা-স্বপ্ন-ভরা কল্পনার নীড় সে বাজের আঘাতে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে সেও কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল...

পুষ্পর জীবনেও বৈচিত্র্য আসিল! অসম্ভব কি প্রচুর সম্ভাবনায় ভরিয়া তাকে কোথায় লইয়া আসিল! চারিদিকে নূতন সুর, নূতন হাসি, নূতন অশ্রু, নূতন সুখ, নূতন দুঃখ...এত নূতনের মধ্যেও বিষ্ণুর সে স্মৃতি কিন্তু অতীতের অতল-তলে তলাইয়া যায় নাই। স্বামীর সঙ্গে প্রতি এই যে তার বিরোধ চলিয়াছে, এ বিরোধের এখানেও বিষ্ণুর সেই আশ্বাস-বাণী, বিষ্ণুর সে কল্পনার-রচা হাজার ছবি তাকে ধৈর্য্যহারা হইতে দেয় নাই; এবং তা দেয় নাই বলিয়াই এমন অবিচল নিষ্ঠায় নারী হইয়াও গতানুগতিকের মায়া-পাশ ছিন্ন করিয়া কর্ত্তব্যকে সে মাথায় লইতে পারিয়াছে!...

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দাবী

অন্নদা তিন-চার দিন পরেই ফিরিয়া আসিল। রাগ বা অভিমান মনে যতই পুঞ্জিত হউক, পুষ্পকে সে ভালোবাসে! দূরত্বের ব্যবধান তার সহ্য হয় না...বিশেষ অভিমানে যে-ব্যবধান গড়িয়া ওঠে! কাছে থাকিয়া ...ষের বাণী, অভিমানের তীক্ষ্ণ বাণ...তার আঘাত দিয়া প্রাণে একটু আরামও মেলে! দূরে থাকিলে ও পুষ্পর অদর্শনে মনে তখন আরো বেশী ব্যথা জা... হা-হা করিতে থাকে। কাছে আসিয়া আঘা... লোভ দুর্বার হইয়া ওঠে।...তাছাড়া একখানা পাইয়াছে...সে চিঠি পড়িয়া তার শির একেবারে উঠিয়াছে! চিঠির কথা যে মিথ্যা, সে-বিষয়ে ত... নাই। তবু কার এমন স্পর্দ্ধা, এ চিঠি পাঠায়?... এ চিঠির অতি-মৃদু ইঙ্গিত যদি পুষ্পকে বিচলিত ক...

তাই অন্নদা ফিরিল অতর্কিতে রাত এগারো... ভাবিল, একটু চমক দিবে! পুষ্প কি তার... কাতর হয় নাই? নিশ্চয় হইয়াছে। না হইলে হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া কণ্ঠে অমন মিনতির সুর মুখের পানে চাহিবে কেন?...

অন্নদার চোখের সামনে জাগিতেছিল পুষ্পর ... মলিন মূর্ত্তি...নিশি-শেষে চাঁদের ক্ষীণ পাণ্ডু রেখার ম... যেন বিরহ-শয়ন-লীনা যক্ষপ্রিয়া! বুক তার ম... প্রেমে ভরিয়া উঠিল!

দোতলার ঘরে বসিয়া বিষ্ণু তখন ভূরি-ভো... আপ্যায়িত হইতেছে। পুষ্প কাছে বসিয়া খাওয়াইতে ...বাহিরে একখানা গাড়ী থামিল। পুষ্প উঠিয়া ওধার... বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল, চাহিয়া দেখিল, অন্নদা...!

দ্রুত ঘরে ফিরিয়া সে সহাস্যে কহিল,—উ... এসেচেন...বেশ চম্‌কে উঠবেন'খন...

পাঁপর খাইতে খাইতে বিষ্ণু কহিল,—কিন্তু আ... চমক দিতে চাই না সম্প্রতি। এই দইয়ের পাত্র নি... আমি সরলুম আমার সেই তেতলার ঘরে। আমার কথা উল্লেখমাত্র করো না। তার পর ভোর হবার আগেই আ... সরে পড়বো। কাল দুটো হাতের লে... মেলাতে হবে কলকাতায় গিয়ে লালবাজারে ...এবং এখানে ফিরবো, এমনি রাত ন'টার পর। আর দুদিন, বোধ হয়! তৃতীয় দিনে ফয়শালা হতে পারে...

দইয়ের পাত্র হাতে বিষ্ণু সরিয়া পড়িল। পুষ্প হাত ধুইয়া দাসীকে ডাকিয়া কহিল,—শকড়িটা নিয়ে যা...

দাসী আসিবার পূর্ব্বেই অন্নদা আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল—তার মুখে কৌতুকের হাসি! সবলে সে-হাসি সে রুধিবার প্রয়াস পাইল। হাসিয়া পুষ্প কহিল,—হঠাৎ...?

স্বামীর মুখের পানে চাহিবামাত্র তার মুখের কথা বাধিয়া গেল। অন্নদা ভোজন-পাত্র লক্ষ্য করিয়া পুষ্পর পানে চাহিল; তার চোখে এমন ক্রুর দৃষ্টি—তেমন দৃষ্টি পুষ্প পূর্ব্বে কখনো দেখে নাই!

অন্নদা কহিল,—এ কার ভোজ্য নিবেদন হচ্ছিল?...

পুষ্প প্রমাদ গণিল...এ ব্যাপারের মধ্যে এমন কদর্য্যতা কালো কালি মাখিয়া নিমেষে উদয় হইল! কথাটা প্রকাশ করিয়া না বলিলে নয়! অথচ বিষ্ণুর

নিষেধ। পাছে সমস্ত আয়োজন পণ্ড হইয়া যায়, এই তার আশঙ্কা…!

পুষ্প কহিল—আমি খেয়েছি। কম্পিত স্খলিত স্বর।

অন্নদা কহিল—তুমি! এমন সৌখীন ভোজ্য! বাঃ! ভালো ভালো, বিরহিণী বধূ…

হাসিয়া পুষ্প কহিল,—কেন, খেতে কি দোষ? নারী-জন্ম নিয়েচি বলে…?

সেই সময় দাসী আসিল শকড়ি বাসন লইতে। দাসী কহিল—তুমি কি নীচেয় খাবে মা? না, এইখানে দিতে বল্‌বো…?

অন্নদা সবিস্ময়ে পুষ্পর পানে চাহিয়া দাসীকে কহিল, —তোর মা-ঠাকরুণ খায়নি এখনো?…

প্রশ্ন শুনিয়া পুষ্প একেবারে কাঠ!

দাসী কহিল,—না। মা যে বললে, পরে খাবে…

পুষ্প অপরাধ-কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিল স্বামীর চোখের দৃষ্টিতে তখন আগুন জ্বলিতেছে!… ব্যাপার সহসা এ কি মূর্ত্তি লইয়া দাঁড়াইল! পুষ্পর মুখে কথা ফুটিল না।

অন্নদা ধপ্‌ করিয়া ইজিচেয়ারে বসিয়া পড়িল। স্তব্ধ ঘর…দাসী শকড়ি বাসন লইয়া চলিয়া গেল, তার পর ভিজা ন্যাতা আনিয়া ঘর মুছিল, মুছিয়া পুষ্পর পানে চাহিয়া কহিল—তোমার খাবার কোথায় দিতে বলবো মা?

পুষ্প কহিল—আমি খাবো না।

মনিবের সামনে আন্তরিকতা জানাইবার অভিপ্রায়ে দাসী কহিল—রোজই ঐ কথা মা! না খেলে শরীর থাকবে কেন?

পুষ্প কোন কথা বলিল না; নিঃশব্দে গিয়া জানলার পাশে বসিল। তার মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলিতে-ছিল। অন্নদা ইজিচেয়ারে নির্জীব পুতুলের মত নিস্পন্দ বসিয়া রহিল। কাহারো মুখে কথা নাই। স্তব্ধ ঘরের দেওয়ালের গায়ে ঘড়িটা শুধু একঘেয়ে আওয়াজ তুলিয়া নিজের মনে সময়ের বাঁধা পথে অগ্রসর হইয়া চলিতে লাগিল।…

জানলার বাহিরে চাঁদের আলোয় আলো-করা আকাশ …বাতাসের মৃদু মর্ম্মর…প্রকৃতি যেন আজ এই দুটি প্রাণীর গভীর অন্তর্বেদনা বুঝিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছে!…

এমনি স্তব্ধতার মধ্য দিয়া ক্রমে দিনের আলো ফুটিল …ঠিক যেন সেই রূপকথার নির্জীব পুরীর বুকে! পুষ্প কহিল,—খুব আরাম নিয়ে, খুব আনন্দের আশায় বাড়ী ফিরচো! কি ভাবচো, জানি না…তবে ভুল বুঝো না। সব কথা তোমায় বলবো…একটি দিন শুধু সবুর করো…অপমানের ব্যথায় তার বুক যেন ভারী পাথর!

নিশ্বাস ফেলিয়া অন্নদা কহিল—এক দিন কেন জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সবুর করবো…কোন কথা জানতে চাইনি তোমার কাছে।…

ভীত কম্পিত কণ্ঠে পুষ্প কহিল—কি যে তুমি বুঝলে, জানি না। কিন্তু ভয়ে আমার প্রাণ শুকিয়ে উঠেছে! শুধু একটি মিনতি—ভুল করো না, ভুল বুঝো না… এইটুকু দয়া করো।

পুষ্প অন্নদার পায়ে হাত রাখিল। অন্নদা পা সরাইয়া লইল, কহিল,—কোনো ভয় নেই, পুষ্প…একটা বিশ্রী কলরব তুলে চারিদিকে কদর্য্য কুৎসার সৃষ্টি করবো, তেমন দুর্বুদ্ধি হবার আগেই আমি এ গৃহ ত্যাগ করে যাবো…

অন্নদা উঠিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। পুষ্প কহিল,—কোথায় যাচ্ছো?

অন্নদা কহিল,—বাইরের ঘরে। অন্দর তোমার এলাকা। এখানকার বাতাস যেন আমার বুক চেপে ধরচে! একটু নিশ্বাস নিতে চাই। আমি বাঁচতে চাই, পুষ্প…এত বাধা, এত দুঃখের মধ্যেও বাঁচার সাধ তো আমার ঘুচছে না!

অন্নদা চলিয়া গেল। পুষ্প কাঠ হইয়া ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল।…

বহুক্ষণ। নির্জ্জন ঘর…নহিলে কেহ দেখিলে ভাবিত, এক নিমেষে কি মায়া-ছড়ির আঘাতে পুষ্প বুঝি পাষাণের মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে! তেমনি নিশ্চল, নিস্পন্দ সে দাঁড়াইয়া রহিল।…

হেম আসিয়া ডাকিল—দিদি…

পুতুলের চিত্র-করা দুই চোখ তুলিয়া পুষ্প হেমের পানে চাহিল। হেম কহিল,—চাটুয্যে এসেছিল মার কাছে, কেশব কাকাকে নিয়ে। মার হাতে-পায়ে ধরে দু'জনে ক্ষমা চেয়ে…

পুষ্পর চেতনা ফিরিল। পুষ্প কহিল,—মা কি বললেন?

হেম কহিল,—এ আদালতের ব্যাপার…সুধাদাকে জিজ্ঞাসা না করে কোনো কথা বলতে পারবো না—মা এই কথা বলেচে!

পুষ্প কহিল,—ঠিক কথাই বলেচেন।

হেম কহিল,—চাটুয্যের বৌ আর বিধবা মেয়ে আমার সঙ্গে নিয়ে এখানে এসেচে…তোমাকে তারা ধরতে চায়।

পুষ্প কহিল,—আমার শরীরটা বড় খারাপ, হেম সত্যিই। তাঁদের এখন যেতে বলো। আমার মাথা কেমন ঘুরচে, দাঁড়াতে পারচি না…বলিতে বলিতে পুষ্প টলিয়া পড়িয়া যাইতেছিল; হেম তাড়াতাড়ি ধরিয়া ফেলিল, ধরিয়া পুষ্পকে আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল।

হেম কহিল,—আমি ওদের বিদায় করে আসি…

হেম চলিয়া গেল, এবং পরক্ষণেই ফিরিল; ফি…

স্মেলিং শল্টের শিশি লইয়া পুষ্পর নাসাগ্রে ধরিল…ল্যাভেণ্ডার আনিয়া মাথায় দিল…পরে মাথায় পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

বহুক্ষণ পরে পুষ্পর সংজ্ঞা ফিরিল। পুষ্প ডাকিল,—হেম…

হেম কহিল—দিদি…

পুষ্প কহিল,—মাপ করবে ওদের? মার কি মত?

হেম কহিল,—এখন ও কথা যাক্। পরে যা হয়, হবে…

দাসী আসিয়া কহিল—চলো না মা, চান করতে। …এ কি, শুয়ে যে!

হেম কহিল,—দিদির মাথা ঘুরছিল…

দাসী কহিল,—শরীরের উপর এত অত্যাচার সইবে কন? রাত্রে খাওয়া বন্ধ, দিনে ভাতের কাছে একবার খু বসা বৈ তো নয়! এসো, মাথায় বেশ করে তেল খিয়ে দি। তেল মেখে চান করো…তার পর কিছু মুখে দাও…

পুষ্প কহিল,—বাবু খেয়েচেন?

দাসী কহিল,—খেয়েচেন।

পুষ্প কহিল,—তিনি কোথায়?

দাসী কহিল,—বাইরের ঘরে। তুমি উঠে বসো দিকিন্। আমি তেলের বাটি নিয়ে আসি।

হেম কহিল,—আমি এখন আসি। তুমি খাওয়া-দাওয়া করো…যে কষ্ট করচো। ওরা কি বলে, শুনি। আমি একটু পরেই আসবো, সুধাদার কাছে খবর পাঠাতে হবে।

পুষ্প কহিল,—ভগবান্ আমাদের এ-কষ্ট এখন সার্থক রেন…

বেলা পাঁচটা বাজে। সত্য একটা খামে মোড়া চিঠি আনিয়া পুষ্পর হাতে দিল। চিঠি খুলিয়া পুষ্প দেখে, দা লিখিয়াছে। পেন্সিলে লেখা দুটি মাত্র ছত্র…

আমি তোমার অযোগ্য, তা জানি! যদি আর াহাকেও ভালোবাসিয়া সুখী হও, বাসিয়ো। আমার পত্তি নাই। আমার জন্য ভাবিয়ো না! আমি -দুঃখী; সুখে আমার দাবী নাই।

পুষ্পর পায়ের তলা হইতে পৃথিবী সরিয়া যাইতেছিল। নো মতে আপনাকে খাড়া রাখিয়া পুষ্প কহিল,—থায় তোর বাবু?

সত্য কহিল—বাইরের ঘরে…

পুষ্প কহিল,—আর কেউ আছে সেখানে?

সত্য কহিল—না।…

পুষ্প তখনি ছুটিল স্বামীর কাছে। না, না, স্বামীর পক্ষে কোনো কথা লুকানো নয়! পাপ হয়! সে কেশ বুক ভাঙ্গিয়া যায়, সংসার চূর্ণ হয়…

ঘরের দ্বার-জানালা ভেজানো…অন্নদা ত বিছানায় শুইয়া ছিল। পুষ্প আসিয়া জানা দিল। অন্নদা চাহিয়া দেখিল। তার দুই চে জবাফুলের মত লাল…ফুলিয়াছে।

পুষ্প আসিয়া অন্নদার পাশে বসিল; অন্ন চোখে জল! পুষ্প কহিল,—এ কি হচ্ছে? ে কেন বলো তো, শুনি? কি এমন হয়েচে যে…

পুষ্পর স্বর গাঢ় হইয়া আসিল; সে আর-কিছু পারিল না।

অন্নদা কহিল,—আমার তো কাঁদতেই জন্ম!

পুষ্প কহিল, কথ্খনো না। কেন? কি দুঃে কাঁদবে? আর এ কি চিঠি লেখা হয়েচে? স্বামী মেয়েমানুষ আর কাকেও ভালো বাসতে পারে কথে না, ভালোবাসে? ছি! এই বুদ্ধি হয়েচে তো এ সব কথায় বুঝি স্ত্রীর অপমান হয় না? তুমি ৎ তোমার শক্তি আছে বলে…

ছল-ছল নয়নে অন্নদা পুষ্পর পানে চাহিয়া রহিল

পুষ্প কহিল—তোমায় খুলে বলি তবে কাল কথা—শোনো। ওদের ঐ জাল উইলের মামলা চ না? পুলিশে তার তদারক চলছিল, জজের হুকুে এ কাজে গোয়েন্দা পুলিশ আসে। সে কে, জানে বিষ্ণু দা!—নাম শুনেচো? সেই যে…তোমায় ব ছিলুম, সম্পর্কে আমার মাসতুতো ভাই, এলাহাবা থাকতো…ভারী একরোখা ছেলে। ওর বাবা, মাে আমার মেশোমশায় এলাহাবাদে একজন খুব বড় ডাক্ত ছিলেন। অনেক সাহেব-সুবোর কাছ থেকেই ডা আসতো।…এক সাহেব ছিল, সিডন্স… সে পরিবারের সে ওঁদের খুব মেলামেশা। সিডন্সের মেয়ে লুসিকে বিে করবে বলে বিষ্ণুদা ক্ষেপে ওঠে। কিছু মনে পড়চে না? বা, তোমায় বলেছিলুম তো…ভাখো দিকি মনে করে…

দেওয়ালের পানে চাহিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া অন্নদা কহিল—মনে পড়েচে,…সেই যমুনার কাছে যাঁদের মস্ত বাড়ী…?

পুষ্প কহিল—হ্যাঁ। তা বিষ্ণুদা এখন গোয়েন্দা পুলিশ। সে এসেচে ঐ উইলের তদারকে। নিরিবিলিতে সকলের লক্ষ্য এড়িয়ে তদারক করবে বলে ছদ্মবেশে এসেচে। আমাদের এখানে তেতলার ঘরে আছে… কেউ ওর পাত্তা না পায়! তোমাকেও দেখা দেবে না, বলেছিল। কেন না, গাঁয়ের সকলেই তোমার কাছে আসে, বসে। ঘুণাক্ষরে কেউ না কিছু টের পায়…এই জন্ম। কাল রাত্রে সে খেতে বসেচে, এমন সময় তুমি এলে…দইয়ের বাটি হাতে নিয়ে সে অমনি তেতলার ঘরে ছুটলো। বয়স হলে কি হয়, এখনো সেই ছেলেমাস্কী! …আর তুমি এসে ঐ সব অকথা কুকথা বললে আমার!

কি করে এ সব কথা মনে এলো, ভেবে অবাক্ হয়ে আছি!

অন্নদা মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিল…যেন ঝড়! সে নিশ্বাসে রাজ্যের দুশ্চিন্তা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়!

অন্নদা সস্নেহে পুষ্পর হাত নিজের হাতে চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—মুখ্যুর অশেষ দোষ, পুষ্প। না হলে…কিন্তু একটা কথা…নিজেদের নির্দ্দিষ্ট জীবনধারা ছেড়ে একটু এদিক-ওদিক করচো বলেই না এত ঝঞ্ঝাট…

পুষ্প কহিব,—তা হোক…মানুষ তা বলে আত্মসর্ব্বস্ব হয়ে বাস করতে পারে না।

অন্নদা কহিল,—কোন্ শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু আমায় কি লিখেচেন…ছাখো। পোষ্টাফিস থেকে আমার চিঠি re-direct হয়ে যেতো…আমি ব্যবস্থা করেছিলুম…

অন্নদা পুষ্পর হাতে এক-টুক্‌রা কাগজ দিল। তাহাতে লেখা আছে,—

রাত্রে মিসেস্ অন্নদার ও পুরুষ বন্ধুটি কে আসা-যাওয়া করে? একটু সন্ধান নিতে হানি কি? না, ইহাতে একালে স্বামীর অনুমতি আছে?

পুষ্প রাগিয়া চিঠিখানা কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল; কহিল,—এ চিঠির কথা নিয়েও তুমি ভাবো! ছি! এ পাড়াগাঁ দেখচি, তোমায় ছাড়তে হবে। এখানকার হাওয়া তোমার মনে ঘুণ ধরিয়ে তুলবে, কোন্ দিন…! মাথা ঠাণ্ডা করো! এই হীন ইতর ইঙ্গিত! ছি! স্বামি-স্ত্রীর অতি গভীর ভালোবাসা আর বিশ্বাস…দুনিয়ার সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধে সতেজে সবিক্রমে তা দাঁড়াতে পারে! আর এই বিশ্বাস-ভালোবাসায় নির্ভর রেখে বিচ্ছেদের মধ্যেও স্বামি-স্ত্রী কত বড় শক্তিতে শক্তিশালী হয়ে থাকে। এ যে তার কি দুর্ভেদ্য ধর্ম্ম! দুনিয়ার কোনো রাবণ কোনো উর্ব্বশী-সূর্পণখা বিপুল শক্তি, কুহক, আর মায়া-জালেও সে বর্ম্ম ভেদ করতে পারে না!…কিন্তু তোমার মন এ ইতর সংসর্গে বিচলিত হলো…

সহসা বাহিরে কোলাহল উঠিল। অন্নদা কহিল—ব্যাপার কি?

পুষ্প উঠিয়া দাঁড়াইল, ডাকিল,—সত্য…

সত্য আসিবার পূর্ব্বেই শ্মশ্রু ও গুম্ফে-ভরা-মুখ বিষ্ণু আসিয়া উদয় হইল; তার পিছনে পাঁচ-সাতজন কনষ্টেবল আর কোমরে দড়ি বাঁধা চাটুয্যে, কেশব ও হানিফ মণ্ডল।…

পুষ্প বহিল—ব্যাপার কি?

বিষ্ণু কহিল,—পুষ্প, ভাই, রাত্রি অবধি ধৈর্য্য আর রইলো না…চাটুয্যে ফেরার হবার চেষ্টায় ছিলেন…কাজেই ওয়ারেন্ট বার করে ছুটে আসতে হলো। ফন্দী বেশ খাটিয়েছিলেন। ও-বাড়ীর পাঁচ বাবুর কাছে মাপ চাইবার ভাণ করেছিলেন খাশা! অভিপ্রা[য়] ওঁদের চিত্ত একটু বিগলিত করে সেই অবসরে পালাবেন কিন্তু এ তো মাপ করবার কেশ্ নয়। দায়রায় জুরি বিচার হবে; এবং ভাগ্যে থাকে তো সমুদ্র-লঙ্ঘন করতে পারেন! বিধাতার মনে কি আছে, তিনি জানেন ষ্টেশনে গাঁটরি-সমেত আমার হাতে তো ধরা প[ড়ে] গেলেন! উইল জাল, তার এমন অকাট্য প্রমাণ আ[ছে] …আর এই ত্রিমূর্ত্তিই এ কাজের পাণ্ডা। সব প্রমা[ণ] করে দেবো। আদালতে আমার জয়ধ্বনি প্রচার হবে!…

পুষ্প কহিল,—কিন্তু ওদের কি সত্যই মার্জ্জনা পাবা[র] আশা নেই?

বিষ্ণু কহিল—না। এ দায়রার মামলা।…আ[র] মাপ করতে চাও এদের? তাহলে পরের বারে গ্রা[ম] শুদ্ধ হয় তো জাল করে ফেলবেন! শয়তানকে মা[প] করার অর্থ, সমাজকে বিপন্ন রাখার ব্যবস্থা!…এইবা[র] এদের চালান দি। দিয়ে এসে অন্নদাবাবুর সঙ্গে আলা[প] করবো। তাঁর বিনানুমতিতে তাঁর গৃহে প্রবে[শ] করেছিলুম…

অন্নদা কহিল,—গৃহ যাঁর, তাঁর আতিথ্যই নিয়েচে[ন] …আমার অনুমতির কোনো প্রয়োজন ছিল না।

হর্ষোৎফুল্ল বিষ্ণু আসামীদের লইয়া বিদায় হইল।

পুষ্প কহিল,—এবার বোধ হয় গ্রামে শান্তি এলো…

অন্নদা কহিল—গ্রামে আসুক না আসুক, শা[ন্তি] এসেচে আমার চিত্তে…পুষ্প। আজ থেকে তোমা[য়] আমি শান্তি বলেই ডাকবো। শান্তি, আমার শান্তি…

হাসিয়া পুষ্প কহিল,—কিন্তু আর যেন ভ্রান্তি ন[া] হয়। খবর্দ্দার!

… … … …

রাত্রে ভোজের আয়োজনে সমারোহ বাধিয়াছি[ল] অন্নদার গৃহে। জয়মণির আশীর্ব্বাদ আর ক্রন্দন…

অন্নদা কহিল—সব ভালো, বিষ্ণু বাবু। শুধু অ[…] স্বদেশী হন্! রূপসী বিদেশিনী তো নাগালের বা[ইরে] হয়ে গেছেন। বিয়ে করে তোফা আরামে সে বা[স] করচে। আমাদের ইচ্ছা, আপনি বিয়ে করে আমাদে[র] দলভুক্ত হন্…

পুষ্প কহিল,—লক্ষীটি, বিষ্ণুদা…পাত্রী আমি দেখে রেখেচি।

বিষ্ণু কহিল—বটে! কোথায়?

অদূরে হেমলতা বসিয়া ঘোলের শরবৎ তৈরী করিতে-ছিল। পুষ্প তার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল—ঐ যে… ওঁদের যে বিপদে রক্ষা করেচো! তোমায় মনের মত reward দেবার জন্য ওঁরা একেবারে কি [...] হয়ে যে আছেন! ভিক্টোরিয়া-ক্রশ কিম্বা কোহিনূর…

পাবেন ? আমি দেখছি, ঐ হেমলতা ছাড়া দেবার মত সামগ্রী ওঁদের আর নেই! আমি সার্টিফিকেট দিতে পারি, বিষ্ণুদা···ভিক্টোরিয়া ক্রশের চেয়েও এ-reward-এর দাম ঢের বেশী। নিলে বুঝবে···

বিষ্ণু হাসিল। হাসিয়া কহিল,—তুমি যে ডিটেক্টিভ্ উপন্যাস বানিয়ে ফেললে, পুষ্প! রহস্য-নাটকের উপসংহারে প্রধানা নায়িকার সঙ্গে ডিটেক্টিভের বিবাহ!

জয়মণি দেবী কাছে বসিয়া খাওয়া দেখিতেছিলেন, তাঁর দুই চোখ কৃতজ্ঞতার ভারে অশ্রু-সজল হইল। গদগদ কণ্ঠে তিনি কহিলেন,—Reward নয় বাবা। গরীবদের যখন এত করলে, তখন ওটুকুও যদি দয়া করে···

বিষ্ণু একবার হেমলতার পানে চাহিল। কাজের আগ্রহে-পরিশ্রমে হেমের নিটোল দুটি গাল লাল হইয়া উঠিয়াছে!

বিষ্ণু কহিল—আচ্ছা, আচ্ছা, সে না হয় পরে বিবেচনা করে দেখা যাবে।

পুষ্প কহিল,— জানো সেই গান···সেই যে

বাঙলা দেশের মেয়ে—
কে রূপসী তার চেয়ে ?
তার কালো চোখে কি যে মায়া—
কালো কেশে আরাম-ছায়া।

বিষ্ণু কহিল,—তুমি থামো, পুষ্প, ডিটেক্টিভ উপন্যাস আর মেলো ড্রামার তুমি মিক্শ্চার করচো ক্রমশঃ!

পুষ্প কহিল—শরবৎ তৈরী হলো, হেম ?

হেম কহিল,—এই যে দিদি, তাই নিয়ে যাচ্ছি।

পুষ্প কহিল···কণ্ঠস্বর শুনলে! বীণার ঝঙ্কার! বিদেশিনীর স্বপ্ন ভেঙ্গে সত্য জীবনে জাগো, বীর! সত্যি বিষ্ণুদা, বিদেশের স্বপ্ন ছেড়ে স্বদেশের সত্যকে ধরো, বুক জুড়িয়ে যাবে।

বিষ্ণু কহিল—যা বলেচো।

অন্নদা এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল; এখন সে কহিল, বলিল—স্বপ্ন আমাদের ক্ষণে ক্ষণে দিক্‌ভ্রান্ত করে, অশান্ত করে; সত্য কঠিন হলেও শান্তি আছে। আমার জীবন-কাহিনী আপনাকে [illegible] খন; জীর্ণ-শাখায় পুষ্পমঞ্জরী দেখুন তো কেম[illegible] আছে! অতএব, আপনিও শ্রীমতী হেমলতা[illegible] পাণিগ্রহণ করে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান্। [illegible] বহু দুর্বৎসরের দুষ্ট স্মৃতি নিমেষে বিনষ্ট হ[illegible] দেখবেন শিবাস্তে পন্থানঃ! একটি শান্তিময়ী জগতের বহু অশান্তির উচ্ছেদ করেন।

বিষ্ণু হাসিয়া কহিল,—আপনি আমায় ভারী [illegible] করে তুলচেন।

পুষ্প কহিল,—টাণ্টালাসের পেয়ালা নয়। নেই! সুধাপাত্র হাতে নিয়ে সামনে লক্ষ্মীরিয়ং [illegible] বর্ত্তির্নয়নয়োঃ! ও হেম, এই শরবৎ-সুধা-লোলুপ অ[illegible] কণ্ঠ যে বিশুষ্ক হয়ে রইলো, ভাই—আনো তে[illegible] নবনী-তক্র···

হেম কাঁচের গ্লাসে ঘোল ভরিয়া আনিল; পু[illegible] ইঙ্গিতে বিষ্ণুর পাতের সামনে গ্লাস রাখিল। অ[illegible] কহিল,—বাঃ স্বয়ম্বর-সভায় আমিও হাজির রয়ে[illegible] আমায় এড়িয়ে ঐ তরুণের সামনে সুধার পাত্র [illegible] দিলে হেম!

সরম-ভরা হাসির দীপ্তিতে হেমের মুখ উজ্জল হই[illegible] উঠিল। বিষ্ণু চোখ তুলিয়া চাহিতে হেমের কম্পি[illegible] দৃষ্টির সহিত তার দৃষ্টি মিলিল। হাসিয়া পুষ্প কহিল,—এই যে শুভদৃষ্টি হয়ে গেল! বাঃ! এ চোখ যে[illegible] আর কারো পানে ফিরবে না, বিষ্ণুদা···

অন্নদা কহিল,—বিষ্ণুদা তো তাই চান্। আসামী পাকড়াবার কাজে ওঁর হাত-যশ প্রচুর! কারণ, শ্রীমতী হেমলতা দেবীও আজ গ্রেফ্তার। জামিনে ছাড়বেন না, বিষ্ণু বাবু! সকলে বলুন, শান্তিঃ শান্তিঃ! পুষ্প, আজই রাত্রে পাঁজি দেখে ফ্যালো। পুলিশের রিওয়ার্ডের ব্যবস্থা শুভদিনের নির্ঘণ্ট দেখে পাকা করে তোলা চাই। শ্রীমতী হেমলতা দেবী, এ ব্যাপারে আপনি আমাদের প্রধান এবং একমাত্র সহায়! বিষ্ণু বাবুর যত চক্ষু-লজ্জাই থাকুক, এ রিওয়ার্ড তাঁকে নিতেই হবে।

শেষ

মণিদীপ

কহিল,—কোনো
না ?
কহিলেন,—না। সেদিকে ওর
মিই ওর একটি মাত্র পাঠক।
ছ' চারটে পড়ে শোনায়। আমা
য়ে শুনতে হয়! কি করি, ও
নো, ও-সবগুলো, তোমাদের ঐ
ন ভালো বুঝতে পারি না
মারী মনে ব্যথা

মোহন মুখোপাধ্যায়

"Where the heart lies,
let the brain also lie there."

তুমি যে আমায় কতখানি দেছ, কেহ না জানে!
ভরিয়া দেছিলে পরাণ, শুধুই আশার গানে!
প্রেমের স্নিগ্ধ মণিদীপ জ্বালি, আলোয় তারি
অন্ধ নয়নে কি দিঠি মিলালে, কহিতে নারি!
সে আলোয় দেখি নূতন বিশ্ব, মানব-চিত্ত
কি সুখে-দুঃখে, আশা-নিরাশায় করিছে নৃত্য!
অক্ষম হাতে তুলে দিলে সখি, তুলিকা-লেখা,—
আঁকিনু ক্ষুদ্র দুঃখ-সুখের কত না রেখা!
সে দুখে ঢেলেছ অশ্রু, সুখে সে মধুর হাসি!
সে-ছবি আমার অমনি ফুটেছে রঙের রাশি!
আর কারো ভালো লাগিল কি না, তা দেখিনি চেয়ে!
আমার সে আঁকা সার্থক—তব পরশ পেয়ে!

আজ তুমি নাই! ওগো, পাশে নাই! আমার ছবি
রঙ্ কোথা পাবে? কালির আঁচড়,—মিথ্যা সবই!
তবু মন—সে তো বুঝিতে চাহে না, হে চির-সখি,
—চোখের আড়ালে টুটিবে মিলন, সাধ্য সে কি!
তাই এ কালির আঁচড় আমার—বুকের ধন এ,
তোমারো এ যে গো বড়-সোহাগের, জানি তা মনে!
এ কালির লেখা লয়ে দাঁড়ায়েছি আঁধার রাতে—
ওগো কথা কও, কথা কয়ে বলো, "নিলেম হাতে!"

সৌরীন্দ্র

ভবানীপুর
২রা শ্রাবণ, ১৩

প্রথম প্রণয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

গৃহে ফিরিয়া বসিবার ঘরে ঢুকিয়া বরদাবাবু ডাকিলেন,—বিভা—

কালো রঙের শাড়ী-পরা এক অপূর্ব্ব-সুন্দরী কিশোরী চঞ্চল চরণক্ষেপে—বাবা—বলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল; কিন্তু পিতার সহিত অপরিচিত এক তরুণ যুবাকে দেখিয়া সসঙ্কোচে থমকিয়া দাঁড়াইল। যুবার হাত ধরিয়া বরদাবাবু হাসিয়া কহিলেন—এঁকে চিনতে পারচিস্ না? ঁর নাম শিশির বাবু—যাঁর লেখা গল্প-টল্প পড়ে তোরা ব সুখ্যাতি করিস্ রে! ইনি সেই শিশির বাবু। খানকার কলেজে ইনি ফিলজফির প্রফেশর—আজ চ-ছ' মাস ভাগলপুরে রয়েচেন। তাহার পর যুবার কে ফিরিয়া বলিলেন,—বসুন, শিশির বাবু—

শিশির নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে আসন গ্রহণ করিলে দাবাবু হাঁকিলেন, রামফল—

সে আহ্বানে একজন ভৃত্য আসিয়া দেখা দিল। াবাবু তাহার হাতে লাঠিগাছটা দিয়া চাদরখানা লের উপর ফেলিলেন ও সম্মুখস্থ ইজিচেয়ারে বসিয়া লেন,—এইটি আমার মেয়ে, শিশিরবাবু,—বিভা। কথা আপনাকে বলছিলুম। বেচারী নেহাৎ একলা । বাড়ীতে আমার আর তো কেউ নেই—আমি আমার এই ছোট্ট মা-টি। তুই ঐ চেয়ারটায় বোস্ ভা। দাঁড়িয়ে রৈলি কেন? এঁর সঙ্গে আলাপ এঁকে আজ আমি একরকম আবিষ্কার করেচি। শিশির বাবু, নয়? বলিয়া বরদা বাবু হা-হা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

শির একবার মুখ তুলিয়া বিভাকে দেখিয়া লইল। সুন্দরী বটে! কালো রঙের কাপড়খানিতে সে রও যেন মাধুরী ফুটিয়াছে। বিভা সস্মিত দৃষ্টিতে ন আগন্তুককে দেখিয়া লইতেছিল। সে দৃষ্টির শিশিরের চোখ আপনি নত হইল। বিভা কথা কহিল না, বা কোনো রূপ চাঞ্চল্য দেখাইল শিশিরের মনে হইল, সে যেন এই ক্ষুদ্র নিভৃত থা হইতে দস্যুর মত সহসা প্রবেশ ল সহজ আনন্দটুকুকে একেবারে হরণ ইয়াছে! সে না থাকিলে এখনই এ ঘরে হাসি ও

তুষ্ট স্মৃতি নিয়ে

শিবাস্তে পন্থানঃ! একটি

গন্ধে বহু অশান্তির উচ্ছেদ করেন। ঈষৎ

হইল হাসিয়া কহিল,—আপনি আমায়

লচেন। এঁরই

ছিল কহিল,—টাণ্টালাসের পেয়ালা মৎকার

পড়েচে সুধাপাত্র হাতে নিয়ে সামনে —দুটো ও

জিনিষ ন ও হেম, এই শরবৎ-সুধা পরটির আ

করলে কবির রইলো । ঠিক কথা!

খাঁটি কথা! আর কি যুক্তি দিয়েই তা বুঝিয়ে সত্যি বিভা, ইনি যে এমন ইংরিজি লিখতে পারে বোধ হয় তোর জানা ছিল না। তুই সেদিন ওঁর একটা গল্পের খুব সুখ্যাতি করছিলি না? ভারী বাঙলা লেখেন, বলছিলি! হাঁ ভালো কথা, শি বাবু, আপনি চা খান তো?

সলজ্জভাবে ঘাড় নাড়িয়া শিশির সম্মতি জানা কহিল, "আপনি আমায় 'বাবু' বলবেন না, শুধু শি বলবেন। বাবু বললে আমি বড়ই লজ্জা পাবো।

বরদাবাবু কহিলেন—কেন, আপনি কি এই ন শ্রীযুতদের দলে? শিশির বিভার পানে চকিতের একটা লজ্জামিশ্রিত দৃষ্টি হানিয়া মৃদু স্বরে কহিল,- আপনি আমার পিতৃতুল্য। আপনি আমায় 'আপনি' বলে কথা কইলে আমার বড় সঙ্কোচ হয়।

বরদাবাবু উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, ওহোহো, তা বলচেন! আচ্ছা, আমি তোমাকে 'তুমি'ই বলবো। বিভা তুমি মা দু' কাপ চায়ের জোগাড় ছাখো। আপনি কি চায়ে চিনি বেশী পছন্দ করেন, শিশির বাবু? না, না, ভুল হয়েচে, পছন্দ করো?

কোনোমতে শিশির উত্তর দিল,—আজ্ঞে না, বেশী চিনি দিতে হবে না।

বিভা উঠিয়া গেল। বরদাবাবু কহিলেন,—বুঝেচেন শিশির বাবু? না, না, বুঝেচো শিশির, বিভা নেহাৎ একলাটি থাকে। ওর সঙ্গী বা বন্ধু কেউ নেই। আমি বুড়ো মানুষ, তায় আমার আবার একটু নুড়ি-পাথর নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা রোগ আছে। আমার স্ত্রী মারা গেছেন আজ দশ বছর; বিভা তখন সাত বছরের মেয়ে। সেই অবধি ঐ নুড়ি-পাথরে ঝোঁকটাও আমা অসম্ভব বেড়ে গেছে। তবু এর মধ্যে বিভার লেখাপড় দিকে যে মোটে মনোযোগ করিনি, তা ভেবো না।

ইংরিজি সংস্কৃত অনেক পড়ে ফেলেচে। তা-ছাড়া ওর একটু বাঙলা লেখার সখও আছে। এত-বড় মোটা খাতা পাঁচ ছ'খানা লিখে ফেলেচে, গল্প আর কবিতা—নেহাৎ মন্দ লেখে না।

শিশির একটা কথা কহিবার বিষয় পাইয়া যেন বর্ত্তাইয়া গেল। সে কহিল,—কোনো মাসিক-পত্রে ছাপিয়েচেন সে-লেখা?

বরদাবাবু কহিলেন,—না। সেদিকে ওর খেয়াল নেই। এই আমিই ওর একটি মাত্র পাঠক। মাঝে মাঝে আমাকেই দু' চারটে পড়ে শোনায়। আমাকেও মুড়ি-পাথর সরিয়ে শুনতে হয়! কি করি, ও ছাড়ে না। কিন্তু কি জানো, ও-সবগুলো, তোমাদের ঐ কবিতা কি গল্প, আমি কেমন ভালো বুঝতে পারি না। তবু শুনতে হয়—না হলে বেচারী মনে ব্যথা পাবে। আমিই ওর মা-বাপ, ভাই-বন্ধু, সব কি না!

বরদাবাবুর স্বর ঈষৎ আর্দ্র হইয়া আসিল। শিশির তাহা বেশ বুঝিতে পারিল। এই স্বরে বৃদ্ধের অন্তরটুকু যেন তাহার চোখের সম্মুখে জ্বল্-জ্বল্ করিয়া ফুটিয়া উঠিল: স্নেহময় সুন্দর একটি প্রাণ—সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ, সমবেদনায় সুমধুর!

বরদাবাবু একটু থামিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন, পরে আবার কহিলেন,—"তুমি যদি মাঝে মাঝে এসে ওর সঙ্গে একটু আধটু সাহিত্যালোচনা করো—তাহলে দেখবে, ও বেশ বুদ্ধিমতী! মেয়েটার যখন এদিকে ঝোঁক একটু আছে, তখন আমার ইচ্ছে নয়, সেটা দমে যায়! ঐ নিয়ে ও যদি ভালো থাকে, থাকুক!

শিশিরের চিত্তে একটা তীব্র কৌতূহল জাগিল। সে কৌতূহলে বেদনাও যে একটু না ছিল, এমন নয়। বিভার এই সুন্দর তরুণ জীবনে তবে বিষাদ কি কোনো করুণ রেখা পাত করিয়াছে? অকাল-বৈধব্যের ছায়া কি তার এই শুভ্র জীবনে কালি মাখাইয়া দিয়াছে? কিন্তু না, তাহার ঐ সজ্জিত সুন্দর বেশ, সস্মিত দৃষ্টি!

তবু একবার কথাটা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা সে রোধ করিতে পারিল না; কোনোমতে জিজ্ঞাসা করিল,—মেয়েটির বিয়ে ছান্ নি?

বরদাবাবু যেন স্বপ্নোত্থিতের মত কহিলেন,—এ্যাঁ! বিয়ে! না, বিয়ে আর দেওয়া হলো কৈ?

বরদাবাবু আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু বলা হইল না। বিভা কক্ষে প্রবেশ করিল, সঙ্গে রামফল; তার হাতে ট্রে, ট্রের উপর চায়ের কেট্‌লি, কাপ প্রভৃতি সরঞ্জাম।

বরদাবাবু একটা বড় রকমের নিশ্বাস চাপিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন,—এই যে চা তৈরী। বাঃ, এর মধ্যে হয়ে গেল!

বিভা কহিল,—রামফল আগে থেকেই জল চাপিয়ে রেখেছিল।···পরে কাপে চা ঢালিয়া চামচে চিনি ভরিয়া শিশিরের দিকে চাহিয়া কহিল,—আপনার কাপে দু'চামচ চিনি দি?

শিশিরের সারা দেহে যেন বিদ্যুৎ বহিয়া গেল। কোনোমতে মুখ তুলিয়া জড়িত স্বরে সে কহিল,—না, এক চামচেই হবে।

চায়ের কাপ মুখে তুলিতে শিশিরের সব কেমন গুলাইয়া গেল। একজন কিশোরীর সহিত এমন অসঙ্কোচ আলাপ—তাহার জীবনে এই প্রথম! ফিলজফির প্রফেশরি করিলে কি হইবে, এখনও তার বিবাহ হয় নাই। নারী-হৃদয়ের সহিত তাহার পরিচয় গৃহে আপনার মাতা ও ভগ্নীদের লইয়াই! সে স্নেহ, সে অভ্যর্থনা আর এক জিনিষ। কিন্তু এ অভ্যর্থনার মাধুরী—এ অপূর্ব্ব! কেতাবে-পড়া নারী-চরিত্র হইতেই তার নারী-হৃদয়ের অভিজ্ঞতা! তার উপর রঙ্ ফলাইয়া কল্পনার তুলিতে গল্পে-উপন্যাসে সৃষ্টিছাড়া কত নারীর চিত্র সে আঁকিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজিকার এই বিজন প্রবাসে মধুর সন্ধ্যায় নারী-হৃদয়ের যে সঙ্কোচ-হীন সরল সহজ লীলাটুকু তাহার চোখে পড়িল, তেমন ছবি তাহার কল্পনাতেও কোনো দিন উঁকি দেয় নাই!

চা পান করিয়া বরদাবাবু কহিলেন,—ঐ যাঃ! বেরুবার আগে যে পাথরটা দেখছিলুম, সেটা বাগানেই ফেলে এসেচি। যাই, দেখে তুলে আনি সেটা···

বরদাবাবু চলিয়া গেলেন। শিশিরের বুকের মধ্যটা অস্বাভাবিক স্পন্দনে দুর-দুর করিয়া উঠিল। সে স্পন্দনের ধ্বনি শুনিয়া লজ্জায় তার মরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল। তার শুধু মনে হইতে লাগিল, মূকের মত এমনভাবে বসিয়া থাকাটা নিতান্ত বিশ্রী দেখাইতেছে! একটা কিছু কথা বলা ভারী দরকার—নহিলে মহিলার সম্মান রক্ষা হয় না। আর এমন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে এই বুদ্ধিমতী কিশোরীর মনে এ ধারণাও জন্মিতে পারে যে, সে একেবারেই বেকুব! কিন্তু কি কথা কওয়া যায়? কি কথা?

সহসা একটা কথা মনে পড়িল। অমনি তাহার মন সস্মিত হইয়া উঠিল! বাঃ, ঠিক হইয়াছে—এই ব্যাপার লইয়াই কথা আরম্ভ করা যাক—বিষয়টা প্রাসঙ্গিক হইবে এবং প্রথম আলাপের পক্ষেও মন্দ নয়।

শিশির কথা কহিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু মুখ দিয়া এমন একটা জড়িত অস্পষ্ট স্বর বাহির হইল যে তার মনে হইল, এই মুহূর্ত্তে চক্ষু মুদিয়া সে ঘর হইতে ছুটিয়া পলায়! সুন্দরী শ্রোত্রীটি কোনোরূপ চাঞ্চল্যের আভাস-মাত্র না দিয়া কহিল, আমাকে বলচেন?

শিশির ভাবিল, এমন বিপদেও মানুষ কথা কহিতে গেলে স্বর বাধিয়া যায়!

প্রাণপণ বলে স্বরটাকে স্পষ্ট করিয়া শিশির কহিল,—আমার এ তুচ্ছ নগণ্য লেখা আপনি তাহলে পড়েন—এ শুনে আমার ভারী আনন্দ হচ্ছে!

বিভা দিব্য অচপল স্বরেই উত্তর দিল,—আপনার কতকগুলো গল্প আমার ভারী ভাল লেগেচিল। সত্যি! সবগুলো অবশ্য সমান নয়। সেগুলো আমি বাবাকেও পড়ে শুনিয়েছি। শিশির মুগ্ধ হইয়া গেল। তার লেখার এমন পাঠিকা আছে! আর সে পাঠিকাকে কখনও চক্ষে দেখিবে, ইহা সে স্বপ্নেও কোনো দিন ভাবিতে পারে নাই!

শিশির কহিল,—শুনলুম, আপনি বেশ লিখতে পারেন। দয়া করে সেগুলি আমায় একবার পড়তে দিতে হবে! আমি তাহলে কৃতার্থ হবো।

মৃদু হাসিয়া বিভা কহিল,—বাবা বুঝি বলেচে? হ্যাঁ, সে আবার লেখা! আপনি পাগল হয়েচেন!

শিশির কহিল,—পাগল হবো কেন? একটু আলাপেই যা বুঝেচি, তাতে আপনার বাবার উপর আমার শ্রদ্ধা বড় অল্প হয় নি।

বিভা একটু হাসিয়া উত্তর দিল,—না, সে আমার মাপ করবেন, শিশিরবাবু—সে আমি কিছুতেই দেখাতে পারবো না! আপনি একজন অত-বড় লেখক—না, না, সে লেখা দেখানো হবে না।

শিশির কহিল,—আমি তরণীতে ছাপাবার জন্য পাঠিয়ে দেবো।

বিভা কহিল,—আমি তো সে-সব ছাপাবার জন্য লিখি না—আর সে সাধ্যও আমার নেই। তা-ছাড়া ছাপাবার মত লেখা যদি হবে, তাহলে কি আর কারও পোরিশের জন্য এতদিন ফেলে রাখি!

তবু—

—না—সে আমায় মাপ করবেন!

বিভার এই আবদারের ভঙ্গীটুকু শিশিরের ভারী ভালো লাগিল। সে আবার অনুরোধ করিতে ছাড়িল না, কহিল,—নিজের লেখার ঠিক সমালোচনা কেউ করে না, করতে পারে না! তাই আপনি বলচেন, আপনার লেখা ছাপাবার যোগ্য নয়!

ঈষৎ হাসিয়া বিভা আবার কহিল, এ কথাটা ঠিক হলো না, শিশিরবাবু! নিজের লেখা যত নিরেস হোক, লেখকদের ধারণা থাকে যে তা ভারী সরেস হয়েচে। তা যদি না হবে তো এত-সব লক্ষ্মীছাড়া লেখা নিয়ে নতুন-নতুন মাসিক-পত্রই বা রোজ-রোজ বেরুবে কেন?

শিশির হাসিয়া কহিল,—আপনার এ কথা কিন্তু খাঁটি!

শিশিরের কথার সঙ্গে সঙ্গেই বিভা কহিল,—কিন্তু আপনাকে দেখে আজ আমি ভারী আশ্চর্য্য হয়ে গেছি শিশিরবাবু।

শিশির কহিল, কেন?

বিভা একবার দ্বিধা কহিল, কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই বা[illegible]—আপনার লেখা পড়ে আপনার চেহারার সম্বন্ধে আ[illegible] অন্য রকম ধারণা ছিল। আমার বিশ্বাস ছিল, ব[illegible] আপনি ঢের বড়—মাথার চুলেও কিছু-কিছু প[illegible] ধরেচে! আর—

শিশির হাসিয়া কহিল,—কিন্তু দেখলেন···

দেখলুম, আপনার বয়স তার চেয়ে ঢের কম।

বরদাবাবু এই সময় ঘরে আসিলেন, আসিয়া কহিলে[illegible]—দেখলি বিভা, ভাগ্যে আমি গেছলুম—পাথরটা [illegible] ফেলে দিয়েছিল! না নিয়ে এলে হয় তো হারিয়ে যেত অথচ এটার জন্য কত দাম লেগেচে, জানিস্? সাতচল্লি[illegible] টাকা। পুরানো পাটলিপুত্রের পাথর। এর লেখা[illegible] পাঠ উদ্ধার করতে আজ এক মাস কি কষ্টই পাচ্ছি!

বিভা হাসিয়া কহিল,—তা তুমি তো বাবা আমাকে ও-সব ছুঁতে-নাড়তে দেবে না!

বরদাবাবু কহিলেন,—কি জানিস্ মা, কত রকম উল্টে-পাল্টে ধরে, কত লেখার সঙ্গে মিলিয়ে ঠিক-ঠাক করি, তোরা ঘাঁটলে পাছে গুলিয়ে ফেলিস্, এই না ভয়! আমার পরিশ্রম তাতে বেড়ে যেতে পারে! এই জন্যই আর কি বলা! কি বলেন, শিশিরবাবু—না, না, শিশির, তাহলে তোমাদের আলাপ-পরিচয় হলো? বিভার বুদ্ধি-সুদ্ধি কেমন দেখলে? আমি যা বলেচি, exceptionally inteligent—নয় কি?"

শিশির ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

সেদিন বিদায় দিবার সময় বরদাবাবু বার[illegible] অনুরোধ করিলেন,—যখন সময় পাবে, তখনই [illegible]সো, শিশির। আমরা এখানে এক রকম নির্ব্বান্ধব বাস করচি।

বিভা কোনো কথা কহিল না; কিন্তু আসিবার সময় তার পানে চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া শিশির দেখিল, বিভার চোখেও বেশ একটা ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিয়াছে! সে ঔজ্জ্বল্যের সে যে অর্থ বুঝিল, তাহাতে আর তার তৃপ্তির সীমা রহিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেদিন সারারাত্রি শিশিরের ঘুমটা বড় সুবিধার হইল না। বুকের মধ্যে অনেকখানি আনন্দ যেন কে ঠাসিয়া ধরিয়াছে—হৃদয়ের দুই কূল অপরূপ মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছে! সার্থক টাউন হলে সে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিল! জয়ের এতখানি আনন্দ জীবনে সে কখনো পায় নাই।

তার পর প্রতিদিনই কলেজের ছুটি হইলে শিশিরকে মন্ত্র-চালিতের মত কে যেন টানিয়া বরদাবাবুর গৃহের দিকে লইয়া যাইত! যে শিশির আপনার নির্জ্জন গৃহ-কোণটিতে অহরহ আবদ্ধ থাকিত, সে আজ অবসর-কালে সে জায়গায় একান্তই দুর্লভ হইয়া উঠিল। বরদা-বাবুর গৃহের চায়ে সে কি অপূর্ব্ব রসের স্বাদ পাইয়াছে, তাহা সে-ই জানে। সন্ধ্যায় নিজের গৃহে চায়ের পাঠ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। ভৃত্য-পাচক মনিবের ভাবান্তরে বিস্মিত হইল।

সেদিন রবিবার। সকালেই শিশির বরদাবাবুর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। চায়ের কাপ নামাইয়া বরদাবাবু কহিলেন—আরে শিশির যে! এসো, এসো। রামফল, তোর দিদিমণিকে বল্, শিশিরবাবুর জন্য শীগ্‌গির এক কাপ চা।

শিশির হঠাৎ কেমন লজ্জা পাইয়া বলিল,—এধারে একটু কাজে আসতে হয়েছিল, ভাবলুম, আপনার এখানে একবার ঘুরে যাই।

বরদাবাবু কহিলেন,—বেশ করেচো! আজ রবিবার, তোমার ছুটিও আছে, না? তাহলে তোমাকে একটু খাটিয়ে নি। কি বলো? কোন অসুবিধে হবে না?

অসুবিধা! শিশির বর্ত্তাইয়া গেল। অনেকক্ষণ সে স্বচ্ছন্দে এখন এখানে কাটাইতে পারিবে!

বিভা চায়ের কাপ লইয়া আসিয়া কহিল,—এই নিন্ চা, শিশিরবাবু—

বরদাবাবু কহিলেন,—হাঁ, চাটুকু খেয়ে নাও, শিশির। তার পর, বুঝলি বিভা, আজ শিশিরকে একটু খাটাবো মনে করেছি। আমি ভাবছিলুম, কি করি—তা শিশির খুব সময়ে এসে পড়েছে, যাহোক্।

শিশির কহিল,—বলুন, আমায় কি করতে হবে।

বরদাবাবু কহিলেন,—এমন কিছু নয়—প্রায় পঁচিশ-ত্রিশখানা পাথর থেকে বিস্তর লেখার পাঠোদ্ধার করে রেখেছি। সেগুলো অমনি নোট করা আছে; তুমি সেগুলো দেখে একটা indexএর মত করে দেবে। কেন না, ওগুলো গুছোনো থাকলে আমার লেখবার সুবিধা হবে। এসিয়াটিক সোসাইটির জর্নালের জন্য একটা প্রবন্ধ লিখচি কি না!

বিভা হাসিয়া কহিল,—তবেই হয়েচে! তুমি বাবা বাঙলা দেশের একজন এত-বড় নভেলিষ্টকে একেবারে প্রত্নতাত্ত্বিক বানিয়ে তুলতে চাও! সাহিত্য-পরিষৎ এতে কৃতার্থ হতে পারে, কিন্তু দেশের যত গল্পখোর পাঠক তোমার উপর খড়্গহস্ত হবে। কি বলেন, শিশিরবাবু, আপনি তাহলে গল্পটল্প ছেড়ে এবারে তাম্রশাসন লিখতে সুরু করবেন!

বরদাবাবু কহিলেন,—তাম্রশাসন লেখাটা কি নগণ্য কাজ?

বিভা কহিল,—না বাবা, ও-সব দুর্ব্বোধ টীকা-টিপ্পনী দেখলে আমার জ্বর আসে। যাক্, আমি কোথায় ভাব-ছিলুম, শিশিরবাবু যদি এলেন, ওঁর সঙ্গে আজ একটু শাজঙ্গীর দিকে বেড়িয়ে আসবো—না, তুমি ওঁকে একেবারে একরাশ নুড়ি-পাথরে চাপা দিয়ে বসলে!

এই সরল সহাস স্বর শুনিয়া শিশির মুগ্ধ হইয়া গেল। এ যেন পাখীর গান! স্বর কোথাও এতটুকু বাধে না, কথায় কোথাও একটু খোঁচ নাই—সলীল স্বচ্ছ প্রবাহে হৃদয়খানি উছলিয়া চলিয়াছে! আর সে, এত-বড় হতভাগা বেকুব—যে, এই বিভার সহিত কথা কহিতে তার গলা বুজিয়া আসে, কথা বাধিয়া যায়, দুর্দ্দশার অন্ত থাকে না!

বরদাবাবু কহিলেন,—তা যা, না হয় একটু বেড়িয়ে আয় তোরা। এক কাজ করলে হয় রে? শিশিরের যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে এখানেই না হয় আজ ওকে নিমন্ত্রণ কর্ না! কি বলো শিশির, তোমার আপত্তি আছে?

তেমনই কুণ্ঠার সহিত শিশির বলিল,—না, আপত্তি কিসের?

বিভা কহিল,—কি জানি শিশিরবাবু, ঘরের কোণে ঐ ভাঙ্গা পিয়ানোটা দেখে যদি আপনার মনে কোনো খটকা উঠে থাকে! আমরা ব্রাহ্ম নই, শিশিরবাবু। বুঝলেন? আমাদের বাড়ী খেলে জাত যাবে না—বামুনেই রাঁধে, বাবুর্চ্চিতে নয়।

কথাটা কাঁটার চাবুকের মত শিশিরের হাড়ে গিয়া বিঁধিল। প্রথম পরিচয়ের দিন হইতে এই সংশয়টুকুই তাহার মনের মধ্যে উঁকি দিয়া ফিরিতেছে এবং সে যে ঠিক প্রাণ খুলিয়া ইহাদের সহিত মিশিতে পারিতেছে না, এই সংশয়টুকুই তাহার প্রধান কারণ!

দু'জনে বেড়াইতে বাহির হইয়া অনেক কথাবার্ত্তা হইল; শিশিরের বাড়ী কোথায়, সেখানে কে-কে আছেন, কেন তাঁদের এখানে আনেন নাই ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া হঠাৎ কি উপলক্ষ করিয়া এই প্রসিদ্ধ গল্প-লেখকটি সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইলেন, এ প্রশ্নও বিভা বাদ রাখিল না! অনায়াস কৌতূহলে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলিয়া সে তাহার নূতন অতিথির মনের অলি-গলির বিস্তর বার্ত্তা সংগ্রহ করিল। এই ভক্ত তরুণীর সম্বন্ধে শিশিরের মনেও যে কোনো কৌতূহল জাগে নাই, এমন কথা বলা যায় না। তবে সঙ্কোচই এক্ষেত্রে দারুণ অন্তরাল রচনা করিয়া তুলিল। কি জানি, কোন্ প্রশ্ন সমীচীন হইবে, কোন্‌টাই বা কিশোরী মহিলার কানে অমর্য্যাদার মত শুনাইবে! তাই প্রতিপদে সে কেমন থমকিয়া পড়িতেছিল। তার উপর আশপাশের পথিকগুলার নিতান্ত অসমীচ

দৃষ্টি যখন তার উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল, তখন সে লজ্জায় কেমন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছিল। প্রকাশ্য পথে কিশোরীর সহিত এভাবে ভ্রমণ করার ব্যাপার—তার জীবনে একেবারে সকল সম্ভাবনার বাহিরে ছিল!

পাহাড়ের উচ্চ টিলার সম্মুখে আসিয়া বিভা কহিল,—ঐ শাজঙ্গী।

টিলার কোলে প্রকাণ্ড পুষ্করিণী—টিলার উপরে দেওয়াল-গাঁথা ছোট একটা ঘরের মত; মাথায় ছাদ নাই। শিশিরকে লইয়া বিভা সেই ঘরের সম্মুখে আসিল। স্নিগ্ধ রৌদ্রালোকে চারিধার ঝলমল করিতেছে। নীচে জমির উপর কয়-ঘর দরিদ্র মুসলমানের বাস—তাহাদের ছোট ছেলেমেয়েরা পুকুরের পাহাড়ে খেলা করিতেছে। পথে একরাশ ধূলা উড়াইয়া গরুর গাড়ী বোঝাই লইয়া চলিয়াছে; বলদগুলার গলায় ঝুলানো ঘণ্টা হইতে বিচিত্র ধ্বনি মৃদু তালে রণিয়া উঠিতেছে। শিশিরের কাছে আগাগোড়া ব্যাপারটা স্বপ্নের মত মনে হইতেছিল। নিভৃত প্রদেশ, দূর লোকালয়ের হাস্য-কলরব মৃদু গুঞ্জনের মত কানে আসিয়া লাগিতেছে, পাশে তরুণী সঙ্গিনী! কল্পনা-লোকের এই তরুণ অতিথিটির মনে হইল, জগৎ-সংসার ছাড়িয়া সে যেন আজ সাধারণের বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে—সঙ্গে আর কেহ নাই, কিছু নাই! আছে শুধু অপরূপ মাধুরীর জীবন্ত প্রতিমা, এই সুন্দরী সহচরী! তার বুকের মধ্যে এক বিচিত্র বাসনা সাগর-মন্থনে সুধার ন্যায় ভাসিয়া উঠিল। বিশ্বের ললামভূতা এই ললনা যদি চিরদিন তার পাশে থাকিত! যাক্ মুছিয়া সমস্ত জগৎ-সংসার, কলেজের প্রফেশরি, ফিলজফির লেকচার,—কি তাহাতে আসিয়া যায়!

বিভা এদিকে স্থির ছিল না। দেওয়ালের গায়ে লতাগুলা বিচিত্র বর্ণের ছোট ফুলে ভরিয়া আছে। ক্ষিপ্র হস্তে অজস্র ফুলপাতাসহ একটা লতা টানিয়া শিশিরের নিকট আসিয়া হাসিয়া সে বলিল,—আজকাল কবিদের অভিনন্দন দেবার খুব ধুম চলেছে, আমি আপনার একজন নগণ্য ভক্ত পাঠিকা—এই laurel আপনার শিরে আজ জয়মাল্যের মত পরিয়ে দিচ্ছি—নিন্। বলিয়া দিব্য অসঙ্কোচে সে সেই লতাটি শিশিরের মাথায় পরাইয়া দিল। নিটোল সুন্দর সেই হাতের স্পর্শ শিশিরের শিরায় শিরায় তপ্ত রক্ত ছুটাইয়া দিল। নিমেষের জন্য তার চোখের সম্মুখ হইতে সমস্ত বনভূমি, আকাশ-চরাচর অদৃশ্য হইয়া গেল—সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দুটি উদগ্র কোমল বাহুর মধ্যে লীন পরিণত হইল! শিশিরের একবার ইচ্ছা হইল, ঐ দুটি বাহুকে সাদরে সে আপনার তপ্ত বুকে চাপিয়া ধরে! সে কেমন বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল-তার চৈতন্য ছিল না। চোখের সম্মুখে এই যে কা ঘটিয়া গেল, ইহা সত্য, না স্বপ্ন!

ভালো করিয়া সব বুঝিবার পূর্ব্বেই শিশিরের হা ধরিয়া টানিয়া বিভা কহিল,—আসুন শিশিরবাবু, টিলার উপরে বসিগে—আপনি চারধার দেখে শুনে একা প্লট ঠিক করে ফেলুন। সেটার নাম দেবেন, 'শাজঙ্গী' আসুন।

বিমূঢ় শিশিরকে একরূপ টানিয়া আনিয়া বিভ টিলার একধারে একটা প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয় পড়িল; শিশির দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে বিভার পানে চাহিয় রহিল। বিভা হাসিয়া কহিল,—অবাক হয়ে আমার পানে চেয়ে রইলেন যে! না, সত্যি, আমি ঠাট্টা করচি না। বসুন। দেখুন দিকি, কোনো প্লট পান কি না! আচ্ছা শিশিরবাবু, আপনি গল্প লেখেন কি করে? আমায় আজ সব বলতে হবে। আমি কিছুতেই প্লট পাই না—কত ভাবি, তবু না।

শিশির কথা কহিবে কি—তার বাক্‌শক্তি একেবারে লোপ পাইয়াছিল। বিভার কণ্ঠস্বরে কি অপূর্ব্ব সঙ্গীত উছলিয়া উঠিয়াছে,—হায়, বিভা কি তার কোন সন্ধান রাখে? বাঁশীর তানে মুগ্ধ মৃগ যেমন সকল চেতনা হারাইয়া ব্যাধের শর বিনা-যাতনায় বুকে ধারণ করে, বিভার এই সরস মধুর কণ্ঠস্বরে এক অদৃশ্য দেবতার পুষ্প-শর তেমনি অলক্ষ্যে তার বুকে বিঁধিতেছিল। সে স্বরে সে এমনই আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল যে তার খেয়ালই ছিল না, এই যে অনুভূতি তাকে গ্রাস করিতেছে, ইহা সুখের, না যাতনার? তার মন এক বিষম ঘূর্ণীপাকের মধ্যে পড়িয়াছিল। কোনো হুঁশ ছিল না!

হঠাৎ এক সময় শিশির চাহিয়া দেখে, বিভা নীরবে মূক প্রকৃতির পানে চাহিয়া আছে। শিশুগাছের বিস্তীর্ণ জঙ্গল চারিদিকে বহুদূর অবধি বিস্তৃত—টিলার উঁচু জমি হইতে সে জঙ্গল চমৎকার সজ্জিত দেখাইতেছে। শিশির বিভার পানেই চাহিয়াছিল। মাথার মধ্যে কি একটা কথা তাল পাকাইতেছিল। হঠাৎ তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে একটা কম্পিত স্বর ফুটিয়া বাহির হইল,—বিভা—

বিভা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল—একটা চাপা দীর্ঘ নিশ্বাস বহু চেষ্টাতেও সে রোধ করিতে পারিল না। শিশির তাহা লক্ষ্য করিল। কেন এ নিশ্বাস! বিভা কি ভাবিতেছে! বিভার চোখ ঝাপসা হইয়া আসিয়াছিল—পাছে শিশির তাহা দেখিতে পায়, তাই সেদিকে না চাহিয়া নত নেত্রে সে বলিয়া উঠিল,—রোদ উঠেচে—চলুন শিশিরবাবু, বাড়ী যাই! এবং তখনই শিশিরের

মতামতের অপেক্ষা মাত্র না করিয়া সে একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সেদিন খর রৌদ্রে ফিরিবার পথে শিশির স্পষ্ট বুঝিল, তার নিজের অস্তিত্ব বলিয়া আর কিছুই নাই। সে যে চলিতেছে, ফিরিতেছে, কথা কহিতেছে, সে শুধু এই তরুণী সহচরীটির তর্জ্জনীর ইঙ্গিতে!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সোমবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে শিশির যখন বরদাবাবুর গৃহে আসিল, বরদাবাবু তখন জর্নালের জন্য কাপি লিখিতেছেন। শিশিরকে দেখিয়া বরদাবাবু কহিলেন,—তুমি একটু অপেক্ষা করো। আমি এই কাজটুকু সেরে নিয়ে একটু বেড়াতে বেরুবো। আজ জ্যোৎস্না আছে—নদীর ধারে বেড়াতে অসুবিধা হবে না। বিভা বাড়ী নেই, আমার দাইয়ের ছেলেটির ভারী জ্বর হয়েচে, তাকে দেখতে গেছে—সেবা-শুশ্রূষা নিজের হাতেই সে করচে সব। মার আমার ভারী মমতা! আমিও একবার ফেরবার মুখে দেখে আসবো!

এ কথা শুনিয়া শিশির অভিভূত হইয়া গেল। বিভার প্রতি শ্রদ্ধার আর তার সীমা রহিল না। এই কিশোরী কি নির্ম্মম জগতের বুকে শুধু আনন্দ আর করুণা বিলাইতেই আসিয়াছে!

নদীর ধারে খানিকটা ঘুরিয়া শিশির কহিল,—চলুন, এবার দাইয়ের ছেলেটিকে দেখে আসি।

বরদাবাবু বলিলেন,—চলো। অসুখটা বেশী। যদি সে ভালো না থাকে, তাহলে বিভাকে রাত্রে বাড়ী ফেরানো দায় হবে।

দরিদ্র পল্লীর এক জীর্ণ কুটীরে দাইয়ের বাস। দুজনে সেখানে আসিলে বিভা বরদাবাবুকে কহিল,—ডাক্তারবাবু এই মাত্র চলে গেলেন, বাবা। তিনি বললেন, টাইফয়েডই। সাত-আট-দিন চিকিৎসা ত হয় নি, উল্টো কুপথ্য চলেছিল। ভরসা তিনি এখন কিছুতেই দিতে পারলেন না।

বরদাবাবু অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাই তো, বেচারী দাই! শিশির কহিল,—এ রকম রোগে এরা ব্যবস্থা ঠিক রাখতে পারবে কি? তার চেয়ে হাসপাতালে—

শিশির বাবু! বিভার স্বরে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু তখনই সে আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল,—বলেন কি আপনি! তা-ছাড়া এদের ধারণা কি জানেন, হাসপাতালে গেলে কেউ বাঁচে না। ঘরে পড়ে বিনা-চিকিৎসায় এরা মরতে রাজী আছে, তবু হাসপাতালে গিয়ে সারতেও চায় না, এদের কাছে ও ক[illegible] তুলে ফল কি! ডাক্তার বাবু অবশ্য এসে ঐ কথ[illegible] তুলেছিলেন। শুনে দাই একেবারে কেঁদে অস্থি[illegible] আমি অনেক বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করেছি। রোগীকে ন[illegible] শক্ত। না হলে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যেতুম।

শিশিরের মুখে মুহূর্ত্তের জন্য কথা ফুটিল না। লজ্জ[illegible] তার মাটীতে মিশিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল। বরদা[illegible] বিভাকে কহিলেন,—তাহলে রাত্রে তুমি ফিরচো না।

বিভা কহিল,—কি করে ফিরি, বলো? মাথায় আই[illegible] ব্যাগ দেওয়া, টেম্পারেচার নেওয়া, ওষুধ-পথ্যি—কে ক[illegible] এ-সব? এই তো লোক এরা! একবার হদ্দ-মুদ্দ চে[illegible] করে দেখি আমরা। এই যে রামফল ফিরেচে—কি[illegible] বরফ এনেচিস? নে, খানিকটা চট্ করে ভেঙ্গে আইস-ব্যাগটায় পূরে দে দিকিন্। দাই ভিতরে আ[illegible] ভালো জল চেয়ে নে। রামফলকে তুমি নিয়ে যাও, বাব[illegible] না হলে তোমার কষ্ট হবে। তুমি বরং রাত্রের [illegible] সহিসকে পাঠিয়ে দিয়ো।

শিশির কহিল,—যদি অনুমতি দেন, তাহলে রোগ[illegible] সেবার অংশ নিয়ে আমি কৃতার্থ হই!

—আপনি! বিভার স্বরে অনেকখানি বিস্ময় ফুটি[illegible] উঠিল। শিশির হাসিয়া কহিল,—আমাকে এতই অপদ[illegible] ভাবচেন কেন?

বরদাবাবু কহিলেন,—শিশির, তোমার এ কথা শু[illegible] ভারী আনন্দ পেলুম। আর্ত্ত বেদনাতুরের সেবা কর[illegible] যে অগ্রসর হয়, সে-ই মানুষ, তারই শিক্ষা সার্থক।

শিশির কৃতজ্ঞভাবে কহিল,—কিন্তু এ শিক্ষা কলে[illegible] কখনো পাই নি, বরদাবাবু। এ শিক্ষা আজ এই প্র[illegible] পেলুম, আপনার কন্যার কাছে!

বিভা কহিল,—এখন এ সব ধন্যবাদ আর কীর্ত্তিগা[illegible] পালা বন্ধ রাখুন, শিশির বাবু। যদি রাত্রে সেবা কর[illegible] চান, তাহলে আমাদের ওখান থেকে চট্ করে খে[illegible] আসুন—বাবাকেও নিয়ে যান।

শিশির এ কথার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারিল ন[illegible] সে অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। এই যে তরুণী, স্বরে তাহ[illegible] এতটুকু কাঠিন্য নাই, আদেশ করিবারও সে কোনো ধ[illegible] ধারে না, অথচ সহজ কোমল সরল ভঙ্গীতে যাহা ব[illegible] মাথা পাতিয়া তাহা লইতেই হয়—না লওয়া ছাড়া উপ[illegible] নাই! রাজার আদেশও বুঝি কেহ এতখানি মা[illegible] পাতিয়া লইতে পারে না! এ কি মন্ত্র জানে? না, উহ[illegible] স্বরে যাদু আছে!

রাত্রি তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। শিশি[illegible] বরফ ভাঙ্গিয়া আইস-ব্যাগে পুরিয়া রোগীর বি[illegible] পাশে আসিয়া বসিলে বিভা কহিল,—বাইরে ইজিচে[illegible]

নিয়ে রেখেছি শিশির বাবু, আমার হাতে ব্যাগ দিয়ে পনি বরং একটু গড়িয়ে নিন্ গে, তারপর নয় শেষ ত্রে আপনাকে ডেকে দেবো।

শিশির কহিল,—আর আপনি সারা রাত জাগবেন! নের বেলাতেও খাটুনি কম যায় নি, তার উপর খে কিছু দেন নি, বোধ হয়?

বিভা কহিল,—মুখে দেবার প্রবৃত্তি মোটে নেই। মি বেলা দুটো-তিনটের সময় এসেচি, সারাদিন আর খাটলুম! দাই গিয়ে কেঁদে পড়ল—তা'ও যদি চারদিন আগে খপর দিত!

শিশির কহিল,—যাক্, এখন আপনি বরং একটু মিয়ে নিন—শেষ রাত্রে আমি ডেকে দেবো। কি লেন?

বিভা বলিল,—আমার মোটে ঘুম পায় নি। তা-ড়া কি জানেন—শিশির বাবু, এ-সব সেবার কাজ মাদের দ্বারাই চিরকাল ধরে চলে আসচে। এ কাজে য়েদের মত তৎপরই বা কে! দেখুন না, পুরুষ নার্শ নো হাসপাতালে নেই, মেয়েরাই সারা পৃথিবীতে র্শের কাজ করে বেড়াচ্ছে। এ কাজে মেয়েদের বান-দত্ত সার্টিফিকেট আছে। পুরুষ দৌড়-ঝাঁপের জে খুব দড় বটে, কিন্তু এ কাজ বড় কোমল ইভাবে করতে হয়। মেয়ে-মানুষের প্রাণ—মার , বোনের প্রাণ, স্ত্রীর প্রাণ! তাই রোগী কোনো য়ে একটু কাতর হলে খুব সহজেই সে তা বুঝতে র। তাছাড়া এতে সহ্য করবারও ঢের আছে, পুরুষ সহ্য করতে পারে না।

শিশির কহিল,—আমাদের জাতকে এ-সব মহৎ থেকে একেবারে বরখাস্ত করিতে চান!

বিভা কহিল,—দেখুন, এই আজই সকালে একখানা া মাসিকপত্রে একটা প্রবন্ধের উপর আমার কেমন ঠেকলো, হঠাৎ। প্রবন্ধটার নাম, "নারী ও পুরুষ"। ক অবশ্য পুরুষ। একটু কৌতূহল হলো—পড়তে ম। দেখি, লেখক মশায় লিখচেন, পুরুষ আর মধ্যে সব রকমে সাম্য আনতে হবে, কোনো ত থাকবে না। ঘোড়ায় চড়া, মোটর হাঁকানো থেকে আরম্ভ করে অফিসে কেরাণীগিরি এবং কোর্টে ওকালতি করা—কোন বিষয়েই তফাত নয়! আমার হাসি পেলো সে প্রবন্ধ পড়ে। আমাদের বাঙালী পুরুষদের নিজেদের কি অধিকার আছে, তা তাঁরা নিজেরা জানেন না, অথচ তাঁরা ছুটেচেন, মেয়েদের অধিকার নির্ণয় করতে! লেখকের কাছে আমাদের শুধু একটা নিবেদন আছে, ঘোড়ায় চড়তে পেলে আমরা বর্তে যাবো না! ও-কাজ তাঁদেরই থাকুক, আমাদের তাঁরা শুধু যেন মানুষ বলে মনে করেন, একটু আলো-হাওয়া থেকে বঞ্চিত না করেন, আর জ্ঞান-রাজ্যের বাইরে অন্ধকারে ফেলে না রাখেন! তাহলেই আমাদের অধিকার আমরা নিজের বুঝে নিতে পারবো!

এমনি কথা, আলোচনা ও সেবার মধ্য দিয়া রাত্রি কাটিয়া গেল। সকালে বরদাবাবুর বাড়ী হইতে চা ও প্রাতরাশ আসিল। বিভা শিশিরকে বলিল,—আপনি মুখে হাতে একটু জল দিয়ে চাটুকু খেয়ে নিন। বিস্কুট ক'খানাও খেয়ে ফেলুন! আর যদি আপনার অসুবিধা না হয় তো আধঘণ্টা অপেক্ষা করলে আমি তার মধ্যে বাড়ী থেকে স্নানটা সেরে আসি। রামফলের সঙ্গেই তাহলে যাই! কি বলেন?

শিশির কহিল,—বেশ তো, আধঘণ্টা কেন, এখনও দেড়ঘণ্টা আমি স্বচ্ছন্দে থাকতে পারি। আপনি একেবারে সব সেরে-সুরে আসুন। বলেন তো, দুপুর বেলায় আমি কলেজের ছুটি করেও আসতে পারি!

বিভা কহিল,—কোনো দরকার নেই! তার চেয়ে বরং আর এক কাজ করলে ভালো হয়। ক'রাত্তির এখন জাগতে হয়, তার কোন ঠিকানা নেই! আপনি বরং বেশী রাত করে আসবেন। শেষ রাতটায় একলা থাকতে ভয় পাই, সে সময় দু'জনে জেগে থাকলে তবু কতকটা ভরসা পাবো।

শিশির হাসিয়া বলিল,—দিনে-রাতে চব্বিশ ঘণ্টাই তাহলে আপনি রোগী নিয়ে থাকবেন! কিন্তু এভাবে ক'দিন কাটাবেন? নিজের শরীরটাকেও দেখা চাই। ...তার চেয়ে আর এক কাজ করা যাক্ না। আপনি না হয় রাত বারোটা অবধি জাগবেন, তারপর ঘুমোবেন—শেষ রাতটুকু আমি জাগবো। কেন না, আবার দিনটা আপনারই হাতে পড়চে।

বিভা হাসিয়া কহিল,—আপনারও তো দিনের বেলায় কলেজ আছে। ঘুমোবেন কখন্? তার চেয়ে ঘুম পেলেই ঘুমোনো যাবে, এই ব্যবস্থাই ভালো।...এখন আমাদের এ কষ্টটুকু সার্থক হয়, তবেই না! কিন্তু আপনার এ সাহায্য আমি কখনও ভুলবো না শিশিরবাবু। এক অজানা দুঃখী লোকের ছেলের জন্য এত কষ্ট করচেন!

শিশিরের বুকটা আনন্দে ভরিয়া উঠিল। সস্মিত মুখে সে কহিল,—যদি আমি কোনো কাজে এতটুকু যোগ্যতা দেখাতে পেরে থাকি, তবে জানবেন, সে শুধু আপনার আদর্শ অনুসরণ করে!

থামুন, থামুন, আপনারা লেখক মানুষ তিলকে একেবারে তাল করে তোলেন! কি যে বকেন, তার ঠিক নেই!

এই সময় রামফল আসিয়া কহিল,—দিদিমণি তাহলে যাবে না কি?

—হাঁ, চ—বলিয়া বিভা রামফলের সহিত বাহির

হইয়া পড়িল। যতক্ষণ দেখা যায়, শিশির মুগ্ধ দৃষ্টিতে বিভার পানে চাহিয়া রহিল। এ কি মানুষ! এমন সে কখনো চোখে দেখে নাই। একে নারী, তায় এই তরুণ বয়স! তাহার উপর দিব্য লেখাপড়া শিখিয়াছে, নিজের আরাম-বিলাস, বসন-ভূষণ লইয়া যে-বয়সে মত্ত থাকিবার কথা, বাহিরের জগৎ রহিল কি গেল, সে সংবাদে কিছুই আসিয়া যায় না—এই নারী ঠিক সেই বয়সে সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও এ কি তপশ্চারিণীর দুরূহ পবিত্র ব্রত যাচিয়া হাতে লইয়াছে? শিশিরের সাহায্য? হায়, বিভা কি এটুকু বুঝিতে পারে না যে, তার সঙ্গ-সুখ পাইবার জন্য জগতে এমন কোনো কঠিন কাজ নাই, যা সে করিতে না পারে! রোগীর সেবার মত এই কঠোর নীরস কর্ত্তব্য কাল রাত্রে তার যে অমন সহজ সুন্দর ঠেকিয়াছে, সে কি কেবল নিষ্কাম কর্ত্তব্য-পালনের জন্য…না, শুধু বিভার সাহচর্য্য…বিভা পাশে থাকিলে সারা জীবন সারা দিনরাত্রি অক্লান্তভাবে সে এ কাজ করিয়া যাইতে পারে। একটুকু ক্লান্তি বা দুঃসহতা বোধ করিবার কোনো আশঙ্কা থাকে না!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আরও পাঁচ-সাত দিন সেবা-শুশ্রূষার পর সুরাহার লক্ষণ দেখা দিল। বিভা তখন দাইয়ের ছেলেকে নিজেদের গৃহে লইয়া আসিল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা শিশির আসিল না দেখিয়া বিভা একটু চিন্তিত হইল। সকালে শিশিরের শরীর তেমন ভালো ছিল না, চোখ দুটাও লাল হইয়া উঠিয়াছিল। বিভার মন অস্থির হইল। তবু এ চিন্তার কথা মুখ ফুটিয়া সে কাহারও কাছে বলিতে পারিল না। এ কয়রাত্রি শিশিরের সঙ্গে পরিচয় তার অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছে; তাই আজিকার এই প্রথম অভাব নূতন করিয়া মনে বাজিতেছিল।

পরদিন প্রাতে বিভা উঠিয়া বরদাবাবুকে বলিল,—বাবা, শিশির বাবু কাল মোটে এলেন না—আমার কেমন ভাবনা হচ্ছে। বুঝি, তাঁর কোন অসুখ হয়েচে! ক'দিন খাটুনিকে খাটুনি বলে গ্রাহ্য করেননি। অভ্যাস নেই তো। তাছাড়া কাল সকালে স্পষ্ট বলে গেলেন, শরীরটা কেমন ভালো ঠেকচে না!

বরদাবাবু চিন্তিত স্বরে কহিলেন,—তাই তো, কাল সে এলো না মোটে! ঠিক বলেচিস! আমারও তত খেয়াল ছিল না—নিজের ঐ লেখাটা নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম—ভাবলুম, বুঝি, তোরা ওধারে কোথাও গল্প-সল্প কর… তা এখনই একবার কাকেও আমি পাঠাই!

বিভা কহিল,—তার চেয়ে বাবা, আমি এ… নিজে বরং গাড়ী করে গিয়ে দেখে আসি—রাম… সঙ্গে নি। সে তাঁর বাড়ী চেনে। বেহারী ভালো আ… তার বন্দোবস্ত আমি সব করে রেখে গেলুম।

বিভার আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব সহিতেছিল না। … সত্যই শিশির বাবুর অসুখ করিয়া থাকে? আ… স্বজনহীন সুদূর প্রবাসে কষ্টের তাহা হইলে … থাকিবে না! যদি অসুখ বেশী হয়…? বিভার … প্রাণ বেদনায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠিল। সৌখীন মা… অভ্যাস নাই, ক'দিন রাত্রি জাগিয়া রোগীর সেব… শরীরে সহিবে কেন? গাড়ী যত বাড়ীর কাছে আসি… লাগিল, ততই তার ভাবনা বাড়িয়া উঠিল। ন… দেবতার কাছে শিশিরের কুশল মাগিতে মাগিতে উ… চিত্ত লইয়া বিভা একখানা ছোট বাঙ্‌লার ফট… সম্মুখে গাড়ী হইতে নামিল। তার গা ছম্‌-ছম্‌ ক… উঠিল। একটা অমঙ্গল-আশঙ্কায় নিশ্বাস বন্ধ হ… আসিতেছিল। ফটক পার হইয়া ব্যাকুল দৃষ্টিতে বাঙ… বারান্দার পানে সে চাহিল। ঐ না, কে বসিয়া আ… শিশিরবাবুই তো! আঃ, রাজ্যের আরাম যেন … কুড়াইয়া পাইল!

বাঙ্‌লার পথে পদশব্দ পাইয়া শিশির উৎকর্ণ হই… ছিল—বিভা ততক্ষণে একেবারে সম্মুখে আ… পড়িয়াছে। শিশির চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—এ কি-… বিভা! বিস্ময়ে তার মুখে কথা ফুটিল না। … কহিল,—কেমন আছেন, শিশির বাবু?

শিশির কহিল,—কেন, আমি ভালোই আছি। …

বিভা কহিল,—তবু ভালো। কাল আপনি গে… না বলে আমার এমন ভাবনা হয়েছিল—

এইটুকু বলিয়া বিভা কথা শুধরাইয়া লইল, ক… —বাবা বললেন, এসে আপনার খোঁজ নিতে। তি… ভারী ব্যস্ত বলে নিজে আসতে পারলেন না। যাই হো… আপনি যে ভালো আছেন, এই আমাদের পরম মঙ্গ… আমরা ভাবছিলুম, ক'রাত্তির খেটে বুঝি কোনো অসু… বিসুখ হলো!

শিশির কহিল,—কলেজ হইতে ফিরিয়া সে কে… ক্লান্তি বোধ করিতেছিল—একটু গড়াইবে ভাবি… বারান্দায় শুইয়া পড়িয়াছিল; তার পর ঘুমাই… পড়িয়াছে! যখন ঘুম ভাঙ্গিল, রাত্রি তখন দশ… কাজেই আর যাইতে পারে নাই! কথার শেষে … একটা পরিহাসের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিল… বসন্তের প্রভাত, স্নিগ্ধ আলোর বিকাশ, মহুয়া… গন্ধে মাতাল হাওয়া, গাছের ডালে পাখীর বি…

ন—আর সম্মুখে এই তরুণী সহচরী! শিশির কহিল, আপনি বুঝি তাই রোগীর সেবার ভার নিতে ছুটে লেন! কিন্তু তেমন কি ভাগ্য আমার যে ও-হাতের—

বাধা দিয়া হাসিয়া বিভা কহিল,—সে আপশোষ খবার দরকার কি? বলুন না, কি করতে হবে? মাথায় ডিকোলন দেব, না, পা টিপে দিতে হবে? যদি এত ধ হয়ে থাকে, রোগ করে সেবা নেবার চেয়ে সুস্থ রে যেচেই না হয় সেটুকু নিলেন! তাতে তবু উদ্বেগের ত এড়ানো যায়!

শিশির বিস্ময়ে বিভার পানে চাহিল। বিভার মুখে নোরূপ ভাবান্তর দেখা গেল না। এ কথাগুলা—ইতো! তবে কি তার আশা দুরাশা নয়?

বিভা কহিল,—আপনি আদর-অভ্যর্থনার কোন য়দা জানেন না, দেখচি। একজন মহিলা বিনা-মন্ত্রণে যেচে এসে আপনার অতিথি হলো, আর পনি তাকে বসবার আসন দেওয়া দূরে থাক্, ঘরে তে অবধি বললেন না। যাক্, অতিথি বিমুখ হলে স্থের পক্ষে ভালো কথা নয়—আমি নিজেই তাহলে পনার ঘরটরগুলো দেখে নি! লেখক মানুষের ঘর! ড়ী দাঁড়িয়ে আছে, এখনই আবার ফিরে গিয়ে বাবাকে র দিতে হবে।

বসন্তের এক ঝলক মিষ্ট বাতাসের মতই বিভা গিয়া রর মধ্যে প্রবেশ করিল—শিশিরের বই-ভরা ছোট লমারিটার সম্মুখে সে খানিকক্ষণ দাঁড়াইল, দেওয়ালের য়ে যে সব ছবি ঝুলিতেছিল, সেগুলাও একবার খিয়া লইল, পরে শিশিরের মুখের পানে চাহিয়া সহসা কটা অদ্ভুত প্রশ্ন নিক্ষেপ করিল,—আচ্ছা শিশিরবাবু, পনি কখনও লভে পড়েছিলেন?

শিশিরের মুখ পাংশু হইয়া গেল—সমস্ত রক্ত ছলাৎ রিয়া মুখ হইতে মুহূর্তে নামিয়া গেল! সে কি বে, কিছু বুঝিতে পারিল না—সমস্ত বহির্জগৎ মেযে তার চোখের সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। ার মনে হইল, পায়ের তলায় মাটী নাই! শূন্যে যেন তাহাকে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে! উত্তরের পেক্ষামাত্র না করিয়া তেমনি অচপল স্বরে বিভা কহিল, —এ উদ্ভট প্রশ্ন শুনে আপনি অবাক্ হয়ে গেছেন—! ? কিন্তু কাল রাত্রে আপনার কতকগুলো গল্প নূতন রে ফের পড়ছিলুম। আপনি বিয়ে করেন নি—তবু পনার গল্পের মেয়েগুলো সম্পূর্ণ নূতন ধরণের—অথচ দের জলজ্বলে প্রাণ আছে—তাদের মনের এত খুঁটিনাটি া আপনি জানলেন কি করে? তাই আমার া করা। যাক্, নির্লজ্জ কৌতূহল নিয়ে আপনার গোপন-কথা টেনে তুলতে চাই না। আমার এ ভতা ক্ষমা করবেন। আর যদি সুবিধে হয়, আজ ওবেলা আমাদের ওখানে যাবেন, ঐখানেই খাওয়া-দাওয়া করবেন। এ খাওয়ানো শুধু নার্শিংয়ের পুরস্কার! বুঝলেন? এখন তাহলে আসি।

একটা দম্‌কা বাতাসের মত বিভা চলিয়া গেল। সে যেমন আসিয়াছিল, অনেকখানি গন্ধ, বর্ণ ও আনন্দ লইয়া—তেমনি গন্ধ, বর্ণ ও আনন্দ এখানে ছড়াইয়া দিয়াই সে চলিয়া গেল। ছড়াইয়া-দেওয়া সে গন্ধ, বর্ণ ও আনন্দ যে লাভ করিল, তার মুখের একটা কৃতজ্ঞ বাণী শুনিবার জন্য মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করিল না! শিশির ভাবিল, হায় দুর্বোধ সৌন্দর্য্য, শিশিরের কাছে প্রহেলিকার মত ক্রমে তুমি জটিল হইয়া উঠিতেছ, এবং যত তুমি জটিল হইতেছ, ততই তোমার পাকে-পাকে তাহাকে অসহ্য উপায়হীনভাবে বাঁধিয়া ফেলিতেছ! তুমি তাহাকে দুরাশার পিছনে ছুটাইয়াছ, অথচ, আশা যে একেবারে দাও নাই, এমন নয়! তবে কেন আর এ দুর্ভেদ্য অন্তরালে তাহাকে এমন ব্যথিত উন্মাদ করিয়া রাখো।

—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার সময় বরদাবাবুর ঘরে বসিয়া শিশির তাঁহার সহিত কথা কহিতেছিল। শিশির বলিতেছিল,—আপনি এই প্রত্নতত্ত্বে আমার একটু interest create করিয়ে দিতে পারেন?

বরদাবাবু কহিলেন,—এ তোমার ভালো লাগবে না। বিশেষ তুমি রক্ত-মাংসের মানুষ গড়চো, কত বিচিত্র চরিত্রের নর-নারী সৃষ্টি করচো, এ নুড়ি-পাথরের নীরস কর্কশ কাজ, এ তোমার ভালো লাগবে না। তা-ছাড়া emotional লোকের পক্ষে এ দিকে না আসাই উচিত। কারণ, সত্য আর উচ্ছ্বাসে মিশলে এর মধ্যে অনেকখানি মিথ্যা জড়িয়ে পড়বে।

এমন সময় বিভা আসিয়া কহিল,—বাবা, দুটো তরকারী আর বাকী আছে, এখনই হবে—আর এক ঘণ্টার মধ্যেই তোমাদের খেতে ডাকবো।

শিশির কহিল,—আপনি নিজের হাতে সব রাঁধচেন?

বিভা কহিল,—আমরা এখনও কলকাতার বাতাস পেয়ে এত বড় পণ্ডিত হয়ে উঠিনি যে বাড়ীতে অতিথি এনে তাঁর অভ্যর্থনা করবো, হোটেলের উচ্ছিষ্ট দিয়ে! যাক্, আপনার সঙ্গে ভারী ঝগড়া আছে কিন্তু শিশিরবাবু। আপনি আমায় এখনও 'আপনি' বলা ছাড়চেন না! এত বলি—

শিশির কহিল,—আপনি যদি seriously mean করে থাকেন, তা হলে তাই হবে।

বরদাবাবু কহিলেন,—দু' একটা গান আজ গাস্ মা। অনেক দিন তোর গান শুনিনি।

বিভা মুহূর্ত্তের জন্য একটু অপ্রতিভের মত হইয়া পড়িল, পরে কহিল,—আচ্ছা, আগে এদিককার সব হোক, তারপর যদি সময় থাকে, তখন দেখা যাবে।

কিছুক্ষণ পরেই এক বিচিত্র সুরের প্লাবনে ঘর ভরিয়া গেল। বিভা যখন তার ললিত কণ্ঠে গাহিতে সুরু করিল,

"তুমি কেমন করে' গান করো যে গুণী,
আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি।
সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে
বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী!"

তখন শিশিরের সমস্ত চেতনা লোপ পাইল। তার মনে হইল, সমস্ত চরাচর এক বিচিত্র সুরের তালে ভরিয়া উঠিয়াছে, চারিধারে সুরের হাওয়া ছুটিয়াছে, সুরের আলো ফুটিয়াছে!

বিভা যখন মৃদু কণ্ঠে গাহিল,

"কইতে কি চাই কইতে কথা বাধে,
হার মেনে যে পরাণ আমার কাঁদে—
আমায় তুমি ফেলেছ কোন্ ফাঁদে
চৌদিকে মোর সুরের জাল বুনি।"

তখন শিশিরের মনে হইল, তার আর কোনো আশা নাই! চারিদিকে সুরের জাল বুনিয়া শিশিরকে কে আজ এমন বন্দী করিয়া ফেলিয়াছে যে, প্রাণ তার অহরহ এক গভীর অতৃপ্তির কান্না কাঁদিয়াও নিজের অবস্থা ঠিক বুঝাইতে পারিতেছে না, বুঝাইবার ভাষা বুঝি তার নাই!

মন যখন সহসা গানের সুরে স্বপ্নলোকে উধাও হইয়াছে, ঠিক এমন সময়ে বাহিরে প্রলয়-ঝঞ্ঝা বিশ্ব-সংহারে মাতিয়া উঠিল। বরদাবাবু চমকিয়া উঠিলেন, —এ কি, হঠাৎ ঝড় এলো যে!

বিভা পিয়ানো ছাড়িয়া হাসিয়া কহিল,—হঠাৎ নয়, বাবা! ঝড় তার পুরোপুরি আয়োজন করেই এসেচে। অনেকক্ষণ থেকে মেঘ জমছিল। তোমরা ঘরে বসে কথা কইছিলে, তাই লক্ষ্য করনি।

শিশির ব্যস্ত হইয়া বলিল,—তাই তো, বড় বিপদ হল যে! এ কি চট্ করে থামবে?

বিভা কহিল,—নাই বা থামলো! আপনি তো আর ...

এ কথার উপর কথা চলে না। শিশির ভাবিল, আর সে বিভার সহিত কোনো তর্ক করিবে না। যখনই সে কথা কহিবে, তখনই বিভা একটা আঘাত না দিয়া ছাড়িবে না!

বিভা কহিল,—মেঘের কথা আমি বলিনি, তার কারণ, আমার খাবার তৈরি হবার আগেই আপনার ব্যস্ত হয়ে উঠতেন তাহলে। ধীরে-সুস্থে খাওয়া হতো না।

বাহিরে তুমুল রবে বায়ু গর্জ্জিয়া ফিরিতেছিল। বন্ধ সাশিগুলাকে কাঁপাইয়া এক দারুণ আর্ত্ত রব বাহিরে উন্মাদের ন্যায় হাহাকার করিতেছিল। সেই সঙ্গে বৃষ্টির বিরাম ছিল না।

রাত্রে খাইতে বসিয়া বরদাবাবু কহিলেন,—এই যে-সব মিষ্টান্ন দেখচো, এর কোনোটি বাজারের নয়, সমস্তই বিভা-মা নিজের হাতে তৈরী করেচে!

আহারাদির পর ঝড়-বৃষ্টি থামিল না দেখিয়া শিশির চিন্তিত-ভাবে সাশির ধারে দাঁড়াইয়া বাহিরের পানে চাহিয়াছিল। বিভা হাসিয়া বরদাবাবুকে ডাকিয়া বলিল, —বাবা, ছাখো, এই রাত্রে শিশিরবাবু জলে পড়তে চান।

বরদাবাবু কহিলেন,—তুমি বাইরের পানে চেয়ে কি দেখচো হে? এ দুর্য্যোগে মানুষ বেরোয় কখনো! এখানেই আজকের মত থেকে যাও—কোনো অসুবিধা হবে না। তোমার জন্য একটু ঠাঁই আমরা অনায়াসে দিতে পারবো।

বিভা কহিল,—আসুন শিশিরবাবু, বৃষ্টি যদি দেখতে চান, ওধারের বারান্দা থেকে দেখবেন, আসুন। আপনাদের এ-সব দেখার দরকার আছে! কোনো এক গল্পে বর্ণনা জুড়ে দিতে পারবেন। নায়ক-নায়িকার মনের দ্বন্দ্বের সঙ্গে উপমা দেবারও দরকার লাগতে পারে!

শিশির চমকিয়া উঠিল। এই কিশোরী কি অন্তর্যামী! তার মনের মধ্যে কত বিচিত্র ভাব ঝড়ের তালে প্রচণ্ড রকমের নৃত্য সুরু করিয়াছে—কত বিরুদ্ধ কথা, কত চিন্তা! ঝড় পাইয়া শিশির কতক বর্ত্তাইয়া ছিল। বাহিরের এ গর্জ্জনে তার মনের ভিতরকার সে সব দ্বন্দ্ব-কোলাহল আর কেহ শুনিতে পাইবে না! বিভার এ-কথায় তাই সে চমকিয়া উঠিল। কি করিয়া তার নিভৃত হৃদয়পুরের দুরন্ত সংগ্রামের সংবাদ বিভা জানিল?

হঠাৎ বাহিরে আঁধারের বুক চিরিয়া বিদ্যুতের একটা তীব্র রেখা ছুটিয়া গেল। সে আলোয় আর একটা জিনিস তার চিত্তে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল! তবে কি বিভার বুকেও এ-ঝড় এমনি তালে-ছন্দে এমনই রুদ্র গর্জ্জনে ছুটিয়াছে?

শিশিরকে নিরুত্তর দেখিয়া বিভা কহিল,—কি, আপনার ভাব লেগে গেছে না কি? অবাক হ...

আকাশ দেখচেন! কি দেখচেন—যেন এক দুরন্ত বালিকা বিস্রস্ত কেশপাশ এলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর সেই কেশপাশ বয়ে চারিধারে মত্ত হাসির ফোয়ারা ঝরে পড়েচে। আমায় মাপ করবেন শিশিরবাবু, উপমাটা ঠিক হলো কি না, জানি না। তবে এমনি ধারাই সব কবিতা মাসিকপত্রে পড়ি কি ন', তাই বলচি। নিজে ও-সব ideaর ধার ধারি না। যাক্, ও-ঘরে আপনার বিছানা তৈরি হচ্ছে, আপনি ততক্ষণ ঝড় দেখবেন, আসুন।

শিশির মন্ত্র-চালিতের মত বাঙ্‌লার পিছন-দিককার বারান্দায় আসিয়া বসিল। সার্শির বাহিরে বাগান দেখা যাইতেছিল—অন্ধকারে ঝোপগুলা আরো কালো দেখাইতেছিল—মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিয়া যায়, আর মনে হয়, দৈত্যগুলা যেন মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিতেছে! গাঢ় অন্ধকারের পানে চাহিয়া দুজনেই চুপ করিয়া রহিল। শিশির ভাবিল, বিভার এ কি দুষ্টামি! তাহাকে লইয়া এমন নির্দ্দয় খেলা সে কেন খেলিতেছে? স্পষ্ট করিয়া কেন সে ধরা দিতেছে না? পাকে-প্রকারে আকারে-ইঙ্গিতে আপনাকে সে যেটুকু দেখাইতেছে, তাহা হইতে শিশিরের কিছুই দুরাশা বলিয়া মনে হয় না—তবু স্পষ্ট একটা আশা দিতে কেন বিভা এতখানি চাতুরী খেলিতেছে! এই যে সরলতার সে আভাস দিতেছে, সে কি সত্যই সরলতা, না, এ ভাণ! শুধু আলেয়ার আলোয় দু'দণ্ড তাহাকে মাতাইয়াই বিভার খেলা শেষ হইবে? না, না, এমন নির্ম্মম সে হইতে পারে? বিভার মুখে-চোখে কৈ, তেমন-কোন লক্ষণ তো দেখা যায় না!

সহসা কড়্কড় শব্দে চারিধার কাঁপাইয়া দীপ্ত আলোয় আকাশ ভরাইয়া অদূরে বাজ পড়িল। বিভা সরিয়া আসিয়া শিশিরের হাত চাপিয়া ধরিল। চপলার আলোয় শিশির বিভার মুখের পানে চাহিল, দেখিল, তার চোখে জল ছাপাইয়া উঠিয়াছে!

শিশিরের প্রাণের মধ্যটা জ্বালাইয়া দিয়া এক তীব্র বিদ্যুৎশিখা ছুটিয়া গেল। বিভা কাঁদিতেছে! কেন? কি তার দুঃখ? যে-যাতনায় অহর্নিশি সে দগ্ধ হইতেছে, সে যাতনা কি তবে বিভার বুকেও বিঁধিয়াছে? মুহূর্ত্তে এক দারুণ বাসনা শিশিরের বুকে জাগিয়া উঠিল। মুখ ফুটিয়া একটা কথা বলিতে পারিলে হয়তো আর এ দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের দুইপারে বসিয়া দুইজনকে হা-হুতাশ করিয়া মরিতে হয় না! এই নীরব নিঝুম বাদলার রাত —প্রাণের সে গোপন বাসনা ফুটাইবার পক্ষে এমন অবসরও আর কখনো মিলিবে না!

শিশির মৃদু কণ্ঠে ডাকিল,—বিভা—!

সে স্বরে নিজেই সে চমকিয়া উঠিল। বিভা কোনো কথা কহিল না। শিশিরের মাথা ঘুরিতেছিল। পাগলের মত সহসা বিভাকে দুই হাতে আপনার বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া সে বলিল,—বিভা, আমি তোমায় ভালোবাসি, বড় ভালোবাসি। তার সর্ব্বশরীর থর্-থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আবার বিদ্যুৎ চমকিল। উত্তর পাইবার আশায় বিভার পানে শিশির নিমেষের জন্য চাহিল; সহসা বিভা শিশিরকে প্রচণ্ডভাবে ঠেলিয়া দিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—শিশিরবাবু—

তার পর শিশিরকে কিছু বুঝিবার সময় মাত্র না দিয়া একনিশ্বাসে বলিল,—এত বড় আপনার স্পর্দ্ধা! একলা পেয়ে এভাবে আমায় আপনি অপমান করেন! যান, চলে যান, এখনই চলে যান আপনি!

শিশিরের মাথায় তখনও আগুন জ্বলিতেছিল। সে বিভার পানে আগাইয়া আসিয়া বলিল,—শোনো বিভা—

বিভা তেমনই কঠিন স্বরে কহিল,—কিছু শুনতে চাই না। কোনো কথা নয়! এত ছোট মন নিয়ে আপনি শিক্ষার ভাণ করে বেড়ান! নারীকে কেবল ভোগের সামগ্রী বলে জেনেচেন! আর কোনো পবিত্র সম্পর্কের কথা ধারণা করতে পারেন না! আমি ভুল করেছিলুম, তাই আপনার সঙ্গে এমন অসঙ্কোচে মিশেছিলুম—আমারও খুব শিক্ষা হয়েচে। যাক্, আপনার সঙ্গে এর পর যদি আর কখনো দেখা হয়, তা হলে সম্পূর্ণ অপরিচিতের মত ব্যবহারই আপনি আশা করবেন।

শিশিরকে তার অবস্থা বুঝিবার অবসর মাত্র না দিয়া বিভা ক্ষিপ্র সে স্থান ত্যাগ করিল। শিশির হতাশ চিত্তে সেই অন্ধকারে বসিয়া বাহিরের জমাট অন্ধকারের পানে উদাসভাবে চাহিয়া রহিল। তখন ঝম্-ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে এবং প্রলয়ের অট্টহাসি চারিধারে ভীষণ বিদ্রূপ ছড়াইয়া হো-হো করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে!

পরের দিন। বেলা তখন প্রায় আটটা। শিশির বিছানায় পড়িয়াছিল—ভৃত্য শিবু আসিয়া সংবাদ দিল, বরদাবাবু আসিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বরদাবাবু কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

শিশির উঠিয়া বসিল। বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। স্নিগ্ধ সূর্য্যরশ্মি কক্ষে হিল্লোলিত হইয়া পড়িয়াছে। বরদাবাবু কহিলেন,—কাল রাত্রে ঐ ঝড়ে-জলে একটিও খবর না দিয়ে তুমি চলে এলে যে! ব্যাপার কি বলো তো?

শিশির লজ্জায় বরদাবাবুর পানে চাহিতে পারিল না। বরদাবাবু কহিলেন,—এ রকম পাগলামি করলে কেন হঠাৎ? বলো···সকালে তোমার জন্য আমি বসেছিলুম—তুমি যে চলে এসেচো, তা জানতুম না। শেষে বিভার কাছে শুনলুম, রাত্রেই তুমি চলে এসেচো!

ভাকে জিজ্ঞাসা করলুম, কারণ কি—সেও কিছু লে না, চুপ করে রইলো।

শিশির সারারাত্রি ঘুমাইতে পারে নাই। অপরাধের নুতাপে জ্বলিয়া মনটাকে সে অনেকখানি প্রকৃতিস্থ রিয়া লইয়াছিল। বরদাবাবুর কাছে একরকম কাঁদিয়াই দ কহিল,—আপনার বাড়ীতে পদার্পণ করবার যোগ্যতা মামার নেই। আমি বিশ্বাসঘাতক, নরাধম।

এ-কথা শুনিয়া বরদাবাবু ভড়কাইয়া গেলেন—প্রশ্ন দৃষ্টিতে শিশিরের পানে চাহিলেন। শিশির তার সে দুর্ব্বল মোহের কথা অতিকষ্টে কোনমতে খুলিয়া বলিল। শুনিয়া বরদাবাবু অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, হিলেন,—আমারই দোষ, শিশির। আমি যদি তোমাকে সব কথা আগে খুলে বলতুম, তাহলে আর এটা ঘটতো না। এ-বয়সে তোমাদের ও-রকম ভুল হওয়া বিচিত্র নয়। তুমি জানো না, বিভার জীবনের উপর দিয়ে কি প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে!

বরদাবাবুর স্বর আর্দ্র হইয়া আসিল। তিনি কহিলেন,—নরেন আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর ছেলে। পিতৃমাতৃহীন তাকে আমিই মানুষ করি। বিভার সঙ্গে তার বিয়ের সব ঠিক হয়। তারপর তাকে আমি বিলেত পাঠাই। সেখানে তিন বছর থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে আর-বছর সে বাড়ী ফিরছিল। পথে জাহাজে তার জীবনের সঙ্গে আমাদেরও সমস্ত সাধ-আশা অকালে ফুরিয়ে গেছে। তার জন্ম বিভাকে বিলেত-ফেরতের স্ত্রীর মত এতখানি free করে গড়ে তুলছিলুম।

খানিকটা থামিয়া তিনি আবার বলিলেন,—তারপর বিভার বিয়ের আবার সব স্থির করেছিলুম। শুনে সে একেবারে কি দীন মূর্ত্তিতে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো! কাঁচি দিয়ে মাথার চুল নির্ম্মূল করতে গেছলো! আমি তার হাতখানি ধরে ফেললুম। সে একটা নিশ্বাস ফেলে শুধু ডেকেছিল,—বাবা—! সেই স্বর, আর তার চোখের সেই চাওয়া—আমার বুকে ছুরির মত বেঁধে! সে ভর্ৎসনার স্বর আমি জীবনে ভুলবো না। বিভা তার সমস্ত কায়-মন দিয়ে নরেনের স্মৃতিকে আঁকড়ে আছে। এর পর দ্বিতীয় বার আমি বিয়ের কথা তুলিনি।...পরে আমার চোখে জল দেখে সে দীন সাজ সে খুলে ফেলে। তবে এই যে বেশভূষা আর হাসির খোলসে শোকটাকে সে চেপে রেখেচে, জেনো বাবা, এ শুধু এই বুড়োর মুখ চেয়ে।

বরদাবাবুর কাতর দীর্ঘনিশ্বাস বাতাসে মিশিয়া গেল। শিশির স্তম্ভিতভাবে তাঁর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তার মুখে একটিও কথা ফুটিল না।

সম্প্রদান

প্রথম পরিচ্ছেদ

ডিবেটিং ক্লাবে পণপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র ঝাঁজে বক্তৃতা করিয়া গৃহে ফিরিয়া পৃথ্বীশ শুনিল, তার বিবাহের কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গিয়াছে। সীতানাথবাবু খুব বড় কোন্ এক ইংরাজ হৌসের মুৎসুদ্দি, তাঁরই জ্যেষ্ঠা কন্যা পারুলবালার সহিত বিবাহ। সীতানাথ বাবু কাল সকালে সবান্ধবে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন; এবং এক সপ্তাহ পরেই বিবাহ। দেরী করা চলিবে না—সামনে মলমাস, তাই এত তাড়া!

পৃথ্বীশ নবীন গ্রাজুয়েট। এ বংশের ছেলেরা চিরকাল ইংরাজীতে কোনমতে নামটা সহি করিতে শিখিয়াই সরস্বতীর সহিত সম্পর্ক চুকাইয়া আসিয়াছে। পৃথ্বীশের পিতৃ-পিতামহ তিনপুরুষ ধরিয়া পাকা ব্যবসাদার; লোহার ব্যবসায় বাজারে তাহাদের অসাধারণ প্রতিপত্তি। লক্ষ্মীদেবীও লোহার বাঁধনে অচঞ্চলভাবে বাঁধা আছেন। পৃথ্বীশই শুধু বংশের চিরন্তন প্রথা ঠেলিয়া সরস্বতীর দরবারে হাজিরা রক্ষা করিয়া তাঁহার প্রসাদপ্রার্থী হইয়াছিল। তাই গৃহে তার খাতিরের সীমা ছিল না। পিতা নরেশ বাবু তাহাকে উপেক্ষা করিয়া কোনো কাজ করিতে পারেন না; মা ছেলের কথায় চলা-ফেরা করেন; বড় দুই ভাই পরেশ ও সতীশ কোন ব্যাপারের মীমাংসার জন্য পৃথ্বীশের মুখ চাহিয়া থাকে!

তাই আজ তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার বিবাহের কথাবার্ত্তা এতখানি পাকা হইয়া গিয়াছে শুনিয়া শুধু যে সে বিস্ময় অনুভব করিল, এমন নয়—তার ললাটে একটু ভ্রূকুটি-রেখাও দেখা দিল।

জামা না খুলিয়া সটান্ সে মার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। মা তখন দোতলার বারান্দায় বসিয়া মালা জপ করিতেছেন, নিকটে বামা দাসী পা মেলিয়া সুপুরি কুচাইতেছে। পৃথ্বীশ আসিয়া হাঁকিল,—মা—

মা বলিলেন,—কে রে? পিতু! আয় বাবা, বোস্।

পৃথ্বীশ কহিল,—না মা, বসবো না। একটা কথা শুনলুম,—সত্যি কি না, জানতে এলুম।

মা বলিলেন,—কি কথা?

—আমার না কি বিয়ে হচ্ছে? আর কাল তার পাকা দেখা?

মা হাসিয়া কহিলেন,—তা পাশ-টাশ তো করলি সব, এখন আমাদের সাধ যায় না যে, একটি টুক্‌টুকে বৌ এনে ঘর আলো করি!

বামা দাসী জাঁতির মধ্যে একটা আস্ত সুপুরিকে বাগাইয়া ধরিয়া আব্দারের সুরে বলিল,—ছোড়্‌দাদাবাবুর বিয়েয় আমার কিন্তু সোনার হার চাই, মা—হাঁ, নাহলে শুনচি না আমি।

পৃথ্বীশ তাকে ধমক দিয়া কহিল,—তুই চুপ কর্। তারপর মাকে কহিল,—কতগুলি গুণে নিচ্ছ, শুনি?

মা বলিলেন,—আমরা কি এমনি কসাই রে যে, মেয়ের বাপের গলায় পা দিয়ে টাকা আদায় করবো?

পৃথ্বীশ কহিল,—তবু শুনি না—

মা কহিলেন,—সে নিজে থেকে খরচ করবে। পয়সা-ওলা মানুষ, দশ-বারো হাজার টাকা খরচ করা তার পক্ষে বেশী কথা নয়। তার উপর এমন জামাই পাচ্ছে! এমন ছেলে বাজারে কটা আছে?

পৃথ্বীশ কহিল,—বাজার! তা এ কথাটা ঠিক বলেচো মা! আলু-পটলের মত পাত্তর আজকাল বাজারেই সাজানো থাকে, যে যেমন দর ফেলে, সে তেমনি জিনিষ বুঝে নেয়,—না?

হরিনামের ঝুলি মাথায় ঠেকাইয়া মা বলিলেন,—তোর সঙ্গে আর তর্ক করতে পারি নে বাপু। বাপ-মায়ে বিয়ে দিচ্ছে, তুই মুখ বুজে বিয়ে করে আসবি, ব্যস্—এতদিন পড়াশোনা বলে এই যে আপত্তি তুলেছিলি, কোনো কথা কইতে গেছলুম? তারপর এতগুলো পাশ করলি, এখনো বেঁকে থাকবি!

পৃথ্বীশ কহিল,—বেঁকে থাকার কথা হচ্ছে না! বেশ তো, বিয়ে করতে আমি রাজী আছি। তবে আমার এক সর্ত্ত আছে!

মা বলিলেন,—সর্ত্ত আবার কি, শুনি?

পৃথ্বীশ কহিল,—গরিবের ঘরের মেয়ে বিয়ে করবো আমি, বড়লোকের মেয়ে নয়।

মা মনে মনে বিলক্ষণ চটিয়াছিলেন। ছোট ছেলেটির বিবাহ দিলেই তাঁহার সংসারের সব সাধ মিটে! যেমন ঘর, মনের-মত পাত্রী তেমনই জুটিয়াছে—সব ঠিক! আর এই সময় ছেলে একটা বেয়াড়া সখের বশবর্ত্তী হইয়া সমস্ত ভণ্ডুল করিয়া দিতে চায়! মা মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন,—গরিবের ঘরের মেয়ে আনলে আমাদের কখনো চলে! সে না জানবে কায়দা-কানুন, না জানবে

কিছু। ছোট মন নিয়ে এসে আমার এমন ঘর ভেঙ্গে শেষে খান্‌-খান্‌ করে দিক্‌! তার উপর তার মা-বাপ, ভাই-বোনকে মাসহারা দিয়ে পুষি!

পৃথ্বীশ হাসিয়া বলিল,—গরীবের ঘরের মেয়ে আনলে তার সেবা খেয়ে বাঁচবে মা, অন্তত পাণটা আর ঝীয়ের হাতে সাজিয়ে খেতে হবে না! আর বড়মানুষী কায়দা-টায়দার কথা যা বলচো, আচ্ছা মা, আমি কথা দিচ্ছি—আমি তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে ছ'মাসের মধ্যে কেতা-মাফিক গড়ে দেবো।

মা বলিলেন,—তোর অনাছিষ্টি কথা। যা বাপু, নিজের কাজ দেখ্‌গে যা, বাজে বকে আমার জপ ভুলিয়ে দিস্‌নে।

পৃথ্বীশ বুঝিল, মা চটিয়াছেন। কিন্তু মার রাগের ঔষধ তার বিলক্ষণ জানা আছে। সে কহিল,—বেশ, আমি বলে-কয়ে খালাস রইলুম, কিন্তু। ভেবো না যে, আমি বাজারের আলু-পটল, শ্বশুরমশায় থলি ভরে টাকা এনে আমায় দেখে পরখ করে দাম ছাড়বেন, আর অমনি ঝুড়িতে তুলে নেবেন! দেখো, সব না শেষে ভেস্তে যায়! বিয়ের রাত্রে বাজনা-বাদ্যি-আলোর ঘটায় পৃথ্বীশচন্দ্র চম্পট দেছে, এ না দেখতে হয়!

মার অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—থাম্‌, থাম্‌, তোর আর অত ইয়ে করতে হবে না!

পৃথ্বীশ আর কথা না বাড়াইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

গৃহিণী আসিয়া কর্ত্তার কাছে সে কথা বলিলে তিনি বলিলেন,—ও-সব লেখাপড়াশেখা ছোঁড়াগুলোর জ্যাঠামি! ওতে কান দিয়ো না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পৃথ্বীশ সেদিনকার ছেলে—তার আবার কথা, তার আবার ওজর-আপত্তি! সে-সব ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়—এমনই ভাবের মধ্য দিয়া উভয় পক্ষে আয়োজন চলিতে লাগিল। ম্যারাপ-বাঁধা, নহবৎখানা, জ্ঞাতি-কুটুম্বের বিপুল সমাগম হইতে সুরু করিয়া এসেটিলিনের ঝাড়, কাগজের পাহাড়-পর্ব্বত, রাক্ষস-খোক্কস, গড়ের বাদ্য অবধি সব বন্দোবস্ত পাকা হইয়া গেল।

বিবাহের দিন সকালে পৃথ্বীশ ভারী গণ্ডগোল বাধাইয়া তুলিল। মার কাছে স্পষ্ট সে খুলিয়া বলিল, সে বিবাহ করিবে না—আজ রাত্রের ট্রেণে পশ্চিম যাইবে। মা প্রথমে কৌতুক ভাবিয়া ব্যাপারটাকে আমোল দিলেন না। শেষে যখন মেজ বৌ আসিয়া খবর দিল, পৃথ্বীশ সাজগোজ করিয়া একটা ব্যাগে কাপড়-চোপড় পুরিয়া কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে, তখন তিনি প্রমাদ গণিলেন। সকালে নহবতের বাঁশীতে তখন ভৈরবী স্থর ছুটিয়াছে।

কথাটা নিমেষে বাড়ীময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। কর্ত্তা চটিয়া বলিলেন,—যাক্‌ চলে সে হতভাগা! পাশ করে মাথায় উঠে বসেচে, বটে! দেশে আর কোনো ছেলে পাশ করেনি, তো! আমার অপমান করে সে বড় হতে চায়, খবর্দ্দার, কেউ তার খোঁজ করো না—

গৃহিণী কাঁদিয়া কহিলেন,—আমিও এ বাড়ীতে আর থাকতে চাই না। গাড়ী তৈরি করতে বলো, বিপিন আছে, ওর সঙ্গে এখনই আমি চাঁপাডাঙ্গা চলে যাবো।

বিপিন গৃহিণীর ভ্রাতুষ্পুত্র—চাঁপাডাঙ্গায় পিত্রালয়।

বাড়ীতে হুলস্থুল বাধিয়া গেল। জ্ঞাতি-কুটুম্বের দল—যাহারা এ পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া হিংসায় জলিয়া যাইত—কলতলায় জটলা পাকাইয়া চাপা গলায় মুখুয্যে-পুত্রের বিসদৃশ বিদ্রোহের তীব্র সমালোচনা লাগাইয়া দিল। মেজ বৌ পৃথ্বীশকে একটু ভয় করিত; কারণ, মেজবৌয়ের বাপের জমিদারীর আয় বেশী বলিয়া চাল-চলনকে সে পিতৃগৃহের সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খাওয়াইবার চেষ্টায় অহরহ ব্যস্ত থাকিত এবং পৃথ্বীশ মেজবৌয়ের এই গূঢ় প্রয়াসটুকুর প্রতি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিত। মেজবৌ দেখিত, বাড়ীর বড় হইতে ছোটটি অবধি সকলে 'পৃথ্বীশ' বলিতে অজ্ঞান—কাজেই সে বিদ্রূপ অসহ্য বোধ হইলেও নিরুপায়ে সে তাহা গায়ে মাখিয়া আসিয়াছে। বামা দাসী হলুদ-মাখা কাপড় পরিয়া প্রকাণ্ড বঁটিতে মাছ কুটিতেছিল; এখন সুযোগ পাইয়া মেজবৌ বামা দাসীর কাছে মনোভাবটা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। মেজবৌ বলিল,—এই ছেলেকে সুছেলে বলে সব পূজো করেন! আমারও এক বোন্‌-পো দুটো পাশের পড়া পড়ছে—কিন্তু মা-বাপের বি[শ]বশ! হুঃ! আর ইনি এখানে কি ব্যালাই করলেন!

বিনা-মেঘে বাজ পড়িলে লোকে যেমন স্তম্ভিত অভিভূত হইয়া পড়ে, বামা দাসীর অবস্থা সেইরূপ দাঁড়াইয়াছিল। সে কোনো কথা না বলিয়া বঁটির উপর হাত রাখিয়া বসিয়া রহিল।

বাহিরের ঘরেও আন্দোলন চলিয়াছে। সরকার মহাশয় এইমাত্র প্রোসেশনের পুলিশ-পাশ আনিয়া কর্ত্তাকে বলিতেছিল,—এখানা বড়বাবুর জিম্মা করে দেবেন—হারিয়ে গেলে—সে কথা শেষ হইল না। কর্ত্তার তাড়ায় সে হতভম্ব হইয়া থামিয়া গেল।

পাড়ার মাতব্বর নারাণ চক্রবর্ত্তী কহিল,—তাই তো, এখন উপায়?

নরেশবাবু কহিলেন,—উপায় আর কি! ঘাড় হেঁট করে এখন মেয়ের বাপের কাছে গিয়ে দাঁড়াই। সব তাঁকে খুলে বলে মাপ চাই গে।

আশু সিকদার বলিল,—ঐ তো ইংরিজি পড়ার দোষ। মাথা কেমন গরম হয়ে ওঠে। হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান থাকে না। আমার হাব জোর পড়ার অত চাড়—আমি বললুম, না বাবা, ও ইংরিজি শিখে কাজ নেই। তুমি আমার কাজ-কর্ম ভাখো, তাহলেই আমি হাসতে হাসতে স্বর্গে যাবো।

বিজয় বোস্ বলিল,—ও সব কথা থাক। এখন আর কটা দায় রয়েচে মাথার উপর, তা জানো? মেয়েদের বাড়ী খবর পাঠাতে হবে—সে ভদ্রলোক না হলে মহা-ফাঁপরে পড়বে।

যত্ন মণ্ডল বলিল,—ওঃ, কাল দেখা হলো ভদ্দরলোকের সঙ্গে—বাড়ীতে যত কুটুম অমনি গিস্-গিস্ করচে। হাসি-ভরা মুখ—প্রথম মেয়েটির বিয়ে দিচ্ছে—কাউকে আর বলতে বাকী রাখেনি, খরচেরও ত্রুটি করে নি। ইলেক্-টি্ক আলোর মালা পরে বাড়ী যেন হাসচে।

নরেশবাবু বলিলেন,—নিজে আর এ-মুখ নিয়ে গিয়ে দাঁড়াই কি করে? পরেশ কি সতীশ কেউ যাক্, হাতে-পায়ে ধরে ব্যাপারখানা তাঁকে বুঝিয়ে আসুক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরেশের মুখে ব্যাপার শুনিয়া সীতানাথ বাবু আকাশ হইতে পড়িলেন। তাই তো, এখন তাঁর উপায়? বাড়ীতে আত্মীয়-কুটুম্ব গিস্-গিস্ করিতেছে। সকলের কাছে মাথা হেঁট!

বন্ধু রমাপতি বাবু নিকটে বসিয়া ছিলেন, চুপি চুপি বলিলেন,—আরও কিছু নেবার ফিকির নয় তো?

সীতানাথ বাবু পরেশের দুই হাত ধরিয়া আর্দ্র কণ্ঠে বলিলেন,—আরও কিছু বেশী দিতে আমি রাজী আছি, বাবা—আমায় রক্ষা করো।

পরেশ নত শিরে কহিল,—আপনি সন্দেহ করবেন না, সীতানাথ বাবু, আমি দাঁও কষতে আসিনি। যথার্থই এই বিপদ ঘটেচে। বাবা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন, মা অজ্ঞান হয়ে গেছলেন।

সীতানাথবাবু কহিলেন,—এখন আমার জাত রক্ষা হয় কি করে? তাঁর চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

রমাপতি বাবু ব্যবসায়ে উকিল। সহজে তিনি কোনো কথা বিশ্বাস করিতে পারেন না। সাক্ষীদের জেরা করিয়া-করিয়া স্বভাব এমন দাঁড়াইয়াছে যে, নিতান্ত সহজ ব্যাপারকেও অত্যন্ত ঘোরালো করিয়া দেখেন। তার উপর যেখানে পয়সা-কড়ির গন্ধ আছে—সেখানকার সমস্তই তো দারুণ সন্দেহজনক! আদালতে হাকিমদের সঙ্গে নানা তর্ক করিয়া তাঁর আর একটা গুণ জন্মিয়াছে এই যে, চোখের পর্দা নাই—এবং যত কঠিন বা রূঢ় হোক্, স্পষ্ট কথা কহিতে জানেন। তিনি এবার পরেশের দিকে চাহিয়া খোলাখুলিভাবেই বলিলেন,—কেন আর ভদ্দরলোকটাকে মজাও বাবাজী, আরও কিছু নয় ধরে দেবে, যাও, ভাইটিকে যথাসময়ে হাজির করে দিয়ো।

লেখাপড়া না শিখিলেও পরেশের স্বভাবটি ছিল নম্র। ব্যবসাদারের ছেলে সে—লোকের মর্য্যাদা রাখিতে বিলক্ষণ জানে এবং সহ্য করিবার শক্তিও একটু অসাধারণ; তথাপি রমাপতি বাবুর কথা শুনিয়া তার ইচ্ছা হইল, ঐ অভদ্র বর্ব্বরটার টাক-ধরা মাথায় সজোরে এক ঘুষি বসাইয়া দেয়! মানুষ এমন হৃদয়-হীন অসভ্য হইতে পারে, মুখে এমন নির্লজ্জ কথা বাধে না, তিন পুরুষ ধরিয়া কঠিন লোহার কারবার করিয়াও তার এ জ্ঞান জন্মে নাই। শুধু সীতানাথ বাবুর বিপন্ন অবস্থার কথা ভাবিয়াই সে কোনোমতে আত্মসম্বরণ করি[illegible]।

পরেশ রমাপতির দিকে অবজ্ঞা[illegible]তে চাহিয়া সীতানাথ বাবুর পদ-স্পর্শ করিয়া বলিল,—দেখুন, আপনি আমার পিতৃতুল্য—আপনার সঙ্গে আমি ধাপ্পাবাজী করতে আসিনি। বিপদ আপনারও, আমাদেরও। তবে আপনার বিপদ আরও বেশী! আমাদের সাধ্য থাকলে যে কোনো উপায়ে আপনাকে সাহায্য করতুম। তা ছাড়া আপনি বাবাকে চেনেন—আপনি বরং তাঁর কাছে চলুন, যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয়—! পরেশের চোখের কোণে অশ্রু-বিন্দু ফুটিয়া উঠিল।

সীতানাথ বাবু তাহা দেখিলেন। তিনি কহিলেন,—দাঁড়াও, বাবা, তাই যাবো। এ বিপদ তাঁরও, আমারও। তবে বাড়ীতে একবার খবরটা দিয়ে আসি।

সীতানাথবাবু অন্দরে চলিয়া গেলেন। রমাপতি উকিল গড়গড়ায় তামাক টানিতে টানিতে পরেশের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—তামাক ইচ্ছা করেন?

পরেশ হাঁ কি না কোন কথা বলিল না, তক্তাপোষের উপর বসিয়া রহিল।

অন্দর-মহল এ দুঃসংবাদে জ্বলিয়া উঠিল। নানা কণ্ঠে নানা ভাবের সুর খেলিয়া গেল। সীতানাথ বাবু হত-বুদ্ধির মত চাতালে বসিয়া পড়িলেন, ভাগিনেয়ী চপলা তাড়াতাড়ি একখানা পাখা লইয়া আসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিল। শ্যালিকা মনোরমা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া দিদিকে ডাকিয়া ভগ্নীপতিকে কহিল,—একটু দুধ এনে দি, খান্ দেখি—

মনোরমার দিদি অর্থাৎ সীতানাথ বাবুর স্ত্রী অন্নপূর্ণা তখন গরদের শাড়ী পরিয়া আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতেছিলেন। মোটাসোটা দোহারা গৌরবর্ণ দেহ, নীচে হাতে গিন্নি-প্যাটার্ণের কয়গাছা করিয়া সোনার চুড়ি ও শাঁখা, উপর হাতে অনন্ত—গহনাগুলা সে হাতে

ঠাঁই পাইয়া চমৎকার মানাইয়াছে। কুটুম্বিনীদের মুখে এ সংবাদ শুনিয়া অন্নপূর্ণা উদ্বিগ্ন হৃদয়ে স্বামীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্নপূর্ণার স্বভাব খুব ধীর, বিপদে টলিতে জানেন না। স্বামীর মুখের ভাব দেখিয়া তিনি কহিলেন,—তা তুমি অমন করে বসে পড়লে কেন? কলকাতা সহরে পাত্রের অভাব কি? এখনই চারদিকে লোক পাঠাও—পাত্র এনে হাজির করবে'খন। মেয়ে আমার কালো-কুৎসিত নয়—আর টাকাও তুমি অল্প খরচ করচো না।

সীতানাথ বাবু হতাশভাবে কহিলেন,—কিন্তু নরেশ-বাবুর ছেলের মত পাত্র কি আর চট্ করে মেলে! সুপাত্রের জন্যই না মেয়েকে বড় করে রেখেছিলুম···

অন্নপূর্ণা জানিতেন, এ পাত্রটির প্রতি স্বামীর ঝোঁক কতখানি! রূপে-গুণে ধনে-মানে এমন পাত্র সহজে পাওয়া যায় না, সত্য! কালই রাত্রে উচ্ছ্বাসের মুখে স্বামী কতখানি আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন,—নিজে-দের জামাতৃ-ভাগ্য পারুলের স্বামিভাগ্যের আলোচনায় একেবারে পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন! ঘর-বরের কথা শুনিয়া তাঁরও প্রাণটা স্নেহ-বাৎসল্যে ভরিয়া উঠিয়া-ছিল। কিন্তু ঘটনা যখন এরূপ দাঁড়াইয়াছে, তখন আর কাঁদিয়া কি হইবে? সত্যই তো দেশে পাত্রের কিছু আকাল পড়ে নাই—ঠিক এটি না হইলে উহার মতও তো মিলিতে পারে! তবে সম্মুখে মলমাস পড়িতেছে—পাঁচ মাস আর বিবাহ হইতে পারিবে না, এই যা! তবু স্বামীর কাতরতা ঘুচাইবার জন্য তিনি বলিলেন,—তা যাই বল—যে ছেলে মা-বাপের কথা অমান্য করে, তার হাতে আমার পারুলকে পড়তে হলো না, এ ওর খুব ভাগ্যি! এ ছেলে দেখচি, গোঁয়ার-গোবিন্দ। শিখুক লেখাপড়া বাবু, তা বলে এতই কি!

তার পর পরামর্শান্তে স্থির হইল, সীতানাথ বাবু এখনই গিয়া নরেশবাবুর সঙ্গে স্বয়ং দেখা করিবেন এবং তাঁহার পুত্রকে একান্ত না পাওয়া যায়, তবে এখনই চারিদিকে লোক পাঠাইয়া পাত্রের সন্ধান করাইবেন। কলিকাতার মেষগুলা ত'ছেলেয় ঠাশা—পাত্রের অভাব কি! অন্নপূর্ণার বৃদ্ধা পিসী কহিলেন,—সত্যিই তো—ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব হয়। এত টাকা খরচ করচ শুনলে কত পাত্তর লুটিয়ে তোমার পায়ে এসে পড়বে।

—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বেলা তখন প্রায় দশটা। নরেশবাবু আত্মীয়-বন্ধুদের সহিত বৈঠকখানা-ঘরেই ছিলেন। অন্দরের দিক হইতে প্রচুর বর্ষণ পাইয়া তাঁহার রোষাগ্নি একেবারে নিবিয়া গিয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুরোধে সতীশ, সরকার মহাশয় এবং দুইজন ভৃত্য [illegible] হইয়াছে। এত বড় উৎসব-ভবনের উপর [illegible] অপ্রসন্নতার কালো ছায়া পড়িয়াছে। বৈঠকখানা গৃহ নিস্তব্ধ; কেবল দুই-চারিজন নিতান্ত লোলুপ [illegible] গড়গড়া-টানার শব্দে সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। এমন সময় পরেশের সহিত সীতানাথ বাবু পাগলের মত সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। সীতানাথ বাবুকে দেখিয়া সকলেই একটু উস্-খুস্ করিয়া নড়িয়া বসিল।

নরেশবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, —পরেশের মুখে বিপদের কথা শুনেচেন?

সীতানাথ বাবু বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন,—আমার উপায়?

—সেই কথাই ভাবচি। বলিয়া নরেশ বাবু বাহিরের দিকে তাকাইলেন।

তাহার পর বন্ধুর দলের আলোচনায় ছেলেদের ইংরাজী লেখা-পড়া শেখানো, পণের মিটিং, খবরের কাগজ—কিছুরই নিন্দা বাদ পড়িল না। বিস্তর বাদানুবাদে যখন কিনারার সন্ধান মিলিল না, তখন সীতানাথ বাবু কাতর কণ্ঠে কহিলেন,—এখন আমার জাত-রক্ষার উপায় করে দিন। আমার দুরদৃষ্ট—এমন ঘর, এমন বর তপস্যায় মেলে—মেয়ের বরাত, আমার বরাত!

নরেশবাবু ঐ সকল নিন্দাবাদে যোগ দেন নাই। তিনি বাস্তবিকই সীতানাথ বাবুর জাতি-রক্ষার উপায় খুঁজিতেছিলেন। সহসা একটা কথা মনে পড়িল; তিনি বলিলেন,—দেখুন, আমারই এক জ্ঞাতি-ভাই আছে, লক্ষ্মীকান্ত—অগাধ পয়সা—তার এক ছেলে আছে, উমাকান্ত। ছেলেটি মন্দ নয়। সেটির জন্য দেখলে হয় না?

সীতানাথ বাবু অকূলে কূল পাইলেন। তিনি কহিলেন,—তবে উঠে পড়ুন—আমার গাড়ী আছে—তাঁকে ধরে যেমন-করে পারেন, আমায় উদ্ধার করে দিন। আজ পাত্রের ঠিক না করে আমি বাড়ী ফিরবো না—এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে বেরিয়েচি। পাত্র পাই ভাল, না পাই, যেদিকে দু'চোখ যায়, চলে যাবো। এত জ্ঞাতি কুটুমের মাঝে মাথা হেঁট! একেই মেয়ে বড় করে রেখেচি বলে পাঁচজনে পাঁচ কথা শুনিয়ে আসচে, তার উপর এই বিভ্রাট!

নরেশবাবু কাঁধে একখানা চাদর ফেলিয়া সীতানাথ বাবুর সহিত জ্ঞাতি-ভ্রাতা লক্ষ্মীকান্তর গৃহে উপস্থিত হইলেন।

মোটা থামওয়ালা বাড়ী। লোকজনের অন্ত নাই। বাহিরের ঘরে কালো মোটা এক ভদ্রলোক

শুইয়াছিলেন, একটা ভৃত্য বসিয়া তাঁহার পা টিপিয়া দিতেছিল। নরেশবাবু আসিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন,—ওহে লক্ষ্মী—শুনচো ?

মোটা ভদ্রলোকটি উঠিয়া বসিলেন; সীতানাথবাবু বিস্তর আবেদন-নিবেদন জানাইলেন। শুনিয়া ভারী দাঁও মিলিয়াছে ভাবিয়া লক্ষ্মীকান্ত কহিল,—তাই তো—মশায়ের এ দায়ে আমার দেখা খুবই উচিত, স্বীকার করি—কিন্তু এদিকে এক বিপদ ঘটেচে—

বিপদ! সীতানাথ বাবু ভড়কাইয়া গেলেন। তিনি একেবারে লক্ষ্মীকান্তর পায়ে হাত দিয়া বলিলেন,—আমায় রক্ষা করতেই হবে।

লক্ষ্মীকান্ত পা সরাইয়া নমস্কার করিয়া কহিল,—আহাহা, করেন কি! আপনি মহাশয় ব্যক্তি! তা বিপদটা কি, জানেন? উমাকান্তর বিস্তর সম্বন্ধ আসছিল, তার মধ্যে টিকুলির জমিদাররা শেষ কথা দিয়ে গেছে। তারা সবশুদ্ধ পঁচিশ হাজার দেবে বলে পাঠিয়েচে, —আমিও একরকম মত দিয়েচি। আরও বলে পাঠিয়েচেন যে, পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে তাঁরা পাকা দেখা সেরে রাখতে চান—তারপর ও-মাসের প্রথম তারিখ পেলেই বিয়ে হবে। বাড়ীতে মেয়েদেরও সাধ, ঐখানে বিয়ে হয়!

লক্ষ্মীকান্তর চেহারা ও কথাবার্ত্তার ধরণ সীতানাথ বাবুর বড় মনঃপূত হইতেছিল না। অন্য সময় হইলে তিনি এ-সকল কথা উত্থাপনও করিতেন না—কিন্তু এ যে বড়-বিপদের মুখ! এখন আর বিচার-তর্কের সময় নাই! তবু পঁচিশ হাজার টাকার কথা তাঁর কাণে অত্যন্ত বেসুরা বাজিল। তিনি বলিলেন,—পঁচিশ হাজার টাকা?

লক্ষ্মীকান্ত বলিল,—হাঁ, আমার ঐ এক ছেলে কি না, আর আমার বিষয়-সম্পত্তির সম্বন্ধে মশায় বাইরে খবর নিতে পারেন।

সীতানাথ বাবু বলিলেন,—তাহলে আমায় উঠতে হলো। আমার এটি বড় মেয়ে বটে, কিন্তু এটি-ছাড়া আরো দুটি মেয়ে আছে—অবশ্য প্রথমটির বিয়েয় যা খরচ করবো, তা যে সকলের বেলায় করতে পারবো, তাও বলচি না। তবু আমার মত লোকের পক্ষে পঁচিশ হাজার টাকা দেবার চেষ্টা করা বাতুলতা! তাহলে আর কি, উঠি। নিরুপায়! কথাটা শেষ করিয়া সীতানাথ বাবু হতাশ-ভাবে দেওয়ালের গায়ে টাঙানো ঘড়ির পানে চাহিলেন। এগারোটা বাজিতে তখন তিন মিনিট বাকী!

লক্ষ্মীকান্ত দেখিল, শীকার বুঝি পলায়! তিনি ভাবিলেন, না, দর নামাইতে হইবে। ও পক্ষ খবর লইতে গেলে বিস্তর গোল বাধিতে পারে! টিকুলির জমিদারের কথাটা একেবারে বানানো না হইলেও, দরটা অবশ্য অতিরঞ্জিত করিয়াই বলা হইয়াছিল। তা এরূপ ব্যবসা-ক্ষেত্রে একটু-আধটু অতিরঞ্জনে দোষ নাই। পঁচিশ হাজার না হৌক, পাঁচ হাজার অবধি উঠিতে পারে বলিয়া তাহারা আভাস দিয়া গিয়াছে। তবে এ কথা ঠিক, ছেলের গুণের কথা জানে না বলিয়াই! পুত্র উমাকান্তর গুণের মধ্যে পাড়ার এ্যামেচার থিয়েটারের সে সেক্রেটারি! নাটকে নায়ক সাজিয়া বেশ চমৎকার নাকি সুরে করুণ অভিনয় জমাইয়া তুলিতে পারে, এবং ইয়ার-মহলে পুরাদস্তুর 'খরুচে' বলিয়া নাম কিনিয়াছে; নাম-ডাক আছে; রাত্রেও সব দিন আজকাল বাড়ীতে থাকে না! বনিয়াদি প্রথায় এতখানি পোক্ত থাকার দরুণ কলিকাতার কোন [illegible] জমিতে-ছিল না, আসিয়া ফাঁশিয়া যাইতেছিল! ভাগ্যক্রমে যদি বা আজ এমন দাঁও মিলিয়াছে—আহা! লক্ষ্মীকান্ত বলিল,—তা বেশ, আপনি ভদ্রলোক, আপনি নয় বিশ হাজারই দেবেন। আপনার মত মহাশয় ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক করতে গেলে, ও তুচ্ছ পাঁচহাজার টাকা লোকসান করা কি-আর এমন বড় কথা!

সীতানাথবাবু কহিলেন,—না মশায়, বিশহাজার দেওয়াও আমার পক্ষে দুঃসাধ্য, অসম্ভব বলতে হবে।

সীতানাথ বাবু উঠিলেন।

লক্ষ্মীকান্ত বলিল,—আহা, উঠলেন যে! বসুন, বসুন —একছিলিম তামাকই নয় খেয়ে যান। আপনি নরু-দার সঙ্গে এসেচেন—যাক, তবে না হয় ঐ ষোল হাজা-রেই রাজী হয়ে পড়ুন—আমি উমাকান্তকে ডাকিয়ে দি—আশীর্ব্বাদ করে যান। আজই লগ্ন বলছিলেন না? তা আটটার লগ্নে হতে পারে না। ঐ যে বল-লেন, দশটায় আর একটা লগ্ন আছে, সেইটেতেই ঠিক করুন। কেন না, আমায় আবার সব গোছগাছ করে নিয়ে যেতে হবে। একটি ছেলে,—বাজনা, বাতি, লোকজন—এ-সব না হলে নিজের মুখ দেখাতে পারবো না যে।

সীতানাথ বাবু দেখিলেন, তিনি এখন দায়ে পড়িয়া-ছেন—সে দায়ে রক্ষা পাইতে হইলে মূল্য কিছু বেশী দিতে হয়। তবু লক্ষ্মীকান্তকে খুব ভদ্রলোক বলিতে হইবে, তাঁর জন্য অতগুলা টাকা লোকসান করিতেছে! তাঁহারও যেমন করিয়া হোক, পাত্র আজ চাইই! তখন আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর পনেরো হাজারেই দর রফা হইয়া গেল।

লক্ষ্মীকান্ত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া উমাকান্তকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

আধ ঘণ্টা পরে বংশধর উমাকান্ত আসিয়া দেখা দিল। রং শ্যামবর্ণ, চোয়াড়ে ধরণের চেহারা, মাথার চুল সম্মুখদিকে অত্যন্ত দীর্ঘ, পিছনে নাই বলিলেও

লে—চোখ দুটি জবাফুলের মত লাল—কাল সারা রাত্রি থিয়েটারে কাটাইয়া সকালে আসিয়া শয্যায় পড়িয়াছিল; বাড়ীর লোকের হাঁকাহাঁকিতে ঘুম ভাঙ্গিলে চিত্ত এখন বিরক্তির ভাব ধারণ করিয়াছে। সীতানাথ বাবু একদৃষ্টে তাহার পানে লক্ষ্য করিতেছেন দেখিয়া, লক্ষ্মীকান্ত বলিল,—কাল এক বন্ধুর বাড়ী নেমন্তন্ন ছিল, সেখানে সারারাত জেগে খাটতে হয়েচে,—ইত্যাদি ইত্যাদি।

পুত্র পিতার পানে ঈষৎ কৌতুক-মিশ্রিত দৃষ্টিতে চাহিয়া মাথা নামাইয়া বসিল। সীতানাথ বাবু পাত্র আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—তাহলে আমি বাড়ী গিয়ে খবর দিইগে—উদ্যোগ সব বন্ধ আছে কি না! ঐ দশটার লগ্নই তাহলে ঠিক? আর কন্যা-আশীর্ব্বাদটা—

তাকিয়াটা কোলের উপর তুলিয়া শরীরকে একটু হেলাইয়া লক্ষ্মীকান্ত বলিল,—তার আর কি! আমার মা-লক্ষ্মীকে ঐ সম্প্রদানের পূর্ব্বেই আশীর্ব্বাদ করবো'খন। এখন আমিও সব উদ্যোগ করি। বলেন কি, নালিশ করতে গেলেও লোকে চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশ দেয়—আর এ আট-দশ ঘণ্টার নোটিশে বিয়ে! হাঃ-হাঃ-হাঃ! লক্ষ্মীকান্ত গলা ছাড়িয়া উচ্চ হাস্য করিল।

লক্ষ্মীকান্তর হাসির সুর সীতানাথ বাবুর প্রাণে বাজের মত বাজিল। তিনি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বিদায় লইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছে। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ সারিয়া একটু মিছরির সরবৎ মাত্র গলায় ঢালিয়া সীতানাথ বাবু নিজের ঘরে আসিয়া খাটের উপর শুইয়া পড়িলেন। মেঝেয়-বিছানো কার্পেটের উপর বসিয়া মেয়েরা পারুলকে 'কনে' সাজাইতেছে। সীতানাথ বাবুর মনটা মোটেই প্রসন্ন নয়—প্রথম মেয়ের বিবাহ, বলিতে গেলে তাঁহার আমোলে বাড়ীতে এই প্রথম কাজ! বাহিরে বাজনা-বাদ্য, গণ্ডগোল পুরা মাত্রায় চলিলেও তিনি যেন উহারই মধ্যে কলের-পুতুলের মতই চলা-ফেরা করিতেছেন, কোন কাজেই তেমন মন লাগিতেছিল না। বিবাহের দিন এ-ভাবে বর-বদল হইয়া গেল! এমন ব্যাপার কোথাও কখনো ঘটিয়াছে, না, কেহ কখনো এমন ব্যাপারের কল্পনা করিতে পারিয়াছে! একটা ভাবী অমঙ্গল-আশঙ্কায় তাঁহার বুকটা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল! সহসা তিনি পারুলের পানে চাহিলেন। তাঁহার মনে হইল, পারুলের চোখ দুটিতে যেন আজ তাহার সে স্বাভাবিক দীপ্তিটুকু আর নাই! মুখেও কেমন বিষণ্ণতার ছায়া পড়িয়াছে! কৈ, কাল ও মুখ অমন ছিল না, চমৎকার দেখাইতেছিল! একটা তীব্র বেদনায় মন তাঁহার টনটন্ করিয়া উঠিল। চোখের সম্মুখে জাগিয়া উঠিল, উমাকান্তর সেই চেহারা—লাল্ চোখ, কামানো ঘাড় এবং মাথার সম্মুখে দীর্ঘ চুল! নিতান্ত গোঁয়ারের মূর্ত্তি! হায়, এমন সোনার কমল মেয়েকে, তিনি কি না, শেষে একটা বানরের হাতে স'পিয়া দিতেছেন! না হয় আরও পাঁচ মাস অপেক্ষা করিতেন—না হয়, লোকে দূষিত! তবু মেয়েটার তো এ-ভাবে সর্ব্বনাশ করা হইত না। ঝোঁকের মাথায় তখনই তাড়াতাড়ি, পাত্র খুঁজিতে বাহির হইয়াই এই বিভ্রাট ঘটিল! হায় হায়, মেয়েটার কি দুর্দ্দশাই না তিনি করিলেন! অমনি আবার মনে হইল, মিথ্যা আর এ-সব ভাবিয়া কি ফল ভবিতব্য! ঐ উমাকান্তই যে পারুলের বর। নহিলে এত পাত্রের মধ্যে ঘটকেরা কৈ কোন দিন তাহার কোন সংবাদ লইয়া আসে নাই তো! আর আজ অমন ভাল পাত্র ঠিক থাকিলেও হাত-ছাড়া হইয়া গেল এবং ঘটনা চক্র শেষে এখানে আসিয়া দাঁড়াইবে কেন! যাক্ উহাকে লইয়াই পারুল সুখী হোক! ও বিষয়ে এখন আর মন খারাপ করিয়া কি হইবে?

সীতানাথ বাবু এমনই নানা কথা ভাবিতেছিলেন এমন সময় এক সুবেশ তরুণ যুবা সে ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল, আসিয়াই কহিল,—মেজমামা, এ কি শুনচি! পৃথ্বীশের সঙ্গে না কি সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেছে?

সীতানাথ বাবুর চোখ ছলছল করিয়া উঠিল আপনাকে একান্তই করুণার্হ ভাবিয়া মৃদু কণ্ঠে তিনি কহিলেন,—কে ললিত, আয় বাবা, বোস্।

যুবার নাম ললিত। সীতানাথ বাবুর খুড়তুতো বোনের ছেলে সে; প্রেসিডেন্সিতে বি. এ, পড়িতেছে, ললিত বলিল,—না, বসবো কি! তার উপর শুনলুম ঐ উমাকান্তর সঙ্গে পারুলের বিয়ে দিচ্ছেন আপনি!

—হাঁ। কিন্তু উপায় কি?

উপায় কি! রামচন্দ্র! ঐ বিশ্ব-বখা হতভাগা উমাকান্ত! এমেচার থিয়েটারে রাজা সেজে বেড়ায়—নেশাটেশাও দিব্যি ধরেচে—যত লক্ষ্মীছাড়া সঙ্গীর সঙ্গে দিবারাত্র ইয়ার্কি দিয়ে ফেরে—এত টাকা খরচ করে সেইটের সঙ্গে পারুলের বিয়ে দিচ্ছেন! হুঁঃ, তার চেয়ে ওর গলা টিপে ওকে মেরে ফেলুন না কেন?

মেয়েদের দলে উপবিষ্টা এক বর্ষীয়সী সহসা গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন,—ললিত—

সে স্বরে চমকিয়া ললিত চাহিয়া দেখে, সে ঘরে পারুল বসিয়া আছে। বর্ষীয়সীর চোখের ইঙ্গিত ললিত বুঝিল, এ কথাটা পারুলের সম্মুখে কওয়া ঠিক হইতেছে না।

ললিত কহিল,—আপনি এমন চুপচাপ পড়ে থাকলে চলবে না, মেজমামা—পৃথ্বীশকে যেমন করে হোক, পাকড়ানো চাইই। আমি সব শুনেচি। এতেই আপনি হাল ছেড়ে দিয়েচেন! আসুন'দিকি আমার সঙ্গে, একখানা মোটর নিয়ে বেরিয়ে পড়ি—সন্ধ্যারও এখন দেরী আছে।

সীতানাথ বাবুর মনে হইল, এতক্ষণ তাঁহার যেন একটা কঠিন পীড়া হইয়াছিল—হাত-পাগুলা দুর্ব্বল অবশ হইয়া পড়িয়াছিল, কোনো শক্তি ছিল না—এখন ললিতের কথায় যেন আবার নূতন করিয়া চেতনা-শক্তি তিনি ফিরিয়া পাইলেন! ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিয়া তিনি বলিলেন,—নরেশবাবুর ছেলের সঙ্গে তোর জানা-শোনা আছে না কি?

ললিত কহিল,—না, তবে তার যে প্রধান মন্ত্রী হরিহর—ওদের ক্লাবের সেক্রেটারি, তার সঙ্গে আমার খুব ভাব আছে! চলুন দিকি, তাকে ধরে পৃথ্বীশবাবুকে বার করতে পারি কি না, দেখি। তাঁকে পেলে, আর ব্যাপারটা বোঝালে সহজেই তিনি রাজী হবেন বলে আমার বিশ্বাস্। নিন, নিন, আপনি উঠে পড়ুন। একটা জামা—থাক্‌গে না হয়, দেরী হয়ে যায় যদি,—তার চেয়ে আসুন, আমার এই চাদরখানা নিয়েই চলে আসুন। আমি এসে এ-সব শুনে অবাক হয়ে গেছি! একনিশ্বাসে ললিত কথাগুলা বলিয়া গেল।

সব কথাগুলা সীতানাথ বাবুর কাণেও গেল না—তিনি ঠিক বুঝিতেও পারিলেন না। তিনি যেন কেমন হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। ললিত তাঁহাকে একরূপ টানিয়া বাহিরে আসিল এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া একেবারে পথে বাহির হইয়া পড়িল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পৃথ্বীশকে বাহির করিতে কষ্ট হইল না। ক্লাবের সেক্রেটারি হরিহরের বাড়ী আসিয়া তাহাকে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিতেই সে বলিল,—ও! তাই বুঝি রাস্কেল হঠাৎ আমার এখানে এক ব্যাগ নিয়ে এসে উপস্থিত—বললে, বিয়ের দিন পেছিয়ে গেছে, মেয়ের বাড়ীতে কার খুব অসুখ—চলো, এই হিড়িকে পুরী-টুরী কোথাও ঘুরে আসি।

ললিত কহিল,—সব মিছে কথা। তার পর সীতানাথ বাবুকে দেখাইয়া দিয়া কহিল,—ইনি আমার মেজ মামা, এঁরই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে। ভদ্দরলোক বাধ্য হয়ে [illegible] কি না পনেরো হাজার টাকাশুদ্ধ মেয়েটিকে ধরে ঐ [illegible]ছাড়া উমাকান্তর হাতে সঁপে দিচ্ছেন! কাল বিকেলে আমি আমার বাড়ী থেকে চলে এসেচি; তার পর আজ সারাদিন সেই সকাল থেকেই প্রেসে কেটেছে! সেখানে বসে থেকে বিয়ের পত্র ছাপিয়ে ফিরে গিয়ে শুনি, এই ব্যাপার! তাই ওঁকে তোমার কাছে টেনে আনলুম। এখনো সময় আছে—তুমি উপায় করো, পৃথ্বীশ বাবুকে চাইই! তুমি তাঁকে এনে দাও—নাহলে মেয়েটার ইহ-জন্মটাই পুড়ে ছাই হয়ে যায়!

হরিহর কহিল,—দাঁড়াও,—সে রাস্কেল আমার উপরকার লাইব্রেরি-ঘরে বসে কি-সব [illegible]-পত্র ঘাঁটচে; বলে, মাথায় কি মজার আই[illegible] এসেচে—একটা বই লিখবে। বেশ, সীতানাথ বাবুকে নিয়ে আমি উপরে যাচ্ছি। তুমি বরং এইখানে একটু অপেক্ষা করো।

সীতানাথ বাবুকে লইয়া হরিহর লাইব্রেরি-ঘরে আসিল। একখানা কৌচে প্রকাণ্ড এক কেতাবের আড়ালে মুখ গুঁজিয়া পৃথ্বীশ পড়িয়া ছিল। হরিহর ডাকিল,—পৃথ্বীশ—

পৃথ্বীশ বইখানা মুড়িয়া রাখিয়া মাথা তুলিল, কহিল,—কি?

হরিহর কহিল,—তোমার শ্বশুর এসেচেন দেখা করতে—

শ্বশুর! পৃথ্বীশ বিস্ময়ে উঠিয়া বসিয়া কুতূহলী দৃষ্টিতে সীতানাথ বাবুর পানে চাহিয়া দেখিল। সীতানাথ বাবু অগ্রসর হইয়া একেবারে তাহার হাত দুইটা ধরিয়া বলিলেন,—বাবা, এ দায়ে আমায় উদ্ধার করো—তোমার মঙ্গল হবে।

হরিহর কহিল,—তুমি এত বড় পাষণ্ড যে পালিয়ে এসে ওঁর সর্ব্বনাশ করচো!

পৃথ্বীশ কহিল, কিন্তু—

হরিহর কহিল, এঁরই নাম সীতানাথ বাবু। তুমি—

পৃথ্বীশ কহিল, আহা, আমার কথাটা—

হরিহর কহিল,—না, এর মধ্যে তোমার কোন কথা থাকতেই পারে না।

সীতানাথ বাবু কহিলেন,—শোনো, বাবা, তোমার কোন দোষ নেই। তবে আমারও কথা শোনো, শুনে যা বলবার থাকে, বলো। আজ আমায় মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে—সে নাহলে দ'পড়া হবে। দ'পড়া হলে সে মেয়েকে কেউ আর বিয়ে করবে না। তাই তোমার কাছে নিরাশ হয়ে লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের ছেলে উমাকান্তর সঙ্গে তার বিয়ের সব ঠিক করতে হয়েচে। লক্ষ্মীকান্তবাবু পনেরো হাজার টাকা নিয়ে বিয়ে দিতে রাজী হয়েচেন। সে ছেলে কেমন, তা তুমি জানো, বোধ হয়। তোমার এই বেঁকে দাঁড়ানোতে বাধ্য হয়ে মেয়েটাকে এ যে কোথায় আমি ফেলে দিচ্ছি, তা বাপ হয়েও কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে।

পৃথ্বীশ কহিল,—কিন্তু জানেন তো, এ বিয়েয় আমার আপত্তি আছে—

কি আপত্তি? বলো।

আমার প্রতিজ্ঞা, যদি বিয়ে করি তো একপয়সা পণ নেবো না। গরিবের মেয়ে বিয়ে করবো, আর—

তাহলে আমার মেয়ে ভেসে গেলেও তুমি ফিরে চাইবে না? শোনো বাবা, আমি মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছি, সুপাত্র পাইনি বলে জ্ঞাতি-কুটুমের মানা ঠেলেও তাকে বড় করে রেখেচি—মনের মত পাত্র পেয়ে মহা-আনন্দে নিজের ইচ্ছায় আজ যখন খরচ-পত্র করতে বসেচি, তখন এই বিপদ। বুঝচি, উমাকান্তর হাতে মেয়ে দেবার চেয়ে মেয়ের গলা কেটে মেরে ফেলাও নিষ্ঠুরতা নয়। কিন্তু তাও বাধ্য হয়ে আমায় করতে হচ্ছে—

হরিহর বলিল,—এ তোমার অন্যায় হচ্ছে, পৃথ্বীশ। তোমার গোঁয়ের জন্য বালিকার ইহজন্মটা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে? না, তা কখনো হবে না! বিশেষ এত পাকাপাকি বন্দোবস্তর পর—

সীতানাথ বাবু আর্দ্র স্বরে বলিলেন, আমায় দয়া না হয়, আমার মেয়ের মুখের পানে চেয়েও—একটা নারী-জন্মকে তার চিরদিনের দুঃখ-দুর্দ্দশা থেকে রক্ষা করবার জন্যও না হয়—

পৃথ্বীশ বলিল,—বেশ, কিন্তু আমার সর্ত্ত আছে—

—বলো, কি সর্ত্ত—

—এ বিয়েয় আপনি যৌতুক-হিসাবে এক-পয়সা দিতে পারবেন না—

—বেশ বাবা, শুধু শাঁখা দিয়েই মেয়েকে তোমার হাতে সম্প্রদান করবো।

—আর—

—আর কি? বলো।

—বাজনা-বাদ্যি করে, আলোর ঘটা নিয়ে চতুর্দ্দোলায় চড়েও বিয়ে করতে যাবো না আমি। ঐ বাড়ীর যে গাড়ী আছে, তাইতে—আর আমার ক'জন আত্মীয়-বন্ধু নিয়ে—ব্যস! কিন্তু আমার বাবাকে এতে রাজি করাতে পারবেন?

—সে ভার আমার। তিনি আমায় দয়া না করে থাকতে পারবেন না।

হরিহর কহিল,—তাহলে চলুন। ওকে নিয়ে যাওয়া যাক।

—

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সীতানাথ বাবু চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন; বসিয়া ভাবিতেছিলেন, জীবনটার উপর দিয়া আজ কি ঝড় এ বহিয়া গেল! এই সুখ, এই দুঃখ, আবার সুখ, ভারী বিচিত্র ব্যাপার! আজ যে ঘটনা এই ঘটিয়া গেল, ইহা সত্যই ঘটিল, না, এ স্বপ্ন! ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন তাড়া দিতেছিলেন,—স্ত্রী-আচার সেরে নাও—এধারে আর বিলম্ব নাই।

পৃথ্বীশকে লইয়া মেয়ে-মহলে স্ত্রী-আচার চলিতেছিল। নিরানন্দ পুরীতে আবার আনন্দের ঢেউ ছুটিয়াছে। শাঁখের রোলে পাশের লোকের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। পৃথ্বীশও সন্ত্রস্ত—বিশেষ ললিতের নবোঢ়ার জ্বালায়! সে সজোরে পৃথ্বীশের কাণ মলিয়া দিলে পৃথ্বীশ রাগিয়া উঠিল,—আঃ!

অমনি পাঁচ-সাতটা বীণা এক সুরে ঝঙ্কার তুলিল, ওগো,—মিনি-পয়সার জিনিষ পেলে লোকে এমন হেনস্তাই করে থাকে!

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আবার হাঁক পাড়িলেন,—আন, আপনারা সেরে আন্—ঐ আটটা বাজলো, লগ্ন বয়ে যায়!

বর আসিয়া বসিলে কন্যাকে তাহার সম্মুখে বসানো হইল এবং মন্ত্র-পাঠ আরম্ভ হইল। ছেলে-মেয়েরা চতুর্দ্দিকে ভিড় করিয়া আসিয়া বসিল। সীতানাথ বাবু যখন কন্যা-জামাতার হাত এক করিয়া দিলেন, তখন আনন্দে তাঁহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। আহা, সুখী হও, দু'জনে চিরসুখী হও তোমরা!

কন্যা-জামাতাকে বাসরে পাঠাইয়া স্বচ্ছন্দ মনে সীতানাথ বাবু বাহিরে আসিলেন; নরেশ বাবুকে অত্যন্ত আবেগে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—আপনি আমায় কিনে রাখলেন, চিরদিনের জন্য কিনে রাখলেন। ওঃ, আমার যে আজ কি আনন্দ হচ্ছে, তা আর কি বলব?

নরেশবাবু বলিলেন,—আমার সঙ্গে আর ও-সব কথা কেন? এখন এই ভদ্রলোকরা যাঁরা এসেছেন, এঁদের আর বসিয়ে রাখা কেন? এঁদের বসাবার উদ্যোগ করা যাক না!

ছাদের উপর ভোজনের স্থান। সকাল-সকাল আহারের ডাক পড়ায় উপস্থিত নিমন্ত্রিতবর্গ সন্তুষ্ট চিত্তে ছাদে গিয়া উঠিলেন। সীতানাথ বাবু নিজে আগাগোড়া খাওয়া-দাওয়ার তদ্বির করিতে লাগিলেন। এঁকে আরো মাছ দাও হে, ও পাতে খানকতক লুচি।—না, না, তাও কি হয়? আজ বড় আমোদের রাত্র—আপনারা আমোদ করুন।—ফেলা যাবে? যাক্ ফেলা—তার জন্য কি!—ওরে, সরবৎটা আর-একবার এদিকে আন্। আপনার কি চাই?—পটলভাজা—? ওরে পটলভাজা, পটল, পটল!

এত টাকার মানুষ হইয়াও সীতানাথ বাবু দাঁড়াইয়া সকলকে খাওয়াইতেছেন, কোনদিকে এতটু

না ত্রুটি হয়, সে বিষয়ে এমন লক্ষ্য! দেখিয়া নিমন্ত্রিতের দল চমৎকৃত হইয়া গেল।

এমন সময় গলির মোড়ে ঝমরঝম্ শব্দে ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। প্রকাণ্ড সমারোহ করিয়া এক বর চলিয়াছে, বিবাহ করিতে! শব্দ নিকটে আসিল, ক্রমে আরও নিকটে—বাড়ীর সম্মুখে! শেষে বাজনার শব্দে লোকের কাণে তালা ধরিবার উপক্রম।

এমন সময় ললিত ছুটিয়া ছাদে আসিয়া ডাকিল,—মেজমামা—

সে ডাক মেজমামার কাণেও পৌঁছিল না। তিনি তখন ও-পাড়ার বিখ্যাত খাইয়ে নন্দ চাটুয্যের পাতে গণিয়া কচুরি দেওয়াইতেছিলেন। ললিত তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল,—এ আপনি করেচেন কি! বর উমাকান্ত যে ওদিকে বাদ্যভাণ্ড নিয়ে উপস্থিত! তাদের বুঝি আর খবর দিয়ে বারণ করে পাঠান নি?

সীতানাথ বাবু চক্ষু কপালে তুলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, কহিলেন,—তাইতো, ভারী ভুল হয়ে গেছে তো! আহ্লাদের চোটে ও কথাও আর মনে পড়েনি! তাছাড়া সময়ই বা পেলুম কখন্, বল্? এদের নিয়ে ঠিকঠাক করে ফিরতেই ত পৌনে আটটা বাজলো—তার পর ফিরেই বিয়ে দিতে বসলুম! তবে ফেরবার মুখে গাড়ীতে একবার কথাটা মনে হয়েছিল বটে! ভেবেছিলুম, বাড়ী ফিরে তোকে নয় দু-একজন মাতব্বরের সঙ্গে পাঠাবো—শেষে আর মনেই পড়েনি রে!

ললিত কহিল,—এখন উপায়? তাহার স্বরে অনেকখানি উদ্বেগ।

সীতানাথ বাবু তখন আনন্দে উচ্ছ্বসিত। কোনো দুর্ভাবনাই মনে আর হুল ফুটাইতে পারে না! হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—তার আবু কি? সব অভ্যর্থনা করে বসাও। তার পর ঐ বড় ঘরে ওঁদের সমস্ত বরযাত্রীদের জন্য পাত করতে বলে দাও গে—

ললিত অবাক্ হইয়া গেল! আনন্দের আতিশয্যে মেজমামার মাথা খারাপ হইয়া গেল না কি? এ উনি বলেন কি!

সীতানাথ বাবু কহিলেন,—অবাক্ হচ্ছিস তুই? ছেলেমানুষ কি না! ওরে, আজ বড় আহ্লাদের দিন। আজ আমার বাড়ী থেকে না খেয়ে কারো ফেরবার জো কি! সব পাত করিয়ে বসিয়ে দিগে যা বাবা। তার পর আমিও যাচ্ছি।

মামার খোশখেয়ালী মেজাজ দেখিয়া ললিতের অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল। মামা তো জানেন না, বাহিরে ঐ যে নূতন দলটি আসিয়া উদয় হইয়াছে, তাহারা কি ... তৈয়ারী পদার্থ! ছেলে থিয়েটারে রাজা সাজিয়া ... ড়ায়—তার বাপ! এক কথায় ষোল হাজার টাকা রোজগার করিতেছিল—সে রোজগারে বাধা! তার কামড় কি সহজ হইবে!

উপর হইতে সীতানাথ বাবু নামিয়া আসিলেন। বাহিরে একেবারে লোকারণ্য! ...ন ও হলঘরে বরযাত্রীর বেজায় ভিড়! লক্ষ্মীকান্তকে দেখিয়া তিনি হাসিয়া নমস্কার করিলেন, কহিলেন,—এই যে, বসুন সব! তামাক-টামাক পেয়েছেন ঠিক?

লক্ষ্মীকান্ত কোন জবাব দিল না। ঝড়ের পূর্ব্বে বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর ভিতরে-ভিতরে যেমন ফুলিতে থাকে, বাহিরে শান্ত মূর্ত্তি,—লক্ষ্মীকান্তর ভাবখানা ঠিক তেমনি!

বর উমাকান্ত একখানা কৌচে বসিয়াছিল। গায়ে লাল ভেলভেটের উপর জরির কাজ-করা চাপকান—পরিধানে যাত্রার রাজার মতই লাল ভেলভেটের হাফ-প্যাণ্ট; হাঁটুর নীচে সে প্যাণ্টের প্রান্তভাগটুকু আবার গুটানো-মত; মাথায় জরি দেওয়া লাল ভেলভেটের পাগড়ী, সম্মুখে সাদা একটা পালক্ খাড়া দাঁড়াইয়া,—বায়ু-স্পর্শে মৃদু দুলিতেছে!

সীতানাথ বাবু কহিলেন, জায়গা হচ্ছে—এখনই সব বসিয়ে দেবো। ততক্ষণ—ওরে, পাণ নিয়ে আয় না রে—পাণ, মিঠে পাণ—দোনা, দোনা! আর কতকগুলো হুঁকো অমনি বেশী করে আনিস্—আর তামাক—

লক্ষ্মীকান্তর পাশে তাহার সম্বন্ধী দাঁড়াইয়াছিল; মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি—তাড়াতাড়ি বরযাত্রী আসিতে হইয়াছে বলিয়া কামাইবার সময় পায় নাই! গায়ে সার্ট,—হাতা দুইটা একটু বেশী দীর্ঘ। দেখিলেই মনে হয়, নিজের জামা নয়—আর-কাহারও; ধার করিয়া আজিকার রাত্রের মত গায়ে দিয়া আসিয়াছে। সম্বন্ধী হাতা দুইটা উহারই মধ্যে সকলের অলক্ষ্যে মাঝে-মাঝে টানিয়া উপরে তুলিতেছে, কিন্তু পরক্ষণে সে হাতা আবার ঝুলিয়া পড়িতেছে! ভিতরে বরযাত্রীর দল নানাবিধ কলরব করিতেছিল।

লক্ষ্মীকান্তর ইঙ্গিতে সম্বন্ধী অর্থাৎ উমাকান্তর মাতুল বলিল, বসতে বলচেন—কিন্তু এধারে এ সব শুনচি কি?

সে কথা কাণে না তুলিয়া সীতানাথ বাবু বলিলেন, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? সব ঠিক আছে। ওরে, জায়গা হল?

লক্ষ্মীকান্ত গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—আসল কাজটা—

মুখের কথা লুফিয়া মাতুল কহিল, তার সঙ্গে খোঁজ নেই, খালি জলো কুটুম্বিতে হচ্ছে! বলি, বাড়ীতে পুরে অপমান করবার জন্যই কি মশায়ের ওবেলা পায়ে ধরতে যাওয়া হয়েছিল? জুচ্চুরির আর জায়গা পাননি? মাতুল ক্রোধে গর্জ্জিতে লাগিল।

সীতানাথ বাবু তার হাত ধরিয়া কহিলেন, আহা, । করচেন কেন? মুখে কিছু দিন আগে, তার পর ।বার্ত্তা হবে'খন।

লক্ষ্মীকান্ত কহিল,—আমরা নেমন্তন্ন খেতে আসিনি ।ানে—

মাতুল জের টানিল,—আমাদের আর লুচির লোভ খাতে হবে না! দু'খানা লুচি ভাজিয়ে খাবার সামর্থ্য ।মাদের আছে!

সীতানাথ বাবু অপ্রতিভভাবে কহিলেন,—আজ্ঞে, তা ।বচেন কেন? তবে একটু মিষ্টিমুখ না করিয়ে কি ছাড়তে ।রি—বিশেষ আজকের রাত্রে!

লক্ষ্মীকান্ত গম্ভীর স্বরে কহিল,—সীতানাথ বাবু, ও-সব ।লাকি রাখুন।

মাতুল কহিল,—পাজী ছোটলোক কোথাকার!

বরযাত্রীদের মধ্যে এক জন বলিল,—লোকটা পাগল া কি!

লক্ষ্মীকান্ত বুক ফুলাইয়া কহিল,—জানেন, আমি লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার?

সীতানাথ কহিল,—তা আর জানিনে!

তবে চালাকি করবেন না! সম্প্রদান করুন।

—সম্প্রদান! সম্প্রদান আর হবার যো নেই। সে যে হয়ে গেছে!

তা জানিনে—সম্প্রদান হওয়া চাই।

হওয়া চাইই?

হাঁ!

সীতানাথ বাবু একটু গম্ভীর হইয়া রহিলেন। এত গালাগালিতেও তাঁর আজ একটুও রাগ হইতেছিল না। তাঁহার চোখে আজ সমস্তই বেশ সহজ সরল বলিয়া ঠেকিতেছিল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি ললিতকে ডাকিয়া বলিলেন,—এই চাবি নিয়ে উত্তরের ঐ ঘরটা খোলো তো বাবা।

ললিত উত্তরের ঘর খুলিল। পারুলের সম্প্রদানে জন্য সীতানাথ বাবু এই ঘরটি সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন স্তরে স্তরে দানের নানা সামগ্রী সাজানো—কেমন সুন্দ সব আসবাব! খাট-বিছানা, টেবিল-চেয়ার, বহুমূল গহনা, আরো-কত কি! তাঁর ইচ্ছা ছিল, এই ঘ বসিয়া এই সমস্ত সামগ্রী ও অলঙ্কারের সহিত তিনি কন্য সম্প্রদান করিবেন। কিন্তু পৃথ্বীশের ধনুর্ভঙ্গ-পণের জন্য এ ঘর বন্ধ রাখিয়া দক্ষিণের একটা ফাঁকা ঘরে কন্য সম্প্রদান করিতে হইয়াছে। সীতানাথ বাবু সেই ঘ ঢুকিয়া বলিলেন, আসুন লক্ষ্মীকান্তবাবু!

লক্ষ্মীকান্তর বুকটা একবার ছাঁৎ করিয়া উঠিল—ঘ পুরিয়া প্রহার দিবে না কি? শুভবিবাহের ইতিহাসে এরূপ ঘটনার অভাব নাই! কিন্তু যখন দেখিল, ঘ সীতানাথ একা, তখন সাহস করিয়া দল বাঁধিয় প্রবেশ করিল।

সীতানাথ বাবু বলিলেন,—বরকে বসতে বলুন।

একখানা আসন পাতা ছিল, উমাকান্ত আসিয় তাহার উপর বসিল। সীতানাথ বাবু পাশের ঘ প্রবেশ করিলেন।

লক্ষ্মীকান্তর কাণে কাণে মামা বলিল, বোধ হয় মেজ মেয়েটাকে সম্প্রদান করবার মতলব করেচে—ত মন্দ কি! এগুলো তো পাবোই—মেয়ে যেমনই হোক্ না!

লক্ষ্মীকান্তর মুখ বিজয়-গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

সীতানাথ বাবু পাশের ঘর হইতে প্রকাণ্ড একট থলি বহিয়া আনিয়া বরের সামনে রাখিলেন; ঝনা করিয়া শব্দ হইল।

সীতানাথ বাবু বলিলেন—সম্প্রদানের মধ্যে বাকি ছিল শুধু এইটে—আসুন, শুভকার্য্য সম্পন্ন করি! বলিয় সেই থলিটায় হাত রাখিয়া তিনি বরের পাশে বসিয় পড়িলেন।

দুর্য্যোগ

পাহাড়ের মধ্য দিয়া সরু পথ। মাঝে মাঝে কোথাও ঘন জঙ্গল, কোথাও বা মুক্ত প্রান্তর ধূ-ধূ করিতেছে।

আষাঢ়ের বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। মাথার উপর ভীষণ কালো মেঘ সংহারোদ্যত দৈত্যের মত রুদ্ধ আক্রোশে দাঁড়াইয়া; নীচে সারা পৃথিবী দারুণ ভয়ে নিস্পন্দ, চেতনা-হীন।

পাহাড়ের পথে রাজকন্যার তাঞ্জাম চলিয়াছে—রূপার ঝালর দোল খাইয়া আঁধারের বুকে সাদা পাড় বুনিয়া দিতেছে। তাঞ্জামের আশে-পাশে সমুখে-পিছনে সশস্ত্র প্রহরী,—কেহ ঘোড়ার পিঠে, কেহ-বা হাঁটিয়া চলিয়াছে। প্রহরী ও বাহকের দলে মুখে কোন কথা নাই—আসন্ন ঝড়ের ভয়ে সকলের গতি দ্রুত, মন উদ্বিগ্ন।

তাঞ্জামের মধ্যে বসিয়া রাজকন্যা ইরা সখী চম্পাকে কহিলেন,—পর্দ্দা সরিয়ে দে চম্পা, হাঁফ ধরে!

চম্পা ভয়ে শিহরিয়া কহিল,—বলো কি রাজকুমারী—এই পাহাড়ের ধারে মুঞ্জ ডাকাতের আস্তানা, তার উপর এই আকাশের শ্রী!

রাজকন্যা ইরা কহিলেন,—আসুক ডাকাত! সে এক রকম নতুন মজা দেখা যাবে। তা বলে এত আব্রু বরদাস্ত হয় না!

সহসা অদূরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনা গেল। একটা নয়, দুটা নয়, অসংখ্য ঘোড়া। শব্দ চঞ্চল,—ক্ষণে ক্ষণে স্পষ্টতর হইয়া উঠিল।

প্রহরীর দলে মুহূর্ত্তে কলরব জাগিল—হুঁশিয়ার!

শব্দ খুব নিকটে আসিল, সঙ্গে সঙ্গে বাজের হুঙ্কারের মত একটা রব শুনা গেল,—খবর্দ্দার!

চম্পা ভয়ে তাঞ্জামের পর্দ্দা দুই হাতে চাপিয়া ধরিল!

রাজকন্যা সখীর হাত ঠেলিয়া পর্দ্দার বাহিরে মুখ বাড়াইলেন। কোথায় আঁধার? পাহাড়ের গায়ে মেঘের ছায়ার উপর কে যেন আলোর তুলি বুলাইয়া দিয়াছে! চারিধারে আলো! অসংখ্য মশাল রক্তনেত্রে চারিধারে লোলুপ দৃষ্টি হানিতেছে! সে আলোয় রাজকন্যা সবিস্ময়ে দেখিলেন, তাঁহার প্রহরীর দল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে!

চম্পা রাজকন্যাকে সবলে টানিয়া পর্দ্দা ফেলিয়া দিল।

তাঞ্জাম তখন দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে। পর্দ্দার বাহিরে আদেশের স্বর ধ্বনিত হইল,—অলঙ্কার-পত্র যাহা কিছু আছে, এখনই দিতে হবে, সহজে না দিলে—

রাজকন্যা একেবারে পর্দ্দা ঠেলিয়া তাঞ্জামের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, গর্জ্জিয়া কহিলেন—না দিলে কি—

সে স্বরে চম্পা শিহরিয়া উঠিল। সখীর কণ্ঠে এমন স্বর সে আর-কখনও শুনে নাই!

যে আদেশ করিয়াছিল, সে মুঞ্জ। সে বলিল,—না দিলে এই হাতে জোর করে সব খুলে নিতে হবে!

রাজকন্যা তেমনই কঠিন স্বরে উত্তর দিলেন,—রমণীর অঙ্গ স্পর্শ করে? তাকে অপমান করে?

মুঞ্জ সম্পূর্ণ অবিচলিতভাবেই উত্তর দিল,—সে রমণীর ইচ্ছা।

ইচ্ছা! রাজকন্যা কহিলেন,—তোমার নাম?

—মুঞ্জ।

—মুঞ্জ! ডাকাতের সর্দ্দার মুঞ্জ! জানো, কার তাঞ্জাম আটকেছ? কার সামনে দাঁড়িয়ে এ নির্লজ্জ আদেশ কচ্চো?

—জানি। রাজকন্যা ইরা!

—জেনেও তুমি এ স্পর্দ্ধা প্রকাশ করচো?

হাসিয়া মুঞ্জ কহিল,—আমি বর্ব্বর ডাকাত।

—কিন্তু রাজপুত তুমি! পুরুষ তুমি!

—রাজপুতানাই আমার জন্মভূমি।

—রাজপুতানার কলঙ্ক তুমি! রাজপুত বলে পরিচয় দাও, অথচ অসহায় স্ত্রীলোকর উপর অত্যাচার করতে কুণ্ঠিত নও! এবং একলা পেয়ে এমন ভাবে তার অমর্য্যাদা কর! তোমার লজ্জা হয় না?

আজ বিশ বৎসর মুঞ্জ ডাকাতি করিতেছে—রাজার সৈন্য ফাঁদ পাতিয়া অস্ত্র হানিয়া মুঞ্জকে কায়দা করিতে পারে নাই! বড় বড় ফৌজ—সে ফৌজের বিরুদ্ধে মুঞ্জ অটলভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে মাথা কখনও নত হয় নাই, সে বুক কখনও কাঁপে নাই। এমন কথা সে পূর্ব্বে কাহারও মুখে কখনও শুনে নাই! মুঞ্জ ঈষৎ বিচলিত হইল। তার মুখে কথা ফুটিল না।

রাজকন্যা কহিলেন,—মাথার উপর ঝড় আসন্ন হয়ে এসেচে। আমার রুগ্ন ভাই—দেশের রাজপুত্র—তার মঙ্গলের জন্য শ্মশানেশ্বরীর পূজা দিতে গেছলুম। জানি না, প্রাসাদে এখন সে কেমন আছে। এ সময় এক মুহূর্ত্ত নষ্ট করা যায় না! আমি প্রস্তুত আছি, তুমি এই সব অলঙ্কার নাও। কিন্তু আমার লোকজন তোমার

রাজ্যের বহর দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে কে কোথায় সরে পড়েছে। মি তোমায় সমস্ত অলঙ্কার খুলে দিচ্ছি, কিন্তু এক সর্ত্ত াছে, তুমি যেমন করে পারো আমায় প্রাসাদে পৌঁছে াও—এই রাত্রেই।

মুঞ্জ একবার রাজকন্যার পানে চাহিল,—অপূর্ব্ব রূপ। শালের তীব্র আলোর মাঝে সে রূপের জ্যোতি এক পরূপ স্নিগ্ধ দীপ্তিতে হাসিয়া উঠিল। মুঞ্জ আর চাহিতে ারিল না, নতশিরে থমকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রাজকন্যা হাসিয়া কহিলেন, কি! সন্দেহ হচ্ছে, এই ছলে রাজধানীতে পেয়ে যদি তোমায় ধরিয়ে দি? না, কোনো ভয় নেই! আমিও রাজপুতের মেয়ে—মিথ্যা বলি না।

মুঞ্জ আবার কথা কহিল; বলিল,—সে ভয় করি না রাজকুমারী। তবে এই ঝড়ে তাঞ্জাম নিরাপদ নয়—দেরীও হবে। যদি ঘোড়ায় চড়ে—

রাজকন্যা কহিলেন,—কিন্তু পথ আমি চিনি না—

—যদি অনুমতি হয়, আমি নিজে সঙ্গে যাবো—

—বেশ।

রাজকন্যা অলঙ্কার খুলিতে লাগিলেন, চম্পা সজল চোখে দাঁড়াইয়া রহিল; আর মুঞ্জ ছুটিল সকলের চেয়ে তেজী ঘোড়াটাকে বাছিয়া আনিবার জন্য। ঘোড়া লইয়া ফিরিয়া সে দেখে, পথের ধারে ওড়নার উপর বিস্তর অলঙ্কার জড়ো করা—হীরা-পান্না-মানিক্যের স্তূপ! মশালের চঞ্চল আলো লাগিয়া তাহা হইতে যেন [illegible] ঠিকরিয়া পড়িতেছে!

মুঞ্জ কহিল,—এ কি, রাজপুত্রী?

রাজকন্যা কহিলেন,—সমস্ত অলঙ্কারই খুলে দিয়েছি।

মুঞ্জ কহিল,—কিন্তু আমি তো অলঙ্কার চাই না। এ অলঙ্কার যেখানে ছিল, সেইখানে রাখো। এদের সে সৌভাগ্য থেকে যে বঞ্চিত করতে চায়, সে মানুষ নয়!

—এক উপায় আছে। তোমায় নিয়ে এক ঘোড়ায় আমি ছুটিয়ে যাই—আর আমার লোক তোমার রক্ষীদের নিয়ে পিছনে আসুক।

মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়াছে। চারিধার আবার সেই আঁধারে ভরা। সেই আঁধারের মধ্য দিয়া দুইটা ঘোড়া বৃষ্টির অজস্র তীর বুক দিয়া ছিটকাইয়া ফেলিয়া প্রাণপণ-শক্তিতে প্রাসাদের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে।

প্রাসাদের দ্বারে পৌঁছিয়া রাজকন্যা ঘোড়া হইতে নামিলেন। মুঞ্জ ঘোড়ার রাশ ধরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, —একটা কথা আছে।

—কি কথা?

—আজকের রাত্রিটাকে মনে রাখবার জন্য কিছু যদি আমায় দিতে পারতে, অতি-তুচ্ছ কিছু—?

—কি চাও, বলো! এই হার—? রাজকন্যা কণ্ঠ হইতে বহুমূল্য হার খুলিলেন। আঙুলের আংটিটা দ্বারের বাতির আলোয় ঝকঝক্ করিয়া উঠিল। মুঞ্জ কহিল,—ঐ আংটিটা—?

—বেশ! এ আংটির হীরার পাশে আমার ছবি আঁকা আছে।

রাজকন্যা আংটি খুলিয়া দিলেন; মুঞ্জ সেটিকে বুকে চাপিয়া ধরিল। রাজকন্যা কহিলেন,—আমারও একটা কথা আছে—ডাকাতি ছাড়ো। এমন বীরত্ব, এমন প্রাণ তোমার!

মুঞ্জ কহিল,—তোমাকে যখন আজ স্পর্শ করেছি, রাজপুত্রী, আমার পুনর্জন্ম হয়েচে! মুঞ্জ দস্যু মরেছে।

—কি করে জানবো, [illegible]

—সে পরিচয় আমিই দেবো। কিন্তু [illegible] পাবার আশা রাখতে পারি?

—জগতে দুরাশার বস্তু কিছুই নেই!

—সে আশা কবে মিটবে?

মুঞ্জ [illegible] দাঁড়াইয়া ছিল। ইরা কহিলেন

এমন সময় কক্কড় শব্দে মেঘ ডাকিল। [illegible] দৈত্যের লেলিহান রসনা লকলক করিল, আমাদেরও পর দুই হাত সবলে [illegible] রেখে [illegible] —কিন্তু তু[illegible]; তারও [illegible] ঘোড়ার দানার হবে [illegible] রাঁচিতে খুবই [illegible] চম্যানের পাগড়ী-বড়দিনের সময় ছুটিতে তুমি [illegible] থেকে আমাদের নিয়ে আ[illegible]

অমলের বলিবার [illegible] পুত্র জবু ওরফে [illegible] [illegible]খন অন্তঃপুরে আসিবে, বাহিরের সমস্ত দ্বন্দ্ব-কোলাহল সে মন হইতে ঝাড়িয়া-মুছিয়া [illegible] অবগাহন করিবে, এমনই তাহার [illegible] ছিল। সেখানে শুধু প্রেমের গুঞ্জন, স্বপ্নের বিভোরতা। কিন্তু হেমাঙ্গিনী কিছুতেই এ ভাবের প্রশ্রয় দিত

[illegible] পারিলে বহুদিনকার এই অপবাদটি [illegible] সমেত ধ্বংস [illegible] মত ওরাও-মুণ্ডা নর-নারীর দল মিহি টুকরি বুনিতেছে। নারীদের মাথায় বিরাট খোঁপা, তাহাতে লাল-নীল বিচিত্র রঙের ফুল আঁটিয়া ঝালরের মত গুঁজিয়া দিয়াছে। দিব্য নিটোল গড়ন যেন স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি। দুই-চারিটা মোড় বাঁকিয়া পুরুলিয়া রোড ছাড়িয়া গাড়ী সার্কুলার রোড ধরিল পথ অমলের নিতান্তই অচেনা। সার্কুলার রোড নাম দেখিয়া সে মৃদু হাসিল; ভাবিল, ইস্, আবার কলিকাতার নকল করা হইয়াছে!

গাড়ী ক্রমে সে-মোড় বাঁকিয়া পূর্ব্বমুখে আর এক পথ ধরিল। পথের ধারে প্রকাণ্ড কদম-গাছে একটা [illegible]

হেমাঙ্গিনী বলিল,—এর আবার গোছ-গাছ কি! ছেলেদের জন্ম দু'চারটে ভদ্র-গোছ গরমের জামা আর পায়জামা আনলেই চলবে। আর-সব আছে। সেখানে গিয়ে তো নতুন ঘর-করণা পাততে হবে না। বড়দির গোছানো সংসার আছে—ভাবনা কি?

ভাবনা কি! অমল ভাবিল, স্ত্রীকে বলে, হায় নিষ্ঠুরা নারী, তুমি এখানকার সকল আনন্দ, সকল সুখ, সকল শান্তি হরণ করিয়া লইয়া যাইতে চাও, আবার বলো, ভাবনা কি! কিন্তু কথাটা বলা চলিল না, কারণ, স্ত্রীর স্বভাব অমলের বিলক্ষণ জানা ছিল। তাহা হইলে উত্তরচ্ছলে স্ত্রী এখনই এমন প্রচুর হাস্যধারা বর্ষণ করিবে যে, তাতে তাহার মনখানা নিমেষে, ভিজিয়া গলিয়া একেবারে পাঁক হইয়া যাইবে।

স্বামীকে নিরুত্তর দেখিয়া হেমাঙ্গিনী আবার বলিল,—কি! কিছু বলচো না যে!

আপাতত এ সকল অপ্রিয় প্রসঙ্গ চাপা দিবার অভিপ্রায়ে অমল কহিল,—আহা রসো, আগে ধড়া-চুড়ো ছাড়ি, একটু নিশ্বাস ফেলি—

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া হেমাঙ্গিনী কহিল,—না…এখনই বলে ফেলো! এমন কিছু বৃহৎ ব্যাপারের পরামর্শ চাইছি না যে, তোমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে!

সুগভীর ট্রাজেডির মধ্যে একটু হাস্যরস মিশাইয়া অমল কহিল,—বন্ধ হয় নি? কি বলো, হেম! একবার এই বুকটায় হাত দিয়ে ছাখো দেখি—দেখ।

স্ত্রীর হাতখানা টানিয়া অমল আপনার বুকের উপর রাখিল। ক্ষিপ্র সে হাত টানিয়া লইয়া হেমাঙ্গিনী কহিল, যাও, যাও বাবু—সবতাতে তোমার ও-সব কাব্যি আমার ভালো লাগে না!

তবে কি ভালো লাগে? এই বুকে ছুরি হেনে দূরে চলে যাওয়া—?

নাঃ, তোমার পাগলামি দেখবার সময় আমার নেই। আমি তাহলে নিজেই বাবাকে চিঠি লিখে দিই ... কেমন? বলিয়া হেমাঙ্গিনী চলিয়া যাইতে

চম্পা ভয়ে ... ধরিয়া টানিয়া

রাজকন্যা সখীর হাত ঠেলিয়া পর্দ্দার বাহিরে ... যবনিকা

...লেন। কোথায় আঁধার? পাহাড়ের গায়ে মেঘে... ছায়ার উপর কে যেন আলোর তুলি বুলাইয়া দিয়াছে! চারিধারে আলো! অসংখ্য মশাল রক্তনেত্রে চারিধারে লোলুপ দৃষ্টি হানিতেছে! সে আলোয় রাজকন্যা সবিস্ময়ে দেখিলেন, তাঁহার প্রহরীর দল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে! চম্পা রাজকন্যাকে সবলে টানিয়া পর্দ্দা ফেলিয়া দিল।

তাঞ্জাম তখন দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে। পর্দ্দার বাহিরে আদেশের স্বর ধ্বনিত হইল,—অলঙ্কার-পত্র যাহা কিছু ...ছে, এখনই দিতে হবে, সহজে না দিলে—

একেবারে হুবহু নতুন হবে—নায়ক অমলচন্দ্রের পতন মৃত্যু!

হেমাঙ্গিনী দেখিল, কাটাকাটি করিলে কথা চারুপাঠ-প্রথম ভাগ-বর্ণিত সেই পুরুভুজ নামক জীবের ন্যায় বাড়িয়া চলিবে—তাহাতে কাজ হইবে না। তাই সে বিরক্তির ভাণ করিয়া কহিল,—থাক্, থাক্, সে হবার পঞ্চম অঙ্কে তখন হবে'খন। আপাততঃ তিন অঙ্ক তো রাঁচিতে বেড়িয়ে কাটানো যাক্। কথা বলিয়া দ্রুত সে সে-ঘর ত্যাগ করিল। অমলও স্ত্রীর পশ্চাদনুসরণ করিল।

২

২৩শে ডিসেম্বর কাছারি হইতে গৃহে ফিরিয়া অমল সন্ধ্যার মধ্যে রাত্রি-ভোজন শেষ করিল। জিনিস-পত্র কিছু গুছাইবার ছিল না। হেমাঙ্গিনী সুগৃহিণী। অমলের প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় প্রভৃতি আপনার টাঙ্কে পূর্ব্বে সে ভরিয়া লইয়া গিয়াছে; অমলের শুধু নিজের শরীরটাকে অক্ষত অবস্থায় পেণ্টলেন-কোট ও অলষ্টারে মুড়িয়া মাথায় টুপি চড়াইয়া একটা ব্যাগ, একটা হাওয়া বালিশ ও হাত-ব্যাগ লইয়া পৌঁছিতে পারিলেই চলিবে।

কোর্ট হইতে পূর্ব্বাহ্নেই ধর্ম্মতলায় বেঙ্গল নাগপুর রেল-ওয়ের নূতন অফিসে মুহুরিকে বারোটি টাকা দিয়া টিকি-টের জন্য পাঠানো হইয়াছিল! এগারো টাকা সাড়ে দশ আনায় সে একখানি সেকেণ্ড ক্লাশ 'কনসেশন' টিকিট কিনিয়া বাকী সাড়ে চার আনা উকিল অমলকে ফেরত দিয়াছে। রাত্রি নয়টা চুয়ান্ন মিনিটে (কলিকাতার সময়) রাঁচি এক্সপ্রেস হাওড়া ছাড়ে। বার্থ রিজার্ভ হইয়া গিয়াছে, সঙ্গে মোট-ঘাট নাই, নারী নাই, সুতরাং নিশ্চিন্ত!

আহারাদি শেষ করিয়া উপরে আসিয়া অমল ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখে, তখনও সাতটা বাজিতে চব্বিশ মিনিট বাকী! ন'টার সময় বাড়ী হইতে বাহির হইবার কথা। এখনও প্রায় আড়াই ঘণ্টা দেরী। কি করিয়া এতখানি সময় কাটানো যায়? অমলের মনে হইল, ... আজ নিতান্তই কচ্ছপের মত থপ্-থপ্ ... অথচ সকালের দিকে এই ঘড়িই কি ...টা সাড়ে ন'টা বাজাইয়া দেয়! ... হেমাঙ্গিনীকে প্রাণ খুলিয়া ... আপনার মনের ভিতর-

কি... পূ...

ঈষৎ বিচলিত হই...

রাজকন্যা কহিলেন...

এসেচে। আমার রুগ্ন ...

মঙ্গলের জন্য শ্মশানেশ্বরীর পূজ...

না, প্রাসাদে এখন সে কেমন আ...র, তাহারও অবসর

মুহূর্ত্ত নষ্ট করা যায় না! আমি প্র... ...দি বিবেচনা

এই সব অলঙ্কার নাও। কিন্তু আমার লোকজন তোমার

যাহা হউক, এদিকে সময় আর কাটিতে চাহে না। শিঁর টেবিলের ড্রয়ার টানিয়া অমল হেমাঙ্গিনীর শেষ ঠিখানা বাহির করিল। খামের উপর কাঁচা অক্ষরে রাজিতে ঠিকানা লেখা—

Babu Amal Chandra Datta B. L.
Pleader. ইত্যাদি

বিবাহের অব্যবহিত পরবর্ত্তী দিনগুলার কথা অমলের নে পড়িল। বি, এ পরীক্ষার কাল তখন আসন্ন ইয়া আসিয়াছে; তবু দশটা বাজিলেই নিজের বই ন্ধ করিয়া রাত্রে হেমাঙ্গিনীকে ফার্ষ্ট বুক পড়ানো, বালির াগজের খাতায় আঁকা-বাঁকা রুল টানিয়া এ, বি, সি লখানো, সে যেন কালিকার ঘটনা! হৃদয়টা ঠিক তেমনি াছে, পাকিয়া উঠে নাই! কাব্য-রসানুভূতির মাত্রাও ছয় বৎসরে আদালতের হাঙ্গামায় এতটুকু মন্দীভূত হয় াই! এখনও তাহার সমস্ত প্রাণটাকে এক অপরূপ তারুণ্যে স্নিগ্ধ শ্যামল করিয়া তেমনই বিচিত্র তালে সে বহিয়া চলিয়াছে। তবে হেমাঙ্গিনী কেন বলে, এ বয়সে ও-সব ছেলে-মানুষি শোভা পায় না?

অমল ধীরে ধীরে চিঠিখানা খুলিয়া ফেলিল। প্রথমেই লেখা,"শ্রীচরণেষু—" 'প্রিয়তম' কিম্বা তদ্রূপ কোন সম্বোধন নাই। অমল আবার ভাবিল, হঠাৎ হেমাঙ্গিনী এতখানি বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, এই চারিটা বাঙলা কথা লিখিবার প্রয়োজন-সার্থকতাও সে ভুলিয়া গেল! আশ্চর্য্য! তার পর শুধুই জবু ও হাবুর মারামারির নালিশ, "লজেঞ্জেস ফুরাইয়া গিয়াছে," "মুন্সেফ বাবুর স্ত্রী বেড়াইতে আসিয়াছিলেন," "কোল নাচ দেখিলাম," "নরেশবাবুর সর্দ্দি হইয়াছিল, সারিয়া গিয়াছে," "কপির দর এখান খুব শস্তা"—ইত্যাদি রাজ্যের যত বাজে খবর! নিজের শরীর কেমন, মন কেমন, তাহার কোন সংবাদ নাই! নিঃসঙ্গ অমলের দিনগুলাই বা কি-ভাবে কাটিতেছে, তাহারও সন্ধান লইবার এতটুকু আগ্রহ নাই! হায়রে পাষাণী!

অমল একটু ক্ষুব্ধ হইল। ঘর ও বাহির, এ দুইটা স্থানের মধ্যে একটা প্রাচীর তুলিয়া বেশ বড় রকমের ব্যবধান রাখিবারই সে পক্ষপাতী ছিল। বাহিরে ফীর টাকা, মক্কেলের মকদ্দমা, থানার জামিন, সাক্ষ্যের নকল, ও জেরার প্রশ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া ঘোড়ার দানার দর, চাকর-দাসীর বেতন ও সহিস-কোচম্যানের পাগড়ী-চাপকানের ঝঞ্ঝাট মিটাইয়া যখন অন্তঃপুরে আসিবে, পায়ের ধুলা-কাদার মতই বাহিরের সমস্ত দ্বন্দ্ব-কোলাহল ও দেনা-পাওনা তখন সে মন হইতে ঝাড়িয়া-মুছিয়া অনাবিল প্রেমের সমুদ্রে অবগাহন করিবে, এমনই তাহার ইচ্ছা ছিল। সেখানে শুধু প্রেমের গুঞ্জন, স্বপ্নের বিভোরতা! কিন্তু হেমাঙ্গিনী কিছুতেই এ ভাবের প্রশ্রয় দিত না। সে সেই সুগভীর রাত্রির স্তব্ধ নির্জ্জনতায় [illegible] পুত্রদ্বয়ের দৌরাত্ম্য, দাসী ও পাচকের কলহ এবং [illegible] খুলিয়া সংসারের হিসাবের বিস্তারিত কাহিনী [illegible] বসিত। অমল নিত্য ভাবিত, হেম তো এমন ছিল না; এই কিছু কাল পূর্ব্বে সেও তাহারই মত কাব্যরসাপ্লুত ছিল। সাল-তারিখ হিসাব করিলে দেখা যায়, যত দিন আদালত-গমনে তাহার কোন স্পৃহা বা আকর্ষণ ছিল না, তত দিনই শুধু হেমাঙ্গিনী আপনার হৃদয়-উৎস হইতে অজস্র প্রেমের ধারা বর্ষণ করিয়া তাহাকে স্নিগ্ধ ও মুগ্ধ রাখিতে অহরহ ব্যগ্র সচেষ্ট ছিল; তার পর লক্ষ্মী যে দিন আদালতে দাঁড়াইয়া তাহার পানে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিলেন, ঠিক সেই দিন হইতে গৃহ তাহার রজত-ধারায় প্লাবিত হইতে সুরু করিলেও গৃহলক্ষ্মীর অন্তরস্থ প্রেমের ধারা শুকাইয়া গিয়াছে! অমল ভাবিল, ধিক এমন অর্থে!

৩

পরদিন বেলা দশটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ট্রেন আসিয়া রাঁচি ষ্টেশনে থামিল। মুক্ত দীর্ঘ প্লাটফর্ম্ম। নীল চাঁদোয়ার মত আকাশের নীচে বিশাল প্রকৃতি ঝিলমিলে স্বচ্ছ রৌদ্র-কিরণের হাসি মুখে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সাহেব বেশী অমলচন্দ্র কুলির হাতে ব্যাগ-অলষ্টার ও হাত-ব্যাগটি দিয়া তাহারি পিছনে বাহিরে আসিল। বাহিরে কয়খানা পুশ-পুশ গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। তাহারই একটা মোট চাপাইয়া কুলিকে পয়সা দিয়া পুশ-পুশওয়ালাকে সাহেবী ভাবে আদেশ প্রদান করিল, "সবজজ-বাবুকা বাঙ্‌লামে চলো।"

"যো হুকুম" বলিয়া কুলির দল পুশ-পুশ তুলিয়া ঠেলিতে সুরু করিল। ধনুকের মত পথ কোনখানে নীচে নামিয়া গিয়াছে, আবার তখনই উর্দ্ধে উঠিয়াছে। আশে-পাশে পথের ধারে দুই-একটা বড় ইঁদারা। কোথাও ধানের ক্ষেত। তাহার পাশে দুই-চারিখানা বিচ্ছিন্ন বাঙ্‌লা। কোথাও বা মিশনরীদের কারখানা। কষ্টি-পাথরে খোদা মূর্ত্তির মত ওরাও-মুণ্ডা নর-নারীর দল বসিয়া টুকরি বুনিতেছে। নারীদের মাথায় বিরাট খোঁপা, তাহাতে লাল-নীল বিচিত্র রঙের ফুল আঁটিয়া ঝালরের মত গুঁজিয়া দিয়াছে। দিব্য নিটোল গড়ন যেন স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি। দুই-চারিটা মোড় বাঁকিয়া পুরুলিয়া রোড ছাড়িয়া গাড়ী সার্কুলার রোড ধরিল পথ অমলের নিতান্তই অচেনা। সার্কুলার রোড না দেখিয়া সে মৃদু হাসিল; ভাবিল, ইস্, আবার কলিকাতার নকল করা হইয়াছে!

গাড়ী ক্রমে সে-মোড় বাঁকিয়া পূর্ব্বমুখে আর এক প[থ] ধরিল। পথের ধারে প্রকাণ্ড কদম-গাছে একটা [illegible]

াটা! তাহাতে লেখা আছে, হাজারিবাগ রোড। সেই থে চার-পাঁচখানি বাড়ী ছাড়াইয়া গাড়ী বাঁ-হাতি কটা বাঙ্লার ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল!

ফটক হইতে সরু পথ বাঙ্লা অবধি চলিয়া গিয়াছে। াড়ী থামিলে অমল নামিল। নামিয়া দেখে, সম্মুখে রান্দা। বারান্দার দুই ধারে দু'খানি বেঞ্চ। একটা লি গিয়া বেঞ্চের উপর ব্যাগ ও ব্যাগ প্রভৃতি রাখিয়া াড়া লইয়া পুশ-পুশ ঠেলিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

বারান্দায় উঠিয়া অমল দেখে, দ্বারে তালা দেওয়া থচ ভিতরে লোকের বাসের চিহ্ন বুঝা যাইতেছে। রান্দার পশ্চিমে দুটা বড় কনকচাঁপা গাছের ধারে কাণ্ড ইঁদারা। ইঁদারার অপর পাশে দুই চারিটা ালাপ ও গাঁদা ফুলের গাছ। একটা ছাগশিশু গানে ইতস্তত চরিয়া বেড়াইতেছে! অমল ভাবিল, াই তো, এখন উপায়! পূর্ব্বাহ্ণে একখানা টেলিগ্রাম দি সে করিয়া দিত! কিন্তু টেলিগ্রামের প্রয়োজনই কি ছিল? বড়দিনের ছুটি হইলে তাহার রাঁচিতে ইয়া আসিবার কথা রীতিমত পাকা ছিল। কেন, মের চিঠিতেও সে কথা সে লিখিতে ভুলে নাই! বে? না, হেমের এ ভারী অন্যায়! দ্বারে তালা চ করিয়া পরম নিশ্চিন্ত চিত্তে কোথায় সব বেড়াইতে াহির হইয়াছে!

সহসা দূরে কাশির শব্দ শুনিয়া সে যেন প্রাণ পাইয়া াচিল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখে, াহিরে কয়েকটা কলাগাছের আড়ালে খাপরার ঘরের াওয়ায় দড়ির খাটিয়ায় বসিয়া কালো র‍্যাপার গায়ে য়া একজন তামাক টানিতেছে। অমল কহিল,—ান্ হ্যায়—?

আজ্ঞে!—বলিয়া লোকটা নিকটে আসিল, আসিয়া বিস্ময়ে কহিল,—আপনি কাকে চান?

কাকে চান? অদ্ভুত প্রশ্ন! অমল কহিল,—তুমি বাড়ীতে কাজ করো?

সে কহিল,—আজ্ঞে।

অমল কহিল,—তোমার নাম কি?

সে কহিল,—গগন।

অমল কহিল,—আচ্ছা গগন, বলতে পারো বাপু, ারে তালা দেওয়া কেন? বাড়ীতে কি কেউ নেই?

গগন কহিল,—আজ্ঞে না। সকালে সব জগন্নাথ াড় দেখতে গিয়েছেন।

—জগন্নাথ পাহাড়!

—আজ্ঞে হাঁ। সে ঐ ডুরাণ্ডার ও-দিকে।

ডুরাণ্ডা! সে নদী? না গ্রাম? না পাহাড়? উদ্ভট ট্রেনেও অমল আর ডুরাণ্ডার তথ্য জানিবার জন্য কিছু-ব্যগ্রতা প্রকাশ না করিয়া কহিল,—ফিরবে কখন্?

—তা বোধ হয়, সন্ধ্যা হবে। এখান থেকে অনে দূর।

বটে! পৃথিবীটা অমলে য়ের নীচে দুলিয় উঠিল। কাল সারা রাত্রি এবং আজিকার দিনে অর্দ্ধেকটা ট্রেনে কাটিয়া গিয়াছে; ক্ষুধায় নাড়ী জ্বলিয় যাইতেছে! এখন এ পোষাকগুলো ফেলিয়া মাথায় দু ঘটি জল ঢালিয়া কাপড় পরিয়া চারটি গরম ভাত উদরস্থ করিয়া একটু গড়াইতে পারিলে শরীরটা জুড়ায়,—তা ন হইয়া এ হইল কি!

কিন্তু বসিয়া সে সব কথা ভাবিলে পেট তো আ ভরিবে না। গগন স্পষ্ট বলিয়া দিল, সন্ধ্যার পূর্বে তাহারা ফিরিবে না। এখন বেলা এই সবে,—চট্ করিয়া ঘড়ি খুলিয়া অমল দেখে, ঠিক সাড়ে বারোটা। তখনই আবার তাহার মনে পড়িল, এখানকার সময় কলিকাতার চেয়ে চব্বিশ-মিনিট স্লো,—বেলা তাহা হইলে এখন বারোটাই। গগনকে ডাকিয়া সে কহিল,—চাবি তোমার কাছে নেই?

—আজ্ঞে, না।

—কলকাতা থেকে আজ কারও আসবার কথা ছিল না?

বাবুর ভায়রা-ভাই, তিনি কলকাতার ওকলতি করেন, তাঁর আসবার কথা ছিল বটে! তা মাসিমা বল্ছিলেন, তা হলে আগে তিনি টেলিগ্রাম করতেন!

অমলের রাগ হইল, হেমাঙ্গিনীর উপর! দেখ দেখি, বুদ্ধি ব্যয় করিয়া আবার সে টেলিগ্রামের কল্পনা করিয়া বসিয়াছে! চিঠিতে অমল কোনদিন তাহার এতটুকু আভাস দেয় নাই!

অথচ উপায়ই বা কি? রাগ করিয়া সটান্ এই ভাবেই কলিকাতায় ফিরিয়া গেলে প্রতিশোধ চূড়ান্ত লওয়া যায় বটে, কিন্তু না, কাজ নাই! হেমাঙ্গিনীর তাহাতে কোন ক্ষতি না হইলেও নিজেই সে পুরুলিয়া অবধি পৌঁছিবার পূর্ব্বেই যে অনুশোচনায় একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অগত্যা গগনকে ডাকিয়া বলিল,—সব ভুল বুঝে চলে গেছে। আমারই আসবার কথা ছিল। যাক্, তুমি এই পয়সা নিয়ে আপাতত কিছু খাবার কিনে আনো তো বাপু। ভালো খাবারের দোকান এখানে আছে ত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই নিকটেই। বলিয়া গগন পয়সা লইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে অমল তাহাকে ডাকিয়া বলিল,—ওহে গগন, এক বাল্তি জল আমার তুলে দিয়ে যেয়ো, বাপু। মাথাটা একটু ধুয়ে এই ব্যাগেই মুছে ফেলি। পুরুলিয়া থেকে রাঁচি আসতে মাথায় একেবারে কয়লার পাহাড় জমে গেছে। বাপ্, কি গুঁড়োটাই ওড়ায়!

গগন জল তুলিয়া খাবার আনিতে গেল। অমল খ ধুইয়া র‍্যাগে মুছিয়া বেঞ্চে বসিয়া ষ্টেশনে-কেনা কখানা বিলাতী মাসিক-পত্র খুলিয়া তাহার গল্প-পাঠে নঃসংযোগ করিল।

৪

দিনের আলোর উপর সন্ধ্যা ক্রমে ধীরে ধীরে আপনার তমির-যবনিকা বিছাইয়া দিল। বেঞ্চে বসিয়া ঢুলিয়া, াসিক-পত্রখানা র‍্যাগে পুরিয়া অমল উঠিয়া বাঙ্‌লার ারিধার-বেড়িয়া যে পরিচ্ছন্ন সরু পথ ছিল, সেই পথে বড়াইতে লাগিল। মাথা অল্প ধরিয়াছিল। শীতল াতাসে একটু আরাম বোধ হইল। বাঙ্‌লার পশ্চাতে াসিয়া সে দাঁড়াইল। বাঁশ-ঝাড়ের মধ্য দিয়া ঈষদ্দূরে াতি-উচ্চ কয়েকটা পাহাড় দেখা যাইতেছিল। অমল সগুলার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মুরাবাদি পাহাড়ের বুকের উপর কালো দৈত্যের মুখে হাসির মতই একটা সাদা বাড়ী ঝক্‌-ঝক্‌ করিতেছে। বাঁশঝাড় বাঙ্‌লার সীমানা,—সীমানার পাশে ছোট-খাঁট ক্ষেত। ক্ষেতে সরগুজার চাষ। ছোট-ছোট হরিদ্রা বর্ণের ফুল-গুলা ক্ষেতে যেন আলোর ঢেউ তুলিয়া দিয়াছে! অমল এ পথে ও পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বাগানে অসংখ্য চারাগুলার মাথায় ছোট ছোট ঢেঁড়স ফলিয়াছে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মতই সেগুলা বাঁকিয়া গিয়াছে। অমলের মনে হইল, ছোট গাছগুলা যেন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া তাহা-কেই উপহাস করিয়া বলিতেছে, কেমন, কেমন জব্দ!

আঁধার ক্রমে ঘনাইয়া আসিল। ফটকের মধ্যে এক-খানা পুশ-পুশ ঢুকিল। সম্মুখে একটা হারিকেন লণ্ঠন ঝুলিতেছে। ইঁদারার কাছে পুশ-পুশ থামিলে শিশু-কণ্ঠের একটা সুর ভাসিয়া আসিল,—দাও না, কি-মি-চি দাও না!—সঙ্গে সঙ্গে নারী-কণ্ঠের আশ্বাস-বাণী,—এই যে বাড়ী এসেচি। বিস্কুটি খাবে'খন! অমল ভাবিল, মজা করিতে হইবে! একটু পরে গিয়া দেখা দিব।

কিয়ৎক্ষণ পরে বাঙ্‌লার বারান্দায় আসিয়া সে দেখে, সেখানে একটি বাঙালী বাবু, একহাতে মোটা এক-গাছি লাঠি,—অপর হাতে কোঁচার খুঁট ধরিয়া দাঁড়াইয়া গগনের সহিত কথা কহিতেছেন। দেওয়ালে ছয় আনা দামের একটা কেরোসিনের সিঙ্গ্‌ল্‌ উইক ল্যাম্প জ্বলি-তেছে। সুধীরবাবুর সহিত তাঁহার চেহারার এতটুকু মিল নাই! অমলকে দেখিয়া গগন কহিল,—ইনি।

গগনের প্রভু বাঙালী বাবুটি কহিলেন,—আপনি কোথা থেকে আসচেন?

অমল কেমন ভড়কাইয়া গিয়াছিল। ব্যাপারখানা তাহার কাছে হেঁয়ালির মত ঠেকিল। তবু সে একটা ঢোক গিলিয়া কহিল,—কলকাতা। কিন্তু সে কথা থাক্‌, আমি শুধু জানতে চাই, মশায় কি এই বাঙ্‌লায় থাকেন?

তিনি কহিলেন,—হাঁ।

অমল কহিল,—মশায়ের নাম?

তিনি কহিলেন,—গোপালচন্দ্র মুখুয্যে।

অমল কহিল,—সুধীরবাবু সবজজ এখানে থাকেন না?

গোপালবাবু কহিলেন,—না।

অমল কহিল,—বেঞ্চে বসুন। ব্যাপারখানা কি, খুলে বলুন দিকিন্‌।

অমল তখন সব কথা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া গোপালবাবু বলিলেন, বুঝেচি। তা হয়েচে কি—জানেন? এ বাঙ্‌লাখানির মালিক একজন রিটায়ার্ড সবজজ। কাজেই এ বাঙ্‌লাখানাকে সকলে সবজজের বাঙলা বলে জানে; এখানকার দোকানদার, গাড়ী-ওয়ালা সকলেই। ষ্টেশনে গাড়োওয়ালাদের কাছে সবজজের বাঙ্‌লা বলতে তারা তাই আপনাকে এইখানে নিয়ে এসেচে। তা যাক্‌,—এখন রাত হয়ে এল। আপনার সারাদিন খাওয়া-দাওয়া হয়নি, নিশ্চয়! এখনই চট্‌ করে খানকতক লুচি ভাজিয়ে দেওয়াচ্ছি; খেয়ে নিন। তার পর গাড়ী আনিয়ে দেবো, যাবেন'খন!

অমল অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল। সে কহিল,—না, না, কোনো প্রয়োজন নেই। গাড়ী আমি নিজেই পথে দেখে নেবো।

গোপালবাবু কহিলেন,—এ কি আপনার কলকাতা মশায় যে ভেবেচেন পথে বেরুলেই গাড়ী পাবেন! এখান থেকে সে অনেক দূরে চাইবাসা রোডে গাড়ীর আড্ডা!

অমলের আর মুহূর্ত্ত ধৈর্য্য ধরিবার সামর্থ্য ছিল না। সে বলিল—না, না, আমার জন্ম আর কষ্ট পান কেন? সারাদিন ঘুরে এই আপনারা আসচেন, ক্লান্ত হয়েচেন, এখন কোথায় একটু জিরুবেন-থিরুবেন, তা না আবার আমার জন্ম লুচি ভাজানো?

গোপালবাবু কহিলেন, তাতে কি হয়েচে? আমা-দেরও তো খেতে হবে!

অমল কহিল,—সুধীরবাবুর বাঙ্‌লা কোথায়, জানেন?

গোপালবাবু কহিলেন,—আজ্ঞে না। আমিও হাওয়া খেতে এসেচি। তবে পূজার সময় এসেচি। এই জানুয়ারিতে ফিরবো। অফিসাররা কোথায় থাকেন, তা জানি না। তবে এ-ধারে নয়, এটা ঠিক। বোধ হয়, ধড়্‌প্যাথ্‌না কি মুরাবাদি অঞ্চলে থাকতে পারেন।

গোপাল বাবু নাছোড়বান্দা। অমলকে লুচি না খাওয়াইয়া কিছুতেই ছাড়িলেন না। অমলের আহার

শেষ হইলে তিনি কহিলেন—আজ রাতটা না হয় এখানেই থেকে যান! কাল সকালে তখন যাবেন।

অমলের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে ভাবিল, ভদ্রলোক বলেন কি? তাঁহার কি স্ত্রী নাই, না, স্ত্রীর প্রতি মমতা নিতান্ত অল্প! দীর্ঘ চৌদ্দ দিনের বিরহ! সে কহিল,—তাহলে তারা ভারী ভাববে। ভাববে কি! এতক্ষণে হয়তো কলকাতায় টেলিগ্রাম চলে গেছে।

অমল আর বাক্যব্যয় না করিয়া ঘড়ি খুলিয়া দেখে, নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। গোপালবাবুকে ধন্যবাদ দিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

গোপাল বাবু কহিলেন,—দাঁড়ান, গেট অবধি আপনাকে লণ্ঠন ধরতে বলি।

গগন হারিকেনের সন্ধানে গেল। অমল আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল। সহসা সে শুনিল, ভিতরের ঘরে ঈষৎ চাপা স্বরে নারী-কণ্ঠে কে কহিল,—ত্যাখ্, তোর বর তো ভাই মাঝে-মাঝে কাগজে গল্প লেখে। এই নিয়ে তাকে একটা লিখতে বলিস্ না। বেশ হবে।

যাহাকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলা হইল, সে উত্তর দিল,—আহা, ও-রকম গল্প তো রয়েইছে। শুনিয়া অমল হাসিবে কি কাঁদিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। এমন করুণ ব্যাপারের মধ্য হইতেও ইহারা কৌতুক-রসটুকুই ছানিয়া তুলিয়াছেন ভাবিয়া রাগও একটু না ধরিল, এমন নয়।

গগন লণ্ঠন লইয়া অমলকে গেট-অবধি পৌঁছাইয়া দিলে অলষ্টার-গায়ে র‍্যাগ-স্কন্ধে ব্যাগ-হস্তে অমল আসিয়া শীতের রাত্রে পথে দাঁড়াইল গগন ফটক বন্ধ করিল।

৫

বাহিরে কন্‌কনে ঠাণ্ডা। বায়ুর বেগও মন্দ ছিল না। জনহীন পথ। খুব দূরে-দূরে একটা করিয়া তেলের আলো মিটি-মিটি জ্বলিতেছে। সোজা পথ ধরিয়া অমল পশ্চিমমুখে চলিল। খানিকটা চলিয়া সে এক চৌমাথায় আসিয়া পৌঁছিল। পুটুশের ঘন ঝোপ হইতে একটা ঝিম্-ঝিম্ ঝম্-ঝম্ শব্দ উঠিতেছিল। চৌমাথার একধারে ছোট একখানি দোকান। দোকানের সম্মুখে বসিয়া এক কাহার-রমণী আগুন জ্বালিয়া হাত-পাগুলাকে গরম করিয়া লইতেছিল। অমল ভাবিল, ইহাকে জিজ্ঞাসা করা যাক্, সুধীরবাবু হাকিমের বাসা কোথায়? পরক্ষণে মনে হইল, এ সামান্য দোকানদার, তায় স্ত্রীলোক; জজ-হাকিম বলিয়া কোন জীবের অস্তিত্ব আছে কি না, তাহাই হয়তো জানে না, ঠিকানা বলিয়া দিবে কি! সুতরাং জিজ্ঞাসা করা ঘটিল না। খেয়ালের ঝোঁকে সোজা পথ ছাড়িয়া সে এবার বাঁ-হাতি রাস্তা ধরিল।

দু'ধারে বড় বড় গাছ। পথে অন্ধকার যেন জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুই হাতে সে-অন্ধকার ঠেলিয়া পথ করিতে হয়। অমল সেই অন্ধকার পথে দিক্-বিদিকের জ্ঞান হারাইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। গা ছম্-ছম্ করিতেছে। দুরন্ত শীতের রাত্রে ঘামে সর্ব্ব-শরীর ভিজিয়া উঠিল। সিক্ত ললাট হইতে ঘর্ম্মবিন্দু টস্-টস্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

কতক্ষণ ধরিয়া একবার ডাহিনে, একবার বামে ঘুরিয়া সরু-চওড়া নানা পথে হাঁটিয়া অমলের শেষে ক্লান্তি বোধ হইল। পথে কচিৎ দুই-একটা কালো ভূতের মত ওরাঁও-মুণ্ডার সহিত দেখা হয়। পথের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তরে তাহারা কি যে বলে, তাহার এক বর্ণ বুঝা যায় না। অমল শেষে প্রমাদ গণিল। ঘুরিয়া পা টন্‌টন্ করিতেছে। টুপির চাপে মাথার শির অবধি দপ্ দপ্ করিতেছে, শীতল বায়ুতে নাসারন্ধ্র জ্বলিতেছে! পথে একজন বাঙালীর সঙ্গেও দেখা হইল না, একটা কনষ্টেবলের সঙ্গেও নয়! অমল ভাবিল, এই রাত্রে পথে পড়িয়া বুঝি তাহাকে মরিতে হয়! একটা ল্যাম্প-পোষ্টের কাছে আসিয়া সে ঘড়ি খুলিল। দু'টা বাজিয়া গিয়াছে। সর্ব্বনাশ! ন'টা হইতে দু'টা পর্য্যন্ত পাঁচ ঘণ্টা সে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে!

কিন্তু আর নয়! আর পারা যায় না! যেখানে হোক, দেহ-ভার লুটাইয়া দিয়া খানিকটা এখন বিশ্রাম করিতে হইবে, নহিলে এমন নিষ্ঠুরের মত প্রাণটাকে নিতান্তই জখম করা যায় না! সে ভাবিল, বেকুবি করিয়া এই রাত্রে পথে বাহির না হইয়া গোপাল বাবুর কথামত তাঁহার বাঙ্‌লায় আশ্রয় লইলেই বেশ হইত। নিশ্চিন্ত নিদ্রাসুখের আশা না থাকিলেও এমন অকূল পাথারে ভাসিতে হইত না! যাহা হৌক, রাতের পাশা যখন পড়িয়া গিয়াছে, তখন আর তাহাকে ফিরাইবার উপায় নাই।

ল্যাম্প-পোষ্টের অপর পারে তারের বেড়া-ঘেরা একখানি বাঙ্‌লা। ফৌজদারী আইন জানা থাকিলেও বিনা দ্বিধায় মাতালের মত টলিতে টলিতে অমল সেই বাঙ্‌লার মধ্যে প্রবেশ করিল। বাঙ্‌লাগুলা এখানে সবই প্রায় এক ধরণের। এখানির সম্মুখেও সেই ছোট বারান্দা। তবে দু'খানা বেঞ্চের জায়গায় একখানা আম-কাঠের ছোট তক্তাপোষ নগ্ন দেহে পড়িয়া আছে। দেওয়ালে ছোট কেরোসিনের আলো জ্বলিতেছে। দু'টা খাটাল অবলম্বন করিয়া একটা দড়ি খাটানো; তাহাতে দুখানা শাড়ী শুকাইতেছে। তবে এ বাঙালীর বাসা, —নিশ্চয়! আঃ! অমল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। আর-বেশী ভাবিবার অবসর ছিল না। সর্ব্ব মূলাধার ভগবানের হাতে ভবিষ্যতের ভার দিয়া ব্যাগে মাথা

ধয়া ব্যাগে দেহ মুড়িয়া তক্তাপোষের উপর সটান সে য়া পড়িল। শ্রান্ত দেহ—নিদ্রার সদয় স্নেহে নিমেষে ভাবনার হাত এড়াইল।

৬

অমলের যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন আকাশের বুক রিয়া কুয়াশার রন্ধ্র ভেদ করিয়া উষার রক্তিম আভা রিধারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উঠিয়া সে ব্যাগটা গায়ে ড়ি দিয়া বসিল। ভাবিল, অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক, হস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ও আপনার একটা ঠিকানা না রিয়া কিছুতেই সে এখান হইতে নড়িবে না।

পথে তখন দুই-চারিজন করিয়া লোক চলিতে সুরু রিয়াছে। সাহেব ও সাহেব-বেশী বাঙালী এবং নব্য থার বেশ-ধারিণী বঙ্গরমণীর দল প্রাতভ্রমণে বাহির ইয়াছেন। বঙ্গরমণীগণের কোমল পায়ে জুতা-মোজা নায়াস-অসঙ্কোচে স্থান পাইয়া আপনাদের জুতা ও মাজা-জন্ম সার্থক করিয়াছে।

সহসা বাঙ্‌লার দ্বার খুলিয়া গেল এবং শিশুদের গুঞ্জন ও ক্রন্দন এবং নারী-কণ্ঠের মৃদু ভর্ৎসনার একটা মিশ্র কোলাহল উথলিত তরঙ্গের মত বাহিরে ভাসিয়া আসিল। অমলের হৃৎপিণ্ডে কে যেন একটা ঘা দিল। ভিতরের কোলাহল তখনই থামিয়া গেল, এবং কয়েকটা জুতার খট্‌-খট্‌ মশ্‌-মশ্‌ শব্দ ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্রমে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া থামিয়া পড়িল। একটা ফিস্‌-ফাস্‌ শব্দ ও পর-মুহূর্ত্তে চির-পরিচিত কোমল কণ্ঠের স্বর গানের মিষ্ট সুরের মত অমলের শ্রুতির মূলে আসিয়া আঘাত করিল,—এ কি! তুমি কোথা থেকে এমন সময়? রাত্রের গাড়ীতে এসেচো বুঝি? ছাখ দেখি, বুদ্ধি! এইখানে পড়ে থাকতে হয়? ডাক্‌তে নেই?

অমল ভাবিল, জাগিয়া সে স্বপ্ন দেখিতেছে না, কি এ? এ যে হেমের কণ্ঠ! ভালো করিয়া চোখ মুছিয়া সে চাহিয়া দেখে, না, এ তো স্বপ্ন নয়। এ যে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সত্যই তাহার হৃদয়ের ধন, আদরের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী! তাহার সারা দেহে স্বাস্থ্যের বেশ-একটা ছোপ পড়িয়াছে! পাহাড়িয়া দেশের বাতাসে মুখের বর্ণ শুধু মলিন হইয়া গিয়াছে!

হেমাঙ্গিনী নিকটে আসিয়া কহিল,—কথা কইচো না যে! তুমি এখানে পড়েছিলে কেন?

আর কেন? অমলের চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে ভাবিল, হায় রে, সাহস করিয়া কাল রাত্রে যখন বাঙ্‌লার বারান্দা অবধি সে আসিল, তখন যদি একবার শুধু দ্বারে দুইটা ঘা দিয়া কাহাকেও জাগাইয়া তুলিত! বাহিরে দারুণ দুঃখ-বেদনায় পড়িয়া একবারও তাহার মনে হয় নাই যে, এই একটা দেওয়ালের আড়ালে তাহার চির-বাঞ্ছিত কামনার ধন, প্রচুর আনন্দ, প্রচুর বিরাম, প্রচুর উত্তাপ সঞ্চিত আছে! যে-অন্ধকারকে বিরাট ঘন পাষাণ-স্তূপের মত দুর্ভেদ্য মনে হইয়াছিল, সেখানা একখানা কালো পরদার ব্যবধানমাত্র! হাতের একটু মৃদু স্পর্শে সে পরদা সরিয়া যাইত এবং নিমেষে অপূর্ব্ব আলোক-প্রাচুর্য্যের মধ্যে কি সহজেই না সে গিয়া পড়িত! উপরে বালি দেখিয়া সে বুঝিতে পারে নাই, তাহারই সূক্ষ্ম আবরণের অন্তরালে স্নিগ্ধ শান্ত অজস্র বারি-ধারা সুমধুর মৃদু প্রবাহে বহিয়া চলিয়াছে। হায় মূঢ়!

বাঙ্‌লায় রীতিমত সাড়া পড়িয়া গেল। গরম কাপড়ে আ-শির আবৃত করিয়া সুধীর বাবু বাহিরে আসিলেন। তাঁহার স্ত্রী,—হেমাঙ্গিনীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী ক... কই তাঁহার পুত্রকন্যার দল, কেল্লার ফৌজের মত ...র উগ্র হইতে বারন্দায় আসিয়া কাতার দিয়া দাঁড়া...রে। বড়-পর প্রশ্নের ধারা বর্ষিত হইলে অমল তাহা...ড় একটা শোচনীয় করুণ কাহিনী বিবৃত করিল। শুনি... পরে বাবু হাসিয়াই অস্থির। বরাঙ্গিনী কহিলেন,—বার এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ওকালতি করো কি করে? সারাদিন তাদের তালা-দেওয়া বাঙ্‌লায় পড়ে রইলে, তবু চাকরটাকে একবার জিজ্ঞাসা করলে না যে, সেটা কার বাঙ্‌লা!

অপ্রতিভভাবে অমল কহিল,—আর বকবেন না দিদি। কোন দোষ নেই আমার। সে বললে, তার বাবুর ভায়রা-ভাইয়েরও এ সময় কলকাতা থেকে আসবার কথা আছে। আবার সে ভায়রা-ভাই মশায়টিও কল-কাতায় ওকালতি করেন! কাজেই আমার কোন সন্দেহ হয়নি!

সুধীর বাবুর সম্মুখে হেমাঙ্গিনী অমলের সহিত পূর্ব্বে কখনও কথা কহে নাই। মাথার উপর ঈষৎ অব-গুণ্ঠন টানিয়া নাতি-উচ্চ কণ্ঠে দিদির কাণের কাছে মু... লইয়া গিয়া সে বলিল,—এখানে এসে সেই যদি উঠলে তো, এটা কোন্ মাথায় গেল ভাই যে এদের চাকর-বাকরকে নয় ডাকি!

বরাঙ্গিনী ভগ্নীর গায়ে ঠেলা দিয়া কহিল,—ওর কি আর জ্ঞান-গম্যি ছিল রে যে, অত মাথায় আসবে! তখন তোকে না দেখে চোখে সর্ষে-ফুল দেখছিল!

কথাটার রস সম্যক্ গ্রহণ করিতে না পারিয়া অমল শুধু নতশিরে বসিয়া রহিল। জবু ও হাবু আসিয়া বাপের কাছে বড়দিনের প্রতিশ্রুত উপহার রেস-গেম ও পিণ্ড-পঙের তাগাদা লাগাইয়া দিয়াছিল। বরাঙ্গিনী তাহাদের মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া কহিল,—আহা, দে রে মানুষকে জিরুতে দে। কাল সেই বেলা দশটা

টাট্টু ঘোড়ার মত তোদের বাপ সারা রাঁচি সহরে ছুটে বেড়িয়েচে। আগে দানা-পানি খেয়ে ঠাণ্ডা-হোক্, তার পর নয় ঘাড়ে চড়িস্! তার পর অমলের পানে ফিরিয়া কহিলেন,—এঁর নাম করে গাড়ীওয়ালাকে বললেই তো হত!

সুধীরবাবু কহিলেন,—তা কি করে ও বেচারা জানবে বলো যে, এখানে বাঙ্‌লার নামে এমন একটা মস্ত গোল পাকিয়ে আছে!

বরাঙ্গিনী কহিলেন,—মোদ্দা সেখানে যে পিঠে লাঠি না পড়ে পাতে লুচি পড়েছিল, এটা খুবই বরাত-জোর বলতে হবে! সে বাঙ্‌লার গোপাল বাবুটি দেখচি পাকা গিন্নি। তা যাক্, হেম, চায়ের জল চড়েছে। তুই আগে অমলের জন্ত এক পেয়ালা চা খপ্ করে নিয়ে আয়, ভাই, নাহলে বেচারার ভোঁচকান লাগতে পারে। চা খেয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে আগে ও খানিকটা গড়িয়ে নিক্, তার পর নালিশ-ফরিয়াদ চালাস্ তখন!

ঠাকুরঝি

ীরজা রান্নাঘরে ঝোল সাঁৎলাইতেছিল, শিবপ্রিয়া পিয়া অলক্ষ্যে আসিয়া তাহার মুখে খানিকটা মোহন পুরিয়া দিল। নীরজা ঘাড় ফিরাইয়া অনুযোগের কহিল,—ও কি ভাই ঠাকুরঝি!

শিবপ্রিয়া হাসিয়া কহিল,—কিছু মুখে দাও দেখি। থেকে কখনও খাবার ফুরসৎ হতে দেখলুম না!

নীরজা হাত ধুইয়া ধোয়া জল কড়ায় ঢালিয়া সরিয়া দল, কহিল,—এই যে ঝোলটা নামিয়ে রেখেই নিচ্ছি।

—বাসি রুটি তো! সে আর তোমায় খেতে দিচ্ছি না! বলো তো—আমি খাবো লুচি, মোহনভোগ, আর বাড়ীর বৌ, একটি বৌ, তুমি কতকগুলো বাসি গিলবে! কেন? মার সঙ্গে এই নিয়ে আজ খুব চোট হয়ে গেছে আমার।

নীরজা ম্লান নেত্রে শিবপ্রিয়ার পানে চাহিল। সে তে করুণ মিনতি যেন ঝরিয়া পড়িতেছে! সে র অর্থ, কেন তুমি আমার হইয়া ঝগড়া করো, ভাই? ল সামলাইতে আমার যে এদিকে প্রাণ বাহির হইয়া য়! শিবপ্রিয়া তাহা বুঝিত; তাই সে কহিল,—আমি বার তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবো। দেখি, মা তোমায় মন কিছু বলে!

নীরজা শিহরিয়া উঠিল, কহিল,—না ভাই, না কুরঝি, তোমার ছুটি পায়ে পড়ি।

শিবপ্রিয়া একদৃষ্টে নীরজার পানে চাহিয়া রহিল। ীরজার সুন্দর মুখে ঘামের বিন্দু ফুটিয়া উঠিয়াছে; কপালের উপর মুক্ত কেশগুলা সে ঘামে ভিজিয়া বসিয়া গিয়াছে; আগুনের তাপে মুখ তাহার রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। শিবপ্রিয়া কহিল,—আজ থেকে আর একলা তোমায় রাঁধতে দিচ্ছি না। আমিও রান্নায় যোগ দেবো। বলিয়া শিবপ্রিয়া উনানের দিকে অগ্রসর হইল।

নীরজা বাধা দিয়া কহিল,—না ভাই, তোমার সহ্য হবে না। অসুখ করবে।

শিবপ্রিয়া সজোরে কহিল,—ওগো, না গো না, আমি মোমের পুতুল নই যে আগুন-তাতে গলে যাবো।

নীরজা কহিল,—তুমি দুদিনের জন্যে এখানে জিরুতে এসেছ—

শিবপ্রিয়া কোপের ভাণ করিয়া কহিল,—বটে! আমার বাপের বাড়ী আমি এসেচি কুটুম! না? তাই আমি সিংহাসনে দিবা-রাত্তির বসে থাকবো, কুটোটি অবধি নাড়তে পাবো না! ইস্ লো! না, আমার হাতের রান্না খেলে তোমাদের জাত যাবে? ওগো, তোমার ঠাকুর-জামাই অখাদ্যি খেলেও সে মোছনমান নয়—বুঝলে?

নীরজা জানিত, শিবপ্রিয়াকে ঠেকাইয়া রাখা দায়! সে যাহা ধরিবে, তাহা করিবেই। বিশেষ নীরজার কষ্ট এতটুকু লাঘব করিবার জন্য শিবপ্রিয়া মায়ের উগ্র রোষানল হাসি-মুখে মাথায় তুলিয়া লইতে পারে। বড়-লোকের ঘরে সে পড়িয়াছে,—বাপের বাড়ী বড় একটা আসিবার সুবিধা তাহার ঘটে না। এক বৎসর পরে কয়দিনের কড়ারে এবার সে বাপের বাড়ী আসিবার অনুমতি পাইয়াছে। মা মেয়েকে পাইয়া কোথায় রাখিবেন, কি পাঁচটা ভাল জিনিস তাহাকে খাওয়াইবেন, ভাবিয়া অস্থির আকুল হইয়া উঠিয়াছেন! পূর্ব্বে যেখানে শুধু স্নেহ ছিল, এখন সেখানে মন যোগাইবার পালা পড়িয়াছে। হোক পেটের মেয়ে, তবু সে আজ বড়লোকের বৌ! এই কথাটাই মায়ের মনে সকলের চেয়ে বেশী জাগিতেছে। তাই মা মেয়ের জন্য অতিরিক্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

মেয়ে কিন্তু দেখিতে পাইল, তাহার আদরের ঘটায় বেচারী নীরজার পরিশ্রমের সীমা নাই! আবার শুধু তাহাই নয়। মুখ টিপিয়া এতখানি যে খাটিয়া সারা হইয়া যাইতেছে, তাহার উপর জুলুমের কি অন্ত আছে! শুধু জুলুম? শিবপ্রিয়া নারী—সে জানে, সংসারের কাজে নারী যতই খাটিয়া সারা হোক না কেন, সে খাটুনি কিছুই তাহার গায়ে লাগে না, যদি এ-সকল খাটুনির পিছনে স্বামীর ভালোবাসায় জুড়াইবার একটা আশ্রয় থাকে! কিন্তু এ ক্ষেত্রে নীরজার ভাগ্যে তাহারও অভাব। প্রবল-প্রতাপ ভাই স্ত্রীর ভালোবাসার ধার মোটেই ধারে না। বৌ যখন গভীর রাত্রে পরিশ্রমান্তে জুড়াইবার জন্য ঘরের কোণে গিয়া আশ্রয় লয়, ভাই শ্রীপতি তখন নীচ ও জঘন্য আমোদ-প্রমোদের চেষ্টায় বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়। মার সেদিকে শাসন মোটে নাই, বরং তিনি ছেলেকে এ বিষয়ে একরূপ প্রশ্রয়ই দিয়া আসিতেছেন!

বহুদিন পরে ভাইয়ের সংসারে আসিয়া এই বিসদৃশ

ব্যাপার দেখিয়া শিবপ্রিয়ার চিত্ত জলিয়া উঠিল। সে ভাবিল, দূর হোক, এখনই চলিয়া যাই! কিন্তু না, বেচারী নীরজা! নীরজার প্রতি সুগভীর মমতাই তাহাকে এখানে আটকাইয়া রাখিল। সে ভাবিল, নীরজার সম্বন্ধে একটা কিছু ব্যবস্থা করিয়া তবে সে এখান হইতে নড়িবে! এমন লক্ষ্মী বৌ—তাহার এমন দুর্দ্দশা! ঘরের লক্ষ্মী যেখানে কাঁদিয়া দিন কাটায়, সে সংসারের উচ্ছেদ হইতে কতক্ষণ!

তাই বৌয়ের পক্ষ লইয়া মায়ের সহিত সে ঝগড়া সুরু করিল। স্বামি-সৌভাগ্যের দুর্জ্জয় বর্ম্ম তাহাকে বিপুল শক্তি-শালিনী করিয়া তুলিয়াছিল। মাকে সে স্পষ্ট বলিল, তোমার আস্কারাতেই দাদার এতখানি বাড় হয়েচে!

মা বলিলেন,—তা যা বলো বাপু, শ্রীপতি আমার এ-কালের ছেলেদের মত বেহায়া নয়—যে, বৌকে মাথায় তুলে নাচবে!

শিবপ্রিয়া রাগিয়া বলিল,—না! বৌকে দু'পায়ে থ্যাংলানোটাই ভারী পৌরুষের লক্ষণ!

মা বলিলেন,—বৌ বৌই আছে, খাচ্ছে পরচে—ব্যস। আবার কি! কিসের তার আর অভাব রইল, শুনি! মেমেদের মত সোয়ামীর হাত ধরে গড়ের মাঠে হাওয়া খেয়ে বেড়াবে না কি! না, পাঁচটা মজলিশে ধেই ধেই করে নাচতে ছুটবে?

বৌ-সম্বন্ধে মাতার এই আশ্চর্য্য ধারণার কথা শুনিয়া শিবপ্রিয়া অবাক্ হইয়া গেল, কিন্তু দমিল না। সে ভাবিল, কিছুতেই ছাড়া হইবে না—এ গাঙ্গে তরী যখন ভাসাইয়াছে, তখন শক্ত করিয়া হাল ধরিয়া কূলে সে পৌছিবেই! ভাইকেও একদিন কাছে পাইয়া সে বেশ চড়া রকমের দশটা কথা শুনাইয়া দিল। ফলে দাঁড়াইল এই যে, শ্রীপতি পূর্ব্বে দুই বেলা দুই মুঠা ভোজন করিবার জন্ম অন্দরে আসিত, এখন ভগ্নীর কড়া কথা শুনার পর হইতে সে পুরে সে একান্ত দুর্লভ হইয়া উঠিল!

এই ঘটনায় মায়ের যত রাগ পড়িল, নীরজার উপর! সে-ই তো এই ব্যাপারের মূল! তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই শিবপ্রিয়া কঠিন বচনের চাকাখানা ঘুরাইয়া দিয়াছে! আর সে চাকা তাঁহাকে ও শ্রীপতিকে মাড়াইয়া পিষিয়া সবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে! কতদিন পরে মেয়ে আসিল—কোথায় দু'দণ্ড তাহাকে কাছে রাখিয়া সুখ-দুঃখের দু'টা কথা কহিবেন, তাহার অবকাশমাত্র না দিয়া মেয়েটা বৌয়ের সঙ্গে সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরিয়া ...য়! পাঁচটা বাজে ছুতা খুঁজিয়া মার সঙ্গে ...দল বাধায়! মুখ টিপিয়া থাকিলে কি হয়, বৌয়ের হাড়ে ভেল্কি খেলে! তাই বৌয়ের উপর তাঁহার আক্রোশ সীমা ছাপাইয়া উঠিল। বৌকে অন্তরালে পাইলে মনের জ্বালার বেশ দুই-চারিটা তীব্র ছিটা তিনি তাহার উপর নিক্ষেপ করিতে ছাড়েন না!

নীরজা চোখের জল মুছিয়া ভাবিল, হায়, ঠাকুরঝি এ করিল কি! মধু পাইবার প্রত্যাশায় মধু-চক্রে খোঁচা দিয়া মধু তো পাওয়া গেলই না, এখন হুলের বিষে তাহার যে প্রাণ যাইবার জো হইয়াছে! মনে সুখ তাহার ছিলই না। স্বস্তি একটু ছিল! সে স্বস্তিটুকু ঠাকুরঝি আজ দূর করিয়া দিতেছে। হায়, সে দু'দিনের অতিথি, দুই দিন পরেই দূরে চলিয়া যাইবে; কিন্তু সে বুঝিতেছে, এ দু'দিনে সংসারটায় যে দারুণ ঘূর্ণাবর্ত্তের সে সৃষ্টি করিয়াছে, সে ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া নীরজার পক্ষে টিঁকিয়া থাকা কতখানি কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে!

২

রান্নাঘরে মেয়ের গলার সাড়া পাইয়া মা পা টিপিয়া তথায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৌয়ের পানে রুক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন,—ননদের সঙ্গে গানে-গল্পে ঝোলটা শেষে পুড়িয়ে ফেলো না যেন! ও কোথায় দু দিনের জন্ম এলো বাপের বাড়ীতে জিরুতে, না, দিবা-রাত্তির ওকে ধরে ফুস্‌লোনো হচ্ছে! শেষে রান্নাঘরে এই উনুনের পাশে আগুন-তাতে অবধি ওকে টেনে আনা হয়েচে!

নীরজা মাটীর পানে চাহিয়া রহিল। শিবপ্রিয়া ফোঁশ্ করিয়া উঠিল,—ও কেন ডাকতে যাবে? আমি নিজে এসেচি। সকাল থেকে মানুষটা কিছু না খেয়ে বেঁধে সারা হচ্ছে,—কি খেলে না খেলে, সেদিকে কারও নজরই নেই—তাই ওর মুখে জোর করে একটু মোহন-ভোগ পুরে দিলুম।

মা বলিলেন,—বড়লোকের মেয়ের মুখে বুঝি রুটি আর রোচে না!

শিবপ্রিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল! মা—! সে স্বরে মা চমকিয়া থামিয়া গেলেন। শিবপ্রিয়া বলিল,—তুমি ওকে যা খুসী বকতে পারো, কেন না, ও তোমার বৌ, এখন ওকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েচো। কিন্তু তাই বলে ওর বাপের নামে খোঁটা দিয়ো না বলচি, খবর্দ্দার! ও ভালো মানুষ, তাই চুপ করে সহ্য করচে। আমার যদি কেউ এমনি করে আমার মরা বাপের নামে খোঁটা দিত, তাহলে আমি কি করতুম, জানো? নখে করে তাকে ছিঁড়ে ফেলতুম—তা সে আমার যত-বড় গুরুজনই হোক না কেন! স্বামী হলেও রেহাই দিতুম না।

মেয়ের কথায় মা ভড়কাইয়া গেলেন। শিবপ্রিয়ার চোখ দুইটা আগুনের মত জলিতেছিল—রাগে সর্ব্বাঙ্গ থর্

থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। মা বলিলেন,—এখন আয় বাপু—রান্নাঘর থেকে চলে আয়—তোর মাথা গরম হয়ে উঠেছে। এখনই আবার ফিট্-টিট হয়ে পড়বে! কত করে ফিট বন্ধ হয়েচে। আয়, চলে আয়। মা মেয়ের হাত ধরিয়া মৃদু আকর্ষণ করিলেন।

শিবপ্রিয়া কহিল,—না, আমি যাবো না। ছাড়ো আমায়। আমি আজ রাঁধব—বৌকে রাঁধতে দেবো না। তুমি যাও। আমায় রাগিয়ো না, বলচি,—তাহলে অনর্থ বাধবে!

মা ভয়ে সরিয়া গেলেন। যাইবার সময় বৌয়ের পানে যে দৃষ্টি হানিয়া গেলেন, তাহাতে যেন আগুন ঠিকরিয়া বাহির হইতেছিল।

নীরজা কাঠের পুতুলের মত নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার যেন চেতনা ছিল না! চোখের সামনে এই যে ঘটনা ঘটিয়া গেল, ইহা কি সত্য? যখন জ্ঞান হইল, তখন সে দেখে, শিবপ্রিয়া কোমরে কাপড় জড়াইয়া কানি দিয়া কড়ার আংটা ধরিয়া উনান হইতে ঝোলের কড়া নামাইতেছে। সে ছুটিয়া গিয়া ডাকিল,—ঠাকুরঝি—

শিবপ্রিয়া তখন একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। সহজভাবেই সে বলিল,—দে ভাই ঐ কাঁশিখানা—ঝোলটা ঢেলে রাখি। কেমন, এই হয়েচে তো? দেখ, আর থাকলে ঝোলটা মরে একেবারে কাই হয়ে যাবে না?

যন্ত্র-চালিতের মত নীরজা কাঁশি আগাইয়া দিল। শিবপ্রিয়া কাঁশিতে ঝোল ঢালিয়া রাখিয়া খুন্তি দিয়া কড়া চাঁচিয়া ফেলিল; পরে কড়ায় জল ঢালিয়া ভিজা ন্যাতা দিয়া কড়ার গা রগড়াইয়া জলটুকু বাহিরে নর্দ্দামার ধারে ঢালিয়া আসিয়া কহিল,—এই কড়াতেই অম্বলটা চড়িয়ে দি, তাহলে—কেমন? তুই ভাই মশলাটা ঠিক করে দে। আমি ততক্ষণে চালতা কটা ছেঁচে নি।

৩

কড়ারের তখনও কয়দিন বাকী ছিল, শিবপ্রিয়ার শাশুড়ী লিখিয়া পাঠাইলেন, হঠাৎ তাঁহার এক দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন উপস্থিত; বীরেন যাইয়া কাল শিবপ্রিয়াকে লইয়া আসিবে। শিবপ্রিয়ার মন অস্থির হইয়া উঠিল। সে নীরজার পানে চাহিল। নীরজার মুখে-চোখে করুণ বেদনার একটা ছায়া পড়িয়াছিল। ঠাকুরঝি চলিয়া যাইবে! হায়, স্নেহের দেওয়াল তুলিয়া এই যে কঠিন বাক্য ও মিথ্যা তিরস্কারের হাত হইতে এতদিন তাহাকে সে আগুলিয়া রাখিয়াছে—সে দেওয়াল ভাঙ্গিয়া ঠাকুরঝি চলিয়া গেলে বাহিরের রুদ্র গর্জ্জন নিমেষে তাহাকে দ্বিগুণ প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করিবে। এখন সেগুলার আক্রোশ যে ভীষণতর হইবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় ছিল না! হায়, কেন সে আসিল? কেন সে এমনভাবে ঘাঁটাইয়া শাশুড়ীর চিত্তের আগুনটাকে এতখানি গাঢ় তীব্র করিয়া দিল! এখন তাহার উপায়!

শিবপ্রিয়াও ঠিক এই কথা ভাবিতেছিল। সে ভাবিল, রুদ্র ভাব ধরিয়া সে ভালো করে নাই; শান্তভাবে কথাগুলা পাড়িয়া গৃহে শান্তি আনিবার চেষ্টা করিলে বোধ হয় কিছু ফল হইত। তাহার অনুপস্থিতিতে নীরজার অসহায় ভাব কল্পনা করিয়া সে ব্যথিত হইয়া পড়িল। সে ভাবিল,দাদাকে একবার পাইলে হয়, নরম কথায় তাহাকে একবার সে বুঝাইয়া দেখিবে! কিন্তু শ্রীপতি আজ কয়-দিন আর বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াইবার অবকাশ পায় নাই!

কাল সকালে বীরেন আসিয়া শিবপ্রিয়াকে লইয়া যাইবে। মেয়ে চলিয়া যাইবে, মা তাই পূর্ব্বরাত্রে তাহার ভোজনের জন্ম একটু বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন। অনেক রাত্রে সংসারের লেঠা চুকাইয়া নীরজা যখন শুইতে আসিল, তখন তাহার মাথা খুবই ধরিয়া উঠিয়াছে। শিবপ্রিয়া আসিয়া কহিল,—আজ আমি তোর কাছে শোবো ভাই—

শিবপ্রিয়া বিছানায় পড়িয়া নীরজাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল। সে চমকিয়া উঠিল। এ কি, গা তাহার পুড়িয়া যাইতেছে! শিবপ্রিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া কহিল, তোর যে জ্বর হয়েচে, বৌ! পরে তাহার কপালে হাত দিয়া কহিল,না—হুঁ বেশ জ্বর! গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে! আর এই জ্বরে আগুন-তাতে সারাক্ষণ বসে সব তুই করলি কর্ম্মালি। তাই বুঝি আমাকে আর ওধারে আর ঘেঁষতে দিলিনি? বললি, না ভাই, কাল তুমি চলে যাবে, মার কাছে আজ থাকোগে! আমিও যেমন নেকা, কিছু বুঝলুম না!

শিবপ্রিয়া উঠিয়া মার ঘরে গেল, ডাকিল,—মা—

মা তখন মনে মনে জ্বলিতেছিলেন! আহারের এতখানি আয়োজন করা গেল, তা শ্রীপতি তাহার কিছুই মুখে দিল না! সাধে কি শিবপ্রিয়া এত কথা শুনায়! কেন বাপু, তুই ঘরের ছেলে, তোর এমন রাত করিয়া বাহিরে পড়িয়া থাকা কেন! যুক্তি-তর্কের পর রাগটা পড়িল, বৌয়ের উপর! সেই সর্ব্বনাশীই যত নষ্টের মূল! এমন বৌকে বিদায় করিলে তবে হাড়ে বাতাস লাগে!

মেয়ের ডাক শুনিয়া মা কহিলেন,—আয়, শুবি আয়।

শিবপ্রিয়া কহিল,—শোবার কথা হচ্ছে না। বৌয়ের খুব জ্বর হয়েচে! এখনই কাউকে একজন ডাক্তার ডাকতে পাঠাও।

আবার সেই বৌয়ের হইয়া ওকালতি! মা জ্বলি

উঠিয়া কহিলেন,—হাঁ, দেউড়ীতে আমার পাঁচটা পাইক বরকন্দাজ বসে আছে—এই যে এতেলা পাঠাই।

শিবপ্রিয়া মুহূর্ত্তে কঠিন হইয়া উঠিল। এই সে একটু পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আর কঠিন হইবে না। কিন্তু উপায় নাই! সে কহিল,—আর তোমার ছেলের কি মেয়ের যদি অসুখ করতো আজ?

সে কথার জবাব না দিয়া মা পাশ ফিরিয়া শুইলেন, কহিলেন,—যা তোর খুশী হয়, করগে না, বাছা! সারাদিন পরে ঘুমিয়ে যে একটু আরাম পাবো, তারও জো নেই!

শিবপ্রিয়া নিরাশ নিরুপায় চিত্তে নীরজার ঘরে ফিরিয়া আসিল; বাক্স হইতে অডিকলোনের শিশি বাহির করিয়া তাহাতে রুমাল ভিজাইয়া নীরজার কপালে পটি আঁটিয়া দিল। সারারাত্রি জাগিয়া বসিয়া সে নীরজার শুশ্রূষা করিল। নীরজা কতবার কহিল,—ও কি ভাই ঠাকুরঝি, অত কেন? আমি বেশ আছি, তুমি ঘুমোও—

ভোরের দিকে নীরজা জ্বরের ঘোরে কেমন আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। শিবপ্রিয়া অস্থির হইয়া পড়িল। এ বাড়ীর কাহারও কাছে কোন সাহায্য পাইবে না সে! বীরেন আসিলে যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করিতে পারিবে ভাবিয়া বীরেনের আশা-পথ চাহিয়াই সে নীরজার গায়ে-মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

সকালে মা আসিয়া ঘরের দ্বারে উঁকি পাড়িলেন। মা হাঁকিলেন, এখনও নবাব-পুত্রীর ঘুম ভাঙলো না! আজ বীরেন আসচে, খাবার-দাবারের একটু উদ্‌যোগ-সুদ্‌যোগ করতে হবে, তা হুঁশ নেই।

শিবপ্রিয়া কহিল,—তোমার ভয় নেই মা। এ বাড়ীতে সে জলগ্রহণ করবে না—তার ব্যবস্থাও আমি করবো'খন। তোমার কোন ভাবনা নেই, তুমি ঘুমোওগে যাও।

মেয়ের মুখের কাছে মা দাঁড়াইতে পারিতেন না। অগত্যা তিনি চুপ করিয়া গেলেন।

৪

যথাসময়ে বীরেন আসিয়া বাহিরে হাঁকিল,—দাদা—

শিবপ্রিয়া ঝীকে কহিল,—তোর জামাইবাবু এসেচে রে। এইখানে ডেকে নিয়ে আয়।

বীরেন আসিলে শিবপ্রিয়া কহিল,—তোমার গাড়ী আছে—এখনই একজন ডাক্তার ডেকে আনো। বৌয়ের কাল রাত্তির থেকে খুব জ্বর!

বীরেন আসিয়াই এ ভাব দেখিয়া কেমন ভড়কাইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিতে ছুটিল।

ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন, —বড় সুবিধে মনে হচ্ছে না। টাইফয়েড হতে পারে বলে আশঙ্কা হচ্ছে! আজ তিন-চারদিন থেকে বোধ হয় জ্বরটা হয়েচে? ডাক্তার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বীরেনের পানে চাহিল।

শিবপ্রিয়ার বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। ঘোমটার অন্তরাল হইতে মৃদু স্বরে সে কহিল,—কাল রাত্রে আমরা জ্বর জানতে পেরেচি।

প্রেস্‌কৃপ্‌সন লিখিয়া ভিজিটের টাকা পকেটে পুরিয়া ডাক্তার বিদায় গ্রহণ করিলে শিবপ্রিয়া কহিল,—আমায় নিতে এসেচো?

বীরেন কহিল,—হাঁ। সরোর ছেলের ভাত হবে কাল। মা কিছু লেখেন নি?

শিবপ্রিয়া কহিল,—লিখেচেন, কিন্তু কি করে যাই, বলো? আমি গেলে বৌটা বিনা চিকিৎসাতে মারা যাবে। যা ওর যত্ন-আত্তি! এ-সব জানলে এ বাড়ীতে আমি এবার পা দিতুম না মোটে।

বীরেন কহিল,—তোমার দাদা কোথায়?

শিবপ্রিয়া কিছু বলিতে পারিল না। বলিতে লজ্জা হইল যে, দাদার গুণের সীমা নাই! স্বামি-সৌভাগ্য পূর্ণ মাত্রায় যে লাভ করিয়াছে, সে-ই জানে, এ কথা মুখে উচ্চারণ করিতে কতখানি বাধে! অনুমানে বীরেন ব্যাপার কতক বুঝিল। সে কহিল,—বাড়ীতে সে কখন্ ফিরবে?

শিবপ্রিয়া কহিল,—সে-ই জানে। আজ ক'দিন চুলের টিকিও দেখতে পাচ্ছি না। তা যাক্, তুমি তো সব দেখলে। গিয়ে মাকে বলো, এ অবস্থায় কেমন করে আমি যাই! ঠাকুরঝিকেও দুঃখ করতে বারণ করো। দেখে যাচ্ছ তো! বলো, নেহাৎ নিরুপায়!

বীরেন কহিল,—তা ত দেখচি। এ অবস্থায় কেমন করেই বা তোমায় নিয়ে যাই! মোদ্দা ডাক্তার ডাকা, হাঙ্গাম পোহানো, তুমি এ সব পারবে কি? রোগটাও সহজ নয়, বিশেষ তোমার শরীরে যদি সহ্য না হয়—

শিবপ্রিয়া হাসিল, হাসিয়া কহিল,—সে ভাবনা তোমার নেই! তোমায় আবার ফিরে লগ্ন দেখতে হবে না।

বীরেন কহিল,—তা বুঝি। কিন্তু সে কথা হচ্ছে না। তুমি মেয়েমানুষ, সামলাতে পারবে কেন? তার চেয়ে আমি গিয়ে বরং সনাতনকে পাঠিয়ে দি।

শিবপ্রিয়া আশ্বস্ত হইয়া কহিল,—তাহলে ভালোই হয়। তবে এ রোগের বাড়ীতে তার খাওয়া-দাওয়া দেখবার সুবিধে হবে না!

বীরেন কহিল,—সে তার ব্যবস্থা করে নেবে'খন। সে তো আর এখানে কুটুম্বিতে করতে আসবে না। আমি তার ব্যবস্থা করে দেবো।

শিবপ্রিয়া কহিল,—তাহলে তুমি যাও। গিয়ে যা দেখলে, মাকে বলো।

বীরেন কহিল, মার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।

শিবপ্রিয়া কহিল,—দেখা করতে চাও, দেখা করোগে। আমায় আর বকিয়ো না।

বীরেন গিয়া শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। শাশুড়ী আনন্দে সারা হইয়া উঠিলেন। বড়মানুষ জামাই মা বলিয়া ডাকিয়াছে, ইহাই যথেষ্ট! তাহার উপর আবার প্রণাম! শাশুড়ী কহিলেন,—রান্না এখনই চাপিয়ে দিচ্ছি। দুটি খেয়ে যাও, বাবা।

বীরেন কহিল,—না মা, তার জন্য ভাববেন না। বৌদি সারুক, এসে ওর হাতে একদিন তখন খেয়ে যাব। আমার এখন ঢের কাজ, দাঁড়াবার সময় নেই।

বীরেন চলিয়া গেল। শাশুড়ী বুঝিলেন, এ শিবপ্রিয়ার কাজ! সে-ই জামাতাকে নিষেধ করিয়া দিয়াছে যে,—এখানে আহার করিয়ো না! নিশ্চয়! কিন্তু কেন এ নিষেধ? ইহারও মূলে ঐ বৌ! তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। এমন সর্ব্বনাশীকে তিনি ঘরে আনিয়াছিলেন যে, মুহূর্ত্ত শান্তি নাই। ইহারই জন্য ছেলে তাঁহার ঘর ছাড়িয়া গেল, মেয়ের মুখ সদাই অপ্রসন্ন। শুধু অপ্রসন্ন? মার উপর মেয়ের মন একেবারে তাতিয়া রহিয়াছে। তিনি ফুঁশিয়া মনে মনে ভাবিলেন, বৌয়ের যদি এখন ঘটনাক্রমে একটা ভাল-মন্দ কিছু ঘটিয়া যায়, তবেই মঙ্গল। নিজের ছেলে ও মেয়েকে আবার তিনি ফিরাইয়া পাইবেন। আহা, তেমন দিন কি হইবে!

বিশ্বের ভগবান্ বুঝি এ প্রার্থনা শুনিয়া সে দিন শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন!

৫

চারদিন জ্বর-ভোগের পর সেদিন দুপুরবেলায় নীরজা চোখ মেলিয়া ডাকিল,—ঠাকুরঝি—

তাহার হাত দুটা—শিবপ্রিয়ার কোলের উপর লুটাইয়া পড়িল। সনাতন আসিয়া ঘরের বাহিরে ডাকিল,—বৌমা—

শিবপ্রিয়া কহিল,—কেন বাবা?

—হোয়েটুকু এনেচি মা। খাওয়াতে পারবে?

শিবপ্রিয়া উঠিয়া গিয়া ক্যাপ্ লইয়া আসিল, নীরজাকে ডাকিল,—বৌ—

নীরজা ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া চাহিল,—কেন ভাই?

—এইটুকু খেয়ে নাও—

—আর কেন ঠাকুরঝি? নীরজার চোখের কোলে জল গড়াইয়া পড়িল।

শিবপ্রিয়া আঁচল দিয়া সে অশ্রু মুছিয়া লইল। পরে হোয়ের ক্যাপ্ নীরজার মুখে ধরিয়া কহিল,—এটুকু খাও, ভাই।

নীরজা আপত্তি না করিয়া পান করিল; কহিল,—ঠাকুরঝি, তোমার ভাই বড় কষ্ট হচ্ছে।

শিবপ্রিয়া কহিল,—এখন সে কষ্টটুকু সার্থক কর দেখি—

নীরজা কিছু বলিল না, উদাস ম্লান নেত্রে বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল। শিবপ্রিয়া তাহাকে বাতাস করিতেছিল। দৃষ্টি তাহার নীরজার মুখের পানে। যে মুখ এত দুঃখেও সর্ব্বক্ষণ হাসি-ভরা দেখিত, সে-মুখ আজ বাসি ফুলের মত শুষ্ক মলিন হইয়া গিয়াছে। তাহার কপালের উপর দুই-চারিগাছি কেশের গুচ্ছ উড়িয়া পড়িয়াছিল। রেশমের মত কোমল কেশ সেগুলা হাত দিয়া সরাইয়া নীরজার মুখের কাছে মুখ আনিয়া শিবপ্রিয়া কহিল,—কি ভাবচো?

নীরজার চোখ জলে ভরিয়া ছিল; বাহিরের এই করুণ সমবেদনা-মাখা প্রশ্নের আঘাতে মুহূর্ত্তে তাহা ঝরিয়া পড়িল। নীরজা বালিশে চোখ মুছিয়া ডাকিল,—ঠাকুরঝি! তাহার গলার স্বর কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

শিবপ্রিয়া কহিল,—কি ভাবচো বলো?

একটা তীব্র নিশ্বাস ফেলিয়া নীরজা কহিল,—আজ বাড়ী আসেননি? আমার জন্য শেষ বাড়ী আসা ছেড়ে দিলেন?

শিবপ্রিয়ার বুকের ভিতরে একটা ভীষণ বেদনা ঠেলিয়া উঠিল। সে কহিল,—দাঁড়া, তোর বুঝি ভাগ্যি ফিরেচে। একটু আগে যেন দাদার গলার সাড়া পেলুম।

নীরজাও সে সাড়া পাইয়াছিল—তাই সে চোখ খুলিয়াছে!

শিবপ্রিয়া বাহিরে গেল। দালানে বসিয়া শ্রীপতি তেল মাখিতেছিল। মা নিকটে দাঁড়াইয়া। শিবপ্রিয়া গিয়া সহজ স্বরে ডাকিল,—দাদা—

শ্রীপতি ভগ্নীকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু গলার স্বরে আশ্বস্ত হইল। সে কহিল,—কি বলচিস্, শিবু?

শিবপ্রিয়া কহিল,—তোমার চান হয়ে গেলে একবার এ ঘরে এসো। বৌয়ের বড় অসুখ—

মা কহিলেন,—অসুখ, তা ও গিয়ে কি করবে? ও কি ডাক্তার?

শিবপ্রিয়া সে কথা কানে না তুলিয়াই কহিল,—

—তোমায় একবারটি দেখতে চায়। মেয়েমানুষের মন, বোঝে না, কি করবে বলো! তবে ভয় নেই, তোমাদের হাড়ে বাতাস লাগবে শীগ্‌গির—তারই বন্দোবস্ত সে এবার করেচে।

মা বলিলেন,—তোর আস্কারাতেই ওর এত বাড় হয়েছে! নাহলে অসুখের ভার করে এতখানি ঘটা বাধাতে পারতো!

শিবপ্রিয়া কোন কথা বলিল না! তাহার মনে

যে আগুন জ্বলিতেছিল, ইচ্ছা থাকিলে সে আগুনে এখনই সে সব পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু সে ইচ্ছা আজ ছিল না। তাই সে আবার শ্রীপতিকে কহিল,—চান করে এসো একবার, দাদা লক্ষীটি! নাহলে একটা মানুষকে চিরদিনের মনস্তাপ নিয়ে চলে যেতে হবে। তুমিও মানুষ, এটুকু মনে রেখো!

শিবপ্রিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় কথার যে প্রচ্ছন্ন হুলটুকু সে শ্রীপতির মনে ফুটাইয়া দিয়া গেল, বহুক্ষণ ধরিয়া তাহা শ্রীপতির মনে খচ্-খচ্ করিতে লাগিল। স্নান সারিয়া সে আহারে বসিল। মা সম্মুখে বসিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। মা কহিলেন, এবার শিবুকে পেয়ে এমন সোহাগ হয়েছে যে, দেখে আর বাঁচি নে! মেয়েটাকে একেবারে পর করে দিলে! আমার কাছে ঘেঁষ দিতে চায় না মেয়ে! ছেলের শোধ মেয়ের উপর দিয়ে নিলে! কি অশুভ ক্ষণেই যে শিবু আমার এবার শ্বশুরবাড়ী থেকে পা বাড়িয়েছিল!

আহার করিতে করিতে শ্রীপতি ভাবিল, আহার সারিয়া একবার সে নীরজাকে দেখিয়া আসিবে! তবে দেখা হইলে কি বলিবে, ইহাই মহা ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু বিধাতা তাহাকে সে দায় হইতে খুব রক্ষা করিলেন। আহার সারিয়া সে মুখ ধুইতেছে, এমন সময় সংবাদ আসিল, যতীশ বাবু গাড়ী লইয়া হাজির—তাঁহার বাগানে আজ ভারী ধুম। কাজেই আর বসা বা নীরজার সহিত দেখা করা ঘটিয়া উঠিল না। ডিবা-ভরা পাণ পকেটে ফেলিয়া সাজিয়া-গুজিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

দাদার কাণ্ড দেখিয়া শিবপ্রিয়া ঘরের মধ্যে গর্জ্জাইতে-ছিল। এই ভাইয়ের বোন্ সে! ধিক্ তাহাকে!

মা আসিয়া ডাকিলেন,—শিবু, খাবি আয়!

শিবপ্রিয়া বর্ত্তাইয়া গেল। মনের ঝাল কতকটা এবার সে মিটাইতে পাইবে! মার উপর তর্জ্জন করিয়া সে কহিল, আমার ভাত একধারে ঠেলে রেখে ক্ষুধা-নিবৃত্তি করো গে। আমার জন্য এ-বাড়ীর কাকেও ভাবতে হবে না।

—পরের বৌকে ঘরে এনে এ কি দায়ে পড়লুম গা—বলিতে বলিতে মা চলিয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল, বৌটাকে ধরিয়া দুই হাতে যদি তাহাকে একবার পিটিতে পারিতেন, তবেই বুঝি প্রাণের জ্বালা কতক জুড়াইত!

শাশুড়ী ও ননদের কথা নীরজা সকলই শুনিল। শাশুড়ী চলিয়া গেলে শিবপ্রিয়াকে কহিল,—তুমি যাও ঠাকুরঝি, খেয়ে নাওগে। আমি ভালো আছি, এখন যাও ভাই।

শিবপ্রিয়া কিছু বলিল না! রাগে সে কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। নীরজা আবার কহিল,—যাও না ভাই, খেয়ে এসো—

নীরজার মাথায় আইস্‌ব্যাগ চাপিয়া শিবপ্রিয়া কহিল,—এ বাড়ীতে জলগ্রহণ করতে বলো তুমি!

নীরজা এ কথায় বড় আরাম বোধ করিল না। সে কহিল,—যে কটা দিন আর আছি ভাই, একটু শান্তিতে থাকতে দাও! আমায় নিয়ে এই খিটিকিটি—

শিবপ্রিয়া বুঝিল, নীরজার প্রাণের কোন্‌খানে কি ব্যথা বাজিতেছে! সে কহিল,—তুই সেরে ওঠ্ ভাই, প্রাতর্বাক্যে কামনা করচি, তুই সেরে ওঠ্! তার পর আমি তোকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাবো। দেখি, কে তাতে বাধা দেয়! যদি আজ তোর মা বেঁচে থাকতেন তো যেমন করে পারতুম, তোকে নিয়ে গিয়ে তাঁর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতুম!

—তাই দাও ভাই—আমার মার হাতেই আমাকে তুলে দাও। আমারও আর সহ্য হয় না!

শিবপ্রিয়া দেখিল, এ কথাগুলা তোলা ঠিক হয় নাই। রোগীর উত্তেজনা ইহাতে বাড়িতে পারে! তাই সে কহিল,—তুমি তা হলে চুপ করে শুয়ে থাকো। বরফের ব্যাগ মাথায় চাপানো থাক্—আমি চট্ করে মুখে কিছু দিয়ে আসি, কেমন?

—হাঁ, তুমি যাও। ভয় নেই। এর মধ্যে আমি মরে যাবো না। বলিয়া নীরজা হাসিল।

শিবপ্রিয়া চোখ চাহিয়া সে হাসি দেখিল। তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। এ হাসি,—সেই দীপ নিবিবার পূর্ব্বে যেমন একবার দপ্ করিয়া ওঠে, তেমনই! মনে মনে মা-কালীকে ডাকিয়া নীরজার রোগ-পাণ্ডু মুখে সে একবার হাত বুলাইল। এ স্পর্শে তোর সব গ্লানি মুছিয়া যাক্। তার পর বাক্স হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া নীরজার মাথায় ছোঁয়াইয়া সেটিকে আঁচলে বাঁধিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

৬

সেদিন শেষরাত্রে নীরজা কেমন অস্থির হইয়া পড়িল। চোখের চাহনি কেমন এলো-মেলো। বিছানায় পড়িয়া সে ছটফট করিতেছিল। ভিতর হইতে কেমন একটা জ্বালা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠে!

শিবপ্রিয়া তাহারই বালিশে মাথা রাখিয়া সবে-মাত্র একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কাতর কণ্ঠে নীরজা ডাকিল, —ঠাকুরঝি—

শিবপ্রিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল। ঘরের কোণে বাতিটা জ্বলিয়া শেষ হইয়া আসিয়াছে। সে ক্ষীণ আলোকে শিবপ্রিয়া চাহিয়া দেখে, নীরজার মুখে কে যেন কালি মাড়িয়া দিয়াছে! বুঝি, এ মৃত্যুর করাল ছায়া! তাড়াতাড়ি আর একটা বাতি জ্বালিয়া সে ঘরের বাহিরে আসিল, ডাকিল,—সনাতন—

সনাতন বাহিরের দালানে পড়িয়া একটু গড়াইয়া লইতেছিল; কহিল,—কেন মা?

—শীগ্‌গির একবার ডাক্তার বাবুর কাছে যাও, তাঁকে আনো, বাবা—অবস্থা আমি ভাল বুঝ্‌চি না। সনাতন উঠিয়া ডাক্তারের উদ্দেশ্যে ছুটিল।

শিবপ্রিয়া আসিয়া মালিশ, পথ্য প্রভৃতির নানা আয়োজন বাধাইয়া তুলিল। কিন্তু হায়, নিবানো দীপে তৈল দিয়া কি ফল! ভিতর হইতে পুড়িয়া জীবন তাহার পূর্ব্ব হইতেই ছাই হইয়া গিয়াছে, বাহিরের কাঠামোটা কোনমতে খাড়া আছে বৈ ত নয়! আজ এ রোগের প্রবল ধাক্কায় বুঝি সে কাঠামোখানাকেও আর বজায় রাখা যায় না! শিবপ্রিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অসহায় দুর্ব্বল নারী সে,—তাহার এমন কি সাধ্য আছে, যমের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া এই অবহেলিতা উপেক্ষিতা প্রাণীটিকে তাহার গ্রাস হইতে সে ছিনাইয়া লয়!

সহসা রোগীর ঠোঁট নড়িল; ভিতর হইতে মিনতির এক অস্ফুট আবেদন! নীরজার শুষ্ক ওষ্ঠে শিবপ্রিয়া এক চামচ্‌ বেদানার রস ঢালিয়া দিল—নীরজা সাগ্রহে তাহা পান করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তার পর ধীরে ধীরে অতি ধীরে সে চোখের পাতা ফেলিল; দুই হাতে হাতড়াইয়া কিসের যেন সন্ধান করিল! হায় রে, পাথেয় যে তাহার বহুকাল হারাইয়া গিয়াছে! কি সম্বল লইয়া এখন এ দীর্ঘ পথে যাত্রা করে!

শিবপ্রিয়া ঔষধ ঢালিয়া নীরজাকে পান করাইল। নীরজা কহিল,—আঃ! পরে শিবপ্রিয়ার পানে স্থির দৃষ্টিতে সে চাহিল। শিবপ্রিয়া আদর করিয়া দুই হাতে তাহার মুখখানি ধরিয়া চুম্বন করিল, কহিল,—কি চাইছো ভাই, বলো?

নীরজা কোন কথা বলিতে পারিল না—তাহার দুই চোখ বহিয়া শুধু ঝর-ঝর-ধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সারা জীবনের উপেক্ষার বেদনা আজ এ কাতর অশ্রুর মধ্য দিয়া অজস্র উৎসারিত হইতেছে। শিবপ্রিয়া ভাবিল, হায় বোন, এতদিন যদি নীরবে সব সহিয়া আসিলি,—আপনার তেজে এ উপেক্ষা গ্রাহ্যও করিলি না, তবে এ নিদান-সময়ে কিসের জন্য এ দুর্ব্বলতা! সে দুর্ব্বলতা আর কেনই বা দেখাস দিদি! তোর পানে কেহ যখন চাহিয়া দেখিল না, তখন তুই-ই বা কাহার জন্য আজ এতখানি কাতর হইতেছিস্‌!

ডাক্তার আসিয়া ইঞ্জেক্‌সন দিলেন। কিছুক্ষণ পরে রোগী যেন একটু শক্তি পাইল। ডাক্তার বাহিরে বসিয়া রহিলেন—শিবপ্রিয়া তাঁহার দুই পা জড়াইয়া কাঁদিয়া কহিল,—আপনি আজ দয়া করে থাকুন—যত টাকা চান, দেবো। তারপর সে সনাতনকে কহিল,—তোমার বাবুকে একবার শীগ্‌গির ডেকে নিয়ে এসো, সনাতন। গাড়ী করে ছুটে যাও। বলোগে, বড় বিপ এখানে!

সনাতন বীরেনের উদ্দেশ্যে ছুটিল।

নীরজা আর একবার কথা কহিল, ডাকিল,—ঠাকুরঝি—

শিবপ্রিয়া বর্ত্তাইয়া গেল। তবে এ ধাক্কা কাটি বুঝি! সে কহিল,—বল্‌, তোর যা কিছু বলব আছে, সব খুলে বল্‌। আমি এই তোকে আগ্‌লে বা রইলুম। দেখি, আমার কাছ থেকে কে আজ তো ছিনিয়ে নেয়!

সতীর মুখে তেজের দৃপ্ত রেখা ফুটিয়া উঠিল একবার সে কোন্‌ যুগে সতীর মুখে এমনই তেজ দেখি যমের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল! আজও এ-বেন রাে রাণী জগদ্ধাত্রী-মূর্ত্তিতে আর-এক সতী নীরজাকে র করিবার জন্য বুক দিয়া দাঁড়াইয়াছে! দুর্জ্জয় তে প্রাণ তাহার বলীয়ান্‌ হইয়া উঠিল।

নীরজা অতি-কষ্টে থামিয়া থামিয়া কহিল,—স তুমি, আশীর্ব্বাদ করো, ফিরে জন্মে যেন তোমার মত বর নিয়ে পৃথিবীতে আসি—এ বড় কষ্ট ভাই, সওয়া যায় না

হায়রে, তবু সে সকলই সহিয়া আসিয়াছে! অ কাহারও প্রাণ হইলে কবে বুঝি ভাঙ্গিয়া যাইত—ঝি এ যে নারীর প্রাণ, বড় কঠিন! সব সয়, তবু ভাঙ্গি জানে না!

কিন্তু তবু সহ্যের একটা সীমা আছে। নীরজ প্রাণ সে সীমার একবারে কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াে তাহাকে আর ধরিয়া রাখা গেল না। সেদিন সন্ধ্যা সময় ঘরে ঘরে যখন মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছে, ঠি সেই সময় তাহার সকল অকল্যাণ হইতে নীরজা মু লাভ করিল। সংসার তাহাকে বিদায় দিয়া আঁধা ভরিয়া গেল।

৭

শাশুড়ী জামাতার কাছে মিনতি জানাইয়া শি প্রিয়াকে আরও কয়দিন আপনার গৃহে ধরিয়া রাখিব অনুমতি আদায় করিল; কিন্তু মা ও মেয়ের মা কথা ছিল না। শত সাধ্য-সাধনা করিয়াও মে মুখে মা একটু জল অবধি দেওয়াইতে পারিলেন ন তাঁহার তখন আশঙ্কা হইল, পরের মেয়ের প্রতি পাপ করিয়াছেন, তাহার ফলে বুঝি আজ নিে মেয়েটিকে হারাইতে হয়! তাই সনাতনকে কহিলেন,—তুমি ভাই বীরেনকে খবর দাও—সে এসে ওকে নি যাক্‌। না হলে দেখচো তো, এখানে রাখলে বাঁচানো যাবে না।

সনাতন অগত্যা বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিল।

বহুদিন পরে শ্রীপতিও আজ ঘরে ফিরিয়াছে। াড়ীতে পা দিয়া সে বুঝিল, সেখানে মস্ত একটা বপর্যায় কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। সারা বাড়ী যেন আজ াহাকে গিলিবার জন্য হাঁ করিয়া রহিয়াছে! নীরজার প্রতি আন্তরিক টান না থাকিলেও বাড়ীটা আজ াহার কাছে নিতান্ত শূন্য বোধ হইতে লাগিল। ব থাকিলেও যেন আজ কিছু নাই, এমনই ভাব ড়ীটার প্রত্যেক ইষ্টক-খণ্ডে—প্রত্যেক প্রত্যঙ্গে বধি লাগিয়া রহিয়াছে। বাড়ীতে যেন এক মুহূর্ত্ত ষ্ঠানো যায় না!

না যাক্, বাড়ীর প্রতি কোন দিনই তাহার মায়া দ না—আজও নূতন করিয়া মায়া পড়িল না। তবে ক্ষ মার কাছে প্রয়োজন ছিল; গোটাকয়েক টাকা চাই বাগানের আমোদে এ-দফায় তাহারই উপর খরচের র পড়িয়াছে। না দিলে মান থাকে না। সেই টাকা টা লইয়া কোন-মতে এখন সরিয়া পড়িতে পারিলেই বাঁচিয়া যায়!

ভিতরে পা দিতে মা ছেলেকে দেখিয়া শোকে ডুক- । কাঁদিয়া উঠিলেন। ছেলে আসিয়া মার কাছে বসিল মা তখন সপ্তমে সুর চড়াইলেন! শিবপ্রিয়া ব্যাপার বোর জন্য সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল! তাহার মুখে জ কোন কথা নাই, দৃষ্টি স্থির, মূর্ত্তি রুক্ষ! কে যেন ারে ক্ষোদা প্রাণ-হীন একটা পুতুলকে আনিয়া সেখানে করাইয়া দিয়াছে! উপেক্ষিতা নীরজার স্মৃতির য থাকিয়া থাকিয়া তপশ্চারিণী সর্ব্বত্যাগিনীর মতই টা ভাব তাহার মুখে চোখে আঁটিয়া গিয়াছে!

কাঁদিতে কাঁদিতে ইনাইয়া বিনাইয়া মা কহিলেন, গৃহ পাষাণের মত তাঁহার বুকে বসিতেছে। পুত্রের এ লক্ষীছাড়া দীন বেশও তিনি আর চক্ষে দেখিতে পারেন না! ও-পাড়ার পার্ব্বতী একটি মেয়ের কথা বলিতেছিল —পুত্রের কোনো আপত্তি তিনি কাণে তুলিবেন না!

শিবপ্রিয়ার সারা অঙ্গ বহিয়া বিদ্যুতের একটা তীব্র দাহ ছুটিল। তাহার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তবু ঝড় আসন্ন দেখিয়াও জীর্ণ গৃহের অধিবাসী যেমন আকাশের পানে হতবুদ্ধিভাবে চাহিয়া থাকে, তেমনই ভাবে মা ও ভাইয়ের পানে সে চাহিয়া রহিল—চোখ পলক-হীন, অচঞ্চল!

শ্রীপতি বুঝিল, টাকা-আদায়ের চমৎকার সুযোগ মিলিয়াছে! নত মুখে গাঢ় স্বরে সে কহিল,—তোমার কথা আমি কবে ঠেলেচি মা, বলো!

দুইখানা চঞ্চল মেঘে ঠোকাঠুকি হইলে অশনি যেমন গর্জ্জিয়া ওঠে, শিবপ্রিয়া ঠিক তেমনই ভাবে গর্জ্জিয়া উঠিল। সে ডাকিল,—সনাতন—

কয়দিনের রুদ্ধ বাণী নিমেষে যেন এক প্রলয়-হুঙ্কারে মুক্ত হইয়া গেল। মাতা-পুত্র উভয়েই সে স্বরে শিহরিয়া শিবপ্রিয়ার পানে চাহিলেন।

সে স্বরে চমকিয়া প্রভু-গৃহ-গমনোদ্যত সনাতন আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল—চাহিয়া দেখিল, মার এ কি করালিনী মূর্ত্তি! চোখে যেন প্রলয়ের আগুন জ্বলি- তেছে!

শিবপ্রিয়া কহিল,—সনাতন, এখনই গাড়ী নিয়ে এসো। আমি চলে যাবো, এখনই চলে যাবো! এ বাড়ীতে আর এক মুহূর্ত্ত থাকবো না। এ বাড়ীতে যদি আর কখনও জলগ্রহণ করি তো আমি বাপের বেটী নই!

কথাটা বলিয়া বিদ্যুতের মত সেখান হইতে সে সরিয়া গেল। মা ও শ্রীপতি বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত!

স্বর্ণমৃগ

জ্ঞাতিদের সহিত মকর্দ্দমা করিয়া সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি আদালতে উকিল-পেয়াদার হাতে তুলিয়া দিয়া কালীনাথ পত্নী ও পুত্রের হাত ধরিয়া গঙ্গার তীরে চাতরায় আসিয়া আশ্রয় লইলেন। এ বয়সে টাকার শোক তাঁহার প্রাণে শেলের মত বাজিল। কিন্তু উপায় কি? কোন দিনই তিনি পরের চাকরি করেন নাই—এখন এ-বয়সে বুকে আগুন চাপিয়া চাকরি করিবেন, সে শক্তি তাঁহার নাই! কাজেই নিরাশ চিত্তে নিরুপায় কালীনাথ পূজা অর্চনায় সহসা অতিরিক্ত মনঃসংযোগ করিলেন। পুত্র মহিম বড় হইয়াছে। খুঁজিয়া-পাতিয়া শ্রীরামপুরের কলে সামান্য একটা চাকরির যোগাড় করিয়া কোনমতে সে নিরাশ্রয় পরিবারে একটু ক্ষীণ অবলম্বনের সৃষ্টি করিল। ত্রিশ টাকা মাহিনা, পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র সংসার—তাহাতেই কোনমতে কায়ক্লেশে দিন চালানো ছাড়া উপায় রহিল না! পূজার আসনে বসিয়া কালীনাথের মন ক্ষোভে-দুঃখে হু-হু করিয়া জ্বলিতে থাকে। শ্মশানবাসিনী শ্যামার রূপ ধ্যান করিতে গিয়া সিন্দুক-ভরা নোট ও কোম্পানির কাগজের চিন্তায় মন ভরিয়া যায়। ক্ষুদ্র গৃহের অন্ধকার কোণে ছোট তামার টাটে দুই চারি টুকরা ফুল-বিল্বপত্র দেখিয়া সাতপুকুরের বাস্তভিটার সেই প্রকাণ্ড পূজার দালান, অজস্র পুষ্পাদিভূষিত সুবৃহৎ পুষ্পপাত্রের ছবি মনের মধ্যে ফুটিয়া ওঠে! সিংহবাহিনী দশভুজা দেবীর হাস্যময়ী মূর্ত্তি, ধূপ-ধুনার গন্ধে চারিধার সুরভিত, আরতি ও চণ্ডীপাঠের বিরাট ধুম; পূজার দালান সমবেত আত্মীয়-কুটুম্বে ভরিয়া গিয়াছে, ফটকের সম্মুখে সজ্জিত নহবৎমণ্ডপ হইতে মঙ্গল-বাদ্যের বিচিত্র সুর ছুটিয়াছে—কি সে আড়ম্বর-সমারোহ! হায়, কাহার পাপে মা আজ এমন বিমুখ হইলেন? কাহার শাপে আজ তিনি রাজা হরিশ্চন্দ্রের মত গৃহ-হারা, নিঃস্ব, কপর্দ্দকহীন! সাতপুকুরের সে ভিটায় সন্ধ্যার দীপ আজ জ্বলে কি না সন্দেহ! চপলা লক্ষ্মীর অন্তর্দ্ধানের সহিত সে গৌরব, সে সম্মান কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে! রাজার হালে যেখানে দিন কাটিয়াছে, সেখানে আজ ভিখারীর মত বাস করিতে হয়! তাই বুঝিয়া-সুঝিয়া কালীনাথ চির-জন্মের বাস উঠাইয়া সুদূর চাতরায় আসিয়া অজ্ঞাত-বাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পূজা-শেষে আপনার ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিবার সময় স্বতঃউৎসারিত নির্ঝর-ধারার মতই কালীনাথের অন্তর মথিত করিয়া বাসনার রাশি ঝরিয়া পড়ে—আবার সব ফিরিয়ে দাও, মা—ফিরিয়ে দাও। এ লক্ষ্মীছাড়া দশা আর সহ্য হয় না!

২

চাতরায় প্রসিদ্ধ বুড়াশিবের তলায় আজ কয়দিন হইল, কোথা হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। সন্ন্যাসীর শক্তি অসাধারণ—ইহারই মধ্যে তাঁহার আশীর্ব্বাদে দুই-চারিজন দুরারোগ্যের রোগ সারিয়াছে, বেচারা উপায়-হীনের চাকরী মিলিয়াছে, বন্ধ্যার সন্তান-সম্ভাবনা হইয়াছে! কালীনাথ গৃহে বসিয়া বিশ্বস্ত সূত্রে যখন সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তির কাহিনী শুনিলেন, তখন তাঁহার প্রাণে ঈষৎ আশার সঞ্চার হইল। ভাঁটা-পড়া জীবনে জোয়ারের মৃদু স্রোত বহিবারও সূচনা দেখা দিল। চক্ষু মুদিয়া কালীনাথ দেবীর উদ্দেশে কহিলেন, দয়া কি তবে হলো মা—পাষাণী? এত দিনে তোর মন টলেছে!

প্রাতে গঙ্গাস্নান সারিয়া তসরের থান পরিয়া গায়ে নামাবলী দিয়া কালীনাথ যাইয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পা-দুইটা জড়াইয়া ধরিলেন। সন্ন্যাসী কহিলেন,—বৈঠো বেটা, বৈঠো।

কালীনাথ কহিলেন,—আমি তোমার সন্তান, তু পিতা!

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি চাই

কালীনাথ কহিলেন,—শুধু সেবা! শেষ জীবন সাধু-সেবাতেই যেন কাটিয়া যায়! ইহা-ছাড়া তাঁহ আর-কোন কামনা নাই!

তার পর সন্ন্যাসীর সহিত কালীনাথের ইহকা পরকাল, বেদ-বেদান্ত, মায়া-প্রপঞ্চ, ব্রহ্ম ইত্যাদি ন জটিল বিষয়ের আলোচনা হইয়া গেল। রামমণি আ সন্ন্যাসীর জন্য এক-বাটি দুধ, চক্রবর্ত্তীদের বিধবা ব সুরবালা আসিয়া ফল ও মিষ্টান্নপূর্ণ পাত্র রাখিয়া গে যখন আলোচনা থামিল, তখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া সন্ন্যাসী দুই-চারি টুকরা ফল ও মিষ্টান্ন-গ্রহণান্তে পা দুগ্ধটুকু নিঃশেষ করিয়া শান্ত স্বরে কালীনাথাক কহি —যা বেটা, পরসাদ্ লে। ঘর্ যা!

কালীনাথ ভক্তিভরে প্রসাদ মুখে দিয়া পাত্র-দু গঙ্গাজলে মার্জ্জনা করিয়া সন্ন্যাসীকে প্রণামান্তে বি গ্রহণ করিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন-কালে মনে মনে প্র করিলেন—মা গো, শান্তি দাও—আর এ কাঞ্চনের মা দগ্ধাইয়ো না!

৩

সেই দিন হইতে সন্ন্যাসীর কুটীরে কালীনাথের দিবসের অধিকাংশ সময় কাটিতে লাগিল। গৃহিণী কহিলেন,—ওগো, সময়ে খাওয়া না হলে তোমার অসুখ করবে! কখনও অভ্যাস নেই—বিশেষ এই বয়সে—

কালীনাথ কহিলেন,—তুমি বোঝো না। আমার মন বিষয়-বিষে জ্বলে যাচ্ছিল,—এই মহাপুরুষের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে সে জ্বালা যদি জুড়োতে পারি, তারই চেষ্টা করচি। পূজা করি, অর্চ্চনা করি, তবু টাকার শোক ভুলতে পারি না! দিবারাত্রি কেবলই মনে হয়, কি করলে আবার সব ফিরে পাব! জানি, সে আর ফেরবার নয়, তবু কি যে মন, কিছুতেই বোঝে না।

মোক্ষদা কহিলেন,—এ যে অদ্ভুত তোমার বায়না! শোক কি আমারও লাগে নি? মহিম দুধের বাছা, তার তাঁবে কত লোক ফিরেচে, কাজ করেচে, বাছা নিজের হাতে জলটুকু অবধি কখনও গড়িয়ে খায়নি! আর তুমি? তোমার চিরদিন দানধ্যান করা, ভালো খাওয়া, ভালো পরা অভ্যাস—তার কোন্‌টা আজ বরাতে জুটচে! ভেবে কি করবে বলো—যত ভাববে, ততই মন হু-হু করবে! উপায় নেই! তার চেয়ে যে দশায় যখন থাকা যায়, সেই দশাতেই মানিয়ে-বনিয়ে থাকলে মন বশে থাকে, শান্তিও তাতে মেলে!

কালীনাথ বলিলেন,—এ সব কথা কি জানি না? জানি। তবে মন আমার বড় দুর্ব্বল! দেখি, এই সাধু-বাবার সঙ্গগুণে মনকে যদি বাঁধতে পারি!

কালীনাথ চলিয়া গেলেন।

সে-দিনকার আলোচনায় কথায়-কথায় যোগী-ঋষিদের অলৌকিক শক্তি-সামর্থ্যের প্রসঙ্গ উঠিল। যোগের অদ্ভুত ক্ষমতা, আধুনিক কালে যোগ-সাধনে কে কবে ত্রিকালজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, সে সকল কথাও বাদ গেল না। সন্ন্যাসী তাঁহার হিমাচল-গুহাবাসী গুরুদেবের কথা পাড়িলেন—পরে সহসা ঝুলির ভিতর হইতে ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডের মত কি-একটা পদার্থ বাহির করিয়া কহিলেন,—এ চীজ্‌ঠো কেয়া, বাতলাও!

ভালো করিয়া দেখিয়া কালীনাথ কহিলেন,—পাথর।

সন্ন্যাসী কহিলেন,—হাঁ পাথরই। কিন্তু এ পাথর সামান্য পদার্থ নয়। ইহারই নাম কামনা-মণি! ইহা হাতে লইয়া যে-কামনা করা যায়, তাহাই সিদ্ধ হয়—এমন ইহার অলৌকিক শক্তি! বহু যাগ-যজ্ঞে এ পাথরে এই শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে। তবে তিনটি মাত্র কামনা সিদ্ধ হইবে, তাহার অধিক নয়।

কালীনাথের বুকটা ধ্বক্‌ করিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন,—তিন কামনা সিদ্ধ হবে?

সন্ন্যাসী কহিলেন,—হাঁ, বেটা।

তিন কামনা! কালীনাথের মনে হইল, ঘর-বাড়ী, বিষয়সম্পত্তি, সমস্তই তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র প্রস্তর-খণ্ডটির আয়ত্তে! তাঁহার মাথা দপ্‌ দপ্‌ করিয়া উঠিল। কি করিলে এ প্রস্তর-খণ্ডটি পাওয়া যায়? চাহিব কি? যদি সন্ন্যাসী না দেন! এমন জিনিস কেন তিনি হাত-ছাড়া করিবেন! আবার সন্দেহ হইল, এ কি সম্ভব! এমন পাথর যাঁহার কাছে, লোটাকম্বল সার করিয়া এমন-ভাবে নদীর তীরে গাছের তলাতেই বা তিনি পড়িয়া থাকেন কেন? রাজার ঐশ্বর্য্য—ঐশ্বর্য্য কেন, একটা রাজত্বই হাতের মুঠায় টানিয়া আনিতে পারেন! তবে? কালীনাথ ভাবিলেন, আমিও যেমন পাগল, তাই এ বুজরুকিতে ভুলিতে বসিয়াছি! কিন্তু সন্ন্যাসীর এ বুজরুকি দেখাইবার কারণ কি? তাঁহার কাছ হইতে একটি পয়সা আদায় করিবার সম্ভাবনা নাই তো! তবে?

সন্ন্যাসী কহিলেন,—কেয়া বেটা,—তেরা সংশয় হোতা?

কালীনাথ অপ্রতিভ হইলেন। সন্ন্যাসী মনের কথা টের পাইয়াছেন! একটা ঢোক গিলিয়া তিনি কহিলেন, না—না প্রভু। কালীনাথ অস্থির হইয়া উঠিলেন। কি বলিয়া মণিটি চাওয়া যায়? চাহিলে তাঁহার লোভ দেখিয়া সন্ন্যাসী যদি ক্রুদ্ধ হন? তাই তো!

কিন্তু সন্ন্যাসী নিজেই সকল দ্বিধা, সকল সঙ্কোচ দূর করিলেন। তিনি কহিলেন, কালীনাথের সেবায় তিনি পরিতুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারও গুরুদেবের চরণে ডাক পড়িয়াছে—চলিয়া যাইতে হইবে! তাই যাই[illegible] পূর্ব্বে এই যোগি ধ্যান-দুর্লভ মণিটি তিনি কালীন[illegible]কেই দিয়া যাইবেন। তবে কৌতূহল চরিতার্থ করিব[illegible]র জন্য যেন মণির গুণ-পরীক্ষায় কালীনাথ কোনদিন উদ্যত না হন, সে বিষয়ে সন্ন্যাসী বিশেষভাবে নিষেধ করিলেন। কারণ, গৃহীর পক্ষে ফল অশুভ হইবারই বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে! তবে ইহার দ্বারা, চাই কি, পরমার্থও লাভ করা যাইতে পারে!

৪

সে দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে হইতেই আকাশের কোণে ঘন-কালো মেঘ পুঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল। চাষার দল পূর্ব্বাহ্লেই বলদ তাড়াইয়া গ্রামের পথে ধূলি উড়াইয়া মাঠ হইতে নিরাপদ কুটীরে ফিরিয়া গিয়াছে। মেঠো পথের ধারে দোকানদার ঝাঁপ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি ক্ষুদ্র দোকান বন্ধ করিতেছিল। শুধু কলের চিমনির ধোঁয়া স্থূল সর্পের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া তখনও ঊর্দ্ধে উঠিবার চেষ্টা করিয়া মধ্য-পথে বাধা পাইয়া ক্ষুব্ধ রোষে ফুলিয়া

উঠিতেছিল। পল্লী-রমণীর দল আসন্ন ঝড়বৃষ্টির লক্ষণ বুঝিয়া কুম্ভ ভরিয়া জল লইয়া আঁধার পথে রূপের আলো ছিটাইয়া গৃহে ফিরিয়াছেন—তাঁহাদের কমল-চরণের কোমল চিহ্ন তখনও পথের ধূলির উপর জলের রেখায় আঁকা রহিয়াছে, সম্পূর্ণ মিলাইয়া যায় নাই। মসীকৃষ্ণ কাগজে লাল পেন্সিলের মত কে যেন থাকিয়া থাকিয়া আকাশের বুকে আগুনের দাগ টানিয়া দিতেছে।

ঠিক সন্ধ্যার সময় কর্মচারীদের প্রাণে বিরাম-আনন্দের আভাস জাগাইয়া কলের বাঁশী বিপুলভাবে বাজিয়া উঠিল। বৃষ্টিও অমনি সেই সঙ্গে ঝম্-ঝম্ শব্দে আকাশ ফাটিয়া ঝরিয়া পড়িল। কাগজে জুতাজোড়া ঢাকিয়া বুকে চাপিয়া, ছিন্ন ছত্রের মধ্যে কোনমতে মাথা রক্ষা করিয়া মহিম প্রায়-ভিজিয়া বাড়ী ফিরিল। মা আসিয়া গামছায় মাথা মুছাইয়া দিলেন। মহিম কাপড় ছাড়িয়া ঘরে ঢুকিল। কালীনাথ তখন আহ্নিকে বসিয়াছেন।

বৃষ্টির বেগ ক্রমশ বাড়িয়া উঠিতেছিল। কালীনাথ আহ্নিক শেষ করিয়া ধীরে ধীরে ঘরের জানলা খুলিলেন। বাহিরে গাঢ় অন্ধকার—অবিশ্রান্ত বৃষ্টি—আর একটা আর্ত্তনাদের সুর সেই বিপুল স্তব্ধতা ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—যেন নৈশ-প্রকৃতি এ-বৃষ্টির অত্যাচারে জর্জ্জরিত ব্যথিত হইয়া বেদনায় কাতর রব করিতেছে! কালীনাথ জানলা বন্ধ করিয়া দিলেন।

মহিম আসিয়া কহিল,—আপনি না কি, কি-এক কামনা-মণি পেয়েচেন, বাবা?

কালীনাথ বুঝিলেন, পত্নীর মুখে পুত্র তাহা হইলে এ সংবাদটুকু পাইয়াছে। তবু তিনি মণির কথা পুত্রের কাছে আর একবার খুলিয়া বলিলেন।

শুনিয়া মহিম কহিল,—আপনিও যেমন! এ কথা বিশ্বাস করেন! তা হলে ও সন্ন্যাসীই বা এমন এ-দেশ সে-দেশ করে ঘুরে বেড়াবে কেন? নির্ব্বাণ কামনা করে পৃথিবীর সঙ্গে সব সম্পর্ক কাটিয়ে ফেলতে পারতো।

কালীনাথ কহিলেন,—ওঁরা কি জন্য ঘুরে বেড়ান, আমরা গৃহী সংসারী লোক, কি বুঝবো, বলো? কত জায়গায় কত রকমে কত জীবের ওঁরা মঙ্গল করে বেড়ান, তার কি আর সংখ্যা আছে? জটা কৌপীন কত লোকেই নিচ্ছে—তার ভেজালই বেশী, তবে তারি মধ্য থেকে আসল মহাত্মাকে বেছে নেবার ভাগ্য ক'জনের থাকে? সে সুকৃতিই বা ক'জন করেচে?

মহিম কহিল,—ইনি যে ভেজাল নন্, তা কি করে জানলেন?

কালীনাথ কহিলেন,—মানুষের মনই তা বলে দেয়। তা ছাড়া ইনি এমন-একটা মণি আমায় দিয়ে গেলেন, অথচ কোন দিন একটা পয়সা অবধি আমার কাছ থেকে পান নি, বা তার প্রত্যাশা করেন নি! আচার-ব্যবহারও দেখলুম। এই-যে এত লোক [illegible] পত্তর নিয়ে গেল, কারো কাছ থেকে একটা [illegible] অবধি উনি নেন্ নি! আসল কথা কি জানো, ঐ গেরুয়া কাপড় আর জটা-কৌপীন দেখলেই আমাদের ভক্তি-শ্র[illegible] করা উচিত—বেশীর ভাগ মেকি হলেও তার মধ্যে আসলটিও মিলতে পারে তো! গেরুয়া দেখলেই যদি খাপ্পা হয়ে তাড়া করি, তা হলে মেকির সঙ্গে আসলটিকে[illegible] হয়ত কোন্ দিন হারিয়ে বসবো!

মহিম বলিল,—আচ্ছা, বেশ—ওঁর মণির গুণ আগে দেখি, তার পর ওঁকে মানবো। না হলে ছেঁদো কথায়—

কালীনাথ বলিলেন,—কিন্তু উনি বলেচেন,—অদৃষ্টই মানুষের সব। তা ছাড়া চলবার উপায় নেই। অদৃষ্টকে বাধা দিতে গেলে—খুব সবল না হলে—খারাপ হবার[illegible] আশঙ্কা বেশী।

মহিম বলিল,—ও আমি মানতে চাই না, বাবা। অদৃষ্ট বলে আমাদের হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলে না। অদৃষ্টে আহার আছে বলে এক অন্ধকার বনে পাহাড়ের গুহার মধ্যে বসে থাকলে আহার অবশ্য আপনি এসে মুখে পড়বে না—তার জন্য চেষ্টা আমাদের করতে হবে। পুরুষকার চাই। উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ। অদৃষ্টের দোহাই মেনে আমাদের দুর্দ্দশাটা কি হয়েচে, দেখুন, আর পৃথিবীর অন্য-অন্য জাত পুরুষকারের আশ্রয় নিয়ে কি কাণ্ডই ঘটাচ্ছে! আমি যদি অদৃষ্ট মেনে চুপ করে বসে থাকি, তা হলে এই কলের চাকরিতে ভবিষ্যতে আমার কি উন্নতি হতে পারে? কিছু না। আর আমি যদি রীতিমত খাটি, মাথা ঘামিয়ে দু-চারটে মৎলব বার করতে পারি, তবেই না ঝাঁ করে আমার উন্নতির সম্ভাবনা ঘটে?

কালীনাথ দেখিলেন, এ যুক্তি অকাট্য বটে! তবু অদৃষ্টে যদি উন্নতি থাকে, তবেই মানুষের পুরুষকারে মতি হয়! তেমনি, অদৃষ্টে যাহার উন্নতি নাই, সে আপনা হইতে কেমন অলস উদাসীন থাকিয়া যায়—আগ্রহ বা উৎসাহ পুরুষকারের দিকে তাহার চৈতন্যকে জাগ্রত করিতে পারে না। কিন্তু পুত্রের সহিত তর্ক বাড়াইবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মত সেই দুর্ল্লভ মণির সাহায্যে ঐন্দ্রজালিক উপায়ে একটা বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া তুলিবার দিকে তাঁহার মন অত্যন্ত তাড়া দিতেছিল। তাই তিনি তর্কটাকে সেই-খানে মুলতুবি রাখিয়া কহিলেন,—এখন মণিটা যখন পাওয়া গেছে, তখন দেখা যাক্ না, তার যথার্থ কোন গুণ আছে কি না!

মহিম বলিল,—বেশ! যে করে হোক, একটা [illegible] করা নিয়ে কথা—মণি ঘাঁটতে আমার কিছুমাত্র আ[illegible] নেই!

মোক্ষদা আসিয়া কহিলেন,—ওগো, না না, ও-সব জিনিষ নিয়ে নষ্টি-নাষ্টি করো না। হাসি-তামাসার সামগ্রী নয় ও। সন্ন্যাসী ভয় দেখিয়েচেন, বিপদও ঘটতে পারে। তখন কাজ কি বাবু—ঘাঁটাঘাঁটি করে? দেবতার জিনিষ, গেরস্ত-ঘরে রাখতেও নেই—কাল ওঁকে গঙ্গায় দিয়ে এসো।

বিপদের কথা মনে হইবামাত্র কালীনাথের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণে মনে হইল, বিপদ আবার কি!

মহিম হাসিয়া কহিল,—কেন তুমি বাধা দিচ্ছ, মা? ত্যাখো না মজা, কেমন ভেল্কি চলে! নুড়িটা কৈ বাবা?

তামার টাট্ হইতে ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডটি তুলিয়া কালীনাথ মহিমের হাতে দিলেন। দেখিয়া মহিম বলিল,—এইটুকু ত নুড়ি! এর আবার অত মুরোদ!

মোক্ষদা নুড়ির উদ্দেশে প্রণাম করিয়া জিভ্ কাটিয়া কহিলেন,—ষাট্! ষাট্! অমন কথা বলতে আছে!

মহিম কহিল,—এক কাজ করা যাক্। আপাততঃ কিছু টাকা চাওয়া যাক্! কি বলেন! একেবারেই বেশী নয়, এই হাজার চার-পাঁচ। একদম্ বেশী চাইলে কি জানি, শেষে হাতে হাতকড়ি অবধি যদি ওঠে। দেখি, এই চার পাঁচ হাজার যদি পাওয়া যায়, তার পর নয় দু'দশ লাখ চাওয়া যাবে। কি বলেন?

কালীনাথেরও সেই কথা মনে হইতেছিল। লাখ টাকা চাহিলে, কে জানে, মিলিবে কি না! অতি লোভ দেখিয়া দেবতা যদি বিরূপ হন্। প্রথমে অল্প চাহিয়াই দেখা যাক্। কথাতেও বলে,—শনৈঃ পন্থা। বেশী চাহিতে ভয়ও করে। তিনি কহিলেন,—বেশ, দেখাই যাক্! এতে ভয়টাই বা কি!

মহিম বলিল,—তা হলে আপনিই কামনা করুন। আপনি আহ্নিক সেরে উঠেচেন, শুদ্ধ কাপড়, কি জানি—তার জন্ত যদি আবার কোন ব্যাঘাত ঘটে। আপনি চাইলে ও সব অশুচি-ফশুচির হাতও এড়ানো যাবে।

মোক্ষদা বাধা দিয়া বলিলেন,—ওগো, না গো না,—কাজ নেই। কে জানে, বাবু, কি অনর্থ ঘটবে শেষে!

—অনর্থ আবার কি মা—অর্থই ঘটবে, তুমি দেখো।

কালীনাথ প্রস্তরখণ্ড হাতে লইলেন; মাথায় ঠেকাইয়া মুঠিতে ভরিয়া নিমীলিত নেত্রে কামনা করিলেন, হে ঠাকুর, পাঁচ হাজার টাকা—কথা শেষ করিবার পূর্ব্বেই তিনি চমকিয়া চীৎকার করিয়া প্রস্তরটি সবলে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। মোক্ষদা কহিলেন,—কি হলো?

কালীনাথ তখনও কাঁপিতেছিলেন; কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন,—নুড়িটা হাতে আগুনের মত গরম ঠেকলো। কি—ভারী গরম!

মোক্ষদা স্বামীর মুখের পানে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন,—দেখ দেখি বাবু, বারণ করলুম, তবু তুমি শুনলে না—এখন কি হতে কি হয়!

মহিম প্রস্তরখণ্ডটা কুড়াইয়া লইয়া বলিল,—কৈ গরম, বাবা—দেখুন ত!

কালীনাথ ও মোক্ষদা উভয়ে স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, না, পাথর বেশ ঠাণ্ডা, একটুও গরম নয়! কালীনাথ কহিলেন, কিন্তু ভারী গরম ঠেকেছিল।

মহিম বলিল,—মা, ধামা কি থলে যা-হয় একটা ঠিক করে রাখো। আলিবাবার টাকার মত শেষে ওজন করে না নিতে হয়! বলো কি, নগদ পাঁচ-পাঁচ হাজার টাকা! কিন্তু কোথা থেকে এ টাকাটা আসবে, বাবা? দেবে কে? সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর নিজেই বয়ে নিয়ে আসবেন না কি?

কালীনাথ কোন কথা বলিলেন না, ধুনাচির দিকে চাহিয়াছিলেন, সেই দিকেই চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, ঐ যে ধুনাচি হইতে মৃদু ক্ষীণ ধূমের রেখা বাহির হইতেছে, ওটা ক্রমেই যেন জটাজালের মত দীর্ঘ ঘন হইয়া উঠিতেছে; এবং ঐ ঘন ধূমের মধ্য হইতে কালো দৈত্যের মত ভীষণ মূর্ত্তি লইয়া কে-একজন ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইতেছে। চোখ তাহার আগুনের গোলার মত লাল টক্‌টক্ করিতেছে। প্রকাণ্ড মুখে কড়ির মত দাঁত—সেই দাঁতগুলায় বিকট হাসি সে ফুটাইয়া তুলিয়াছে! ঐ যে, হাতে তাহার এক প্রকাণ্ড থলি। সেই থলি ঝাড়িয়া হুড়-হুড়্ করিয়া সে টাকা ঢালিয়া দিতেছে! কালীনাথের মাথা ঘুরিতে লাগিল। তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন।

৫

যখন চোখ চাহিলেন, তখন ভোর হইয়াছে। ঘরের জানালা খোলা। বাহিরে গুড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে এবং জলো হাওয়া খোলা জানালার মধ্য দিয়া আসিয়া তাঁহার ললাটে-মাথায় স্নিগ্ধ পরশ বুলাইতেছে। মহিম কহিল,—একটু দুধ খাবেন?

কালীনাথ দেখিলেন, কোথায় দৈত্য! কোথায় কি! তিনি বিছানায় শুইয়া আছেন, তাঁর মাথার শিয়রে দাঁড়াইয়া মহিম।

কালীনাথ কহিলেন,—শরীরটা বড় দুর্ব্বল বোধ হচ্ছে!

মোক্ষদা নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন, কহিলেন,—একে কাল একাদশী গেছে, সারাদিন উপোস, তার উপর রাত্রে কিছু মুখে দিলে না—এতে আর কাহিল হবে না? এখন একটু দুধ এনে দি—খাও। কি বলো?

কালীনাথ কহিলেন,—দাও।

দুগ্ধ পান করিয়া কালীনাথ প্রকৃতিস্থ হইলেন।

বেলা ক্রমে নয়টা বাজিল। আহারাদি শেষ করিয়া মহিম অফিস যাইবার পূর্ব্বে পিতার কাছে আসিল। কালীনাথ তখন শয্যায় বসিয়া মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্ খুলিয়াছেন। মহিম কহিল,—কৈ বাবা, টাকা ত এল না। এদিকে ন'টা বেজে গেছে। আর তো অপেক্ষা করতেও পাচ্ছি না। মোদ্দা আমি শুধু ভাবচি, এতগুলো টাকা,—দেবে কে?

কালীনাথ কোন কথা বলিলেন না। রাত্রের সেই জাগিয়া-দেখা-দুঃস্বপ্নের ছবি তাঁহার মনে আবার সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। বুক কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই হাসি পাইল। কোথায় কি, আর তিনি সেই ধূনাচির মৃদু ধূমে কৃষ্ণকায় ভীষণ দৈত্যের আবির্ভাব দেখিলেন। মানুষের মন এমন অদ্ভুত কুসংস্কারেও আচ্ছন্ন হয়। একটা নুড়ি কি না পাঁচ হাজার টাকা আনিয়া দিবে! হায়রে, টাকার শোকে তিনি পাগল হইয়াছেন, নহিলে এমন আজগুবি গল্পও বিশ্বাস করেন! আবার শুধু বিশ্বাস? তাহার উপর নির্ভর করিয়া সত্যই কাল এক অসম্ভব কামনা করিয়া বসিলেন! সঙ্গে সঙ্গে দৈত্যের বিভীষিকা-দর্শনও বাদ পড়িল না। এই আইন-আদালত রেল-পুলিশের দিনে আরব্য উপন্যাসের রচা গল্পের নায়ক আলাদিনের মতই নুড়ি ঘষিয়া কনক-প্রাসাদ ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের তিনি মালিক হইবেন! হা রে বুদ্ধি!

কালীনাথ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; পুত্রের পানে চাহিয়া বলিলেন,—ও-সব ভেল্কির কথা মনে এনো না বাবা। বেলা হয়ে যাচ্ছে, তুমি বেরিয়ে পড়ো।

মহিম কহিল,—আমি ও মোটেই বিশ্বাস করি নি বাবা। শুধু একটু মজা দেখলুম রাত্রে—এই আর কি। তা যাক, আপনি এখন ভাল আছেন?

কালীনাথ কহিলেন,—হ্যাঁ, বাবা। তুমি তাহলে এসো—আমিও স্নানাহ্নিক সেরে নি।

মহিম চলিয়া গেলে কালীনাথের হঠাৎ কেমন মনে হইল, কাল যে একটা দুঃস্বপ্নের মত কোথা হইতে কি আসিয়া পড়িয়া সংসারের সুশৃঙ্খলতায় ব্যাঘাত ঘটাইয়া গিয়াছে—তাহার একটা ছিটাও যদি মহিমের গায়ে লাগিয়া থাকে! তাহার অভিশপ্ত শির হইতে সে ছিটাটুকু আশীর্ব্বাদ-পূত করের স্পর্শে মুছিয়া লইলে বেশ হইত! সে দুঃস্বপ্ন হইতে পুত্রকে তাহা হইলে নিরাপদ রাখা যাইত! কিন্তু হঠাৎ আজ নূতন করিয়া কি বলিয়া তিনি পুত্রের মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন? পুত্র ভাবিবে, পিতার মনে দুশ্চিন্তা-ভয় এখনও আপনার প্রভাব জাগাইয়া রাখিয়াছে। কতকটা সেই জন্যই ইচ্ছা থাকিলেও মহিমকে আশীর্ব্বাদ করা আর ঘটিয়া উঠিল না।

দুপুরের পর আকাশ আবার নিবিড় কালো মেঘে ভরিয়া উঠিল। সমস্ত বিশ্বের উপর কে যেন একখানা কালো পর্দ্দা মুড়িয়া দিয়াছে—বিশ্বের নিশ্বাস বুঝি সে চাপে বন্ধ হইয়া যায়! সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ধারে বৃষ্টি নামিল। কালীনাথ ঘরে বসিয়া পূর্ব্ব-সমৃদ্ধির কথা ভাবিতেছিলেন; কাল এমনসময় আকাশ কেমন পরিষ্কার ছিল, উজ্জ্বল ছিল—হঠাৎ কোথা হইতে মেঘ আসিয়া সে উজ্জ্বলতা মুছিয়া দিয়াছে—আর আজ সেই আকাশই কি কালো, কি আঁধারে-ঘেরা! জীবনের প্রভাতে তাঁহারও দিনগুলা বেশ উজ্জ্বল ছিল, পরিষ্কার ছিল, আজ দুর্দ্দশার মেঘে সেই দিনই ঘনকৃষ্ণ আবরণে আপনার সমস্ত উজ্জ্বলতা চাপা দিয়া বসিয়াছে! সহসা মোক্ষদা আসিয়া কহিলেন,—ওগো, বাইরে কে ডাকছে যে! ডেকে ডেকে গলা তার ভেঙ্গে গেল—আর তুমি শুনতে পাচ্ছ না? কালীনাথের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল।

এই বৃষ্টিতে কে ডাকিবে? সহসা তাঁহার মনে গত রাত্রের সেই দৈত্যের ছবি আবার ফুটিয়া উঠিল। কেমন আতঙ্ক জন্মিল। শরীর শিহরিয়া উঠিল। কাণ খাড়া করিয়া তিনি শুনিলেন, বাহির হইতে তাঁহারই নাম ধরিয়া কে ডাকিতেছে বটে! মাথার মধ্যে রক্ত চন্‌চন্ করিয়া উঠিল! কোনমতে সাহস সঞ্চয় করিয়া কালীনাথ আসিয়া দ্বার খুলিলেন। বাহিরে দাঁড়াইয়া একটি ভদ্রলোক, মাথায় ছাতা! বৃষ্টির জলে তাঁহার জামা-কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে; হাঁটু অবধি কাদায় ভরা! কালীনাথ কহিলেন,—কি চান, আপনি?

সহসা কাহাকেও অতর্কিত চাবুক মারিলে তাহার যেমন মুখের ভাব হয়, ভদ্রলোকটির মুখে ঠিক তেমনই একটা কাতরতার চিহ্ন ফুটিল। তিনি কহিলেন,—আমি—আমি কল থেকে আসচি।

কল! কেন, মহিমের সেখানে কোন অসুখ করিল না কি? চিন্তিত আগ্রহে কালীনাথ কহিলেন,—কল থেকে আসচেন আপনি! কেন, বলুন দেখি, মহিমের কোন—

ভদ্রলোকটি কহিলেন,—আজ্ঞে, হ্যাঁ, ভারী দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। সাহেবরা তাই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। একটা নূতন কল এসেছিল। মিস্ত্রীরা পারে নি, মহিম সেটা দেখে চালাতে গেছলো! তার পর কেমন-করে সেই কলে তার কাপড়ের কোঁচা আটকে যায়—সেও অমনি কলের মধ্যে পড়ে পিষে—

সমস্ত পৃথিবী টলমল করিয়া দুলিয়া উঠিল! কালীনাথ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এঁ্যা—আমার মহিম—?

অদূরে কড়কড় শব্দে বাজ পড়িল। কালীনাথ পড়িয়া যাইতেছিলেন, ভদ্রলোকটি তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন; কহিলেন,—তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল—

কিন্তু কোন ফল হয় নি। কলেই তার সব শেষ হয়ে গেছে। আপনারা চলুন,—সাহেবরা অত্যন্ত দুঃখ করচেন—আর সান্ত্বনার জন্য আপনার নামে পাঁচ হাজার টাকার চেকও তাঁরা তৈরী রেখেচেন। অবশ্য আপনার এত বড় দুঃখে—

ঝম্‌ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। টাকা-চেক—কোন কথাই কালীনাথের মনে পৌঁছিল না। তিনি যেন স্পষ্ট দেখিলেন, সমস্ত বিশ্ব-চরাচর কোথায় উবিয়া গিয়াছে—সম্মুখে দাঁড়াইয়া শুধু একটা অতিকায় কৃষ্ণদৈত্য! তাঁহার মহিমকে বুকে চাপিয়া সে অট্টহাস্য করিতেছে। তাহার লাল চোখ দুইটা রেলগাড়ীর চাকার মত ভীষণ বেগে ঘুরিতেছে, মুখে রুধিরের প্রবাহ!—মহিম—বলিয়া কালীনাথ মূর্চ্ছিত হইলেন।

৬

অন্ধকার ঘরে কালীনাথ বিছানায় শুইয়া ছিলেন। সহসা পাশে কে সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। প্রবল ঝড় যেমন রাজ্যের খড়-কুটা উড়াইয়া লইয়া যায়, তেমনই এই দীর্ঘনিশ্বাসে একটা হৃদয়ের যত-কিছু সঞ্চিত সাধ-আশা খড়-কুটার মত উড়িয়া বুকটাকে একেবারে খালি করিয়া দিয়া গেল। গাঢ় স্বরে কালীনাথ ডাকিলেন,—মোক্ষদা—

—ও বাবা মহিম রে! বলিয়া মোক্ষদা স্বামীর বুকের উপর লুটাইয়া পড়িলেন। তার পর বহুক্ষণ আর কাহারও মুখে কোন কথা ফুটিল না। কি কথা কে বলিবে? কে কাহাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে? কে কাহাকে বুঝাইবে যে,—ওগো, কাঁদিয়া-ভাবিয়া কোন ফল নাই, চুপ করো!—চুপ ত দুজনেই আছে—চুপ করিয়া এ শোকের আগুনে এখন গুমিয়া গুমিয়া পুড়িতে হইবে। নিস্তার পাইবার বা রক্ষা পাইবার কোন আশাই নাই আর!

কিন্তু সত্যই আশা নাই? সাজাইয়া-গুছাইয়া যে ছেলেকে চাকরি করিতে পাঠাইলাম, সে ছেলে আর ঘরে ফিরিল না—কখনও ফিরিবে না, ইহা কি সম্ভব!

মোক্ষদা বলিলেন,—ওগো—

কালীনাথের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিতেছিল। তিনিই এ-সর্ব্বনাশের মূল! তিনিই টাকার লোভে স্বহস্তে পুত্র-বধ করিয়াছেন! হাঁ, তিনিই। এ কলের চাকা তিনি ঘুরাইয়াছেন—আর সে চাকার মুখে পড়িয়া মহিম আপনার প্রাণটাকে পিষিয়া মারিয়াছে—ইহ্‌জের অস্থিপঞ্জরগুলাকে ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া তাহাতে পাঁচ হাজার টাকা সে খোদাইয়া দিয়াছে। কেমন! কেমন হইয়াছে! অর্থলোভী রাক্ষস,অর্থের সাধ এখন মিটিয়াছে!

কালীনাথ কহিলেন,—কি বলবে, বলো মোক্ষদা।

—সে মুড়িটা আছে তো! তাই দিয়ে আমার বাছাকে তুমি ফিরিয়ে আনো। ওগো, সন্ন্যাসী বলেচেন, কামনা নিষ্ফল হবে না।

ঠিক কথা! কালীনাথ ভাবিলেন, মোক্ষদা ঠিক বলিয়াছে! এ কথাটা কৈ তাঁহার মনে উদয় হয় নাই তো! দুইটা কামনা যে এখনও পুরাইতে পারা যায়! তবে? তাই হোক্! মহিমকে ফিরাইয়া আনি।

কিন্তু মনকে সজোরে কে ধাক্কা দিল! ওরে কি করিয়া সে আসিবে? চিতা সাজাইয়া মহিমের সেই পিষ্ট চূর্ণিত দেহটাকে যে—

তাই তো! কালীনাথ নিজে দেখিয়াছেন, কি লোল-জিহ্বা মেলিয়া চিতার আগুন ধু ধু জ্বলিয়া তাঁহার সে প্রাণের নিধিকে গ্রাস করিয়াছে। তবে?

যাই হোক্, তবু মহিমকে চাই—তাহাকে ফিরাইবার কামনা করিবই—যেখান হইতে যেমন করিয়া হোক্, তাহাকে ফিরাইবই। সৃষ্টির নিয়মে যদি আজ বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটে, বিশ্বে সব যদি আজ উলট্-পালট্ হইয়া যায়—তবু কামনা করিয়া তাহাকে ফিরাইতে হইবেই!

মোক্ষদা প্রদীপ জ্বালিলেন, কালীনাথ খুঁজিয়া পাতিয়া প্রস্তরখণ্ডটি সংগ্রহ করিলেন; হাতে লইয়া ভাবিলেন,—কিন্তু দশ দিন কাটিয়া গিয়াছে! এখন কোথায় সে ফিরিয়া আসিবে? কি লইয়া ফিরিবে? দেহ! সে তো চিতায় পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে! সেই ছাইয়ের গুঁড়ায় নিজেকে গড়িয়া কেহ কি ফিরিতে পারে কখনও? সেই বিকৃত দেহ লইয়া ভীষণ মূর্ত্তিতে কি করিয়া সে ফিরিবে? না, না। এ যে একেবারে অসম্ভব। তিনি পাগল হইয়াছেন।

মোক্ষদা কহিলেন,—ওগো বলো না—

কালীনাথ মণি লইয়া পুত্রের প্রত্যাবর্ত্তন কামনা করিলেন। গা কাঁপিয়া উঠিল—মাথা ঘুরিয়া গেল। খোলা জানালা দিয়া একটা দম্‌কা হাওয়া ভিতরে ঢুকিয়া প্রদীপটাকে একেবারে নিবাইয়া দিল।

মোক্ষদা আসিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইলেন। বাহিরে জ্যোৎস্নার মৃদু আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে! পার্শ্বস্থ অনিবিড় বনভূমিকে স্পন্দিত কম্পিত করিয়া ঝিল্লী সুর ধরিয়াছে। ও পাড়ার যাত্রার আখড়া হইতে একটা ঢোলের আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছে এবং আকাশের বুকে বসিয়া নক্ষত্রগুলা বিস্ময়-স্তম্ভিত দৃষ্টিতে পৃথিবীর পানে চাহিয়া আছে।

* * * * *
* * *

গভীর রাত্রির স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মোক্ষদা চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—বাবারে, মহিম—বাই বাবা—

কালীনাথের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। চমকিয়া তিনি কহিলেন,—কি ও?

মোক্ষদা কহিলেন,—আমার মহিম এসেচে গো! ঐ যে দোরে ঘা দিচ্ছে।

কালীনাথ পত্নীকে ভৎর্সনা করিলেন,—তুমি পাগল হয়েচো? সে ফিরবে কি? সে যে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ফিরতে পারে কখনও?

—ওগো, হ্যাঁ গো হ্যাঁ—সে এসেচে, নিশ্চয় এসেচে। দোরে সে ঘা দিচ্ছে, আমি পষ্ট শুনেচি। আমি তো ঘুমোই নি—সারারাত আমার বাছার জন্যে পথের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি! আমার মন বলচে, বাছা আমার ফিরবেই! ওগো, সন্ন্যাসীর কথায় তাচ্ছীল্য করো না—ওঠো, দোর খুলে দাও—নাহলে বাছা আমার অভিমান করে চলে যাবে। ওঠো, ওগো ওঠো—

কালীনাথের সর্ব্বশরীর ছুম্-ছুম্ করিয়া উঠিল। তিনি স্ত্রীকে বুঝাইলেন, কে বলিল, মহিম আসিয়াছে? তাহা কি সম্ভব? কিন্তু—সন্ন্যাসীর মণির গুণ—! তখনই আবার মনে পড়িল, সেই কলে-পিষ্ট খণ্ড-বিখণ্ড চাঁদমুখ! রক্ত-কাদা-মাখা কি সে ভীষণ মূর্ত্তি! সে নাই রে, নাই, মরিয়া গিয়াছে—চিতায় পুড়িয়া ছাই হইয়াছে। মরা লোক কি করিয়া ফিরিবে? কি লইয়া ফিরিবে? দেহ তার নাই! তবে—? একটা প্রেতকে পুত্র বলিয়া গৃহে লইতে হইবে? এ কি মোক্ষদার পাগলামি!

মোক্ষদা কহিল,—ও যে-ই হোক্, ভূত হোক্, প্রেত হোক্, তবু আমার মহিম। ওকে না পেলে আমি বাঁচবো না।

কালীনাথ কহিলেন,—শোনো, মোক্ষদা, পাগলামি করো না।

—আমি কোন কথা শুনতে চাইনে। ওগো, ঐ যে, দোরে আবার ঐ ঘা দিচ্ছে। তুমি না যাও ত আমি যাই—দোর খুলে বাছাকে আমার ডেকে আনিগে যাই বাবা মহিম আমার—মোক্ষদা পাগলের মত ছুটিয়া ঘরের বাহিরে গেলন।

কালীনাথ মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইলেন, ভাবিলেন, সত্যই মহিম আসিয়াছে? না, না। কিন্তু কে জানে! মণির শক্তিতে সত্যই যদি আসিয়া থাকে? ঐ না, দ্বারে কে ঘা দেয়? ঐ যে। কিন্তু সে যে মৃত—না, না, এ গৃহে তাহার স্থান আর কি করিয়া হয়। সেই রক্তমাখা ভীষণ মূর্ত্তি—না, না।

পাথর-খণ্ডটা কুলুঙ্গিতেই ছিল, তাড়াতাড়ি সেটা হাতে লইয়া কালীনাথ চীৎকার করিয়া বসিলেন,—আমার তৃতীয় কামনা—মহিম চলে যাক্, চলে যাক্, এই দণ্ডে সে চলে যাক্—তার পর পাথরটা ছুড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া কালীনাথ পত্নীর অনুসরণ করিলেন।

মোক্ষদা তখন নীচেকার উঠান পার হইয়া সদরে গিয়া পড়িয়াছেন, দ্বার খুলিবার উপক্রম করিতেছেন; কালীনাথ দ্রুত তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন, ডাকিলেন—মোক্ষদা—

মোক্ষদা সে কথায় কাণ না দিয়াই সবলে অর্গল ঠেলিয়া দ্বার মুক্ত করিলেন। একটা দমকা জলো হাওয়া চোরের মত গৃহের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। কালীনাথ ছুটিয়া একেবারে বাহিরে পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পথে জন-মানবের চিহ্নও নাই—শুধু মাথার উপর অষ্টমীর চাঁদ একদল নক্ষত্রের সহিত রুদ্ধ কৌতুকে বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া আকাশের গায়ে লুটাইয়া পড়িতেছে।

হাত-যশ

বাঁচিতে লেকের ধারে বৈকালে বেশ ভিড় জমে। সেদিনও জমিয়াছিল। এক জায়গায় ভিড় একটু বেশী! বাঙালীর ভিড়। ভিড়ের কারণ ছিল।

এক তরুণ বাঙালী বসিয়া গান গাহিতেছিল। স্বরের মুক্ত স্বচ্ছ নির্ঝর—এমন কণ্ঠ বড় একটা শুনা যায় না! তাই গান শুনিয়া বেড়ানোর কথা ভুলিয়া অনেকেই গায়ককে কেন্দ্র করিয়া ভিড় বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

সন্ধ্যার পর গান থামিল। সকলে যে যার বাসায় ফিরিতেছিল। গায়কও সেই সঙ্গে। আর এ দলটির ঠিক পিছনে চার-পাঁচজন তরুণী মহিলা; তাদের সঙ্গে ছিল বারো বছরের একটি ছেলে আর একজন বাঙালী ভৃত্য।

তরুণীর দলে গানের কথাই চলিয়াছিল। এক জন বলিলেন,—অনেকের গান শুনেচি বটে,—সেবার স্টীমারে মায়ার খেলা দেখতে গেছলুম,—তবু বলবো, রবিবাবুর গান এমন মিষ্টি গাইতে এর আগে আমি তো কখনো শুনিনি! কি বলো বড়দি?

বড়দি বলিলেন—আমি শুনেছিলুম। কলকাতায় ওঁর এক বন্ধুর বাড়ীতে একজন রবিবাবুর গান গেয়ে-ছিলেন—নাম বুঝি গুরুদাস বাবু—এমনি দরদ তাঁর গলায়—আহা! পরে থিয়েটারে কি একখানা বইয়ের গানেও তিনি সুর দিয়েছিলেন। আমার সে বই দেখা হয়নি, বুড়ী তখন পেটে—এঁরা আমায় থিয়েটারে যেতে দেন্ নি…

প্রথমে যে-তরুণী কথা বলিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, —সে গান এমন? বাজনা নেই, কিছু না—খোলা জায়গায় বসে গান গাইচেন…এমন?

বড়দি কহিলেন—এর চেয়ে খারাপ তো নয়ই—এ কথা জোর করে বলতে পারি।

ছেলেটি কহিল—এঁরা আমাদের পাশের বাঙলোয় থাকেন—আমি দেখেছি।

বড়দি বহিলেন,—দূর! ও বাঙলায় দিন-রাত্তির যেন ভূতের কীর্ত্তন চলেছে! এমন গাইয়ে বাঙলায় থাকলে গান কি কখনো শুনতুম না?

ছেলেটি কহিল,—সত্যি বড়দি, আমি ওঁকে ওই বাঙলায় দেখেছি।

বড়দি কহিলেন,—তাহলে বোধ হয় সেদিন বেড়াতে এসেছিল…

এ-দলের ঠিক আগে যে-দল পথ চলিতেছিল, সে তরুণের দল। তাদের কথাবার্ত্তা বন্ধ ছিল না।

একজন বলিল,—তোমার গানের তারিফ শুনচো হে সুরেশ…

সুরেশ কহিল—কে করচে তারিফ?

প্রথম তরুণ কহিল—পিছনে কাণ পেতে শোনো…

সুরেশ ফিরিয়া পিছনে তাকাইল। প্রথম তরুণ ভর্ৎসনার স্বরে কহিল—অভদ্র বেয়াদবের মত পিছন-পানে তাকিয়ো না তা বলে!

সুরেশ কহিল—যে আজ্ঞে!

বন্ধু হরেন্দ্র কহিল—সেই সঙ্গে দু'নম্বর তারিফটাও শুনেচো?

সুরেশ কহিল—কি?

হরেন্দ্র কহিল,—ওঁরা বলচেন, এমন গাইয়ে বাঙলায় থাকতে গানের বদলে অষ্ট প্রহর ভূতের কীর্ত্তন শুনে মরি কেন?

সুরেশ কহিল,—সত্যই তো! তোমরা যা চেঁচামেচি করো…আমার ভয় হয়, বোমার দল বলে পুলিশ এসে কোন্ দিন না গ্রেফ্‌তার করে বসে! তুমি কি বলো ডাক্তার?

যাকে উদ্দেশে কহিয়া কথা সমাপ্ত হইল, তার নাম ডাক্তার বিমলাকান্ত। দলের সকলে সংক্ষেপে তাকে ডাক্তার বলিয়া ডাকে।

বিমল কহিল,—আজ থেকে তোমরা চেঁচামেচি ছাড়ো—সত্যি! পাশে ভদ্রমহিলাদের বাস—সে কথা মনে রেখো।

সুরেশের গা টিপিয়া হরেন্দ্র কহিল—একখানা গাইতে গাইতেই চলো না সুরেশ…

সুরেশ কহিল—নিন্দা অপযশ যদি কাটে? বেশ…

সুরেশ গান ধরিল,—

তোমায় আমায় প্রথম দেখা
সে এক পরম ক্ষণে—
নয় বকুলের কুঞ্জতলে
নয় গো চাঁপার বনে।…

পিছনে তরুণীর দলে কথা বন্ধ হইল। বড়দি সতর্ক করিয়া দিলেন—চুপ কর্, গান গাইছে।

গাহিতে গাহিতে সুরেশদের দল নিজেদের বাঙলায় আসিয়া ঢুকিল। পিছনে বড়দির দল সে বাঙলার সামনে দিয়া পাশে পাশে নিজেদের বাঙলায় প্রবেশ করিলেন।

হরেন্দ্র কহিল—আজ থেকে আর চীৎকার-চেঁচামেচি নয়। কীর্ত্তনিয়া ভূতের দল ভেগে পড়ো। অপজশ রটেচে! গাও সুরেশ কণ্ঠ ছেড়ে। পাড়ার লোক বুঝুক, ভূতের কীর্ত্তন বন্ধ হয়েচে। সুরের ফুলঝুরি রচাই হবে এখন থেকে আমাদের একমাত্র কাজ!

সেই যে বাঁশী বাজিয়েছিলে
যমুনার তীরে—
সুরে তার প্রেমের ধারা—
ভাসিয়ে দিলে ধরণীরে!

পাশের বাঙলায় ছোট ছেলেমেয়ের দলে বিষম কলরব উঠিয়াছিল। সতু আসিয়া বলিল—তখন বললুম বড়দি, এখন দেখলে তো ওরা পাশের বাঙলায় থাকে। ওই শোনো, গান হচ্ছে···

খবর শুনিয়া মেজদি সেজদিরা ছুটিয়া বাঙলার পাশের বারান্দায় আসিল। বড়দি তখন খোকার জন্ম হরলিক্স তৈয়ার করিতেছেন,আর দাসীকে বকিতেছেন,—এ কাজটুকু যদি না পারবে তো এত পয়সা খরচ করে তোমায় এখানে আনা কেন, বলতে পারো?

মা বলিলেন,—যা টুনি গান শুনগে···আমি দেখে তোর ছেলেকে খাওয়াচ্ছি।

বড়দি আশ্বাস পাইয়া ব্যস্ত হইয়া গান শুনিতে ছুটিলেন।

২

সতুর মনে শ্রদ্ধা জাগিল। যখন-তখন পাশের বাঙলার সামনে দিয়া সে যাতায়াত সুরু করিয়াছে, সোজা চলিয়া যায়, আবার পরক্ষণে ফিরিয়া আসে। যাতায়াতের সময় দৃষ্টিটুকু থাকে ঐ বাঙলার পানে। একটু-আধটু গান গাহিবার বাসনাও তার মনে উদয় হইয়াছে। বাড়ীতে গাহিলে পাছে পিটুনি খায়, এই ভয়ে গৃহে তার কণ্ঠ বহিয়া সুর ঝরিতে পায় না—পথে গুণগুণ করিয়া সুর সাধনা করে।

সকালে বেড়াইয়া ফিরিবার সময় নিত্যকার মত সেদিনও পাশের বাঙলার পানে চাহিয়া সে দেখে, দুজন সাঁওতাল—মাটীতে শুইয়া পড়িবে, এমন অবস্থা, জ্বরে ধুঁকিতেছে!. একটি বাবু তাদের ঔষধ দিতেছেন। পাশে দাঁড়াইয়া সুরেশ বাবু!

দাঁড়াইয়া সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে সতু সুরেশকে দেখিতেছিল। সুরেশ তাকে লক্ষ্য করিল—লক্ষ্য করিয়া ডাকিল—ও খোকা, এদিকে এসো!

সতুর মন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল! সে ধীরে ধীরে বাঙলার মধ্যে আসিল।

সুরেশ কহিল,—পাশের বাঙলায় তোমরা থাকো?

সতু কহিল,—হ্যাঁ।

—তোমাদের বাড়ী কোথায়?

—কলকাতায়!

—তোমার বাবার নাম কি?

—শ্রীযুক্ত কৈলাসগোবিন্দ দত্ত।

—তিনি কি করেন?

সতু কহিল,—তিনি ব্যারিষ্টার।

—এখানে এসেচেন?

—না। বাবা রেঙ্গুনে গেছেন! আমরা বড় সঙ্গে রাঁচি এসেছিলুম। আমাদের এখানে রেখে ব মোটরে করে কাশ্মীর বেড়াতে গেছে।

—একলা গেছেন?

—না। তাঁর বন্ধু দুজন সঙ্গে গেছেন।

—তোমরা যাও নি?

—না।

—এখানে তোমরা কে-কে আছো?

—মা, বড়দি, মেজদি, আমি, ছোট ভাই-বো বামুন, চাকর আর ঝী।

—তুমি কোন্ ক্লাশে পড়ো?

—থার্ড ক্লাশ।

—বেশ।··· বিস্কুট খাবে?

—না।

ডাক্তার বিমলকান্তি কহিল,—খাও না! এ ভালো বিস্কুট।

সতু কহিল,—সকালে খাবার খেয়েচি। আর কিছু খাবো না।

বিমল কহিল,—রাঁচি কেমন দেখচো? ভ লাগচে?

হাসিয়া সতু কহিল,—ভালো। আমি আর বার এসেছিলুম।

সাঁওতাল মালী আসিয়া কহিল—বাবু, হ লেড়কার বহুৎ টাট্টি হয়েচে। দাওয়াই দিবি?

বিমল কহিল,—কখন্ থেকে টাট্টি হচ্ছে? ব হয়েচে?

মালী কহিল,—ফজেরমে। তিন দফে।

বিমল কহিল,—দাঁড়া।···বলিয়া ঘরের মধ্যে এবং তিনটা পুরিয়া আনিয়া মালীর হাতে দিয়া কহি এখনি এক পুরিয়া দিবি। আধা ঘণ্টা বাদ ঔর পুরিয়া···এখন ঘুমোতে বল্। আউর টাট্টি হলে দিবি···বুঝলি!

মালী চলিয়া গেল। সুরেশ কহিল,—তুমি এবু একটাকে মারবে, দেখচি ডাক্তার। দু'হাতে যে- ওষুধ বিতরণ করচো!

হাসিয়া বিমল কহিল,—কোনো ভয় নেই।

ওষুধে কারো কোনো দিন অপকার হয় নি, হতে পারে না—উপকরেই হতে দেখেছি।

সুরেশ কহিল,—কি দিলে মালীকে?

বিমল কহিল,—সাল্‌ফার থার্টি।

সুরেশ কহিল,—বাঃ!

৩

বাড়ীতে সতুর ভারী খাতির। দিদিরা কহিল,—একদিন তোর গাইয়েকে আমাদের এখানে নেমন্তন্ন করে আন্। না—গান শুনিয়ে দেবে···

সতু কহিল,—বারে, একজনকে বল্‌লে বুঝি ভালো দেখায়!

বড়দি কহিলেন,—ওঁরা ক'জন আছেন?

সতু কহিল,—পাঁচজন।

বড়দি কহিলেন,—বেশ, পাঁচজনকেই নেমন্তন্ন করে আয়। একদিন সন্ধ্যাবেলায় এখানে খাওয়া-দাওয়া করবেন আর গান হবে···

সতু কহিল,—আজই?

বড়দি কহিলেন,—না, আজ নয় রে পাগল—কালকের জন্যে···পারবি?

সতু ছুটিল, বলিয়া গেল,—খুব।···

আধ ঘণ্টা পরে সে ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—ওঁরা রাজী···শুধু একটা কথা আছে।

বড়দি কহিলেন,—কি?

সতু কহিল,—একজন ডাক্তারবাবু আছেন—তিনি বল্‌লেন, তিনি রাত্রে ভাত খাবেন। ভাত ছাড়া তিনি আর কিছু খান না!

বড়দি কহিলেন,—সৃষ্টিছাড়া ডাক্তার!

সতু কহিল,—না বড়দি, বেশ ভালো ডাক্তার, কত লোক ওষুধ নিয়ে যায়, আমি দেখেছি···

বড়দি কহিলেন,—তা নয়, তা নয়—তবে কেমন ভদ্দরলোক! নেমন্তন্ন করে ভদ্দরলোককে ভাত কি বলে মানুষ খেতে দেবে?

সতু কহিল,—তা বলে তাঁর যদি লুচিতে রুচি না হয়···

বড়দি কহিলেন,—থাম্! যেমন তুই, তেমনি তার এই বন্ধুরা···

সতুদের বাংলায় গানের মজলিশ উপলক্ষে খুব ধুম বাধিয়া গেল। পাশাপাশি আরো দু' চারজনকে নিমন্ত্রণ করা হইল এবং গান চলিল প্রায় রাত্রি এগারোটা অবধি। তার পর আহার। লুচি, মাংস, বিবিধ ব্যঞ্জন, অন্নেরও অপ্রতুল নাই। দিদিরা নিজেদের হাতে তৈরী করিয়াছেন, মা খাজা তৈরী করিয়াছেন। খাইতে খাইতে সুরেশ কহিল,—সতু ভাই, মাকে বলো, তাঁকে রোজ রোজ গান শোনাবো, মাঝে মাঝে এমনি খাজা আর লেডিকেনি তৈরী করে যেন খাওয়ান!

দলের সকলে কহিল,—আমাদেরও চাই, ভাই সতু। না হলে সুরেশকে আমরা ছাড়বো না। ঘরে চাবী বন্ধ করে রাখবো···

বিদেশ। এমনি করিয়া পাশাপাশি দুই বাংলায় স্নেহের একটা সুমধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠিল।···

৪

এক সপ্তাহ পরে। ভোর হইতেই পাশের বাংলার চাকর আসিয়া ডাকিল,—ডাক্তারবাবু···

বিমল সকলের পূর্ব্বে বিছানা ত্যাগ করিয়াছিল। সে কহিল,—কেন?

—আমি পাশের বাড়ী থেকে আস্‌চি···

—কেন?

—মা আপনাকে ডেকে পাঠালেন।

বিমল সবিস্ময়ে কহিল,—আমাকে!

বিস্মিত হইবার কথাই! সুরের ধারায় আনন্দ সে দিতে পারে না। সে গুণী নয়···

ভৃত্য কহিল,—আপনি তো ডাক্তার বাবু?

তাই!

বিমল গায়ে কোট চড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িল। মা বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিলেন, কখনো সামনে বাহির হন্ নাই। বিমল আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল,—আমায় ডেকেচেন?

মা কহিলেন,—হ্যাঁ বাবা।

বিমল কহিল,—কেন?

মা কহিলেন—কাল সকালে জগন্নাথ পাহাড়ে গেছলুম, ফিরতে রাত হলো। তা রাত্রেই ফিরতে না ফিরতে মঙ্গলার হুড়-হুড় করে বমি আর জ্বর। মাথা খসে যাচ্ছে। ঘুমোতে পারে নি। তাই ডাকতে পাঠিয়েছিলুম বাবা। বললুম, ডাক্তারবাবুকে পাশের বাড়ী থেকে আন্ চট করে। সতুর মুখে শুনেচি, বাবা, তোমায় খুব ভালো হাত। কত লোক এসে ওষুধ নিয়ে যাচ্ছে!

বিমল হতভম্ব! সর্ব্বনাশ! ইনি এ বলেন কি! সে কি ডাক্তার যে এত বড় দায়িত্ব হাতে লইবে!—সে কহিল,—কিন্তু দেখুন, আপনি ভুল করচেন মা। মানে, ঠিক ডাক্তার আমি নই।

মা কহিলেন,—যে-রকম ডাক্তারই হও তুমি, এসো বাবা—

বিমল প্রমাদ গণিল। মা কিন্তু এমন অস্থির··· তাহাকে যাইতেই হইল। মা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন, কহিলেন,—এই যে! ভাখো বাবা···

বিমল যাইয়া দেখে, শয্যায় দেহভার লুটাইয়া এক তরুণী···সে কপালে হাত দিল, কপালে ঘাম হইতেছে!

মা কহিলেন,—হাতটা ত্যাখো বাবা,···নাড়ীর অবস্থা···সারারাত ছট্‌ফট্ করেচে। মা-বাপ কাছে নেই—বিদেশ-বিঁভুই! ভেবে মরচি।

বিমল তরুণীর হাতখানি লইয়া নাড়ী পরীক্ষা করিল। এটি এঁর মেয়ে নয়···কোনো আত্মীয়···!

তরুণী চাহিল—চোখ ফুলিয়া আছে। বিমল কহিল,—থার্ম্মোমিটার নেই?

—আছে বৈ কি।

মা এক-পা অগ্রসর হইলেন, তার পর কহিলেন, এই যে সতু—তোর বড়দিকে ডাক্···থার্ম্মোমিটার দিক···

সতু কহিল,—থার্ম্মোমিটার এই দেরাজেই আছে যে···

সতু থার্ম্মোমিটার দিল। সেটা ঝাড়িয়া মঙ্গলার পানে চাহিয়া বিমল কহিল,—একবার টেম্পারেচারটা দেখতে হবে···

মঙ্গলা থার্ম্মোমিটার লইয়া কহিল,—দিন···

কম্পিত হস্তে মঙ্গলাকে থার্ম্মোমিটার দিয়া বিমল সরিয়া আসিল। তার আপাদ-মস্তক কাঁপিতেছিল···সে শেল্‌ফের দিকে তাকাইয়া রহিল—শেলফে একটা টাইম্-পীশ ঘড়ি টিক্‌টিক্ করিতেছে।

—এক মিনিট হয় নি ডাক্তারবাবু?···

ডাক্তার বাবু অগ্রসর হইল—থার্ম্মোমিটার লইতে কম্পিত হাত মঙ্গলার হাতে ঠেকিল। কোনমতে থার্ম্মোমিটার লইয়া বিমল দেখিল, ৯৯। সে কহিল,—গায়ে বেদনা আছে?

মঙ্গলা কহিল,—খুব।

বিমল কহিল,—হুঁ।

মা কহিলেন—ওষুধ দিয়ে ভালো করে দাও বাবা! এদের সব গোঁয়ার্ত্তুমি। কমলাকে বললুম যাস্‌নে বেড়াতে রে—একজন ডাগর পুরুষ নেই। ঐ বাচ্ছা ছেলে! কি ভরসায় রেখে গেল! এতগুলো নেড়ি-গেঁড়ি—আমি এদিকে ভেবে কতখানি সারা হচ্ছি···

বিমল বুঝিল, ঠাণ্ডা লাগিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জার মত হইয়াছে। সে কহিল—আচ্ছা, সতুকে সঙ্গে দিন। ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মা বলিলেন,—সঙ্গে যাও সতু।

বাঙলায় ফিরিয়া বিমল হোমিওপ্যাথির বই খুলিয়া বসিল। এ সাঁওতাল রোগী নয়; মস্ত ব্যারিষ্টারের বাড়ী। তায় তরুণী মহিলা।

লক্ষণ মিলাইতে গিয়া সে বিপদে পড়িল। বইয়ে লেখা আছে হাঁচি, শরীরে তাপ-বৃদ্ধি, নাক-চোখ দিয়া জলপড়া, অস্থিরতা, তৃষ্ণা, এ-সবে একোনাইট! [illegible] বমনেচ্ছায় ইপিকাক; জলবৎ সর্দ্দি ঝরিলে আর্সেনিক। চক্ষু রক্তবর্ণ, শিরঃপীড়া প্রভৃতি লক্ষণে বেলেডোনা। বুকে ব্যথা সর্দ্দি জম্মানোয় ত্রায়োনিয়া।···বইয়ের এ সব লক্ষণগুলো···

সে সতুর পানে চাহিল। সতু কহিল,—ওষুধ?

বিমল কহিল,—আর একবার আমায় যেতে হবে সতু···

সতু কহিল,—আসুন···

কিন্তু বই লইয়া যাওয়া চলে না···প্রশ্ন করিবে আর বইয়ের সঙ্গে মিলাইবে—ছি, কি ভাবিবেন? একে তো সে যা করিতেছে, ইহাতে হাতে হাতকড়ি মিলিবার আশঙ্কা প্রচুর! তবে, রোগটা না কি তেমন নয়—ঠাণ্ডা লাগিয়াছে, সামান্য সর্দ্দি জ্বর। ডাক্তারেরা যাকে বলেন, Catarrhal fever···

সতুর অগোচরে লক্ষণগুলা একখানা কাগজে টুকিয়া সে ঔষধের বাক্স লইয়া আবার ব্যারিষ্টার দত্ত-সাহেবের বাঙলায় আসিল। কিন্তু মঙ্গলাকে এ-সব প্রশ্ন করিতে তার লজ্জা হইল। মাকে ডাকিয়া একটি একটি প্রশ্ন করিল। বইয়ের সঙ্গে লক্ষণ কতক মেলে, কতক মেলে না। মুস্কিল! বুদ্ধি করিয়া সে একডোজ নাক্স থার্টি দিল, বলিল,—বেলা দশটা এগারোটার সময় খপর দেবেন।···কোনো ভয় নেই। এতেই সেরে যাবে।

মা কহিলেন,—বেলা নটা-দশটায় তুমি এসে আর একবার দেখে যেয়ো, বাবা!

ঔষধ দিয়া বাক্স লইয়া বিমল চলিয়া আসিল। ঘামে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে; বাহিরের বাতাসে ঘাম ঘুচিল। সে যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল! তবে বন্ধুদের কাছে এ-কথা সে প্রকাশ করিল না—নিঃশব্দে চা পান করিয়াই পাহাড়ের দিকে বেড়াইতে চলিয়া গেল।

বেলা ন'টার সময় ফিরিয়া পাশের বাঙলার মধ্যে ঢুকিয়া বিমল ডাকিল,—সতু···

সতু তখন বেড়াইতে গিয়াছে। ভৃত্য আসিয়া কহিল,—ভিতরে আসুন···

বিমল ভিতরে আসিল; মা নাই। মঙ্গলা শুইয়া আছে। অসুখ হইলেও রঙ্ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে আর মুখের কি শ্রী! ঘর্ম্মসিক্ত ললাটে রেশমের মত চুলগুলি লেপিয়া আছে! পাশে বড়দি···বাঙালী ঘরের সে লক্ষ্মীছাড়া দীর্ঘ ঘোমটা তাঁর মুখে নাই! বে··· স্বচ্ছন্দ, সহজ ভঙ্গী! সিঁথিতে সিন্দুরের রাঙা রেখা··· অপরূপ কান্তি!

বিমল বুঝিল, ইনিই বড়দি—যে বড়দির কথা [illegible] মুখে শুনিয়াছে।

তার ইচ্ছা হইতেছিল, ইঁহাকে বড়দি বলিয়া ডাকে কিন্তু সে সুযোগ ফশকাইল। হায় রে···

বড়দি কহিল,—একবার পায়খানা গেছলো। একটু ভালো বোধ করচে…যাতনা বিশেষ নেই। টেম্পারেচার অবশ্য নিইনি। গা দেখুন তো…ঘামচে না?

আবার সেই কাঁপন! তার জিভটাকেও যেন কে সজোরে পেটের মধ্যে টানিয়া ধরিতেছে! কোনো মতে সে রোগীর কপালে হাত রাখিল। না, কপাল গরম নয়!

বড়দি কহিল,—ষ্টেথেশকোপ আনেন নি। বুকে যদি সর্দ্দি বসে থাকে?

ষ্টেথেশকোপ! তাই তো! বিমল কহিল,—না, তার দরকার হবে না।…আচ্ছা, আমি এখনি গিয়ে অন্য ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি…গায়ের বেদনা কেমন?

বড়দি প্রশ্ন করিল,—কেমন রে মঙ্গলা?

মঙ্গলা সলজ্জভাবে পাশ ফিরিল, পাশ ফিরিয়া কহিল,—আছে। তবে কম।

ডাক্তারোচিত গাম্ভীর্য্য-সহকারে বিমল কহিল,—হুঁ।…জ্বর নেই। ব্রায়োনিয়াতেই এটুকু যাবে'খন।

মনের মধ্যে বিবেকের তাড়না চলিয়াছিল বিলক্ষণ! এ জুয়াচুরি…এ…এ…ভীষণ জুয়াচুরি! ভয়ঙ্কর অপরাধ।

সুরেশকে একদিন চুপি-চুপি সে কথাটা বলিল। সুরেশ কহিল—কিন্তু রোগী ভাল আছে। সতু বলছিল। ও-বাড়ীতে তোমার ডাক্তারির ভারী সুখ্যাতি হয়েচে। দু'ডোজ ওষুধে রোগ আরাম!

বিমল কহিল—কিন্তু হরেন-টরেন যেন জানতে না পারে—দেখো ভাই।

সুরেশ কহিল—বেশ। কিন্তু সাবধান, ভগবান্ পুষ্পশর না এই সুযোগে তোমায় শরবিদ্ধ করেন!

বিমল কহিল—ছি! কি যে বলো!…—

সতু আসিয়া কহিল,—ভারী মজা হয়েচে, ডাক্তার বাবু! বড়দারা যেমন আমাদের ফেলে গেছলো—তেমনি! টেলিগ্রাম এসেচে—আগ্রায় গাড়ী এমন বিগড়েচে যে সেখানকার এক কারখানায় গাড়ী তুলে দিয়ে বড়দা এখানে চলে আসচে! আজ রাত্রে এসে পৌছুবে। ড্রাইভার আগ্রায় থাকবে—গাড়ী সারিয়ে সে নিয়ে ফিরবে।

৩

পরের দিন বেলা দশটা! সতু আবার আসিয়া হাজির—দাদারা ফিরিয়াছে।

বিমল কহিল—চারু-বাবু কি তোমাদের বাঙলাতেই আছেন? দেখা হলো বোড়িয়ে ফেরবার সময়…

সতু কহিল—হাইকোর্টের উকিল চারুবাবু?

বিমল কহিল,—হ্যাঁ, হ্যাঁ!

সতু কহিল,—চারুবাবু আছেন, সুধীর বাবুও আছেন…আর দাদা! এই তিনজনেই তো একসঙ্গে মোটরে বেরিয়েছিলেন।

বিমলের বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল।

আহারাদির পর সেই দিনই সে তল্পী বাঁধিয়া ফেলিল, কহিল,—চিঠি পেয়েচি। মার অসুখ…

সুরেশ কহিল,—চিঠি দেখি।

এ-পকেটে হাত ঢকাইয়া, ও পকেট উল্টাইয়া বিমল কহিল,—তাই তো, কোথায় ফেললুম!

চিঠি পাওয়া গেল না। হাসিয়া সুরেশ কহিল,—ডাক্তারির পরিণাম শেষে পলায়ন, বন্ধু?

—তার মানে?

—মানে আবার কি! You cannot face young Mr Dutt! চারুবাবু যদি বেফাঁশ করে দেন! যদি বলেন, তুমি রোগী-দেখা ডাক্তার নও—বুজরুকি চালিয়েছো! তুমি ফিলজফির ডক্টর!

বিমল কহিল,—তাতে কি! আমি তো কোনো কিছুর প্রত্যাশায় চিকিৎসা করতে যাইনি! এ faith cure…

—যদি অসুখ বাড়তো?

—ডাক্তার ডাকাতুম।

বৈকালের এক্সপ্রেসে বিমল চম্পট দিল।…

ওদিকে চারুর সঙ্গে গৃহে মহাতর্ক বাধিয়াছিল…

চারু কহিল, আরে না, আমাদের বিমল হতে পারে না। সে আবার ডাক্তার হলো কবে? মেডিকেল কলেজের ফটক মাড়িয়েচে কোনো দিন?

কমল কহিল, এ বাঙলার সবাই তাকে ডাক্তারবাবু বলে ডাকতো!

চারু কহিল,—ও খুব ভালো ছেলে। প্রফেশরি করে। ডক্টর অফ ফিলজফি। তাই সকলে তামাসা করে ওকে ডাক্তারবাবু বলে ডাকে।

কমল হাসিল, কহিল,—কিন্তু সারিয়ে দেছে তো।

চারু কহিল—সে তার গুণে নয়, হোমিওপ্যাথি ওষুধের গুণে।

* * * *

তিন-চার মাস পরের কথা।

বিমল বিবাহ করিতে গিয়া দেখে, বিবাহ-সভায় সতু! সতু দেখিল, সেই ডাক্তারবাবুই বর! বা রে।

ছানলা-তলায় বড়দির সঙ্গে দেখা। তাঁর যেন অন্য মূর্ত্তি। দেবী ভগবতী দশমহাবিদ্যারূপিণী…বড়দির তেমনি এমন রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি! কাণে পাক দিয়া হাসিয়া বড়দি কহিলেন—তবে রে জোচ্চোর! ডাক্তার না হয়ে ডাক্তারী করতে আসা! মঙ্গলার অসুখ দেখতে

আসচেন—ষ্টেথেশকোপ আনেন না! হাট এগজামিন করবেন বিনা ষ্টেথেশকোপে···চোখের দৃষ্টি দিয়ে!

বিমল অবাক্। বিস্ময় কাটিল শুভদৃষ্টির সময়! চোখ তুলিয়া বিমল দেখে, এ কি—কনে? সেই মঙ্গলা! তবে যে কনের নাম শুনিয়াছে, শ্রীমতী মালবিকা!

তাই। মঙ্গলা ডাক-নাম! বটে! কিন্তু মা?

তাই।

উত্তরে বড়দি বলিলেন,—মা রেঙ্গুনে গেছেন। বাবাকে এখনো দু'তিন মাস সেখানে থাকতে হবে। খুব বড় মকর্দ্দমা। এ-বয়সে বাবাকে দেখা চাই তো···

কিন্তু এ বিবাহ?

বড়দি বলিলেন,—তুমি পালিয়ে গেলে চারু বাবুর কাছে পরিচয় পাওয়া গেল। মঙ্গলার বিয়ের জন্য পাত্র পাওয়া যাচ্ছিল না—বড়দা চারুবাবুর কাছে শুনলেন যে তোমার বিয়ে হয় নি—খুব ভালো ছেলে, ফিলজফির ডাক্তার—প্রফেশার। চুপি চুপি তোমায় না জানিয়ে কথা কওয়া যাচ্ছিল। আমরা নেপথ্যে ছিলুম। বাবার নাম প্রকাশ করা হয়নি! পিসে-মশায়ের নাম বিনোদলাল মিত্তির। মঙ্গলা আমার পিসতুতো বোন হয়। কাজেই বিনোদবাবুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে। আসল কথা কি করে তুমি জানবে! ওঃ, কি লাজুক! মেয়ে দেখতে আসবার জন্য বলা হলো, তা ওঁর লজ্জা হলো আসতে এদিকে—দেবো নাকি কাগজে ছাপিয়ে প্রফেশারের জীবন-কথা! ছাত্রের দল জানুক!

বিমল কহিল,—চুপ। চুপ। চুপ—এ কথা প্রকাশ হলে প্রোফেশারী করে আর খেতে হবে না। এ কালের যে ছেলে—

বড়দি কহিলেন,—খুব ডাক্তার যোদ্ধা। রোগীকে শুধু সারানো নয়—আমাদের বাড়ী থেকেও তাকে সরালেন। কি বলিস রে মঙ্গলা!

মঙ্গলা হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল, কহিল'—যাও বড়দি—

বড়দি কহিলেন,—তা, যাচ্ছি ভাই, তাই যাচ্ছি। ভয় নেই। যা-কিছু হৃদয়-বেদনা আছে, একান্তে তোর ডাক্তারকে খুলে বল্। সে সব আরাম করে দেবে।

শেষ

দরিয়া

নাটিকা

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত ;

প্রথম-অভিনয়-রজনী, ২৪শে চৈত্র ১৩৩৮

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

পূর্ব্বকথা

প্রসিদ্ধ কবি গোল্ডস্মিথ-রচিত She Stoops To Conquer ইংরাজী ভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট নাটিকা। ইহার রোমান্স ও রহস্যরসটুকু যেমন বিচিত্র, তেমনই উপভোগ্য।

উক্ত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ অবলম্বনে 'দরিয়া' রচিত হইয়াছে। নাট্যকার বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিব, সে ধৃষ্টতা আমি রাখি না। শুধু বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে নাট্যের উপাখ্যানে সুমধুর বৈচিত্র্য ও অনাবিল হাস্যরসের অবতারণা-কল্পেই 'দরিয়া' লিখিয়াছি। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

আর একটি কথা। মুসলমানী আদব-কায়দা ও রীতি-নীতি সম্বন্ধে আমি নিতান্ত অজ্ঞ। সে বিষয়ে আমার মুসলমান বন্ধুগণ যদি কোনরূপ ত্রুটি দেখেন তো তাহা ইচ্ছাকৃত নহে, আমার অজ্ঞানতা-বশতঃই ঘটিয়াছে ভাবিয়া আমাকে যেন ক্ষমা করেন, ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা। ইতি—

ভবানীপুর, গ্রন্থকার

১লা বৈশাখ, ১৩১৯

ভ্রাতৃবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস,

করকমলেষু—

ভাই ননীদা,

সহস্র দোষে দুষ্ট হইলেও আমার রচনার তুমি পক্ষপাতী। তাই আমার হাস্যময়ী দরিয়াকে তোমার হাতে দিলাম।

স্নেহার্থী সৌরীন্দ্র

চরিত্র

পুরুষ

আসফ খাঁ ... ... সিরাজ-নিবাসী সম্ভ্রান্ত ওমরাহ
ওসমান আলি ... ... পল্লীনিবাসী ওমরাহ ; ঐ বন্ধু
সেলিম ... ... আসফ খাঁর পুত্র
তসীর ... ... ঐ বন্ধু
ফয়নাশা ... ... গুলফমের প্রথম পক্ষের স্বামীর ঔরসজাত পুত্র
আবদুল্লা ... ... চটি ওয়ালা

ইয়ারগণ, বান্দা প্রভৃতি

নারী

গুলফম ... ... ওসমান আলির স্ত্রী
দরিয়া ... ... ঐ প্রথমা পত্নীর গর্ভজাতা কন্যা
ফিরোজা ... ... ওসমান আলির গৃহে পালিতা, অনাথা
আমিনা ... ... ঐ বাঁদী

নর্ত্তকীগণ, বাঁদীগণ প্রভৃতি

দরিয়া

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ওসমান আলির উদ্যান। দ্রাক্ষা-কুঞ্জ।

কাল—প্রভাত। কুয়াশার মধ্য দিয়া সূর্য্য উঠিতেছে।

বাঁদীগণ ডালি-হস্তে প্রবেশ করিল।

বাঁদীগণ। গান

আকাশে বাতাসে আলোকে সলিলে
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ!
আমরা গাহিব গান।
গাবো গোলাপের গান,
গাবো আপেলের গান,
গাবো আঙুরের গান,
দ্রাক্ষাকুঞ্জে নববসন্তে গাবো প্রণয়ের গান।
শীতের বাঁধন ফাগুন-পরশে, গিয়েছে আজিকে টুটি,
মরণ পেয়েছে ছুটি।
জড়ায়ে সবুজ গাছে
লতা স্বপনেতে আছে,—
যাবো তাহারি কাছে—
হেনা চামেলির কাণে কাণে, গিয়ে শোনাবো মিলন-গান—
থাকুক জগতে যুগল-হৃদয়ে প্রেম অফুরান!

[প্রস্থান।

বিরক্তভাবে ফিরোজার প্রবেশ

ফিরোজা। নাঃ, জীবনটাকে ক্রমে অসহ্য করে তুললে, দেখছি!

প্রস্তর-বেদিকার উপর বসিয়া মুখ ঢাকিল।

আমিনার প্রবেশ

আমিনা। ইস্—ব্যাপার দেখছি নেহাৎ সাদা-সিধে নয়।···বলি, ওগো বিবিসাহেব···

ফিরোজা। (মাথা তুলিয়া চাহিয়া) কে? আমিনা?

আমিনা। হ্যাঁ। আমি না হলে চোখ এমন সজাগ কার থাকে, বলো?

ফিরোজা। কি চাস্?

আমিনা। চাই না এমন কিছু! তবে দেখলুম, এই সকালে উঠে বিবিসাহেব মুখ ভার করে বাগিচার দিকে ছুটলে, তাই পেছু পেছু এলুম।

ফিরোজা। চাস্‌নে কিছু তো যা। তুইও আর জ্বালাসনে বাপু।

আমিনা। ব্যাপার তাহলে বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে। এঁ্যা! বলি, কথাটা কি, বিবিসাহেব? আইবুড়ো মেয়ে, সকালেই এত ঝাঁজ-মেজাজ যে মানায় না! বিয়ে-থা হতো, ভেবে নিতুম, রাত্রে বুঝি বনিবনা হয়নি, তাই সকালে মানের ভরে কুঞ্জে এসে বাতাসের সঙ্গে কথাবার্ত্তা সুরু করে দেবে। তা যখন নয়, তখন একটু অবাক হয়ে পড়েছি—তা সত্যি বলছি, ফিরোজা বিবি।

ফিরোজা। আমার মরণ হয় তো জুড়োই, আমিনা!

আমিনা। নাঃ—পাগল করলে! এমন সুন্দর সকাল! দিব্যি হাওয়া বইছে, ফুলের রাশ ফুটে উঠে চারিধারে গন্ধ বিলুচ্ছে, এমন সময় মনে বাঁচবার সাধই হয়, জানি। তোমার এমন বেয়াড়া বাই হলো কেন, বলো দেখি!

ফিরোজা। সত্যি আমিনা, আমার কিছু ভালো লাগে না।

আমিনা। না লাগা সম্ভব বটে···কিন্তু একটা কথা বলি, ফিরোজা বিবি, হট্ বলতেই কি সব হয়? সবুর করো, সবুরে মেওয়া ফলে। ফয়নাশা সাহেবের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির হয়েই আছে—কেবল দরিয়া বিবির একটা ঠিক-ঠিকানা হলেই ছুটো বিয়ে পেকে ওঠে! বাজনার আওয়াজে দেশের লোকের ঘুম হবে না, তখন।

ফিরোজা। সেই জন্যই আর কি আমি ভেবে সারা হলুম, একেবারে!

আমিনা। কেন হবে না, বলো?

গান

এমন প্রভাত, মরি! এমন মধুর বায়,
এমন ফুলের হাসি আকাশে ভাসিয়া যায়!
এমন পাখীর গানে, তিয়াসা জাগে যে প্রাণে,
কিবা সে সুধার লাগি? কেমনে মিটাই তায়!
জাগে কত সাধ আশা, কত প্রেম ভালোবাসা,
কারে দিব উপহার? কেহই নাহি রে হায়!

ফিরোজা। তামাসা নয়, আমিনা, যথার্থ বলছি, আমার আর বাঁচতে সাধ নেই।

আমিনা। তাই তো—আমারও হাসিটা যে ক্রমশ জমাট বেঁধে আসছে। কি ব্যাপার, খুলে বলো না, বিবি।

ফিরোজা। তুই কিছু জানিস না, আমিনা?

আমিনা। কি?

ফিরোজা। ফয়নাশার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার জন্য গুলফমবিবি উঠে পড়ে লেগেছে। আজ এই ভোরে এসে আমায় অস্থির করে তুলেছিল।

আমিনা। তাতে তোমার এমন রাগ হলো কেন? ফয়নাশা সাহেবকে তুমি বিয়ে করবে না?

ফিরোজা। না।

আমিনা। অবাক করলে তুমি! কত আদরের বউ হবে—এতে তোমার অরুচি কেন?

ফিরোজা। আমি বিয়ে করবো না।

আমিনা। বিয়ে করবে না! কি, একেবারেই বিয়ে করবে না? না, ফয়নাশা সাহেবকে বিয়ে করবে না?

ফিরোজা। একেবারেই বিয়ে করবো না।

আমিনা। নাঃ, এবার আমি ক্ষেপে যাবো, দেখছি। বলো কি, বিবি-সাহেব? কত কেতাব পড়ে প্রাণটাকে এত যত্নে গড়ে তুলেছ…

ফিরোজা। নিজের হাতে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবো।

আমিনা। তা হলে ভিতরে কিছু আছে, দেখছি! এমন কথাও কখনো শুনিনি। আইবুড়ো মেয়ে—গালে গোলাপের বাহার, কথায় গানের ঝঙ্কার, চোখে বিজলীর ধার, সারা দেহে ঝর্ণা বইছে! এ সব মিছে হবে? কেন বিবিসাহেব, এমন বেয়াড়া সাধ ধরে বসেছ? তোমার পায়ের তলায় পড়ে মাটি হয়ে যাবার জন্য লক্ষ লক্ষ পুরুষ একটা ইঙ্গিতের অপেক্ষা করছে শুধু! তাদের একেবারে নিরাশ করে তুলবে!

ফিরোজা। সে অনেক কথা, আমিনা।

আমিনা। শুনতে পাই না? আমিনাকে তুমি ভালোবাসো, তাই আমি অনুরোধ করছি। আমায় বলো।

ফিরোজা। সে এক দুঃখের কাহিনী, শোকের করুণ সঙ্গীত, আমিনা।

আমিনা। বলো—আমিনা সে দুঃখ তোমার সঙ্গে ভাগ করে নেবে।

ফিরোজা। বাবা মা তখন বেঁচে। তাঁদের আদরে হরিণশিশুর মত মনের সুখে আমি খেলে বেড়াতুম। কোনো বাধা নেই, বন্ধ নেই, অজস্র স্নেহ, সে কি সুখ, আমিনা! সেই সময়, পৃথিবীর চারিধার যখন আমার প্রাণের রঙে রঙীন হয়ে উঠেছিল, পাখীর গান, নদীর তান, ফুলের হাসি গভীর অর্থপূর্ণ মনে হতে লাগলো, জীবনকে অজস্র সাধ-আশার ফুলে ভরা কুঞ্জবন ভেবে ভাবছিলুম, তখন বসন্তের নবীন দূতের মত তিনি এসে আমার সেই জীবন-কুঞ্জের দ্বারে দাঁড়ালেন। তাঁর সে স্নিগ্ধ কান্ত মূর্তি দেখে আমার জীবনের ফুলগুলো আকুল উচ্ছ্বাসে ফুটে উঠলো, প্রাণের ভিতর সুপ্ত তারগুলো যেন জেগে উঠলো।

আমিনা। কে তিনি, বিবিসাহেব?

ফিরোজা। তাঁর নাম তসীর। তাঁকে দেখে আমি আপনাকে হারালুম, তিনিও আমাকে সোনার দৃষ্টিতে দেখলেন। আমাদের বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেল, এমন সময় তাঁকে কোনো কাজে বিদেশ যেতে হলো, বিবাহ স্থগিত রইল।

আমিনা। তার পর?

ফিরোজা। তার পর কত স্বপ্নের মধ্য দিয়ে স্বপ্নে দিনরাত্রিগুলো কেটে চললো। শেষে একদিন ভীষণ বজ্রাঘাতে আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। জেগে চেয়ে দেখি, আমার কেউ নেই—বাবা, মা—কেউ না। আমি অনাথা।

আমিনা। তার পর বুঝি, আমাদের দরিয়া বিবির মা তোমাকে এখানে নিয়ে এলেন! কি সম্পর্ক, ঠিক জানি না।

ফিরোজা। দরিয়ার মা আর আমার মা সম্পর্কে বোন।

আমিনা। ও,—তাই আমাদের বিবি-সাহেবকে তুমি মাসীমা বলো! সম্পত্তিগুলোর কি হলো?

ফিরোজা। কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল, কিছু জানি না আমিনা। তবে বাবা হীরে-জহরতের পাহাড় জমিয়েছিলেন,—সেগুলো সব গুলফম বিবির হাতে। সেগুলো পাছে ছাড়তে হয়, তাই ওঁর এত জিদ, ফয়নাশার সঙ্গে বিয়ে দিতে!

আমিনা। বেশ, ফয়নাশা সাহেবকে পছন্দ না হয় আর কারুকে বিয়ে করো।

ফিরোজা। না।

আমিনা। তুমি ভেবেছ, তোমার তসীর সাহেব এ্যাদ্দিন বিয়ে করেন নি? তোমার মত উৎকট গোঁ নিয়ে বসে আছেন? তিনি পুরুষ মানুষ—তোমার মত পাগল হননি যে কবেকার কি একটা ছেলেমান্ষী নিয়ে বিয়ে না করে, তোমার জন্য সারা জীবন বুক চাপড়ে মরবেন! তোমারও অন্যায়, বিবিসাহেব—তুমি এত লোক থাকতে সবাইকে বাদ দিয়ে একটির জন্য তোমার অসম্ভব ঝোঁক রাখা, ভারী অন্যায়।

ফিরোজা। দরিয়া আসছে।

আমিনা। দরিয়া বিবি এ সব কথা জানে?

ফিরোজা। জানে।

আমিনা। কি বলে? ফয়নাশার সঙ্গে বিয়েয় মত আছে?

ফিরোজা। না! ও-ও বলে, হৃদয়টা একবার দেওয়া যায়।

আমিনা। কে জানে, বাপু, ও সব কথা বুঝতে পারি না। আমি তো জানি, বিয়ে একটা হলেই হলো, সে রহিমের সঙ্গেই হোক, আর করিমের সঙ্গেই হোক। তবে হ্যা, মেয়েমানুষের সঙ্গে না হয়ে পুরুষমানুষের সঙ্গে যেন হয়। পুরুষমানুষ স্বামী না হলে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে পারবো না। মেয়েমানুষ স্বামী হলে সোয়াস্তি পাবো না। ভারী একগুঁয়ে! আমি একদিকে যাবো তো, তিনি অন্যদিকে যাবেন—দুজনের মতের মিল কখনো হবে না। পুরুষমানুষগুলো অতি নিরীহ, গোবেচারা,—গোলাম, খুড়ি, স্বামী করবার যোগ্য বটে! তবে হ্যা, নাকটা চোখটা থাকা চাই তার। এই আর কি সাদা কথা।

ফিরোজা। তোর কথা শুনে রাগ ধরে, হাসিও পায়।

আমিনা। আমার স্পষ্ট কথা বিবি! অত মন-জোগানো কথার ধার ধারি না আমি।

দরিয়ার প্রবেশ।

দরিয়া। তুই এখানে! আর আমি চারধারে খুঁজে মরছি! সকালে এখানে কেন?

আমিনা। সকালে পাখীর গানের সঙ্গে প্রাণখানা ভাসিয়ে দেবে বলে এসেছে!

দরিয়া। আজ কারো ফুল তোলা হলো না এখনো আমিনা? ফুল পেলুম না!

আমিনা। কি জানি? দেখি!

প্রস্থান

দরিয়া। কি হয়েছে, ফিরোজ?

ফিরোজা। সেই পুরোনো কাহিনী। ফয়নাশার সঙ্গে বিয়ের জন্য অবিরাম অনুরোধ!

দরিয়া। তার জন্য নূতন করে দুঃখ কেন?

ফিরোজা। দুঃখ নয়। কাণটা আর প্রাণটা বাঁচাবার জন্য এখানে এসে আশ্রয় নিছি।

দরিয়া। ফয়নাশার সঙ্গে বিয়ের কথা কতকাল ধরেই শুনে আসছি—কোথায় বিয়ে!

ফিরোজা। আজ শুনলুম, তোমার বিয়ের ঠিক হলেই নাকে লোহার বাঁধনে বাঁধা পড়তে হবে!

দরিয়া। আমার বিয়ে! তাহলে তুমি নাসারন্ধ্রে সর্ষপ-তৈল লাগিয়ে তোফা নিদ্রা দাও!

ফিরোজা। ওগো, অত দুঃখের কারণ নেই! শুনেছি—তোমার বিয়ের কথা মৃদুমন্দভাবে চলা সুরু করেছে! ক্রমে বাঁশি বাজে!

দরিয়া। তোমারও ফাঁসির দিন তাহলে ঠিক হয়ে গেছে বলো!

বাঁদীর প্রবেশ

বাঁদী। জনাব আলি সেলাম পাঠিয়েছেন। তিনি ঘরে আছেন।

দরিয়া। চ, যাচ্ছি। আয়, ফিরোজ।

ফিরোজা। আবার।

দরিয়া। আমি তোকে আশ্বাস দিচ্ছি—তোর কোন ভাবনা নেই। বাগানে বাসা নিতে হবে, এমন দশা এখনও হয়নি তোর।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ

একখানি পত্র পাঠ করিতে করিতে ধীরে ধীরে ওসমান আলি প্রবেশ করিল। পশ্চাতে গুলফমের প্রবেশ।

গুলফম। কার চিঠি?

ওসমান। কে? গুল! আমার বন্ধু আসফ খাঁ চিঠি লিখেছেন।

গুলফম। কি লিখেছেন?

ওসমান। তাঁর ছেলে সেলিমের সঙ্গে দরিয়ার বিবাহ দেবার জন্য। সেলিম এখানে শীঘ্রই আসছে।

গুলফম। তা হলে ফয়নাশার বিয়েরও একটা ঠিকানা এবার হবে।

ওসমান। ফয়নাশার বিয়ে!

গুলফম। জানো না বুঝি! আমি অনেক দিন থেকেই মেয়ে ঠিক করে রেখেছি।

ওসমান। ওকে কে মেয়ে দেবে?

গুলফম। বাইরে কোথাও খুঁজতে হবেনা গো। মেয়ে ঘরে আছে।

ওসমান। ঘরে আছে! কে?

গুলফম। ফিরোজা।

ওসমান। ফিরোজা!

গুলফম। হাঁ, ফিরোজা নয় তো আর কে! আমি সে ফিরোজার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে সব ঠিক করেছি।

ওসমান। ফিরোজা ফয়নাশাকে বিয়ে করতে রাজী হবে?

গুলফম। কেন হবে না?

ওসমান। ঐ মূর্খ মর্কটটাকে ফিরোজা বিয়ে করবে! ফিরোজা ওর মৌলভী হয়ে ওকে লেখাপড়া শেখাতে পারে।

গুলফম। তোমরা সবাই ওকে এমন হেনস্তা করবে, তা ওর ভালো কি করে হবে! বেচারা ফয়নাশা!

ওসমান। হেনস্তা করেছি কবে, বলো? ওর নিজেরই মানুষ হবার কোন চেষ্টা দেখতে পাইনে! জানোয়ারের মত বুদ্ধিটি যে দাঁড়িয়েছে, তার জন্যে দায়ী যদি কেউ থাকে তো, তুমি! নিজে কখনও শাসন করবে না, অপরে শাসন করলেও তোমার রাগ হবে!

গুলফম। সাধে করি! ওকে দেখচো তো! ও কি বাঁচবে? হয়ে অবধি, ব্যামোর ব্যামোয় বাছা সারা হয়ে গেল!

ওসমান। ব্যামো! ব্যামো থাকলে দিন দিন মানুষ এমন ফুলতে পারে!

গুলফম। ও তোমার পয়সা নষ্ট করে ফোলেনি, তা বলে। ওর নিজের যা ধুলো-গুঁড়ো আছে, তাতে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে ও খেতে পারে!

ওসমান। রাগ করো না, গুল, আমি সে কথা বলছি না!

গুলফম। তোমরা কেউ ওকে দেখতে পারো না! ফিরোজার সঙ্গে ওর বিয়েটি দেবো, তাতেও বাগড়া দিচ্ছ!

ওসমান। ফিরোজার মা-বাপ নেই! আমিই ওর অভিভাবক। নিজের মেয়েকে যে রকম পাত্রের হাতে দিতে পারি না, সে রকম পাত্রের হাতে ফিরোজাকেও দেবো না আমি।

গুলফম। ফিরোজার নিজের পছন্দ হয় যদি—তবুও?

ওসমান। ফিরোজা নিজে যদি ফয়নাশাকে পছন্দ করে, তাহলে আমি কিছু বলবো না—কিন্তু সে লেখাপড়া শিখেছে, ফয়নাশাকে তার মনে ধরবে কেন?

গুলফম। মনে না ধরলে কি আর আমি ঠিক করেছি!

ছুটিয়া ফয়নাশার প্রবেশ

ফয়নাশা ফয়নাশা, কোথায় যাচ্ছিস্? শোন—

ফয়নাশা। হ্যাঁ—শুনবে? আমার ফুরসৎ নেই!

গুলফম। কি এমন মহা-কাজে ব্যস্ত, শুনি?

ফয়নাশা। কি কাজ শুনবে! করিম চাচার ছেলে হয়েছে, তাই আজ সরাইয়ে মহাধুম! নাচ, গান, খাওয়া—আমায় গিয়ে তদারক করতে হবে সব।

গুলফম। আবার ঐ সব ছোটলোকদের সঙ্গে মেশা! তোর প্রবৃত্তি এত নীচ হলো কেন?

ফয়নাশা। পাগলের মত বকে, দ্যাখো না! ছোটলোকের সঙ্গে মেশা! এরা নৈলে ফুর্ত্তি জানে কেউ? মত সব—কেতাবের বুল ঝাড়ে অন্ধ লোকগুলো,—মুখে মিষ্টি, মনে হারামি, দূর করে দাও তাদের!

গুলফম। আজ যেতে পাবি নে, তুই। একদিন বাড়ীতে থাক্!

ফয়নাশা। বাড়ীতে থাক্! আর ওরা ধুমধামে নাচ গান ভোজ লাগিয়ে দিক? সরো, সরো, পথ দাও।

গুলফম। একদিন তুই না গেলে ওরা মরে যাবে না!

ফয়নাশা। ওরা না মরুক, না গেলে আমি মরে যাবো। সরো, সরো, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

গুলফম। (হাত ধরিয়া) এই ধরলুম। কেমন যাবি, দেখি।

ফয়নাশা। কি! কুস্তি লড়বে? জোরে পারবে আমার সঙ্গে? তবে লাগ্, লাগ্, লাগ্, লাগ্! এই ফর্শা!

ছুটিয়া প্রস্থান

গুলফম। ফয়নাশা, ফয়নাশা— (পশ্চাদনুসরণ করিল।)

ওসমান। দুজনেই দুজনের মাথা খাচ্ছে! এই জানোয়ারকে ফিরোজা বিয়ে করবে! অসম্ভব।

গুলফমের পুনঃ-প্রবেশ

কি, ছেলের সঙ্গে পারলে?

গুলফম। যেখানে আমোদ-আহ্লাদ, সেইখানে যাবে!

দরিয়া ও ফিরোজার প্রবেশ

দরিয়া। আমায় ডেকেচো বাবা?

ওসমান। হাঁ, মা। কথা আছে।

দরিয়া। কি কথা, বাবা?

ওসমান। সিরাজে আমার এক বন্ধু আছেন, তাঁর নাম, আসফ খাঁ। আমার কাছে কতবার তাঁর নাম শুনেচিস্ তো?

দরিয়া। শুনেছি।

ওসমান। আসফের এক ছেলে আছে। ছেলেটির নাম, সেলিম। যেমন বিদ্বান, তেমনি তার নম্র স্বভাব!

দরিয়া। বসবে, চলো বাবা—গল্পটা ভালো করে শোনবার ইচ্ছে হচ্ছে। এ গল্পটা নিয়ে আমায় একটা কবিতা লিখে দিতে হবে, বুঝি?

ওসমান। আবার পাগলামী করে! বন্ধু তোর সঙ্গে সেলিমের বিয়ের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন!

দরিয়া। বটে! তার পর?

ওসমান। তার পর সেলিম এখানে দু'একদিনের মধ্যে আসছে! তোকে দেখে যদি তার পছন্দ হয়, তাহলে শুভ কাজ চট্‌পট্ শেষ হয়ে যাবে!

দরিয়া। আর যদি পছন্দ না হয়?

ওসমান। নাঃ, পছন্দ হবে না? একবার আয়নায় নিজের চেহারাখানা দেখিস দিখি, মা। আমার চোখে কোথাও এতটুকু খুঁত দেখিনে।

দরিয়া। বলো না বাবা, যদি পছন্দ না হয় তো, কি হবে?

ওসমান। তা হলে বুঝবো, তার চোখ নেই! আমায় মেয়ের আবার বিয়ের ভাবনা! এমন পরীর মত রূপ!

দরিয়া। পরী দেখেছ, বাবা?

ওসমান। পরী কি চোখে দেখা যায়, মা?

দরিয়া। তবে কি করে বুঝলে, আমার রঙ পরীর মত?

ওসমান। কেতাবে পড়েছি।

দরিয়া। ও, সেই কেতাবের পরী! তাই বলো! তা সে-পরীর তো ডানা আছে, আমার ডানা নেই!

ওসমান। নাঃ, তোর সঙ্গে পারা ভার।

দরিয়া। আচ্ছা বাবা, এ'তো গেল ও-পক্ষের কথা! আর যদি তোমার ঐ খোদাবন্দকে আমার না পছন্দ হয়?

ওসমান। কেন হবে না, মা? ছেলেবেলায় তাকে দেখেছিলুম এক বার! খাশা ছেলে! যেমন রূপ, তেমনি গুণ। বন্ধু লিখেচেন, বেশ সুশিক্ষিত, নম্র, সুচরিত্র, শুধু একটু লাজুক।

দরিয়া। তবে আর ভাবনা নেই। আমার খুব পছন্দ হয়ে গেছে বাবা! আমি এখন চল্লুম—একটা কবিতা লিখে ফেলিগে তার নামে। আয় ফিরোজ!

দরিয়া ও ফিরোজার প্রস্থান

গুলফম। আচ্ছা মেয়ে! এতটুকু লজ্জা নেই, তোমার কাছে। নিজের বিয়ের কথা নিয়ে স্বচ্ছন্দে মস্করা করে! লেখা-পড়া শেখানোর এই তো ফল!

ওসমান। এই রকমই আমার পছন্দ। আমার মেয়ে আমার কাছে তার মনের সুখ-দুঃখের ছোট কথাটুকুও গোপন করে রাখবে, প্রকাশ করে বলবে না? কেমন সরলভাবে নিজের কথাটুকু বল্লে, বলো? যেন একটা পাখী গান গেয়ে গেল! অথচ লজ্জাটুকু মুখে-চোখে কেমন জ্বল-জ্বল করছিল! বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলে না! চলে গেল, তাও কি স্বচ্ছন্দ গতিতে! আহা, মাতৃহারা কন্যা আমার!

গুলফম। থাকগে, আমার ও-সব কথায় দরকার কি! ভালো কথা, এখন বিয়ের ধূমধাম বাধতে চললো, আমার সে কথাটা রাখবে কি?

ওসমান। কি কথা।

গুলফম। এই বাড়ীটা ভেঙ্গে-চুরে নূতন কেতায় গড়া! নেহাৎ সেকেলে ধরণের বাড়ী—পুরোনো পুরোনো।

ওসমান। কেন? পুরোনো বাড়ী মন্দ কি! আসল কথা কি জানো, গুল? আমি পুরোনো জিনিষপত্তরই ভালোবাসি। পুরোনো বাড়ী, পুরোনো চাকর-বাকর, পুরোনো কাব্য-গল্প আর গুল আমার এই পুরোনো স্ত্রীটি! (গুলফমের চিবুক ধরিয়া নাড়িল)

গুলফম। থামো। বুড়ো বয়সে আর রঙ্গ করতে হবে না!

প্রস্থান

ওসমান। চাকর-বাকরগুলোকে একটু শিখিয়ে-পড়িয়ে রাখতে হবে।

প্রস্থান

দরিয়া ও ফিরোজার পুনঃ-প্রবেশ

ফিরোজা। আসফ খাঁ—সিরাজ নগর—সেলিম!

দরিয়া। তুমি যে দেখছি, আমার প্রিয়তমের প্রেমে পড়লে!

ফিরোজা। এ নাম···আমি শুনেছি। হাঁ—সেলিম—হাঁ—

দরিয়া। কাব্যের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে! বাঃ! এবার কি পতন আর মূর্চ্ছা হবে?

ফিরোজা। হাঁ। ঠিক! তাঁরই কাছে নাম শুনতুম। তাঁর বন্ধু! তাহলে দরিয়া, একটা কাজ করতে হবে তোকে!

দরিয়া। কি কাজ? দুটি হাত ধরে এক করে দিতে হবে? না, বেশ···

ফিরোজা। ঠাট্টা নয়। সেলিমের কাছে তাঁর খবরটা নিস, ভাই!

দরিয়া। আমার কি তখন আর কারো কথা মনে থাকবে? দুজনে দুজনের পানে চেয়ে বিভোর হয়ে থাকবো, জগৎ-সংসার পায়ের তলা থেকে সরে যাবে! এমনি ধারাই তো পড়েছি কেতাবে, না?

ফিরোজা। তোর সঙ্গে কথা কইবো না আর, অমন করিস যদি! ঠাট্টা হচ্ছে! আচ্ছা, দেখবো, তোমারও হাসিখেলা এবার কোথায় থাকে! তখন আমিও অল্পে ছাড়বো না!

গান

ওগো, এ নয় মস্করা!
এবার আমি বুঝে নেবো তোমার শীকার করা!
হাসির ফাঁসে বেঁধে নেবে, নয়নে বাণ ছুটাবে,
নিজে ফাঁদ পেতে—শেষে নিজেই তাতে পড়বে ধরা!

তৃতীয় দৃশ্য

সরাই

আবহুল্লা, ফয়নাশা, ইয়ার ও নর্ত্তকীগণ।

সকলে মদ্য, বাদ্য ও আমোদপ্রমোদ লইয়া মত্ত।

ফয়নাশা। গান

তেরে আঁখিয়া, তেরে আঁখিয়া!
উস্মে জহর জলে, মেরি দিল পিছু চলে!
বিবি, সমঝ হালে, লে লেও, মুঝে সেঁইয়া!
মেরে জান, তু মেরে জান,
যব রাখো, ম্যয় রহি,
শুন্ হারামি বাত, ম্যয় সাঁচা কহি,—
আও, পাশ আও, পিয়ার করো,
পড়ি, তেরি পৈঁইয়া!
দিল তুঝে দিয়া, ম্যয় তুঝে দিয়া!

ইয়ারগণ। আরে বাঃ, বাঃ, বহুৎ আচ্ছা, মিয়া-সাহেব!

১ ই। আগুন চাপা ছিল, এ্যাদ্দিন!

২ ই। ফয়নাশা সাহেব এমন! আরে তোফা!

ফয়নাশা। এই চুপ, চুপ, কারা আসছে।

বান্দা; তৎপশ্চাৎ সেলিম ও তসীরের প্রবেশ

বান্দা। এঁরা সাহেব ওসমান আলির বাড়ী যাবেন বলে পথ খুঁজছিলেন। তাই আমি এখানে নিয়ে এলুম।

আব। তা বেশ হয়েছে। এই যে—

ফয়। চুপ, চুপ! বান্দা তুই যা।

বান্দার প্রস্থান

(স্বগত) ওঃ! বুঝেছি, দরিয়ার জন্য সিরাজ থেকে যার আসবার কথা ছিল, সে নিশ্চয় এদের মধ্যে একজন! একটু মজা করা যাক।

সেলিম। তুমিও যেমন তসীর, এই মাতালগুলোর কাছে আবার খোঁজ পাবো!

তসীর। লোকজনের কাছে ইঙ্গিতে পরিচয় জানালে কোন্‌কালে সেখানে পৌঁছুনো যেত। তোমার আবার বেয়াড়া সাধ হলো, আচমকা গিয়ে সেখানে দাঁড়াবে—তাই এত গোল!

সেলিম। তা বলে রাস্তার দুধারে হাঁক পিটে যাবো না আমি!

তসীর। এখানে মিছে আসা। মদ খেয়ে এরা মাতাল হয়ে আছে, জবাব পাবে এদের কাছে—হুঃ!

ফয়নাশা। মিয়াসাহেব, বুঝি ওসমান আলি সাহেবের বাড়ীর খোঁজ কচ্ছেন? জানেন, এ জায়গার নাম কি?

তসীর। না, সেই খোঁজটুকু বলে দিলে বহুৎ সেলাম দি।

ফয়নাশা। আচ্ছা, যে পথে আসছিলেন, সে পথের নাম জানেন?

তসীর। না, আপনি এখন মেহেরবানি করে যদি বলে দেন!

ফয়নাশা। বাঃ! কোথায় এসেছেন, জানেন না, কোথায় যাবেন, তা জানেন না, কোন্ পথ ধরে এলেন, তাও জানেন না! এ'ত দেখছি আপনারা পথ হারিয়ে হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য)

সেলিম। সে কথা আর নূতন করে বলতে হবে না।

ফয়নাশা। আচ্ছা, কোত্থেকে আসছেন, শুনি?

সেলিম। সে কথা শোনাবার কোন প্রয়োজন দেখছিনে।

ফয়নাশা। বলি, বলতে দোষই বা কি! তা যাক, মোদ্দা কোন্ ওসমান আলি সাহেবের বাড়ী যাবেন? এক জন বুড়ো ঐ নামের আছে—ভারী খিটখিটে মেজাজ, বদ চেহারা, কিপটের ধাড়ী,—তার এক ছেলে আর এক মেয়ে…

সেলিম। আমরা তাঁকে দেখিনি কখনো, চেহারাটা কাজেই মিলিয়ে নিতে পাচ্ছিনে।

ফয়নাশা। সেই ওসমান আলি, যার একটা কদাকার ঢ্যাঙ্গা আইবুড়ো মেয়ে, আর ভবিষ্যুক্ত একটি সুন্দর ছেলে আছে?

সেলিম। আমরা উল্টোরকম শুনেছি। আমরা জানি, তাঁর মেয়েটিই সুশ্রী, শিক্ষিতা, আর ছেলেটা মর্কট!

ফয়নাশা। সেটা তাহলে ভুল শুনেছেন। আপনাদের দোষ নেই। তা সে বাড়ী পৌঁছুনো আজ আর হচ্ছে না, রাত হয়ে যাবে। সে কি এখানে? ওঃ, কোথায় সে! মাঠ ভেঙ্গে, জলা পার হয়ে, জঙ্গল ফুঁড়ে, পাহাড় ঘুরে, ব্যস্‌রে, সে যা পথ!

তসীর। পথটা জানো যদি তো, মেহেরবানি করে বলো, নাহলে সরে পড়ি।

ফয়নাশা। চটো কেন সাহেব!…পথ চাও… দিচ্ছি বাৎলে। এই ত এখানকার দরজা দিয়ে বেরুলেন। বেরিয়ে পথে পড়লেন, কেমন? পথে পড়ে, ডান-বাঁ-ডান-বাঁ, ডাইনে চল্লেন। চল্লেন, চল্লেন, গিয়ে দেখবেন একটা মস্ত বাদামের গাছ। বাদামের গাছটা, হুঁ, বাঁয়ে রেখে সোজা যাবেন। সোজা যেতে যেতে, বাঁয়ে এক গলি। গলিতে ঢুকেই একটা তেমাথা। দুপাশের রাস্তাদুটো পড়ে রইলো, বাকীটা ধরে সোজা চললেম। সোজা গিয়ে ডাইনে ফিরলেন, তার পর বাঁয়ে, তার পর আবার ডাইনে, তার পর আবার বাঁয়ে, বাঁয়ে, বাঁয়ে, বাঁয়ে,…তার পর পাহাড়ের ধারে এলেন। সেখানে

একটা ছোট জল্লা আছে, সেটাকে ডাইনে রেখে আবার সোজা চললেন। যেতে, যেতে, যেতে, যেতে, একটা খেজুর বাগানের ধারে পড়বেন। তার বাঁ-গায়ে একটা নালা, সেই নালার উপর একটা গাছ-ফেলা সাঁকো, সেই সাঁকোটা পার হয়ে আবার বাঁয় ঘুরলেন···

সেলিম। থামো, থামো, মিয়া, এ যে একেবারে জাহান্নমের দোরে গিয়ে পৌঁছুবো।

ফয়নাশা। (আপন-মনে বক্সিয়া চলিল) বাঁয় ঘুরে একটা চৌমাথা।

তসীর। দোহাই, মিয়া থামো।

সেলিম। আর চৌমাথায় কাজ নেই। এইতেই মাথা খারাপ হবার লক্ষণ হয়েচে।

ফয়নাশা। পথটা একটু বাঁকা?

সেলিম। হাঁ, ঈষৎ।

তসীর। আচ্ছা, রাতটা এখানে পোহানো যায় না, আজ?

ফয়নাশা। কেন যাবে না? একটা বিছানা খালি ছিল—তার একটুখানি একজনের জন্য ঠিক হয়ে গেছে—বাকী জায়গাটুকুতে আপনাদের দুজনকে—তা ধরতে পারে।

সেলিম। চলো তসীর, গাছতলায় শুয়ে রাত কাটাবো।

তসীর। আচ্ছা, কাছাকাছি অন্য সরাই নেই?

ফয়নাশা। অন্য সরাই! তা—হাঁ, আছে একটা। এই কাছেই। এই পথে পড়ে, সোজা খানিক গেলেই একটা বাগান, সেই বাগানের বাঁধারে একটু ঘুরলেই একটা সরাই পাবেন। বাড়ীটার ফটকে দুখানা গণ্ডারের চামড়ার ঢাল ঝুলছে, দেখবেন।

আবদুল্লা। (জনান্তিকে) আলি-সাহেবের বাড়ীকে সরাই বলচো!—এঁ্যা!

ফয়নাশা। (জনান্তিকে) চুপ! তবে আর মজা কি! (প্রকাশ্যে) চটিওয়ালা এক বুড়ো, সভ্যভব্য কাপড়চোপড় পরে, বয়েদ-ওলা কথা কয়—এই যা দোষ, বলবে'খন, তার বাপ একজন মস্ত ওমরাও ছিল, খুড়ো ভারী সদাগর, নানা ছিল উজীর।

সেলিম। বকুকগে, আস্তানা যদি সে দিতে পারে—তার কিছু এসে যাবে না।

ফয়নাশা। তা ঠিক—আর তোফা সব নাচনা-ওয়ালী আছে বুড়োর হাতে। নেচে গেয়ে মশগুল করে দেবে।

সেলিম। বাগানের বাঁ ধারে ঘুরলেই তা হলে সরাই পাবো—কেমন?

ফয়নাশা। বাঁ-ধার! হাঁ, ঠিক বাঁ ধারে ঘুরে যাই। তোফা সরাই! আচ্ছা, চলুন—আমি না দেখিয়ে দিয়ে আসি—(ইয়ারগণের প্রতি) আমি এখনি আসচি! এখন এই সন্ধ্যে—সারারাত আজ ফুর্তি চালাবো—কেউ পালিও না।

সেলিম, তসীর ও ফয়নাশার প্রস্থান

আবদুল্লা। আচ্ছা শয়তান! ওসমান আলি সাহেবের বাড়ীটাকে সরাই বলে এদের নিয়ে চল্লো।

১ই। শয়তানি মতলব।

২ই। কিন্তু ভারী আমুদে।

৩ই। ওহে, নাচ-গান চালাও। (নর্ত্তকীদের প্রতি) নাও গো, অনেকক্ষণ জিরিয়েচো—আবার উঠে হাত-পা ছোড়ো।

নর্ত্তকীগণ।

গান

সাকি, পেয়ালা দে ভরি!
কানে-কানে পূরোপূরি!
যৌবন-সুধা অধরে-অধরে ঝলকে ঝলকে পড়ে ঝরি!
তুষার-শুভ্র গ্রীবাটি হেলায়ে, বাঁকা কটাক্ষ হানো মোরে,
চুলে গাঁথি ফুল, এনে দে রে ভুল, নিবিড় স্বপন ঘুমঘোরে!
আজি এ সাঁঝের শেষে, এসো, মধুর হেসে,
কাজল-নয়নে, রচি মোহ মায়া,
এসো, এসো, ত্বরা করি!
পেয়ালা দে ভরি!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ওসমান আলির বাটীর কক্ষ

সেলিম ও তসীর

সেলিম। ভাগ্যে এই চটিটা পাওয়া গেছলো, তাই সব দিকে পরিত্রাণ পাওয়া গেল।

তসীর। তার চেয়ে [illegible] সাহেবের বাড়ী পৌঁছুতে পারলে [illegible] নিশ্চিন্ত হতুম। খাতির-যত্ন [illegible] থাকা যেত!

[illegible]। ঐটুকুতে আমি নারাজ। আলি সাহেবের [illegible] কাছে এসে পড়েছি, তা ভেবে আমার আরো [illegible] হচ্ছিল।

তসীর। সে কি হে! কত আরাম পাওয়া যেত রাত্রিটায়!

সেলিম। আরাম! মোটে নয়—ভাবনায় আমার একটা উৎকট ব্যায়রাম জন্মে যেত।

তসীর। তার মানে?

সেলিম। আরে, সেখানে পৌঁছুলেই মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে আদর আপ্যায়িত হতে হতো। ওতে আমি নারাজ! আলি সাহেবের মেয়ের সঙ্গে লম্বর রেখে, কায়দা মেনে কথা কইতে হবে—এই ভাবনায় আমার বুকটা ধড়ফড় করে উঠছে!

তসীর। তবে দরিয়া বিবির সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইবে কি করে? পছন্দ করে তবেই তুমি বিয়ে করেছো!

সেলিম। নাঃ, বিয়ে দেখছি, অদৃষ্টে নেই! ও ভাই, হিন্দুদের মধ্যে বেশ। শুনেছি, তাদের বাপ মা কি অভিভাবকরা কেউ বিয়ের সব পছন্দ করাকরি কথাবার্ত্তা সেরে নেয়। তার পর বর একদিন সেজে-গুজে গিয়ে বোবার মত ঘাড়টি হেঁট করে বিয়ে করে আসে। চমৎকার নিয়ম!

তসীর। তবে তুমি এখানে এলে, কিসের জন্য? খাঁ-সাহেব যে পাঠালেন!

সেলিম। শুধু তোমার জন্য এসেছি। তুমি বললে, তোমার ফিরোজা বিবি আলি সাহেবের বাড়ী আছে, তাই যদি তোমাদের মিলন ঘটাতে কিছু সাহায্য করতে পারি, এই জন্য এসেছি। নৈলে আমার বিয়ে যথার্থ বলছি, বন্ধু, যদি উকিল দিয়ে বিয়ে করবার কোন বিধান হয়, তবেই হবে! ... ...টা কাল হিন্দুদের আইবুড়ো কার্ত্তি... ...থাকবো!

তসীর। তা ... ...লাল আলি সাহেবের বাড়ী গিয়ে তুমি কি ... ...া করবে বলো দেখি?

সেলিম। ...খো, এ সরাইটা বেশ ঝরঝরে। এখানে হপ্তাখা... ...কাটিয়ে দিলে মন্দ হয় না! ভাবছি, এই-খানে ...স্তানা নিয়ে থাকা যাক—দু দিন। তার পর ফি... ...া বিবির সঙ্গে তুমি সেখানে গিয়ে দেখাশুনা ক..., সব ঠিকঠাক করে ফেল—আমিও এখানে না হয় ...পেক্ষা করতে রাজি আছি। তার পর তোমার কাজ হাসিল হলে, ফিরে গিয়ে বাবাকে বলবো,—বিয়ে করা আমার দ্বারা পোষাবে না।

তসীর। চমৎকার ব্যবস্থা! দরিয়া বিবির সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে আলাপ করতে এত ভয়! আশ্চর্য্য! অথচ বাঁদী নাচউলি পেলে তোফা রসিকতা করতে পারো তো! আরে দরিয়া বিবি মেয়েমানুষ, তারাও তাই।

সেলিম। তা নয়। এরা পুরুষের নাককাণ কেটে দেয়! থাক্ ও সব কথা। এ সরাইটা আমার ভারী পছন্দ হয়েছে।

তসীর। ঘরগুলো বেশ সাজানো, ঝরঝরে! এমন সরাই সহরেরও বড় একটা দেখা যায় না।

সেলিম। কিন্তু চটিওয়ালাটা কিছু বকে বেশী ভদ্রখানা জাহির করে খুব! একেবারে আমাদের নামধাম সব জেনে ফেলেছে—আর নাম ধরে মুরুব্বির ম... কেমন কথাবার্ত্তা কইলে, বলো!

তসীর। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—ও চটিতে সে লোক ঠিক বলেছিল—বলে, ওর বাপ এক মস্ত ওমরাও ছিল-

সেলিম। শুধু তাই? আর ওর কে নানা ছি... বাদশা ওয়াজির সার উজীর! বেচারা!

তসীর। বেজায় লম্বাচওড়া কথা কয়!

সেলিম। কথায় কি এসে যায়?

তসীর। এই যে বুড়ো আসছে!

সেলিম। তাই তো! আরে, এসো, এসো, বুড়ো মিয়া!

ওসমান আলির প্রবেশ

রাত্রে ... বার বন্দোবস্ত করচো কেমন মিয়া?

তসীর। যা-তা খাওয়া আমাদের অভ্যা... নেই।

সেলিম। দুখানা জিভের পরোটা, চারখানা কো... আর তোমার বাসি পোলাও-কোর্ম্মা চালিয়ে দিও না যে দাঁও বুঝে!

তসীর। কি তৈরী হয়েছে, শুনি? বেজায় ক্ষি... পেয়েছে, মিয়া।

...) এ কি বলে এরা? (প্রকাশ্যে ... ...ই পাবে। তার জন্য ভাবনা নেই। ...

সেলিম। (জনান্তিকে) দেখেচো কথা ক... আদব-কায়দা মোটে জানে না!

তসীর। (ঐ) যাক্! বুড়ো মানুষ!

সেলিম। খানাটা কিন্তু শুনতে চাই আ... নিজেদের ইচ্ছামত খেতে চাই, মিয়া, তোমার খেয়াল খাওয়া হতে পারে না।

তসীর। হাঁ, আমাদের দস্তুরই এই—

ওসমান। আমি দেখছি—খপর নিচ্ছি এই যে—

সেলিম। যাও, যাও, মিয়া—এখানে বস... দরকার নেই।

তসীর। আপনার চরকায় তেল দাওগে! ... পাকাওগে।

ওসমান। হাঁ। এই যে যাই...

সেলিম। ভালো কথা মিয়া,—অমনি বিছান... কেমন হয়েছে, স্বচক্ষে দেখতে চাই।

ওসমান। কিছু ভাবতে হবে না। আমি যা... নিজে তদারক কচ্ছি।

সেলিম। না, না, ও কথা শুনছি না। চ... নিজেরা দেখবো।

ওসমান। বেশ, তবে এসো। (স্বগতঃ) এ কি এদের ব্যবহার! আমি স্তম্ভিত হয়েছি, সব দেখে। ভদ্রলোকের বাড়ী এসে ভদ্রলোকের সঙ্গে এমনিভাবে—না, আমার বয়সে এমন ভব্যতা, এমন বেয়াদবী!…এরা আবার শিক্ষিত, নম্র, শান্ত!

[ওসমান ও সেলিমের প্রস্থান

তসীর। বুড়ো চটিওয়ালাকে নিয়ে সময় কাটবে, মন্দ না! মাথায় কিছু ছিট আছে! এ কি ফিরোজা! ফিরোজা এই চটিতে—

ফিরোজার প্রবেশ

ফিরোজা। তসীর! তুমি! তুমি এখানে! কি আশ্চর্য্য!

তসীর। তুমি আশ্চর্য্য হয়েছ! তার চেয়ে আমি আরো আশ্চর্য্য হচ্ছি যে, আমার ফিরোজার সঙ্গে এই সরাইয়ে দেখা হলো।

ফিরোজা। সরাই! সরাই কোথা!

তসীর। কেন, এটা?

ফিরোজা। এটা সরাই! ওসমান আলি খাঁ ওমরাওয়ের বাড়ী তোমার সরাই বলে ভ্রম হলো!

তসীর। ওসমান আলি সার বাড়ী! এটা ওসমান আলি সার বাড়ী?

ফিরোজা। তা নয় ত কি? কে বললে তোমায় যে, এটা সরাই?

তসীর। আসবার সময় একটা চটিতে খুব লোক-দরগরম দেখে তাদের কাছে ওসমান আলি সার বাড়ীর সন্ধান নিতে যাই! সেখানে একটি লোক—সেই বললে, সে বাড়ী অনেক দূরে, রাত্রে পৌঁছুনো যাবে না! কাজেই একটা সরাই আছে। এই কথা বলে, আমাদের এই বাড়ী দেখিয়ে দিয়ে গেল।

ফিরোজা। এ নিশ্চয় ফয়নাশার কাজ! এমন দুষ্ট বুদ্ধি আর কার হবে?

তসীর। ফয়নাশা! তারই সঙ্গে না তোমার বিয়ের কথা হচ্ছে!

ফিরোজা। তুমিও আমায় ঐ কথা বলে ব্যথা দিতে চাও? আমার হৃদয় নিয়ে কৌতুক করো না।

তসীর। না। ফিরোজ, তোমার মনে ব্যথা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়! কথাটা শুনেছিলেম—

ফিরোজা। ফিরোজাকে তুমি এমনই মনে করো!

তসীর। যাক্, ও কথা! আমি যদি তাই মনে করবো ফিরোজ, তা হলে আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য কি? তুমি একাই ভালোবাসতে জানো, তসীর জানে না?

ফিরোজা। আমায় ক্ষমা করো, তসীর।

তসীর। তোমাকে গ্রহণ করবো বলেই আমি সেলিমের সঙ্গে এসেছি।

ফিরোজা। সেলিম এসেছে?

তসীর। হাঁ। সেও জানে, এটা সরাই—আজ যে আলি সাহেবের বাড়ী যাওয়া হলো না, এতে সে ভারী খুসী হয়েছে?

ফিরোজা। কারণ?

তসীর। মেয়েদের সাম্‌নে সে মুখ তুলে কথা কইতে পারে না—কেমন জড়সড় হয়ে পড়ে—অথচ নাচের আসর জমিয়ে তুলতে অদ্বিতীয়।

ফিরোজা। তবে কি হবে? দরিয়ার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হবে কি করে?

তসীর। ভাবনার কথা বটে! ওসমান আলি সা কোথায়?

ফিরোজা। তিনি এইমাত্র এ ঘর থেকে গেলেন।

তসীর। ইনি! ইনিই আলি সাহেব? ছি, ছি, ছি, ছি, ছি!

ফিরোজা। কেন? কি হয়েছে?

তসীর। আমরা মনে করেছিলুম, চটিওয়ালা। ছি, আমাদের আগাগোড়া ব্যবহারে কি মনে করলেন!

ফিরোজা। ভুল জানতে পেরেছো তো, এখন!—আমার মাথায় একটা মতলব আসছে। সেলিম সাহেব জানে, এটা সরাই?

তসীর। হঁ্যা।

ফিরোজা। তার কাছে কিছু ভেঙ্গো'না। কাল কোনো ছুতোয় এখানে থেকে যাও। তার পর, আমি সব ঠিক করে দেবো।

তসীর। দরিয়া বিবি কোথায়?

ফিরোজা। আমরা বেড়াতে গেছলুম। এখন ফিরছি। দরিয়াও ফিরেছে।

তসীর। তা হলে ফিরোজ, আমার আশা এবার পূর্ণ হবে! বলো, আমাদের সঙ্গে যেতে তোমার কোন আপত্তি নেই? (হাত ধরিল)

ফিরোজা। কেন তসীর, ও কথা বলচো! আমি চিরদিন তোমারই।

সেলিমের পুনঃ-প্রবেশ

সেলিম। বাঃ, এমন না হলে বরাত! যতক্ষণ আমি ছিলুম, ততক্ষণ এক বুড়োর কচকচি—আর যেই সরেছি, অমনি আকাশ থেকে হুরী নেমেছে!

তসীর। এ ফিরোজা, সেলিম,—দরিয়া বিবির সঙ্গে সরাইয়ে এসেছিল, দেখা হয়ে গেল। দরিয়া বিবিও এখানে এসেছে—দেখা করিয়ে দিচ্ছি

সেলিম। দেখা! না, না, না, না, আজ না।
{ানে কেন! এখানে কেন! কালই দেখা হবে!
জ আর থাক।

তসীর। পালাও কোথা! সে তো বাঘ নয় হে
{লিম!

সেলিম। না, না, পালাবো কেন! ফিরোজা বিবি!
ন ফিরোজা বিবি! তা, তা, তা—

ফিরোজা। তা, তা, তা, কেন, সেলিম সাহেব?
{ সে তোমার দরিয়া—

দরিয়ার প্রবেশ

দরিয়া, এই তোমার হৃদয়েশ্বর—সেলিম সাহেব!

তসীর। বন্ধু, ইনিই দরিয়া বিবি। তোমরা কথা-
র্ত্তা কও, আমরা আসি।

সেলিম। (তসীরকে ধরিয়া) না, না, যেয়ো না,
{কো, এখানে তুমি থাকো। (নতমুখে রহিল)

দরিয়া। (ফিরোজার প্রতি জনান্তিকে) ভারী
{াজুক, না?

ফিরোজা। ভয় নেই, প্রেমের স্পর্শে লজ্জা পালাবে।

তসীর। কথা কও, অসভ্যর মত আমার পাশে এসে
{াড়িয়ে রইলো—ছ্যাখো! কি মনে করবে! আহা কথা
{ও, বন্ধু, মান রাখো।

সেলিম। (অগ্রসর হইয়া) এ—এ, তসীর, চলে
যেয়ো না তুমি! (তসীরকে ধরিয়া দাঁড়াইল)

তসীর। নাঃ, এমন চাষা আমি কখনো দেখিনি।
{রিয়া বিবি, আমার বন্ধু সেলিম যাঁর সঙ্গে দু একটা কথা
{ইলেই বুঝতে পারবেন, বন্ধু আমার সঙ্কোচে লজ্জায় শুধু
{াপনার অভ্যর্থনা করতে পাচ্ছেন না।

সেলিম। (জনান্তিকে) তুমিই আমার হয়ে
কথাবার্ত্তা কও।

তসীর। (জনান্তিকে) বিয়েটাও তা হলে করতে হয়!

দরিয়া। (সেলিমের প্রতি, সলজ্জভাবে) পথে
আপনাদের কোন কষ্ট হয়নি?

সেলিম। ক-ক-কষ্ট! না, না। হাঁ-ঐ সা-সা-সামান্য
একটু, না-তা-তা-তা কিছুই নয় সে, ধরতে গেলে! আ-
আ-আপনার সঙ্গে দে-দে-দেখা হওয়ায়—

তসীর। (জনান্তিকে) বেশ হচ্ছে—বলো, বলো—
সে কষ্ট ভুলে গেছি—

সেলিম। হাঁ-হাঁ! সে কষ্ট ভু-ভুলে গেছি।

দরিয়া। আপনি আমায় বাড়িয়ে দিচ্ছেন! আমার
সঙ্গে দেখা হলে আপনি কষ্ট ভুলবেন, এ কথা কি বিশ্বাস
করতে বলেন, আপনি! কোন লোককে দেখলে কোন
লোকের কষ্ট যায়? কোন কেতাবেও কি এমন কথা
পড়েছেন আপনি!

সেলিম। না, তা-তা-কৈ কোনো কেতাবে পড়ি নি।

দরিয়া। তবে, ও একটা কথার কথা বললেন, বুঝি!

সেলিম। তা হ-হতে পারে!

তসীর। (জনান্তিকে) ও কি, পাগলের মত কি
বকচো! হতে পারে—মূর্খ কোথাকার!

সেলিম। না-না। মু-মুখের কথা নয় শুধু, আমার
মনের বিশ্বাস...

তসীর। এই! এ-কথাটা আগে বললে না,
মাঝখানে একটা গোল রেখে দিলে!

দরিয়া। আচ্ছা, মেয়েদের লেখাপড়া শেখা সম্বন্ধে
আপনার কি মত?

তসীর। (জনান্তিকে) বেশ গুছিয়ে বলো দেখি,
এবার।

সেলিম। সে-লেখাপড়াটা...কি জানেন অ-অর্থাৎ
লেখাপড়াটা অর্থাৎ কি না ভারী দ-দরকার! তা পু-পুরুষের
যেমন, মে-মেয়েদেরও তেমনি! অ-অর্থাৎ কিনা, বু-বু-
বুঝলেন, লে-লে-লেখাপড়া না হলে চ-চলে না মোটে!
তা ছাড়া আ-আপনি ধরুন, এই যে-যেমন কো-কোনো
দেশে,—মাপ করবেন...কি, কি বিষয়ে আমার ম-ম-মত
জানতে চাইলেন আ-আপনি! আমার ভু-ভু-ভুল হয়ে
গেছে।

তসীর। তাহলে তোমরা আলাপ-পরিচয় করো,
আমরা আসি।

সেলিম। না না, তসীর, যেয়ো না, যেয়ো না। আমার
সব গুলিয়ে যাবে, তা-হলে!

তসীর। অনেকদিন পরে দেখা হলো, আমরাও একটু
সুখ-দুঃখের কথাবার্ত্তা কইগে! এস ফিরোজা।

তসীর ও ফিরোজার প্রস্থান।

দরিয়া। আচ্ছা, নারী আর পুরুষ,—এদের মধ্যে
হৃদয়টা কার বেশী আছে, আপনার ধারণা?

সেলিম। দে-দে-দেখুন, তা যদি বলেন, ত, ত, না-
নারী আর পু-পু-পুরুষ দুজনেরও হৃদয় আছে, ত-তবে
দেখুন, আমায় একটু মাপ করতে হবে! ফি-ফি-ফিরোজা
বিবির সঙ্গে আমার বিশেষ একটু দরকারী কথা
ছিল—সেইটে সে-সে-সেরে নিয়ে, ফিরে এসে আপনার
কথার জ-জ-জবাব দিচ্ছি। আ-আপনি, বোধ হয়,
বি-বি-বিরক্ত হচ্ছেন, আমার কাণ্ড দেখে!

দরিয়া। বিরক্ত! এমন সুখ আমি জীবনে উপভোগ
করিনি।

সেলিম। (স্বগতঃ) উঃ, গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। এর
চেয়ে কামানের সামনে বুক পেতে দাঁড়ানো, ঢের সহজ
মনে হয়। এখন কি বলে সরি?

দরিয়া। কি ভাবছেন?

সেলিম। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) এঁ্যা—না। হাঁ, যাচ্ছি, যাচ্ছি। তাই তো, এঁরা আমাদের ডাকছেন! আপনি তা হলে,—হাঁ, চলুন তা হলে—না যাওয়া ভালো দেখায় না।

প্রস্থান

দরিয়া। হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ! কি সুন্দর মিলন! কোনো কাব্যে, কোনো উপন্যাসে, এমন প্রেম-মিলনের কথা পড়া যায়নি, এ পর্য্যন্ত! আমার মুখের দিকে একবার চাইলে না! আশ্চর্য্য মানুষ কিন্তু! কি লাজুক—অথচ এ লজ্জাটুকু কেমন মানিয়েছিল! লেখাপড়া বেশ জানা আছে—অথচ একটা কথার জবাব ভালো করে দিতে পারলে না! লজ্জাতেই জিভ জড়িয়ে যায়, তা কথার উত্তর দেবে কি! নাঃ, এ লোকটিকে পছন্দ হয় বটে!

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদ্যান-পার্শ্ব

গুলফম ও তসীরের প্রবেশ

গুলফম। দরিয়ার বিয়ের ঠিক হলেই ফয়নাশার বিয়ে হবে।

তসীর। খাশা লোক এই ফয়নাশা। এমন সাদা মন বড় দেখা যায় না!

গুলফম। না হলে ফিরোজার শেষে পছন্দ হয়!

তসীর। বটে! ফিরোজা বুঝি প্রথমে পছন্দ করে নি?

গুলফম। না। ও তো বেঁকে বসেছিল, ফয়নাশাকে বিয়ে করবে না! তা আমি তাড়া দিইনি, ভাবলুম, ছেলেমানুষ—অবুঝ—দুদিন দেখুক, শুনুক—তার পর পছন্দ হয়ে যাবে।

তসীর। বটেই তো! কথাতেও বলে, সবুরে মেওয়া ফলে।

গুলফম। ঐ যে ওরা আসছে। আমোদ-আহ্লাদ করছে। ফয়নাশা আমার ভারী আমুদে—আমোদ নিয়েই আছে!

তসীর। বাঃ, বেশ তো! শুধু আমোদ নিয়ে আছে!

গুলফম। হাঁ। দুঃখ নেই, জ্বালা নেই—দিনরাত হাসিখেলা! আমরা একটু আড়ালে যাই, এসো। ওদের ভাব-গতিক একটু লক্ষ্য করা যাক।

ফয়নাশা ও ফিরোজার প্রবেশ

ফয়নাশা। আবার আমার পেছু নেছো! ওরে, আমায় ছাড় রে—এ'যে ভাল জ্বালায় পড়লুম!

ফিরোজা। (জামা ধরিয়া) আমি ছাড়বো না।

ফয়নাশা। (জনান্তিকে) বেশ হচ্ছে! ঐ যে মা আড়ালে দাঁড়িয়ে। মনে করছে, আমরা দেখিনি। আমার চোখে ধুলো দেবে! হুঁ, হুঁ, ভারী শক্ত বাবা! (প্রকাশ্যে) ছাড়বি নি?

ফিরোজা। না।

ফয়নাশা। ছাড়বি না, ঠিক বলছিস্?

ফিরোজা। না—ছাড়বো না! ঠিক বলছি।

ফয়নাশা। তবে আমিও ছাড়বো না তোকে—(জনান্তিকে) গয়নাগুলো মার কাছেই ঠিক আছে?

ফিরোজা। হাঁ। সেগুলো কিছুতে দিতে চায় না—আগে সেইগুলো আদায় করে দিতে হবে!

ফয়নাশা। আচ্ছা, কাল সকালে পাবে। (প্রকাশ্যে) তা হলে আমায় পছন্দ হয়েছে?

ফিরোজা। খুব হয়েছে!

ফয়নাশা। বিয়ে করবি?

ফিরোজা। করবো!

ফয়নাশা। একশো বার?

ফিরোজা। একশো বার!

গান

ফয়নাশা। তবে আয়, আমরা দুটি বর-কনে!
ফিরোজা। ফুলের মালা গলায় দি এই ফুল-বনে!
ফয়নাশা। হেনস্তা তো করবিনে আর? বাসবি আমায়,
খুব ভালো?
ফিরোজা। তোমায় ভালোবাসলে বঁধু, এ আঁধারে
পাই আলো!
তুমি আমার সূর্য্য যে হৃদ্-গগনে!
ফয়নাশা। বলিস কি! এঁ্যা?
ফিরোজা। সত্যি কথা!
ফয়নাশা। নাইকো ব্যথা আর মনে!
উভয়ে। আয়, তবে আয়, নাচি-খেলি, প্রাণ খুলে
গাই দুজনে।

গুলফম ও তসীরের পুনঃ-প্রবেশ

গুলফম। ছাখো, ছাখো, দুজনকে কেমন মানিয়েছে! আমার চোখ আছে বলেই এত পীড়াপীড়ি করেছিলুম। ফিরোজা, এখন ফয়নাশাকে মনে ধরেছে তোমার?

ফিরোজা। খুব।

গুলফম। কেমন ফয়নাশা, ফিরোজাকে বিয়ে করবার মত হয়েছে এখন?

ফয়নাশা। হুঁ।

গুলফম। যাই, আমি এখনই আলি সাহেবকে

...র দিইগে। তসীর সাহেব, এদের সঙ্গে একটু ...থাবার্তা কও তুমি ততক্ষণ।

[প্রস্থান

ফয়নাশা। মিয়া সাহেব, তোমায় চিনেছি। আমি ...া এক বিপদে পড়েছি—আমায় যদি বাঁচাও, তাহলে চাও, আমি তাই করতে রাজী আছি।

তসীর। তোমার আবার বিপদ কি? এমন ...লার সাথী পেয়েচো! তোফা নাচগান করচো!

ফিরোজা। (অলক্ষ্যে বক্র ইঙ্গিত করিল)

ফয়নাশা। এই বুঝি এমন খেলার সাথী! মার ...ালায় গেলুম! আমার মাথায় এই সাথীটি মা চাপিয়ে ...তে চায়—আমি একদম নারাজ! এর চেয়ে হাতীর ...াল মাথায় বওয়া ভালো!

তসীর। কেন? তোমার মত নয়, বলচো—আর ...তামার মা যে চায়, তুমি একে বিয়ে করো!

ফয়নাশা। বিয়ে করা ভারী ফূর্ত্তির কাজ কি না! ...া চায়, মা বিয়ে করুক না! আমার সঙ্গে লাগা ...কন? কি জানো মিয়া, সাধ করে পায় ও বেড়ী এঁটে ...ারদে বসে থাকতে আমি রাজী নই!

তসীর। তার মানে?

ফয়নাশা। তার মানে আবার কি? এ তোফা ...াছি। যখন যা খুশী, তাই করি, যেখানে খুশী সেখানে ...াচ্ছি—বিয়ে করলে আর এমনটি চলবে না! তখন ...াতে-পায় দড়ি বেঁধে বউয়ের কাছ বসে থাকতে হবে! ...কোণে বসে বসে, শুধু ভালোবাসো? ভালোবাসি। ভালোবাস? ভালোবাসি। এই তো?

তসীর। তা কি চাও তুমি?

ফয়নাশা। আমার ঘাড়ের এই মোটটি নিয়ে আর কারও ঘাড়ে যদি চাপিয়ে দাও—এ ঘাড় তেমন মজবুত নয়!

তসীর। এ বোঝাটিকে যদি তোমার ঘাড় থেকে কেউ নামিয়ে নেয়, কি করো?

ফয়নাশা। তার কেনা গোলাম হয়ে থাকি! আর কি করি?

তসীর। আচ্ছা, এ বোঝা আমি ঘাড়ে নিতে রাজী আছি.

ফয়নাশা। তুমি! আরে মিয়া,—এমন বেকুব তুমি! যাক্‌গে—বেশ, বেশ, আমি খুব রাজি এতে।

তসীর। তবে আমি যা করবো, তাতে তোমায় সাহায্য করতে হবে!

ফয়নাশা। বেশ! কেমন ফিরোজা, এবার তুমিও বাঁচলে, আমিও বাঁচলুম। কিন্তু মিয়া, খুব চুপি চুপি কাজ হাসিল করা চাই, নাহলে মার কাণে গেলে একেবারে সব ভেস্তে যাবে।

[সকলের প্রস্থান

—

তৃতীয় দৃশ্য

কক্ষ

ওসমান আলির প্রবেশ

ওসমান। এই ছেলেকে নম্র, শান্ত, সুধীর বলে আসফ আমার কাছে পাঠিয়েছে! এত বড় বেয়াদব অসভ্য ছোকরা,—আমার এত বয়স হলো—কখনও চক্ষে দেখিনি। এর সঙ্গে দরিয়ার বিয়ে দেবো? অসম্ভব! আমার সামনে বসে আমার দিকে পা তুলে রইলো—আমায় হুকুম দেওয়া হলো, পোষাক-জুতো সব যেন ঝেড়ে তুলে রেখে দি! কি অসহ্য বেয়াদবি! এর কাছে ফয়নাশা—সেও দস্তুরমত সভ্য! দেখি, দরিয়া কি বলে! দরিয়া—

[নেপথ্যে দরিয়া। বাবা—]

দরিয়ার প্রবেশ

দরিয়া। ডাকচো বাবা?

ওসমান। হাঁ, মা!…দরিয়া, আমার কাছে মনের তুচ্ছ কথাও গোপন করবে না—এমনি শিক্ষাই তোমায় বরাবর দিয়ে এসেছি—তুমিও মা, আমার মনে একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্য ব্যথা দাওনি। তাই একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করচি—অসঙ্কোচে উত্তর দিয়ো।

দরিয়া। এত কথা কেন বলচো, বাবা? কি বলবে, বলো। তোমার কাছে লুকোবার মত আমার কিছু নেই। কোন দিন কোন কথা লুকিয়েছি, বাবা? যখন যে আব্দার করেছি, তখনই সে আব্দার তুমি রেখেচো! তোমায় আমি কত জ্বালাতন করি, বাবা, কি করবো, বলো! তুমিই বলেছো, তুমি শুধু আমার বাবা নও, বাবা, মা—দুই-ই। নয় কি?

ওসমান। হাঁ মা, আমি দুই! সে কথা তুলিসনে, দরিয়া! আমার চোখে জল আসে। তোর মুখে অমন করুণ কথা শুনলে আমি স্থির থাকতে পারিনে মা!

দরিয়া। না, বাবা, আর কখনো এমন কথা বলে তোমায় মনে আমি কষ্ট দেবো না। এবার মাপ করো!

ওসমান। অমন করে মাপ চাসনে, মা, আমার কাছে।…দরিয়া—

দরিয়া। কেন বাবা?

ওসমান। বিয়ে দিলে পরের ঘরে চলে যাবি তুই,

তখন তোর এ বুড়ো ছেলেকে কে দেখবে, মা? ছোট-খাট আব্দার নিয়ে কে এই বুড়োকে জাগিয়ে রাখবে?

দরিয়া। না, বাবা, তুমি আমায় কোথাও যেতে দিয়ো না। তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারবো না! আমি বিয়ে করতে চাইনে, বাবা—আমরা মায়ে-পোয় বেশ আছি, দুজনে! কেন বাবা, এর মধ্যে আবার একটি লোককে নিয়ে আসবে? নূতন লোক, সে আমাদের দুজনের মধ্যে খাপ খেতে পারবে কেন?

ওসমান। কেন পারবে না, মা? বরাবরই সকলে খাপ খেয়ে আসছে! এখন যা বলছিলুম মা, শোন্—আমার বন্ধু আসফ খাঁর ছেলেকে তুই দেখেছিস?

দরিয়া। দেখেছি, বাবা।

ওসমান। তাকে কেমন দেখলি মা, বল্ তো?

দরিয়া। ভারী পাগল, সে বাবা—আমার এমন হাসি পাচ্ছিল, তার রকম দেখে যে, কি আর বলবো! লেখাপড়া বেশ জানা আছে। তা ছাড়া, এমন নম্র, শান্ত, লাজুক লোক আমি কখনো দেখিনি, বাবা!

ওসমান। নম্র, শান্ত! কার কথা বলচিস, দরিয়া?

দরিয়া। কেন বাবা? সেলিম সাহেবের কথা।

ওসমান। সেলিম নম্র, শান্ত?

দরিয়া। হাঁ, বাবা, এত নম্র, শান্ত লোক চোখে দেখা দূরের কথা—বইয়েও এমন ধরণের লোকের কথা কখনো পড়িনি বাবা!

ওসমান। বলিস কি, দরিয়া! আমিও তাকে দেখেছি, এমন অসভ্য বেয়াদব ছোকরা ভদ্র ঘরে জন্মাতে পারে না!

দরিয়া। তুমি তা হলে আর কোন লোককে দেখে থাকবে! তোমার নিশ্চয় কোন ভুল হয়েছে!

ওসমান। ভুল! আমার ভুল হতে পারে না দরিয়া। তার কথাবার্ত্তার ভঙ্গীতে, তার ব্যবহারে আমার এত রাগ হচ্ছিল যে সে যদি আমার বন্ধু আসফের পুত্র না হয়ে আর কেউ হতো, তাহলে বান্দা দিয়ে গলা ধাক্কায় তাকে বাড়ীর বার করে দিতুম!

দরিয়া। তুমি নিশ্চয় ভুল করেছো বাবা। এত লাজুক যে আমার মুখের পানে চাইতে পারলেন না, মোটে। আদব-কায়দাও চমৎকার!

ওসমান। আমি মিথ্যা বলছি দরিয়া?

দরিয়া। না বাবা, তা নয়। তোমার কোন ভুল হয়েছে, নিশ্চয়—তুমি আর একবার ছাখো তাঁকে।

ওসমান। বেশ! কিন্তু দরিয়া, এ কথা বলে রাখচি, তার ব্যবহারে যদি আমি সন্তুষ্ট হতে না পারি তো তার সঙ্গে তোমার বিবাহ কখনো হবে না।

দরিয়া। আমি এমন নীচ নই বাবা যে তোমার অমনোনীত পাত্রে আত্মসমর্পণ করব! আমি তোমার মেয়ে, এ কথা ভুলে যেয়ো না, বাবা!

ওসমান। বেশ মা, দেখা যাক, কার ভুল হয়েছে—তোমার? না আমার! যাই হোক, তোমরা দেখো, তার আদর-অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি না হয় যেন, আমার গৃহে সে অতিথি!

দরিয়া। কোন ত্রুটি হবে না, বাবা।

[ওসমানের প্রস্থান

তাইতো, নিশ্চয় বাবার কোন ভুল হয়েছে। লজ্জায় আমার মুখের পানে চাইতে পারলে না—এমন আপন-ভোলা, উদাস লোক! আহা, আমার বড় মায়া হচ্ছে। নিশ্চয় বাবার ভুল হয়েছে! কে? আমিনা!

আমিনার প্রবেশ

আমিনা। বাঃ, দুজনেরই গম্ভীর ভাব দেখছি!

দরিয়া। আমিনা, প্রেমটা কেমন, জানিস? সে কি একটা পাখীর মত? দুঃখে ভর করে সে উড়ে আসে?

আমিনা। চমৎকার! কি দরিয়া বিবি, একটি চাউনিতেই সব গোল করে ফেলেছো! আমি জানি, লেখাপড়া শেখার দস্তুরই এই। ভালো একটি দেখলেই মন অমনি দুম করে লুটিয়ে পড়ে—আগু-পাছু কিছু বিচার করে না!

দরিয়া। ফিরোজা কোথায়?

আমিনা। তুমি এ কোণে, তিনি আর এক কোণে! অবস্থা দুজনের সমান! দীর্ঘনিশ্বাস, হাহাকার,—লক্ষণ একই!

দরিয়া। কিসের লক্ষণ?

আমিনা। কিসের আবার! রোগের!

দরিয়া। রোগ আবার কি দেখলি, আমার?

আমিনা। ওগো, সব রোগের কি এক ধারা? এ রোগ রোগী আগে জানতে পারে না, আশ-পাশের লোক এক আঁচড়েই ধরে ফেলে।···ওগো, আয়, তোরা আয়, দরিয়া বিবির রোগ ধরা পড়েছে!

একদল বাঁদী গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল

বাঁদীগণ। গান

ফুলশর মানে না মানা।
রমণী-হৃদয়ে দেয় সে হানা।
কোমল ফুলের দল, ব্যথা তায়, কোথা বল?
সাজাতে সে জানে শুধু ব্যথা দিতে জানে না!
কাঁটা সে, ফুলের সনে, গাঁথা আছে গোপনে,
দল ঝরে গেলে রয়, কাঁটার সে যাতনা।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

অলিন্দ

ছুটিয়া ফয়নাশার প্রবেশ। হাতে অলঙ্কার-পেটিকা।

ফয়নাশা। হাঃ, হাঃ—ঠিক পেয়েছি। আমার হাত ড়িয়ে কোনো জিনিস থাকতে পারে কখনও? ফিরোজার র, আর হীরে-জহরতের যত গহনা, সব এর মধ্যে াছে। নাঃ, বেচারীর এগুলো মা ঠকিয়ে আত্মসাৎ রবে, তা হতে পারে না। এই যে! আরে এসো, এসো সীর মিয়া—

তসীর। এই যে ফয়নাশা! ও কি? গয়না? তোমার র কাছ থেকে এনেছো! কেমন করে আনলে? আঃ -তোমার ঋণ কখনো শোধ দিতে পারবো না। (ফয়নাশা হনা দিল) তোমার মা দিলে যে!

ফয়নাশা। মা কি আর দিয়েছে? আমি নিজে নেছি।

তসীর। নিজে এনেছো! কি করে আনলে?

ফয়নাশা। সে সব কল-কৌশল আর শুনে কাজ াই। তবে জেনো, মার সমস্ত বাক্স-তোরঙ্গর চাবি ামারো একটি করে আছে। নাহলে আমার খরচ চলতো সে? কলে চাবি ঘুরিয়ে এনেছি, সাহেব!

তসীর। যাক্ যে করে হোক, আদায় হলেই হলো! গুলোর জন্যই ফিরোজার ভাবনা ছিল। গহনা না য়ে সে এ বাড়ী ছাড়বে না। বাইরে গাড়ী তৈরী াছে, সন্ধ্যা হলেই বেরিয়ে পড়বো, কেমন?

ফয়নাশা। যখন খুশী, সরো—মোদ্দা খুব 'শিয়ার!

তসীর। তোমার মা কিন্তু রেগে যাবে, গহনা ারিয়েছে জানলে।

ফয়নাশা। রেগে! ক্ষেপে যাবে! হাঃ, হাঃ, সে ক মজাই হবে! এখন সরে পড়ো, সরে পড়ো—ঐ যে মা াসছে।

তসীর। তোমার ঋণ কখনো শোধ দিতে পারবো া ফয়নাশা।

ফয়নাশা। আবার ফ্যাচ ফ্যাচ করে! সরে পড়ো না, মিয়া!

[তসীরের প্রস্থান

গুলফম ও ফিরোজার প্রবেশ

গুলফম। নাঃ, তোমার দেখছি, মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ফিরোজা। তোমার বয়সে মেয়েরা কেউ কখনো গহনা পরে না। এখন এই বয়স, এমন রূপ—এতে কি গহনার দরকার হয়? যখন বয়স ঝরে যায়, রূপের জলুস থাকে না, তখনই মানুষে গহনা পরে ঝরা-রূপ মেরামত করতে! তারই জন্য গহনা পরা।

ফিরোজা। এই বয়সে কত মেয়ে গহনা পরে!

গুলফম। আ—রে, বোকা মেয়ে! তাদের কি তোমার মত রূপ আছে! কাজেই তারা গহনার জোরে চকচকে দেখাতে চায়! আয়নায় একবার তোমায় চেহারাখানা ছাখো গে দেখি, ফিরোজা—চেহারা তো নয়, যেন ছবি! মুখ নয় যেন চাঁদ, গালদুটি গোলাপ ফুল, ভুরুদুটি জোড়া রামধনু, চোখদুটি মাছ, নাকটি বাঁশী, দাঁতগুলি, দেখি, আহা, যেন কুঁদফুল! একবার আয়নায় ছাখো মা ছাখো!

ফিরোজা। না, আমার গহনা চাই—আমি আজ পরবো—আমার সখ হয়েছে পরতে। তার পর আবার রেখে দিও, না হয়।

গুলফম। কি সব গহনা পরা ঢং, আমার মোটে পছন্দ নয়। আজ চাই? তা আসল কথা কি জানো, ফিরোজা, কোথায় যে রেখেছি সেগুলো—

ফয়নাশা। (জনান্তিকে) বলো না, মা, সেগুলো হারিয়ে গেছে! আমি সাক্ষী দেবো যে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

গুলফম। (জনান্তিকে) এঁ্যা, এঁ্যা, এঁ্যা, তুই জানিস, ফয়নাশা! তোরি জন্যে আটকে রেখেছি, সেগুলো। তাই হাতছাড়া করতে চাই না। তুই সাক্ষী দিবি, তা হলে?

ফয়নাশা। (জনান্তিকে) নিশ্চয়। বললুম তো, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, বলবো।

ফিরোজা। গহনা দেবে না তুমি?

গুলফম। কেন দেবো না, ফিরোজা? আর তা আটকে রেখে লাভই বা কি? আসল কথা তবে খুলে বলি, সেগুলো হারিয়ে গেছে, খুঁজে পাচ্ছিনা।

ফিরোজা। হারিয়ে ফেলেছো!

গুলফম। তার জন্য ভাবনা কি, ফিরোজা? তোমার যা গহনা ছিল, আমি সেই দামের গহনা নিজে কিনে খেশারত দেবো। তুমি ধৈর্য্য হারিয়ো না। আমার যদি যথাসর্ব্বস্ব যায়, তবু আমি অধীর হই না। কি করবো বলো, সে তো আর মানুষের হাত নয়। এই ফয়নাশা জানে। ফয়নাশা, ফিরোজার গহনা যা আমার কাছে ছিল, সেগুলো হারিয়ে গেছে না?

ফয়নাশা। হাঁ, গেছেই তো হারিয়ে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, সে গহনা হারিয়ে গেছে!

ফিরোজা। হারিয়ে গেছে?

গুলফম। কি করবো বলো, মা, আমার কোন হাত ছিল না। লজ্জায় এতদিন আমি বলিনি। তুমি আমায়

গহনা দুচারখানা পরো, যত দিন না তোমার গহনা পাওয়া যায়!

ফিরোজা। তোমার গহনা চাই না আমি।

গুলফম। আমি আনছি আমার গহনা। তুমি তার মধ্যে যেটা পছন্দ হয়, পরো।

প্রস্থান

ফিরোজা। কি এ সব কাণ্ড! ও গহনার কি কোন দাম আছে? আমার মার গায়ের গহনা! পৃথিবীর সকল ঐশ্বর্য্যের চেয়েও মার ও গহনার দাম, আমার কাছে ঢের বেশী। আমার সেই গহনা হারিয়ে দিলে!

ফয়নাশা। আরে চুপ, চুপ! সে হারায়নি, হারায়নি, হারায়নি! আমি নিজের হাতে সরিয়ে তোমার ওসীরের হাতে দিয়েছি। মা জানে না, জানলে ওঃ, কি মজাই হবে! উঃ, মা ক্ষেপে যাবে!

ফিরোজা। এঁ্যা, ফয়নাশা, ভাই, তুমি এমন মহৎ? (হাত ধরিল।)

ফয়নাশা। আর কাজ কি প্রেম জানিয়ে? নাও, নাও, সরে পড়ো, ঐ মা আসছে।

ফিরোজা। তোমার এ উপকার কখনো ভুলবো না, ফয়নাশা!

ফয়নাশা। নাঃ, সব মাটি করলে! আরে, সরে পড়ো। ইঃ, হন্সে কুকুরের মত ছুটে আসছে একেবারে! নাও, নাও, পালাও তুমি।

ফিরোজার প্রস্থান

ওঃ, ভারি মজা হয়েছে।

বেগে গুলফমের প্রবেশ

গুলফম। সর্ব্বনাশ হয়েছে আমার! চোর! ডাকাত! ওরে বাবা রে, কোথায় যাবো রে আমি!

ফয়নাশা। কি? কি? এ গহনা হারানোর জন্য, বুঝি! বাঃ, বাঃ, ঠিক হচ্ছে। চালাও চালাও।

গুলফম। চালাবো কি রে, ফয়নাশা! আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে বাবা রে, ফয়নাশা রে!

ফয়নাশা। কি? হয়েছে কি?

গুলফম। আমার বাক্স খুলে সর্ব্বস্ব নিয়ে গেছে, ফিরোজার সমস্ত গহনাগুলো রে—কিছু রাখেনি! ওরে বাবা রে, এ কি চোর রে! কোথা থেকে এলো রে বাবা এ চোর? কিছু জানতে পারিনি!

ফয়নাশা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—চমৎকার। খাশা হচ্ছে, খাশা হচ্ছে! যে শুনবে, সেই বিশ্বাস করবে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! গহনা খোয়া গেছে, গহনা খোয়া গেছে, আমি নিজে দেখেছি।

গুলফম। থাম্, সর্ব্বনেশে ছেলে, কোথাকার! আমি মাথা খুঁড়ে মরবো, এবার। ওরে, সব নিয়ে গেছে রে সব নিয়ে গেছে!

ফয়নাশা। হাঁ, গেছেই তো, আমি নিজের চোখে দেখেছি, বাক্স খুলে গহনা নিয়ে গেছে।

গুলফম। থাম্ তুই পাজী! সত্যি সত্যি নিয়ে গেছে। ওরে মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয়!

ফয়নাশা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! আমার নাচতে ইচ্ছে হচ্ছে। তোফা তোফা, বেশ বলে যাচ্ছো, বেশ হচ্ছে!

গুলফম। সরে যা, বাঁদর কোথাকার, কাটা ঘায় আর নুন ছিটুতে হবে না তোকে।

ফয়নাশা। আমি নিজের চোখে দেখেছি, নিজের চোখে দেখেছি, চোরে সব নিয়ে গেছে।

গুলফম। সরে যা—তোর মুখ দেখতে চাই না হতভাগা, বাঁদর, উল্লুক, ভূত কোথাকারের! ওরে, আমি কোথা যাবো রে, বাবা? আমার দম ফেটে মরতে ইচ্ছে হচ্ছে! এ কি, রাহাজানি রে, বাবা! ওরে আমায় মেরে গেল না কেন রে বাবা?

প্রস্থান

ফয়নাশা। আমি সাক্ষী, সব নিয়ে গেছে। হাঃ হাঃ হাঃ! ভারী মজা বেধে গেছে।

প্রস্থান

—

পঞ্চম দৃশ্য

জলটুঙ্গি

আঙুরের বেড়া ধরিয়া দরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কাল সন্ধ্যা।

দরিয়া। গান

আঁধার আসিছে নেমে, মাঠে ঘাটে, তরুশিরে!
নীরব প্রেমের ব্যথা যেন প্রাণ রাখে ঘিরে!
হৃদয়-বীণায় তার, তেমন বাজে না আর,
উদাস অবশ প্রাণ, কোথা যেতে চাস ফিরে?
সুদূর আরাম-নীড়ে, গেয়ে পাখী আসে ফিরে,
তা শুনে অলস আঁখি, কেন রে ভাসিস্ নীরে?
কোথা তোর বাজে ব্যথা? কি ছিল বলিতে কথা?
রয়ে গেল চিরদিন, কাতর অধর-তীরে।

নাঃ, কি যেন একটা গোল হয়ে গেছে। বারবার কেন তার সঙ্গে কথা কইতে সাধ হচ্ছে? সারাদিন মনটাকে বেঁধে রেখেছিলুম, এ সাধ দমন করবোই! কিন্তু আর যে পারি না। ঐ মেঘের আড়ালে চাঁদ উঠছে, কি

সুন্দর বাতাস বইছে, আর পায়ের নীচে পুকুরের কালো জল যেন কেঁপে কেঁপে গান গেয়ে চলেছে! এরা কি গান গায়? কেন হাসে? কে জানে! আজ যেন সমস্ত প্রকৃতিকে সজাগ, জীবন্ত বলে মনে হচ্ছে! ফিরোজার সঙ্গে দেখা করতে লজ্জা হচ্ছে, তার সঙ্গে কবি-কল্পনা নিয়ে কত তামাসা করেছি! বাবার সামনে যেতে পা সরছে না! শুধু সেই লজ্জা-মিশ্রিত নত দৃষ্টি, আর আধ-জড়িত সসঙ্কোচ কণ্ঠস্বরটুকু মনে জেগে আছে! আর সব—কোথায় হারিয়ে বসেছি! কে? আমিনা আসছে। আমিনা—

আমিনার প্রবেশ

আমিনা। ডাকছো আমাকে? তোমাকেই আমি খুঁজছি! ভারী মজা হয়েছে, বিবি, তোমার নায়কটির ধারণা এটা সরাই, আর হুজুর আলি সেই সরাইয়ের কর্তা, আর তুমি এ সরাইয়ের বাঁদী একজন।

দরিয়া। বলিস কি, আমিনা? সত্যি?

আমিনা। হ্যাঁ গো,—ঐ জানলার ধারে সেলিম সাহেব দাঁড়িয়েছিলেন। তোমাকে এ ধারে আসতে দেখেছিলেন, আমি কাছে ছিলুম, আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের ও বাঁদীটি বেশ দেখতে, এ সরাইটা চমৎকার! তার পর কথাবার্ত্তায় টের পেলুম, তাঁর বিশ্বাস, এটা সরাই, হুজুর আলির বাড়ী নয়!

দরিয়া। ওঃ, তাহলে বাবার কথাগুলো এখন বুঝতে পারছি—বাবাকে সরাই-ওয়ালা ভেবে হয়তো তেমন কায়দার সঙ্গে কথা কননি! ঠিক হয়েছে। নিশ্চয় তাই। তা হলে ভারী মজা হয়েছে তো! দ্যাখ্, আমিনা, এ ভুল ভাঙ্গিসনে—থাকুক এই ভুল! আমাকে বাঁদী বলেই জানুন। একটু মজা দেখি।

আমিনা। সে কি! তোমায় দেখেছেন, কাল! কথা কইলেই টের পাবেন!

দরিয়া। কতটুকুর জন্য দেখা হয়েছিল। তাও আবার আমার মুখের দিকে চাননি মোটে, এমন লাজুক।

আমিনা। তবে তো, আচ্ছা জোট পাকিয়েছে!

দরিয়া। হাঁ, আস্তে আস্তে এ জোট খুলতে হবে। নাহলে তাড়াতাড়ি করলে, হয় গেরো পড়বে, নয় ছিঁড়ে যাবে।

আমিনা। আচ্ছা চোখ বাপু, ওঁর! তোমার এই রূপ দেখে বাঁদী বলেও লোকের ভুল হয়? আশ্চর্য্য!

দরিয়া। কিছু আশ্চর্য্য নয়, আমিনা, তাঁর নিজের চেহারার পানে চেয়ে দেখেছিস?

আমিনা। তোমার কাছে, বাপু, তিনি কিছুই নন—তা হক্ কথা বলছি।

দরিয়া। না, আমিনা, তা হলে তোর চোখ নেই।

আমিনা। চোখ আছে, গো—চোখ আছে; কপালের নীচে দু-দুটো জলজলে চোখ! তবে হাঁ, তোমার চোখে ওঁকে দেখিনি আমি!

দরিয়া। আমার চোখ আলাদা হলো, বুঝি!

আমিনা। না হলে আর তাঁকে ভালবেসেছো।

দরিয়া। ভালোবেসেছি! কে তোকে এ কথা বললে আমিনা?

আমিনা। তোমার মুখ-চোখ, তোমার হাব-ভাব তোমার এই পালিয়ে-পালিয়ে বেড়ানো, তোমার এই গম্ভীর মূর্ত্তি!

দরিয়া। আমিনা, ভালোবাসা সুখের? না দুঃখের! আমার মনে হয়, প্রথমটা ভারী দুঃখ—পরে কি জানি না!

আমিনা। দরিয়া বিবি, তোমার মুখে আজ নূতন কথা শুনলুম!

দরিয়া। কি নূতন কথা, আমিনা?

আমিনা। তোমার সে হাসি-কথা কোথায় গেল! একদিনের দেখায় দুঃখটাই বুঝলে শুধু?

দরিয়া। কে জানে, আমিনা! আমার মনে হচ্ছে, এ যেন বড় দুঃখ! কিন্তু এ দুঃখেও কি শান্তি—!

আমিনা। তাই লোকে কথায় বলে—

গান

হেথা, প্রেম যেন কেউ করে না,
ওগো, কেউ যেন ভালোবাসে না!
ও তায় কেবলি বিষাদ, আশা-অবসাদ,
শুধু বুক-ফাটা যাতনা!
নিরাশা-তুফানে ভেসে যায় প্রাণ,
নাহি হেথা, ওগো, প্রেম-প্রতিদান,
প্রাণের বাসনা গুমরিয়া মরে,
কিছুতে সে যে গো মেটে না!
প্রাণ যারে চায়, তার পাশে ধায়,
পাষাণ পরাণে, সে যে দলে যায়,
তবুও পরাণ ফিরে তার পায়,
(ও) তায়, কেমনে ফিরাবো, বলো না!

দরিয়া। ভয় নেই তোর, আমিনা। এমন অবস্থা আমার হয়নি এখনো! আমি তো কাব্যের নায়িকা নই!

আমিনা। যাই, দেখিগে, তোমার নায়ক-প্রবরের ভাব-গতিক একটু লক্ষ্য করিগে। ফিরোজা বিবির গহনা নিয়ে আজ তুমুল গোল বেধে গেছে। তারও একটু-আধটু খপর নিই!

প্রস্থান

দরিয়া। আমার এমন ভাবান্তর হয়েছে যে আমিনা অবধি তা লক্ষ্য করেছে? ছি, ছি, আমার

ভারী লজ্জা করচে—রাগও হচ্ছে নিজের উপর! একবার পাগলের মত কি কথা-বার্ত্তা হলো, শুধু ক্ষণিকের জন্য! না, এ আমার অন্যায়! কোথা গেল আমার সে সরল হাসি, সে উদাস খেলাধুলা? ছি, ছি—এ আমি কি করচি? বাবার মুখের দিকে না চেয়ে নিজের সুখ নিয়েই ব্যস্ত! বাবার কাছে যাই—(দুই-এক পদ অগ্রসর হইয়া) না—কেমন লজ্জা করচে! সারাদিন বাবার কাছে যাইনি,—বাবা কি মনে করছে? আর একটু বসি, এখানে। ঐ যে বেশ চাঁদ উঠেছে—চারিধারে আলোর ঢেউ বয়ে যাচ্ছে—চমৎকার দেখতে লাগচে। (সোপানে বসিল)

গান

ছেলেবেলার কোমল ধরা কঠিন কেন হয়ে আসে?
বড় হলে পায় না কেন, যে যেটি চায়, ভালোবাসে!
তখন আকাশ পড়ত নুয়ে, মেঘে গায়ে যেত ছুঁয়ে,
তারার চাঁদের হাসিটুকু, আজ কেন রে নিবে আসে!
ফুলে জলে পাখীর স্বরে; যে সুখ ছিল, যায় সে ঝরে—
শুধু কিসের কঠিন বাঁধন ঘেরে প্রাণের চারি পাশে।

সেলিমের প্রবেশ

সেলিম। এধার থেকেই না গানের শব্দ পাচ্ছিলুম! কে গাইছিল? যেমন মিষ্ট স্বর, তেমনি করুণ গান! এই যে কে বসে! কি রূপ! আহা, চাঁদের আলো সারা দেহে ঝরে পড়েছে যেন প্রকৃতিরাণী জ্যোৎস্নায় স্নান করছে! কে এ? এখানে নির্জ্জনে বসে গান গাইছে কেন? (অগ্রসর হইয়া) সেই বাঁদীটি না? কে তুমি? এ বিজনে বসে সুধার ধারা ছড়িয়ে দেছ...

দরিয়া। আপনি! আপনি এখানে কেন?

সেলিম। বাগানে বেড়াচ্ছিলুম—তার পর তোমার গান শুনে এখানে এসেছি। যদি কোন দোষ করে থাকি, ক্ষমা করো, সুন্দরী—বলো, এখান থেকে চলে যাই।

দরিয়া। না, তা আমি বলিনি।

সেলিম। তুমি কে, জানতে পারি?

দরিয়া। আমি—আমি—

সেলিম। বুঝেছি। অভাগিনী তুমি, তাই এ সরাইয়ে বাঁদীর হীন কাজে নিযুক্ত আছো।

দরিয়া। আমি বাঁদী।

সেলিম। সে দুর্ভাগ্য তোমার নয় সুন্দরী, তোমার ভাগ্য-বিধাতারও! এমন রূপ বাদশার ঘরেই মানায়। এ ফুল বাদশার বাগানের যোগ্য!

দরিয়া। বনেও ফুল ফোটে না সাহেব?

সেলিম। ফুটবে না কেন! কিন্তু সে ফোটায় ফুলের কি সুখ সুন্দরী! কে তার সে রূপ দেখে? কে তার সে সুরভির পরিচয় পায়?

দরিয়া। নাই পাক্—ফুল তার জন্য দুঃখ করতে আসে না!

সেলিম। যদি কিছু মনে না করো, একটা কথা জিজ্ঞাসা...এ ফুলটি কার জন্য ফুটেছে?

দরিয়া। যে আদর করে বুকে নেবে...

সেলিম। আমি তোমায় বুকে তুলে রাখবো—(আলিঙ্গনোদ্যত)

দরিয়া। অমন কথা বলবেন না, সাহেব। ওসমান আলি সাহেবের কন্যা, দরিয়ার পাণিপ্রার্থী আপনি।

সেলিম। ভুল বুঝেচো আমায়! দরিয়াকে আমি চোখে দেখিনি এখনো।

দরিয়া। কেন, কাল এই সরাইয়েই আপনার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল, পরিচয়ও হয়েছিল।

সেলিম। তাকে পরিচয় বলে না,—যথার্থ বলছি, দরিয়াকে আমি দেখিনি! সে কেমন, কিছু জানি না।

দরিয়া। তাঁকে দেখলে আমায় রূপসী বলতেন না!

সেলিম। আমি তাঁর প্রার্থী নই, সুন্দরী। তুমি যদি অনুগ্রহ করো...

দরিয়া। কুরূপাকে সুন্দরী বলে সম্বোধন করবেন না। বাঁদীর নাম সোফিয়া।

সেলিম। সোফিয়া! এ রত্ন কি হৃদয়ে ধারণ করতে পারবো না? আমায় অনুগ্রহ করো, (হস্ত ধরিয়া সেই হস্তে চুম্বন করিল) আমি তোমারই! আঃ! জ্বালালে! বুড়ো চটিওয়ালা ব্যাটা এদিকে আসছে।

প্রস্থান

ওসমান আলির প্রবেশ

ওসমান। দরিয়া, এই তোমার শান্ত নম্র সলজ্জ সেলিম?

দরিয়া। আমি এখনো বলছি বাবা, তুমি এঁকে ভুল বুঝচো।

ওসমান। এখনো ভুল বুঝছি! আমার কন্যা হয়ে তুমি এমন কথা বলচো! কি স্পর্দ্ধা ওর! বিবাহ স্থির হবার পূর্ব্বে মহিলার অঙ্গ স্পর্শ করতে যার সঙ্কোচ হয় না, তাকে তুমি শিক্ষিত বলতে চাও!

দরিয়া। বাবা, তুমি ভুল বুঝেচো!

ওসমান। দরিয়া, তোমার মুখে এ কথা শুনবো, তা কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি! সারা দিন তোমায় না দেখে সন্ধান কচ্ছিলুম। আমিনা বললে তুমি জলটুঙ্গিতে আছ, তাই আমি এ ধারে আসছিলুম—এসে যা দেখলুম—না দরিয়া, এ আমার অসহ্য। এত বড় বেয়াদব—এখানে ওকে আর স্থান দিতে পারি না।

দরিয়া। না বাবা, এখনো বলছি, তুমি ভুল বুঝেচো। আচ্ছা, আর এক দিন দ্যাখো, তাহলেই বুঝতে পারবে!

ওসমান। বেশ, তাই হবে। কিন্তু তুমি প্রতিজ্ঞা :রো, আমার অমর্য্যাদা হয়, এমন আচরণ তোমার দ্বারা ম্ভব হবে না!

দরিয়া। না বাবা। আমি প্রতিজ্ঞা করচি, তোমার ায়ে আমি, সে কথা কখনো ভুলবো না। আমার খের দিকে চেয়ে ছাখো, বাবা,—বলো, আমার ভিতর মন কিছু দেখচো, যা আমি তোমার কাছে গোপন :রচি! (ক্রন্দনোন্মুখা)

ওসমান। কাঁদছিস্, দরিয়া! না মা, কিছু মনে ারিসনে! কখনো যদি আমার উপর অভিমান না করে াকিস, আজও করিসনে। যদি আজ রূঢ় হয়ে থাকি তা জানিস, সে তোরই মঙ্গলের জন্য!

[দরিয়াকে বক্ষে ধরিয়া প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

দালান

তসীর ও ফিরোজার প্রবেশ

তসীর। আসফ খাঁ কাল সকালে এখানে আসছেন! তুমি যে আমাকে অবাক করলে! তুমি কি করে জানলে?

ফিরোজা। মেসোমশায়ের কাছে চিঠি এসেছে, আমি সে-চিঠি দেখেচি।

তসীর। আমার ভারী লজ্জা করচে, তাঁর কাছে মুখ দেখাতে! তিনি যদি বুঝতে পারেন, আমার এখানে আসার কারণ কি! তিনি জানেন; আমি শুধু সেলিমের সঙ্গে এসেছি মাত্র, আমার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।

ফিরোজা। তবে কি হবে?

তসীর। আজ রাত্রেই এখান থেকে চলে যেতে হবে। সন্ধ্যায় সুবিধা হলো না। ফয়নাশা ঘোড়া ঠিক করে রাখবে, বলেছিল,—তার কি করলে সে? আমি একটু অন্য কাজে বাইরে যাবো। তার নামে একখানা চিঠি লিখে রেখে যাবো। শেষ রাত্রে সকলে যখন ঘুমোবে, তখন আমরা যাবো।

ফিরোজা। গহনাগুলোর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত তো?

তসীর। হাঁ, সে আমি তখনি সেলিমের হাতে জিম্মা করে দিয়েছি। আচ্ছা, আমি তবে চল্লুম এখন।

[প্রস্থান

ফিরোজা। যাই একবার দরিয়ার সঙ্গে দেখা করিগে। আমি ভারী স্বার্থপর, নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত! তার সঙ্গে আজ সারাদিন দেখা করিনি।

প্রস্থান

সেলিম ও জনৈক বান্দার প্রবেশ

সেলিম। তসীর হঠাৎ আমার কাছে অতগুলো গহনা জিম্মা রাখতে দিলে কেন? সরাইয়ে দিন-রাত্ত লোকজন আনাগোনা করছে—আমার কাছে নিরাপদ থাকা সম্ভব কি! কাজেই সরাইওলার স্ত্রীর জিম্মা করে দিলুম। (বান্দার প্রতি) কি রে, তোর বিবি-সাহেবের কাছে সেগুলো রেখে এসেছিস তো! বেশ সাবধানে রাখতে বলেচিস্?

বান্দা। হাঁ। তিনি বললেন, খুব সাবধানে রাখা হবে—কোনো ভাবনা নেই!

[প্রস্থান

সেলিম। বাঁচা গেল। ও এক সোজা ঝক্কি চাপালি তসীর। এ বাঁদীটি মোদ্দা দিব্যি দেখতে! অমন রূপ নিয়ে বাঁদীগিরি করে! বরাত! নাঃ, সরাই কাল ছাড়বো ভাবছিলুম, তা ত হচ্ছে না! আজ রাত্রে ঐ জন্যই মজলিসের বন্দোবস্ত করেছি। এ বাঁদীটি যদি আমার সঙ্গে যায়! এই যে তসীর—

তসীরের প্রবেশ

তসীর। আসল কথাই বলতে ভুলে গেলুম ফিরোজাকে—যে, আমি আর এ বাড়ীতে আসবো না, একেবারে শেষ রাত্রে বাগানের পিছনে, রাস্তায়, গাড়ীর ধারে দেখা হবে। সেলিম—কি বন্ধু, ওসমান আলি সাহেবের বাড়ী যাবে, না, এই সরাইয়েই থাকবে? মনের মত কিছু পেয়েচো না কি?

সেলিম। এই যে, তুমিও তাকে দেখেচো, তাহলে! সত্যি তসীর, বাঁদীর এমন রূপ! বোধ হয়, বাদশার রঙমহালেও এমন দেখা যায় না।

তসীর। কেন ভাই গরিব বাঁদীর সর্ব্বনাশ করবার মতলব করচো!

সেলিম। বাঁদীর আবার সর্ব্বনাশ। ভাগ্য বলো—যে, রূপের কদর হবে।

তসীর। তুমি কি মনে করো, বাঁদীর হৃদয়টা হৃদয় নয়?

সেলিম। না তসীর, বাজে তর্ক করছিলুম। সর্ব্ব-নাশ? ছি তসীর, তুমি একে ছাখোনি, এ যে কি সুন্দর মূর্ত্তি, দেবী বলে মনে হয়! কি এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে মণ্ডিত! এই বাঁদীর জন্য আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পারি।

তসীর। সেলিম—

সেলিম। আমি তাকে ভালোবেসেছি, গোপন করবো না, তসীর।

তসীর। ভালোবেসেচো? সেও তোমাকে ভালো-বেসেছে? ভালো কথা! (স্বগতঃ) না, এ কথা থাক,

আমার দেরী হয়ে যাবে! (প্রকাশ্যে) তুমি বোধ হয় গহনাগুলো সাবধানে রেখেচো!

সেলিম। খুব সাবধানে রাখা হয়েছে! আমার কাছে কোথায় রাখবো! সরাইয়ে তেমন জায়গা কোথায়? কাজেই সরাইওলার স্ত্রীর কাছে সেগুলো রেখে দিছি।

তসীর। কোথা রেখেচো?

সেলিম। সরাইওলার স্ত্রীর কাছে।

তসীর। এঁ্যা! সরাইওলার স্ত্রী!

সেলিম। হাঁ হে। সে বলেছে, কোন ভাবনা নেই, বেশ সাবধানে রাখবে। ভালো করিনি?

তসীর। এঁ্যা—করেচো কি! এঃ! হাঁ,—তা বেশ করেচো। (স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ করেচে। আমারও যেমন বুদ্ধি। হায়, হায়, কেন ওকে সব কথা লুকোতে গেলুম!

সেলিম। কি হে, ভাবচো কি?

তসীর। না, ভাববো আর কি! বেশ করেচো, বেশ করেচো, (স্বগতঃ) কি দু'খানা গহনা! তুচ্ছ অলঙ্কার! ফিরোজাকে পাই যদি তো বাদশার ঐশ্বর্য্যও তার কাছে ছার! (গমনোদ্যত)

সেলিম। বলি, যাও কোথা? আজ খুব ধুমধামে তরফা দেওয়া যাচ্ছে। সরাইয়ের নাচ-ঘরে প্রকাণ্ড মজলিশ!

তসীর। না, না, একটু কাজ আছে।

[প্রস্থান

সেলিম। যাওয়া যাক। আহা, সোফিয়া যদি বাঁদী না হতো!

[প্রস্থান

আমিনার প্রবেশ

আমিনা। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) ওরে, নাচ-ঘরে আলো দিছিস তো? আজ খুব ধুমধামে তরফা হবে। দেখিস, ঘর বেশ সাজানো হয়েচে? কোনো খুঁত নেই?

বাঁদীগণের প্রবেশ

১। না। আমরা সব সাজিয়ে এসেছি। ফুলের মালায়—

২। আলোর ছটায় ঘর যেন হাসছে।

আমিনা। বেশ, বেশ! দেখে আসি তবে, কেমন সব হলো

[প্রস্থান

বাঁদীগণ। গান

আলোর গানের ছড়াছড়ি, কিবা,
চারিধারে হাসিরাশি!
বাধা-ভয় সব, দূরে রাখো, আজ
শুধু ভালোবাসাবাসি।
হৃদয়ে হৃদয়ে কথা হবে শুধু,
ঢেলে দিব নব যৌবন-মধু,
পিয়ো তা হরষে, তুমি প্রাণবঁধু,
তুমি হে হৃদি-বিলাসী!
চাঁদ, মিছা চাঁদ, মিছা সুধা ঝরে!
চেয়ে দেখ এই নারীর অধরে
কি সুধা লুকানো, পিয়ো প্রাণভরে!
হোক্ প্রাণে-প্রাণে মেশামেশি!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রমোদ-শালা

সেলিম ও নর্ত্তকীগণ

নর্ত্তকীগণ।

গান

তুমি এসো, তুমি এসো!
অলস নয়নে স্বপনের মত এসো, তুমি এসো!
ফুলবনে মধু মলয়ের মত,
শিহরি মুখরি দূর বনপথ—
করি লুণ্ঠন জীবন-সুরভি এসো বঁধু, এসো!
এসো, নানা বরণের রঙীন মধুর,
পূর্ণ প্রেমের বেদনা-বিধুর,
মৃত্যুর দ্বারে স্বর্গ-আলোক, এসো, তুমি এসো!

ফয়নাশার প্রবেশ

ফয়নাশা। বাঃ বাঃ চমৎকার! তোফা! ইস্, মশ্‌গুল করে দেছ সাহেব!

সেলিম। কে? ফয়নাশা মিয়া যে! এসো, এসো, আজ ভারী ফূর্ত্তির রাত!

ফয়নাশা। এই যে বসে গেলুম চেপে। এঃ, এমন মজলিশ! জমজমাট্ হয়নি মোটে! শুধু মিয়া একলা বসে আমোদ করচো! ডেকে আনি দু-চার জনকে তবে না জমবে!

সেলিম। আলবৎ! সব এসেছিল। এধার ওধার আমোদ করে বেড়াচ্ছে। আজ ফুর্ত্তির রাত—ফুর্ত্তি চালাও!

ফয়নাশা। চালাও গান, চালাও নাচ—থেমো না।

সেলিম। ঠিক বলেচো, মিঞা, জমছে না! আমোদ করবো কার সঙ্গে?

ফয়নাশা। কেন, বাঁদীগুলো সব গেল কোথা? আচ্ছা, আমি দেখছি, আমি দেখছি।

সেলিম। যাও যাও—

ফয়নাশার প্রস্থান

সোফিয়া কোথা গেল? চমৎকার রূপ! আহা, যেন হুরী! এমন রূপ নিয়ে বাঁদী হয়ে জন্মালো সে! খোদার এমন বিধান! হাঁ, হাঁ, গাও তোমরা—আসছে সব লোকজন। চমৎকার নাচতে গাইতে পারো তোমরা। তারিফ করি আমি।

নর্ত্তকীগণ। গান

মিছা জীবন, যৌবন এ।
নিমেষে ফুরাবে, কে না জানে!
তারি মাঝে দিন যে-কটা মেলে,
শুধুই খেলো হাসি-রাশি তুলে—
চেয়োনা, চেয়োনা কারো পানে!
এমন মিঠা সুর জীবন-বীণার,
আবেশ এ, নেশা এ—ফুরাবে, হায়!
এসো পিয়ারে, ফুল-বনে,
আমোদে মাতো গো, প্রাণে-প্রাণে।

সেলিম। আচ্ছা, তোমরা একটু বিশ্রাম করোগে। লোকজন এলে ডাকিয়ে পাঠাবো তোমাদের! চমৎকার নাচ-গান। খুব খুশী হয়েছি আমি। দস্তুরমত ইনাম মিলবে।

নর্ত্তকীদের প্রস্থান

সোফিয়া। শুধু তার কথা মনে পড়চে! নাঃ, পিতার চক্ষুশূল হই, হবো, সোফিয়াকে ছাড়তে পারবো না! ওসমান আলির কন্যাকে বিবাহ করতে পারবো না, সোফিয়া—আমার জীবনের একমাত্র সুখ, আমার—এ কি আবার বুড়ো জ্বালাতে এলো।

ওসমান আলির প্রবেশ

ওসমান। নিজের বাড়ীতে নিজে স্বচ্ছন্দে থাকতে পাবো না। অতিষ্ঠ করে তুলেছে একেবারে!···সেলিম সাহেব—

সেলিম। (করজোড়ে) হুকুম ফরমাইয়ে, হুজুর!

ওসমান। আসফ খাঁর পুত্রের জন্য আমার দ্বার অবারিত!

সেলিম। শুধু তোমার দোর নয়, মিয়া, সকলের দোরই অবারিত!

ওসমান। আসফ খাঁর পুত্র বলে অনেক সহ্য করেছি—কিন্তু সহ্যের একটা সীমা আছে!

সেলিম। পরিষ্কার করে বলে ফ্যালো, মিয়া! আমার সময়ের দাম আছে!

ওসমান। তুমি যা করছিলে, তাতে কথা কইনি, কিন্তু তুমি রাজ্যের হতভাগাগুলোকে ডেকে এনেচো, তারা সরাপ খেয়ে যে কাণ্ড আরম্ভ করেছে, তাতে আমার ধৈর্য্য রাখা দায় হয়ে উঠেছে!

সেলিম। কি করবো, মিয়া, আমি নিজে সরাপ ছুঁই না, কাজেই ওদের খাইয়ে পাষাণ ভেঙ্গে নিচ্ছি। আজ ফুর্ত্তির রাত, বুঝলে কি না, মিয়া! নাও না, তুমিও দু পেয়ালা টেনে ভোঁ হয়ে পড়ো না!

মত্ত অবস্থায় জনৈক ইয়ারের প্রবেশ

কি সাহেব, পা টলছে, কেন? মাথা ঠিক থাকছে না যে!

ইয়ার। পা টলবে কেন, মিয়া? দুনিয়াখানা ভারী ঘুরছে, তাই এধার ওধার করে আস্তানা ঠিক করে নিচ্ছি।

ওসমান। কি, এ সব?

সেলিম। ফুর্ত্তি! খালি একটু ফুর্ত্তি! বুড়ো মিয়া, চটো কেন? এই···এই···সরে পড়ো এখান থেকে।

ইয়ার। কোথায় কাপুরুষের মত সরবো, মিঞা? বীরের মত শুয়ে পড়া যাক— (শয়নোদ্যত)

ওসমান। (ঘাড় ধরিয়া) বেরো এখান থেকে, পাজী, বেয়াদব! বেরো—(ধাক্কা দিলেন ও ইয়ার পড়িয়া গেল। নেপথ্যে পতন-শব্দ) সেলিম সাহেব, এ আমার বরদাস্ত হয় না!

সেলিম। তোমারও এ বেয়াদবি অসহ্য!

ওসমান। কি! আমার বাড়ীতে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ হবে, আর আমি তাই সহ্য করবো? সেলিম সাহেব, তা হবে না। এ বাড়ীতে তোমায় আর আমি স্থান দিতে পারি না।

সেলিম। আহা, চটো কেন, মিয়া? এসো আমোদ-আহ্লাদ করো। এমন ফুর্ত্তির রাত!

ওসমান। অসভ্য, উদ্ধত বালক, এ আমার বাড়ী—আমার কথা কথা নয়, আদেশ বলে জেনো!

সেলিম। তোমার বাড়ী! পাগল হলে নাকি মিয়া? এ বাড়ী আমার, যতক্ষণ যতদিন খুসী, আমি থাকবো!

ওসমান। চমৎকার শিক্ষা পেয়েচো তুমি, বালক। কি বলবো, তুমি আসফ খাঁর পুত্র—

সেলিম। থাক্, থাক্, আর খোসামুদিতে কাজ নেই। যেখানে পয়সা ঢালবো, সেখানেই জায়গা পাবো, খাতিরের সঙ্গে পাবো। নিয়ে এসো তোমার ফর্দ্দ—যা খরচ, সব চুকিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

ওসমান। বালক, বালক, তোমার পিতার পত্র পড়ে ভেবেছিলুম যে, একজন শিক্ষিত, নম্র, শান্ত যুবককে দেখতে পাব—কিন্তু এ আমি কি দেখচি? এক অসভ্য বেয়াদব—পথের ভিখারী যেটুকু আদব-কায়দা জানে, আসফের পুত্র তাতেও বঞ্চিত! এ দুঃখ অসহ্য!

[প্রস্থান

সেলিম। এ কি! তবে কোন ভুল হয়েছে কি আমার? না, সব তো সরাইয়ের মত—অসংখ্য বাঁদী-বান্দা ফরমাশ খাটার জন্য হামেহাল হাজির রয়েছে—ঢুকতে ফটকের পাশে গণ্ডারের চামড়ার ঢাল ঝুলছে, সে লোকটা যা বলেছিল, সব ঠিক! এই যে সোফিয়া আসছে। একে জিজ্ঞাসা করি। সোফিয়া—

দরিয়া। আমায় ডাকছেন? কি বলবেন, শীঘ্র বলুন, আমি এখন ভারী ব্যস্ত! (স্বগতঃ) বোধ হয়, ভুল বুঝতে পেরেছে।

সেলিম। সোফিয়া, একটা কথার তুমি শুধু জবাব দাও, এ বাড়ীর তুমি কে? কি তোমার কাজ?

দরিয়া। বলেছি তো, একজন বাঁদী শুধু।

সেলিম। এ সরাইয়ে কতদিন আছ?

দরিয়া। সরাই! সরাই কোথায়?

সেলিম। কেন, এই বাড়ী।

দরিয়া। সরাই! ওসমান আলি সাহেবের বাড়ী! সরাই! বলেন কি আপনি?

সেলিম। এটা ওসমান আলি সাহেবের বাড়ী?

দরিয়া। তা নয় তো কি? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—সরাই!

সেলিম। এঃ, তাইতো—এ কি বিষম ভুল করে ফেলেছি! পৃথিবীতে কারো কাছে মুখ দেখাতে পারবো না যে! এই বুঝি ওসমান আলি সাহেব···? এইমাত্র চলে গেলেন?

দরিয়া। হাঁ।

সেলিম। ইঃ, কি মনে করলেন আমাকে। অসভ্য, বেয়াদব! না, এই রাত্রের নির্জ্জনতার মধ্যেই সরে পড়া একমাত্র সুযুক্তি!

দরিয়া। আপনি এই রাত্রেই চলে যাবেন?

সেলিম। হাঁ, সোফিয়া—যে কাণ্ড করছি আমি—তাতে আর এক মুহূর্ত্ত থাকতে সাহস হচ্ছে না আমার!

দরিয়া। চলে যাবেন? (নতমুখী হইল)

সেলিম। তোমার মনে কষ্ট হবে, সোফিয়া?

দরিয়া। আপনি কি আমার জন্ত চলে যাচ্ছেন? আজ সন্ধ্যার সময় জলটুঙ্গিতে যা ঘটেছিল, তাতে আমার আশা হয়েছিল—

সেলিম। (স্বগতঃ) আহা, বালিকা কাঁদচে। আমারই দোষ! (প্রকাশ্যে) সোফিয়া, ক্ষমা করো, আমার অবিনয় ভুলে যাও, বালিকা! জগতে কোন নারীকে আমি এমন ভালোবাসিনি—কি করবো সোফিয়া, তোমায়-আমায় মিলন অসম্ভব। আমায় ভুলে যাও তুমি!

দরিয়া। নিষ্ঠুর পুরুষ—

সেলিম। সত্যই আমি নিষ্ঠুর, সোফিয়া। জগতে তোমাকে অদেয় আমার কিছু নেই, কিন্তু পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করবার ক্ষমতাও আমার নেই। তাঁর অতুল বংশগৌরব আমার একটা রূপ-তৃষ্ণার জন্য ধুলায় লুটিয়ে দেবো, সে শক্তি আমার নেই, সোফিয়া!

দরিয়া। নিষ্ঠুর—যাও তবে!

সেলিম। অনুতাপে জ্বলে যাচ্ছি, সোফিয়া। এ হৃদয় দেখাবার নয়—না হলে দেখাতেম, সেখানে আর কেউ নেই—শুধু সোফিয়া, তোমার মূর্ত্তি!

দরিয়া। বুঝেচি। দরিয়া বিবি—

সেলিম। ভুল সোফিয়া—এ তোমার ভুল! জগতে সোফিয়া ছাড়া কেউ আমার হৃদয়-ভাগিনী হবে না, কিন্তু তা যখন সম্ভব নয়, তখন এ জীবনে আমি কাকেও বিবাহ করবো না, স্থির জেনো।

দরিয়া। তবে আমায় গ্রহণ—

সেলিম। অসম্ভব! আসফ খাঁর পুত্র অজ্ঞাত-কুলশীলা বাঁদীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করতে পারে না। জগতে প্রেমই সর্ব্বস্ব নয়, অপর বন্ধনও আছে। কি করব? তোমায় গ্রহণ করতে না পেরে আমার মনে কি কষ্ট হচ্ছে, তা আমিই জানি! কিন্তু উপায় নেই। আমায় ক্ষমা করো সোফিয়া! আর আমার অনুরোধ, আমায় ভুলে যাও। তোমার মুক্তি চাও, যদি···বলো, যত মুদ্রা ব্যয় হয়, আমি তাতে কুণ্ঠিত হবো না।

দরিয়া। কোন প্রয়োজন নেই, এ অনুগ্রহ দেখাবার, সাহেব! তবে একটি কথা আপনাকে রাখতে হবে। আমি মিনতি করচি।

সেলিম। রাখবার হয় যদি, অবশ্য রাখবো।

দরিয়া। আজ রাত্রের মত কোথাও যাবেন না—বলুন।

সেলিম। আর কেন আমায় ধরে রাখচো সোফিয়া?

দরিয়া। প্রয়োজন আছে। কাল সকালেই জানতে পারবেন। এ সামান্য অনুরোধটুকু···

সেলিম। অনুরোধ নয়, সোফিয়া—আদেশ বলো! শ, আমি রাজী।

দরিয়া। আমিও কৃতার্থ হলেম।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ

ওসমান আলি ও আসফ খাঁর প্রবেশ

ওসমান। যে রকম মনিবের মত আমার উপর ড়া হুকুম চালিয়েছিল, যদি শুনতে! হা-হা-হা—

আসফ। তোমার সঙ্গে প্রথম আলাপটুকু জমেছিল বশ, তা হলে!

ওসমান। হাঁ! আগাগোড়া আমাকে সরাইওলা লে ঠিক করে ফেলেছিল।

আসফ। খুব বেদস্তুর সরাইওলা, বলো! কোন কথা াহ্য করে না, ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে! রাইওলার পক্ষে সেটা বড় সুখ্যাতির কথা নয়! হা-া-হা-হা—

ওসমান। তখন আমার খুব রাগ হয়েছিল। এই তামার সভ্য ছেলে! বেশ কড়া রকমের পাঁচ কথা ওনিয়ে দিতে ছাড়িনি আমি!

আসফ। অমন ব্যবহার দেখলে বলবেই তো—তুমি তা জানোনা, একটা মস্ত ভুল চলেছে দুজনের মধ্যে!

ওসমান। কাল রাত্রে দরিয়া আমাকে ব্যাপারটা খুলে বললে—তখন বুঝলুম। নাহলে আজ একটা হেস্তনেস্ত হতো, তোমার সঙ্গেও। অল্পে ছাড়তুম না। একটি ছেলে, তাকে এমন তরিবৎ শিখিয়েচো! সেলিমও কাল রাত্রে নিজের ভুল জানতে পেরে ভারী লজ্জিত হয়ে পড়েছে। কাল রাত্রেই সে পালাচ্ছিল। দরিয়ার বিস্তর পীড়াপীড়িতে রাতটা শুধু থাকতে রাজী হয়েছে।

আসফ। যাক্, এখন দরিয়াকে ওর পছন্দ হয়েছে তো? দুজনের দুজনকে মনে ধরেছে? বিয়ে করতে রাজী করাতে কখনো পারিনি ওকে!

ওসমান। এখন এই বিয়েয় আমাদের বন্ধুত্ব পাকা হলো। আর কদিনই বা আমরা আছি, বলো? আমাদের এ বাঁধনে ওরাও যে পরস্পরে চিরজীবনের জন্য বাঁধা পড়ল, এ কি কম সুখ! তোমার দৌলতে আমি অপুত্রক হয়েও পুত্রের পিতা হলুম! আসফ, এ এক কি মস্ত ঋণে তোমার কাছে বাঁধা পড়লুম আমি!

আসফ। সে ঋণ তো শোধ হয়েছে, বন্ধু! আমার মেয়ে ছিল না—এমন একটি সুন্দরী মেয়ে তুমি দিলে—এ যে আরো গভীর ঋণ!

ওসমান। সেলিম আসছে, লজ্জায় মাথা তুলতে পাচ্ছে না!

সেলিমের প্রবেশ

সেলিম। আমি আপনার কাছে অত্যন্ত অপরাধী হলেও আপনার সন্তান, সেই মনে করে শুধু ক্ষমা প্রার্থনা করবার সাহস হচ্ছে। আমার অবিনয়, ঔদ্ধত্য অনুগ্রহ করে ক্ষমা করবেন! কি ভুলের মধ্যে পড়েছিলুম আমি!

ওসমান। থাক্, থাক্, সেলিম! তা নিয়ে মন খারাপ করে কি হবে? এমন ভুল হয়েই থাকে মানুষের। আমি সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করেছি তোমায়।

আসফ। এর জন্য এখন আর লজ্জিত হবার কারণ নেই তোমার। দরিয়া যখন তোমায় পছন্দ করেছে—

ওসমান। আর তুমিও যখন দরিয়াকে পছন্দ করেচো—

সেলিম। ক্ষমা করবেন—পছন্দ করবার মত আমাদের পরস্পরের মধ্যে পরিচয়ের এমন কোন সুযোগ ঘটেনি!

ওসমান। সুযোগ ঘটে নি? সে কি, আমার অজানিত কিছু নেই। এতে লজ্জিত হবার কোন কারণ দেখছি না সেলিম।

সেলিম। যথার্থ বলছি, শুধু একবারমাত্র আপনার কন্যার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল—তাও অত্যন্ত ক্ষণিকের জন্য। তাতে কারো মনে কোন ভাবান্তর হওয়া সম্ভব নয়।

ওসমান। এ তুমি কি বলচো, সেলিম! সে তোমার মনোনীত নয় তা হলে?

সেলিম। সে কথাও বলতে পারি না। যথার্থ বলছি, আপনার কন্যা আমার কোন পরিচয় পান নি, আমিও তাঁর পরিচয় পাইনি।

আসফ। তুমি তাকে তোমার আন্তরিক অনুরাগ জানাও নি—এই কথা তুমি বলতে চাও সেলিম?

সেলিম। পিতা, আপনার সম্মুখে মিথ্যা বলছি না। আপনার আদেশে আমি এখানে এসেছিলেম—দরিয়া বিবির সঙ্গে মুহূর্তের জন্য শুধু আমার দেখা হয়েছিল এবং দু একটি অসম্পর্কিত কথা ছাড়া আমাদের আর কোন কথা হয় নি! আমায় আপনারা ক্ষমা করবেন। আমি দরিয়া বিবিকে বিবাহ করতে অক্ষম—আমি তাঁর অযোগ্য।

প্রস্থান

ওসমান। এর অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

আসফ। কিন্তু সেলিম সত্যবাদী, নির্ভীক, আপনার সঙ্কল্প জানাতে কখনো কুণ্ঠা করে না।

ওসমান। কি অটল অকম্পিত স্বরে বলে গেল! আমি যে আশ্চর্য্য হচ্ছি। এই যে দরিয়া আসছে। আমার কথায় তোমার প্রত্যয় না হয়, ওকেই জিজ্ঞাসা করো, বন্ধু—সরলা বালিকা। কোন কথা গোপন করা ওর স্বভাব নয়। দরিয়া, এ দিকে এসো।

দরিয়ার প্রবেশ

আমার বন্ধু, আসফ খাঁ!

দরিয়া। (অভিবাদন করিল)

আসফ। এসো মা—

ওসমান। দরিয়া, তোমার কাছে আমি একটা সংবাদ জানতে চাই। লজ্জা করোনা, কোন কথা গোপন করার প্রয়োজন নেই।

দরিয়া। কি কথা বাবা?

ওসমান। তুমি সেলিমের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়েচো, সে তোমার অনুরাগী কি না—তার কোন আভাস পেয়েচো? বলো, লজ্জা করোনা!

দরিয়া। (সলজ্জভাবে) পেয়েছি।

ওসমান। শোনো, বন্ধু—

আসফ। সেলিম নিজে তোমায় সে কথা বলেছে, মা?

ওসমান। বলো—

দরিয়া। (সলজ্জভাবে) হাঁ।

ওসমান। শোনো, বন্ধু!

আসফ। সে নিজে বলেছে, তোমাকে ভালোবাসে?

দরিয়া। হাঁ।

আসফ। তবে আর আমার কোন সন্দেহ নেই! কিন্তু সে নিজে স্বীকার করলে না কেন, এ কথা?

ওসমান। লজ্জায় হতে পারে।

আসফ। না—এ সব বিষয়ে কোন কথা বলতে আমার কাছে সে সঙ্কোচ করবে না। সে যখন নিজে স্বীকার করছে না, তখন আমার মনে হয়, এ বিবাহে তার কোন আপত্তি আছে!

ওসমান। তুমি যাও, দরিয়া—(দরিয়ার প্রস্থান) কিন্তু আমি নিজে দেখেছি, বন্ধু, কাল সন্ধ্যায় জলটুঙ্গিতে সেলিম দরিয়ার হস্ত চুম্বন করছে।

আসফ। এ এক রহস্য!

ওসমান। এ রহস্য আবিষ্কার করতে হবে। আমি নিজের চোখে দেখেছি—সে-তো স্বপ্ন নয়! আচ্ছা, একটা পরামর্শ করা যাক। আমিনার সাহায্যে এ রহস্য আমি আবিষ্কার করছি।

আসফ। এ বিবাহ যদি না হয় তো আমার মনে বড় আঘাত লাগবে।

ওসমান। আমার মাতৃহারা কন্যা! তাকে সুপাত্রে না দেওয়া অবধি আমার মন কিছুতে সুস্থির হচ্ছে না। এসো, একটা মতলব করতে হবে। এ বিবাহ হওয়া চাইই।

আসফ। আমারও মনের কথা টেনে বলেচো তুমি বন্ধু।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

উদ্যান-পার্শ্ব

তসীর ও ফিরোজার প্রবেশ

তসীর। রাত্রিটা আমার প্রতীক্ষা করেই কাটলো, ফিরোজা—তুমি এলে না! আমার সমস্ত সংকল্প চূর্ণ করে দিলে!

ফিরোজা। আমায় ক্ষমা করো। আমি যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলুম, কিন্তু পা সরলো না! অনাথা আমায় কুড়িয়ে এনে পিতার অধিক স্নেহে যিনি আমায় পালন করলেন, তাঁকে কিছু না বলে এমন চোরের মত রাত্রে পালিয়ে যাবো! তিনি কি মনে করবেন! তাঁর কতখানি মনস্তাপ হবে! শুধু এই ভেবে আমার পা কেমন আটকে গেল, আমি যেতে পারলুম না। তোমার অনেক কষ্ট হয়েচে! কি করবো? উপায় ছিল না! আমায় ক্ষমা করো।

তসীর। অমন কাতর নয়নে চেয়োনা ফিরোজা—ক্ষমা চাইছ তুমি? তোমার কোন অপরাধ নেই!

ফিরোজা। তোমার অনুগ্রহ আমার জীবন!

তসীর। ও কথা আর কেন ফিরোজা? এখন কি করবো, বলো?

ফিরোজা। ছাখো, তা'ও আমি ভেবে রেখেছি! মেশোমশায়ের কাছে তুমি নিজের পরিচয় দাও—সব কথা তাঁকে খুলে বলো। তাঁর হাত থেকে আমায় গ্রহণ করো। প্রিয়তম সে কি গৌরবের সঙ্গে তোমার হাত ধরে চলে যাবো!

তসীর। বেশ কথা, ফিরোজা। যথার্থ বলছি, আমারো মন থেকে থেকে কেঁপে উঠছিল! লুকিয়ে কোন কাজ করায় তেমন সুখ পাওয়া যায় না, তা সে কাজ যত মহৎ হোক! কিন্তু গুলরুম বিবি যদি কোন বাধা দেয়?

ফিরোজা। সে বাধায় মেশোমশায় কিছুমাত্র বিচলিত হবেন না। তুমি জানোনা, কি অসীম স্নেহপূর্ণ, উদার তাঁর হৃদয়!

তসীর। তবে তাঁরই কাছে যাই, চলো। যতক্ষণ অবধি না তোমায় পাচ্ছি, ততক্ষণ আমার মন শান্ত হচ্ছে না।

গান

উভয়ে। আজি সব দুঃখ অবসান।
চারিধারে এ কি আলো, এ কি এ শোভা!
বিশ্ব গাহিছে কিবা সুমধুর গান!

ফিরোজা। হৃদয়-আসন ছিল এতকাল শূন্য।

তসীর। আজি কি হলো তা, সখি?

ফিরোজা। মিলনে পূর্ণ!

উভয়ে। ঘুচেছে, সকল বাধা, নাহি ব্যবধান।
নিশিদিন রবো দোঁহে দোঁহার প্রণয়ে ভোর,
এ কি এ কঠিন পাশ! এ কি এ নিবিড় ডোর!
কি দিব তোমারে আর? সকলি করেছি দান!

উভয়ের প্রস্থান

দরিয়া ও আমিনার প্রবেশ

আমিনা। তুমি ঐ লতাকুঞ্জে বসবে, চলো, সেলিম সাহেবকে ডেকে আনছি। এমন ছেলেমান্ষিও করে! নিজের পরিচয় দিতে আর দেরী নয়! তা হলেই সব ঠিক হয়ে যায়। এমন তৃষ্ণা নিয়ে নদীর ধারে বসেও যদি জলে না নেমে, আকাশের দিকে চেয়ে থাক তো তার মত বেকুবি আর কি আছে, বিবি?

দরিয়া। ঠিক বলেছিস আমিনা। আমিও তাই ভাবছিলুম! ভয় হচ্ছিল, যদি এ কৌতুকের কথা শুনে তিনি রাগ করেন!

আমিনা। ওঃ, রেখে দাও তাঁর রাগ! তিনি গিয়েও যে যেতে পারচেন না, এর মানেটা কি? পা বাড়াচ্ছেন, আর ফিরুচ্ছেন! ভাবছেন, উঁহু, কি সর্ব্বনাশ করচি! আর যে দেখতে পাবো না! তাই একটা না একটা ছুতোর খোঁজ করচেন বই নয়। আমি তাঁকে বলে এসেছি, সোফিয়া বিবির সঙ্গে দেখা না করে যাবেন না, বড় জোর অনুরোধ!

দরিয়া। তাতে কি বললেন?

আমিনা। তা না না, তা না না করলেন খুব, প্রথমটা! তার পর যেই আমি একটু ঝোঁক কম দেখালুম, অমনি তাঁর রোখ্ বেড়ে উঠলো। হুঁঃ, পুরুষমানুষগুলোকে আজও তুমি চিনলে না, বিবি সাহেব! এই রাঙা ঠোঁট, কালো চোখ, এর মায়া কি সহজ মায়া?

গান

এ তো নয়, আঁখির তারা, প্রাণ-পাখী ধরা ফাঁদ।
ঢেউ-তোলা এ চুলের রাশি—এ যে বড় কঠিন বাঁধ!
এ মুখের এমন হাসি গোপনে পরায় ফাঁশি
এ বাহুর মালা গেঁথে গলে পরি মনেরি সাধ।
কথা কয় বাঁশীর তান—এ আবেশে ভরে প্রাণে!
ছুটে প্রাণ লুটোতে চায়—পেলে এ চরণ-চাঁদ।

দরিয়া। যাঃ, রঙ্গ করতে হবে না আর!

আমিনা। ওগো, রঙ্গ নয়। খাঁটি কথা। পুরুষমানুষগুলোকে ডেকে একবার জিজ্ঞাসা করো দিকিন, আমার কথা ঠিক কি না। তুমি ত কত কেতাব পড়েচো, দেখেচো তো তাতে, পুরুষগুলো মেয়েদের পায়ে পড়েই আছে! যাক্, তুমি এখন যাও সেখানে। আমিও দেখি, ইনি চোখে সুরমা-টুরমা টেনে হাজির হন্ কি না।

দরিয়ার প্রস্থান

আলি সাহেব আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, উপায় কি? উপায় পড়েই রয়েছে। আইবুড়ো ছেলে, আইবুড়ো মেয়ে—দুজনে চোখাচোখি হয়েছে, কি মজেছে! খাঁ সাহেবের বিশ্বাস হচ্ছে না, তাঁর ছেলে দরিয়া বিবির জন্য পাগল। বুড়ো মানুষ—প্রথম বয়সের কথা ভুলে গেছেন কি না। বেশ স্বচক্ষে দেখুন, স্বকর্ণে শুনুন একবার—তাহলে আর সন্দেহ থাকবে না। (গমনোদ্যতা) বাঃ, এই যে সেলিম সাহেব! ইস, কি সাজগোজ হয়েছে। হাসি পায় রকম দেখে। চোরের মত উসখুস্ করতে করতে আসছেন দ্যাখো! পা যেন চলে-চলে চলে না! যেন ফাঁসি-কাঠে চড়তে চলেছেন।

সেলিমের প্রবেশ

সেলিম। কে? আমিনা? দ্যাখো আমিনা, আমি তোমাকেই খুঁজছিলুম। কি জানো? দ্যাখো, সোফিয়ার সঙ্গে বুঝলে…দেখা করতে কেমন…বুঝলে… মন সরছে না! কেমন—

আমিনা। সে কি সাহেব, একেবারে চলে যাচ্ছেন, আর কখনো দেখা হয় কি না সন্দেহ। মেয়েমানুষের মনটুকু কেড়ে নিয়ে চল্লেন, এখন একটিবার দেখাও যদি না দেন—

সেলিম। ভালো দেখায় না, না? তা চলো একবার। কি জানো, আমার আবার তাড়াতাড়ি আছে। তা তুমি যখন বলচো, তোমার কথা ঠেলতে পারি না!

আমিনা। আসুন তবে—সোফিয়া বিবি এই দিকে আছে।

প্রস্থান

সেলিম। ঠিক বলেছে এ বাঁদী! ইহজন্মে হয়তো আর দেখা হবে না! একবার শেষ দেখা দেখে যাই।

সোফিয়া। আহা! কেন তুমি বাঁদী হয়ে জন্মালে?

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

উদ্যানস্থ লতাকুঞ্জ

দরিয়া

দরিয়া। হাসি পাচ্ছে আগাগোড়া সব মনে করে! আহা, নিতান্ত ভালোমানুষ! এমন কৌতুক করা ভালো হয়নি! আমার কষ্ট হচ্ছে! এই যে আমিনা—

আমিনার প্রবেশ

আমিনা। আসছেন, আসছেন—আমি সরে যাই। (স্বগত) আলি সাহেবকে খপর দিইগে! খাঁ সাহেব এসে আড়ি পাতুন। যেমন ছেলের রোগ, ওষুধও চাই তেমনি বিদঘুটে তো!

প্রস্থান

সেলিমের প্রবেশ

সেলিম। আমায় ডেকেচো তুমি সোফিয়া? বিদায় দাও সোফিয়া—আমার যাবার সময় হয়েছে। যেতে আমার কি কষ্ট হচ্ছে—

দরিয়া। থাক্ সেলিম সাহেব—সে কষ্ট বেশীক্ষণ থাকবে না। আপনি পুরুষমানুষ, তায় আপনার রূপ আছে, গুণ আছে—অগাধ সম্পত্তির অধিকারী আপনি! আমায় ভুলে যেতে বিলম্ব হবে না—আমি তুচ্ছ বাঁদীমাত্র।

[ওসমান আলি ও আসফ খাঁ অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইল]

সেলিম। ও কথা বলে তুমি আমায় কি গভীর বেদনা দিচ্ছ, তা তুমি বুঝচো না, সুন্দরী! যথার্থ বলছি, তোমায় ছেড়ে যেতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে!

দরিয়া। তোমার ভাবনা কি সেলিম সাহেব? তোমার বাঁদী হবার জন্ম লক্ষ রূপসী উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

সেলিম। আবার ঐ কথা, সোফিয়া! আমার হৃদয় জানো না—এ হৃদয়ে কি গভীর রেখাপাত করেচে—তা যদি জানতে!

দরিয়া। পুরুষের হৃদয়ে রেখাপাত! জলে রেখাপাত করলে সে-রেখা তখনি মিলিয়ে যায়। পুরুষের হৃদয় জলের মত। প্রতি নিমেষে বীচি-তরঙ্গের মত লক্ষ লক্ষ রেখাপাত হচ্ছে, আবার তখনি মিলিয়ে যাচ্ছে—এ'তো নারীর পাষাণ হৃদয় নয় যে, একবার রেখাপাত হলে সে রেখা ইহজন্মের মত গভীর থাকবে, কখনো মিলুবে না!

সেলিম। (দরিয়ার এই দুই হাত আপনার হাতে লইয়া) তুমি সত্যই পাষাণী, পাষাণী! তুমি সব জানো—তোমার কাছে কিছু গোপন করিনি। জগতে এমন কোন নারী নেই যে, আমার হৃদয়ে কখনো প্রবেশাধিকার পাবে! এ হৃদয় তোমার—তুমিই আমার হৃদয়েশ্বরী!

ওসমান আলি ও আসফ খাঁর প্রবেশ

উভয়ে চকিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

আসফ। এ উত্তম, সেলিম! ভণ্ড, মিথ্যাবাদী, কাপুরুষ, এই তোমার কর্তব্যজ্ঞান, এই তোমার ধর্ম্ম!

সেলিম। আমায় ক্ষমা করুন, পিতা! আমি আপনার অযোগ্য সন্তান!

আসফ। চুপ করো, ভীরু! তোমার ব্যবহারে আমি স্তম্ভিত হয়েছি! তুমি ওসমান আলির কন্যাকে বিবাহ করবে না, কারণ, তুমি তার অনুরাগী নও?

সেলিম। পিতা, আমি কাপুরুষ নই, ভণ্ড নই। আমি দরিয়া বিবিকে বিবাহ করতে অক্ষম। আমি মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, আমি তার অনুরাগী নই।

ওসমান। যুবক, আমাকে তুমি বিস্মিত করে তুলেচো!

আসফ। তুমি দরিয়াকে তোমার অনুরাগ জানাও নি?

সেলিম। কখনো না।

আসফ। এ উত্তম অভিনয়, সেলিম! কিন্তু এ পৃথিবী অলীক-স্বপ্ন-ভরা রঙ্গমঞ্চ নয়, জেনো।

ওসমান। যুবক, তুমি দরিয়াকে ভালোবাসো না?

সেলিম। ক্ষমা করবেন—আমি আপনার কন্যার অযোগ্য, কোন যোগ্য পাত্রে তাকে অর্পণ করবেন।

ওসমান। তবে এ-সবের অর্থ কি, যুবক? একজন সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলার সহিত এ নির্জ্জনে সাক্ষাৎ, মিথ্যা প্রেমের এই কুৎসিত অভিনয়, আমার কন্যার মর্য্যাদার প্রতি এ পৈশাচিক অপমান!

সেলিম। এ-অপরাধে আমায় অপরাধী করবেন না।

আসফ। আমার পুত্র এমন হীন···

সেলিম। না পিতা, আপনার মর্য্যাদার হানি হবে বলে শুধু আমার নিজের জীবনের সুখ চিরদিনের জন্য জলাঞ্জলি দিয়েচি! আপনার কাছে অসঙ্কোচে প্রকাশ করচি, আমি এই বাঁদীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছি। এই বাঁদীকে আমি ভালোবাসি।

আসফ। বাঁদী ?

ওসমান। এ কি বলচো সেলিম ? বাঁদী··· ?

সেলিম। সোফিয়া। আপনার গৃহে···

ওসমান। আমার কন্যা দরিয়া।

সেলিম। দরিয়া ?

ওসমান। আমার কন্যা দরিয়া বাঁদী !

সেলিম। দরিয়া ! কি বিষম ভ্রম আবার ! আমায় া করুন। আমি এঁকে বাঁদী বলে ভেবেছিলুম।

আসফ। তুমি উন্মাদ হয়েচো ! এই রূপ, এমন ক্ষা বাঁদীতে সম্ভব !

দরিয়া। পিতা, আমায় ক্ষমা করুন। যথার্থ আমি পনাকে সরাইয়ের বাঁদী বলে পরিচয় দিছলাম !

ওসমান। সরাইয়ের বাঁদী ! ওহোহো—সেই ভুল ! না, তাহলে তোমার কোন অপরাধ নেই !

সেলিম। (স্বগতঃ) আমার মুখ দেখাতে লজ্জা চ্ছ—এমন বেকুব আমি !

আসফ। মা, তুমি আমার ঘরে এসে সে ঘরখানি জ্বল করে তুলবে, এ আমার চিরদিনের সাধ ! সে সাধ ি করে বৃদ্ধকে সুখী করবে, মা !

দরিয়া। পিতা, আমি আপনার বাঁদী।

ওসমান। সেলিম, মুখ তোলো। লজ্জা কি ? যা য় গেছে, তা আর মনে রেখো না। আমি অপুত্রক, মি আমার পুত্র !

সেলিম। আমি আপনার অযোগ্য সন্তান।

ওসমান। আজ বড় আনন্দের দিন, বন্ধু, বড় নন্দের দিন !

তসীর ও ফিরোজার প্রবেশ

রোজা, মা, আজ বড় আনন্দের দিন ! আনন্দ করো ! ামি অপুত্রক, পুত্ররত্ন লাভ করেছি। কে ? তসীর, সো—

তসীর। আমার একটি আরজী আছে। ফিরোজা খন সিরাজে, আমাদের পিতামাতা আমাদের উভয়ের বাহ স্থির করেছিলেন। তার পর ফিরোজা অনাথা য় আপনার মহদাশ্রয়ে আসে। অল্পদিন হলো, আমি সন্ধান পেয়েছি। আপনার কাছে আজ. আমি রোজাকে প্রার্থনা করচি, আমাদের উভয়ের সুখের ামা থাকবে না। আপনি ফিরোজাকে আমার হাতে র্পণ করুন।

ওসমান। আমি ফিরোজার অভিভাবক, সে কথা ত্য, কিন্তু বহুদিন থেকে ফয়নাশার সঙ্গে তার বিবাহের থাবার্ত্তা হচ্ছিল। শুনছি, ফয়নাশাকে বিবাহ করবে, ফিরোজারও ইচ্ছা।

গুলরুখ ও ফয়নাশার প্রবেশ

ফয়নাশা। মিছে কথা, মিছে কথা ! ও ঝক্কি পোহানো আমার কাজ নয়। বাবা, একটা বিয়ে করে শেষে চোর-দায়ে ধরা পড়বো ? ও কাজ আমার দ্বারা হবে না।

ওসমান। ফিরোজা, তুমি ফয়নাশাকে বিবাহ করতে অসম্মত ?

ফিরোজা। ফয়নাশা আমার ভাই—আমি ফয়নাশার বোন !

ফয়নাশা। বাহবা ! একেই বলে, বুদ্ধি ! তোফা বলেচো, ফিরোজা বিবি !

ওসমান। কিন্তু তোমার মা যে ফিরোজার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে চায়।

ফয়নাশা। ওঃ—চায় ! চায় তো নিজে বিয়ে করুক ! আমার ঘাড়ে চাপানো কেন ! বলেছি তো, আমার ঘাড় তেমন মজবুৎ নয় ! আমি এই চললুম। আজ আমাদের মজলিসে ঘুড়ি-ওড়ানোর ভারী ধুম বেধেছে—দুদিন ধরে সুতোয় কসে মাঞ্জা দেওয়া গেছে—মনের সাধে প্যাঁচ লড়বো !

[প্রস্থান

গুলরুখ। ওরে সর্ব্বনেশে ছেলে, ওরে হতভাগা, এই জন্য তোকে এখানে ডেকে নিয়ে এলুম ! আজ তোর একদিন, কি আমারই একদিন ! দাঁড়া—দেখছি।

[প্রস্থান

আসফ। তবে আর কি ! তসীরের মত পাত্র তুমি সহজে খুঁজে পাবে না। এমন সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান ছোকরা সিরাজে আর আছে কি না, সন্দেহ !

ওসমান। বেশ তসীর, আমি সানন্দ চিত্তে ফিরোজাকে তোমার হাতে সমর্পণ করচি। ফিরোজা···মা, সুখে থেকো, সকলকে সুখে রেখো !···আর এ বুড়োকে একেবারে ভুলে যাসনে মা !

ফিরোজা। তুমি আমার খোদা—তোমাকে ভুলবো ?

ওসমান। আজ বড় আনন্দের দিন ! সেলিম, এ দিকে এসো। দরিয়া, মা আমার—(উভয়ের হাতে হাতে ধরিয়া) সেলিম, আমার সর্ব্বস্ব আজ তোমার হাতে তুলে দিলুম ! যত্ন করো, যত্নে রেখো ! দরিয়া মা—আজ তোমায় যোগ্য পাত্রে অর্পণ করে মনে কি সুখ পাচ্ছি, তা আর কি বলবো ? আশীর্ব্বাদ করি, খোদার রাজ্যে কর্ত্তব্য-পথে অটল মতি রেখে খোদার দেওয় অমূল্য জীবন সার্থক করো ! এসো বন্ধু, আজ বা

আনন্দের দিন! আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করতে বলি। আনন্দ করো, সকলে আনন্দ করো!

[ওসমান আলি ও আসফ খাঁর প্রস্থান

বাঁদীগণের প্রবেশ

বাঁদীগণ।

গান

দুটি ফুল কোথা ছিল—ভেসে এলো প্রেমের প্লাবনে।
আজি মধু নিশি— মুকুলিত দশদিশি মধু সমীরণে।
মনোমোহন মিলন হেরি কুঞ্জে উথলে জোছনা-বারি।
আকুল বাজিছে প্রেমের বাঁশরী—
কূলে লাগলো এসে সোনার তরী
মিলেছে প্রেমিক নয়ন নয়নে!
কোন্ চাঁদে আছে এত হাসি?
কোন্ ফুলে পরিমল-রাশি?
আজি কিবা হৃদয়ে হৃদয় গেছে মিশি।
থাকে প্রেমিক-হৃদয় যেন অক্ষয়!
হেন প্রেমময় প্রিয় বন্ধনে।
আজি মধু নিশি কিবা মধু দিশি!
হাসো মধু হাসি হেরি মধু-মিলনে।

যবনিকা

যৎকিঞ্চিৎ

ব্যঙ্গ-নাট্য

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত ;

প্রথমাভিনয়-রজনী, ৬ই আষাঢ়, ১৩১৫

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

পূর্ব্বকথা

বেদনাহত বিক্ষিপ্ত মনকে কোন মতে একটা কাজের মধ্যে নিবিষ্ট রাখিব, এইরূপ ভাবিয়াই গ্রন্থখানি ারম্ভ করি। তখন অবশ্য মনে করি নাই, একদিন ইহা লোকচক্ষুর সম্মুখে আসিবে! কিন্তু শ্রদ্ধেয় যুক্ত অমৃতলাল বসু, ও শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়দ্বয়ের স্নেহে ও আগ্রহাতিশয্যে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে ভিনীতও হইয়া গেল ; এ জন্য তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

আমার প্রিয়সুহৃৎ সুখ-দুঃখের নিত্য-সহচর বঙ্গসাহিত্যে সুলেখক শ্রীযুক্ত গোলোকবিহারী খাপাধ্যায়, যিনি আমার সাহিত্য-সেবায় চিরদিন আমাকে উৎসাহিত করিয়া আসিতেছেন, যাঁহার চত "প্যারি, যাস্‌নে লো যমুনায়" ইত্যাদি মধুর গানটিতে আমার এ 'যৎকিঞ্চিতের' শোভা সম্বর্দ্ধিত ইয়াছে, এবং কান্তিক প্রেসের স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, যাঁহার সবিশেষ যত্ন ও যোগ ভিন্ন এত শীঘ্র এ গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারিতাম না—তাঁহাদিগকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ াপন করিতেছি।

গ্রন্থখানি ব্যঙ্গ-নাট্য। ঠিক এ-শ্রেণীর নাটক বঙ্গসাহিত্যে তেমন সুপ্রতুল নহে। ইহার রোমান্সের সটুকু সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা উপলব্ধি করিতে পারিলে অত্যন্ত সুখী হইব। একটি কথা,—বন্ধুবর্গের ধ্যে অনেকে 'লাবণ্য'-চরিত্রে প্রীত হইয়া এই চরিত্রটি আরো একটু পরিণতভাবে আঁকিতে বলিয়াছিলেন ; ন্তু বলা বাহুল্য, তাহা করিলে আমার উদ্দেশ্যের বহির্ভূত হইয়া পড়িত, এবং পাঁচ অঙ্কে একখানি স্বতন্ত্র াটক লিখিতে হইত।

বঙ্গ-সাহিত্যের যে সকল অনুরাগী পাঠক নানা মাসিক-পত্রাদিতে আমার রচিত ক্ষুদ্র গল্পগুলি পাঠে খ্যাতি করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সম্মুখে নাট্য-লীলা লইয়া এবং গ্রন্থকার-রূপে এই আমার প্রথম সসঙ্কোচ বেশ! গ্রন্থকারের বয়স নবীন, জ্ঞান নবীনতর, এবং যে অবস্থায় গ্রন্থখানি রচিত, তাহা ভাবিয়া সহৃদয় াঠক-পাঠিকা ছোট-খাট ত্রুটিগুলি আশা করি মার্জ্জনা করিবেন। ইতি—

বিনীত
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ভবানীপুর,
১৮ই আষাঢ়, ১৩১৫

নলিনীবালা

স্মৃতিকল্পে

I hastend to the spot whence I had come.
That I might there present it.—Oh, to Whom?

* * * * *

অশ্রুর সাথে মিশায়ো অশ্রু,
হাসিটির সাথে হাসি !

রঙ্গোক্ত পাত্র-পাত্রী

পুরুষ

নন্দলাল মিত্র	...	...	...	বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি
হেমন্ত দত্ত	...	...	...	ধনাঢ্য যুবা
সুকুমার	...	...	...	ঐ কনিষ্ঠ সহোদর (ব [illegible])
বিনয়	...	...	...	সুকুমারের বন্ধু
গোবিন্দ চাটুয্যে	...	...	...	নন্দলালের প্রতিবেশী
হারু	...	...	...	হেমন্তর ভৃত্য

নারী

লাবণ্য	...	...	...	হেমন্তর স্ত্রী (শিক্ষিতা)
উষা	...	...	...	নন্দলালের কন্যা (উচ্চশিক্ষা-হেতু বিকার-গ্রস্তা)
সুরমা	...	...	...	নন্দলালের ভাগিনেয়ী (কলেজে শিক্ষা-প্রাপ্তা

রমণীগণ, বালকগণ, কোরাস্ প্রভৃতি

সংযোগ-স্থল—কলিকাতা

যৎকিঞ্চিৎ

প্রস্তাবনা

রমণীগণ

গান

আহা ; বাস্‌তে বাস্‌তে বাস্‌তে ভালো,
বাসা হলো কই !
ডাক্‌তে ডাক্‌তে ডাক্‌তে কোকিল
থেমে গেল অই !
আচমক এই যে এল,
কিসের চমক দিয়ে গেল !
প্রাণটি ছুঁয়ে এই পালালো,
আপন-হারা হয়ে রই !
বিজন বনে বসে ছিল,
চাঁদের আলোয় দেখা হলো,
এলোচুলে চোখের জলে
মালা নিয়ে সারা হই !

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নন্দলালের বাটীর সম্মুখ

নন্দলাল ও গোবিন্দর প্রবেশ

গোবিন্দ। তখনি বলেছিলুম, ভায়া—অতটা ভাল ! শুনলে না! এখন টের পাচ্ছ! বলেছিলুম যে, বাপ-পিতমো চিরকাল যে সনাতন প্রথা মেনে ছে, সেটা একেবারে হট্‌ করে উলটে দেওয়া বুদ্ধি-নর কাজ হবে না !

নন্দলাল। আরে যাও ভাই, আমার আর কিছু লা লাগে না !

গোবিন্দ। এখন পস্তাতে হবেই যে ! মেয়ের মা না কলমের একটা আঁচড় কাটেন্‌নি, আর তুমি কি না ক একেবারে কলেজে পড়িয়ে রমাবাই করে তুলবে ! : এতখানি বাড় তার ধাতে সৈবে কন ?

নন্দলাল। আরে করি কি ? তখন তোমরা তেমন ! তো বারণ করতে পারোনি !

গোবিন্দ। বারণ করিনি ? বলো কি ! গোবিন্দ চাটুয্যে বরাবর তোমাদের গে' অই মেয়েদের কলেজ-ফলেজে পাঠাবার বিরুদ্ধে ! তুমি শুনলে না…

নন্দলাল। করি কি বলো, ভায়া, করি কি ? আমার ঘাড়ে সব ফেলে গৃহিণী চলে গেলেন ! মেয়েটাকে বড় ভালবাসতুম, সে যা চায়, তাই দিতে লাগলুম, বেশ বড় ঘরে মেয়েটার বিয়ে দোবো, লেখাপড়া সেজন্ত ভালো করে শেখানো চাই, তখন আবার আমার ভগ্নীপতি, তোমার ঐ মন্মথ ভায়া বেঁচে—তা সে তার মেয়েকে দিনকতক কলেজে পড়িয়েছিল কি না, তারি কথায় ভাই মেয়েটাকে কলেজে দিলুম।

গোবিন্দ। হুঁ ! তার পর ?

নন্দলাল। তার পর মেয়েটার কি-যে ঝোঁক হলো—বোর্ডিংয়ে থাকবে,—কে ওদের Musicএর lady প্রোফেসার নাকি ওকে বড় ভালোবাসত—বড় বেজায় বায়না নিলে। দিলুম বোর্ডিংয়ে রেখে। তার পর জানো, ছ' সাত মাস এ দেশ ও-দেশ করে ঘুরে বেড়ালুম। ফিরে এসে ভাবলুম, মেয়েটার বিয়ে দেবো, মেয়েটাকে ঘরে নিয়ে এলুম, না, দেখি ও মা, মেয়ে একেবারে খিঙ্গি ; বলে, বিয়ে করবো না—বিষম বায়নাক্কা !

গোবিন্দ। তাই তো ভায়া, তা এতেই তুমি মাথায় হাত দিয়ে বস্‌লে !

নন্দলাল। কি করবো—তুমিই না হয় বলে দাও।

গোবিন্দ। আরে ছাই !—ইংরিজীর গরম ওটা—ছোঁড়ারা একটু Shakspere, Milton নাড়াচাড়া করে বায়না ধরে—বিয়ে করবো না, বিয়ে করবো না,—দেখেচো তো ? তার পর কেমন অম্লান বদনে বিয়ে করে একেবারে বৌ-অন্ত প্রাণ হয়ে পড়ে !—তা এ রোগের ওষুধ, বিয়ে দেওয়া। বুঝলে ভায়া, একটি সুপাত্র দেখে বিয়ে দিয়ে ফেলো—ও আর দেরী নয়, বুঝলে ?

নন্দলাল। বুঝলুম সব, আমার মাথা আর মুণ্ডু ! ঘটকের উপর ঘটক লাগিয়ে চেষ্টা কি কম কচ্ছি—মেয়ে দেখে যাচ্ছে, পছন্দও করছে—

গোবিন্দ। পছন্দ না করবেই বা কেন ? অমন পরীর মত মেয়ে আজকালের বাজারে চট্‌ করে একটা চোখে পড়ে কি !

নন্দলাল। বিশেষ আমাদের কায়েতের ঘরে—বলো তো ভায়া ! হাঁঃ, তা সব হচ্ছে, কিন্তু মেয়ে যে আমার এদিকে লম্ফঝম্প ছুড়চে—বলে, বিয়ে

করবো না—বিয়ে দিলে গলায় দড়ি দোবো, ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়বো, জলে ঝাঁপ খাবো—এই সব।

গোবিন্দ। তা মা-লক্ষ্মীর মনের বাসনাটুকু কি ?

নন্দলাল। তাও কি ছাই ভেঙে বলে ? খালি চুল এলো করে পাগলীর মত ঘরে-দালানে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে—গান আর বই পড়া—মাথা আঁচড়ানো, আর তোমার গে' আরসির সামনে দাঁড়িয়ে ভেউড়ে কি-যে-সব বিড়বিড় করে বকে—মাথামুণ্ডু ছাই বুড়োমানুষ বুঝতেও পারিনা। তার উপর—

গোবিন্দ। তার উপর কি আবার ?

নন্দলাল। তার উপর আমার ভাগ্নীটাকে আনালুম—তার বিয়ে হয়ে গেছে। ওই যে জামাইটি বহরমপুরের কলেজে প্রফেসারী কচ্ছে—হ্যাঁ, তা ঐ ভাগ্নীটা কোথায় ওকে একটু বোঝাবে-সোঝাবে, তা' নয় সে ওর মাথাটা আরো ভালো করে খেয়ে দিলে! এমন একটা মেয়েমানুষ বাড়ীতে নেই, এই উচক্কা ছুঁড়ি দুটোকে যে একটু বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে!

গোবিন্দ। পাগল হয়ে যায়নি তো ভায়া ?

নন্দলাল। মনের দুঃখ আর কাকে বলি, দাদা ? এদিকে এ রকম পাগলে কাণ্ড, কিন্তু খাওয়া-পরা সাজগোজের উপর নজরটুকু বেশ আছে! তবে কি করে বলি, পাগল হয়ে গেছে ? পাগল হয়নি দাদা, আমাকে পাগল করেছে! আর, আমারো ভাই মরণ নাই, তাই এ সব দেখতে হচ্ছে! মেয়েটাকে বড় ভালোবাসি, তাই বুঝি ভগবান্ এই শাস্তি দিচ্ছেন।

গোবিন্দ। বলি কোনো ডাক্তার কবরেজ দেখিয়েছিলে ?

নন্দলাল। আর বলো না দাদা, তাই কি বাকী রেখেচি ? কবরেজদের তেল কিছু বাকী রাখিনি। কোনো শিশিই বেচে কম না হোক পঞ্চাশ টাকা নেয়েছে।

গোবিন্দ। তাই তো, তাহলে বড় সঙ্গিন্ রোগ!

নন্দলাল। এখন দেখি, মা কালী যদি মুখ তুলে চান্! একটা সুরাহার লক্ষণ—

গোবিন্দ। এঁ্যা! কি, কি ? বলো তো বলো তো—যে ভারী ভাবনার বিষয়!

নন্দলাল। এই গে' ও পাড়ার নকুড় দত্ত—জানো, সে মস্ত হৌসওয়ালা, তিন-চারখানা গাড়ী, মস্ত আস্তাবল, তবে গে তোমার ঐ মস্ত ইলেক্‌ট্রিক আলোওলা বাড়ী হে—

গোবিন্দ। হাঁ, হাঁ—

নন্দলাল। তা—ঐ নকুড় দত্ত—

গোবিন্দ। সে তো মারা গেছে বহুদিন হে—

নন্দলাল। সে গেছে—তার ছেলে তো আর যায় নি! সেই যে হে দুটি ছেলে—দিব্যি ফুটফুটে চাঁদের মত—তা ঐ ছোটটি—সে টুনিকে বিয়ে করতে চায়!

গোবিন্দ। চায় তো বিয়ে করে ফেলুক।...কিন্তু তুমি যে বলচো তোমার মেয়ে বিয়ে করতে চায় না ?

নন্দলাল। না, তা চায় না! আঃ অই তো হয়েছে জ্বালা! মাথার ঘায়ে কুকুর-পাগল হলুম দাদা,—আমার আর জীবনে সাধ নেই!

গোবিন্দ। সাধ না থাকবার কারণ বিলক্ষণ দেখচি!

নন্দলাল। বলো তো দাদা—এমন সুপাত্র আর পাবো কোথায় ? টাকার অন্ত নেই, তার উপর ছেলেটি আবার বি, এ পাশ করেচে।

গোবিন্দ। বটে! সোনার কার্ত্তিক—সোনার কার্ত্তিক!

নন্দলাল। আবার শুধু তাই ? নিজে বিয়ে করতে চাচ্ছে! ছেলে নয় যেন রাজপুত্তুর—তা মেয়েটা কিছুতে রাজী হবে না!

গোবিন্দ। রাজী হবে না বলো কি!—তা হলে উপায় ?

নন্দলাল। ভগবান একমাত্র উপায়! তা ছেলেটিও নাকি ভাই, নাছোড়বন্দা—বলে, 'আমি ওকে বিয়ে করবোই—একবার নিজে মেয়েটিকে দেখি।'

গোবিন্দ। ভালো, ভালো। বাবাজীর বুদ্ধি আছে!

নন্দলাল। (স্মিতমুখে গোবিন্দর গা ঠেলিয়া) আরে, ভাই, ছেলেটি এখন দেখতে [illegible]চে—আমি থাকলে যদি লজ্জাটজ্জা করে, তাই আমি রাস্তায় একটু পায়চারি করে বেড়াচ্ছি! এখন মেয়েটার যদি সুমতি হয়—

গোবিন্দ। হুঁ! ছাখো, চারচক্ষুর মিলনে প্রজাপতির ইচ্ছা যদি পূর্ণ হয়!

নন্দলাল। বিয়েটা একবার হোক্ না—তার পর আমি দিনকতক সরে পড়বো—মেয়েটাকে একবার কাঁদাবো।

গোবিন্দ। সে পরের কথা পরে। এখন ছাখো বাবাজীর—

নন্দলাল। বাইরের ঘরেই দেখাশোনা হচ্ছে। সুকুমার আমাদের পাড়ার ছেলে—ছেলেবেলা কত আমার বাড়ী আসা-যাওয়া করেছে—এক রকম ঘরের লোক বললেই হয়!

গোবিন্দ। হ্যাঁ তা, তো বটেই!—এই যে বাবাজী আসছেন।

(ভিতর হইতে সুকুমারের প্রবেশ)

নন্দলাল। এই যে বাবাজী। তার পর বাবাজী, কমন দেখলে ?

কুমার। আমাকে মাপ করবেন মশায়—এমন ান কখনো আমি হই নি !

ন্দলাল। কেন ? কেন ?

কুমার। নাম জিজ্ঞাসা করলুম, তা হো-হো করে উঠলো, তার পর কি কতকগুলো আবল-তাবল বকে গেল !

ন্দলাল। (সুকুমারের হাত ধরিয়া) রাগ করোনা জী। আমার অদৃষ্ট ! তুমি আমার বড় আত্মীয়, জী ! মেয়েটার মাথা কেমন খারাপ হয়ে গেছে— কি বলা উচিত, কি কথা কওয়া উচিত তা, কিছুই না—ঠাওরাতে পারে না। বুঝলে বাবা, বিয়ে হলে নই সেরে যাবে !

গোবিন্দ। তা বৈ কি, তা বৈ কি— বেশী লেখাপড়া ল পুরুষদেরই মাথার ঠিক থাকে না, এ তো একটা মেয়ে !

সুকুমার। আজ্ঞে না, আমি রাগ করচি না পক্ষ্যে দীর্ঘনিশ্বাস) তবে মনটায় বড় ব্যথা পেয়েচি— য নাকি—

নন্দলাল। রাগ করো না বাবা। দেখ বাবা, তোমার য় কর্ত্তার সঙ্গে আমার এক প্রাণ ছিল। আহা, অমন য় জন্মায়—

গোবিন্দ। শিবতুল্য লোক—শিবতুল্য লোক !

নন্দলাল। তুমি তাঁর উপযুক্ত ছেলে। তা এ সব মনে করোনা ; আমি বকে দেবো—তারপর বিয়ে ও সবগুলো সেরে যাবে—এখানে দেখবার কেউ —

গোবিন্দ। সে তো ঠিক, সে তো ঠিক, বিয়ে হলে কের অনেক রোগ সেরে যায় !

সুকুমার। আজ্ঞে না, রাগ করবো কেন ? রাগ নি। তবে—

নন্দলাল। আমি তাকে এখনি বকে দেবো। তার বাবা,—এঁ, কেমন দেখলে ? তোমার দাদার সঙ্গে হলে দেখাটা—

সুকুমার। আজ্ঞে তা, হ্যাঁ—না—সে যা ভালো ঝেন, করবেন।

নন্দলাল। তা হ'লে এসো বাবা, একটু মিষ্টিমুখ— —না হলে সেটা কি ভালো হয় ?

সুকুমার। আজ্ঞে, তার জন্য আবার জেদ কিসের ? মি তো এ পরের বাড়ী মনে করি না। সে এখন থাক, মি তা হলে এখন আসি।

নন্দলাল। একটু মিষ্টিমুখ ?

সুকুমার। আজ্ঞে, এখন মাপ করবেন—

গোবিন্দ। আরে ভায়া, এরা Young Bengal এরা কি আমাদের সেকালের মত খেতে পারে Dyspepsiaর সব সারা হয়ে যাচ্ছে—বই আর মাথা মুণ্ডু নিয়েই আছে, খাবার বেলা কেউ নয়। মুখে ঐ বক্তৃতা সার !

নন্দলাল। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য) দেখি মেয়েটাকে একবার !—(গোবিন্দর প্রতি) আসবে ?

গোবিন্দ। না, এই বক্রেশ্বরের কাছে একটা দরকার আছে, সেটা সেরে আসি—একটু পরেই আসচি ত হলে।

প্রস্থান

নন্দলাল। তাই তো বাবাজী, একটু মিষ্টিমুখ করবে না ! তা তুমি বাবা, রাগ করো না, মন খারাপ করো না—

সুকুমার। আজ্ঞে, না। আপনি কেন এত ক পাচ্ছেন ?

নন্দলাল। এ দায় তোমাকে বাবা উদ্ধার করতেই হবে—হ্যাঁ, তা বাবাজী ছাড়চি না।

ভিতরে প্রস্থান

সুকুমার। নাঃ, এ অস্থির করে তুলেছে ! যতই ওকে দুর্লভ মনে করি, ততই যেন প্রাণটা ওর জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে। উপন্যাসে কবিতায় পড়তুম, পাষাণী ! ...তা এ পাষাণে কি প্রাণ-সঞ্চার হবে না ? কলেজ থেকে ফেরবার সময় দেখতুম, খড়খড়ির ধারে চুল-গুলি এলিয়ে বসে আছে—কোলের উপর বইখানি খোলা,—চোখে যেন কি একটা মাদকতা মাখানো ! ছাদের উপর সন্ধ্যাবেলায় বেড়িয়ে বেড়ায়—কোঁকড়া চুলগুলি খোলো হয়ে গা বেয়ে পড়ে—ত্রস্ত আঁচলখানি গায়ের উপর কেমন-একভাবে বিছানো থাকে ! আমার মনে হয়, Juliet যেন পায়চারি করছে—এই সব থেকেই তো লভে পড়ে গেলুম ! তাই তো, একটা মনের মত কথা কইতে পারলুম না ! নিষ্ঠুর, পাষাণী আমার প্রাণের অগাধ-অসীম ব্যাকুলতা বুঝলে না ; ওকে যদি জীবন-সঙ্গিনী করতে পারি, তবেই জীবন সার্থক হবে। না হলে ? না হলে, বৃথা কবিতা লেখা ! বনে চলে যাবো, সন্ন্যাসী হবো, আত্মহত্যা করবো !

প্রস্থান

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

উষার-কক্ষ

আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া উষা মুখে পাউডার দিতেছে—সুরমা তাহার এলায়িত কেশ হাত দিয়া ঝাড়িয়া দিতেছে।

উষা। (পাউডার মাখিতে মাখিতে)

গান

দে লো, সখি, পরায়ে চুলে
সুরভি কুসুম-মালা,
বিভূতি মাখায়ে দে লো সারা দেহে,
জুড়াবো প্রাণেরি জ্বালা!
কারে যেন চাই, জানি না'ক তারে,
এ আসে, সে আসে, সে-ত আসে না রে,
মনোমত বিধি মিলায় না রে,
কেমনে কাটাব বেলা!

উষা। সু—

সুরমা। কেন উ!

উষা। আমি তাপসী সেজে বসে রইলুম—কোথায় নবীন তাপস,—যে আমার জন্যে সাগরে-ভূধরে, বনে-নগমে, হা উ হা উ করে বংশীবাদন করছে?

সুরমা। কেমন করে বলবো উ! আমি তো telepathy জানি না!

উষা। তবে কি আমার এ সাধের তাপস-সাজ মিছে হবে? এই এলায়িত বেণী, এই বিভূতি-বিভূষিত কায়, এই গৈরিক বসন···

সুরমা। গৈরিক বসন নয় উ—এ যে রেশমী বসন!

উষা। তুমি জানো না সু,—এই বেশে তিলোত্তমা মন্দির-দ্বারে জগৎসিংহের আশায় বসেছিল, এই বসনে মৃণালিনী হেমচন্দ্রের হাত ধরে ভূত-ভবিষ্যৎ না ভেবে, আকাশের দিকে চেয়ে প্রেমের সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিলেন।

সুরমা। তা ঠিক! আর এই বসনেই বিভা বৌ-ঠাকুরাণীর হাটে রামচরণের দেখা পেয়েছিল, উদয়াদিত্য যখন নৌকায় বসে।

উষা। আমার এত সাধের সাজসজ্জা, আমার এই নবপ্রেমামুদীপ্ত মুকুলিত কৈশোরক প্রেম কি হিয়া' পর শুকিয়ে যাবে?

সুরমা। হায়, 'সকলি গরল ভেল'।

উষা। সু—

সুরমা। কেন উ?

উষা। বাবা বলে, বিয়ে কর্!

সুরমা। অর্ব্বাচীন! বিয়ে? তার মানে পুরুষের দাসী! তার মানে, শাঁখ বাজবে, এক মাগী উলু দিয়ে চেঁচিয়ে যেন শ্মশানের বিরাট বিভী[ষিকা] জাগিয়ে তুলবে···

উষা। ওঃ! কি বিকটধ্বনি ঐ শাঁকের! কো[থায়] ক্ল্যারি'নেটের মধুর সুরে প্রাণে আবেশ আসবে, সো[নার] বরতনু হেলে পড়বে—আর সে আমার এসে, করে মালা দিয়ে—

সুরমা। আহা, আর বলো না উ, আর বলো না, এক অনির্ব্বচনীয়, অভাবনীয়, স্বর্গীয় দৃশ্য—কত কা[ন্না] মাখামাখি! কেউ জানবে না, শুনবে না—শুধু চোখের দিকে চেয়ে থাকবে—পৃথিবীতে মহাপ্রলয় [!] জনপ্রাণীর অস্তিত্ব থাকবে না—শুধু কোমল নরম সো[ফার] উপর চারটি চোখের কি-যেন-কি-ভাবে চেয়ে-থাক[া], আর চারিধার থেকে উঠবে অনন্ত প্রেমের অখণ্ড রাগি[ণী]

উষা। সেই রাগিণীর মাঝে বাজবে শুধু হাতে দুটি কাঁকণ—গাগরীর কথা আর মনে থাকবে ন[া]; যৌবন-নিকুঞ্জে চাঁদিমা লুটোপুটি খাবে!

সুরমা। যা বলেচো উ! আর বাজবে শুধু হাতে কাঁকণ দুটি—আহা, 'ছল-ভরে কত কল-স্বরে!'

নন্দলালের প্রবেশ

নন্দলাল। হ্যাঁরে টুনি—

উষা। এ কি! বাবা! ছি ছি, এমন সুন্দর মধুর অবসরে···

সুরমা। বাঁশরীর তানের পরিবর্ত্তে···

উষা। কর্কশ কণ্ঠের তানলয়হীন—'টুনি'!

নন্দলাল। হ্যাঁরে, তোরা ও কি বিড়-বিড় করচিস্?

উষা। হায় সু—

নন্দলাল। বলি, আমার কথা কাণে যাচ্ছে, না কি?

উষা। বাবা, মহিলাদের সঙ্গে কি রকম করে কথা বলতে হয়, তা তোমার আগে শেখা উচিত। ছি ছি, কবে শিখবে?

নন্দলাল। কি শিখবো রে?

সুরমা। বিশ্রম্ভালাপ!

নন্দলাল। চোপ্ বেটি! ঢলাঢলি আরম্ভ করেচো! হ্যাঁরে টুনি, আমি কি মাথামুড় খুঁড়ে মরবো তোর জন্য!

সুরমা। উ, ক্ষমা করো—অবহিতচিত্তে শোনা যাক্—

উষা। বেশ! (নন্দর প্রতি) কি, কি বলচো?

নন্দলাল। বলি, আজ আবার করেচিস কি? এ্যাঁ? বল্ আমার মাথা আমার মুণ্ডু—অমন বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ধনবান সৎপাত্র! ভালোমানুষি করে দেখতে এলো, তাকে কি অপমান করেচিস্, বল্ আমাকে!

ষা। সু—

রমা। এ কি প্রহেলিকা! (আশ্চর্য্য ভাব দেখাইল)

ন্দলাল। থাম্ বেটি—

রমা। বলি, আপনি ও কি বলচেন ?

ন্দলাল। বলচি, আমার পিণ্ডি! আমার শ্রাদ্ধ! সোনার চাঁদ ছেলে, নিজে সেধে বাড়ী বয়ে মেয়ে এলো—তিন-তিনটে পাশ—তা তাকে কি ন করেচিস্? বল্—বল্, বলচি—নৈলে আজ একটা হেস্তনেস্ত করবো, করে ছাড়বো!

ষা। ওহোঃ বুঝেচি, সু, বুঝেচি!

রমা। কি, উ?

ষা। ঐ সেই পুরোনো কথা! সেই সব বীভৎস বর্ব্বর প্রথা—বিয়ে!

রমা। এঁ্যা! বলো কি! বিয়ে? (হাস্য)

ন্দলাল। দেখ্ কখনো কোন মন্দ কথা বলিনি, এবার কিন্তু আর শুনচি না—শাপে আছড়ে —সব ঢং শিখেচে—যত কিছু বলি না, না?

ষা। তোমার মাথার ঠিক নেই বাবা! আগে তস্থ হও, তার পর তোমার কথা শোনা যাবে, এখন র্জ্জন, মধুর, বিজন সন্ধ্যায় প্রলাপ শোনবার অবসর !

ন্দলাল। তবে রে বেটি, তুমি লেখাপড়া শিখেচো—ত হয়েচো? বড় বাড় বেড়েচে,—মেয়ের নিকুচি চ, আজ এদিক না ওদিক—আর আমার সহ্য হয় ত্যি! আজ আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরবো, তোর হত্যার পাতক হবে, তা কিন্তু বলে রাখচি।

ষা। কি বলবে, বলো না—খালি বাজে বক্তে রু করলে!

ন্দলাল। দেখ্ টুনি, বড় হয়েচিস্ মা, লেখা-পড়া চিস তো! লক্ষ্মী মা আমার, বুড়ো বাপের কথাটা , তোর মা যখন চলে গেল, তখন তুই এই এতটুকু! তুই ভালো থাকবি, কিসে তোর ভাল হয়, এই , এই করেই আমার মাথার চুল পেকে গেল! এখন বিয়েটি হলেই মা আমার সব সাধ মেটে! কেন কথা শুনচিস না? না হয় কেমন বর চাই, বল্— তেমনি দেখে দিচ্ছি। বিলেত-ফেরত বর চাস্,,তাও য় বল্—যত টাকা লাগে, আমি তাই দিয়ে তোদের ট হাত এক করি।

ঊষা। আবার সেই বিয়ে? হৃদয়ের আদান-নহীন নীরস, চিরকেলে প্রথার দাসত্ব? তারি নাম বিয়ে! ওঃ, সেই আদিমকাল থেকে চলে আসচে—নো, চিমসে, মান্ধাতার আমলের সেই পচা বিয়ে! বাবা, তা আমি পারবো না—মনে করতে গা যেন রে ওঠে!

নন্দলাল। কি যে বলিস্ মা—চিরকাল সবাই বিয়ে করে আসচে—তোর ঠাকুরদা-ঠাকুরমা, তোর মা-বাপ, কেউ তো আর বাদ যায় নি, সবাই চিরকাল এই রকম বিয়ে করে এলো, আর তুই ছাই এ কি বল্‌চিস? তোর কলেজের সঙ্গীদেরও যে সব এ্যাদ্দিনে বিয়ে হয়ে গেল রে!

ঊষা। না বাবা, মাপ করো—আমার দ্বারা তা হবে না! জোর করে কি প্রণয় হয়?

নন্দলাল। দুর্গা, দুর্গা! আঃ, সব বলে কি! বুড়ো বাপ বলে একটু সম্ভ্রমও রাখে না! আচ্ছা, বল্ বাপু, কি বল্‌বি, বল্...

সুরমা। আমি বল্‌চি, আমি বলচি—উ'র সরম হচ্চে কি না, বলি-বলি করে মরমের কথাগুলি সরমে ঝরে যাচ্ছে!

নন্দলাল। এ বেটি আবার বিয়াল্লিশ-কর্ম্মা! এ আবার ছড়া কেটে হেঁয়ালিতে কথা কয়! সাদা কথায় বল্!

সুরমা। উ অমন বিয়ে চায় না—চার ঘোড়ার গাড়ী করে ব্যাণ্ড বাজিয়ে বর এলো, শাঁখ বাজলো, কুশাসন কলাপাতা মাছের আঁশ আলুর দমে বাড়ী যেন নরককুণ্ড হয়ে গেল, শাঁখের মন্তের আওয়াজে কাণ ঝালাপালা...

নন্দলাল। তবে কি রকম বর চায়, বল্ না বাপু,—আমি না হয় কাউকে বলবো না। বর চুপি চুপি আসবে, বিয়েটি হবে, ব্যস্—লোকজন খাবে না, কিছু না। তবে শুভকর্ম্মে শাঁখটা না বাজে কি করে, বল্?

ঊষা। না বাবা, ঐ শাঁখটা আমার কিছুতে পছন্দ নয়। ওর আওয়াজ বিকট, আর বাজাবার সময় মুখের যে বীভৎস ভাব হয়—উঃ! বাজনা চাই? ক্ল্যারিয়নেট আছে। আঃ, তার পর আরো কি কি, সব বলো না সু...

সুরমা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই যে বলচি, তার পর দাড়ী কামিয়ে, গোঁফ ছেঁটে, শিল্কের জামা গায়ে বেনারসী কাপড় পরে একটা পচা বর আসবে, তাও হবে না!

নন্দলাল। তবে কি রকম টাটকা বর চাই, বল্। বাপু—মনের কথা খসা, সব বুঝব তো তবে—

সুরমা। সে কোন্ বিজন বিপিনে, ভাঙা মন্দিরে, বৃষ্টি-বজ্রাঘাতের মধ্যে, কার সঙ্গে, কোন্ অপরিচিতের সঙ্গে মিলন হবে, তার পর দেখা নেই—হা-হুতাশ, দীর্ঘনিশ্বাস—দূতপ্রেরণ, অন্বেষণ—কোথাও নেই! সহসা মৃত্যুর দ্বারে অজানা অতিথির সঙ্গে আবার দৃষ্টি-বিনিময় —নবজীবন-সঞ্চার—আকাশে দুন্দুভিধ্বনি, অপ্সরাগণের পুষ্পবৃষ্টি—পরে ঐক্যতান-বাদন ও যবনিকা পতন!

নন্দলাল। কি যে বললি তড়বড়-তড়বড় করে, মাথামুণ্ড ভাল বুঝতে পারলুম না! কে বিজন, কে বিপিন, কোথায়, কোন্ মন্দিরের কাছে তাদের বাড়ী,

ভালো করে খুলে বল্—আমি লোক পাঠিয়ে সন্ধান নিচ্ছি—

উষা। ওহোঃ, তা নয়, বাবা, তা নয়! তুমি যদি তা বুঝতে, তা হলে কি এ অদ্ভুত বিবাহ-প্রস্তাব নিয়ে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করতে! কোথাও ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাবে, আমি ছাদ থেকে দেখবো—বকুলমালাগাছি আমার হাত থেকে খসে তার মুকুটের উপর পড়বে—তার পর, আমি অনাথিনী ভিখারিণী বেশে, তারি গান গেয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবো। সহসা সিংহাসনের পানে চেয়ে দেখবো, এই যে আমার জীবন-দেবতা! অমনি আমার জীবন-যৌবন তার চরণে ডালি দেবো।

সুরমা। আহা, আর তিনি অমনি মাথার মুকুট পদদলিত করে সেই শুকানো মালাগাছি গলা থেকে খুলে সখীর আকুল কবরীতে সংলগ্ন করে মিলন-পাশে তাকে বদ্ধ করবে, আর চারিধারে সাহানা রাগিণীতে সখীরা গেয়ে উঠবে, মধুর মিলনের অপূর্ব্ব গান!

নন্দলাল। নাঃ, এরা আমাকে পাগল করেচে! আমার মরণও হয় না ছাই! ওরে বাপু, আমি তোদের ও অনুপ্রাস-পাঁচালি কিছু শুনতে চাই না! সাদা কথায় বল্, ও ছোকরাকে অপমান করলি কেন? আমার বাড়ীতে পা দিয়েচে, আমার ভাগ্যি! বল্ তাকে কি বলেচিস্! বেচারী মুখখানি চুণ করে চলে গেল।

উষা। কার কথা বলচো?

সুরমা। আমি বুঝেচি—সেই যে এসেছিল, এইমাত্র—

উষা। ওঃ, সেই হতভাগ্য প্রেমক্ষুব্ধ কিশোর!

নন্দলাল। থাম্ বেটি!

উষা। রাগ করচো কেন? কি জিজ্ঞাসা করচো?

নন্দলাল। বল্, বল্, তাকে তাড়ালি কেন, বল্—বল্চি—

উষা। সে হতভাগ্য বিয়ে করতে চায়—

নন্দলাল। তা না তো কি তোমার বাপের গঙ্গাযাত্রা করতে চাইবে? তাকে কি বলেছিস্, বল্?

উষা। সে কি বিয়ে করবে! তার প্রাণে প্রণয় নেই, হৃদয়ে প্রেম নেই, রমণীর মর্য্যাদা সে জানে না।

নন্দলাল। সে কি রে? বলিস্ কি! এ্যাঁ—তিন নটে পাশ!

সুরমা। সে পাশ পাঁশ হয়ে গেছে।

নন্দলাল। থাম্ বেটি—

উষা। সে বলে, 'তোমার নাম কি?' 'তোমার আমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে, তোমার কি মত?' (হাস্য)

সুরমা। (হাস্য)

নন্দলাল। তা না তো সে তোমাদের মত ছড়া কাটবে? পাজী বেটি, ছুঁচো বেটি—

উষা। পূর্ব্বরাগ নেই, বিরহ নেই, কিছু নেই, হঠাৎ বলে—'তোমার নাম কি?'

সুরমা। মামা—

নন্দলাল। চোপ্, বেটি,—দুজনকে মজা দেখাচ্ছি, এবার। খেয়ে-দেয়ে, বসে-গড়িয়ে সব ধিঙ্গি হয়েচো—আহ্লাদে চোখে-কাণে দেখতে পাচ্ছ না—না? তোমাদের দিয়ে বাসন মাজাবো, জল তোলাবো এবার। দাঁড়া টুনি, তোর কি হাল করি—দেখ্। আর আমি শুনচি না। আর সুরি, তোকে যেমন করে পারি বহরমপুরে পাঠাচ্ছি—এর ব্যবস্থা আগে করে তবে অন্য কথা—হুঁ।

প্রস্থান

সুরমা। উ—

উষা। সু—

সুরমা। কি হবে?

উষা। কি আবার হবে? ও অমন বাবা বলে।

সুরমা। তাইতো—বহরমপুর যাবো? তা হলে এমন সোনার মেঘে গা ভাসিয়ে ওড়া, এ সব কবিত্বের বন্ধন, কোথায় মিলিয়ে যাবে! সেখানে যে নিষ্ঠুর ভীষণ বাসন-মাজা, ঘর-ঝাঁট, রান্না—ওঃ অসহ্য! না উ, যাবো না, যাবো না, আমি যাবো না—

উষা। না সু—দেবো না, দেবো না, যেতে দেবো না—

উভয়ের ধরাধরি করিয়া প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

রঙ্গ-পট

কোরাস্। গান

আমরা ক'টি তারা খশে নেমেচি ধরায়!
ধরার বাতাস-সয় না মোদের কোমল নধর কায়।
সাজিয়ে সভা, রূপের প্রভায় মাতিয়ে দেবো দিক্
ঢলঢলে মুখ নিয়ে সবাই চাও কি তার অধিক?
খাটিয়ে গতর, হবো কাতর! ছি ছি সরম তায়!
মাজবো বাসন, পাতবো আসন, আমরা তেমন নই!
হেঁসেল পাড়ি, হাঁড়ি নাড়ি, ভূতের বোঝা বই!
এ সব সভ্য করে কাব্য ঝরে, (বড় জোর) চুলগুলি কুলায়!
১। (আমি) এলিয়ে বেণী, জোৎস্না রাতে
গাঁথবো বকুল-ফুল!
২। (আমি) সেজে-গুজে থাকবো যেন
সন্ধ্যারাণীর দুল!

(আমার)
চলখানি—প্রেমের নিশান—উড়বে সাঁঝের বায়!
(আমি)
াশভাবে আকাশ-পানে, চাইবো নিশিদিন!
(আমার)
হ-শয়নে তাপিত-নয়নে ভেবে ভেবে তনু ক্ষীণ!
(আমি)
আসিবে বলে, মালাগাছি লয়ে বসি রবো জানালায়!
কলে মিলিয়া)
সংসার অসার, কেবা বলো কার?
কাজ করা ভালো লাগে নাকো আর—
র-কোকিল-জোছনাটা বেশ, ভাবনা নাহিক তায়!
ই, সৌখীন কাজে কটা দিন কাটাই—যে কটা যায়!

চতুর্থ দৃশ্য

লাবণ্যের কক্ষ

মস্ত জামা, শাল প্রভৃতি লইয়া সজ্জাকরণে নিযুক্ত।

পাণের ডিবা হস্তে লাবণ্যর প্রবেশ

লাবণ্য। কোথায় যাচ্ছ?

হেমন্ত। একটু বেড়াতে।

লাবণ্য। এই কাল সমস্ত রাত্রি থিয়েটারে কাটালে, নর বেলা বাইরে গান-বাজনা করলে, চোখের পাতা টু এক করলে না—আবার বেরুচ্ছ! কখন্ ফিরবে?

হেমন্ত। তা কি জানি?

লাবণ্য। না—বলতে হবে। না বললে ছাড়বো না!

(হস্তধারণ)

হেমন্ত। আঃ, কি পাগলামি করচো? সরো, মোজাটা য় দি।

াবণ্য। দাও, আমি পরিয়ে দিচ্ছি—তুমি খাটে বসো।

(হেমন্তের খাটে উপবেশন; লাবণ্যর মোজা াইয়া দেওয়া ও হেমন্তর পা বুকে ধারণ)

হেমন্ত। ও আবার কি হচ্ছে?

লাবণ্য। বেশ তোমার পা দু'খানি!

হেমন্ত। কাব্যি?

লাবণ্য। কাব্যি নয়, সত্যি! (উঠিয়া) ঐ যাঃ, মার পাণ দিতে ভুলে গেছি! এই নাও! (ডিবা তে পান লইয়া) না, এসো, আমি খাইয়ে দি! হমন্তর মুখে পাণ দিল) অমন করে দেখচো যে!

হেমন্ত। তুমি বড় বাড়িয়ে তুলেচো!

লাবণ্য। কি বাড়িয়ে তুলেচি?

হেমন্ত। ছং!

লাবণ্য। কিসে দেখলে?

হেমন্ত। এই মোজা পরানো, পাণ [illegible]

এখন সরো। ছড়িগাছটা কোথায় গেল? আঃ!

লাবণ্য। সে আমি লুকিয়ে রেখেচি—তোমার পা' দু'ও লুকিয়ে রেখেচি!

হেমন্ত। তবে এ ধারে সাজালে কেন? চোঁ[illegible] রঙ দিয়ে…

লাবণ্য। যাওঃ!

হেমন্ত। তবে মোজা পরিয়ে দিলে কেন?

লাবণ্য। কেন, বাড়ীতে বুঝি মোজা পুরে থাকতে নেই?

হেমন্ত। তা থাকবে না কেন? তবে আজ বড় বেশী গায়ে পড়চো—যাও না, একটু ওদিক দেখগে না।

লাবণ্য। এখন আমার কোন কাজ নেই—পাণ-টান সাজা হয়ে গেছে। দুপুর বেলা ত তুমি ওপরে উঠলে না, এখন একটু তোমার সঙ্গে গল্প করবার ইচ্ছে হয়েচে।

হেমন্ত। হঠাৎ এমন বেয়াড়া ইচ্ছে কেন?

লাবণ্য। হঠাৎ আবার কি! আসতে নেই?

হেমন্ত। তা থাকবে না কেন? তবে এমন অসময়ে—

লাবণ্য। অসময়েও বিদ্যুৎ চমকায়!

হেমন্ত। লেখাপড়া যদি একটু কম শিখতে, তা'হলে জ্যাঠামিটাও কিছু কম হতো! এখন, ছড়ি আর জুতা কোথায়, বলো! দেরী হয়ে যাচ্ছে।

লাবণ্য। বলেচি তো, কোথায় যাচ্ছ না বললে যেতে দেবো না।

হেমন্ত। এত জবাবদিহি করে বেরুনো আমার স্বভাব নয়।

লাবণ্য। এ জবাবদিহি নয়। তা করতে বলচিও না। আমার জানবার সাধ হয়েচে। তাই জিজ্ঞাসা করচি—লক্ষ্মীটি, বলো!

হেমন্ত। এমন তো কত যাই, রোজই বেড়াতে যাই—কই, কোন দিন তো জিজ্ঞাসা করো না।

লাবণ্য। আজ আমার জিজ্ঞাসা করতে সাধ হয়েচে, তাই বলচি। তোমার পায়ে পড়ি, বলো—

হেমন্ত। ছড়িটা কোথায় রেখেচো? (অন্বেষণ)

লাবণ্য। (হেমন্তর নিকট যাইয়া, তার হাত ধরিয়া) তুমি তো বলেচো, আমাকে সুখী করবার জন্য তুমি সব করতে পারো, আজ শুধু এইটুকু বলতে পারচো না?

হেমন্ত। আঃ, জ্বালালে! আরে বেড়াতে যাবো, বেড়াতে যাবো। সঙ্গীত-সমাজে নিমন্ত্রণ আছে—এখন

দাও, দাও, জুতোটা কোথায় লুকিয়ে রেখেচো! (চীৎকার করিয়া) হারু—

(নেপথ্যে—দাদাবাবু)

হারু ভৃত্যের প্রবেশ

আমার পাম্প সু, আর ছড়ি। গাড়ী তোয়ের হয়েচে?

হারু। হাঁ।

হেমন্ত। আমার জুতো আর ছড়ি দে। (হারুর অন্বেষণ)

লাবণ্য। ও ঘরে টেবিলের তলায় জুতো আছে, আর ছড়ি আমি দিচ্ছি। (হারুর প্রস্থান; মশারির চাল হইতে লাবণ্য কর্তৃক ছড়ি বাহির করিয়া দেওন)

জুতা রাখিয়া হারুর প্রস্থান

হেমন্ত। হলো তো?

লাবণ্য। বলবে না?

হেমন্ত। দেখ, বেশি বাড়াবাড়ি করো না। যে যেমন, তার সেই গণ্ডীর মধ্যে থাকা উচিত। আমি কি করি, না করি, তার প্রত্যেকটির কৈফিয়ৎ দেবার জন্য তোমাকে ঘরে আনা হয় নি। তুমি স্ত্রী—তোমাকে ভালোবাসি, স্নেহ করি, আদর করি, কিন্তু মাত্রা বোধ হয় বেশী হচ্ছে, তাই আজ তুমি বাড়িয়ে তুলেচো···

লাবণ্য। থাক্, আর বলতে হবে না,—আমি বারণ করচি না। যেখানে যেতে চাও, যাও, কিন্তু ফিরে এসে আমাকে আর দেখতে পাবে না!

হেমন্ত। (ফিরিয়া লাবণ্যর নাসিকা ধরিয়া ঈষৎ নাড়িয়া) পাগলী, অমনি রাগ হলো?

লাবণ্য। (মুখ ফিরাইয়া) না, রাগ হতে যাবে কেন?

হেমন্ত। হ্যাঁ, তুমি রাগ করেচো। বলো, তোমার কি মনে হচ্ছে—বলো!

লাবণ্য। কি আর বলবো? তুমি যেখানে যাচ্ছ, তা—

হেমন্ত। তা কি?

লাবণ্য। আমি তা জানি।

(নেপথ্যে, হেমন্তর জনৈক বন্ধু—কি হে দত্ত, আজ যে উবে গেলে দেখচি। নাম্‌বে না কি? Coward!)

হেমন্ত। কি জান, বল?

লাবণ্য। না, সে আমি বলতে চাই না—

হেমন্ত। তোমাকে বলতেই হবে, বল, লক্ষ্মীটি—

লাবণ্য। আর আদরে কাজ নেই।

হেমন্ত। বলবে না?

লাবণ্য। কোথায় তা আমি কি জানি? কাল যেখানে গিয়েছিলে, আজো সেখানে যাচ্ছ—আজ ক'মাস যাচ্ছ—আমাকে মিছে করে কেন বলতে, সঙ্গীত সম[illegible] যাই, থিয়েটারে যাই, ইডন্-গার্ডেনে যাই! এ [illegible] বলবার কোন দরকার ছিল না।

হেমন্ত। বাঃ বাঃ বাঃ, লেখাপড়া-শেখার সুন্দর [illegible] দেখচি! স্বামীকে অবিশ্বাস করচো?

লাবণ্য। অবিশ্বাস! তা তুমি বলবে! তুমি দু[illegible] বেলা আমাকে না দেখলে থাকতে পারতে না, এখন এ[illegible] বার ওপরে ওঠ না! ভালো করে আমাকে আদর ক[illegible] পারো না, ভালো করে আমার মুখের দিকে চাইতে পা[illegible] না! আগে আমার সঙ্গে তোমার কথা ফুরোতো [illegible] আর এখন, আমি দুটো বেশী কথা কইতে গেলে ব[illegible] 'ঘুম পাচ্ছে'! কোনমতে আমার পাশ কাটাতে পার[illegible] আরাম বোধ কর, আমি কিছু বুঝতে পারি না? অ[illegible] সব বুঝি।

হেমন্ত। Well done! কতকগুলো কি [illegible] করে বেশ গড়ে তুলেচো তো! আচ্ছা, আমি বেড়[illegible] কি কোথায় যাই, তুমি সহিসকে জিজ্ঞাসা ক[illegible] যাই, সুকুকে দিয়ে না হয় জানতে পাঠাও—

লাবণ্য। তা কেন জানতে যা[illegible]? আমি কা[illegible] বলতে চাই না। তুমি তো বুঝ[illegible] পারচো—আমি জানচি, টের পাচ্ছি, আমার কি [illegible]ছে!

হেমন্ত। লাবু—

লাবণ্য। আর আদর থা[illegible] কোন দরকার নেই [illegible] আমাকে একটু বিষ দাও—দি[illegible] নিশ্চিন্ত হও।

হেমন্ত। আদর করচি না, [illegible]নু। তবে শোনো, [illegible] জানতে পেরেচো ভালোই হয়েচে। আমারো [illegible] লুকোচুরির ভাবটা ভাল লাগছিল না—আজ [illegible] চক্ষুলজ্জার হাত এড়ালুম, এ কি কম সোয়োস্তি!

লাবণ্য। (হেমন্তর পায়ে ধরিয়া) তোমার প[illegible] পড়ি—কেন তুমি এমন হ[illegible]? তোমার জন্যই আ[illegible] জীবন, কিসে তোমাকে সুখী করবো, তাই আ[illegible] একমাত্র চিন্তা। তুমি যখন যে রকমে সুখী হতে চেয়ে[illegible] তখনি সেই রকমে তোমাকে সুখী করেচি। তোম[illegible] ইচ্ছায় গান শিখেচি, তোমাকে সুখী করবার জন্য দু[illegible] বেলা তোমার সামনে পিয়ানো বাজিয়ে গানও গেয়েচি [illegible] তবে কিসে তুমি আমাকে পায়ে ঠেলেচো?

হেমন্ত। কবে তোমাকে পায়ে ঠেলেচি লাবু? তু[illegible] আমার মাথার মণি!

লাবণ্য। দেখ, আলস্যই সকল রোগের মূ[illegible] নিষ্কর্মা হয়ে ঘরে বসে থাকলে মানুষ মাটী হয়ে যা[illegible] তুমি ঐ লক্ষ্মীছাড়াগুলোকে বাড়ী ঢুকতে দিয়ো না। ওদে[illegible] পরামর্শ নিয়ো না। ওপরে বসে গান-বাজনা করো, সখ হয় করো, কেবল ওদের নীচ সংসর্গ ছেড়ে দাও[illegible] নিজের সুনাম কেন নষ্ট করবে? দেখ দেখি, এই [illegible]

াকেরা নানারকমে স্বদেশের সাহায্য করচে—তাঁত নিয়ে, মিল খুলে, দেশের কাজে মন দিয়ে কত করচে। এ সব কুসংসর্গ, হীন নীচ চিন্তা ছেড়ে বার ঐ দিকে মন দাও দেখি। ঠাকুরপো বলছিল, ন—

হেমন্ত। থাক্, ও সব কথা আমি বুঝি, ও আর বোঝাবে ? এরা কি বলে, জানো ? চুনি, কার্ত্তিক, ওরা দের সঙ্গে পড়তো, ওদের নাম-ডাক কেমন, তা'ত না; কিন্তু বাগান আর ও সখটা সকলেরই আছে। কি না, ওটা না হলে তেমন মান হয় না, লোকে পোঁছে বড়লোক বলে যখন একটা নাম-ডাক আছে, তখন টা বাগান তবে গিয়ে দুটো মেয়েমানুষ নিয়ে গান-না···—এ—না হলে (লাবণ্য প্রস্থানোদ্যতা) চো, রাগ করো না, আমি তো আর তোমাকে অযত্ন চি না, অনাদর করচি না—

লাবণ্যর প্রস্থান

(নেপথ্যে—কি হে দত্ত, নাবচো ? না, আমরা যাব ?)

হেমন্ত। না, না, এই যাচ্ছি ! আঃ, ভালো গেরো !

প্রস্থান

লাবণ্যর প্রবেশ

লাবণ্য। উঃ ! (শয্যোপরি বালিশে মুখ গুঁজিয়া ন)

সুকুমারের প্রবেশ

সুকুমার। (স্বগত) এ কি, বৌদি কাঁদচে ? দাদা গেল না ? দাদার কথা কি জানতে পেরেচে ? দাদা ন মন্দ কথা বলেচে ? তাইতো—আমায় দেখলে দি হয়ত অপ্রতিভ হবে ! আমি কি পাষণ্ড, নিজের থর জন্যে ছটফট্ করে বেড়াচ্ছি, কিন্তু বৌদির এ দুঃখ করতে, দাদাকে ফেরাতে একটুও চেষ্টা করিনি ! প্রকাশ্যে) বৌদি—

লাবণ্য। (মুখ তুলিয়া) কে ? ঠাকুরপো !

সুকুমার। তুমি কাঁদ্‌চো, বৌদি ?

লাবণ্য। না, শুধু শুধু কাঁদবো কেন ? উঃ, মাথাটা নি ধরেচে, ঠাকুরপো—স্মেলিং শল্টের শিশিটা কোথা ই ?

সুকুমার। দাদা না এই মাত্র চলে গেল ?

লাবণ্য। হ্যাঁ, ওদের সঙ্গীত-সমাজে কি প্লে হবে ! ছা, সঙ্গীত-সমাজের থিয়েটার, এ সব থিয়েটারের চেয়ে লো হয়, না ?

সুকুমার। তা আর হবে না, বৌদি ? তাঁরা সব কত বড়-বড় লোক play করচেন ? থাক্, আমি স্মেলিং শল্টের শিশিটা আন্‌চি।

প্রস্থান

লাবণ্য। ঠাকুরপো কি জানতে পেরেচে ? বোধ হয়, পেরেচে, না হলে কান্নার কথা তুলবে কেন ? কিন্তু খুব শক্ত হতে হবে—ও যেন জানতে না পারে। এ কষ্ট কাওকে বলবার নয় ! ওকে নিশ্চয় আমি ফেরাবো—তা যদি না পারি তো আমি কিসের স্ত্রী ! আমার এখন রাগ করবার সময় নয়, দুঃখ করবার সময় নয়, অভিমান করবার সময় নয়, বুক বেঁধে দাঁড়াতে হবে, শুধু ভালোবাসায় এ দায় থেকে উদ্ধার হতে হবে। পাগল !—আমাকে লুকোতে চায়, আমি মুখের ভাব থেকে, কথাবার্ত্তা থেকে যে সব বুঝতে পেরেচি—এই যে ঠাকুরপো আসচে—

স্মেলিংশল্টের শিশি লইয়া সুকুমারের পুনঃ-প্রবেশ

আঃ, দাও তো ভাই, খুঁজে-খুঁজে আমি একেবারে হায়রাণ ! তোমার দাদা তো বকেই খুন—জানোই তো মেজাজ ! বলে, কোথায় কি রাখো, হুঁশ্ থাকে না ! (ঘন ঘন আঘ্রাণ) আঃ, একটু যেন আরাম হলো !

সুকুমার। (স্বগত) দাদার কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে দোবো না—বৌদির মনের এতটুকু কষ্ট আমার সহ্য হবে না ! (এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল)

লাবণ্য। (শিশি আঘ্রাণ) কি ঠাকুরপো, ঘুরঘুর করচো যে ! খপর কি ?

সুকুমার। নাঃ, খপর আর কি ?

লাবণ্য। (শিশি আঘ্রাণ) বাঃ, খপর বেশ আছে —কি যেন বলবে-বলবে করচো ! করিমগঞ্জের বিলাতী দোকান লুঠ, না চক্রধরপুরে ফুলারের অভিনন্দন—কিছু না ? তবে বুঝি, কবিতা লিখেচো ?

সুকুমার। হ্যাঁঃ, তুমিও যেমন বৌদি !

লাবণ্য। (শিশি আঘ্রাণ) আঃ, বলো না ঠাকুরপো, —এমন অসময়ে বিনয়ের সঙ্গে হেদোয় না ঘুরে, এখানে ? নিশ্চয় কোনো একটা মতলব আছে ! একটা কিছু দাঁও-টাও···বোধ হচ্ছে—

সুকুমার। হ্যাঁঃ, তেমন অদৃষ্ট কিনা আমার !

লাবণ্য। এ কি, হঠাৎ যে গম্ভীর হয়ে উঠলে !

সুকুমার। বলচি সব কথা বৌদি, কিন্তু শুধু শুনলে হবে না, উপায় করতে হবে।

লাবণ্য। (শিশি আঘ্রাণ) কিসের উপায় ?

সুকুমার। তুমি ঠাট্টা করবে না, বলো ?

লাবণ্য। (শিশি আঘ্রাণ) কেন, ঠাট্টা করবো কেন ?

সুকুমার। তোমাকে এর উপায় করতেই হবে বৌদি। না হলে আমি বাঁচবো না—সত্যি বলচি।

লাবণ্য। ইঃ, অবস্থা যে ক্রমে সঙ্গিন্ হয়ে উঠলো! ভূমিকা রেখে এখন বলো দিকিন্!

সুকুমার। ঐ মোড়ের বাড়ীটা অবশ্য দেখেচো, আমাদের ছাদ থেকে ঐ যে হলদে বারাণ্ডাটা দেখা যায়—ঐ যে ছ'চারখানা বাড়ীর পরেই…

লাবণ্য। ঐ ছাদের আলসেয় কতকগুলো ফুলের টব বসানো আছে?

সুকুমার। (ব্যগ্রভাবে) হাঁ, হাঁ, ঐ বাড়ীটা।

লাবণ্য। তা ও বাড়ীটা কি করেচে?

সুকুমার। ওখানা নন্দ মিত্তিরের বাড়ী। তা, ঐ নন্দ মিত্তির বড় ধরেচে।

লাবণ্য। কেন? স্বদেশীয় চাঁদার জন্য?

সুকুমার। আহা, না, না, তা কেন? তার একটি মেয়ে আছে।

লাবণ্য। সে-ই যাকে কলেজের বোর্ডিংয়ে রেখে বুড়ো পশ্চিমে যায়?

সুকুমার। হাঁ, ঠিক ঐ মেয়েটির কথাই বলছিলুম—

লাবণ্য। তা সে মেয়েটিকে জীবন-সঙ্গিনী করতে হবে না কি?

সুকুমার। বড্ড ধরেচে বুড়ো। তাইতো, কি করি বৌদি, ভারী মুস্কিলে পড়েচি।

লাবণ্য। কেন, তুমি তো বলেইচো যে দেশের এই দুর্দ্দিনে বিয়ে-ফিয়ে কোন রকম স্বার্থগণ্ডীর মধ্যে ধরা দেবে না। স্পষ্ট তাই বলো।

সুকুমার। তা'তো বলচি—কিন্তু বুড়ো একেবারে নাছোড়বন্দা। আমার রাস্তায় বেরুনো দায় হয়ে উঠলো।

লাবণ্য। তুমি না হয় বুড়োকে দেখা দিয়ো না—দিনকতক গা-ঢাকা দাও।

সুকুমার। তার মানে?

লাবণ্য। ওয়াল্টেয়ার-ফোয়াল্টেয়ার ঘুরে এসো।

সুকুমার। সেটা কি ভালো দেখাবে বৌদি! নেহাৎ পাড়ার লোক—

লাবণ্য। ওঃ, তাই বলো—বুড়ো যত নাছোড়বন্দা হোক্ না হোক্, তুমি নাছোড়বন্দা!

সুকুমার। আর লুকিয়ে কাজ কি? তবে তাই বৌদি। আমার কবিতার উৎস ঐ মেয়েটি—ওকে বিয়ে করতে না পেলে, উঃ (দীর্ঘনিশ্বাস), আমি সন্ন্যাসী হয়ে কোথাও চলে যাবো।

লাবণ্য। তাইতো কবিবর, অবস্থা এমন শোচনীয় কবে থেকে হলো?

সুকুমার। আর ঠাট্টা করো না বৌদি, আমি আর চেপে থাকতে পারলুম না—লজ্জার মাথা খেয়ে তোমাকে সব বল্লুম, এখন তুমি এর উপায় করো।

লাবণ্য। অর্থাৎ চার হাত এক করে দাও। কে তোমার দাদাকে বলি—

সুকুমার। দাদাকে নন্দ মিত্তির বলেছিল, দা বলেচে, সুকুর যদি মত হয়, হোক্ না।

লাবণ্য। তবে পিসিমা-টিসিমাকে বলি, ভট্চা মশাইকে ডাকানো যাক্, পাঁজি দেখানো হোক্।

সুকুমার। তা হলে আর ভাবনা কি ছিল! মেয়েটি বিয়ে করতে চায় না।

লাবণ্য। সে আবার কি?

সুকুমার। তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ব উপন্যাসের মত প্রণয় হলো না, কিছু না, একেবারে বিয়ে সে বৌদি ধাতে নেই, তার মাথা খারাপ!

লাবণ্য। তা, এ পাগলীকে নিয়ে কি করবে?

সুকুমার। তাদের বাড়ীতে গিন্নিবান্নি তো কেউ নেই কেই বা দেখে-শোনে! কাজেই লেখাপড়ার ঝাঁজে ঐ রক বাজে বকে। তোমার হাতে পড়লে ও দুদিনে ঠি হয়ে যাবে,—তবে কোন বেতর ঢং নেই, যাতে লোকে মাথা হেঁট হয়, এমন কোন আচরণ তার নেই। চো দুটি যেন সরলতায় মাথা!

লাবণ্য। তুমি দেখেচো! এমন নিখুঁত চোখ, ত অবধি দেখেচো?

সুকুমার। কতবার!

লাবণ্য। ওঃ, তাই তোমার ছাদে না উঠলে পড় হয় না, বটে?

সুকুমার। তার বাপ আজ ধরে মেয়ে দেখতে নিয়ে গেছল। মেয়ের নাম জিগ্‌গেস কল্লুম, তা হেসে কতকগুলো কি যে আবোল-তাবোল বকলে, আমি মাথা তুলতে পারলুম না, আস্তে-আস্তে পালিয়ে এলুম।

লাবণ্য। রণে ভঙ্গ দিয়ে? এঁ্যা! এ সব কথা ঘুণাক্ষরেও আমাকে জানাওনি, ভাই! কবিতার উৎস …?

সুকুমার। লজ্জায় বলিনি বৌদি—একেবারে তোমাকে চম্‌কে দোবো ভেবেছিলুম।

লাবণ্য। তা চম্‌কে এখনো দিয়েচো। আমি তোমাকে নিরীহ কবি বলেই জানতুম। তা, তোমার "আকাশ ও সাগরের" খাতাটা কোথায়?

সুকুমার। চুলোয় যাক্ সে খাতা। এ বিষয়ে বন্দোবস্ত করে দাও বৌদি, না হলে সত্যি আমি মরে যাবো—

লাবণ্য। একেবারে heart fail করে,—না?

সুকুমার। সত্যি, ঠাট্টা নয়।

লাবণ্য। তা ঠিক, আমিই কি ঠাট্টা করচি! আমি কি নভেল পড়িনি? তা মোদ্দা অত ছট্‌ফট্ করলে আমি কিছু করতে পারবো না—আমি যা বলি শোনো—

সুকুমার। বল।

লাবণ্য। ও রোগটি দেখতে হবে।

সুকুমার। হাঁ।

লাবণ্য। বুঝতে হবে—

সুকুমার। বেশ!

লাবণ্য। সারাতে হবে।

সুকুমার। নিশ্চয়।

লাবণ্য। তারপর বিয়ে।

সুকুমার। বড্ড দেরী হয়ে যাবে—তাইতো!
—

লাবণ্য। তা না হলে কি করে হবে! সে বিয়ে
তে চায় না।

সুকুমার। তা ঠিক!—তা কি উপায় করবে?

লাবণ্য। সে বিবেচনা করা যাবে। এখন তুমি এক
করো দিকি। ঐ নন্দ মিত্তিরকে আর ওঁদের বাড়ীর
অন্য পুরুষ-মানুষদের কাল বাড়ী থেকে কোন ফিকিরে
কোথাও পাঠাও—আমি একবার গাড়ী করে ওঁদের
যাবো, মেয়েটাকে দেখি। তার পর, যে রকম ব্যবস্থা
ত মনে হয়, তাই করবো—কিন্তু এ কথা আর কাকেও
ত পাবেনা—খালি তুমি আর আমি জানবো।

সুকুমার। আচ্ছা, তা সুবিদেই আছে—ও নন্দ
ওদের বাড়ী পুরুষমানুষের মধ্যে ও-ই সবে-ধন
মণি! তা তাকে আর কোথাও পাঠানো যাবে—

লাবণ্য। তুমি না হয় তাকে বলো যে তোমার
আত্মীয়া মেয়েটিকে দেখতে চান—যদি ভালো
যায়!

সুকুমার। তাইতো, আমি নিজে কিন্তু বলতে পারবো
বৌদি, সে আমার ভারী লজ্জা করবে।

লাবণ্য। ই-হি-হি—দেখো, ভারী লজ্জা—বটেই
মেয়ে দেখবার সময় লজ্জা হয়নি ত?

সুকুমার। তা হয়নি বটে, কিন্তু যখন আসি, গোবিন্দ
র সঙ্গে দেখা হলো, তখন ভারী লজ্জা হলো!—

লাবণ্য। তবে উপায়?

সুকুমার। বিনয়কে দিয়ে ব্যবস্থা করবো!

লাবণ্য। আবার বিনয়?

সুকুমার। আঃ বৌদি, তুমি জানতো, সে বেশ চালাকি
বলতে পারবে। আর বিনয় তোমাকে খুব শ্রদ্ধা
। সে বলে, তার নিজের মার চেয়ে সে তোমাকে
ভক্তি করে।

লাবণ্য। আচ্ছা, আচ্ছা, এখন ও সব কথা থাক্—
পরামর্শ করা যাক্, এসো।

সুকুমার। তুমি দেরী করো না, বৌদি, আবার
চমাস পড়ে যাবে—ফাল্গুন মাসের মধ্যে যেমন করে
ক্ বিয়েটা লাগাতেই হবে!

লাবণ্য। আহা, মধুর বসন্তে! তাইতো, ধৈর্য্য যে আর
থবে না! পাঁজিগুলো নেহাৎ অসভ্য, না? কি মাল
বিয়ের দিন লেখে না!

সুকুমার। এ বিয়েটা যদি লাগাতে পারো বৌদি,
তাহলে—

লাবণ্য। তা হলে কি বখশিশ দেবে, বল?

সুকুমার। তা হলে তুমি হরিণ পুষবে বলেছিলে,
আমি খুব ভালো দেখে একটা হরিণ কিনে দেবো।

লাবণ্য। শুধু তাই নয়—শিল্প-বিদ্যালয়ে পাঁচশো
টাকা গুণে দিতে হবে তোমাকে।

সুকুমার। যা বলো বৌদি, তাতেই রাজী।

লাবণ্য। আঃ, কি ভালো ছেলে গা—যেন প্রথম-
ভাগের গোপাল, যা পায়, তাই খায়—তেমনি, যা বলো
তাই—এঁ্যা? আচ্ছা, তা এখন আমি নীচেয় যাচ্ছি,
তুমিও আকাশের তারা না গুণে একটু বেড়িয়ে-চেড়িয়ে
এসোগে। তার পর রাত্রে আরো পরামর্শ আঁটা যাবে।

সুকুমার। বেশ; হ্যাঁ, মাথাধরাটা ছাড়লো বৌদি?
একটু ল্যাভেণ্ডার দাও না।

লাবণ্য। অনেকখানি কমেচে—মাথা একেবারে
তুলতে পারছিলুম না—মাথার যাতনায় কান্না পাচ্ছিল।

স্মেলিং সল্ট আঘ্রাণ করিতে করিতে প্রস্থান

সুকুমার। আহা, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! লেখাপড়া শিখলে
আর সঙ্গে সঙ্গে মাথাটি ঠিক রাখলে স্ত্রীলোক কি দেবীত্বে
ভূষিত হতে পারে, বৌদি তার প্রমাণ। এই বৌদিকে
দাদা হেনস্থা করচে? ছি ছি—আমি যদি মানুষ হই তো
যেমন করে পারি, দাদাকে ফেরাবোই।

প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

গঙ্গাতীরস্থ পথ

রমণীগণের প্রবেশ

গান

চল্ চল্ চল্ চল্ সবে ধীরে ধীরে—
সোনার তনুটি সই, খেলাতে নীরে!
ছল-ছল করি হাসে ঐ ঢেউ!
ভয় নেই, ওলো—পথে নাইকো ত কেউ!
কাজ কি, নয়! মাথায় কাপড় টেনে দে রে!
হাঙলা কুকুর কত পথে থাকে,
ও মা ছিছি, মুখের পানে খালি চেয়ে দেখে!
আ ছি ছি, আ ছি ছি, ছি ছি ছি রে!

দিই গে দুটো ডুব, ও তায় ঠাণ্ডা হবি খুব,
ভালো না ফুটতে আলো, যাবো লো ফিরে।

প্রস্থান

নন্দলাল ও বিনয়ের প্রবেশ

বিনয়। আপনার উদ্বেগের যাতে শান্তি হয়, তার চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য! বলেন কি, পাড়ার ভিতর আপনি একজন গণ্যমান্য বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি, আপনাকে দেখবো না?

নন্দলাল। তোমার কথাগুলি বাবা বেশ,—তা, কি জানো, ঐ নকুড় দত্তর ছেলেটিই আমার পছন্দ, নকুড়ের সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। আরো কি জানো, ছেলেটি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র!

বিনয়। আজ্ঞে, তা আর বলতে! অমন ছেলে কি আজকালের বাজারে মেলে?

নন্দলাল। তোমার নামটি কি বাবা? বেশ নাম! তুমি আমার প্রাণধনের ছেলে! সব এই টুকু-টুকু দেখেছিলুম, এখন সব বড় হয়ে পড়েচো—ওঃ প্রাণধন গাঙ্গুলি আর নন্দ মিত্তির একেবারে হরিহর-আত্মা ছিল! তা, হাঁ, তোমার নামটি বাবা কি বলছিলে? বিশ্বম্ভর?

বিনয়। আজ্ঞে না, বিনয়!

নন্দলাল। বেশ নাম, দিব্যি! যেমনি নাম, তেমনি স্বভাব। আহা বেঁচে থাকো, বাবা, বেঁচে থাকো!

বিনয়। হ্যাঁ, তা হলে যা বলছিলুম—দিদি বলছিলেন কি না যে বাড়ীতে গিন্নিবান্নি তেমন কেউ নেই যে, একটু বোঝাবে-সোঝাবে! একে লেখাপড়ার গরম, তায় একা থেকে থেকে কেমন মাথা খারাপ হয়ে গেছে। পাঁচজন মেয়েছেলের সঙ্গে দুটো কথাবার্ত্তা কইতে কইতে সেরে উঠতে পারে।

নন্দলাল। আহা, তাই বলো বাবা, তাই বলো! ঐ মেয়েটা হলো আমার প্রাণ—ও যখন এই এত-টুকু, তখন ওর মা চলে যান্‌, তার পর হাতে করে মানুষ করেচি! সংসারের একমাত্র বন্ধন, বল তো বাবা, ওটার জন্য আধ-মরা হয়ে রয়েচি। আহা, ঐ নকুড়ের ছেলেটির হাতে সমর্পণ করতে পারলে আমার মাথার বোঝা নামে, আমি একটু আরামে মরতে পারি!

বিনয়। আজ্ঞে, সে কথা ঠিকই বলচেন! দেখুন, তা হলে এক কাজ করা যাক্‌—দিদিও বলছিলেন! আপনি আপনার মেয়েকে নিয়ে পরেশনাথের বাগানে বেড়াতে যাবেন—দিদিরাও যাবেন। সেইখানে একটু খোলা হাওয়ায় দু'চারদিন বেড়িয়ে-চেড়িয়ে, তবে পাঁচরকম কথাবার্ত্তায় যদি ক্রমশ কিছু সুস্থ হয়! আপনি নিজেই তা হলে নিয়ে যাবেন—দিদিকেও খাওয়া-দাওয়ার পরে আমি নিয়ে যাবো। এই রকম একদিন পরেশনাথ, একদিন চিড়িয়াখানা, একদিন সাতপুকুর, একদিন শিবপুরের বাগান—

নন্দলাল। বলেচো ভালো বাবা, বলেচো ভালো! তা, আমি তা হলে বেলা এগারোটা নাগাদ নিয়ে যাবো। তুমি বাবা তোমার দিদিকে বলো, আমার টুনিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ভালো করে দিতে হবে। আহা, প্রাণধনের তোমরা—আমারো কিছু পর নও! তা হলে—হ্যাঁ, তোমার নামটি বাবা কি বলছিলে—আহা, কি বৈকুণ্ঠ, না বিশ্বম্ভর—

বিনয়। আজ্ঞে, বিনয়!

নন্দলাল। হ্যাঁ হ্যাঁ, বিনয়! দেখ বাবা বিনয়, তোমায় দেখে বড় খুশী হলুম। তা হলে মনে করে তোমার দিদিকে নিয়ে পরেশনাথে যেয়ো বাবা, দুপুরবেলা সেখানে লোকজনও বেশী থাকে না। কি জানো বাবা বিনয়, শুধু এই নয়—ঐ নকুড়ের ছেলেটির সঙ্গে টুনির বিয়েটি যাতে হয়, এ'ও তোমাকে করতে হবে! তুমি প্রাণধনের ছেলে, ঘরের লোক, টুনির বড় ভাই, এ তো তোমারো কাজ!

বিনয়। আজ্ঞে, আমাকে এত কেন বলচেন!

নন্দলাল। তা হলে আমি বাবা চট করে দুটো ডুব দিয়ে আসি। প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করলে শরীর বড়ই ভালো থাকে। তা হলে বাবা, ঐ বেলা এগারোটা-বারোটায়—কেমন?

বিনয়। আজ্ঞে হ্যাঁ, মনে করে তা হলে যাবেন, আমি বরং আর একবার আপনার সঙ্গে দেখা করবো'খন!

নন্দলাল। ঐ, হ্যাঁ হ্যাঁ, তা হলেই হলো—তা হলে—বাবা বিশ্বনাথ···

বিনয়। আজ্ঞে না, বিনয়।

নন্দলাল। হ্যাঁ বিনয়। তা বিনয়, আমি বাবা ডুবটা দিয়ে আসি—

প্রস্থান

সুকুমারের প্রবেশ

সুকুমার। কি হে বাগালে কেমন?

বিনয়। সব ত শুনলে?

সুকুমার। তা ত শুনলুম—

বিনয়। দেখ ভাই, এমন করে ঘটকালি লাগিয়ে দিয়েচি—শুভদৃষ্টি হলে ভালো করে খাওয়াতে হচ্ছে!

সুকুমার। কদিন চাও?

বিনয়। হোটেলে বেশ ভালো করে গুণে একটি মাস খাওয়াতে হবে, না হলে ছাড়চি না!

সুকুমার। আচ্ছা ভাই, আগে বরাতে লাগুক্‌!

বিনয়। তোমার বৌদি যখন ভার নিয়েচেন, তখন ও ব্যাদড়া রোগ আরাম না হয়ে যায় না; মোদ্দা তোমার দাদার সম্বন্ধে কি করা যায় বলো দেখি?

সুকুমার। হ্যাঁ, ভাখো, ঐ গয়গবাক্ষগুলোকে মতে ঝেঁটিয়ে চটিয়ে দিলে হয় না? তার পর একবার স্বদেশীতে ভিড়িয়ে দিতে পারি!

বিনয়। যা বলেচো—তাই করা যাবে।

উভয়ের প্রস্থান

বালকগণের প্রবেশ

গান

কাঙালিনী মায়ের পানে, চা তোরা চা!
ক না সে তোর শ্রীহীন, মলিন, সে তো তোদেরি মা!
ধূলায় লুটায় মায়ের আঁচল,
আঁখিধারা বয়ে তিতিছে কপোল!
মা বলে তোরা একবার ডেকে মার কোলে ফিরে যা।
হাহাকার ঘুচে অভিনব সুখে,
ফুটিবে আবার স্নেহ-হাসি মুখে;
আপনার মায়ে চিনে শুধু তোরা মা বলে কাছে যা!

প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

পরেশনাথের বাগান

লাবণ্য ও সুকুমার

সুকুমার। (ঘড়ি দেখিয়া) এই যে বারোটা বাজে, এলো বলে!

লাবণ্য। তুমি বেশ আড়ালে-আড়ালে থেকো; যেমন দরকার হবে, তেমনি চাল চালবে; মনে হ?

সুকুমার। খুব মনে আছে।

লাবণ্য। আমাকে পুরুষমানুষের মত দেখতে হয়নি? র আলষ্টার, পায়ে পাম্প সু! মাথায় পাগড়ী হলেই হতো!

সুকুমার। কেন এ থিয়েটারী পরচুল মন্দ কি? রবি-ঠাকুর রবি-ঠাকুর দেখাচ্ছে—এখন দেখবো দি, তোমার হাত-যশ।

লাবণ্য। তোমারও কপাল! তবে খুব সাবধান, কেউ জানতে না পারে—তা হলে খপরের কাগজ-রা একটা ঢিঢিক্কার করবে।

সুকুমার। হ্যাঁ, তুমিও যেমন বৌদি, এমন নিরিবিলি গা—কে বা টের পাবে? এই যে বিনয় আসচে—টু ওধারে চলো—

লাবণ্য। ঠিক বলেচো—চলো।

উভয়ের প্রস্থান

নন্দলাল ও বিনয়ের প্রবেশ

বিনয়। দিদিরা এসেচেন—তাঁরা ঐ মন্দির দেখচেন; এইখানে এই বেঞ্চে ওঁদের বসতে বলুন! আসুন, আমরা একটু ওদিকে যাই; দিদিকে আমি খপর দিইগে।

প্রস্থান

নন্দ। আয় না টুনি! ওকে আবার লজ্জা কি? ও তোর দাদা হয় যে!

ঊষা ও সুরমার প্রবেশ

নে, এই বেঞ্চে বোস্ দিকিন্। কেমন জায়গা! বেশ, না? কেমন সব সাজানো থাম, বাঁধানো পুকুর। এখানে একটু বোস্, আমি গাড়ীটার একটা বন্দোবস্ত করে ফিরে আসি।

প্রস্থান

ঊষা। সু—

সুরমা। এই যে ঊ—(উভয়ের উপবেশন)

ঊষা। বেশ জায়গা শয়নে-স্বপনে এই মধুর শোভা আমার প্রাণে উঁকি মারছিল। আহা, কি সুন্দর!

সুরমা। চুপ করো। কে গান গাইচে না?

অন্যমনস্কভাবে লাবণ্যর গান গাহিতে গাহিতে পরিক্রমণ

গান

"এখনো, তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশী শুনেছি।
মনপ্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি।
শুনেছি মুরতি কালো, তারে না দেখা ভালো,
সখি বলো আমি জল আনিতে যমুনায় যাব কি!"

প্রস্থান

ঊষা! আহাহা! এ কি স্বপ্নরাজ্য! সু, সু, কে এ সুন্দর পুরুষ? কি গান গায়?

সুরমা। আর বলোনা ঊ, আর বলো না। আমার চিত্ত-চকোর উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে রয়েচে!

ঊষা। কাণে যেন গানের তানটুকু লেগে রয়েচে! এ যে আকুল-করা গান—শেষে আবার পাগল হবো?

সুরমা। এ কি ইন্দ্রজাল! ঊ, এইখানেই তোমার চিরবাঞ্ছিত আছে। আঃ, মলয়ের কি স্নিগ্ধ বীজন!

ঊষা। প্রকৃতির কি মোহন নৃত্য! ইচ্ছা করচে, গানের তান হয়ে বাতাসে ভেসে যাই!

গান

হৃদয় ছুঁয়ে, গেয়ে কে গেল ফিরে!
উদাস পরাণ আমি বাঁধিতে নারি রে!

বাঁধন পড়িছে খসি, সরম চলেছে ভাসি—
বেদনা আকুল কি যে পরাণে ফুটিছে ধীরে!
কে যেন ডাকিছে মনে, কোথা কোন্ ফুল-বনে,
কোথা সে—ব্যথা-ভরে নয়ন ঝুরিছে নীরে!

সু, সু—আমার প্রাণ আর সান্ত্বনা মানে না! আমি চোখে তাকে দেখিনি, তার গানের তান আমার প্রাণের মধ্যে আকুল আর্ত্তস্বরে ফুকারি ঘোরে!

সুরমা। স্থির হও, উ, স্থির হও! বোঝো, আগে কোথায় কে অজানা পথিক গান গেয়ে গেল, অমনি তোমার মন-কুরঙ্গ অধীর আবেগে চঞ্চল হয়ে উঠলো!

উষা। তুমি জানো না সু—প্রেমের আবেশ নিমেষ পরশে—বাঙলা অপেরা ছাখোনি? আপনার কাজ শেষ করে যায়। চুপ, আবার ঐ গান হচ্ছে—

লাবণ্যর গাহিতে গাহিতে পুনঃ-প্রবেশ

গান

"সখি, আমারি দুয়ারে কেন আসিল
নিশি-ভোরে যোগী ভিখারী!
কেন করুণ সুরে বীণা বাজিল!

প্রস্থান

উষা। উঃ, আমি আর বাঁচিনা! আর এ বিফল জীবনে, বিফল জনমে কাজ কি? এই মর্ম্মরতলে এ প্রাণ কেন চলে যাক্ না! আমার পৃথিবীর সব সাধ মিটেচে। দাঁড়াও, দাঁড়াও, কে তুমি মূর্ত্তিমান গানের স্বরটুকু—কে তুমি? তুমি যেই হও, দেব-যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর—কমেডির কমনীয় কান্ত—

সুরমা। অপেরার নায়ক, প্যান্টোমাইমের ডাম্ব-সো—

উষা। মেলো-ড্রামার হিরো—যে হও, আমাকে নাও। সু, সু, আমার কি হবে?

সুরমা। যতক্ষণ দাঁড়িয়ে গাইছিল, ততক্ষণ কিছু বললে না কেন?

উষা। তখন কি আর আমাতে আমি ছিলুম? আমি যে চকোরের মত গীতিস্বর-সুধা পান করছিলুম! আমার প্রাণ-মন-জীবন-যৌবন গানের রজ্জুতে যেন লাটিমের মত ঘুরপাক খাচ্ছিল!

সুরমা। উ, হৃদয় হারিয়েচো! দেখ দেখি, তোমার সেই সরল উদার 'তুমিত্ব'-ভরা হৃদয়ে কি কোন রেখাপাত হয়েচে? আছে তাতে কোন বিচিত্র বর্ণ? দেখ খুব সূক্ষ্ম পর্য্যালোচনা করে—

উষা। শূন্য, শূন্য, সু, অসীম শূন্যতা!

সুরমা। চুপ, চুপ, কে আসচে!

লাবণ্যর পরিহিত আলষ্টার ও পরচুলের ছদ্মবেশে সুকুমারের ধীরে ধীরে পরিক্রমণ

এই যে আবার এসেচে। উ, উ, কথা কও!

উষা। আপনিই কি ভ্রাম্যমাণ স্বর-লহরীর মত ভেসে বেড়াচ্ছিলেন?

সুকুমার। কে রে? পাগল না কি!

সুরমা। না, না, পাগল কেন? গানের তানে সখী আমার বিভোর হয়ে রয়েচে। আপনিই কি গান গেয়ে এখান দিয়ে চলা-ফেরা করছিলেন?

সুকুমার। হাঁ।

উষা। আহা, আবার গা'ন, আবার গা'ন।

সুকুমার। পাগল না কি—এঁ্যা!

প্রস্থান

উষা। সু, সু—চলে গেল, নিষ্ঠুরের মত চলে গেল! প্রাণে পাষাণ বেঁধে চলে গেল! ফিরলো না, চাইলো না, দেখলো না, চলে গেল! আমি জলে ঝাঁপ দেবো—ঐ শীতল বারিরাশি—আমার এ কোমল পুষ্পগুচ্ছের মত দেহ-ভার ঐ শীতল জলে ভাসিয়ে দি।

সুরমা। সর্ব্বনাশ! উ, ও কথা বলো না—ঘরের ভিতর সোফায় বসে জলে ঝাঁপ দেবার কথায় কবিত্ব আছে—সে যত বলো, তত করুণ লাগে। তাতে কাপড় ভেজে না, ঙ×ও হয় না—কিন্তু পুকুরের ধারে বসে ও কথা বলো না উ, বিভীষিকায় হৃৎকম্প হয়!

তবে কি করবো? প্রাণপুষ্পটি পদদলিত করি?—যাক্ সে চূর্ণ হয়ে!

স্ত্রী-বেশে লাবণ্যর প্রবেশ

লাবণ্য। আপনারা ও কি করচেন? এঁর কি কোন অসুখ করেচে?

সুরমা। না, অসুখ কেন করবে?

লাবণ্য। তবে অমন বেঁকচেন-চুরচেন—কত কি বলচেন! আপনাদের সঙ্গে কি পুরুষমানুষ নেই, তদারক করে?

সুরমা। কেন থাকবে না? এ এঁর কিছু নয়—এঁর বাঞ্ছিত প্রিয় গানের তানে মিশিয়ে গেছেন! তাই!

উষা। আঃ, কি বলচো, সু! না, না, আপনি কে? আপনি জানেন কি, কে এখান দিয়ে গান গেয়ে চলে গেল?

লাবণ্য। কে আবার গাইবে!

উষা। আপনি শোনেন নি তবে? আহা, সে যেন অজানা স্বপ্নের মত! বীণাখানি ছুঁয়ে গেল, আর আমার মর্ম্মের ভিতর থেকে উঠলো এক অশ্রুময় ঝঙ্কার!

লাবণ্য। এঁর যে দেখচি মাথা খারাপ।...না হলে এমন আবোল-তাবোল বকবেন কেন!

সুরমা। মাথা বেশ আছে! দাঁড়ালো না; ফিরলো
—পাষাণে হৃদয় গেঁথে চলে গেল!

লাবণ্য। এঃ, এতক্ষণে বুঝেচি—গানের কথা বল-
ন, না? সে—হ্যাঁ, ও একজন গায়। আহা, বেচারী!
। উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বেড়াচ্ছে। ও একজনকে ভালোবাসে,
ন্তু ফিরেও চায় না—তার বুক-ভরা ভালোবাসা
ক্ষা করচে, তাই পাগল হয়ে গেছে, এখান-সেখান
বেড়ায়, আর ঐ আপনার মনে গান গায়। সে
ণী কিন্তু ফিরেও চায় না!

ঊষা। এমন পাষাণী কি আছে?

লাবণ্য। তা আর নেই? শুধু পুরুষই পাষাণ?
ও পাষাণী।

ঊষা। আপনি দাঁড়িয়ে কেন? বসুন না।

লাবণ্য। না, ভাই, বসবো না। এখানে এলে
প করে থাকা যায়! চারিধারে কেমন-যেন-একটা
-প্রীতির আনন্দ বিরাজ করচে! কেমন যেন
শান্তি!

সুরমা। ঠিক। অনাবিল নির্ম্মল শান্তি!

ঊষা। শান্তি! কোথায়? এখানে এসে আমার
অশান্ত হয়ে উঠেচে। কোন্ অজানার জন্য হৃদয়
ল হয়ে উঠছে! এ তো বিজন বন নয়, এ তো ভাঙা
র নয়, এখানে তো বিদ্যুতের চমক নেই, বজ্রের
য নেই, তবু কেন হৃদয়ে এ আকস্মিক প্লাবন
লো?

লাবণ্য। কার জন্য প্রাণ অস্থির হয়েচে, আমাকে
ত, ভাই! দেখি, যদি কিছু উপকার করতে পারি।
বা এখানে থাকি কি না, এখানকার সব জানি।

ঊষা। কার জন্য বলবো? সে যেন আপনার,
চ যেন চিনি না। স্বপ্নে যেন কবে তার সঙ্গে দেখা
ছিল, আর কাণে তার গানের উচ্ছ্বাস এসে লেগেছিল!

লাবণ্য। আচ্ছা, তার সন্ধান নিচ্ছি। তার জন্য
পাগল হয়েচো! আহা, তা জানলে সে বেচারীও
ই সোয়াস্তি পাবে!

ঊষা। কেন?

লাবণ্য। বেচারী তবু জানবে, তার জন্য একটা
ও কাতর হয়!

ঊষা। নিষ্ঠুর! পাষাণ!

লাবণ্য। এসো, দেখি! খোঁজা যাক্, সে এখানে
ছ কি না।

ঊষা। আছে কি? আছে কি? একবার দেখাও।

সুরমা। আর একবার শোনাও তার গান।

লাবণ্য। এসো আমার সঙ্গে!

সকলের প্রস্থান

নন্দ ও বিনয়ের পুনঃ-প্রবেশ

বিনয়। দিদিদের এখানে আসবার কথা আপনি এঁদের না জানিয়ে ভালোই করেচেন।

নন্দলাল। ভাল করিনি, বাবা? কি জানি, যদি বেঁকে বসে—এঁ্যা?

বিনয়। আজ্ঞে তা'ত বটেই—তা আসুন, এদিক-ওদিক একটু বেড়ানো যাক্।

নন্দলাল। হ্যাঁ, তা এঁরা-সব কোথায়?

বিনয়। ঐ যে একসঙ্গে সব বেড়াচ্ছেন। আসুন—

নন্দলাল। চলো বাবা। তা মনে রেখো, বাবা, ঐ নকুড়ের ছেলেটির সঙ্গে যাতে বিবাহটি হয়, তা করতেই হবে। বুঝলে বাবা বিশ্বেশ্বর?

বিনয়। আজ্ঞে, আমি বিনয়।

নন্দলাল। হ্যাঁ, হ্যাঁ—বিনয়, বিনয়! কি জানো, বুড়ো হয়েচি, স্মরণও থাকে না। বিনয়, বিনয়! তা এখন চল বাবা বিনয়।

উভয়ের প্রস্থান

সুকুমারের পুনঃ-প্রবেশ

সুকুমার। বৌদি যা বললো তা তো করলুম—কিন্তু ও অমন করচে দেখে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে! কেন ওর মাথা খারাপ হলো? এত মেয়ে লেখাপড়া শেখে, কারুর মাথা খারাপ হয় না, আর ওরই মাথা খারাপ হলো! আমার কপাল! এই বেঞ্চটায় একটু বসি। আহা, সে বসেছিল! জায়গাটাতে বুক পেতে পড়ে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে; আমার অবস্থা দেখে লোক হয়তো হাসবে, কিন্তু আমার বুকের ভিতর যে যাতনা হচ্ছে, তা হে পরমেশ্বর, তুমি যদি থাকো, তা হলে তুমিই জানচো! এই তো বৌদি এত লেখাপড়া জানে—তা ও যদি বৌদির মত মাথা ঠাণ্ডা রাখতো! নাঃ, আমি গেলুম, মরে গেলুম—খেয়ে, বসে, শুয়ে, বেড়িয়ে কিছুতে সুখ পাচ্ছি না—ওকে না পেলে, ওঃ, আমার জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে! ও কি সারবে না? আমার ইচ্ছে করচে ওকে বুকে তুলে নি। কি বিপদেই পড়েচি! ঊষা, ঊষা, তোমার জন্যে আমি পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তোমায় যদি না পাই, তা হলে উঃ, এ জীবন আর রাখবো না। এই যে বৌদি আসচে।

লাবণ্যর পুনঃ-প্রবেশ

লাবণ্য। কি ঠাকুরপো, বসে আছো?

সুকুমার। হ্যাঁ, কেমন দেখলে বৌদি?

লাবণ্য। হদ্দ পাগল!

সুকুমার। সারবে?

লাবণ্য। চেষ্টা তো দেখা যাচ্ছে!

সুকুমার। তারা কোথা গেল?

লাবণ্য। ঐ যে মন্দিরে বসে আছে। নন্দবাবু গেলেন কি না, তাই আমি চলে এলুম। তা হলে আজ বাড়ী চল!

সুকুমার। এখনি?

লাবণ্য। কেন ওর জন্য মন-কেমন করবে নাকি?

সুকুমার। ধেৎ! তা নয়।

লাবণ্য। তবে? তুমি কি আজই আরোগ্য চাও?

সুকুমার। কত দেরী হবে?

লাবণ্য। দু'দিনেই এত অধৈর্য্য!

সুকুমার। দু'দিন কি, বৌদি? আমার ডায়েরিখানা দেখেচো?

লাবণ্য। তা বেশ তো! যতদিন এমনি অবস্থা থাকে, ডায়েরিখানা ততদিন সজোরে চলবে—মাসিক পত্রের যা দৈন্য, যদি তাদের পাদপূরণ হয়!

সুকুমার। না। বৌদি, আর পারা যায় না। তুমি না হয় বাড়ী যাও—আমি এখানে খানিক থাকি।

লাবণ্য। আহা, আঁচলের বাতাস যদি একটু গায়ে লাগে! আর এখানটায় সে বসে ছিল কি না; তা বরুখানা বাড়ী নে যাবার ব্যবস্থা করা যায় না ঠাকুরপো?

সুকুমার। তোমার কেবলি ঠাট্টা!

লাবণ্য। বটে, কেবল ঠাট্টা! এরি মধ্যে এমন অকৃতজ্ঞ!

সুকুমার। না, না, মাপ করো, বৌদি, কোন আশা আছে কি?

লাবণ্য। আজ তো রোগনির্ণয় হলো—এখন ওষুধের ব্যবস্থা হবে! কিন্তু তুমি বেশ বুক বাঁধ—ডাক্তারের পরামর্শ যেন সযত্নে পালন করা হয়!

সুকুমার। যদি আশা দাও—যদি ওকে পাবার আশা থাকে, তা হলে পৃথিবীতে আমার অসাধ্য কিছু নেই—

লাবণ্য। অসাধ্য কিছু নেই! ঠিক বলচো? আচ্ছা, দাও দিকি আমার গলায় ছুরি বসিয়ে!

সুকুমার। তাই তো বলি, তোমার কেবল ঠাট্টা!

লাবণ্য। ঠাট্টা কেন? তুমিই তো বললে অসাধ্য-সাধন করতে পারো!

সুকুমার। যাও, তুমি কেবল জ্বালাতে লাগালে!

প্রস্থান

লাবণ্য। ও ঠাকুরপো, যেয়ো না যেয়ো না, শোনো! বদ্ধ পাগল! নাঃ, পারি না আর ঘুরতে—এখনি আসবে। এধারে কেউ নেই। বেশ নিরিবিলি জায়গাটি। (উপবেশন) না, বসলে চলবে না। এখন বাড়ী যেতে হবে! তাকে আজ একটু বোঝাতে হবে—কাল থেকে যেন একটু লজ্জা পেয়েচে! ওর মনটা বড় সরল, পাঁচ-জনের কু-পরামর্শে নিজের ভালো দেখতে পায় না। ফেরাতে পারবো না তাকে? আমার প্রাণের ভিতর যে হচ্ছে, তা অন্তর্যামী জগদীশ্বর, তুমিই জানো! ও ফেরানো আমার জীবনের ব্রত—এ ব্রত সফল করো!

গান

বেলা গেল, গেল চলে, আঁখি মুছি আঁচলে!
হৃদয়েরি ব্যথা রাখি গোপনে হৃদয়-তলে!
সজল আঁখির ভাষা, সুখ-দুঃখ-ভয়-আশা
বুঝিয়া বোঝে না সে যে, ভুলে আছে কি ছলে!
কাছে কাছে এসে এসে, কোথা যায় ভেসে ভেসে
রাখিতে নারি তাহারে, হাসিতে কি আঁখিজলে!

নাঃ, ঠাকুরপো এলো না। ক্ষেপেচে, ভা[illegible] ক্ষেপেচে! দেখি!

প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নন্দলালের বাটীর ছাদ—নীচে পথ।

(ছাদের উপর ঊষা ও সুরমা;

কাল—সন্ধ্যা; আকাশে চন্দ্রোদয়)

ঊষা।

গান।

(সখি) ভালে শশী তারা-মালা গলে
নামিছে রজনী ধরাতলে!
বহিয়া আনে কত সে প্রীতি,
অনুরাগ, মান, প্রণয়-গীতি
প্রেম কাণাকাণি সে নীলাঞ্চলে!
নামিছে রজনী ধরাতলে!
তারি পথ চেয়ে, বকুল-মালা
গেঁথেছি ধরিয়া সারা বেলা,
সে তো এলো না, এলো না, এলো না সে,
মিছে মধু-রাতি, মালা ছলনা যে,
শুধু নিরাশে ভাসাতে আঁখিজলে
নামিছে রজনী ধরাতলে!

সুরমা। উ, এসো, নীচে যাই।

ঊষা। নীচে কোথায় যাবো সু? এই মুক্ত আকাশে তলে প্রাণের বেদনা স্বর-লহরীতে ভাসিয়ে দিয়ে কি তৃ[প্তি] পাই, তা কি তুমি বুঝচো না?

হিম বলিল,—আমি কবে যাবো ?

বিজলী কহিল,—কোথায় যাবে ? তোমার বাপ-মা
ায় থাকেন, বলো। তাঁদের একটা খবর পাঠাতে
তো। তাঁদের ভাবনায় কি সীমা আছে ? ক'দিন
কে মন দিতেও পারি নি—এমন ভাবনা হয়েছিল !
মার বাবা কোথায় থাকেন, বলো—আমি এখনি
ক পাঠাই।

মহিম বলিল,—আমার বাপ-মা নেই।

—আর কে আছেন, বলো।

—আমার কেউ নেই। আপনার জন কেউ কোথাও
ই।

তার মুখের পানে নীরবে ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া
লী কহিল,—কোথায় থাকতে ?

—কোথায় আর থাকব ! আজ তিনদিন হলো সহরে
চি—আমার বাড়ী পাড়াগাঁয়ে।

বিজলী বলিল,—এখানে কি করে এলে ? আর
অসুখে কি করেই বা ঐ দোকানে সেদিন এসেছিলে ?

মহিম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল—তার
কোনো কথা ফুটিল না। বিজলী মহিমের পানে
হয়া চাহিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল—ঐ
র সরল মুখখানিতে দুর্ভাগ্য কি গভীর কালো রেখা
নিয়া দিয়াছে, অভাবের কঠিন হাত বালকের গায়ের
সটুকুকে খুলিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া হাড়গুলাকে কিরূপ
কের মত খাড়া করিয়া ধরিয়াছে ! হঠাৎ
মের স্বরে সে চমকিয়া উঠিল,—মহিম তখন তাহার
াগ্যের ইতিহাস বলিতে বসিয়াছে।

পল্লীগ্রামের এক গৃহস্থ ঘরের ছেলে সে। বাপের কথা
পড়ে না—মার কোলে মানুষ হইয়া মতামহের ঘরে
ড়িয়া উঠিতেছিল। মাতামহের অবস্থা সে কালে মন্দ
না—পাটের ব্যবসায়ে বিস্তর লোকসান দিয়া
পনার দুর্ভাগিনী বিধবা কন্যা আর নাতিটিকে লইয়া
নমতে দিন কাটাইতেছিলেন। হঠাৎ একদিন
ইহলোকের সঙ্গে সব সম্পর্ক কাটিয়া সরিয়া পড়িল।
মের বয়স তখন আট বৎসর। বৃদ্ধ মাতামহ নাতিটিকে
ড়িয়া-চাড়িয়া এত-বড় দুঃখেও মাথা খাড়া করিয়া
চাইয়া রহিল। মার একান্ত সাধ ছিল, তাঁর মহিম
খাপড়া শিখিয়া দশজনের একজন হইয়া ওঠে।
ামহ তাই মেয়ের সে-সাধ পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে
খাপড়ায় খেলাধূলায় মহিমের নিত্য-সঙ্গী হইয়া তাহাকে
মনি ভাবে মানুষ করিতেছিল। আজ মাস তিনেক
ল, বৃদ্ধ মাতামহও তাহাকে ফাঁকি দিয়া সংসার
ড়য়াছে। মরিবার সময় মাতামহ বলিয়াছিল,
লকাতায় জনার্দন চৌধুরী এক-কালে তার আশ্রিত
। আজ সে কলিকাতায় গিয়া কিসের ব্যবসা চালিয়া

বেশ নাকি দু-পয়সার সংস্থান করিয়াছে। পরিচয়
তার দ্বারে দাঁড়াইলে দুটি অন্নের অভাব তার হবে
না—লেখাপড়াটাও চলিয়া যাইতে পারে। আশ্রিত
কখনো বাবর সিংহের নাতিকে ঠেলিতে পারিবে না।

তাই দেশের বিষয়-আশয়ের বিলি-ব্যবস্থা করি
অর্থাৎ সর্বস্ব বেচিয়া মহিম কলিকাতায় আসি
শিয়ালদহ ষ্টেশনে নামিয়া এই জনারণ্যের পানে চাহি
প্রথমটা সে কেমন হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিল; তার
যখন সে ভাব একটু কাটিল, তখন জামার পকেটে হ
দিয়া সে দেখে, টাকার ছোট থলিটি কখন্ অদৃশ্য
হইয়াছে ! কাঁদিয়া কলিকাতার রাস্তা সে ভিজাই
ফেলিয়াছে—পঞ্চাশজন লোক কাতার দিয়া দাঁড়াই
প্রশ্ন নিক্ষেপ করিয়াছে—উত্তরে তার দুর্দশার কাহি
শুনিয়া ঝড়ের মতই আবার কে কোথায় সরিয়া গিয়াছে
না খাইয়া না শুইয়া সহরময় সে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে,
রাস্তা চোখে পড়িয়াছে, সেই রাস্তায় ঢুকিয়াছে, যা
সম্মুখে পাইয়াছে, তাহারই কাছে জনার্দন চৌধুরী
ঠিকানা খুঁজিয়াছে। কেহ গালি দিয়াছে—কেহ
মিনিট আকাশের পানে ঊর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকি
নিরুত্তরে চলিয়া গিয়াছে—কেহ-বা জবাব দে
নিষ্প্রয়োজন বুঝিয়া তার সে-কথা কাণেও তোলে
নাই। রৌদ্রের তাপ, ক্ষুধার তাড়না, বিনিদ্র রজনী,
দুশ্চিন্তা পরিভ্রমণ—সব কয়টা মিলিয়া তাড়াইয়া ক
যে তাহাকে এ পথে আনে, আর কেমন করিয়াই
আনিল, সে তার কিছু জানে না ! শুধু এইটুকু ম
আছে, একটা দোকানের সামনে আসিয়া সে দাঁড়াই
ছিল—জ্বরে গা পুড়িয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটি
যায় ! মাথা ঝন্ঝন্ করিতেছিল, পা আর চলিতে চাহিত
ছিল না—তারপর এক ফোঁটা জল মুখে পড়িতে—অ
এত আরামও ছিল, ঐ একবিন্দু জলে ! কিন্তু তখ
মাথা কেমন ঘুরিয়া গেল ! চোখের সামনে স
পৃথিবী ভয়ঙ্কর দুলিয়া উঠিল ! তারপর চারিধার ধোঁ
আচ্ছন্ন হইল—কিছু দেখা যায় না ! অন্ধকার,—র
রাশি অন্ধকার আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলি
তারপর ? তারপর আবার যখন চোখ মেলিয়া চাহি
তখন এই ফুলের মত কোমল শয্যা—ঐ দুটি হাত
সুমধুর স্পর্শ ! সে যেন কোন্ ইন্দ্রের স্বর্গপুরীতে আসি
পারিজাতের পাপড়ির উপর শুইয়া আছে, দেখি
আলো—আলো, ওগো, আলোয় চারিধার ভরপুর হ
গিয়াছে !

বিজলী কহিল,—এখান থেকে কোথায় যাবে ?

মহিম বলিল,—তা জানি না। জনার্দন চৌধু
খোঁজ করবো।

বিজলী কহিল—

...ার জনার্দ্দন চৌধুরীর কোন খোঁজ পাবে না তুমি, ...ক জেনো। কোন্ রাস্তায়, কি কোন্ পাড়ায় থাকে, ...ে জানা থাকলেও খুঁজে বার করা সম্ভব হতো! ...ক্, ধরো, তাকে পেলে না—তখন উপায়?

...হিমের চোখ ছল-ছল করিতেছিল। উপায় সত্যই ...ই! ইহার চেয়ে আরো দুই-চারিদিন যদি সে রোগে ভুগিত, তাহা হইলে ছিল ভালো, বাহিরের কথা ভাবিতে হইত না!

রোগীকে দয়া,—যার প্রাণ আছে সে করিতে পারে, ...াশ্রয়ও সে দিতে পারে—কিন্তু মহিম এখন সুস্থ ...ইয়া উঠিয়াছে, এখন আর তার পরের করুণার ...উপর দাবী চলিতে পারে না! এই দেবী তাহার জন্য যাহা করিয়াছেন—এই প্রচণ্ড সেবা, প্রচুর অর্থব্যয়—সেজন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে কৃতজ্ঞ থাকিবে! ..., এখন যদি ইনি বলেন,—বাপু হে, তুমি সারিয়া ...াছ, এখন নিজের পথ দেখ—তাহা হইলে তাঁহাকে ...ই দোষ দেওয়া যায় না তো। হায় রে, ইহার চেয়ে মরণই তার ছিল ভালো!

বিজলী কহিল,—তোমার জনার্দ্দন চৌধুরীকে পেলে তুমি কি চাকরি-বাকরির চেষ্টা দেখতে?

মহিম বলিল,—না। আমার মার বড় সাধ ছিল, আমি লেখাপড়া শিখি।

বিজলী কহিল,—বেশ, তাই করো।

মহিম মৃদু হাসিল, কথা বলিল না।

বিজলী বলিল,—আমি তোমার লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দেবো। তুমি পড়ো, পড়ে মানুষ হও। তোমার মার সাধ পূর্ণ হোক্।

কৃতজ্ঞতায় মহিমের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল—গদ্‌গদ কণ্ঠে সে ডাকিল,—মা—

—ছি, মা বলো না। আমায় মা বলতে নেই। আমি বেশ্যা।

জলমগ্ন ব্যক্তি কোনমতে প্রাণপণ শক্তিতে যখন কূলে ...াসিয়া উঠিয়াছে—পরিশ্রমে আতঙ্কে যখন সে একান্ত ...াতর, তখন যদি কেহ সবলে ধাক্কা দিয়া আবার ...াহাকে মাঝ-দরিয়ায় ফেলিয়া দেয়, তাহার যেমন অবস্থা ..., মহিমের ঠিক তেমনি হইল। তাহার দুর্ব্বল বুকে ... যেন সবলে মুগুর মারিল। সে বিজলীর পানে ...ইয়া চুপ করিয়া রহিল। বিজলী বেশ শান্ত স্বরে ...ল,—সেই জন্যই আর কি তোমায় অন্যত্র থাকতে ...। নাহলে আমার কাছেই তোমায় রাখতুম। কিন্তু ...হবার নয়। কল্‌কাতায় ছেলেদের পড়বার মেশ ... বিস্তর। তুমি আর একটু সেরে নাও—তারপর ...ার জন্য মেশের ব্যবস্থাই করে দেবো। তবে একটা ... ... যাতে যাবে আমি ...—

তুমি এখানে আসতে পা..., কখনো আমি নিজেও কখনো যদি তোমায় ডাক... তবু না

৬

আট-দশ দিন পরে মহিমকে স্কুলে ভর্ত্তি ... তাহাকে মেশে পাঠাইয়া বিজলী নিজেকে ব... বড় নিঃসঙ্গ বোধ করিল। পাশের বাড়ীতে হা... বাজাইয়া তাহারই মত কে-এক নারী গান গাহিে...

> ওগো, আঁধারের মাঝে আলো দেখে আ...
> ছুটিনু তাহারি পাছে,—
> যত চলি, দেখি সুদূরের আলো
> সুদূরেই রহিয়াছে!

একটা কৌচের উপর পড়িয়া ...লী এক-ম... শুনিতে লাগিল। প্রাণের মধ্যে ... বেদন... ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। সুমুখে ... ফাঁক দিয়া অনেকখানি নীল আকাশ দেখা ...। আকাশের পানে সে চাহিল। নির্ম্মল ...য় চা... উজ্জ্বল! কি সুন্দর!

তারপর নিজের ঘরের মধ্যে সমস্ত ... আসবাবের উপরও সে চোখ বুলাইয়া লই...। সমস্ত উপকরণে ঘর একেবারে ঠাশা। পা... তখনো গান চলিয়াছে—

> আলোর ভিখারী এ প্রাণ আমার
> সহে না, সহে না এ ঘোর আঁধা...!
> কোথা আলো? ওগো, অন্ধ নয়ন
> আলেয়ায় ছলিয়াছে!

বিজলীর মনে পড়িল, অতীতের কথা! সে কত... কথাই বা! আলো কি তাহার জীবনে সে পাইয় না! আলেয়ার ছলনা সার হইয়াছে! ক্ষুদ্র গণ্ডীর অভাব তার কতটুকু ছিল, আকাঙ্ক্ষাই বা ক... তারপর সেই বিবাহের রাত্রি! কম্পিত পুলকে ক... আশা লইয়া তার লজ্জা-কুণ্ঠিত প্রাণ কি আ... না সে, ভরিয়া উঠিয়াছিল! তারপর সেই সুখের রাত্রি... প্রেম-আর সোহাগের স্বপ্ন বুনিয়া চলিয়া গিয়া! সে স্বপ্ন সত্য হইয়া ফলিল না তো! ...র অকস্মাৎ সে আশার কুঞ্জটিও কি-বাজের আ... পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। এবং এক ঝঞ্ঝার ... আকা... জীবনটা এ কোন্ দিকে ছিটকাইয়া আসিয়া প... ...র কি ... সমস্ত প্রাণটাকে তোলপাড় করিয়া ভিতরে ঢেউ ছুটিল। ওগো, তার এতটুকু জীবন—অদৃষ্ট সেই জীবনকে লইয়াই ...

সুরমা। আমি আবার বুঝবো না উ? খুব বুঝচি!

উষা। তবে [illegible] স্ব?

আজ [illegible]

হার লোক অবাক হইয়া গেল। নীচেকার রোয়াকে রেবতী ছোলা ভাজা খাইতেছিল; হঠাৎ মধ্যে ভিড় ঠেলিয়া আসিল দেখিয়া তাড়াতাড়ি সে দাঁড়াইল। গঙ্গা ততক্ষণে অচেতন বালকটিকে দুজন লোকের সাহায্যে বাড়ীতে আনিয়া রাছে। কনষ্টেবলও সঙ্গে আসিয়াছিল। সে সদর-রুখিয়া ভিড় ঠেলিয়া দাঁড়াইল—গঙ্গা সদরে হুড়কো দিয়া দিল। রেবতী বলিল,—কি লা গঙ্গা? ও? কাকে নিয়ে এলি?

রূপসী তখন নীচে নামিয়া আসিয়াছে। গঙ্গাকে সে —আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে খাটের উপর শুইয়ে পৈরাগ্‌কে বল্‌, কিশোরীবাবু ডাক্তারকে এখনি ডেকে নিয়ে আসুক।

দোকানীও সঙ্গে আসিয়াছিল। রূপসী কহিল,— হয়েছিল?

দোকানী বলিল,—ছেলেটি আমার দোকানে উঠে টু জল চাইলে, আমি একটা ঘটী করে জল দিলুম। খেয়ে ছেলেটি যেমন দোকান থেকে বেরিয়েচে, অনি পড়ে গেল।

রূপসী কহিল,—তা তোমরা একটু জল অবধি মুখে তে পারো নি! এতগুলো লোক শুধু ভিড় করেই ড়িয়েছিলে!

দোকানী অপ্রতিভ হইয়া কহিল,—ব্যাপার কি— নবার জন্ম যাচ্ছি, এমন সময় রৈ-রৈ করে ভিড় জমে গল। এ একটা কথা বলে, ও একটা কথা বলে, পাঁচ কথায় কেমন থ হয়ে গেলুম মা!

কনষ্টেবল্‌কে রূপসী বলিল,—তোমরা এখন যাও। আমি ডাক্তার ডাক্‌তে পাঠিয়েচি। ওর ভার আমি নিলুম।

কনষ্টেবল আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। এখনি হাকে গাড়ী আনাইয়া থানা আর হাসপাতাল করিতে [illegible] পর করোণার্স কোর্ট অবধিও ছুটাছুটি [illegible]তে হইত। আঃ! সে ও দোকানী প্রস্থানো- [illegible] অপর লোকগুলি ছেলেটিকে উপরে [illegible]খিয়া নামিয়া আসল। তার পর সকলে একসঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

তখন রেবতী কহিল—হ্যালা বিজ্‌লী, এ আবার তোর কি খেয়াল! মাথা খেতে পরের দায় কেন ঘাড়ে নিলি?

রেবতীর পানে তীব্র কটাক্ষ হানিয়া বিজলী কহিল,—খাড় শক্ত বলে।

আধখানা-লেখা সনেট—সে এসে হাতখানি আপনার হাতে তুলে নিয়ে ডাকবে, নম্র-মধুর-মৃদু-স্বরে—সু!

গঙ্গা বলিল,—হ্যাঁ! [illegible] প্রেমের সুন্দর কল-তান! তা না

বিজলী তখন শশব্যস্তে উপরে উঠিয়া আসিল।

রেবতী অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—আঁচলের ছোলাভাজাগুলা মাটীতে পড়িতেছিল, সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপও ছিল না। বিজলী উপরে উঠিয়া গেলে রেবতী কহিল,—রূপের দেমাকে সারাক্ষণ মট্‌মট্‌ করচেন! ঢঙ্গিনী!

কল-তলা হইতে সদু, পাঁচি, হেনা, ডালিম একে-একে আসিয়া রেবতীর কাছে দাঁড়াইল, কহিল,—কি গা রেবতী দিদি? কাকে বলচো?

—ঐ বিজ্‌লী ছুঁড়ী! ছাখ্‌ না—ওলো আমার দরদী —দরদ একেবারে উথলে উঠেচে!

সদু বলিল,—হয়েচে কি?

রেবতী বলিল,—শুন্‌বি যদি তো ঘরে আয়! [illegible] বল্‌ না, ঘাড়ে ছটো মাথা আছে যে, এখানে একটা [illegible] করে শেষে থানা-পুলিশ করবে!

কৌতূহলীর দল রেবতীর সহিত তার ঘরে [illegible] ঢুকিল।

রেবতী বলিল,—একটা ছেলে বুঝি রাস্তায় [illegible] গেছলো—ঐ যে আমাদের তিনুপেশী এসে বলছিল না! তা মরি বোন্‌ নিজের জ্বালায়—কে [illegible]য় পরের [illegible] দেখতে। এখন বিজ্‌লী ছুঁড়ি গো সখের দাসী গঙ্গাকে পাঠিয়ে তাকে আনিয়ে কি না নিজের বিছানায় নিয়ে শোয়ালেন! ডাক্তার ডাকতে পাঠানো হয়েচে! তাই বলছিলুম, কেন বোন্‌ পরের দায় ঘাড়ে করচিস্‌? তা আমায় কি ঝঙ্কার না দিয়ে উঠলো!—ওঃ রূপের জাঁক এতই লো! যাবে, যাবে, ও রূপ থাক্‌বে না! আমরাও এককালে রূপের রাণী ছিলুম।

পাঁচি বলিল,—বাইজী! দুখানা জুড়ি-মটর এসে দাঁড়ায়—সেই দেমাকে একেবারে কাকেও চোখে দেখতে পায় না! সেদিন আমি গেছলুম, একটা টাকা ধা[র] করতে। টাকাটা ফেলে দিয়ে বলা হলো,—ধার আবা[র] কি! ও আর তোমায় দিতে হবে না। আমরা যে[ন] ভিখিরী। টাকা কখনো চক্ষেও দেখি-নি!

রেবতীর ঘরে কমিটি যখন দস্তরমত জমিয়া উঠিয়াছে বিজলীর ঘরে বিজলী তখন সেই মূর্চ্ছাহত বালকটি[র] মাথায় অডিকলোঁ ঢালিয়া পটি টিপিয়া বসিয়াছিল কাছে দাঁড়াইয়া গঙ্গা পাখায় বাতাস করিতেছিল ছেলেটি একবার চোখ চাহিয়া আবার চক্ষু মুদি[ল]। বিজলী কহিল,—গা কি রকম গরম দেখচিস্‌!

মাথায় হাত দিয়া গঙ্গা বলিল—[illegible]

[illegible] মহাঁচি

...প্রাণের ভিতর কি জানো! ওকে ... পড়ে ... করো!

জনার্দ্দন চৌধুরীর কোন খোঁজ পাবে না তুমি, তুমি এখানে ...ব ডাকবো।

...বিজলী হাঁকিল,—গঙ্গা! স্বর মৃদু হইলেও তাহাতে বাজের হুঙ্কার ছিল। বিজলীর চোখের ভঙ্গী দেখিয়া গঙ্গা শিহরিয়া থামিয়া গেল।

৩

ডাক্তার আসিয়া আর্ত্তি জানাইয়া বলিলেন, জ্বরটা খারাপ। হাসপাতালে পাঠাইলে ভালো হয়—নহিলে এত ঝঞ্ঝাট সহা ইত্যাদি।

বিজলী কহিল,—সে জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনি ঝঞ্ঝাট সইতে না পারেন, বেশ, অন্য ডাক্তার আনাবো'খন!

অপ্রতিভ হইয়া ডাক্তার কহিলেন,—না, না,—তা নয়। আমার আবার ঝঞ্ঝাট কি! আমার তো কাজই এই। তবে যে রকম তদ্বির দরকার, তাই ভয় হয়, আপনার এখানে করবে কে!

বিজলী বলিল,—আমাকে নেহাৎ মোমের পুতুল ভাববেন না, ডাক্তার বাবু। রোগীর সেবা আমার নেহাৎ অজানা নয়। একদিন...

কথাটা বিজলী শেষ করিল না। একটু থামিয়া সে ...লিল,—যাক্ ও-সব বাজে কথা। আপনি ওষুধ-...ত্তরের ব্যবস্থা করে দিন্। কি কি করতে হবে, বলে ...ন্। আর যখনই আপনি দরকার বোধ করবেন, ...খনই আসবেন। আপনার টাকার জন্য ভাববেন না। ...লন তো, আগাম ...শো টাকা না হয় রেখে দিন্।

...সহরে তখন বিজলীর খুব পশার। বিজলীর রূপ, ...জলীর কণ্ঠ, বিজলীর নৃত্য-ভঙ্গী কলিকাতার সৌখীন ...াজে আগাপের একটা মস্ত সামগ্রী। যে-বাগানে ...লীর পদার্পণ হয় না, সে বাগান বাগানই নয়! ...র মুখের একটুখানি হাসির দামে বিজলীর কাজ করিতে ...কের ভিড় বাধিয়া যায়। সেই বিজলী এমন ...রভাবে সাহায্য চাহিতেছে, তাহাও নগদ দাম ...,—ডাক্তার বাবু আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া ...লেন,—বেশ, আমার যথাসাধ্য আমি করবো। টাকা ...ই দেবেন—টাকার জন্য এত ব্যস্ত হবার দরকার ...!

...ঔষধ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার বিদায় লইলে ...ী ছেলেটির সেবার ভার লইয়া তাহার শিয়রে ...া বসিল।

...া বলিল,—একেবারে খেয়ে নিলে হতো না?

...লী কহিল,—আমি এখন খাবো না। তুই যা, ...জ কেলের ব্যবস্থা...

গঙ্গা চলিয়া গেল। বিজলী রোগীকে ঔষধ খা... দিল। ফৈরাগ, বরফ ও আইস্-ব্যাগ লইয়া আ... বিজলী আইস্-ব্যাগে বরফ পুরিয়া রোগীর মাথায় ধরি...

হঠাৎ বাহিরে ডাক পড়িল,—বিজু—

বিজলী কাণ পাতিয়া খাড়া হইয়া বসিল ম... উঠিল না।

আবার ডাক পড়িল,—বিজু, ও বিজু!

সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গা আসিয়া ঘরে ঢুকিল, বলিল—দি... মণি, জহরবাবু এসেচেন!

জহরবাবু জবরমাটীর জমিদার। এ-পাড়ার ... বদান্যতার ভারী সুখ্যাতি। তাঁর আঙুলের আ... আঙটির জলুশে চারিধার যেমন ঝলমল করিয়া উ... তেমনি নামের রশ্মিতেও এ-পাড়া উজ্জ্বল হি... কলিকাতায় কয়টা থিয়েটারে তাঁর একটা করিয়া ... বারো মাস রিজার্ভ আছে। মোসাহেব ও বিলাসি... পরিবৃত হইয়া জহরবাবু যেদিন থিয়েটারে পদার্পণ ক... সেদিন থিয়েটারের প্রোপ্রাইটার ম্যানেজার সা... তটস্থ হইয়া বক্সের পাশে-পাশে ঘোরেন। থিয়েটা... প্লাকার্ডওয়ালার বেনিফিট-নাইটেও জহরবাবুর ... এক'শো টাকার রয়েল-বক্স বাঁধা বরাদ্দ আছেই! ... ছাড়া কলিকাতার এই পল্লীর সর্ব্বশ্রেণীর ব্যক্তির ... প্রকার আবেদন জহরবাবুর কাছে সংরক্ষিত হয়। এ... জহরবাবুও বিজলীর ঘরের দ্বারে আসিয়া প্রবেশের ... সসম্ভ্রমে অনুমতি ভিক্ষা করেন।

জহরবাবুর প্রকাণ্ড মোটর আসিয়া বাড়ীর ... থামিতে গঙ্গা আহার ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়... আসিয়া দেখে, জহরবাবু তখনও প্রবেশের অনুমতি ... নাই, তাই দ্রুত সে কর্ত্রীর কাছে আসিয়া জহর... আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। বিজলী কহিল,— বলে দে, আজ গান হবে না।

গঙ্গা অবাক্! হঠাৎ যদি সমস্ত পৃথিবীখানা সেই ... উল্টাইয়া গিয়া আকাশটা পায়ের তলায় লুটাইয়া ... তাহা হইলেও গঙ্গা এতখানি বিস্মিত হইত না। ...হয় ...বিল, হয় দিদিমণির, নয় তার একজনের শুনিবার ভুল হইয়াছে। তাই সে আবার ব... জহরবাবু এসেচেন গো দিদিমণি!

বিজলী কহিল,—এসেচেন, তা কি! নাচ... যেতে বলে দে—আজ আমার রঙ্গ করবার সময় নেই! দেখচিস নে?

গঙ্গা যন্ত্রচালিত মূর্ত্তির মতই বাহিরে আসিল। প্রকাণ্ড ভুঁড়ি দুলাইয়া জহরবাবু বলিলেন,—ওরে কেউ

সুরমা। আমি আবার বুঝবো না উ? খুব বুঝচি!
উষা। তবে আমাকে নীচে যেতে বলচো কেন, সু?
আজ আর এলো না, এত সাধের মালা-গাঁথা বিফল
না! (হাওয়া পাওয়াও যেমন চাকতে এ কি করবো?
হারাইতেও চোখের পলক পড়ে না! সে খুব
প ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল। তারপর বলিল,—
ভেতরে যাও গো দাদাবাবু। ছাখো না এই এক
মি! এক-বাড়ী লোক সকলে ছি-ছি করচে, তা
ও নেই!
হরবাবু কহিলেন,—যাবো? তাঁর চোখে অত্যন্ত
দৃষ্টি!
ঙ্গা বলিল,—যাবে না তো কি! একেবারে অজ্ঞান!
য় দেখলে তবু যদি জ্ঞান হয়!
শ্বাস পাইয়া জহরবাবু ধীরে ধীরে তখন কক্ষে
করিলেন। বিজলী টেম্পারেচার দেখিতেছিল।
চোরের মত জহরবাবুকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সে
—কে?
-আমি!
হরবাবুর স্বর একেবারে গোবেচারী ভিখারীর মত,
তায় ভরা! সে স্বরে পাষাণও গলিয়া যায়।
র ঘাড়ে ভূত চাপিয়াছিল; সে গলিল না,
একটু রূঢ়স্বরেই বলিল,—যেতে বলে দিলুম

-আমি যাচ্ছি, বিজু! কাতর দৃষ্টিতে জহর বিজলীর
চাহিলেন। বিজলী সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই
,—গঙ্গা—
ঙ্গা আসিল। বিজলী কহিল,—খানিকটা বরফ
দে দেখি,—তারপর আমার দেরাজ খুলে একখানা
তায়ালে বার করে আমাকে দিয়ে যা।
গা ভাবিয়াছিল, না জানি, কত ভর্ৎসনাই তাহাকে
ত হইবে! তাহার পরিবর্তে এই সামান্য ফরমাশে
কবারে বর্তাইয়া গেল। গঙ্গা তাড়াতাড়ি ঘর
বাহিরে আসিয়া নিশ্বাস ফেলিল...
হরবাবু কহিলেন,—একটা নার্স আনিয়ে দেবো

কোনো দরকার নেই।
না হলে তোমার কষ্ট হবে যে। শেষে কি একটা
পড়বে!
জলী সে কথার কোন জবাব দিল না।
হরবাবু একবার চারিদিকে চাহিয়া খাটের নিকটে
আসিলেন; বিজলীর পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া
লন,—বিজু, তুমি দেবী!
বিজলী একটু হাসিয়া বলিল,—আপনি আজ বাড়ী
এ ক'দিন আমি একটু [illegible]

আধখানা-লেখা সনেট—সে এসে হাতখানি আপনা
হাতে তুলে নিয়ে ডাকবে, নম্র-মধুর-মৃদু-স্বরে—সু
সহসা প্রাণে ঝঙ্কার দেবে প্রেমের সুদূর কল-তান! তা
এসে বলবে, চাপকানটা রাখো, জলখাবার কোথায়?
খাবার জল দাও, একটু বাতাস করো, গামছাখানা
[illegible] ...tric প্রাণে সহ্য হয়?
কয়ে কি সাহেব-ডাক্তার আনা [illegible]
গঙ্গা বরফ ও ধোপ-দোস্ত তোয়ালে লইয়া
আসিল। বিজলী সেগুলির ব্যবস্থা করিয়া গঙ্গাকে বলিল,
—বাহিরে আলো জেলে দে—জহরবাবু নীচে যাবেন।
এ-কথার পর আর দাঁড়ানো চলে না। যদি বিজলী
রাগ করে! চিরকালের মত যদি একটা বিচ্ছেদ ঘটিয়া
যায়! জহরবাবু এক-পা এক-পা করিয়া ঘরের বাহির
হইলেন, দারুণ বেদনার ভারে পীড়িত হৃদয় লইয়া;
গঙ্গা পিছনে পিছনে চলিল।
রাগে সে গর্-গর্ করিতেছিল। আজিকার মত
তার পাঁচ পাঁচ টাকা বখশিসটাই মাটী হইয়া গেল।

৪

পরের দিনের কথা বলিতেছি।
সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঘরে আলো জ্বলিতেছে।
খাটের পাশে একটা টিপয়ের উপর আঙুরের বাক্স, বেদানা,
এই-সব আছে। বিজলী একটা মেজ্যর গ্লাসে বেদানার
রস ছাঁকিয়া বাহির করিতেছিল। হঠাৎ অচেতন ছেলেটি
পাশ ফিরিয়া ডাকিল,—ও মা, মা গো—
বিজলী চমকিয়া রুমাল ও বেদানা রাখিয়া বিছানায়
রোগীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। মাথার পটিতে ছেঁড়া
কাণির টোসা করিয়া ওডি-কলোঁ ঢালিয়া রোগীর মুখের
কাছে মুখ লইয়া ঝুঁকিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।
ছেলেটি বড় রকমের একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আবার
চাহিল—পরে তাহার শীর্ণ ক্ষীণ দৃষ্টিতে যতখানি-সম্ভব
বিস্ময় ঢালিয়া চারিধারে তাকাইয়া... সেবা
তাহার সার্থক হইয়াছে তবে! এ-যাত্রা ছেলেটি তবে
বাঁচিয়া গেল।
বৈকালে ডাক্তার আসিয়া বলিয়া গিয়াছিল, সন্ধ্যা
নাগাদ জ্ঞান হওয়া সম্ভব। যদি না হয়, তবে রক্ষা করা
দায়। এই যে, জ্ঞান হইয়াছে—আঃ!
স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বিজলী মেজ্যর গ্লাস আনি
ছেলেটির মুখে ধরিয়া বলিল,—খেয়ে ফেলো দিকিন!
ছেলেটির তরফ হইতে কোনরূপ সাড়া পাওয়া
না। বিজলী আবার কহিল,—খাও, এটুকু
ফেলো। লক্ষীটি!

র জনার্দ্দন চৌধুরীর কোন খোঁজ পাবে না তুমি, তুমি
... ...পালাচের উপর
... ...হল, বিজলী হাত দিয়া সযত্নে চুলগুলি
সরাইয়া দিয়া কহিল,—খাও এটুকু, লক্ষ্মী ছেলে।

মমতার এমন কোমল সুর—আঃ! এ জীবনটা সত্যই যদি সত্যের না হইয়া এমনি স্বপ্নের হইত!

বিজলী আবার বলিল—খাও।

না, এ স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন নয়! এমন সুর স্বপ্নের বীণাতেও বাজে না তো!

রোগী আবার চোখ চাহিল, চাহিয়া চোখে যাহা দেখিল, সত্যই তাহা বিশ্বাস করিবার মত নয়! এক অপূর্ব্ব ভাবে হৃদয় তার ভরিয়া উঠিল,—মুখ হইতে আপনা-আপনি একটা স্বর ফুটিয়া বাহির হইল,—মা—

বিজলীর সমস্ত শরীর চন্‌চন্‌ করিয়া উঠিল—যেন এক জলন্ত বিদ্যুৎশিখা মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত চকিতে ছুটিয়া গেল। অপ্রতিভ হইয়া বিজলী কহিল—ছি, আমায় মা বলো না, বলতে নেই।

দুই ফোঁটা জল রোগীর চোখের কোলে গড়াইয়া পড়িল। সে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করিয়া বিজলীর পানে চাহিয়া রহিল—কোনো কথা কহিল না। করুণাময়ী নারী—
এ কে!

বিজলী কহিল,—এই বেদানার রসটুকু খেয়ে ফেলো।

রোগী ছোট শিশুর মতই বেদানার রস গলাধঃকরণ করিল।

বিজলী কহিল,—এখন কোনো কষ্ট হচ্ছে?

রোগী কহিল,—বড় কাহিল বোধ করচি।

—না।...আর কোনো কষ্ট নেই। দুদিনেই সেরে উঠবে'-

—না। কিছুক্ষণ ঘরের চারিদিকে আপনার বিস্মিত বুলাইয়া লইয়া রোগী আবার বলিল,—আমি কোথায় আছি?

বিজলী কিছু বলিল না। কি বলিবে সে? এত-ধরিয়া আমোদ-প্রমোদ ও বিলাস-লীলার মধ্যে যা যে-ঘরকে সে ঘর বলিয়া মনে করিয়াছিল, আজ ঘরই তাহার কাছে এমনি বিশ্রী, কদর্য্য শ্মশানের ঠেকিল যে, সে ঘরের পরিচয় দিতে তার আজ এই লজ্জা বোধ হইল।

...লটি আবার বলিল,—আপনি কে?

আমি? বিজলী থমকিয়া গেল। তাই তো—কি ... কহিল,—আমি এমনি-একজন স্ত্রী-
... বলিল,—একেবারে খেয়ে নিলে হতো না?

বিজলী কহিল,—আমি এখন খাবো না। তুই যা,
... ...
...র জন্ত মেশের ব্যবহার ...

...প্রাণের ভিতর
...জানো!
—আমি এখানে কি করে এলুম? ...ল করো!
—সে অনেক কথা। আগে সেরে ওঠো, তা শুনো'খন। এখন তোমার নামটি কি, আমায় দিকি!

—আমার নাম মহিম।

৩

তিন-চারদিন পরে মহিম পথ্য পাইয়া উঠিয়া ব... সারাদিন ঘরের মধ্যে পড়িয়া বাহির হইতে যে বি... কণ্ঠের বিচিত্র সুর তার কানে আসিয়া লা... তাহা শুনিয়া সে অবাক্‌ হইয়া যাইত। বাহিরের কলরব, ঐ সব হাসি-গল্পের তরঙ্গ তাহার প্রাণে অত... কৌতূহল জাগাইয়া তুলিত। আরো কৌতূহল জম্মি... উঠিত, এই তার প্রাণ-রক্ষয়িত্রী করুণাময়ী নারীটিকে ঘেরিয়া! ঘরের আসবাব-পত্র বেশ দামী,—কৌচ আয়না, সোফা, কাঁচের ফুলদানী,—এ-সব জিনিষ মহিমের চোখে সম্পূর্ণ নূতন! এ-সবের যিনি অধিকারিণী, তাঁর রূপের সীমা নাই, বয়স অল্প,—লোকের মধ্যে ঐ একটা দাসী আর দুইজন ভৃত্য! ইহাদের ছাড়া আর কোন পুরুষমানুষকে সে এ কয়দিন চক্ষে দেখে নাই! ডাক্তার নিত্য আসিতেছে তাহাকে দেখিতেছে। কথাবার্ত্তা, দেনা-পাওনা যাহা-কিছু হইতেছে, ঐ কিশোরী রমণীর সঙ্গে! রোগশয্যায় পড়িয়া মহিম আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিতে থাকে—কিন্তু ভাবিয়া কোথাও থই পায় না!

আজ খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া বিজলী আসিয়া ভিজা চুলগুলা এলাইয়া দিয়া বসিতেই প্রকাণ্ড আয়নায় ছায়া পড়িল। আপনার চেহারাখানি দেখিবার অবসর ... আজ এই প্রথম মিলিল। এ কয়দিন রূম-রুক্ষ রবিয়া চেহারাকে সাজাইয়া তুলিবার কথা তার মনেও হয় নাই। বিজলীর মনে হইল, না হোক, কিন্তু এই রুক্ষ শুষ্ক বেশে তাহাকে আরো মানাইয়াছে,—সর্ব্বশরীরে রূপ যেন একেবারে উথলিয়া উঠিয়াছে! হায় ... এই রূপই কাঁটার চাবুক মারিয়া কোথা হইতে কোথা... তাহাকে আনিয়া ফেলিয়াছে! আগে যেখানে ছিল, আ... আজি যেখানে সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—এই দুই জায়গা... মধ্যে কত দীর্ঘ ব্যবধান কোথা হইতে পড়িয়া উঠিয়াছে... এ-পার হইতে আজ সেই ও-পারের দিকে চাহিতে ... ঠিক্‌রিয়া পড়ে! ও-পার আজ চোখের সামনে একেবারে ঝাপ্‌সা অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে! হঠাৎ মহিমের পানে বিজলীর চোখ পড়িল—মহিম একদৃষ্টে তাহারই মুখের ...
প্রকাণ্ড ভুঁড়ি দুলাইয়া ... বিজলী চোখ নামাইয়া আবার ...

সুরমা। আমি আবার বুঝবো না উ? খুব বুঝচি!

উষা। তবে আমাকে নীচে যেতে বলচো কেন, সু? আজ আর এলো না, এত সাধের মালা-গাঁথা বিফল না! (হাতের মালা নাড়িয়া-চাড়িয়া) এ কি করবো?

সুরমা। রেখে দাও, বিছানার ধারে রেখো, তবু টু মদির গন্ধে তোমার সন্তপ্ত প্রাণ শীতল হবে।

উষা। শীতল হবে! এ প্রাণ শীতল হবার নয়, কুন্তলা পদ্মপত্রে শয়ন করে বিরহতপ্ত দেহ চন্দনসিক্ত ও ত শীতল হয় নি—আর আমার প্রাণ এ ফুলের শীতল হয়ে যাবে? কেন, সু, আমি কি তাদের য় নীচে? আমার হৃদয়ের প্রগাঢ় প্রণয় কি তাদের য়ে কম? সেই বাপীতটে, মন্দিরের শুভ্র মর্ম্মর অলিন্দে গিণীর ঝঙ্কারে আমার প্রাণে প্রেমের সঞ্চার—না সু, মি এ মালাগাছি আমার আকুল কবরীতে গেঁথে দাও!

সুরমা। (তথাকরণ)

উষা। এখন একবার সে ব্যক্তিতের ধ্যান করি! াহা, কি ললিত কণ্ঠস্বর—কি মধুর নাম! সু—সু—কুমার! সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুতের লহর বয়ে গেল। তাই সুকুমার!

সুরমা। এখনো গোঁফের রেখাটি দেখা দেয় নি, মলের মত কোমল মুখখানি!

উষা। আর, কি মধুর গান! আজ এলোনা; সু, ামনে বসন্ত! এ বসন্তে কি গান হবে না? কেমন করে াটবে?

সুরমা। তাইতো!

উষা। তুমি কেমন করে আছো, সু?

সুরমা। আর বলো না। উঃ, চিত্ত-চকোর মাঝে াঝে বড়ই চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে সুধাকরের জন্য উদভ্রান্ত য়। কিন্তু উ—

উষা। কি সু?

সুরমা। সে আমার নিকুঞ্জ নয়, সে তো প্রমোদ-বন নয়—সে পাড়াগাঁয়ের মশক-মুখরিত সামান্য একখানি বাড়ী—আর তার ভিতর ছবি নেই, গান নেই, lyric নেই, মলয় নেই, কড়ি নেই, কোমল নেই, আর নেই জ্যোৎস্না; আছে শুধু রান্নাঘর আর হিমালয়-প্রমাণ কাজ!

উষা। বলো কি সু?

সুরমা। তাইতো উ—মনের বেদনায় সারা হচ্ছি! কোথায় জ্যোৎস্না-রাত্রে বাতায়নে তার প্রতীক্ষা করে বসে থাকবো—

উষা। হাতে থাকবে অপরাহ্নের নয়ন-জলে গাঁথা…

সুরমা। মালাগাছি! পরণে থাকবে বসন্তী রঙের রেশমী বসন—উড়তে থাকবে মুখের চারিধারে চূর্ণ-কুন্তল—পাশে পড়ে থাকবে কালি, কলম, আর আধখানা-লেখা সনেট—সে এসে হাতখানি আপনা হাতে তুলে নিয়ে ডাকবে, নম্র-মধুর-মৃদু-স্বরে—সু সহসা প্রাণে ঝঙ্কার দেবে প্রেমের সুদূর কল-তান! তা ন এসে বলবে, চাপকানটা রাখো, জলখাবার কোথায়? প ধোবার জল দাও, একটু বাতাস করো, গামছাখান কোথায়! তা কি উ, এ lyric প্রাণে সহ্য হয়?

উষা। আহাহা, বলো না, সু, আর বলো না। এমন নিষ্ঠুর পাষাণ কে সে?

সুরমা। সে আমার বিবাহিত পতি—কলেজের প্রফেশার—শেলি-টেনিসন নাড়াচাড়া করেও একটী নিরেট গণ্ড! তার পর—

উষা। আর কি, সু?

সুরমা। উঃ, সে কথা মনে হলে অজ্ঞান হয়ে পড়ি আমাকে বলে, বসে কেন? রান্নাটা চাপিয়ে দাও না! আমি হতাশ-ভাবে আকাশের পানে চাই, দর-বিগলিত ধারে কপোল বেয়ে আমার অশ্রু ঝরে, তবু সে নিষ্ঠুর পাষাণের দয়া হয় না! উনুন-গোড়ায় বসবার জন্যই বি এমন সাধের কোমল রমণী-জন্ম! কলেজের শিক্ষাদপে স্ফীত হয়েছি? উঃ!

উষা। ওহোহো—থাক্—থাক্—এখন আমার কি হবে, সু?

সুরমা। উ!

উষা। কেন সু?

সুরমা। একটা কথা মনে পড়লো—চলো, নীচে নেমে যাই।

উষা। কেন? এমন চন্দ্রালোকিত ছাদ—

সুরমা। না ভাই, সন্ধ্যার পর ছাদে থাকতে ভ করে—ঐ পাশের বাড়ীর ছেলেটা সেদিন মারা গেছে—উঃ, আমার গা ছম্‌ছম্ করচে—এসো ভাই, নীচে যাই!

উষা। অদৃষ্টের ক্রূর পরিহাস! একটু কাত নিশ্বাসে গান গাইবো, একটু যে জ্যোৎস্নায় ব soliloquy করবো, একটু কবিতা করবো, তা'ও নির্দ্দ বিধাতার সহ্য হয় না! কতকগুলো ভূত-প্রেতের উপদ্রবে রাজধানীটাকে বিভীষিকায় ভরিয়ে রেখেছে! আমাকে ধরো সু—আমার ভয় করচে—কেন, ও কথা মনে ন করিয়ে দিয়ে তুমি নীচে যেতে বললে না?

সুরমা। এসো, হাত-ধরাধরি করে নীচে যাই!

উষা। ওহোহো—এমন চাঁদনী রাত!

সুরমা। এত সাধের মালা-গাঁথা!

উষা। সবই বিফলে গেল! ওঃ!

সুরমা। আঃ!

উভয়ের প্রস্থান

পথে বিনয় ও ছাদের দিকে চাহিতে-চাহিতে সুকুমারের প্রবেশ

সুকুমার। যাঃ, নেমে গেছে! আঃ, বরাত ছাখো! এ সময় ছাদে একটু বসে, তাই খপ্ করে হেদোর ধার থেকে চলে এলুম। তা নেমে গেছে। আহা, তবু দু'দণ্ড দেখতুম!

বিনয়। তুমি যে পাগল হলে হে দেখচি। তোমার আর তর সয় না! আরে, বিয়ে—হবে, হবে!

সুকুমার। না বিনু, তুমি জানো না—আমি যে কি কষ্ট সহ্য করচি!

বিনয়। তা বিলক্ষণ বুঝচি—না হলে তুমি পাষণ্ড হোটেলে গিয়ে সেদিন পয়সাগুলো বাজে খরচ করে এসো। পাতে বিলকুল সব ফেলে এলে! মাংসর হাড়-খানা পর্য্যন্ত চিবিয়ে চুর্ করে ফেলতে, আর সেই-তুমি কিনা সেদিন এক-খানা মাংস মুখে করলে না!

সুকুমার। (উপরের দিকে চাহিয়া) নাঃ; আজ ছাদে ওঠবার সম্ভাবনা নেই; দূর থেকে দেখলুম, নেমে যাচ্ছে; ওঃ, আজ সমস্ত দিনেও একটিবার দেখতে পেলুম না!

বিনয়। পাগলামি করো না; রাস্তার লোকে কি মনে করবে বলো তো?

সুকুমার। বিনু, তুমি না হয় বাড়ী যাও আজ। আমি খানিকক্ষণ এইখানে পায়চারি করি। বল কি, আজ একটিবারও দেখতে পাইনি। বিকেলে ছাদে উঠলুম, দেখা হলো না! ভূতোটা দুপুরবেলা জ্বালাতন করতে এসেছিল, একরাশ পদ্য লিখেচে, তাই পড়ে হত-ভাগা আমার দুপুরবেলাটা মাটী করে দিয়ে গেছে। নাহলে সে সময় ছাদে চুল শুকোতে ওঠে, সে সময়ও একবার-না-একবার দেখা পাই—

বিনয়। তুমি হাসালে ভাই, লোকে শুনলে তোমাকে কি মনে করবে বলো দেখি!

সুকুমার। আচ্ছা বিনু, তোমার কি মনে হয়, আমাদের মিলন সম্ভব?

বিনয়। নাঃ, তুমি বড় বাড়িয়ে তুললে! ওহে, এটা প্রেমে পড়বার বয়স নয়, সে বয়স উৎরে গেছে! ১৬।১৭ বৎসর বয়সেই বাঙালীর ছেলে প্রেমে পড়ে, নূতন পদ্য লিখতে শেখে, একজামিনে ফেল হয়, তার পর বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যায়। বাঙলা উপন্যাস কি কিছু পড়োনি? একদম নিরেট! আরে—উপন্যাসের মতে প্রেমে পড়বে, অথচ তার বয়সটা মানবে না? ও কি, হাঁ করে ওপর দিকে চাইছ যে?

সুকুমার। ঐ যে ঘরটায় আলো জ্বাললে না! সে কি খড়খড়ির ধারে আস্বে না?

বিনয়। (সুকুমারকে সবলে আকর্ষণ করিয়া) দেখ, সত্যি বলচি, আমি তা হলে তোমাদের মিলনে ব্যাঘাত ঘটাবো আর নন্দবাবুকে এমনি ক্ষেপিয়ে দোবো যে, সে কিছুতে তোমার হাতে মেয়ে দেবে না!

সুকুমার। না, না, তুমি কি বলচো, বল না!

বিনয়। আমার কথায় জবাব দাও—কদিনে development কেমন হলো? বুলির অসুখের জন্ম কদিন হুগলি গেছলুম, আজ বিকেলে যদি তোমাকে করায়ত্ত করলুম, তো একদম বেহুঁস! কদিন দেখিনি, আর অমনি ঘাড়মোড় গুঁজড়ে প্রেমিক হয়ে দাঁড়িয়েচো। ইস্, বাবুর সিঁথির তরঙ্গ কিন্তু এলোথেলো হয়নি! ভণ্ড প্রেমিক, চুল আঁচড়াতে ত একটু ভুল হয় নি! এই বুঝি তুমি প্রেমে পড়েছ! Nonsense! তা যাক্, এখন বলো, বাগানের interviewর পর কেমন দাঁড়িয়েচে?

সুকুমার। বৌদি গানে তার মন হরণ করেচে, আর আলষ্টার, পরচুলার জোরে নিজেকে সুকুমার বলে চালাচ্ছে।

বিনয়। তার পর দেখাসাক্ষাৎ হয়েচে?

সুকুমার। হ্যাঁ—রোজই দুপুরবেলা বৌদি গাড়ী করে ঐ সাজে সেজে এখানে আসে। ঊষা বৌদির প্রেমে এমন উন্মত্ত যে, বৌদিকে সে সুকুমার বলে জানে!

বিনয়। তার পর unmasked সুকুমার কবে আসরে নাম্‌চেন?

সুকুমার। সে বৌদি ঠিক করে দেবে! বলে, একদিন সুবিধামত বাগানবাড়ীতে নিয়ে গিয়ে dramatic ভাবে ভাব করিয়ে দেবে, রোগটা সারবার দেরী নেই।

বিনয়। নন্দবাবু সব জানেন?

সুকুমার। পরচুল, সুকুমার—এ সব জানেন না বটে, জানেন তোমার দিদিই রোজ আসচেন!

বিনয়। হুঁ! একেবারে নভেল! তা তবু তুমি এমনি ক্ষেপেচো?

সুকুমার। ছাখো ভাই, যখন এতদূর আশা পাওয়া গেছে, তখন মন আর ধৈর্য্য মানে কি?

বিনয়। বটেই তো! মোদ্দা যা কাণ্ডখানা করলে—বিয়েটা হয়ে যাক্ না, আমি সমস্ত লিখে কাগজে ছাপিয়ে দেবো।

সুকুমার। সে idea কি আমারি strike করেনি হে! আমি ত একটা মিলনান্ত অপেরা লিখে ফেলবো ঠিক করেচি।

বিনয়। বহুৎ আচ্ছা! এমন আটা-বাঁধা সজাগ প্রেমিক কিন্তু দেখা যায় না। উপন্যাসের প্রেমিক আর সত্যি প্রেমিকে এইখানে তফাৎ! সত্যি প্রেমিক খালি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, জলে ডুবে মরতে চায়

...tical দিকে একটুও মাথা খেলে না, একটি ...ট গোবর-গণেশ তৈরি হয়—আর সত্যি প্রেমিক ...ন আরামে থাকে—কাব্যি-বক্তৃতা ঝাড়ে, নায়, খায়, ...ঁচড়ায়।—অর্থাৎ তার পাণ থেকে চুণটুকু অবধি না!

দুইজন লোকের প্রবেশ

১। অমন লোকের ছেলে—আজ কি দশা দেখ!

২। ছিঃ ছিঃ, বড় লোক হলে কি লজ্জা-সরম ...বারে যায়? মান-সম্ভ্রমে জলাঞ্জলি!

আর একজন লোকের প্রবেশ

৩। কে হে? কার কথা বলচো?

১। ঐ হেমন্ত দত্ত!

৩। কি হয়েচে? কোন্ হেমন্ত দত্ত?

১। এই যে এই গলিতে থাকে—ঐ মস্ত গেটওলা ...খানা।

বিনয়। তোমার দাদার কথা বলছে না, সুকু?

সুকুমার। হ্যাঁ—চুপ্—শোনা যাক্ না—কি বলে!

৩। তা কি হয়েচে?

১। হবে আর কি—যে কাজের যা ফল!

৩। সে আবার কি হে?

২। হাঃ, বল কেন? একটা বাইজী নিয়ে মাণিক ...লের বাগানে চুনি চন্দরের সঙ্গে মারামারি—সে একে-...র ভয়ানক কাণ্ড! হেমন্ত দত্তর সহিস্-কোচম্যানকে ...কবারে জখম করে দিয়েছে—আর বাবুকেও ছাড়েনি ...দেখে এলুম, ঐ মাণিকতলার পোলের ধারে, রাস্তায়, ...ড়া কাপড় ছেঁড়া জামায় দাঁড়িয়ে রয়েচে।

সুকুমার। হেমন্ত বাবু দাঁড়িয়ে আছেন, মশায়?

বিনয়। কে মারলে?

২। চুনি চন্দর আর কার্ত্তিক মিত্তিরের লোকেরা।

বিনয়। হেমন্তবাবুকে কেউ দেখলে না?

২। কে দেখবে মশায়? আপনিও যেমন! হেমন্ত ...র ইয়ারগুলোকে কার্ত্তিকের লোকেরা ঐ মাগীটার rough দিয়ে হাত করেচে—বাগানে আজ দুপুর ...লা party হয়েছিল; হেমন্ত দত্ত মাগীটাকে বাগাবার ...ষ্টা করে, তা মাণিক পাল আর কার্ত্তিক মিত্তির ...পমান করে, তাই হেমন্ত দত্ত ঘোড়ার চাবুক নিয়ে ...দের তেড়ে যায়!

৩। এমন কাজও করে! মাণিক পালের বাগান! ...র, চুনি চন্দর একটা মাতাল গুণ্ডা! খুব ঠেঙিয়েচে!

সুকুমার। হেমন্ত বাবু কোথায় গেলেন?

২। মাণিকতলার পোলের ধারে দেখে এলুম ...শায়—

বিনয়। সুকু, ছুটে এসো।

সুকুমার। এ আবার কি বিপদ—চলো!

বেগে উভয়ের প্রস্থান

১। এঁরা বুঝি আলাপী বন্ধু হবে!

২। হবে!

৩। এ কি বড়মানুষি রে, বাবা! মেয়েমানুষ নিয়ে এমন বেলেল্লা-গিরি! হাঃ, তোর বড়লোকের কাঁথায় আগুন!

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

হেমন্তর অন্তঃপুরস্থ দরদালান

অঞ্চলবদ্ধ চাবির গোছা নাড়িতে-নাড়িতে লাবণ্যর প্রবেশ

লাবণ্য। রাত হয়ে গেল, এখনো এদের কারো দেখা নেই যে! আজ আমার প্রাণটা কেমন অস্থির হয়ে রয়েচে। উষাদের বাড়ী যেতে পারলুম না। ঠাকুরপোর বেড়িয়ে ফিরতে এত দেরী হয় না। এঁর জন্যও আজ মনটা কেমন করচে! সেই যে সকালে বেরিয়েচে, বললে, বাগানে চড়িভাতির বন্দোবস্ত হয়েচে; অন্যবার এমন হলে বিকেলে ফিরতো! কিন্তু রাত ন'টা বাজে, এখনো দেখা নেই? ঠাকুরপোও আসচে না,—কেন, কিছু বুঝতে পারচি না! মনটা যেন কোথাও ছুটে যেতে চাইছে—কিছু ভালো লাগচে না। (ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া) দূর হোক্, কেন ভাবি? আমি তো কখনো কারু মন্দ করিনি, তবে আমার ভয়ই বা কিসের, ভাবনাই বা কিসের?

গান

সুন্দর হে এস ফিরে!
চিরদিবসের সুখ-দুঃখের রচিত নীড়ে!
দিবস-যামিনী নিতি, ফুটায়ে রেখেছি প্রীতি,
তোমার পূজার অর্ঘ্য-কুসুম, মনো-মন্দিরে!

নাঃ, গান যেন আজ ভালো লাগচে না—ও কি?

(নেপথ্যে হেমন্ত। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে—তাদের দেখতে চাই)

এ কি?

ছিন্ন পাঞ্জাবি ও অ-সুবিন্যস্ত-বস্ত্র-পরিহিত, নগ্নপদ হেমন্তকে ধরিয়া হারু ও সুকুমারের প্রবেশ

ঠাকুরপো, এ কি?

হেমন্ত। ছাড়ো,আমাকে ছাড়ো—আমার revolver ? rsevolverটা দাও। নিমকহারাম, কুকুর!

লাবণ্য এ কি ঠাকুরপো?

সুকুমার। এখন অস্থির হবার সময় নয় বৌদি! কোন ভয় নেই। একটা মারামারি করেছেন।

হেমন্ত। আমায় কুকুর-মারা করেচে, সুকু, ছাড়বে না? এ অপমানের শোধ চাই! কার্ত্তিক, চুনি—

সুকুমার। চলো বৌদি, ঘরে নিয়ে যাই।

লাবণ্য। (হেমন্তর হাত ধরিয়া) এসো!

হেমন্ত। না, আগে revolvor! revolver দাও—তাদের খুলি উড়িয়ে দিয়ে আসি—উঃ!

সুকুমার। চলো, ঘরে নিয়ে যাই বৌদি! (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) বিনু, দাঁড়াও। আমি আসচি।

হেমন্ত। ছাড়বে না? ছাড়বে না? ভালো হবে না!

হেমন্তকে ধরিয়া হারু ভিন্ন সকলের প্রস্থান

বিনয়ের প্রবেশ

বিনয়। হারু, শীগ্‌গির টমটম তৈরী করতে বলো।

হারু। বিনয় বাবু, কোন ভয় নেই?

বিনয়। পাগল; কিসের ভয়? খালি রেগে রয়েছেন বৈ তো নয়। তুমি শীগ্‌গির ঘোড়ায় সাজ দিতে বলো।

হারু। যাই।

প্রস্থান

বিনয়। গ্রহের ভোগ! আগে থাকতে এ সব বোঝা উচিত ছিল। পাপের মধ্যে কখনো শান্তি নেই, সেখানে খালি লজ্জা আর ঘৃণা! এই যে সুকু আসচে।

সুকুমারের প্রবেশ

সুকুমার। বিছানায় শুইয়ে এসেছি, বৌদি বাতাস করচে, পিশিমা মামী ওঁরা সব রয়েছেন। আমি এক-বার চট্ করে ডাক্তারের কাছে নিজে যাই।

বিনয়। টমটম তৈরি করতে আমি বলেচি। ...জনীবাবুর কাছে আমিই যাচ্ছি; তুমি বাড়ীতে থাকো ...হ! যদি আবার সত্যি revolver নিয়ে—

সুকুমার। নাঃ, সে ভয় নেই। বৌদির হাত ধরে ...কেঁদে ফেলেছেন।

বিনয়। সুলক্ষণ!

সুকুমার। খুব সময়ে যাওয়া গেছলো, নৈলে আবার পুলিশে একটা কেলেঙ্কারি প্রচার হতো—

বিনয়। কেলেঙ্কারির আর বাকি নেই; এখন, এই থেকে শুধরে যান—

সুকুমার। বৌদির অদৃষ্ট!

বিনয়। সেইজন্যই আশা হয়!

হারুর প্রবেশ

হারু। গাড়ী তৈরী করতে বলেচি; পুলিশে... দারোগাবাবু বসে আছেন।

বিনয়। ওঃ, হ্যাঁ সুকু, পথে ভদ্রলোক বড় সাহা... করেচেন, নাহলে একটা হাঙ্গামে পড়তে হতো। যা হয়ে... তার ত আর চারা নেই। পুলিশে যাওয়ার মানে, ঢে... বাজিয়ে কেলেঙ্কারি রাষ্ট্র করা! তা, তাঁকে একটু খা... করা দরকার!

সুকুমার। বেশ, আমি—

বিনয়। আমি নীচে যাচ্ছি। ডাক্তারের কা... আমিই যাচ্ছি, গায়ে দু'এক জায়গায় কেটে লেগেছে, ... হতে পারে, ডাক্তার চাই—রজনীবাবুকে না পে... আর যাকে হোক নিয়ে আমি আসচি। তুমি দারো... বাবুর জন্য চায়ের ব্যবস্থা করো।

সুকুমার। হ্যাঁ।

একদিক দিয়া বিনয় ও অন্যদিক দিয়া হারু সুকুমারের প্রস্থা...

তৃতীয় দৃশ্য

রঙ্গ-পট

কোরাস্। গান

আমাদের দেখচো সবাই, চিনছ কি— ...টি কবি!
ভারত-আকাশে ফুটেছি যেন গো ...র রবি!
ছেলে লয়ে থাকে দাসীতে বাঁদীতে র*াধাবাড়া করে শাশুড়ী
পতি করে এই চরণ-সেবা বিনয়ে কুঁকুড়ি-শুঁকুড়ি;
খাটে শুয়ে মোরা আড়-মোড়া খাই, রচি শুধু প্রেম-hobb...
লিখিগো lyric কত না কাব্য প্রেমদানা-ভরা দানাদার,
হৃদয়বীণায় ঝঙ্কারি ধীরে তুলি নিতি নব হাহাকার;
ঠিকরিয়া পড়ে পুরুষ-পাঠক খুলে ফেলে হৃদি-চাবি!
গৃহের কাধ্য ধারিনেকো ধার সোফাতে পড়িয়া থাকি,
সংসার হাজিয়া মজিয়া যাইলে দেখি না মেলিয়া আঁখি,
শুধু হাই তুলি আর তুড়ি দিই আর খাই প্রণয়েরি খাবি
প্লীহার কষ্টে ভুগিতেছে পতি গৃহের মধ্যে শায়িত,
ছেলেটা ভুগিছে—সেদিকে দেখা—মিছা energy ব্যয়িত
সংসার হেথা অসার, তাহার ভাবনা কভু না ভাবি!
পাউডার মাখি, লেসের মাঝারে অলকে লাগায়ে ফুল
সেজে-গুজে থাকি নায়িকার মত, নাহিক কোথাও ভুল;
খাইতে শুইতে বসিতে রয়েছি, যেন পটে-আঁকা ছবি!*

চতুর্থ দৃশ্য

লাবণ্যের কক্ষ

হেমন্ত ও লাবণ্য

মন্ত। না, বলো, তুমি মাপ করেছ ?

াবণ্য। তুমি কি পাগল হলে!

মন্ত। তা হবে না, কথায় তুমি উড়িয়ে দিতে না! আগে বলো, আমায় মাপ করেচো ?

াবণ্য। ও কথা বলো না, আমি তোমায় মাপ ।কি! তুমি যে নিজের ভুল বুঝতে পেরেচো, তুমি শের মান-মর্য্যাদা ধূলোয় লুটোতে দাওনি, সময় চ তোমার জ্ঞান হয়েচে, এর জন্ম ভগবানকে ।দি। তাঁর অনন্ত দয়ায় আমার ক্ষুব্ধ প্রাণ শান্ত ।

হমন্ত। না লাবু, তা আমি কিছুতেই ছাড়বো না। তেই কেন বলো না—যতক্ষণ না তুমি নিজের মুখে , আমায় মাপ করেচো, ততক্ষণ আমি কিছুতে পাবো না।

াবণ্য। বলো কি ? এই সামান্ত জিনিষটুকুর ওপর ার নির্ভর করচে।

হমন্ত। হাঁ, সামান্ত মানুষ আমি, আমার শান্তি ঐ য় জিনিষটুকুর উপরই নির্ভর করে। তা থেকে চ করো না।

লাবণ্য। আচ্ছা, আচ্ছা।

হমন্ত। শুধু 'আচ্ছা' নয়, বলো, 'মাপ করেচি।'

লাবণ্য। করেচি, গো, করেচি—

হেমন্ত। লাবু——

লাবণ্য। কেন ?

হেমন্ত। আজ যেন পুনর্জীবন বলে মনে হচ্ছে! আবার আমরা মিলেচি! মধ্যে কি যেন খানিকটা । হয়ে গেছলো, তার পর এই প্রসন্ন দীপ্ত প্রেমালোকে । যেন নবজীবনের সন্ধান পেয়েচি।

লাবণ্য। নিষ্ঠুর, এই বুঝি তোমার ভালবাসা! এই আমাকে সব কথা বলো ?

হেমন্ত। কেন, কি বলি না ?

লাবণ্য। তুমি যে বাঙলা বই লিখচো, তা'তো াকে একদিনও বলোনি!

হেমন্ত। কি রকম ?

লাবণ্য। কি রকম আবার কি ? না হলে এমন ছানো-সাজানো গাল্-ভরা কথাগুলো বলচো কেমন । ?

হেমন্ত। ওঃ, ঠাট্টা! তা ঠাট্টাই করো, আর যাই া, আমার প্রাণে সত্যই আজ অপূর্ব্ব আনন্দ উচ্ছ্বসিত য় উঠেছে!

লাবণ্য। তুমি নিশ্চয় যত লক্ষ্মীছাড়া বাঙলা নাটক পড়তে আরম্ভ করেছ। যে সব কথা বলচো, তা একেবারে যত রোতো বাঙলা নাটক থেকে ছাঁকা চুরি।

হেমন্ত। নাঃ, কথায় তোমাকে পারবো না।

লাবণ্য। কিসে পারো ?

হেমন্ত। কিছুতে না ? ভালবাসায় ?

লাবণ্য। বটে!

হেমন্ত। না লাবু, সে কথা মুখেও আনতে পারবো না। বড় গর্ব্ব করতুম্—আশ্চর্য্য! সেই সব লক্ষ্মীছাড়া মুহূর্ত্তেও নিজের ভালবাসার স্পর্দ্ধা করতুম্! নীচ সঙ্গীগুলোর চেয়ে আপনাকে অনেক উঁচুতে মনে করতুম! ভাবতুম্, তোমার প্রতি ভালবাসার ত্রুটি নেই! ওঃ, আমি কি নীচ, কি পশু!

লাবণ্য। কেন আমাকে এত কথা বলচো ? আমি তোমার দাসী। একদিনের জন্ম আমাকে অসুখী দেখেচো ? তবে ও-সব বলে কেন আমাকে লজ্জা দাও ? আমরা বাঙালীর মেয়ে, বাঙালীর বৌ,—স্বামীই আমাদের সর্ব্বস্ব! স্বামী যদি একটু উপেক্ষার চোখে দেখে তো সিংহাসন পেলেও বাঙালীর মেয়ে সুখী হয় না! স্বামীর মিষ্টি কথাটুকুর জন্ম, স্বামীর একটা আদরের কথার জন্ম সে স্বর্গসুখ ত্যাগ করতে পারে।

হেমন্ত। আর বাঙালীর ছেলে এই স্বর্গ তুচ্ছ করে নরকের আবর্জ্জনা মাথায় তুলতে পাগল হয়!

লাবণ্য। দেখ দেখি, কোথাকার কথা কোথায় আনলে! গান শোনবার সখ হলো—এ যেন নাটক লিখতে বসলে!

হেমন্ত। আচ্ছা, আচ্ছা, গাও, গাও।

লাবণ্য। গাচ্ছি। তুমি কিন্তু হার্ম্মোনিয়মের পাশে তেমনি করে দাঁড়াবে এসো!

হেমন্ত। আচ্ছা।

লাবণ্য। (হার্ম্মোনিয়ম বাজাইতে বাজাইতে)

গান

বোঝো না, শোনো না দাসীর কথা!
বোঝো না নীরব প্রাণেরি ব্যথা!
তোমার স্বপন-ধেয়ানে থাকি,
নিমেষ না দেখিয়ে ঝরবে আঁখি;
ছিঁড়ো না টানিয়া চরণ-লতা!
ছায়ার মতন তোমার আছি,—
তোমার বিহনে কেমনে বাঁচি ?
তপন-বিহনে ছায়া যথা!

হেমন্ত। লাবু, লাবু, তুমি দেবী!

লাবণ্য। সে তো আর আজ নতুন নয়—সে তো আছিই! হ্যাঁ ভালো কথা—আসল কথা মনে আছে

আজ বুধবার। আজ দুপুর বেলা কি কাজ আছে, জানো ?

হেমন্ত। তা আর মনে নেই ?

লাবণ্য। দেখো কিন্তু—ঠাকুরপো যেন না জানতে পারে, যে, তুমি এ সব জানো, তা'হলে সে ভারী লজ্জা পাবে।

হেমন্ত। আমি ঠিক চারটের সময় নন্দবাবুকে নিয়ে বাগানে যাবো! তোমরা খাওয়া-দাওয়া করেই যাচ্ছ তো ? নন্দবাবুকে সব বলে রেখেচি, ভদ্রলোক ভারী খুশী হয়েচেন! বাবাকে বড় ভক্তিমান্ত করতেন, আর, ভারী বন্ধুত্ব ছিল! তুমি সুকুকে গুছিয়ে বলো—

লাবণ্য। সে আর তোমাকে পরামর্শ দিতে হবে না। এতখানি গড়ে তুললে কে ?

হেমন্ত। তা বটে! গৃহলক্ষ্মী যে বলে, লাবু, তা তুমি তাই! আমার মত অসচ্চরিত্র স্বামীকে কেমন মাথায় তুলে নিলে! এক দিনের জন্য ঘৃণা নয়, অভিমান নয়, রাগ নয়! সর্ব্বদা কাছে-কাছে থেকে, ভালো কথা কয়ে, দাসীত্ব করে আস্তে-আস্তে আমাকে কেমন চৈতন্য দিলে!

লাবণ্য। যাক্ ও সব কথা! তোমার তাঁতের স্কুলের ছেলেদের যে একদিন খাওয়াবে বলেছিলে, তা এই রবিবারে বন্দোবস্ত করো না কেন ?

হেমন্ত। রবিবার একটু কাজ আছে! দুটি ছোকরাকে সভা থেকে আমেরিকায় agriculture শেখাবার জন্যে পাঠাবার কথা আছে, তাদের সব গোছ-গাছ করতে হবে! খাওয়ানোটা সুকুর বিয়ের আগে বরং থাক্!

(নেপথ্যে সুকুমার। দাদা—)

হেমন্ত। কে, সুকু ? আয় না!

সুকুমারের প্রবেশ

সুকুমার। এই যে বৌদিও আছো! বিমু তোমায় খুঁজচে দাদা। সে বাইরের ঘরে বসে আছে!

হেমন্ত। ও—আমি তাকে ডাকিয়েছিলুম; একটু দরকার আছে!

সুকুমার। দাদা, তোমার একখানা চিঠি—

হেমন্ত। কিসের চিঠি ?

সুকুমার। Indian Famine Fundএর সেক্রেটারী লিখেছেন—তাঁদের office-change নিয়ে যে গোলমাল হয়েছিল, তা মিটে গেছে, আপনার টাকা এখন পাঠাতে পারেন।

হেমন্ত। হ্যাঁ, দু হাজার টাকার একখানা চেক আজই পাঠিয়ে দেবো! আমি তা'হলে বিমুর সঙ্গে দুটো কথা কয়ে আসি!

প্রস্থান

লাবণ্য। কি ঠাকুরপো ?

সুকুমার। আর কি ? ফাল্গুন মাস যে শেষ হয়ে এলো, বৌদি। কি হবে ?

লাবণ্য। আজ দুপুর বেলা বাগান ঠিক করা গেছে; চট্‌পট্‌ খাওয়া-দাওয়া শেষ করে নিয়ো। আমি উষাকে নিয়ে যাবো; মালীরা যেন সব বাইরে থাকে।

সুকুমার। আচ্ছা।

লাবণ্য। শুধু 'আচ্ছা' নয়! গেরুয়া কাপড় ঠিক আছে ?

সুকুমার। ওঃ, সে কি ভুলি! কাল থেকে তৈরি আছে। তা সেটা কি হবে ?

লাবণ্য। সেখানি মশায়কে পরতে হবে। অর্থাৎ যদি উষাকে পাও, তবেই ঘরে ফিরবে—আর না পেলে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। তা সন্ন্যাসীর বেশটা দুদিন একটু সয়ে থাক্! আর, আমরাও দেখি, কেমন মানায়! এখানে থেকে নিরুদ্দেশ-যাত্রা করলে তখন আমাদের অদৃষ্টে সে যোগি-বেশ-দর্শন ঘটবে না।

সুকুমার। তোমার ঠাট্টাগুলো মাঝে-মাঝে বড় মর্ম্মান্তিক হয়ে পড়ে, বৌদি।

লাবণ্য। কেন, গায়ে ফোস্‌কা পড়ে ?

সুকুমার। সময়ে-সময়ে পড়ে বৈ কি! যাক্, তার পর ?

লাবণ্য। তার পর এই আমি যেমন-যেমন শিখিয়ে দেবো, বুঝলে ? সে-ত সুকুমার বলতে অজ্ঞান, অথচ জানে না, বেচারী কি ভেজাল-সুকুমার নিয়েই আছে! যখন জানবে, সত্যি-সুকুমার তার জন্য সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছে—

সুকুমার। কি, হেঁয়ালি হয়ে পড়চে!

লাবণ্য। আলষ্টার, পরচুলাটা সঙ্গে [illegible]য়ো। আর, তুমি গেরুয়া পরে—

(নেপথ্যে হেমন্ত। সুকু, এদিকে একবার আসতে হবে।)

সুকুমার। দাদা আবার ডাকচে। যাই, শুনে আসি।

লাবণ্য। আচ্ছা, আবার এইখানেই এসো; আমি ততক্ষণ ঠাকুরঘরের কাজটুকু সেরে আসিগে। তুমি এখনি এসো।

সুকুমার। নিশ্চয়।

উভয়ের প্রস্থান

—

পঞ্চম দৃশ্য

বঙ্গ-পট

দাস— গান

আয় তোরা, ভাই, আয় রে ছুটে—
র আশিস্ আয় নিবি আয়, মানস-কমল পায়ে লুটে!
ঘোরে আছিস কোথায়, কবে তোদের ফুটবে আঁখি?
ডুবে থাক্‌বি কত, রাই তো রাতি ডাক্‌চে পাখী;
দেখ ওই পূব্-গগনে রবির কনক-কিরণ ফুটে!
খেলা ছেড়ে সবাই সার করি আয় মায়ের চরণ,
র কোলে জনম নিছি, মায়ের কাজে জীবন-মরণ;
ঢেলে দিই আয়, ওরে ভাই, মায়ের রাঙা চরণ-পুটে!

ষষ্ঠ দৃশ্য

হেমন্তের বাগান-বাড়ী

বিনয় ও সুকুমারের প্রবেশ

সুকুমার। আহা, তুমি ভুল বুঝচো!

বিনয়। ভুল নয় হে,—মেয়েদের কলেজে পাঠাও, ত আমার আপত্তি নেই—কিন্তু, ভাই, রাশটা সামলে খো। ও কলেজ-ফলেজে এমন একটা English stocrat ভাব ঢুকেচে, যে-টা কোন-মতে tolerate উচিত নয়। কলেজে পড়ে স্ত্রী যে শুধু চাটুকু বলে দিয়ে delicious কথাটি শোনবার প্রতীক্ষা বেন, কিম্বা দুটো পিয়ানোর গৎ বাজিয়ে, লেসের শ্রাদ্ধ, মি-লর্ডে করে ইডন্ গার্ডেনে হাওয়া খেয়ে বেড়া- আমরা অমনি চতুর্ভুজ হয়ে পড়বো, তা নয়। দেখ ই, দরিদ্র জাত্—ইংরিজিটা বেশী শেখার একটা প্রধান ষ কি, জানো? 'বিলাসিতা' জিনিষটাকে দোষের বলে হয় না, বরং সেটা 'দরকারি' বলেই মনে একটা াস দাঁড়ায়!

সুকুমার। সকলেই কি ইংরিজি শিখে অমনি হে?

বিনয়। না, সে কথা কেমন করে বলি—বিশেষ ন তোমার বৌদিকে দেখি! ইংরিজি শেখাও! কিন্তু রেখো ভাই, স্ত্রী শুধু পিয়ানোর গৎ বাজাবার ওস্তাদ , বা Drawing Room এ guest receive করবার টেশ্ নন্! গৃহধর্ম্মটার উপর বেশী stress দেওয়া কার। সকলে সেটা পারে না, কাজেই আমরা দেখতে ই, ইংরিজিটা বেশী শেখাতে গিয়ে এই দাঁড়ায়—স্বামী ন অসুখে কষ্ট পাচ্ছে, স্ত্রী তখন তাঁর সেবা একমাত্র কর্ত্তব্য বলে মনে করেন না, সেটা তাঁর কাছে তখন দাঁড়ায় একটা luxury! আর, তিনি তাঁর ক্রুশের কাজ, পিয়ানো, শোফায়-পড়ে-নভেল-লেখা এই সব নিয়ে থাকেন। অবশ্য, সকলে কিছু এমন নন্—তা'ও বলচি, তবে অধিকাংশ caseএ এমনি হয়ে পড়ে, জানি।

সুকুমার। তা হলে বিলাত-ফেরতারা তাদের স্ত্রী নিয়ে সুখী নয়, বলতে চাও?

বিনয়। অনেকেই নয়, আমার বিশ্বাস! জুড়িগাড়ী আর ধোপদোস্ত সার্টের প্লেট দেখেই সুখের মাত্রা ঠিক করো না। বিধু গুপ্তকে আক্ষেপ করে বলতে শুনেছি, বেচারী তার স্ত্রীকে নিয়ে একটুও সুখী নয়! অর্থাৎ কি জানো ভাই,আমাদের এ দেশে মাতৃত্বটাই ideal—নায়িকা নয়! mother of son, and not a heiorne!

সুকুমার। আচ্ছা—

বিনয়। বেশী দূর যাবার দরকার কি? তোমার lady-love-কেই ছাখো না! মাপ করো ভাই, সহজে বুঝবে বলেই বলচি! বাড়ীতে অভিভাবিকা কেউ ছিল না, গৃহ-ধর্ম্মটা কিছু শেখেনি, কলেজে কতকগুলো ইংরিজি কাব্য-উপন্যাস পড়ে heroineএর ভাবটুকু প্রাণে কেমন জাগিয়ে তুলেচেন, যার ঠ্যালায় তোমার প্রাণটুকু এক-বারে ঠোঁটস্থ হয়ে পড়েচে! তাকে দেখ, আর তোমার বৌদিকে দেখ; ইংরিজি তার চেয়ে কিছু কম পড়েন্ নি, অথচ গৃহশিক্ষার গুণে আধুনিক বৌদের মধ্যে আদর্শ বললেও হয়!

সুকুমার। এ কথা মানি বটে; মোদ্দা, তুমি যা বললে ভেবে দেখলে—

বিনয়। Unbiassed হয়ে ভাবলে ঠিক মনে হতে পারে! অবশ্য আমার এ মত আমি সকলকে accept করতে বলচি না। তবে তোমার সঙ্গে কথায়-কথায়, আর সম্প্রতি তোমার এই caseটা study করে আমার নিজের ভাবটুকু আরো জোর পেয়েছে, তাই কথা পড়লো তোমাকে বললুম। মেয়েদের cnoccupied রাখলে একটা-না-একটা পাগলামি ধরে-ই হে! ও, পরের কাপড়-চোপড়, চলা-ফেরার দোষ ধরা, তবে সে তোমার hyseciia, luxury, নয় নভেলি ভাব—এই যে এঁরা আসছেন—আমরা তা হলে একবার ওধারে যাই চলো; তোমাকে তো আবার গেরুয়া পরে সাজতে হবে!

সুকুমার। হাঁ, ওঁরা এলেন যে! তা হলে যাওয়া যাক্।

বিনয়। চল, আমি ততক্ষণ আশপাশে একটু ঘুরে আসি; আমাদের অনঙ্গ যে এধারে একখানা বাগান কিনেছে, সে তার family নিয়ে সেখানেই আছে।

উভয়ের প্রস্থান

আলষ্টার-গায়ে লাবণ্য, সঙ্গে উষা ও সুরমার প্রবেশ

লাবণ্য। তা হলে, আমাকে তুমি ভালোবাস?

উষা। খুব—

লাবণ্য। আমাকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি নেই?

উষা। আপত্তি! দিনরাত কাছে-কাছে থাকবো, হৃদয়ের সামান্য বেদনার আঘাত-টুকু—

লাবণ্য। ঐ তো! ঐ-টুকুই ত তোমার দোষ! বেশ কথাবার্ত্তা হচ্ছিল, আবার তুমি ও রকম বাজে বকুনি আরম্ভ করলে!

সুরমা। বিয়ে হলে ওটা সেরে যাবে।

লাবণ্য। ঐ-টুকুর জন্যই তো যা-কিছু ভয়।

সুরমা। কেন?

লাবণ্য। কে জানে কেন? আমার কেমন ও রকম বেয়াড়া বক্তৃতাগুলোর উপর রাগ আছে; আচ্ছা, তোমরা একটু এখানে দাঁড়াও, আমি আসছি।

প্রস্থান

সুরমা। বেশ জায়গাটি, উ, না? দিব্যি বাগান! কেমন অনিল-সুগন্ধিত—

উষা। পিক-কুহরিত বনভূমি!

সুরমা। ভারী রোমান্টিক না?

উষা। যেমনটি চাইছিলুম। এই যে—

গান গাহিতে গাহিতে লাবণ্যর প্রবেশ

গান

প্যারি, যাস্‌নে লো যমুনায়, উঠেছে তুফান।
আকুল সে কালো জল ছলকিছে ছল-ছল,
স্রোত খরসান।
বরষা আকাশ ঘিরে নামিতেছে তীরে তীরে
কুঞ্জ-কানন-সারি মেঘে ম্রিয়মাণ!
গাগরী যাবে লো ভাসি, কোথা রবে কলহাসি,
কালা বাজাবে বাঁশী উদাসি' পরাণ।
অলকে লাগায়ে জল, তিলক মুছে কি ফল?
হোক্ আজি গৃহ-কাজে বেলা অবসান।

উষা। আহা, কি সুন্দর!

লাবণ্য। তোমার মুখের চেয়ে নয়, কিন্তু!

উষা। (লজ্জানতমুখী)

লাবণ্য। লজ্জা হলো? কেন, উষা, তোমার গানও আমার বেশ লাগে!

উষা। আমার আবার গান?

লাবণ্য। কেন, সে গানটি ত' আমার বেশ লেগেছিল!

উষা। কোন্‌টি?

লাবণ্য। সেই কাল দুপুর বেলা তোমাদের বা[illegible] ঘরে বসে তুমি গাইছিলে—আমি গেলুম।

সুরমা। ওঃ, সে গান যে আবার ওঁরি লেখা!

লাবণ্য। বটে—তা'তো বলোনি আমাকে, উষা?

উষা। আমি ভুলে গেছলুম—আমাকে মাপ করো

লাবণ্য। শুধু মাপ করবো না—সেটি এখন একব[illegible] আমাকে শোনাতে হবে!

উষা। সে খালি আমাকে লজ্জা দেওয়া হবে!

লাবণ্য। বেশ! তবে থাক্!

উষা। না, না, রাগ করো না—তোমার যদি ত[illegible] তৃপ্তি হয়—

লাবণ্য। তা আর হবে না, উষা? আমি তোমা[illegible] কত ভালোবাসি, তা কি তুমি জানো না?

উষা। জানি। তোমার অসীম অনুগ্রহ, তা জানি

গান

সে মধুর মুখ জাগে মনে!
ভুলিতে পারি কি তারে এ জীবনে!
চাঁদে চাহি না, হা রে চাঁদ নহে ভালো,
সে মুখে দেখেছি শুধু যত-কিছু আলো,
সকলি আঁধার—সে-বিহনে!
সে যে মোর এ নয়নে তারা নয়নেরি—
সে যে পূরণিমা-শশী হৃদি-গগনেরি,
পারিজাত হৃদয়-কাননে!

লাবণ্য। এসো চারিধার দেখে-টেখে বেড়াও।

সকলের প্রস্থান

গেরুয়া পরিয়া সুকুমারের পুনঃ প্রবেশ

সুকুমার। এই ত সাজসজ্জা ঠিক! যে রক[illegible] proceebing চলছে, তা hurely dramatic। য[illegible] বিয়েটা হয় তো অপূর্ব্ব বটে! এমন বিয়ে মোদ্দা কারে[illegible] হয়নি! নভেলিষ্ট, কবি, এমন কি, উপন্যাসের নায়কে[illegible] অবধি নয়!

লাবণ্য। তা ঠিক! এইবার সেই সব, বুঝলে আমি তা হলে ওকে ডেকে আনি।

সুকুমার। এইখানেই?

লাবণ্য। শুধু উষাকে নিয়ে আসবো—সেটাবে[illegible] groveএ বসিয়ে আসবো—আমি আড়ালে থাকবো বুঝলে।

লাবণ্যের প্রস্থান

সুকুমার। আচ্ছা! (ট্র্যাঙ্ক হইতে কাগজ বাহি[illegible] করিয়া) দেখি, দু' একটা point ত' note করা আছে[illegible] শেষে না গুলিয়ে যায়! 'হংসবতী' নাটক থেকে[illegible]

কটা তো মুখস্থই করে ফেলেচি ! আঃ, কি বিভ্রাট ! যে আসচে—সুরু করে দিই। (গম্ভীরভাবে কর মত সুরে) কি জন্য এ জীবন ? যাকে না পেলে াবন—যাকে না পেলে—আঃ, ভুলে যাচ্ছি যে !

উষা ও লাবণ্যের প্রবেশ

সুখ নেই, শান্তি নেই, এ জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে, তো ফিরে চাইলে না ! আমার সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে ে। এ সংসার অরণ্য ; এখানে কেউ কারো মুখের চায় না, কেউ কারো হৃদয়ের ব্যথা বোঝে না—সব য় পাষাণ বেঁধে বসে আছে, তবে কেন এ সংসারে বো ? (স্বগত) আঃ, তার পর ? তার পর মনে চ না যে—হাঁ, হাঁ, (প্রকাশ্যে) গহন বনে যাবো— াই—সে বন শ্বাপদ-সঙ্কুল ? হাঃ হাঃ, সেখানে নারী- সী নেই—নারী পাষাণী ! আজ সন্ন্যাসী হয়ে যাবো— এই গেরুয়া পরেছি ! কমণ্ডলু ? কিনে নেবো ; ছো, নারী, পারবো না যেতে ? কেন ? তুমি বলচো, য় ? হাঃ হাঃ, সে তো স্বপ্ন ! তুমি আমার হলে না ? না। আমি বনে চললুম, কিন্তু একটা জীবন তুমি করে দিলে, এর মহাপাতক কি নেই ? ওঃ উহুহু।

প্রস্থান

উষা। ইনি কে ?

লাবণ্য। বুঝতে পারলে না ?

উষা। না।

লাবণ্য। সে কি ! ও একজন নারীকে ভালবাসে, র জন্যে পাগল হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ! কিন্তু সে ষ্ঠুর নারী ওর দিকে ফিরেও চায় না—বেচারী উদ্‌ভ্রান্ত য় বেড়াচ্ছে।

উষা। আহা—এমন নিষ্ঠুর নারী !

লাবণ্য। হ্যাঁ, নারী এমনি নিষ্ঠুর ! ভাবো দেখি, ারীর হৃদয় এ লোকটার এত দুঃখেও কাতর হয় না !

উষা। পাষাণী সে ! সে কি বলে ?

লাবণ্য। এমন কি, সেই নারীর অভিভাবকেরা জনের বিয়ে দেবার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি, কিন্তু বলে, সে কিছুতে বিয়ে করবে না !

উষা। কিছুতে না ?

লাবণ্য। না। শেষে ওর আর দোষ কি ! ও বচারী সাধে কি সন্ন্যাসী হয়ে চলে যেতে যায় !

উষা। তুমি কেমন করে জানলে ?

লাবণ্য। আমি ওকে একটু-একটু চিনি কি না !

উষা। উনি সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাবেন ?

লাবণ্য। তা সংসারে সুখ না পেলে মানুষ কি সংসারে থাকতে পারে ? এই আমি যদি মরে যাই, তা হলে কি আর তোমার সংসারে থাকতে ভালো লাগবে ?

উষা। ও কি কথা ?

লাবণ্য। এই যে আবার আসচে—কি বিড়-বিড় করে বক্‌চে না ? শোনা যাক্ এসো, কি বলে !

সুকুমারের পুনঃ-প্রবেশ

সুকুমার। না:, বনে গিয়েই কি সুখ পাবো ? অহরহ তার চিন্তা আমার হৃদয়-ভার আরো বাড়িয়ে তুলবে। তার চেয়ে কি করি ? (ইঙ্গিতান্তে অলক্ষিতে লাবণ্যর অন্তরালে গমন) কি করলে এ জ্বালা জুড়োয় ? (উষার দিকে হঠাৎ চাহিয়া) এই যে পাষাণী ! পাষাণী এসেচো ? দাঁড়াও, উঃ, এ কি করেচো ? গৃহে আমার সুখ নেই, কোথাও নেই। আমাকে বলে দাও, আমি কি করবো ? মুখ ফিরুচ্ছ ? আশ্চর্য্য হচ্ছ ? না, না,—কেন, মনে নেই সেই যে তুমি আমার প্রেম নিষ্ঠুর উপেক্ষায় ঠেলে গেলে !

উষা। (বিস্মিতভাবে) আমি ?

সুকুমার। হাঁ, তুমি ! মনে নেই ? সেই কঠিন, নিষ্ঠুর পরিহাসে চলে গেলে। আজ দাঁড়াও, তোমার সামনে এ অতৃপ্ত সাধ-আশা-ভরা জীবনের অভিনয় শেষ হোক্ !

উষা। (সবিস্ময়ে) এ আপনি কি বলচেন।

লাবণ্যর সম্মুখে আগমন

লাবণ্য। কেন ? ঠিকই তো বলচেন।

উষা। আমি তো কিছু বুঝতে পারচি না। ইনি—

লাবণ্য। হাঁ, ইনি তোমারি জন্য আজ সুখহীন গৃহহীন।

উষা। এ কি সুকুমারবাবু, আপনিও—

লাবণ্য। আমি সুকুমারবাবু নই, ভাই। ইনি সুকুমারবাবু। বিয়ের কথাবার্ত্তা হচ্ছিল, দেখতে গেছলেন—নাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমরা ঠাট্টা করেছিলে ! সেই অবধি বেচারী পাগলের মত বেড়াচ্ছে অবাক হচ্ছো, বিশ্বাস করচো না ?

উষা। সে কি ; তা হলে আপনি—?

লাবণ্য। না। বলচি তো, আমি সুকুমার নই ! আমি সুকুমারের বৌদি শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা, ওরফে লাবু (মাথার পরচুলা, ও আলষ্টার খুলিয়া ফেলিল) তুমি দুখানা কাব্য পড়ে heroine হয়ে বসেছিলে, মাথা এম খারাপ হয়ে গেছে, যে পরেশনাথের বাগানে গান শুনে আমাকেই ভালোবেসে ফেললে ! আমি তোমাদের বাড়ী যাচ্ছি-আসচি, আর তোমার বাবাও দিব্যি যেতে দিচ্ছেন এ তুমি একবারও সন্দেহ করনি ? তুমি এমনি ক্ষেপেছ যে বিয়ে করবে না বলে পণ করেচো ! আ

পুকুরধারে গান শুনে একটা মেয়েমানুষকেই সেই মন্দিরে বিয়ে করতে উদ্যত! ছি ছি উষা—

উষা। এঁ্যা, সে কি? আমি কি সত্য এমন পাগল। আমাকে ক্ষমা করবেন—

লাবণ্য। না, শুধু কথায় ক্ষমা হবে না! তুমি যখন সুকুমারের জন্ত পাগল হয়েচো, তখন সুকুমারকে বিয়ে করতে হবে। আহা, বেচারী সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছে! এমন প্রেমস্নেহপূর্ণ হৃদয় কিন্তু আর পাবে না, উষা। আমাকে ভালোবাস তো! ঠাকুরপোকে বিয়ে কর্ ভাই! দুটি জা'য়ে বেশ থাকবো। না হলে ঠাকুরপো সন্ন্যাসী হয়ে যায়! আর কেলেঙ্কারি করিস নে ভাই!

উষা। (চুপ করিয়া রহিল)

লাবণ্য। কি? কথা কচ্ছিস না যে! দেখ, নন্দবাবু বিবাগী হয়ে চলে যাচ্ছেন, ঠাকুরপো এ দিকে সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছে, আমাকে তো ভালবাসিস্, তার খাতিরে কথাটা রাখ্। না হলে আমি সত্যি তোর সঙ্গে কথা কবো না। আর, আমি মেয়েমানুষ, আমার সঙ্গে বিয়ে হতে পারে না! আর তোর নায়কের নামও সুকুমার, লাবণ্য নয়! কিছু গোল হবে না—হৃদয়ে কোন দাগ পড়বে না!

উষা। (নতমুখে) আমি এমন পাগল হয়েছিলুম!

লাবণ্য। আচ্ছা, তা থাক্। এখন কথার জবাব দেখি!

উষা। তোমার কথা ঠেলতে পারি না। আচ্ছা—

লাবণ্য। তা হলে ঠাকুরপো, ও আর দেরী করে বাড়ী গিয়ে পাঁজিখানা দেখাতে হবে। একটা র দিন—

সুকুমার। আজ ১৭ই একটা দিন ছিল, বৌদি।

লাবণ্য। আজ তো আর হতে পারে না। কি উষা?

উষা। (জনান্তিকে) যাও!

লাবণ্য। এই লজ্জাটুকুই প্রেমের লক্ষণ, বুঝচো রপো?

সুকুমার। আর ২২শে একটা দিন আছে শুধু, তা আর দিন নেই।

লাবণ্য। আচ্ছা গো, সে পাঁজি দেখানো যাবে।

সুকুমার। আমি পাঁজি দেখে রেখেচি।

লাবণ্য। ওঃ, সে কষ্টটুকু তা হলে আর আমাদের ত দিচ্ছ না? পাঁজির সব কটা দিনই বোধ হয় হু করে ফেলেচো! এঁ্যা? দেখচিস্, উষা, কি ম পাগল হয়েচে তোর জন্ত!

উষা। য্যাঃ।

প্রস্থান

লাবণ্য। কেমন ঠাকুরপো, এক রকম সব তো! এখন মনে আছে বখশিশ?

সুকুমার। বিয়ের পরদিনই হরিণ পাবে বৌদি।

লাবণ্য। ওঃ, আগে দিতে বুঝি সাহস হয় না যদি ফস্কে যায়! আর শিল্প-বিত্তালয়ের টাকাটা ভুলোনা যেন!

সুকুমার। এ কি নন্দবাবু আর, দাদা যে! বৌদি তুমি বুঝি ঢাক পিটেচো?

লাবণ্য। বাঃ, আশীর্ব্বাদের জন্ত বুঝি আবা একদিন পেছুবে?

সুকুমার। যাও, আমি পালাই। এই গেরুয়া কাপড় পরা—এঃ, দাদা কি মনে করবে?

লাবণ্য। প্রেমে পড়বার সময় এ সব কি ভাবোনি তো!

সুকুমার। পালাই!

প্রস্থা

হেমন্তর প্রবেশ

হেমন্ত। নন্দবাবু এসেছেন গো! তা এ দিকে তোমাদের খপর কি? উনি একেবারে মোহর নি হাজির, আশীর্ব্বাদ করে যাবেন। খাবার-দাবার বন্দোব এখানে হয়েচে?

লাবণ্য। সে ভার বিনয়ের উপর দিয়েছিলে না?

হেমন্ত। হাঁ। তা তোমাদের খপর কি?

লাবণ্য। খপর আর কি রকম হতে পারে! সব পাগলামি সেরে গেছে। এখন বাজারের বন্দোবস্ত করোগে। তোমার অধীর ভাই একেবারে পাঁজি দেখে দিন-টিন ঠিক করে রেখেচে, ২২শে ফাল্গুন। আজ তো ১৭ই!

হেমন্ত। যাক্, মেয়েটি সারলো তবে?

লাবণ্য। জালিয়াৎ সুকুমারকে কি করে বিয়ে করে বলো? এ কি! নন্দবাবু আসচেন যে! আমি যাই।

হেমন্ত। আঃ, থাকো না! ওঁকে লজ্জা কি?

নন্দলালের প্রবেশ

নন্দলাল। এই যে, মা এখানে আছো। বেঁচে থাকো মা। উষা আমার সেরেচে তো?

হেমন্ত। ২২শে বিয়ের দিন আছে। সেইদিনই—

লাবণ্য। (সলজ্জভাবে) আমি উষাকে ডেকে আনি।

প্রস্থা

বিনয়ের প্রবেশ

নন্দলাল। এই যে বাবা, তুমিও এসেচো। বুঝ

দিব্যি ছেলেটি এই আমাদের বনমালী! না, না,
।
য়। আজ্ঞে, আমি বিনয়!
লাল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিনয়! বিনয়! বেঁচে থাকো
নয়!
য়। (হেমন্তর প্রতি) খাবার-দাবার সব
রে ঠিক আছে। স্বকুর কাছে সব শুনলুম।
চা গেল!
মন্ত। ২২শে বিয়ের দিন স্থির হয়েচে বিনু।
নয়। আজ্ঞে, সব শুনেচি। আর ঐ একটা
ছিল। তা হলে আপনি একবার ওপরে যাবেন না?
মন্ত। এই যে মেয়েরা এদিকে আসচেন। তা
নন্দবাবু, এদের সঙ্গে একটু কথা কন্। আমরা
।

হেমন্ত ও বিনয়ের প্রস্থান

অন্যদিক দিয়া উষা ও সুরমার প্রবেশ

ন্দ। এই যে টুনি, লক্ষ্মী মা আমার, এমন পাত্র
পাবো না রে! আমার কথা রাখ্, মা। নাহলে
সত্যি বিবাগী হয়ে যাবো। সংসারে আর থাকবো

ষা। (লজ্জানতমুখে) তোমার কথার আমি কবে
করেচি, বাবা?
ন্দ। তা জানি মা, তুমি আমার লক্ষ্মী মেয়ে!
-বুদ্ধি হয়েচে, তুমি কি আমার অবাধ্য হবে?
র, হ্যাঁ, সতীশ এসেচে। বুঝলি সুরি, তোকে
যেতে চায়। আজ দুপুর বেলা তোরাও চলে এলি,
ও এসে উপস্থিত! পাঁচ-সাত দিন থাকবে।
সুরমা। আমি যাবো না—
নন্দ। সে কি রে, যাবি না কি? স্বামীর কাছে
ব না? সতীশ ডেপুটি হলো, বুঝলি টুনি। আর হবে
ই বা কেন? অমন বিদ্বান্ ছেলে—পুরুলিয়ায় যেতে
পাঁচ-সাত দিন পরেই! সেখানে বাঙলা-টাঙলা সব
হয়েচে। ঐ চৌধুরীদের একখানা বাঙলা আছে কি
তা' যাবি না কি মা—সতীশ না হলে কি মনে
বে?
সুরমা। তোমার কথা মামা, ঠেলতে তো পারি না।
ন্তু টুনির বিয়ে দেখে তবে যাবো—
নন্দ। হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়!
সুরমা। (জনান্তিকে উষার প্রতি) এ্যাঁ, ডেপুটি
পুরুলিয়া—বাঙলা! যাবে না কি ভাই? পা আমি
ড়িয়ে রেখেচি।
নন্দ। আজ তে দুজনে আমাকে যে কত সুখে
ী করলি, তা আর কি বলবো? বেঁচে থাক্, আর,
এমনি সুখী হ'—প্রাণ খুলে তোদের আজ এ আশীর্ব্বাদ
করচি।
উষা। বাবা, আগে তোমাকে কত কষ্ট দিয়েছি;
মাপ করো।
নন্দ। হ্যাঁ রে টুনি, আমার কাছে মাপ চাইছিস্
তুই? তুই যখন এতটুকু, তখন তোকেই একমাত্র বন্ধন
করে সংসারে পড়ে রইলুম—তোর উপর কবে রাগ করেচি,
মা, যে তুই মাপ চাইছিস?
সুরমা। তোর ভাসুর—

উভয়ের লজ্জানতমুখে প্রস্থান

হেমন্তর প্রবেশ

হেমন্ত। একবার এদিকে আসতে হবে, নন্দবাবু—
নন্দলাল। আমি বলি, হেমন্ত, আশীর্ব্বাদটা এই-
খানেই হয়ে যাক্।
হেমন্ত। আজ্ঞে, তা হলে ত ভালই হয়! তা
এদিকে একবার আসতে হবে।
নন্দলাল। চলো, বাবা, চলো। বেশ বাগানখানি
করেচো! খাশা বাগান।

উভয়ের প্রস্থান

উষা ও সুকুমারকে টানিয়া লাবণ্যর প্রবেশ

লাবণ্য। (উষাকে) তোমাকেও ছাড়চি না!
তোমার উপর ঠাকুরপোর আগে আমার দাবী! ঠাকুরপো,
এটা তুমিও মনে রেখো!
সুকুমার। বৌদি, একটা কাজ বাকী। আজ
তোমাকে বাস্তবিক প্রণাম করতে ইচ্ছে করচে।
লাবণ্য। ইস্, হঠাৎ যে ভারী ভক্তি উথলে উঠলো!
কিন্তু যাই বলো, ঠাকুরপো, তোমাদের বিয়ে যেমন-তেমন
বিয়ে নয়—এর ভিতর যৎকিঞ্চিৎ একটু আছে!
সুকুমার। হ্যাঁঃ, কিন্তু যাই বলো বৌদি, এ মাসে
যদি বিয়ে না স্থির হতো, তা হলে এই গেরুয়া নিয়েই—
লাবণ্য। চম্পট! হুঁঃ, কাকে বলচো?
সুকুমার। সত্যি—দেখতে—আমাকে চেনো না?
লাবণ্য। খুব চিনি! মস্ত বীর! কিন্তু সে দুদিন
শুধু। মাথায় চিরুণি পড়তো না, আরসি পেতে না, রাস্তা
হেঁটে পা ফাটতো, সুড়সুড় করে বাড়ী ঢুকতে হতো! ও
খপরের কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপাবার দেরীটুকু সইতো না!
সুকুমার। বটে! সত্যি বলচি আমি।
লাবণ্য। আচ্ছা, আচ্ছা, থাক্! ও কথাগুলো
এখানে আর কেন? ফুলশয্যার রাত্তিরের জন্ত মুলতুবি
রাখো, দেখো, কে হারে, কে জেতে! কি উষা, ঘোমটা
টানচো যে (উষার চিবুক ধরিয়া, সুরে) সোনার
তরীটি মরি ভিড়িল কূলে!

সুকুমার। যাও, বৌদি—কি?

লাবণ্য। এখন এসো উষা।

(উষার চিবুক ধরিয়া)

গান।

এসো, লক্ষ্মী, এসো ভবনে!
মরি কি উল্লাস ভাসে সুরভিত পবনে!
বিকচ-কুসুম-বাসে, বিহগ-কলভাষে,
অঞ্চল ভরি এসো, হেম-ধান্য-ধনে!
আনো পুণ্য, আনো প্রীতি, আন হর্ষ, আনো গীতি,
বাঁধো সুমধুর, শুভ প্রেমের বাঁধনে!
এসো সংসার-মাঝে, এসো এসো গৃহ-কাজে,
শুভ্র সুন্দর, বধূ, নির্ম্মল জীবনে!

পট-পরিবর্ত্তন

উজ্জ্বল দৃশ্য

গান

মধুর হিল্লোলে চলিছে ভেসে, মধুর অমিয়-ধারা!
আনন্দ-নির্ঝর ঝর-ঝর ঝরে, আকুল পাগল-পারা!
উষার আকাশে, সন্ধ্যার মেঘে,
কুসুমে, মলয়ে, নিতি ওঠে জেগে
কোন্ জগতের পরীর স্বপন, কোন্ বিদেশের তারা!
আয় হাসি-মুখে, মুছি আঁখি-জল,
জীবন সুখের, হরষ কেবল;
নিমেষের দুখ,—বিধাতার ভুল!
(কেন) সুখের মাঝারে আপনার তরে, রচিছ বিষাদ-কার

যবনিকা

বিষ্যুৎবারের বারবেলায়

শ হাইকোর্টে ওকালতি করে; ভবানীপুরে বাসা। তার তরুণী পত্নীই সর্ব্বময়ী কর্ত্রী; আর চাকর-আছে। কোর্টে তার পশার বাড়িতেছে; জীবনে র বসন্তের আনন্দ-হিল্লোল! অস্বাচ্ছন্দ্যের নো ধার ধারে না!

শাখের মাঝামাঝি শ্বশুর চিঠি লিখিলেন,—সামনের রে অপর্ণার বিবাহ। হঠাৎ কথা পাকা হইয়া সময় সংক্ষেপ। কতকগুলা জিনিষের ফর্দ্দ লাম। সত্বর কিনিয়া মাধুরীকে লইয়া চলিয়া ব। কাজ-কর্ম্মের একটা ব্যবস্থা করিয়া আসিও।

শুর থাকেন ভাগলপুরে। অপর্ণা রমেশের শালী; পত্নী। চিঠির সঙ্গে ফর্দ্দ আসিয়াছিল। এসেন্স, সাবান, রুমাল, দেশী-ধুতি, সিল্কের গেঞ্জি, পাম্প-শু ত বিবাহ-যৌতুক-উপহারের খুঁটি-নাটীর সহিত ঘড়ি, আংটি, বোতাম! কোনো নাম ফর্দ্দ হইতে পড়ে নাই।

মাধুরী কহিল—সকাল সকাল কাছারি থেকে ফিরো। কে নিয়ে বাজারে যেতে হবে। আমি নিজে করে সব কিনবো।

রমেশ কহিল,—তাহলে গাড়ীভাড়াতেই অনেক খরচ হয়ে যাবে।

মাধুরী কহিল—তা হোক্। আমার এই একটি , তার বিয়ে। জিনিষ-পত্র নিজে দেখে কিন্‌তে । গাড়ীভাড়ার খরচ তোমার এই একবারই বে—আর নয়। শালীর বিয়েয় মানুষ কত টাকা করে, জানো?

রমেশ মনে মনে কহিল, তা বটে! স্ত্রীর ভগ্নী যে !

মাধুরী কহিল,—ফর্দ্দখানা দাও দিকিনি···এই যে ন, খেলনা, সাবান, এসেন্স,—তা এগুলো সব রাধা-রে পাবে,—কেমন? আর কার্পেটও তাই। ধুতি, নমস্কারীর শাড়ী-টাড়ী বড়বাজারে—সমস্ত ভাগ করে লো···তার পর ট্যাক্সি নাই নিলে—একটা সেকেণ্ড ঘোড়ার গাড়ী নিয়ো···ঘণ্টা হিসেবে। কতই বা মার খরচ হবে বাবু?

রমেশ কহিল,—কিন্তু আজ একটা বড় আপীল ছিল···

মাধুরী কহিল,—আপীল রোজ আছে—আমার নের বিয়ে আর রোজ হবে না!

রমেশ কহিল—তা যদি হয়, আমি পেছ-পা হবো না!

—যা বললেন! মাধুরী কহিল—তামাসা নয়! বেলা চারটের মধ্যে ফিরতে চাও। আমি তৈরী থাকবো, পাঁচটার আগে বেরুবো। এর নড়চড় নয়, বুঝলে?

পত্নীর মুখের পানে চাহিয়া রমেশ কহিল—অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান!

মাধুরী কহিল,—তুমি কি দিচ্ছ, বলো?

রমেশ কহিল—যেমন তোমার আদেশ হবে।

মাধুরী কহিল—আমার আদেশ! কেন, তোমার নিজের মন থেকে কিছু দেওয়ার সখ বুঝি হবে না? তা হবে কেন? এ যে আমার বোন্···

রমেশ কহিল—দোহাই প্রেয়সি, অনর্থক মান করো না। মানের বহু অবসর, বহু সুযোগ এমনিতেই মেলে ···তার উপর অহেতুক···

মাধুরী কহিল,—আমি একখানা সুবাটী শাড়ী আর ব্লাউশ দেবো—তা কিন্তু বলে রাখচি। তোমায় [illegible] থেকে বলে রেখেচি···

রমেশ কহিল,—কিন্তু কি রকম [illegible], দেখচো তো? এর মধ্যে হবে কেন? এ যা [illegible] কালই বেরুলে ভালো হয়।

মাধুরী কহিল,—কাল সেই বিকেলে [illegible] আজ বেস্পতিবার। কাল না বেরুলে হবেই বা কেন! তুমি কিনে দাও, আমি কালই সব গুছিয়ে ফেলি,—তুমি কাছারি করতে হয়, করো কাল—তার পর সন্ধ্যার ট্রেনে বেরুবো। শাড়ী আর ব্লাউশের জন্য যথেষ্ট সময় পাবে। ছ'পয়সা বেশী দাম দিলে তারা বাড়ীতে শাড়ী-ব্লাউশ পৌঁছে দিয়ে যাবে।

রমেশ কহিল—সে তো আবার রঙ-টং পছন্দ করা হাঙ্গামা আছে।

মাধুরী কহিল—সে হাঙ্গামা তোমায় পোয়াতে হবে না গো···আজ সন্ধ্যা-বেলায় আমায় নিয়ে বেরিয়ো। মিউনিসিপাল মার্কেটে সেই যে জেঠামল-ধালামলের দোকান আছে, কত রঙের রকমারি শাড়ী তাদের আছে—সেখানে গিয়ে আমি নিজে পছন্দ করে অর্ডার দিয়ে আসবো।

রমেশ চুপ করিয়া রহিল। মনে-মনে সে হিসাব কষিতেছিল! বিবাহের যা-কিছু মাধুরী···মাধুরী তাকে চিরদিন দিয়াছে,—আর আজ?···

মাধুরী কহিল,—তুমি নিশ্চয় একখানা গহনা দিচ্ছ—না দিলে বিশ্রী দেখাবে! রোজগার করচো তো··· ব্রেশলেট, কি, ভালো লেক্‌টী পিন—অন্ততঃ দু'শো টাকা ···তার কমে ভালো জিনিষ পাবে না!

রমেশ একটা ঢোঁক গিলিল। বিবাহের সময় শ্বশুরের কাছ হইতে যৌতুক সে বড় অল্প আদায় করে নাই। এখন হইতেই তার শোধ সুরু হইল! এখনো দু'টি শ্যালকের বিবাহ বাকী···

মাধুরী কহিল—এই কথাই তাহলে পাকা, বুঝলে! তোমার গহনাও সেই সন্ধ্যার সময় দেখে পছন্দ করবো। সকাল-সকাল কাছারি থেকে ফেরা চাই—নাহলে চারিদিকে বিষম বিভ্রাট ঘটবে। তোমার উপরই বাবার ভরসা। তাঁর মান-ইজ্জৎ তোমার হাতে, এটুকু খেয়াল রেখো। মক্কেলই সব নয়,—লোক-লৌকিকতা রক্ষা না করলে ভদ্রলোকের চলে না।

কথাগুলা খুব ঠিক। কিন্তু এমন অকস্মাৎ···! তার তো পৈতৃক সম্পত্তি তেমন কিছু নাই! পাশের জোরে ওকালতির শনদ লাভ করিয়াছে, তারপর দালালের তদ্বিরে এই ব্রীফগুলার মারফৎ যা কিছু গৃহে আসিতেছে! কিন্তু এই আমানতের পিছনে কত ব্যয় করিতে হয়, হায় অন্তঃপুরবাসিনী গৃহলক্ষ্মী, সেগুলার সংবাদ যদি রাখিতে!

কিন্তু ইহা লইয়া বাদানুবাদ চলে না—বিশেষতঃ স্ত্রীর সঙ্গে। তাহা হইলে এত ছোট ব্যাপার বাহির হইয়া পড়িবে যে পত্নীর কাছে নিজের ইজ্জৎ বাঁচাইয়া রাখা দায় ঘটিবে······

বেলা চারিটার সময় কাছারি হইতে ফিরিতে হইল। বেদনায় সমস্ত অন্তর ভরিয়া আছে! এতগুলা টাকা এমন অকস্মাৎ! কিন্তু লৌকিকতা-রক্ষার কর্ত্তব্যও একটা আছে, সত্য!···তবু···এতটা না হইলেও হয়তো চলিত! ব্রেশলেট যথেষ্ট···তার উপর আরো? সুরাটী শাড়ী-ব্লাউশ···সে-ও না কোন্ দেড়শো টাকার ধাক্কা!···নূতন উকিল···খবরের কাগজে নিত্য নাম ছাপা হইতেছে বটে, কিন্তু তার পিছনে কতখানি তদ্বির করিতে হয়, ক'জন সে সংবাদ রাখে! অথচ নামের সঙ্গে নেট্ দাম কতটুকু ঘরে আসে!···রমেশ একটা নিশ্বাস ফেলিল।

মাধুরীর উৎসাহের সীমা নাই! অবুঝ নারী,—তোমার এ উৎসাহ রমেশের বুকে কত কঠিন বাজিতেছে!

গাড়ী আসিল। মাধুরী কহিল—কত টাকা সঙ্গে নিচ্ছ?

রমেশ কহিল,—কত নিতে বলো?

মাধুরী কহিল,—পাঁচ-সাতশোর কমে কি হবে? ও সবে যা খরচ হবে, সে তো ফর্দ্দ ফেলে দেবে বাবার কাছে। বাবা টাকা দেবেন।

রমেশ কহিল—তিনি পাঁচশো টাকা পাঠিয়েছেন টেলিগ্রাফিক মনি-অর্ডারে। কোর্টে পেয়েছি।

মাধুরী কহিল—বাবা সে দিকে খুব হুঁশিয়ার। তাঁর পাছে মনে ভাবে, এতগুলো টাকার ফেরে ফেলচেন তা পাঁচশো টাকায় বাবার বাজার হবে না?

রমেশ কহিল—দেখি।

মাধুরী কহিল,—তা হলে গহনা আর সাড়ী-ব্লাউশের জন্য তোমার শ'তিনেক তুমি সঙ্গে নাও।

রমেশ কহিল—বেশ!

গাড়ীতে বসিয়া রমেশ কহিল—চলো রাধাবাজার।

রাধাবাজারে বাজার সারিয়া গাড়ী চলিল মিউনিসিপাল মার্কেটে।

ধালামলের দোকানে বহু শাড়ী দেখিয়া যেটা পছন্দ হইল, সেটার দাম তিনশো টাকা। মাধুরী শুষ্ক চিত্তে কহিল,—এত দাম! তুমি পারবে কেন? না এর চেয়ে কম দামের দিতে বলো।

তাহাই হইল। দেড়শো টাকায় শাড়ী-ব্লাউশ কাপড়ে পাড় বসানো এবং ব্লাউশ তৈরী—তা কাল বেলা দুটায় বাড়ীতে ডেলিভারী দিবে! মাধুরী কহিল—নিশ্চয় চাই। না হলে—

দোকানের লোক কহিল,—দাম এখন না হয় দেবেন না। বাড়ীতে মাল পৌঁছুলে দাম দেবেন।

মিঠা পাণ এবং লিমনেড দিয়া তারা খুব খাতির অভ্যর্থনা করিল। সেখান হইতে বাহির হইয়া মাধুরী কহিল—গহনাটা নিয়ে ফ্যালো; তার পর দেশী শাড়ীগুলোর জন্য যেতে হবে বড়বাজার। কালকের জন্য আর কিছু ফেলে রেখো না।

রমেশ যেন নির্জীব পুতুল বনিয়া উঠিয়াছিল মাধুরীর ইঙ্গিতে তার চলা-ফেরা! সে কহিল,—তথাস্তু

ফর্দ্দ-মাফিক বাজার করিয়া রমেশ যখন বাড়ী ফিরিল রাত তখন এগারোটা। দেহ-মন অত্যন্ত শ্রান্ত। গাড়ী হইতে নামিয়া মাধুরী ডাকিল,—গোটলা···

গোটলা ভৃত্য। মাধুরী কহিল—জিনিসপত্তরগুলো নামিয়ে নে।

জিনিস-পত্র নামানো হইল···বিস্তর মোট। দোতলার ঘর একেবারে জিনিসে থৈ-থৈ করিতে লাগিল! মাধুরী কহিল,—তুমি খেতে বসো গো। আমি সব মিলিয়ে নিচ্ছি।

রমেশ কহিল,—দাঁড়াও। গাড়োয়ানকে আগে বিদায় করি!

বিদায় দিতে বচনের রাশি ব্যয় করিতে হইল, শেষে নগদ সাড়ে ছ টাকায় গাড়োয়ান চুপ করিল। মুখ হাত ধুইয়া রমেশ আহারে বসিল, মাধুরী ফর্দ্দ ধরিয়া জিনিস মিলাইতে সুরু করিল।

ক! বরের ফুলশয্যার জন্ত ভালো ধুতি ও উড়ানির
টা? নাই। মাধুরী ডাকিল,—গোট্‌লা…
ট্‌লা আসিল!—মাধুরী কহিল,—সব জিনিষ
মিয়েছিলি?
টলা কহিল—হ্যাঁ, মা।
কখ্‌খনো নয়। এই তো একটা প্যাকেট পাওয়া
া! দামী কাপড়! কত দাম গা?
মশ হতভম্ব! সে কহিল,—তা ধুতিখানা এগারো
ার উড়ানি পাঁচ টাকা চার আনা।
ধুরী কহিল—ষোল টাকা চার আনা! ওরে, ছাখ্‌,
-গাড়ী আছে কি না?
মশ কহিল,—গাড়ী চলে গেছে অনেকক্ষণ। ভাড়া
চ।
াধুরী কহিল,—ওরে গোট্‌লা, ছাখ্‌ বাবা,—
য়ানকে চিনতে পারবি না?
মেশ কহিল,—ওর কাজ নয়। গাড়ীর নম্বরও ছাই
রাখিনি! ফ্যাশাদ!
ঠিয়া সে গায়ে জামা চড়াইল।
াধুরী কহিল,—কোথায় যাচ্ছো?
মেশ কহিল,—গাড়ীর সন্ধানে।
াধুরী কহিল,—এই এত ঘুরে…এখনি? কষ্ট হবে
!
মেশ কহিল,—কষ্ট হলে আর কি করচি, বলো?
াধুরী কহিল,—তাও বটে! ওদিকে এতগুলো
জিনিষ খামোকা শুণকার দেবে!
মৎকার! ইহারি নাম সহানুভূতি! রমেশ দ্রুত
হইয়া গেল।
প্রথমেই গাড়ীর ষ্ট্যাণ্ডে।…দু'খানা থার্ড ক্লাশ গাড়ী
াড়াইয়া আছে। তাদের প্রশ্ন করিল,—জানিস্‌,
না সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ী পাঁচটা থেকে এগারোটা
হাজরে দিয়েছিল?
চারা বলিল,—না বাবু…
উপায়? রমেশ থানায় ছুটিল। ডাকাডাকি করিতে
কোট-পেন্টুলেন-পরা বাবুর দেখা মিলিল। সব
া তিনি কেশ লিখিলেন। প্রথমটা নানা ওজর
রাছিলেন; কিন্তু রমেশ উকিল,—পরিচয় পাইয়া
শ লিখিলেন এবং তাকে লইয়া জমাদারকে বাহির
দন। দু'ঘণ্টা ধরিয়া এ আস্তাবল ও আস্তাবল
ার পর একটা লোক খবর দিল, ঠিক! আব্‌দুল
ম্যান ভাড়া গিয়াছিল বটে—ঘণ্টা-হিসাবে, বেলা
ার; এবং ফিরিয়াছে অনেক রাত্রে!
ইন্‌স্‌পেক্টর কহিলেন,—আব্‌দুলের বাড়ী কোথায়?
লোকটা কহিল,—তিলজলায়।
তিলজলা! কিন্তু এখন উপায় কি? নালিশ এখন
রুজু হইয়াছে। আইনের চাকা যখন ঘুরিয়াছে, তখন
সে তো এমনিতে থামিবে না!

ইন্‌স্‌পেক্টর কহিলেন,—কি করবেন মশায়?

রমেশ তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। সে কহিল—
যখন নেমেচি,তখন একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়চি না।

ট্যাক্সি চলিল তিলজলায়। লোকটাকেও সঙ্গে
লওয়া হইল। আব্‌দুল কোচম্যানকে মিলিল। বেচারা
সবেমাত্র আহার শেষ করিয়া হুঁকায় মুখ দিয়াছে।
ইন্‌স্‌পেক্টর কহিলেন,—বার কর্‌ কাপড়ের মোট।

আব্‌দুল কহিল,—ভাড়া লইয়া একবার সে জগুবাবুর
বাজারে আসিয়াছিল, কার কাছে পাঁচ সিকা পাওনা
ছিল, সে টাকা লইয়া সোজা সে গৃহে ফিরিয়াছে; গাড়ীও
দেখে নাই। ঘোড়া খুলিয়াই স্নান করিয়া আহারে
বসিয়াছিল। গাড়ী আস্তাবলে—পাকিট থাকে তো
সেইখানে আছে।

আস্তাবলে গাড়ী দেখা হইল। মাল নাই। ইন্‌স্‌পেক্টর
বাবু কহিলেন,—ব্যাটা [illegible]!

আব্‌দুল কহিল,—মিথ্যা তাকে গালি দেওয়া
হইতেছে। সে নিরপরাধ।

তার বাড়ী তল্লাসী হইল। কা[illegible] মিলিল না।
ইন্‌স্‌পেক্টর কহিলেন,—চ, ব্যাটা থান[illegible] কাপড় দিবি
না যখন…

তাই হইল। বেচারা আব্‌দুল ন[illegible]কে পাকি
দিয়া থানায় আসিল। তার বক্তব্য লিখিয়া ইন্‌স্‌পেক্টর
ডায়েরি শেষ করিলেন—রাত তখন দুটো বাজিয়া
গিয়াছে।

উত্ত্যক্ত প্রাণ আর বিরক্ত চিত্ত লইয়া রমেশ গৃহে
ফিরিয়া ট্যাক্সির ভাড়া দিল সাত টাকার উপর। বিরক্তি
মাত্রা বাড়িয়া গেল; ট্যাক্সি বিদায় লইলে গোট্‌লা দ্বার
খুলিয়া দিয়া কহিল,—সে কাপড় পাওয়া গেছে।

কুণ্ঠা এবং উত্তেজনা—চিত্ত-বৃত্তির উভয়বিধ ব্যাপারে
গোট্‌লার কণ্ঠস্বরে তোৎলামি জাগে; তার কথা
শুনিয়া রমেশের পা টলিল—ভূমিকম্পের দোল
না কি?

ব্যাপারটা ঠিক ঠাহর করিয়া লইবার পূর্ব্বে
অস্থির পা দুটা তাকে টানিয়া একেবারে দোতলায়
আনিয়া হাজির করিয়া দিল। পত্নী মাধুরী মেঝের উপর
জিনিষ ছড়াইয়া তাহা তখন গুছাইতে ব্যস্ত। রমেশের
পিঠে কে যেন চাবুক মারিল! ভাবিয়াছিল, তারই জন্য
উদ্বেগে মাধুরী নিশি জাগিতেছে! তার পরিবর্ত্তে সে
যখন দেখিল, উদ্বেগ বিন্দুমাত্র নাই, মাধুরী ভগ্নীর
বিবাহের জিনিস-পত্র লইয়া স্বামীর কথা ভুলিয়া
গিয়াছে, সে বেচারা কোথায় কত ঘুরে পাড়ি দি[illegible]

আসিল—বেলা পাঁচটা হইতে পাড়ির আর বিরাম নাই, তখন—

তার সাধ হইল, এই দণ্ডে ঘর ছাড়িয়া সন্ন্যাস লইয়া বাহির হইয়া পড়ে। কিসের জন্য ঘর-সংসার? এখানে স্নেহ কোথায়?

তাকে দেখিয়া মাধুরী হাসিয়া কহিল,—কি রকম মানুষ, বলো দিকিনি, তুমি! কাণ নে গেল কাকে তো কাকের পিছনে ছুটলে অমনি! কাণে হাত দিয়ে মানুষ দেখে আগে, কাণ দুটো সত্যি গেল কি না!

একদিকে নিরুদ্দেশ নিষ্ফল ভ্রমণ—তাও পয়সা খরচ করিয়া, তার উপর পত্নীর মুখে এই হাসি আর হেঁয়ালি, কোনো পুরুষের তা সহ্য হয় না—পত্নী নিতান্ত নবোঢ়া হওয়া সত্ত্বেও! তপ্ত ঝাঁজালো স্বরে সে কহিল—তার মানে?

মাধুরী কহিল,—কাপড়ের প্যাকেট সিঁড়ির নীচে পড়ে গেছলো—গোটলা বার করলে।

রমেশ গর্জ্জন করিয়া উঠিল—মিছে কথা! বেটা চোর! চুরি ধরা পড়বে, সেই ভয়ে বার-করে দেছে।

মাধুরী কহিল—আহা, না গো না! গোট্‌লাকে ডেকে আমি বলছিলুম,—বাবু বেরিয়ে গেলেন, এই খাটুনি—তোমরা বাড়ী থেকে দেখে শুনে জিনিষগুলোও নামাতে পারো না, এমন নবাব! বক্‌তে বক্‌তে নিজেই নেমে নামছিলুম। নামতে গিয়ে দেখি, সাদা একটা কি পড়ে আছে সিঁড়ির পাশে। গোট্‌লাকে আন্‌তে বললুম। গোট্‌লা আনলে দেখি, সেই ফুল-শয্যার কাপড় আর উড়ানি।

মাধুরীর কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে রমেশ আবার উঠিয়া দাঁড়াইল, তোলা পাঞ্জাবীটা টানিয়া গায়ে চড়াইল।

মাধুরী কহিল—কোথায় আবার যেতে হবে এই রাত্রে?

রমেশ কহিল,—থানায়! বলিয়া ব্যাগটা খুলিয়া গণিয়া দেখে, চৌদ্দটা টাকা আর ক-আনা পয়সা এখনো অবশিষ্ট আছে!

মাধুরী চমকিয়া কহিল—থানায় কেন?

রমেশ কহিল,—একটা নিরীহ নির্দ্দোষ লোককে তার বিশ্রাম-শয্যা থেকে টেনে হাজতে পুরে রেখে এসেচি—তার প্রায়শ্চিত্ত করা চাই। যদি দণ্ড নিয়েও তার ক্ষমা পাই, দেখি।

মাধুরী রমেশের হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল—এত রাত্রে আর যায় না। কাল সকালেই যেয়ো গো। শরীরের উপর যে ধকল চলছে সারাদিন! শেষে কি···

রমেশ কহিল,—শ্যালীর বিবাহে যদি জান্ দিতে হয়, দেখো, দিয়ে জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখবো।

দুর্জ্জয় গোঁ-ভরে রমেশ দুপ্-দাপ্ শব্দে নীচে নামিয়া গেল, ডাকিল,—গোট্‌লা···

—আজ্ঞে!

—সদর দোর বন্ধ করে দে। আমি বাইরে যাচ্ছি।

থানায় গিয়া আবার ইন্‌স্পেক্টরের সাক্ষাৎ-লাভ—সে যে কি ব্যাপার! তাঁর তো শ্যালী-দায় নয়! তবে ইন্‌স্পেক্টরের মনে সহসা কি ভাবের উদয় হইল, বলা যায় না! তিনিও সংবাদ পাইয়া তাঁর চিরাচরিত প্রথা ভুলিয়া থানার অফিস-ঘরে আসিয়া দেখা দিলেন।

রমেশ তাঁকে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিল। হয়তো তাঁরো কোন দিন শ্যালীর বিবাহে এমন দায় ঘটিয়াছিল, কিম্বা রমেশের শ্যালীদায়ের আন্তরিকতা দেখিয়া প্রাণে মমতা জাগিয়াছিল! নহিলে এমন দরদ! তিনি বৃত্তান্ত শুনিয়া আবার ডায়েরি খুলিলেন এবং কি কতকগুলা লিখিয়া হাঁক দিলেন,—দরোয়াজা—

লাল-পাগড়ী এক সিপাহী আসিয়া সাম্‌নে দাঁড়াইল। ইন্‌স্পেক্টর বাবু কহিলেন,—আবদুল কোচম্যান আসামীঠো লে-আও!

সে আসিলে ইন্‌সপেক্টর কহিলেন,—তোর জামিন হবার কেউ নেই? তা' লাইসেন্স আছে, কোচম্যান, পালাবি আর কোথায়? একটা মুচ্‌লেকা সই ক'রে আপাততঃ বাড়ী যা। কাল মোদ্দা ঠিক বেলা ন'টায় এখানে আসবি,—বুঝলি?

আব্দুল সেলাম করিয়া কহিল,—হামারা কুছ কশুর নেহি, বাবু।

রমেশ তাকে কি বলিতে যাইতেছিল, ইন্‌সপেক্টর বাবু বাধা দিয়া বলিলেন,—আপনি একটু চুপ করুন। আদালতের ঘর ছাড়া উকীলদের বুদ্ধি খোলে না বলে একটা কথা আছে—সে কথা ভারী ঠিক! না?

রমেশ এ-কথার অর্থ বুঝিল না, চুপ করিয়া রহিল। আব্‌দুল মুচ্‌লেকা সহি করিয়া বিদায় লইতেছিল, রমেশ কহিল,—সেই তিলজলা অবধি বেচারা হেঁটে যাবে? ওর গাড়ীভাড়া···

ইন্‌স্পেক্টর বাবু কহিলেন,—আঃ, আবার দরদ কেন! যেতে দিন না ওকে—

রমেশের বিস্ময় বাড়িল; কিন্তু মাথা সারাদিন এত খাটিয়াছে যে তার আর খাটিবার শক্তি ছিল না।

আব্‌দুল চলিয়া গেলে ইন্‌স্পেক্টর কহিলেন,—ওকে এখন সব কথা খুলে বলে কখনো? ও এখন তো ঐ কেঁচোটি,—ও কথা শুনলে একেবারে কেউটের মত ফণা তুলে দাঁড়াতো! ওর এই অনর্থক কর্ম্মভোগের জন্য ওকে খুশী করতে চান্ যদি তো বেশ, আলিপুরে কাল একবার আসবেন, ওকে ছেড়েই দেওয়া হবে, তখন কষ্টটা

এমনি বখশিস্ দেবেন। ব্যস্! মোদ্দা বেশ
াহিনী বানিয়েছেন, দেখছি। এ রকম গল্প
ছাপাবার মত।

শ হাসিল, হাসিয়া কহিল,—ছাপাবার মতই!
ক্টা বিপদ্ আছে তাতে।

সপেক্টর কহিলেন,—বিপদ আবার কি?

শ কহিল—আমি তালকাণা, এ কথা প্রচার
মার এই উঠতি প্র্যাক্‌টিশটা একদম মাটী হবে।
শক্তি তো নেই—তা যদি থাকতো তো প্র্যাক্‌টিশ
লও এক রকমে দিন গুজরাণ হতে পারতো।
...

সপেক্টর হাসিলেন। রমেশ কহিল,—কিন্তু আপনি
র মধ্যে পুরুষোত্তম! রাত্রে কি জ্বালাতনই করেচি,
! তবু নেমে এসেচেন, তাড়া করেন নি! থানার
সে এও বোধ হয় লিখে রাখবার মত নূতন কাহিনী!

হর পথে রমেশের মাথার ব্যথা সারিয়া আসিতে-

গৃহে পৌঁছিয়া দেখিল, মাধুরী মুখখানা ঘোরালো
বসিয়া আছে।

মেশ অপ্রতিভ। যাইবার পূর্ব্বক্ষণে যে কথাগুলা
। মাথায় বলিয়াছিল, সেগুলা শোভন তো হয় নাই,
উপর তার আষ্ঠে-পৃষ্ঠে ইতরতার ছাপ···!

হাসিয়া সে ডাকিল,—প্রিয়ে চারুশীলে···

একটা বক্র কটাক্ষে মাধুরী স্বামীর পানে চাহিল,
তার পরেই একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ভগ্ন
স্বর ফুটিল,—আমার বোনের বিয়েতে তোমার যে
কষ্ট হলো, তার জন্য তোমার পায়ে ধরে মাপ চাইছি।

রমেশ কহিল—আঃ, কি যে বলো। ছি, শ্যালীর
বিয়ে নিয়ে একটু রসিকতা করবো না?

রমেশ মাধুরীকে সস্নেহে বুকে টানিয়া লইল।

মাধুরী তখনো ম্লান! করুণ স্বরে সে কহিল,—তা
বলে জীবন-মরণের কথা?

পত্নীর অধরে চুম্বন করিয়া রমেশ কহিল,—

শুধু কি মুখের কথা শুনিবে প্রেয়সি?
বুঝিবে না কত প্রেম বহিছে রহসি!
তোমার লাগিয়া, আর শ্যালিকার লাগি
সারাদিন রোদে আর সারারাত্রি জাগি
প্রদক্ষিণিতে পারি ভুলিয়া বিপুল!
কি তুচ্ছ এ থানা, আর তিলজলার আব হুল।

হাসিয়া মাধুরী কহিল,—থামো, থামো! কের যদি
এমন কাব্য-চর্চা করবে তো আমি মাথা কুটে মরবো,
সত্যি বলচি!

জাতীয় সমস্যা

১

পূর্ব্বাভাস

সাহিত্যের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারিত্বের যে খুব একটা দাবী আছে, এ কথা জোর গলায় বলা হয়তো শক্ত!

তবে কাশীনাথ চক্রবর্ত্তীর ভাগিনেয় শ্রীমান্ কিশোরী হালদারকে তার মামার মৃত্যুর পর ছোট গল্প আর উপন্যাসে হাত পাকাইতে দেখিয়া সকলে বলিল, এটা সেই পুরানো শাস্ত্র-বচন নরাণাং মাতুলক্রমঃ—তারি ফলে, তবে দুজনের পদ্ধতিতে একটু পার্থক্য ছিল। কাশীনাথ লিখিত জমাট ডিটেকটিভ্ উপন্যাস—তাহাতে নর-নারীর যেমন সমারোহ, বৈধ ও অবৈধ প্রেমের তেমনি ঠাশ বুনানি; তবে পরিশেষে ধর্ম্মের জয় আর অধর্ম্মের পরাজয় দেখাইতে সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক কাশীনাথ চক্রবর্ত্তী কখনো কার্পণ্য করিয়াছেন, এ কথা তাঁর অতি বড়-শত্রু 'চামচিকার' অসমসাহসিক সম্পাদক-সমালোচকও কোনো দিন অস্বীকার করিতে পারিবেন না। শ্রীমান্ কিশোরী নূতন যুগের লেখক হইলেও তার রচিত গল্পে ও উপন্যাসে তরুণ-তরুণীর প্রেমের অতি মৃদু একটা ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। জাতীয়তা-গঠনের হদিশ,—যথা চরকা, খদ্দর, দেশী ছুরি-কাঁচির কারখানা, টিনে ভরিয়া দেশী মুড়ি-মুড়কি, ফল-মূল বিলাতে চালান্ দিবার প্রচেষ্টা, এমনি সব কাজের কথায় তার লেখা গল্প-উপন্যাসের প্রতি পৃষ্ঠা ঠাশা থাকে। অলীক প্রেমের রঙীন স্বপ্ন রচা—তার ধাতে মোটে বরদাস্ত হয় না।

কাশীনাথের বাস ছিল বাঁশবেড়েয়। গঙ্গার ধারে পরিচ্ছন্ন একতলা বাড়ী। স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের বালাই বহু পূর্ব্বে ঘুচিয়া গিয়াছিল। কাজেই তাঁর মৃত্যুতে হিন্দু আইন মতে কাশীনাথের একমাত্র ভাগিনেয় শ্রীমান্ কিশোরী সম্পত্তির মালিক হইয়া বাঁশবেড়ের বাস করিতে আসিল। এ বাড়ীতে পূর্ব্বে তার আসা-যাওয়া ছিল, তবে এবারে আসিল কায়েমিভাবে বাস করিতে।

একতলায় বড় ঘরের মাঝখানে একখানা তক্তাপোষ··· আর দেওয়ালের ধারে আলমারি আঁটা। সেই আলমারির মধ্যে কাশীনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত সেই সব অমূল্য উপন্যাস —"সাতখুন" "রক্ত-গঙ্গা", "বিছুটে বিষ", "সপ্তদশী সুন্দরী কামিনী", যেগুলির প্রতি পৃষ্ঠা রোমাঞ্চকর ঘটনায় পরিপূর্ণ, যাহা পড়িয়া বাঙ্লার পাঠক-পাঠিকার হৃৎকম্প হইলেও বার বার পড়িবার সাধ জাগে!

আলমারি খুলিয়া কিশোরী একখানা বই বা[hi]
করিয়া গঙ্গার ধারে আসিয়া বসিল। মামার লেখা কে
বই সে আগাগোড়া পড়ে নাই! পড়িবার ইচ্ছা ম
আজ প্রথম জাগিল। মামার সম্পত্তি তুচ্ছ করিবার না
বাঙ্লা দেশে পঞ্চাশখানা ডিটেক্টিভ উপন্যাস লিখি
যিনি বই ছাপাইয়াছেন, তাঁর আর্থিক অবস্থা যে কোন
উকীল বা পেনশন প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চে
নিরেশ নয়, এ কথা কে না মানিবে! কিশোরীই এ
মামার পরিত্যক্ত এই এষ্টেটের একমাত্র মালিক। মামু
কৃতজ্ঞতা বলিয়াও একটা বস্তু আছে। তায় কিশোরী
বিশেষ সে যখন জাতীয়তা-গঠন-সাহিত্যের একজ
উদীয়মান পুরোহিত!

কিশোরী পড়িতে লাগিল,

মধুসূদন থমকিয়া দাঁড়াইল। এ কি তাহার ভ্রম
কিন্তু পরক্ষণেই সেই শব্দ! প্রথমে অতি ক্ষীণ! বাস
শয্যায় নববধূর প্রথম প্রণয়-কাকলীর মতই সলজ্জ মৃ
আভাস, পরক্ষণে শ্রবণ-যুগল-বিদারী কোদণ্ড-টঙ্কার-সদৃ
বজ্রনাদ।

মধুসূদনের নির্ভীক বীর-হৃদয় প্রকম্পিত হইল
একদৃষ্টে সে উন্মুক্ত বাতায়ন-পথ দিয়া যে নীল নভোমণ্ড
দেখা যাইতেছিল, তাহার দিকে চাহিয়াছিল। একটি
দুইটি, তিনটি, অসংখ্য নক্ষত্র ফুটিতেছে, কখনো জ্বলি-
তেছে, কখনো নিবিতেছে! যেন মানিনী অভিসারিকা
নয়ন-মধ্যবর্ত্তী ভ্রূকুটি-ভঙ্গী!

সহসা বীণা-বিনিন্দিত স্বরে পার্শ্বে কে কহিল,—
আপনার অদ্ভুত সাহস!

চমকিয়া মধুসূদন দেখে, সে কি দৃশ্য! পাঠক, ঘন-
কৃষ্ণ আকাশ-বক্ষে তুমি স্থির-কাদম্বিনী দেখিয়াছ?
পাঠিকা, দর্পণে প্রিয়সমাগম-জনিত-হর্ষ-পরিপূর্ণ আস্যে
নিজের হাস্যছবি প্রত্যক্ষ করিয়াছ?

কিশোরীর মনে হইল, ধেৎ! এই সব উপমার
পাহাড় তুলিয়া বক্তব্যকে পিছাইয়া দেওয়া—এ যে বি
বদ রোগ! তবু না, নেহাৎ মন্দ লাগিতেছে না
তো! ঘটনা বেশ জটিল হইয়া উঠিয়াছে! কিন্তু
ডিটেক্টিভ উপন্যাসে এত নারীর সমাবেশ কেন?
আর একটা পৃষ্ঠা সে খুলিল। সে-পৃষ্ঠায় লেখা
আছে,—

কুলসম পাণ চিবাইতে চিবাইতে কহিল, তোমার
ভুল, বাপজান্। তুমি যাকে দেখিয়াছ, সে ফতিমা নয়।
তার নাম লুৎফন্নেসা। দেখিতে ফতিমার মতই। ফতিমার

তাহাকে দেখিলে কস্তিমার সমস্ত তন্ত্রী বলিয়া তে পারে।

এক পৃষ্ঠার তিন ছত্রে তিনজন নারী! এরা মুসলমান। ব্যাপার কি?

ঘরে ফিরিল এবং আলমারির মধ্যে বই রাখিয়া র ঘুরিয়া সব দেখিতে লাগিল। বাড়ীর পাশেই গলি, গলির ওধারে শিবের মন্দির, মন্দিরের ংলগ্ন একখানি ফুলের বাগান। মন্দির ও তার ধ্যে যে-গলি, সেই গলি এই প্রান্তে পায়ে-চলা সৃষ্টি করিয়া নদীর গায়ে মিশিয়াছে।

ভাবিল, পল্লীর নিভৃত কোণে ভাগ্য-ক্রমে যখন া মিলিয়াছে, তখন এ অবসরটুকুর পরিপূর্ণ সুযোগ সে জাতীয়তা-গঠনের উদ্দেশ্যে উপন্যাসের মধ্য দিয়া স্তারাশি দেশের সম্মুখে ধরিবে, যাহা পড়িয়া বাঙালী মানুষ এবং অচিরে স্বরাজ তার করতল-গত হয়!

বড় ঘরটি লেখার পক্ষে চমৎকার জায়গা,—ঐ নদীর জল—ওপারে গাছের অন্তরাল—তার আছে, দেখা যায় না! তার মনের মধ্যকার রাশির মতই! এ সমস্যার পিছনে কি অপূর্ব্ব, -ভরা সুন্দর সমাধানের না দেখা মিলিবে!—মন শীতে ভরপুর হইয়া উঠিল!

ঙ্গীর মধ্যে একটিমাত্র কুকুর—নামজাদা নয়! দেশীয় জীব! পথে অনাহারে পড়িয়াছিল, া কিশোরীর মনে করুণার সঞ্চার হয়। ভগবানের প্রাণী! কুড়াইয়া ঘরে আনে। সেই অবধি তার য়ে রহিয়া গিয়াছে। মায়া কোন্ দিক দিয়া যাকার প্রাণে চরণপাত করে, বুঝিবার উপায়! কুকুরটার উপর কিশোরীর মায়া জন্মিয়াছিল, বড়েয় আসিবার সময় তাকে ফেলিয়া আসিতে পারে। কাজেই কালু তার সঙ্গে আসিয়াছে।

প্রভুর মত কালুও খুশী! কোথায় ঘরের বদ্ধ কোণে কারে পড়িয়াছিল—এখানে অবাধ মুক্ত আলো-য়া, উন্মুক্ত প্রান্তর!

গঙ্গার ঢেউ দেখিতে দেখিতে কিশোরী ডাকিল,—

(—

কালুও নদীর দিকে চাহিয়াছিল; এ আহ্বানে ল্যাজ ড়য়া আসিয়া প্রভুর গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল—এবং টা আনন্দের সাড়া তুলিল—ভৌ-ঔ!

২

কালুর পাপের প্রায়শ্চিত্ত

পরের দিন! বেলা প্রায় আটটা। তক্তাপোষে রা মোটা খাতা লইয়া কিশোরী "জাতীয় সমস্যা" জান লিখিতেছিল। দারিদ্র্য প্রভৃতি সমস্যার কথা কাঁদিবার পরই স্বদেশীয়ানার বনিয়াদ না হইলে জাতীয়তার বিরাট সৌধ তোলা সম্ভব নয়—এই কথাটা মহানন্দ স্বামীর মুখে সে গুঁজিয়া দিয়াছিল; তার পর সে খদ্দর আর চরকার মশলা মাখিয়া কার মুখে ধরিয়া দিবে ভাবিতেছে, এমন সময় ঘরের পাশে একটা কণ্ঠস্বর ফুটিল—জনুদা—

জনুদা ওরফে জনার্দ্দন কাশীনাথের ডান হাত ছিল। তার রান্না-বান্না দেখা, উপন্যাসের হিসাব রাখা, ভি-পি ডাকে বই পাঠানো—এ-সব কাজে সে খুব পটু। কাশীনাথের পরিত্যক্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির সঙ্গে এই জনার্দ্দন মায়াও কাশীনাথের ভাগিনেয় শ্রীমান্ কিশোরী হালদারের অধিকারে অর্শাইয়াছিল।

ডাক শুনিয়া কিশোরী ফিরিয়া চাহিয়া দেখে—একটি ছোকরা। আদুড় গা, ময়লা রং, দ্বারের পাশে অত্যন্ত কুণ্ঠা-ভরে দাঁড়াইয়া। কিশোরী কহিল,—জনু বাড়ী নেই। ডাকঘরে গেছে টাকা আনতে। কি চাই? এদিকে এসো।

ছোকরা আসিল, আসিয়া কহিল,—বই। পিশিমা বই পড়ে কি না—পড়া হয়ে গেছে। তাই এটা ফেরত এনেচি। আর একখানা বই চাই।

—কি বই?

ছোকরা বইখানা কিশোরীর হাতে [illegible]। মলাট দেওয়া। পাতা উল্টাইয়া কিশোরী দেখে, তাহারি স্বর্গীয় মাতুলের লেখা উপন্যাস, "বেলে কাটা"। কিশোরী কহিল,—কে তোমার পিশিমা?

ছোকরা কহিল,—নেই যে 'বামুন-বাড়ী আছে না! সামনে ঐ মস্ত তেঁতুল গাছ—সে বুঁচির পিশিমা। ত বুঁচিও এসেচে। আমায় বুঁচি সঙ্গে আসতে বললে বি না······

কিশোরী হাসিল, হাসিয়া কহিল—বুঁচি আবা কে? সে কোথায়?

ছোকরা কহিল,—বুঁচি পিশিমার ভাই-ঝী। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বললে, নতুন লোক এসেচে, চেনে না। তার আসতে লজ্জা করছিল, তা আমায় নিয়ে···

কিশোরী কহিল,—ও! ব্যাপারখানা সে বুঝিল সে কহিল,—তোমার নাম?

ছোকরা কহিল,—আমার নাম ঠাকুরদাস। বামুন দের বাড়ীর ঠিক পিছনেই—

কথা তার শেষ হইল না। বাহিরে কুকুরের ডা ও সঙ্গে সঙ্গে একটা ভীত আর্ত্তরবে দু'জনেই চমকিয়া উঠিল, এবং ঠাকুরদাস কথার খেই ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল —ও যে বুঁচি! বলিয়াই সে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে দিকে ট দিল। কিশোরীকেও উঠিতে হইল।

উঠিয়া বাহিরে আসিয়া কিশোরী দেখে, তারই প্রিয় অনুচর কালু এক কীর্ত্তি বাধাইয়াছে! একটি মেয়ে সামনের গাছতলায় পড়িয়া, আর কালু তাকে ঘিরিয়া মহা-আস্ফালনে কলরব তুলিয়া লম্ফ-চর্চ্চা করিতেছে!

কিশোরী মেয়েটিকে তুলিল। তার কপাল কাটিয়া রক্ত ঝরিতেছে, ঠোঁট ছেঁচিয়া গিয়াছে। মেয়েটি কাঁদিয়া কহিল,—আমার টেপু—টেপু—টেপু? ও ঠাকুর-দাস রে—

বিস্ময়ে কিশোরী ঠাকুরদাসের পানে চাহিল। ঠাকুর-দাস কহিল,—টেপু ওর বেরাল! তা, কোথায় গেল রে, বুঁচি?

বুঁচি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—আমার কোলে ছিল। এঁ্যা···এই মুখপোড়া কুকুরটা কোথা থেকে এসে ঘেউ ঘেউ করে তাকে কামড়াতে গেল। এঁ্যা···টেপু ভয়ে পালিয়ে গেল। আমিও পড়ে গেলুম।

বুঁচি ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কিশোরী সমস্যায় পড়িল। জাতীয়তা গঠনের বিপুল সমস্যার মাঝে এ সমস্যা কোনো দিন তার মনে উদয় হয় নাই।

কিন্তু সমস্যা নিজেই না কি অনেক সময় সমাধানের উপায় খোঁজে! সুতরাং এ সমস্যা কিশোরীর চোখে সমাধানের উপায় দেখাইয়া দিল। কিশোরী কহিল, —বাড়ীতে এসো বুঁচি।

বুঁচি উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পায়ে অত্যন্ত বেদনা! সে কাঁদিয়া উঠিল,—পায়ে লাগচে।

ঠাকুরদাস কহিল,—পা মচকে গেল নাকি?

কালু তখনো লম্ফ-সহযোগে চীৎকার করিতেছিল। সেটা ঠিক অভিনন্দন নয়! কিশোরী সবলে তাকে একটা পদাঘাত করিল। এ শাস্তি সে বহুদিন ভুলিয়া-ছিল; সহসা পূর্ব্বস্মৃতি জাগিতে কালু আর্ত্ত রব তুলিয়া ল্যাজ গুটাইয়া একদিকে ছুট দিল।

কিশোরী তখন ঠাকুরদাসের সাহায্যে বুঁচিকে এক-রূপ দোদুল অবস্থায় আনিয়া তক্তাপোষের উপর শোয়াইয়া দিল।

তার পর পরিচর্য্যা। জল আসিল, ঠাকুরদাস কোথা হইতে এক-রাশ দূর্ব্বা-ঘাস আনিয়া জলে ভিজাইয়া ছেঁচিয়া কিশোরীর হাতে দিল, কহিল—কাটা জায়গায় এগুলো চেপে দিন্!

সসম্ভ্রমে কিশোরী ঠাকুরদাসের পানে চাহিল। টিংচার আয়োডিনের কথা তার মনে জাগিতেছিল, কিন্তু ঘরে সে বস্তু নাই! এ সমস্যার সমাধানে ঠাকুরদাসের মুষ্টি-যোগ-চিকিৎসার উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। ছেঁচা ঘাসগুলা বুঁচির ঠোঁটে ও কপালে সে লেপিয়া দিল। বুঁচি কহিল—আঃ!

ঠিক! কিশোরী কবে কোন্ দৈনিক কাগজে ফার্ষ্ট এড-এর কথা পড়িয়াছিল। তাহা মনে পড়িল। বুঁচির দুই পা ধরিয়া হুঁশিয়ার ভাবে সে টানিয়া দিল; বুঁচি চীৎকার করিয়া উঠিল,—ওগো, মা গো!

ফ্যাশাদ! কালুর উপর রাগে কিশোরী তাতিয়া উঠিল। এই নির্জ্জন গৃহ-তলে অখণ্ড নির্জ্জন অবসরে জাতীয়তা-গঠনের কত বড় কথাই না মনে জাগিয়াছিল সহসা কোথা হইতে···

কিশোরী কহিল,—পা ভেঙেচে কি না, তা তো বুঝতে পারচি না। ওহে ঠাকুরদাস···

ঠাকুরদাসও মুস্কিলে পড়িয়াছিল। বুঁচির কথায় বাঁ আনিতে আসিয়া এ বিভ্রাট ঘটিবে, তা কি সে জানিত বামুন পিশির কাছে ইহার কৈফিয়ৎও দিতে হইবে। তা ছাড়া সাঁতারের আজ মস্ত আয়োজন—সুইমিং কম্পিটি-শনের একটা ছোট-খাট রিহার্শাল আছে······

কিশোরীর আহ্বানে ঠাকুরদাস হতাশ নেত্রে তার পানে চাহিল। কিশোরী কহিল,—ডাক্তার পাবো না একজন?

—পাবেন। ঐ যে বনমালীর দোকানের পাশে দাতব্য ঔষধালয় আছে।

—একবার ছাখো! ভিজিট দেবো'খন।

ঠাকুরদাস ছুটিল। কিশোরী বুঁচির পানে চাহিয়া ছিল, দৃষ্টি খুবই করুণা-মাখা। মেয়েটি সুশ্রী নয়। আত্মীয়েরা সস্নেহে যাকে বলেন, 'পাঁচ-পাঁচি', তাই। তরুণ সাহিত্যিকের মোহ-বিভ্রম জাগাইবার বস্তু তো নয়ই! তা ছাড়া কিশোরী? সে গোঁড়া স্বদেশী। প্রেমের নামে খড়্গহস্ত। অতএব, পাঠক-পাঠিকা এ ক্ষেত্রে যা কল্পনা করিতেছেন, সে-সবের বালাই মোটে নাই। বহুক্ষণ তাকাইয়া থাকিবার পর কিশোরী কহিল, পায়ে খুব লাগচে?

বুঁচি কহিল—চেটোয়। উঃ, চেটো যেন খসে যাচ্ছে।

কিশোরী কহিল—হুঁ।

তার মাথার চারিধারে সমস্যা জটিল জাল বুনিতে সুরু করিল। এম্ব্রোকেশন, বেলেডোনা, লিনিমেণ্ট, গুলার্ড লোশন, অনেক কথা মনে উঁকি দিতে লাগিল, কিন্তু এ তো সহর কলিকাতা নয়! বাঁশবেড়ে—অজ পাড়াগাঁ! সুতরাং জাতীয় সমস্যার ফর্দ্দ আর এক দফা বাড়িয়া উঠিল।

ডাক্তার আসিলেন। নাম শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র পরামাণিক; ক্যাম্বেলের পাশ। তাহা হইলে কি হয়, চাল-চলনে পুরা সাহেব, মুখে বচনের রাশি! ক্ষুদ্র বাঁশবেড়ে গ্রাম সে বচনের ধাক্কা সামলাইয়া কি করিয়া টিঁকিয়া আছে, ভাবিয়া কিশোরীর তাক্ লাগিয়া গেল।

পা দেখিয়া তিনি কহিলেন,—হাড় ভাঙে নাই, মচকাইয়াছে। তবে লাটিন না হিব্রু কি কতকগুলা

ভাবা বলিয়া ডাক্তার পরামাণিক তাঁর মন্তব্য
রিলেন।

ারী কহিল, উপায়? কলকাতার হাসপাতালে
হবে না কি?

ার কৈলাসচন্দ্র পরামাণিক কহিলেন,—না।
সম্বন্ধে স্পেশাল ষ্টাডি করিয়া জার্ম্মাণ দাওয়াই
। রাখিয়াছেন, তারি মালিশ, এবং একটা
র দাওয়াই ইঞ্জেকশন। দুটো দাওয়াইয়ের মূল্য
। মাত্র। তবে কোথাও কোনো ত্রুটি যে থাকিবে
নশ্চিত। তার উপর পায়ের হাড় জন্মের মত
ানিয়া উঠিবে। হাঁটিতে যেমন জোর মিলিবে,
চার পায়ের চামড়ার কোথাও তেমনি ফোস্কা
না!

ুর পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিশোরী করিল, চব্বিশ
—দশ টাকা ঔষধের দাম ও ষোল টাকা ভিজিট
সার্জ্জারী-কেশে ডাক্তার পরামাণিক ষোল টাকার
লন না! ডাক্তারের উপর মন যে খুব প্রসন্ন
তা নয়। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্বেলের উপরও মেজাজ
ইল! তার পর বুঁচিকে বাড়ী পাঠানো!
। পরামাণিক বলিলেন, না। চব্বিশ ঘণ্টা
চাড়া মোটে নয়।

কা লইয়া সহর্ষে পরামাণিক প্রস্থান করিলেন
ন্তুর সাহায্যে বুঁচির পিশিমা প্রভৃতিকে আনাইয়া
গের ঘর ছাড়িয়া দিয়া কিশোরী মর্ম্মাহত বুকে
লজ্জিত মুখে পাশের ছোট কামরায় আশ্রয় লইল।

৩

জাতীয়তার যজ্ঞ

ঘণ্টা পরে বুঁচির এক আত্মীয় যুবা বুঁচিকে দেখিতে
।। দূর-সম্পর্কে ইনি বুঁচির পিশিমার কি রকম
পো; নাম অমিয়লাল। অমিয় হুগলি কলেজে
এবং বাঁশবেড়ের তরুণ-সভার সম্পাদক। সে কবিতা
গল্প লিখতে সুরু করিয়াছে। কোন জমিদারের
পুত্রকে বাগাইয়া একটা মসিকপত্র বাহির করিবার
র্তাও পাকা করিয়া ফেলিয়াছে, শুধু প্রতিশ্রুত
াতে পায় নাই; পাইলেই আগামী শুভ-আষাঢ়স্য
দিবসে মাসিকপত্র বাহির করিবে।

। কিশোরীর পরিচয় পাইল এবং কিশোরী লিখিয়ে
ও এ-বয়সে তরুণ-তরুণীর অগাধ প্রেমের গল্প
। মায়া কাটাইয়া জাতীয় সমস্যার কথা লিখিতেছে
। তার মনে বিস্ময়ের সঙ্গে একটু শ্রদ্ধাও জাগিল।
।পথের বাহিরে শ্রদ্ধার কেমন ঝোঁক আছে! এ
তারি দৃষ্টান্ত। কিশোরীকে ফশ, করিয়া সে বলিয়া
বসিল,—আমাদের সভায় একটা প্রবন্ধ পড়ুন না!

কিশোরী কহিল,—আপনাদের সভায় জাতীয়তা-গঠনের কোনো ব্যবস্থা আছে?

অমিয় কহিল,—সাহিত্য-চর্চ্চা। সাহিত্যই জাতীয়তা-গঠনের মূল!

কিশোরী কহিল,—ও সব সাহিত্য ঢের হয়েচে! শুধু প্রেমের গল্প আর প্রণয়ের কবিতা। ও সব রেখে মনকে বলিষ্ঠ সুদৃঢ় করতে হবে। প্যান্‌প্যানানি মোটে নয়!

—অর্থাৎ? অমিয় সকৌতূহলে কিশোরীর পানে চাহিল।

কিশোরী কহিল,—মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা চাই। ধনীর ধন বিলাসে ব্যয় হবে না—চাষের ক্ষেতে, লোহার কারখানায়, তুলার ফশলে, কাপড়ের চরকায় লুটিয়ে দেওয়া চাই।

কিশোরীর মুখের বচনে আগুন ছুটিল। অমিয় চোখে দেখিতে লাগিল, যেন সে কথার আগুনে ধনীর সিন্দুক, বিলাতী সাজ-পোষাকের মস্ত দোকান, জহরতের আলমারি, বিলাতী বুট, ম্যাঞ্চেষ্টারের জাহাজ অবধি দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছে! আগুনের সে কি সতেজ লেলিহান শিখা!

অমিয় কহিল,—কিন্তু আমাদের এ দেশ গল্পের দেশ, গাথার দেশ!

কিশোরী কহিল,—গল্প-সাহিত্যে তরুণদের মন পঙ্কিল হয়ে উঠচে। তাদের মনে পচ্ ধরচে—ওতে কাজ হবে না—অগ্নি-শুদ্ধি চাই শুধুই নারীর চটুল চাহনি, রক্তিম অধর, আর ললিত বাহু? না, নারী এ বিরাট কর্ম্মশালায় যদি আসতে চায় তো তাকেও ঐ হাপোরে ফুঁ পাড়তে হবে, হাতে হাতুড়ি তুলে নিতে হবে। নিকুঞ্জে বসে ফুলের মালা গাঁথা আর চলবে না। এখন জোরালো উপন্যাস চাই।

ব্যস রে! অমিয়র মনে পড়িতেছিল,—এই গৃহে বসিয়াই কাশীনাথের মুখে একদিন সে শুনিয়াছিল—কি করিয়া উপন্যাসের প্লটে মোচড় দিতে হয়—পাঠকের মনে লাগে এমন ঘটনার প্রলেপ কি করিয়া দিতে হয়! আর আজ?—এই বয়সে কিশোরীর মনের মধ্যে এত আগুন জ্বলিল কি করিয়া? ভাবিয়া তার তাক লাগিয়া গেল!

সে কহিল,—কিন্তু এই সব কবিতায়-গল্পে মানুষের মনের কত পরিচয়—তার সুখ-দুঃখ···কথাটা আর শেষ হইল না।

বুঁচির পিশিমা আসিয়া কহিলেন—ওর পা ভালো আছে বাবা। ওকে বাড়ী নিয়ে যাই।

কিশোরী কহিল—কিন্তু ডাক্তার নড়া-চড়া বারণ করে দেছেন।

পিশিমা কহিলেন—কৈলেস তো! ওর ধুমধাম বাবা সবতাতেই আছে। অনর্থক তোমার এতগুলো টাকা···

সেটা মর্মে মর্মে অনুভব করিলেও মুখে কিশোরী কহিল—বাজে খরচ নয় তো।

পিশিমা কহিলেন,—এ শুধু তোমার উপর জুলুম হচ্ছে, বাবা। কিছু ভাবতে হবে না। পড়ে গেছলো; পায়ে লেগেছিল—একটু রেড়ির তেল মালিস করে দেবো···সেরে যাবে।

কিশোরীর মনে আবার এক সমস্যার উদয় হইল। ওই জার্মান ঔষধগুলা···বিদেশে বিজাতীয়দের ধাত বুঝিয়া তৈরী! বাঙলার ধাতে ও-সব খাপ খাইবে কি? তার চেয়ে সনাতন যুগ হইতে ঐ যে রেড়ীর তেল, গাছ-গাছড়ার রস চলিয়া আসিতেছে···! জাতীয়তার সহিত জাতিটাও তো এই সব ঔষধে টি'কিয়া আসিয়াছে এত কাল!···কিশোরী বিরাট গ্রন্থের নির্ঘণ্ট আবার বাড়িয়া উঠিল। এও এক সমস্যা!

পিশিমা শুনিলেন না, বৈকালে রোদ পড়িলে বুঁচিকে বুকে তুলিয়া কোনো মতে গৃহে আনিলেন। কিশোরী সঙ্গে আসিল। পিশিমা বলিলেন,—বরাবর এখান থেকে কত বই চেয়ে-চেয়ে পড়েছি···একখানা বই সঙ্গে দিয়ো বাবা। পড়ার নেশা···পড়ে ফিরিয়ে দেবো।

কিশোরী কহিল,—বেশ তো! নেবেন।

সেই সঙ্গে দুঃখ হইল, লঘু সাহিত্যের প্রভাব বাঙলার অন্তান্তঃপুরকেও ঘিরিয়া ফেলিতেছে! শুধু খদ্দরের কাজ নয় এ জঞ্জাল সাফ করা!

কালুর পাপটুকুকে উপলক্ষ করিয়াই অজানা গ্রামে স্নেহ মিলিল। পরের দিন বুঁচি আসিয়া হাজির—একখানা বই চাই—এখানা পড়া হয়েচে।

কিশোরী কহিল,—তোমার পা সেরে গেছে?

বুঁচি কহিল,—হ্যাঁ।

কিশোরী কহিল,—টেপু কৈ? বিড়ালের নামটা কিশোরী ভোলে নাই—এমনই! বিশেষ হেতু ছিল না।

বুঁচি কহিল,—হ্যাঁ! তাকে আর আনচি কি না! যে তোমার কুকুর—মা গো! কাল তাকে পেলে তো গিলেই খেতো।

কিশোরী কহিল,—এই সব বই যে নিয়ে যাও, তুমিও পড়ো?

বুঁচি কহিল,—হ্যাঁ!

কিশোরী কহিল,—কিন্তু এ সব তো তোমাদের পড়ার যোগ্য বই নয়।

বুঁচি কহিল,—আমি সব বই পড়ি।

কিশোরী কহিল,—পড়ো? আচ্ছা, আমরা যে-দেশে বাস করচি, সে-দেশের নাম কি, জানো?

বুঁচি কৌতুক-ভরা দৃষ্টিতে কিশোরীর পানে চাহিল, কহিল,—তা আর জানি না! এ হলো বাঙলা দেশ। আমরা বাঙালী! আমার সোনার বাঙ্‌লা আমি তোমায় ভালোবাসি!

বটে, এত দূর! কিশোরী যেন কূল পাইয়াছে এমনি ভাবে খুশী-মনে কহিল,—বাঙ্‌লা দেশ, জানো ত হলে! কিন্তু বিশ্ব-সভায় বাঙ্‌লা দেশ ঢুকতে পারচে না কেন, তা ভাবো?

বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে বুঁচি কিশোরীর পানে চাহিল। কিশোরী কহিল,—তার কারণ, বাঙালী জাতীয়তা এখনো জাগেনি! বিদেশীর ভাষায় বিদেশী আইডিয়া নিয়েই তার কারবার। বিশ্ব-সভা নকল চায় না, সে চায় আসল। আসল বাঙালীয়ানা হলো তার জাতীয়তায়। যত দিন বাঙালী নকল ছেড়ে সে আসল জাতীয়তার পরিচয় না দেবে, তত দিন জগৎ-সভায় বাঙালী ঠাঁই পাবে না। এই জন্যই চাই আমাদের দেশে বাঙালীর মেয়ে চরকা চালাবে, আর বাঙালীর ছেলে খদ্দর পরবে। বক্তৃতা করে কোনো জাত বড় হয় নি কোনো দিন তা হবে না।

কথা শুনিয়া বুঁচি অবাক! সে কহিল,—কি কাগজে পড়ি, যত নেতা বক্তৃতা দিয়েই [illegible]ড়াচ্ছেন!

কিশোরী কহিল,—ওটা দোকান[illegible] ওতে কি হবে না। খাঁটি মানুষ হতে গেলে চাই [illegible], চাই দেশে ভালোবাসা। দেশের মাটী, দেশের [illegible]-ডোবা, পুকুর মাঠ—সবের উপর খাঁটি অনুরাগ আর [illegible]তি।

বুঁচি বসিল; কিশোরীর মুখের [illegible]নে তাকাই ভাবিল, এ কি বলে!

কিশোরী কহিল,—তোমায় [illegible] পড়তে দেবে মজার বই। পড়বে? কল-কারখানার আত্মকাহিনী পড়ে বুঝবে, কি করে আমেরিকা য়ুরোপ আজ ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধিতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েচে। কি বিরাট শক্তি নি সারা পৃথিবীর অভাব সে মোচন করচে!

বুঁচি কহিল,—পড়বো। কিন্তু সেই সঙ্গে "জালিয়া যজ্ঞেশ্বর" বইটাও চাই। আমার আধখানা পড়া আছে তার পর পিশিমার অসুখ হলো বলে আর বইটা শেষ করতে পারি নি।

কিশোরী কহিল,—আগে কল-কারখানাটা পড়ে শেষ করো, তার পর জালিয়াৎ যজ্ঞেশ্বর দেবো।

বুঁচি আব্দারের ভঙ্গীতে কান্নার সুর তুলিয়া কহিল,—না, পিশিমা চেয়েছে সেই বইখানা।

সে রাত্রে বিছানায় শুইয়া কিশোরী স্বপ্ন দেখিল, সুবৃহৎ বটবৃক্ষমূলে প্রকাণ্ড বেদী, সেই বেদীর উপর বসিয়া কিশোরী জাতীয়তার বিরাট যজ্ঞ-সম্পাদনে ব্রতী—যজ্ঞাগ্নি ধূ-ধূ শিখা-বিস্তারে জলিয়া উঠিয়াছে—বুঝি গগন স্পর্শ করিবে। আর সে যজ্ঞে সমিধ বহিয়া আনিতেছে

র ক্ষুদ্র এক পল্লী-গৃহ-বাসিনী ওই ক্ষুদ্র বালিকা

বিপরীত ঘটনা

র দিনের মধ্যেই কিশোরী দেখিল, এই ক্ষুদ্র র চারিদিকে অসংখ্য সমস্যা জড়ো হইয়া আছে। াগ—ঠিক সহরের মত। অথচ ঐ পরামাণিক । জার্মাণ আর মেক্সিকান্ ডাওয়াইয়ের দাম দিতে পারে না, কাজেই চিকিৎসার অভাবে যা ভাবিতে গা শিহরিয়া ওঠে। পুষ্করিণী আছে, জল নাই। একটা ঘরে আগুন লাগিলে মানুষ- টয়া আসে, কিন্তু শূন্য কলসী দেখাইলে আগুন াভিবে না। দোকানে খাবার যা আছে, তা চেয়ে জঙ্গলে সাপের মুখে যাওয়ায় একটু আরাম ই যে, প্রাণ গেলেও দু'চারিটা পয়সা-কড়ি যা াছে, সেটুকু প্রাণের সঙ্গে অদৃশ্য হয় না! স্কুল মাষ্টার আছে, ছাত্র আছে—তবে এ তিনের বশ একটা সামঞ্জস্য নাই। ছাত্র যা বুঝিতে চায়, তা বুঝাইতে পারে না! সেজন্য অনুযোগ তুলিলে বলে, এ টাকায় অত বিদ্যা শেখানো চলে না। রী আছে, তাও লঘু সাহিত্যে পরিপূর্ণ। লোকে চটুল গল্প পড়িয়া মশ্গুল হইতে চায়। দেশকে । দিকে কাহারো আগ্রহ নাই! কোথাও দুর্ভিক্ষ হইয়াছে শুনিলে ছোকরারা নাচিয়া ওঠে—সে দুর্ভিক্ষ-দায় ঘুচাইবার জন্য তত নয়, যতখানি ওই ত দু'চার রাত্রি আলিবাবা কি আবুহোসনের ল চালাইবার জোগাড় হইয়াছে ভাবিয়া! যাদের াছে, তারা বিদেশে গিয়াছে; যাদের টাকা নাই, শে পড়িয়া ঘুমায়; জাগিয়া থাকিলে পরচর্চ্চা কিশোরী দেখিল, মনে তো দু'চারিটা মাত্র দেখা দেয়, কিন্তু গ্রামের দিকে চাহিলে? সমস্যা ক!

মিয়কে ডাকিয়া সে তরুণ সমিতির অধিবেশন —দেশের দারিদ্র্যের কথা জানাইল, সমস্যাগুলার সকলের নজর ফুটাইল। কিন্তু অধিবেশনের পর র কাজে গিয়া মন দিল। সমস্যা মুখের কথায় আবার কিশোরীর মনের মধ্যে ফিরিয়া আসিল। যেন মেঘ—সাগরের বুক হইতে আকাশে উঠিয়া ঃ সেই সাগরে ফিরিয়া শয়ন!

মিয় আসিয়া কহিল,—স্যাকরাদের মেয়েটাকে তার বাড়ীতে মার-ধর করতো বেজায়—মেরে ফেলার াড। স্যাকরা গিয়ে নিয়ে এসেছিল। নিজের মেয়ে তো! তা তারা পুলিশ ডেকে এনে মেয়েকে আর স্যাকরাকে তাদের দিয়ে বাঁধিয়ে নিয়ে গেল।

এও এক সমস্যা! জাতীয় সমস্যার আর অন্ত নাই! সমাধান কি করিয়া হয়? এ একার কাজ নয়। এই গ্রামেই যদি ছোট একটা দল···

কথাটা সে অমিয়কে খুলিয়া বলিল। অমিয় বলিল, —আমার এবার এগজামিন—

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কিশোরী কহিল,—তা বটে!

বৈকালে বুঁচি আসিল বই চাহিতে। কিশোরী কহিল,—পিশিমাকে জিজ্ঞাসা করো, কালী সিঙ্গির মহা- ভারত পড়তে চান কি?

বুঁচি কহিল,—মহাভারত আমাদের কাছে।

কিশোরী কহিল,—তুমি জানো মহাভারতের গল্প?

বুঁচি কহিল,—আহা, তা আর জানি না! গল্প যে আমি কত পড়েচি···

কিশোরী কহিল,—গল্প ছাড়া আর কিছু পড়তে ভালো লাগে না?

বুঁচি কহিল,—না।

কিশোরী কহিল,—আমাদের দেশ কত গরীব, তা জানো? অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, বিদেশ থেকে কত টাকার কাপড় আসে···কত ছুঁচ, সুতা, সাবান···?

এই যে থাকিয়া-থাকিয়া কিশোরী কি সব বকে, শুনিলে বুঁচির কেমন তাক্ লাগিয়া যায়! তার মনে পড়ে সেই জটাজুটধারী সন্ন্যাসীকে—সেবার আসিয়া পার-ঘাটে আস্তানা লইয়াছিল, কত কি বকিত, আর মাঝে মাঝে ব্যোম্-ব্যোম্ করিত, কোনো অর্থ বুঝা যাইত না! শেষে এক দিন বাসুদেবের ভাগ্নীকে প্যাঁড়া খাইতে দিয়া ভুলাইয়া তার গহনা চুরি করে। ভাগ্যে ধরা পড়িল! তখন সকলে বলিল, ভণ্ড বুজরুক! ব্যোম্-ব্যোম্ করার মতলব এতদিনে বুঝা গেল! এ-ও তেমনি কোনো মতলব লইয়া এই সব হেঁয়ালি বকিয়া যায় নাকি? বুঁচির গা কাঁপিয়া উঠিল। সে কহিল,—বই দাও পিশিমার—বা রে!

কিশোরী কহিল,—কি বই?

বুঁচি বলিল,—তা আমি কি জানি? একটা নতুন গল্পর বই দাও না।

কিশোরী ভাবিল, গল্প চাহিলে কাহাকেও বড় কথা বুঝানো কঠিন। সভা ডাকিয়া সে দেখিয়াছে, আর এই যে বাহিরের সভার প্রভাব-বিমুক্ত ক্ষুদ্র বুঁচি—এও ঐ এক কথা কয়! সকলে বলে, গল্প—গল্প চাই। তাও ঐ প্রেমের গল্প, ঘর ভাঙ্গার গল্প—তার মধ্যে দেশের কোনো সমস্যার সমাধান নাই!

কিশোরী ডাকিল,—অমু—

অমু কহিল,—কেন?

কিশোরী কহিল,—একে একখানা বই দাও। আর সেই খাতাটা দিয়ো আমাকে।

বুঁচি বই লইয়া চলিয়া গেল। কিশোরী দোয়াত-কলম-খাতা লইয়া গঙ্গার ধারে বাঁধানো চাতালে গিয়া বসিল। পাটের চাষে দেশের কি ক্ষতি হইতেছে, নিজেরা কি করিয়া ঘরের লক্ষ্মীকে রশি বাঁধিয়া বিদেশে পাঠাইতেছি—এটাকে ভিত্তি করিয়া এবার সে এক নূতন উপন্যাস ফাঁদিবে।

ওপারে যতদূর দেখা যায়—ঐ গাছপালার রন্ধ্র পথ! সে লিখিতে বসিল, ঐ গাছের রন্ধ্র পথ দিয়া একটি মেয়ে ঘাটে আসিতেছে। গৃহে তার দারিদ্র্য,—বাপ পয়সার জন্য এধারে-ওধারে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, মেয়ে ডাগর হইয়াছে—বিবাহ হয় না, সেজন্য পাড়ার লোকের গঞ্জনার অন্ত নাই! এমনি ব্যাপারে ছুটো পরিচ্ছেদ চট্‌পট্ সে শেষ করিয়া ফেলিল। তৃতীয় পরিচ্ছেদ কি দিয়া সুরু করিবে—সে ভাবিতে বসিল। ঐ মেয়ের বাপ এক বড়লোকের দ্বারে দুঃখ জানাইতে গিয়াছে? না, মা কাহারো গৃহে পাচিকা-বৃত্তির উমেদারীতে চলিয়াছে? সে ভাবিল, তার আগে পড়িয়া দেখা যাক্, কি লিখিলাম।

নিজের লেখা দুই পরিচ্ছেদ সে পড়িতে লাগিল। পড়িয়া অবাক্ হইল,—এ কি! এ মেয়েটি তো হুবহু বুঁচি! তার সেই বিড়াল টেপুটা অবধি সঙ্গে আছে। বুঁচির জায়গায় নাম দিয়াছে কাদু! তার অজ্ঞাতে বুঁচি কোথা হইতে আসিয়া এ উপন্যাসে দেখা দিল? না, এ ঠিক নয়!

দুই পরিচ্ছেদ পড়িয়া সে ভাবিল, এ লেখা বদ্‌লাইতে হইবে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষে পিশিমার কথাও আসিয়া পড়িয়াছে! বই বাহির হইলে মুস্কিল বাধিবে। উঁরা চটিয়া যাইবেন, এমন করিয়া ঘরের কথা লেখো? এ তো পর-চর্চার সামিল! বই রাখিয়া সে উঠিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। কিশোরী গ্রামের দিকে বেড়াইতে চলিল।

বুঁচিদের রোয়াকে সভার মত আসর বসিয়াছে। বয়স্ক দু'চার জন মাতব্বর চেহারার লোক, তা ছাড়া অমিয় প্রভৃতি! বয়স্কদের মধ্যে এক জন বলিতেছেন, —ও সব বক্তৃতায় কিছু হবে না হে বাপু। ও সব কথা ডব্লিউসি, সুরেন ব্যানার্জ্জী, গোখলে—এঁদের আমল থেকে বক্তৃতায় শুনে আসচি। হাতে-কলমে কিছু করতে পারো তো এসো বাপু নেতাগিরি করতে। তা নয়, নিজেরা মোটর-গাড়ীতে বসবে, আর আমরা সেই গাড়ী ঠেলবো—আমরা চাষ করবো, আর কামিনী ধানের ধপধপে চালে তোমাদের পরমান্ন বানানো হবে! হুঁঃ! ও-সব আর চলবে না।

অমিয় বলিল,—কিন্তু এই যে চারধারে এত বিষম সমস্যা—এ না হলে আমাদের জাতিই যে যে[...] পাবে।

কথাগুলা সে যা বলিতেছিল, তার সবই কিশো[...] কাছ হইতে ধার-করা। কথাগুলা বলিতে বলিতে [...] বুকের মধ্যটা আনন্দে গৌরবে দুলিয়া উঠিতেছিল। এ[...] সময় কিশোরীকে সামনে দেখিয়া সে কুণ্ঠিত হইয়া পড়ি[...] সে ভাব কাটাইয়া তর্ক লড়ায় জোর পাইবার আশায় কহিল,—এই যে কিশোরী বাবু! আসুন,—ওই কথাই হচ্ছে আমাদের!

কিশোরী সস্মিত মুখে আসিয়া রোয়াকে বসিল।

যে মাতব্বর এ তর্ক-সভার প্রধান বক্তা, তাঁর [...] ধরণীধর ঘোষাল। রেলোয়েতে চাকরি করিতেন, একটা হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে গোল হওয়ায় চা[...] খোয়াইয়াছেন, আদালতে যাইতে হয় নাই, [...] সৌভাগ্য!

তাকে দেখিয়া ঘোষাল কহিলেন,—এই যে[...] আমাদের কাশীদার ভাগ্‌নে তুমি? বটে! খদ্দর পরে[...]

কিশোরী কহিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ। এ ছাড়া আমা[...] জাতির মুক্তির অন্য পথ নেই!

ধরণীধর কহিলেন,—বটে! সকলে খদ্দর ধর[...] রাজ্যটি ইংরেজ তোমাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে দেশে চ[...] যাবে—না?

কিশোরী কহিল,—আজ্ঞে, তা নয়। তবে বিদে[...] কাপড়ে কত টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে! তাতে আমাদে[...] দারিদ্র্যই বাড়চে। খদ্দর পরলে দেশের টাকা দেশে থাকবে। তা ছাড়া ম্যাঞ্চেষ্টার এ দেশ থেকে পয়সা [...] পেলে এ-দেশের লোককে শ্রদ্ধা করবে, তখন আমাদে[...] ন্যায্য পাওনা আদায়ে সহায় হতে পারে।

ধরণীধর কহিলেন,—ওঃ, বফা! তার পর তোম[...] পাওনা-গণ্ডা আদায় করে আবার ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপ[...] ধরবে?

কিশোরী কহিল,—তা কেন?

ধরণীধর কহিলেন,—তবে কেন বাপু, যারা তাদে[...] কাপড় পরা বন্ধ করে পয়সা বন্ধ করবে—তাদের পাও[...] আদায়ে তারা সাহায্য করবে?

কিশোরী কহিল,—এর মধ্যে আরও অন্য কথা [...] আছে। মানে…

ধরণীধর কহিলেন,—মানে রেখে দাও বাপধন! পলিটিক্স বুঝি না। আমরা যে খেতে পাচ্ছি না, খে[...] দেবে? ভালো জলের অভাবে রোগে ভুগচি, জল দেবে[...] কন্যাদায়ের জ্বালায় বাড়ীতে মেয়েগুলোকে অভিশাপ দি[...] দিবারাত্র তাদের মরণ কামনা করচি—যে নারীকে তোমর[া] বক্তৃতায় কাগজের প্রবন্ধে শক্তি বলে গলাবাজী করছে[া]—সেই নারীর বিয়েয় যৌতুকের ভয়ে তাদের গল[...]

রতে পারতুম, যদি পেনাল-কোড না থাকতো
দিশ কিছু বাৎলাতে পারো, বাপু? আতার
র ছাড়া চলেন না, রেলে ফার্ষ্ট ক্লাশে টুর, লাট
মত টুর-প্রোগ্রাম বেরুচ্ছে, যখনই যাতে চাঁদা
তখনি সে ব্যাপারে হুড় হুড় করে চাঁদা দিচ্ছি,
সবও চাইছি না—ফলে আমরা যে তিমিরে
রে! মাঝে থেকে চতুর উকীল-ভ্রাতা আদালতে
রর সার্টিফিকেট এঁটে পশার বাড়াচ্ছেন, ভ্রাতা-
রোগীর বাড়ী ফী নিচ্ছেন মুঠো মুঠো, আর লিখিয়ে
য়ের দল ঢাউস-ঢাউস কাগজ বার করে ব্যাঙ্কে
কা জমা করচেন! ও-সব হবে না, আর ভুলচি
। সমস্যার চাপে মরবো, সে বি আচ্ছা!
আমাদের মাতব্বরির চাপ সইতে পারবো না।
এসো তো বাপু—পাটের চাষ বন্ধ করতে
নজেরা এসে লেগে যাও—তা না, মুখে বলবে,
ক্ষ করো, আর চেক কেটে পাটের শেয়ার

ধরের বয়স হইয়াছে—রেলোয়েতে চাকরি
, তা-ও অত বড় ব্যাপারে চাকরি খোয়াইয়াছে,
ধর ধার সহা কিশোরীর পক্ষে সম্ভব নয়। তবু
,—দেখুন, চরকার আদর যখন ছিল, তখন
র ঘরে অন্নও ছিল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা
োৎসব করে গেছেন, মন্দির প্রতিষ্ঠা করে
অতিথি-পালন…

সয়া ধরণীধর কহিলেন,—বাপু হে, সেকালে
দর ছিল স্বতন্ত্র। টাকায় তিন সের ঘী পাওয়া
—লোক-সংখ্যা ছিল কম—বাহিরের এমন প্রচণ্ড
সইতে হতো না। জিনিস ছিল শস্তা, লোক
ম, ছোট ছোট গণ্ডীর মধ্যে মানুষের আকাঙ্ক্ষাও
টি—সেকাল নিয়ে তর্ক তুলো না। তখন চোর
ডাকাত ছিল, লুঠ ছিল, লাঠালাঠি ছিল—এখন
নেই, তার বদলে যা আছে, আদালত মামলা-
, উকিল-ব্যারিষ্টার, রোগে অবধি ডাক্তারের নানা
সে-সবের উৎপাত কি সামান্য? ও-সব কাজের
য়! কাজের কথা হচ্ছে—মনকে বড় করতে হবে,
তে হবে। আর এই শিক্ষা-দায়, অন্নদায়—এই
ড় দুর্ভাবনাগুলো থেকে বাঁচাবার উপায় করো
বা—তখন দেখবে, সব ঠিক! স্বাস্থ্য ফিরতে
ণ? ও দুর্ভাবনা ঘুচলে মানুষের পরিপাক-শক্তি
, আর দুর্ভাবনা ঘুচলে ডায়েবিটীসও দেশ ছেড়ে
ব।

সবেগ তর্কের মুখে কিশোরী দাঁড়াইতে পারিল
যুক্তির চেয়ে আস্ফালন যে-তর্কে বেশী, সে তর্কের

[illegible]

৫

সমাধান

কিশোরীর মাথায় ধরণীধরের কথাগুলা বিষম জোরে বসিয়া গিয়াছিল। বক্তৃতায় প্রবন্ধে জাতিকে জাগানো সম্ভব নয়। মহাত্মাজীর দৃষ্টান্ত তো লোকের চোখের সামনে—সে ত্যাগ-মন্ত্র কেহ লইতে পারিল? বিলাসী মন বিলাসে ডুবিয়া থাকে, মাঝে মাঝে বিলাসের খোলশ ছাড়িয়া খদ্দর ঘাঁটে, সেটা ভড়ংএর জন্য—কালীঘাটের পথ-চারী কমণ্ডলু-চিমটা-লোটাধারী ভণ্ড সন্ন্যাসীর মত।

তবু দেশের জন্য কিশোরীর প্রাণ কাঁদিয়াছিল। আত্মীয়-বান্ধবহীন তরুণ মন কোথাও কোনো আস্তানা বাঁধিবার সুযোগ পায় নাই। অবলম্বন নহিলে মানুষের মন থাকিতে পারে না। তার তরুণ মনে দেশের দুঃখ সত্যই একটা স্পন্দন তুলিয়াছিল। তবে কোন্ পথ দিয়া গেলে দেশের দেখা মিলিবে এবং কি করিলে দেশের কাজ করা হইবে, তার কোনো সন্ধান সে পায় নাই। খবরের কাগজকেই সে দেশপ্রীতি ভাবিয়াছিল। এখন বাস্তবের রাজ্যে বাস করিতে আসিয়া পদে পদে তার বাধিতেছিল।

লেখা? তাহা দিয়াও আবার মানুষকে পথের হদিশ বাৎলানো চলে? লোকে লেখার তারিফ করিবে,—গল্প হয় যদি তো গল্পের গাঁথুনির বিচার করিবে, তার ভিতরে যদি কোনো বড় কথা থাকে তো দু-চার জন দু'চারিটা কাগজে তাহা লইয়া আলোচনাও করিবে! কিন্তু তার পর?

তার মনে দ্বিধা জাগিল, মানুষ এত শিক্ষা-দীক্ষা পাইয়াও সেই আদিম কালের মতই বর্ব্বর রহিয়া গিয়াছে! দরদ নাই, সহানুভূতি নাই—তবে কি ছাই মানুষ মানুষের জন্য বই লেখে? কাব্য রচনা করে? শুধু দুটা তারিফের জন্য? কাহারো প্রাণ জাগিয়া উঠিবে না?

বুঁচি আসিয়া ডাকিল,—জমুদা…

সেই প্রথম দিনের কথা মনে পড়িল। কিশোরী কহিল,—এ দিকে এসো বুঁচি।

বুঁচি আসিল। কিশোরী কহিল,—বই চাই বুঝি?

বুঁচি কহিল,—না।

কিশোরী বিস্মিত হইল। বই চাই না? সে কহিল,—বই চাই না কেন? পিশিমা…?

বুঁচি কহিল—বই ফিরিয়ে দিতে এসেচি। পিশিমার অসুখ।

অসুখ! কিশোরী কহিল,—কি অসুখ?

বুঁচি কহিল—তা জানি না। কারো সঙ্গে কথা কইচে না। চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে সকাল থেকে

কিশোরী কহিল,—ডাক্তার দেখচে না? তোমার পিসেমশায়…?

বুঁচি কহিল,—পিসেমশায় রাগ করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে।

সে কি! কিশোরী কহিল,—চলো, দেখে আসি।

কিশোরী আসিয়া দেখিল, পিশিমা স্নানের উদ্যোগ করিতেছেন। সে কহিল,—এ কি পিশিমা, তবে যে বুঁচি বল্লে আপনার অসুখ!

পিশিমা কহিলেন,—না বাবা। ও পাগল মেয়ের কথাও আবার শোনে!

পিশিমার স্বর গাঢ়, মুখ ফুলিয়াছে। পিশিমা কি কাঁদিয়াছেন? কিশোরীর বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল! সে কহিল,—কি হয়েচে পিশিমা? বলুন না আমায়?

কিশোরী পিশিমার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল।

পিশিমা কহিলেন,—ঐ হতভাগা মেয়েটাই আমায় খাবে।

বুঁচি অবাক্! কিশোরী বুঁচির পানে চাহিল, কহিল—কি করেচে বুচি?

বুঁচি কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল,—বা রে, আমি কি করলুম!

পিশিমা তার পানে চাহিলেন। পরে কহিলেন—ওদের কাছ থেকে বই আনলি তো? যা, নিয়ে আয়। বই আনিস্‌নে বলেই তো বকচি।

বুঁচি তিলমাত্র অপেক্ষা না করিয়া ছুট দিল।

পিশিমা কহিলেন,—বাপ-মা-মরা মেয়েটা বড় অভাগী! তা-ও কি ছাই রূপ আছে? বিয়ে যে কি করে হবে! তা উনি বলছিলেন, ওঁর আপিসে কে একজন বৌ-মরা আছে—তেজপক্ষে সে বিয়ে করতে চায়—পাঁচ-সাতটা ছেলে-মেয়ে আছে। তা এ বিয়ে কি করে দিই বাবা?

কিশোরীর বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। তাই তো! এ যে মহাদায়! বাঙালীর সব চেয়ে বড় সমস্যা! মেয়ে—তার বিবাহ দেওয়া চাই, তা-ও সুপাত্রে!

সহসা বাহিরে কণ্ঠস্বর,—কোথায় গো বৌমা জননী?

ঘোষাল খুড়ো! বলিয়া পিশিমা মাথায় ঘোমটা টানিলেন এবং তাঁর সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন সেদিনকার তার্কিক সেই ধরণীধর ঘোষাল।

ঘোষাল কহিলেন, গেছলুম গো বৌমা তোমাদের ওই স্বদেশী চাঁইদের কাছে। তাঁরা বলেন, দেশের বড় বড় কাজ তাঁদের হাতে, কৌন্সিল, বাজেট, লেবর…এই সব। এ সবের ভারে তাঁরা কাতর। এর মধ্যে কে মেয়ের বিয়ে দিতে পারচে না, সে ভাবনা ভাবতে গেলে চলে কখনো? তাঁকে ছেড়ে ঐ মস্ত আড্ডাটায় গেলুম, ঐ যে ছোকরারা খদ্দর ঘাড়ে নিয়ে বিক্রী করে দেশকে স্বর্গে তুলচে ভেবে বুক দশ হাত করেচে,—সেইখানে। তারা জিজ্ঞাসা করলে, মেয়ে ডাগর? বললুম, হাঁ। জিজ্ঞাসা করলে,—লেখাপড়া জানে? বললুম, হাঁ। জিজ্ঞাসা করলে,—সুন্দরী? বললুম, না বাবা, এই আমার গায়ের রং! শুনে বল্লে,—না মশাই, এখন বিবাহের অবসর নেই, তবে ডাগর মেয়ে হলে এবং এম্পায়ারে দুদিন নাচতে বা এ্যাক্ট করতে পারার ক্ষমতা থাকলে চেষ্টা দেখতুম! থিয়েটারের টাকা আর যৌতুকটা একটা ফণ্ডে জমা দিতুম! তা মা, মডার্ণ ইয়ং বেঙ্গলরা যখন এলো না, তখন এই আমি আছি। আজ দশ বছর গৃহিণী গেছেন—ভেবেছিলুম, আর ও-পথে নয়! তা ব্রাহ্মণের দায়—আমি ব্রাহ্মণ! না হয় আবার মাথা মুড়োলুম!

কিশোরী কহিল,—আপনি?

ঘোষাল কহিলেন,—হাঁ বাবা, আমিই। মেয়েটার বিয়ে কি হবে না? গরিব; পয়সা-কড়ি দিতে পারবে না যখন…অনাথা? তখন ওর এই বানের জল ছাড়া আর গতি হবে কোথায়? দেশের নেতারা বড় বড় সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন—আমরা এই ছোট ছোট সমস্যার সমাধান করি।

কিশোরী কহিল,—আমি বিয়ে করবো বুঁচিকে।

ঘোষাল কহিলেন,—তুমি? ঐ কালো মেয়ে? এতে তো poetry নেই, বাবা!

কিশোরী কহিল,—ইংরেজ আমাদের কালা নিগার বললে আমরা জ্বলে উঠি, আর দেশের মেয়েকে কালো বলে দেশের ছেলে ঘৃণায় নাক সিঁটকুবো, এর বাড়া পাপ আর হতে পারে না!

ঘোষাল কহিলেন,—তুমি! বক্তৃতা-বাজ কিশোরী এ-কথা বলচো!

ঘোষালের পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া তাঁর পায়ের ধুলা লইয়া কিশোরী কহিল,—আপনার কথাই ঠিক ঘোষাল মশায়! যদি দেশের যথার্থ মঙ্গল কিছুতে হয় তো সে বক্তৃতায় বা প্রবন্ধে হবে না; হবে শুধু হাতে-কলমে কাজে। দেশের উপর যথার্থ দরদ, যথার্থ ভালো-বাসা মানুষের যেদিন জাগবে, কন্যাদায় আর সেদিন দায় থাকবে না! দেশের নারীও যথার্থ সেদিন শক্তি হয়ে পুরুষের বুকে বিরাজ করবেন! সেদিন পুরুষ তাঁর পাণি সাধনার বস্তু বলে বরণ করবে, পীড়নে গ্রহণ করবে না!

বে-পরোয়া

নের আগের দিন। একজিবিশন্ দেখিয়া
লাম। ট্রামে কামাখ্যার সঙ্গে দেখা। কামাখ্যা
সঙ্গে প্রেসিডেন্সিতে পড়িত। সে প্রায় বিশ
কথা। কহিলাম,—কি হে, কি করচো এখন?
াখ্যা কহিল,—নানা রকম চেষ্টা দেখচি,—মানে,
ations.
লাম,—কোথায় আছো?
াখ্যা কহিল—ঠিক নেই। তবে উপস্থিত ক্যাল-
াডিংয়ে।
লাম—কলকাতায় থাকো না?
মাখ্যা কহিল—স্থিরতা নেই। ঘুরুতে ঘুরুতে
। আবার কাজের ডাক এলে হয়তো কালই চলে
বোম্বাই, নয় ম্যাণ্ডালে!
মাখ্যার বুদ্ধি ঢের। মাথা খেলাইতে সে খুব
। কলেজে পড়িবার সময় তার বহু পরিচয়
ছিলাম। কহিলাম—ফ্যামিলি কোথায়?
মাখ্যা হাসিল, হাসিয়া কহিল—ও বালাই নেই।
ফ্যামিলি প্রতিষ্ঠা করার অবসর আজো পাইনি।
স্মিত হইলাম। কলেজে কামাখ্যার প্রতিভার
দিকে বিচিত্র বিকাশ দেখিতাম। সে কবিতা
চ, পার্টিতে যাইত, কংগ্রেসে ভলাণ্টিয়ারদের সর্দ্দারী
; অর্থাৎ সর্ব্বঘটে সর্ব্বত্র তাকে বিরাজিত দেখি-
। কলেজে থিয়েটার হইবে, কামাখ্যা শীন, পোষাক,
সমস্ত জোগাড় করিয়া আনিল। ইনষ্টিটিউটে মিটিং
কাও নামজাদা ব্যক্তিকে ধরিয়া সে সভাপতি
ইয়া আনিল।
সবার কলেজে দুর্ভিক্ষের চাঁদা সংগ্রহ হইতেছিল।
টাকা, দশ টাকা এমনি চাঁদাই সকলে দিতেছে,
াখ্যার সামনে খাতা ধরিতে ফশ্ করিয়া সে একশো
সহি করিয়া বসিল। পঞ্চাশ টাকা প্রায় আট মাসে
য় হইয়াছিল, বহু তাগিদে; বাকী পঞ্চাশ-সম্বন্ধে সে
ল,—ওটা এবারে মাপ করো! আবার কখনো বন্যা-
হলে তার চাঁদা যখন সংগ্রহ করবে, তখন ও পঞ্চাশ
। তাতে যোগ করে দেবো।
কোথায় তার বাড়ী, বাড়ীতে কে আছে, সে-সংবাদ
াদের কাছে চিরদিন অপ্রকাশ ছিল। যদি বলিতাম,
মার দেশে নিয়ে চলো না হে—সে বলিত, যাবো!
ী মামলা চলেছে জ্ঞাতিদের সঙ্গে জমিদারী নিয়ে।
। চুকুক, তার পর নিয়ে যাবো। সে যা দৃশ্য দেখবে,
কার। আমার পল্লী-জননীর সে মূর্ত্তি…

কামাখ্যা চক্ষু মুদিয়া ধ্যানীর ভাবে রবীন্দ্রনাথের কয়
ছত্র কবিতা আওড়াইয়া গেল। অর্থাৎ তার ওদিকটা
আমাদের কাছে রহস্যাবৃত ছিল চিরকাল।

তার পর আমরা পাশ করিয়া জীবনের রণক্ষেত্রে
বাহির হইয়া পড়িলাম। কেহ গোছা গোছা বাণের খোঁচা
খাইয়া জর্জ্জরিত হইয়া উঠিতেছে, কেহ-বা চতুরঙ্গ সেনা-
দলের নেতা হইয়া রথে চড়িয়া বিজয়ীর বেশে ছুটিয়া
চলিয়াছে, কেহ-বা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রণক্ষেত্রে প্রাণ
দিয়াছে! কামাখ্যা কিন্তু অটুট স্বাস্থ্যে বর্ত্তমান! এই
বিশ বৎসরেও তার চেহারার পরিবর্ত্তন হয় নাই। কখনো
সাহেবী পোষাক গায়ে আঁটিয়া ট্যাক্সিতে চলিয়াছে,
কখনো ট্রামে ছিন্ন মলিন পোষাকে, আবার কখনো বা
অতি দীন মূর্ত্তিতে আসিয়া দশটা টাকা ধার চাহিয়া
হাত পাতিতেছে। আমার কাছ হইতে তিন বারে
প্রায় সত্তর টাকা ধার লইয়াছে দু'দিনের কড়ারে; দেশ
হইতে চেক আসিলেই…কিন্তু তার পর সে চেকও আসে
নাই এবং বছর কয়েকের মধ্যে দেখাও হয় নাই।
আজ দেখা হইতেই সে বলিল,—তোমার সে
টাকাটা…? আর মেরে কেটে একটা মাস। আপীলটা
জিতলেই…

তার পরই কহিল—কাল বড়দিন। এসো না আমার
বোর্ডিংয়ে। একটু চায়ের বন্দোবস্ত করবো'খন। বেলা
দুটোয় কিম্বা তিনটেয়। কি বলো—আসবে?

কহিলাম,—আসবো। থাকবে তো?

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়ে কামাখ্যা নামিয়া পড়িল
কহিল,—বাঁয়ের মস্ত বাড়ীটা ক্যালকাটা বোর্ডিং। কাল
ঠিক এসো।

পরের দিন আহারাদির পর নিদ্রালু হইয়া পড়িলাম
সহসা মনে হইল, না, ঘুম নয়! কামাখ্যার ওখানে
চায়ের নিমন্ত্রণ! বাহির হইয়া পড়িলাম।

বোর্ডিংয়ের তেতলার ঘরে গিয়া উঠিলাম। সন্ধান
লইলাম—কামাখ্যাবাবু? একটা বেয়ারা ঘর দেখাইয়া
দিল। কামাখ্যা ঘরে ছিল; এক রাশ কাগজ লইয়া কি
করিতেছিল। আমায় দেখিয়া কাগজগুলা তাড়া বাঁধিয়া
একটা টেবিলে রাখিল, কহিল,—এসেচো! বসো।

বসিলাম। কামাখ্যা কহিল,—মামলার কাগজপত্রগুলো
দেখছিলুম! তা—বাড়ীর সব খবর ভালো?

ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, ভালো।

কামাখ্যা কহিল,—হরকান্তটা ঘোর স্বদেশী হয়েচে…

কাল পার্ক সার্কাসে দেখা হলো! কি রকম moral wreck ছিল···খুব শুধরেচে তো!

আমি কহিলাম, বিষয়-সম্পত্তি খুইয়েচে···

কামাখ্যা কহিল,—যাক্, তবু ভালো, ঠিক পথ নজরে পড়েচে···খুব emotional ও! দেশের কাজে লেগেচে···ভালো···!

কামাখ্যা মুগ্ধ দৃষ্টিতে বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল—আমার মনে হইল, ভারত-মাতা হরকান্তর কাঁধে চাপিয়া ভূমিশয্যা হইতে উঠিতেছেন, বুঝি, এমন দৃশ্য সে চোখে প্রত্যক্ষ করিতেছে! কামাখ্যার মুখের ভাব তেমনি!···

ঘরের চতুর্দ্দিকে চাহিলাম। আল্নায় বেশ দামী এক বিলাতি সুট। একটা দামী চেষ্টার-ফিল্ড্। বিছানার ব্যবস্থাও পরিপাটী, পালকের লেপ,—গৃহশয্যা সৌখীন ধনীর অনুরূপ! কামাখ্যা তাহা হইলে আছে বেশ! এমন আরামে থাকে! এমন আসবাব-পত্র কিনিবার সামর্থ্য যার আছে, সে কেন আমার মত গরীবের সত্তরটা টাকা শোধ করে না? ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম!

কহিলাম—তোমার মাসী না পিশি কে বালিগঞ্জে থাকতেন না? তোমাকে ছেলের মত দেখতেন?

কামাখ্যা কহিল—হ্যাঁ। পিশিমা।

কহিলাম—তার ওখানে না থেকে এ হোটেলে এসে উঠলে যে!

কামাখ্যা কহিল—পিশিমার ওখানে নানা ঝঞ্ঝাট···স্ত্রীলোকের মেজাজ! হাতে কিছু পয়সা আছে। কাজেই খিট্-খিটে···কাজ কি ভাই সে এস্তেজারিতে···

কহিলাম,—একটু সয়ে থাকলে তোমারি তো লাভ!

কামাখ্যা কহিল,—তা ঠিক···কিন্তু—

কামাখ্যা স্থির দৃষ্টিতে বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিল, পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—মানে, আমার ভাগ্যটা যে-চক্রে চালিত হচ্ছে, সে-চক্রে কেমন গোল-যোগ আছে,···কি ঝড়ের মুখে আজীবন ছুটে চলেছি!

আমি কহিলাম—সারা জীবন মকর্দ্দমাই তো করচো!

কামাখ্যা কহিল—এক রকম তাই বৈ কি! যেন নাগরদোলায় চড়া···কখনো সেই উপরে উঠে যাচ্ছি, আবার পর-মুহূর্ত্তে নামচি মাটী ছুঁয়ে···

আমি কহিলাম,—যখন কলেজে পড়তে, তখন ফ্যাশনে তুমি ছিলে···

কামাখ্যা কহিল,—অগ্রবর্ত্তী—এই কথা বলচো তা! তা ঠিক। কিন্তু জানো না কি, কুমোরে যে চমৎকার প্রতিমা গড়ে, তার ভিতরে কি নোংরা খড়-দড়ির সৃষ্টি থাকে? অনেক সময় আমার মনে হয়, আমার ভিতরটা সেই একই রকম রয়ে গেছে, সেই খড়-দড়ি! যখন যে-কুমোরের হাতে পড়েচি, তখন তার খেয়াল আর মর্জ্জি-মাফিক্ রাংতা চাপিয়ে বেড়িয়েচি!

কথাটা কাণে ঠেকিল একেবারে নূতন! বিস্ময়ে কামাখ্যার পানে চাহিয়া রহিলাম।

কামাখ্যা কহিল—একটু ক্ষমা করো ভাই। চায়ের বন্দোবস্ত করে আসি। কথাটা বলিয়া কামাখ্যা বাহিরে চলিয়া গেল।

টেবিলের উপর মোটা একখানা ইংরাজী বহি পড়িয়াছিল। তুলিয়া দেখি, গোর্কির লেখা Mother, মামলা-মকর্দ্দমা কামাখ্যা যতই করিয়া বেড়াক, এদিকে up-to-date ঠিক আছে! বইখানার পাতা উল্টাইতে লাগিলাম!···

ঘরে সহসা বেচারা-গোছ একজন লোক প্রবেশ করিল। একখানা কাগজ আগাইয়া দিয়া কহিল—বিলের টাকাটা? বেশ হুঁশিয়ার ভাবে বিলখানা সে আমার সামনে ধরিল। দেখি, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের এক ফার্মের বিল; নূতন সুটের দরুণ ৮৫৲ পঁচাশি টাকা; পাঁচ টাকা আগাম দেওয়া হইয়াছে—বাকি এখনো আশি টাকা।

একটু শিহরিয়া উঠিলাম! কহিলাম,—যে বাবু টাকা দেবেন, তিনি বাইরে গেছেন। একটু বসো।

সে বসিল; বসিবার পূর্ব্বে দু'চারিটা তপ্ত বচন তার মুখে ঝরিল। বুঝিলাম, বেচারা এই বিল লইয়া বহুবার এ-বাড়ীর তেতলা ভাঙ্গিয়াছে। আমি গোর্কির কেতাবে মনঃসংযোগ করিলাম।

বইখানা প্রায় শেষ হইয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যও কলুটোলা, ক্যানিং ষ্ট্রীট, ষ্ট্রাণ্ড রোড পার হইয়া নদী ডিঙ্গাইয়া হাওড়ার ওধারে হেলিয়া পড়িবার উদ্যোগ করিল! কামাখ্যার তবু দেখা নাই। চিন্তিত হইলাম! কোথায় গেল চা আনিতে? মোটর চাপা পড়িল না তো?

বিল-বেহারা চঞ্চল হইল, ঈষৎ অস্পষ্টভাবে মর্ম্ম-বেদনা দু-চারি বার ব্যক্ত করিল, তার পর অসহ্য বোধ করিয়া চলিয়া গেল। আমারো অতিষ্ঠ লাগিতেছিল। একা···ঘরের দ্বার খোলা···ফেলিয়া নড়িতে পারি না। ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। পাশের ঘরে এক ভদ্রলোক বক্স-হারমোনিয়ম লইয়া সুর-সাধনা করিতে-ছিলেন। বিরক্তি ধরিল। সহসা সম্মুখে দেখি, কামাখ্যা—পিছনে পাগড়ী-ধারী একটা বয়, তার হাতে ট্রে, চায়ের কেটলি প্রভৃতি।

কামাখ্যাকে বিল-বেয়ারার কথা বলিলাম। কামাখ্যা সখেদে কহিল,—আহা, বেচারা ফিরে গেল! তাইতো, টাকাটা পড়ে আছে। সামান্তই—তাইতো কি ভাবলে!

াম,—তুমি দার্জ্জিলিং গেছলে নাকি চায়ের

াখ্যা কহিল—যা বলেচো! যা-তা চা আমি
াবি না ভাই। কলকাতায় একটিমাত্র দোকান
ই গ্যাঁড়াতলার মোড়ে। খাশ্ চীনা চা···তুমি
—বছরকার দিন···
ান করিতেছি, একটা বেয়ারা আসিয়া কহিল,—
সের টাকাটা···?
াখ্যা কহিল,—হাঁ্যা, তা আজ ব্যাঙ্ক বন্ধ কি না—
ক ভাঙ্গিয়েই চুকিয়ে দেবো। বাবুকে বলো—
ারাটা কহিল,—আজ্ঞে পরশুও এই কথা
লন!
াখ্যা কহিল,—বটে! ভুল হয়ে গেছে বাপু!
ভুল কি হয় না? তুমিই বলো।
ারা কহিল,—আজ মাসের ২৫ তারিখ। আবার
শেষ হতে চললো।
াখ্যা ঝাঁজিয়া উঠিয়া কহিল—২৫ তারিখটা
শেষেই আসে। তা সে কথা তোমার বাবুর সঙ্গে
তুমি ও-জ্যাঠামিটুকু নাই বা করলে!
ারা কহিল,—আজ্ঞে, মনিবই বলেচেন এ-কথা
।
মাখ্যা কহিল,—বলা হয়েচে তো? ব্যস্—
নাও!
য়ারা কহিল,—যাই, বাবুকে বলিগে···আপনার
শুধু বাকী···
ামাখ্যা কহিল,—কুছ্ পরোয়া নেহি!
বয়ারা চলিয়া গেল। কামাখ্যা কহিল,—এই জন্যই
ীর হোটেল চলে না। ভদ্রতা জানে না—মানুষের
মানে না। ভাড়ার একটু এদিক-ওদিক হলে
স্ত হয়ে ওঠে। বিলাতী হোটেলের বন্দোবস্তই
দা···কৌশুলির ফী-টা নেহাৎ কাল রাত্রে দিতে
তাই···হাত একেবারে খালি। কাল ব্যাঙ্কে চেক
লে তবে···
া-পানান্তে বেয়ারা তার তৈজসপত্র গুটাইল।
খ্যা তার হাতে আট আনা গুঁজিয়া দিয়া হাসিয়া
,—তোমার বখশিস্!
বয়ারা কহিল,—বিল?
কামাখ্যা কহিল,—একশো টাকার নোট আছে।
দিতে পারো?
বয়ারা কহিল,—না।
কামাখ্যা কহিল,—তবে? তাহলে বিলটা সই করে
। কাল টাকা পাঠিয়ে দেবো।
বয়ারা সেলাম করিয়া বিল সহি করাইয়া বিদায়
।

আমিও উঠিবার আয়োজন করিতেছিলাম। কামাখ্যা ধরিয়া বসাইল, কহিল,—যে জোরে আমি চালিয়ে যাচ্ছি—

মনে মনে কহিলাম, তা তো চক্ষে দেখিলাম

কামাখ্যা কহিল,—শুধু ক্রেডিট্! ক্রেডিট্টুকু ব্যবসার পক্ষে কতখানি সহায়তা করে, এদেশের ব্যবসায়ী ত বোঝে না। এই হোটেলওয়ালা—আরে, মালপত্র নিয়ে আমি তো পালাচ্ছি না বাপু—ভাড়া পাবি—দু'দিন আগে, না হয় দু'দিন পরে, এই তো কথা!

কোনো জবাব দিলাম না!

কামাখ্যা কহিল,—তুমি লগ্ন-ফল মানো? রাশি নক্ষত্রের প্রভাব?

আমি কহিলাম,—ও ভাই ঠিক বুঝি না।

কামাখ্যা কহিল,—মেনো হে! আমার পক্ষে সব কাঁটায় কাঁটায় মিলে আসচে! আমার নক্ষত্রে বলে, সঞ্চয় থাকবে না, ব্যয়-বাহুল্য—তবে অভাবও ঘটবে না। আগাগোড়া তাই দেখে আসচি।—ছেলেবেলায় বাপ-মা মারা গেলেন। মাতামহ ছিলেন পল্লী অঞ্চলের বেশ পয়সাওয়ালা জমিদার! তাঁর টাকায় লেখাপড়া শিখছিলুম। এণ্ট্রান্সে স্কলারশিপ্ পেয়ে প্রেসিডেন্সিতে এলুম পড়তে। মাতামহ টাকা পাঠাতেন মাসে মাসে। হিন্দু হোষ্টেলে থাকতুম···সে সব তো জানোই। তার পর হঠাৎ মাতামহর অবস্থা খারাপ হলো। কতকগুলো মামলা-মকর্দ্দমা চাপলো। আমার অবস্থা টললো। এক পিশিমার কাছে দরবার করলুম। পিশিমার ছেলে-পিলে ছিল না। বালীগঞ্জে বাড়ী···তাঁর ওখানেই আস্তানা পাতলুম।

তখন বালীগঞ্জের এ চেহারা ছিল না। দিনে-দুপুরে পথের উপর ফেরুদলের বিচরণ খুবই সহজ ব্যাপার ছিল। পিশিমার গাড়ী-ঘোড়া ছিল—অবশ্য সান্ধ্য বায়ু-সেবনের জন্য নয়। সেটার ব্যবহার হতো অপর কাজে। অর্থাৎ পিশেমশায়ের আমোল থেকেই তাঁর দুধের ব্যবসা ছিল। গোয়ালে বিস্তর গরু। মাহিনা-করা গোয়ালা ছিল, সরকার ছিল, সরকারের খাতাপত্র ছিল। সেই সব দুধ বড় বড় ক্যানে ভর্ত্তি হয়ে নতুন বাজারে চালান যেতো প্রত্যহ এই গাড়ীতে! ওই গাড়ীতে করেই আমি কলেজে আসতুম।···বহুবাজারের মোড়ে নেমে পড়তুম—দুধের ক্যানের সঙ্গে এক গাড়ীতে আসচি—পাছে ধরা পড়ে যাই, এই আশঙ্কায়।···দিন বেশ কাটছিল। তার কারণ, গরুকে কি খাওয়ালে গরুর দুধ বাড়ে, দু-চারখানা কেতাব থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পিশিমাকে জানালুম—পিশিমার বিশ্বাস হলো যে তাঁর এবং তাঁর ব্যবসার প্রতি আমার একটা দরদ আছে। একে স্ত্রীলোক, তায় হাতে পয়সা,—এ ক্ষেত্রে তাঁকে খুবই সমীহ করে চলতে হয়!···

পিশিমার এক প্রতিবেশী ছিলেন, রমেশ রায়। পাটের কারবারে অগাধ পয়সা রোজগার করছিলেন। এই রমেশ রায় প্রথম বয়সে পিসেমশায়ের কাছে নাকি প্রচুর সাহায্য পেয়েছিলেন, এবং তা মানতেন। তাই পিশিমা বলতেন,—এই রমেশকে ছাখ্…কি ছিল! পাট থেকে মা-লক্ষ্মী একেবারে ঘরে বাসা নেছেন। ওকে ধরে পাটের কাজে ঢুকে পড়ো,—লেখা-পড়া শিখে কি হবে? খালি ষাড়ের গোবর!

রমেশ রায় একটু সাহেব-ঘেঁষা ছিলেন। পাটের কারবারে সাহেব-সুবোর ঘেঁষ সইতেই হয় কি না! তাই সেকালে হিন্দুয়ানী বজায় রেখে যতখানি সম্ভব রমেশ রায় সাহেবিয়ানায় হাতমক্সো করতেন। তাঁর সংসারে স্ত্রী ও অপরাপর পোষ্যের সঙ্গে ছিল একটিমাত্র কন্যা পুষ্পমঞ্জরী। পিশিমা তাকে ইঙ্গিত করে এ কথাও বলতেন, যদি পাটের কাজে ঢুকিস্, আর তোর উপর মন পড়ে, তাহলে ঐ এক মেয়ে বৈ তো নয়, রমেশ রায়ের রাজত্বর সঙ্গে রাজ-কন্যাও বরাতে মিলতে পারে।

পুষ্পমঞ্জরীর নামে যত মোহ থাকুক, চেহারায় তা ছিল না। পুষ্পমঞ্জরীর রং ময়লা। তাছাড়া বাপের আদরে আহ্লাদে পুতুলের মত ভাবখানা! তবু রমেশ রায়ের জুড়ি গাড়ী, মস্ত বাড়ী প্রভৃতির ছবি মনের মধ্যে বার বার সাড়া তুলতে লাগলো,—রঙে কি এসে যায়? যদি ওই বিষয়-সম্পত্তি…পয়সাই সৌন্দর্য্য!

পিশিমার কথায় রমেশ রায় আমায় গ্রহণ করলেন, কিন্তু বললেন,—লেখাপড়া নাই ছাড়লে! ছুটী-ছাটার দিনে আমার সঙ্গে বেরিয়ো।

তাই হলো; এবং অল্পদিনেই রায়-গৃহে আমার পসার জমে উঠলো আমার কণ্ঠের গুণে। আমার গান শুনেচো তো! নেহাৎ বোধ হয় মন্দ গাই না। রমেশ রায় বললেন—পুষ্পকে গান শেখাতে পারো? সন্ধ্যার সময়?

বললুম—বেশ!

এই সঙ্গীত-চর্চ্চার ফলে পুষ্পমঞ্জরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হতে লাগলো। নিত্য তাকে দেখে দেখে মনের বিরূপতা ঘুচতে লাগলো। গানে মেয়েটি মন্দ নয়। যে সুর দি, সেটা বেশ সহজেই আয়ত্ত করে! এমনি ভাবে বছর খানেক আরো কাটলো। আবার বি-এ দিলুম।

তার পর…পিশিমা তীর্থ-দর্শনে বেরুলেন। বেশ লম্বা পাড়ি। ওদিকে দ্বারকা, এদিকে চন্দ্রনাথ, উত্তরে জ্বালামুখী, দক্ষিণে সীমাচল! তখন আমার হাতে এষ্টেটের ভার দিয়ে সুগভীর উপদেশে আমায় হুঁশিয়ার করে পিশিমা পুণ্য-চর্চ্চার উদ্দেশে কলকাতা ত্যাগ করলেন! আমি তখন রমেশ রায়ের চিত্ত-জয়ে উঠে-পড়ে লেগে গেলুম! এই রমেশ রায়কে অবলম্বন করেই এ জগতে আমায় উঠে দাঁড়াতে হবে। ধ্রুবর তপস্যার কথা বার বার মনে পড়ছিল। হিংস্র জানোয়ারের বিভীষিকাকে ধ্রুব কেয়ার মাত্র করে নি,—আর আমি ঐ পুষ্পমঞ্জরীর বর্ণহীনতাকেই এত বড় করে দেখে নিজের ভবিষ্যৎ মাটী করবো? না। ইতিহাসে লেখা বড় জীবনের পরিচয় নিলে তাঁদের মহত্বের মূলে এমন ত্যাগ-স্বীকারের মহিমা দেখতে পাবে। মনে মনে এমনি কল্পনা গড়ে আমার দিন কাটছিল।

হঠাৎ একদিন পিশিমার ভাগুর এসে হাজির,—আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড়! এসেই তিনি বললেন—তোমার নাম কামাখ্যা?

মন একটু খারাপ হলো। যেখানে একচ্ছত্র বিরাজ করছিলুম, সেখানে—কিন্তু উপায় কি?

বললুম,—হ্যাঁ।

তিনি বললেন,—বৌদির কাছে তাই শুনলুম। কাশীতে তাঁর সঙ্গে দেখা—আমায় বললেন, যদি কলকাতায় কিছুদিন থাকো ভাই…ছেলেমানুষ ভাইপোটির হাতে সব রেখে এসেচি…

বটে!

ইতিহাসে পড়েচো তো—অনার্য্যরা প্রথমে সর্ব্বত্র স্বাধীনভাবে বিচরণ করে বেড়াতো, সহসা আর্য্যেরা এসে যখন তাদের বললেন,—বৎসগণ, তোমরা বড় কষ্টে আছ! আমরা তোমাদের আরাম দেবো, আনন্দ দেবো,—তখন অনার্য্যদের মনে আঘাত খুবই লেগেছিল! আমার মনের অবস্থা ঠিক তেমনি হলো। দু'চারদিনে মনের সঙ্গে ঝোড়াপাড়া করে স্থির করলুম,—এ চিন্তা মিছা! আমি কে? এখানে আমার যে অধিকার, এরো তাই,—হয়তো আইনের সূত্র ধরলে বেশী। তবে? আপোষ হয়ে গেল…তাঁকে একদিন ডাকলুম—ছোট পিসেমশায়…

তিনি বললেন—না, না। আমায় অধর বাবু বলে ডাকবে। ছোট পিশে নই। আমি বন্ধু।

অগত্যা তিনি বন্ধুই হলেন; অন্ততঃ পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে আমার প্রতি তাঁর ব্যবহার অত্যন্ত শিষ্ট এবং দরদী হয়ে দাঁড়ালো।

তিনি বললেন—রমেশ বাবুর ওখানে তুমি হামেশা যাও?

বললুম—হাঁ। ওঁর মেয়েকে আমি গান শেখাচ্ছি।

তিনি হেসে বললেন,—এবং…?

আপাদ-মস্তক কেঁপে উঠলো। মাথা নীচু করে রইলুম। অধর বাবু বললেন—লোকটা টাকার আণ্ডিল। রমেশ বাবুর কাছে বৌদি নাকি তোমার বিয়ের প্রস্তাব করে গেছে—ওঁর মেয়ের সঙ্গে…

আমি নির্ব্বাক! অধর বাবু বললেন—মেয়েটি একটু

তা হোক, বাপের পয়সা আছে অঢেল, এবং
মাত্র মেয়ে। সুতরাং—
বাবু সিগারেট জ্বাললেন, কাজেই "সুতরাং"
র তাঁর বাক্য রুদ্ধ হয়ে গেল। গেলেও "সুতরাং"-
র কি, তা আমার মনে জেগে উঠলো—দারিদ্র্য-
য় অজস্রতার মধ্যে বাস—চিন্তাশূন্য, দ্বিধাহীন!
বাবু একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন,—রমেশ
কটু তোয়াজ করো।
র দৃষ্টিতে অধর বাবুর পানে চাইলুম।
বু বললেন,—বাঙালীর মেয়ের সঙ্গে প্রেম-
র রেওয়াজ নেই আমাদের সমাজে। সে
চর্চ্চা তাই করতে হয় এই অভিভাবকদের
তাঁদের প্রীতি পেলেই নায়িকাকে পাওয়ার
স্ত হয়।
। বাবুর উপর শ্রদ্ধা হলো। মনস্তত্ত্ব ব্যাপারে
। হদিশ জানা আছে, দেখলুম। সবিনয়ে প্রশ্ন
-কি করতে বলেন?
বাবু বললেন,—রমেশ বাবুর কোন্ জিনিষে
ছ, জানো?
হে বললুম—কুকুর। উনি কুকুর ভালো বাসেন।
অনেক দিন বলেচেন, যদি একটা ভালো বিলাতি

। বাবু বললেন,—অল্ রাইট।
। এই পর্য্যন্ত!

কালের দিকে রমেশ বাবুর বাড়ী চলেছিলুম,—
রীর প্রতি ব্যক্তিগত কোনো আকর্ষণ ছিল, এমন
তে পারি না। তবে রোগী যেমন আরাম পাবার
ক্ত ঔষধ স্বেচ্ছায় সেবন করতে চায়, আমারো
দশা! অর্থাৎ ঐ পরিবারের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান
র করে ওদের পয়সা-কড়িতে অধিকার-স্থাপন—
ঐ পুষ্পমঞ্জরীর মারফৎই সম্ভব! বিশেষ অধর
ইঙ্গিত আমার মনে এদিকে অনেকখানি আশা
য় তুলেছিল।
ধর বাবু ডাকলেন—ওগো কামাখ্যাবাবু—
ড়ালুম। অধর বাবু বললেন,—কুকুরের সন্ধান
। এক সাহেবের খানসামা বিক্রী করতে চায়।
দর-দস্তুর করলুম; তা পনেরো টাকার কমে রাজী
কিছুতে।
ইটুকু বলে তিনি থামলেন। আমি তাঁর পানে
ম। অধর বাবু আবার বললেন,—বৌদির হুকুমে
তোমার হেফাজতেই তো থাকে—তা থেকে যদি
ততঃ পনেরোটা টাকা দিতে পারতে, তাহলে
টা হয়তো হাত-ছাড়া হতো না।

শিউরে উঠলুম! বিবেকের প্রথম আস্ফালন!
ভাবলুম, ক্ষতি কি? পনেরোটা মাত্র টাকা! পিসিমার
তো শীঘ্র ফেরবার সম্ভাবনা নেই! তার মধ্যে এ টাকাটা
যেমন করে হোক—

পনেরো টাকা দিলুম। অধর বাবু বললেন—আমার
এতে একটু স্বার্থ আছে। অর্থাৎ তোমার মারফৎ ওঁদের
সঙ্গে একটা সম্পর্ক হয়ে গেলে আমি একবার রমেশ
বাবুকে ধরবো—পাটের দালালি যদি জোটাতে পারি!
অধর বাবু হাসলেন।

তোমার বোধ হয় কৌতূহল হচ্ছে, অধর বাবুর পরিচয়
নেবার জন্য? সে পরিচয় জানা নেই। রবি বাবুর
কবিতা পড়েচো তো? উর্ব্বশী?

—কোনো কালে ছিলে নাকি মুকুলিকা বালিকা-বয়সী
হে অনন্ত-যৌবনা উর্ব্বশী?
* * * *
যখন জাগিলে বিশ্বে যৌবনে গঠিতা
পূর্ণ-প্রস্ফুটিতা!

এ'ও তেমনি! অর্থাৎ তাঁকে দেখে থেকে-থেকে মনে
হতো, রবীন্দ্রনাথ যদি অধর বাবুকে দেখতেন, তা হলে
উর্ব্বশীর নামে কবিতা না লিখে এই অধর বাবুর উপরই
ঐ কথাগুলো কাব্যে প্রয়োগ করতেন। কাজেই অধর
বাবুর পূর্ব্ব-পরিচয় জানবার বাসনা আমার মনে কখনো
জাগে নি। তাঁকে যখন দেখলুম, তখন তিনি একেবারে
'পূর্ণ-প্রস্ফুটিতা'... কাজেই আগের কথা জানবার দরকার
মনে জাগে না।

অধর বাবু বললেন,—ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কুকুর
পাবে। খাশা পমিরেনিয়ান কুকুর—ইয়া লোম—এত-
টুকুনটি!

অধর বাবু চলে গেলেন। আমিও এলুম রমেশবাবুর
গৃহে। রমেশবাবুকে একটু ব্যস্ত দেখলুম। পুষ্পমঞ্জরী
তাঁর কাছে ছিল। সে বললে,—সে দিন তোমার কোনো
খানে যাওয়া চলবে না কিন্তু বাবা...

আমি স্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইলুম। রমেশবাবু বললেন—
বসো কামাখ্যা।

আমি বললুম—আপনার জন্য একটা ভালো কুকুর
পাচ্ছি—পমিরেনিয়ান!

—বটে! আনন্দে রমেশবাবুর মুখে হাসির দীপ্তি
ফুটলো। তিনি বললেন,—কোথায় পেলে?

সত্য কথা গোপন করলুম। বললুম—একটি বন্ধুর
কাছ থেকে।

পনেরো টাকা দামে কুকুর কেনার মানে পিসির
পয়সায় নবাবী! রমেশবাবু হয়তো সেটা পছন্দ করবেন
না! তাই কল্পনার আশ্রয় নিতে হলো।

রমেশবাবু বললেন—এই ছাখো হে, পুষ্প কি হাঙ্গামা বাধাচ্ছে!

—কি?

—সামনের রবিবারে আমার জন্ম-দিন! সাহেবদের মত ও একটা পার্টির ব্যবস্থা করতে চায়, ধুমধাম লাগাবে।

বললুম—বাঃ, বেশ তো! তা, আপনার আপত্তি কেন?

রমেশবাবু বললেন,—ভারী ছেলেমানুষী হবে।...

যথারীতি সঙ্গীত-চর্চ্চা চললো! অধর বাবুর ডাক এলো। বাহিরে এলুম! অধর বাবুর হাতে কুকুর—ধাশা—যেন তুলার বাণ্ডিল! কুকুর নিয়ে মহা-খুশী হয়ে রমেশবাবুর কাছে এলুম। রমেশবাবু বললেন—আমার জন্ম-দিনের উপহার বুঝি?

বললুম—হাঁ!

সে রাত্রে রমেশবাবু বললেন—আমার এইখানেই খেয়ে বাড়ী যেয়ো!

হায় রে মানুষ! এতদিন এ নিমন্ত্রণের খেয়াল হয়নি! আজ সন্ত কুকুর পেতে...

যাক্—এগুলো সাধনার স্তর মাত্র! আক্ষেপের বস্তু নয়, আনন্দের হেতু!

বাড়ী গিয়ে অধর বাবুকে ধন্তবাদ জানালুম। তিনি কি একটা কাগজ দেখছিলেন, আমায় দেখে সেটা লুকিয়ে ফেললেন। তাঁকে রমেশবাবুর জন্মদিনের পার্টির কথা বললুম। অধর বাবু বললেন,—বাঃ, তাহলে তুমি এক কাজ করো।

—কি?

—আগের দিন সন্ধ্যার সময় রমেশ বাবুদের জন্ত একটা পার্টি দাও...বার্থ-ঈভ্! তোমার টেষ্ট প্রভৃতির পরিচয় তাতে পাবেন। বেশী লোক নয়—শুধু রমেশবাবু, তাঁর মেয়ে, আর স্ত্রী—ব্যস্!

—তাঁর স্ত্রী আসবেন না। তিনি গোঁড়া হিন্দু, চা অবধি খান না।

—তা বেশ, রমেশবাবু আর তাঁর কন্তাকে বলো। সেদিন আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ো।

বললুম—কিন্তু বাড়ী তো দেখচেন—একেবারে মোগল আমলের বাঙালীর বাড়ী। একখানা চেয়ার অবধি নেই। বাঁশের খুঁটির আন্‌লা,—তাতে কতকগুলো লেপ-কাঁথা ঝুলচে!

অধর বাবু বললেন—ভয় নেই, সব এনে দেবো হে! গোটা দশেক টাকা মাত্র...করবে খরচ? একেবারে ড্রয়িং-রুম বানিয়ে দিয়ে যাবে।

পিশিমার ত'বিল থেকে আরো দশ টাকা নিতে হলো। পিশিমার ফেরবার কোনো সম্ভাবনা নেই সম্প্রতি! সেদিন চিঠি পেয়েচি, তিনি এখন হরিদ্বারে।

পার্টি দিতে হলো। রমেশবাবু প্রথমে আপত্তি তুলেছিলেন। পুষ্প বললে—কেন বাবা 'না' বলচো। কামাখ্যা বাবু দুঃখিত হবেন।

রমেশবাবুর আপত্তি কেটে গেল। অধর বাবু দু'দিনে পিশিমার বাড়ীর বাইরের সেই নোংরা ঘরখানাকে কার্পেটে মুড়িয়ে পর্দ্দায় ঘিরে চেয়ার-টেবিলে সাজিয়ে এমন বানিয়ে তুললেন যে, দেখে মোহিত হয়ে গেলুম—তাঁর শক্তি অদ্ভুত, সত্যই!

শনিবার সন্ধ্যায় কোন্ হোটেল থেকে পাগড়ী-ধারী খানসামা এলো। আর তার সঙ্গে এলো চায়ের কাপ, ডিশ, প্লেট, ছুরি, কাঁটা, এবং বিচিত্র ভোজ্য—রসনা যার গন্ধে সরস সজল লোলুপ হয়ে ওঠে!

পার্টির ক্রিয়া স্বচ্ছন্দে চুক্‌লো। রমেশবাবু বললেন—তোমার পিশিমা কবে ফিরচেন?

বললুম—এখনো সে সম্বন্ধে কিছু লেখেন নি।

রমেশবাবু বললেন—তোমার এগজামিনের রেজাল্ট কবে বেরুবে?

বললুম—জুলাই মাসের গোড়ায়!

রমেশবাবু চুপি চুপি বললেন—পুষ্পর নেহাৎ অমত হবে না, বোধ হয়! গিন্নিও বলছিলেন। বিয়ে দিয়ে ওকে আমি কাছেই রাখতে চাই! একটি মেয়ে—কোথায় পরের ঘরে পাঠাবো? তা, তোমার পিশিমা আসুন!

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হলুম। মনে হলো, আগামী বৎসর এমন দিনে আমি একটা মানুষ হয়ে দাঁড়াবো! পুষ্পর পানে চাইলুম। সাজ-সজ্জার জোলে নেহাৎ মন্দ নয়! আর স্ত্রীর রূপটাই কি সব? আর পৈতৃক সম্পত্তির জৌলুশ? তার দাম?

পরের দিন রমেশবাবুর গৃহে পার্টিতে হাজির আছি—বহু লোক-জন। সমারোহ ব্যাপার। কেশর থাঁর গানে মজলিশ ভরপুর! হঠাৎ পুলিশ এসে হাজির! গান থেমে গেল। পুলিশ বললে—রমেশবাবু আছেন?

রমেশবাবু বললেন,—ব্যাপার কি?

পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর বললেন—একটা কুকুর-চুরির ব্যাপার। চোর ধরা পড়েচে—কুকুরটা নাকি আপনার এখানেই...

আমার নজর পড়লো কনষ্টেবলের পিছনে হাত-বাঁধা লোকটির উপর! অধর বাবু! এঁ্যা! চমকে উঠলুম। চোখের সামনে আলো নিবে গেল...সমস্ত লোকজন-সমারোহ সেই সঙ্গে!

চেতনা ফিরলো পুলিশের প্রশ্নে—এ কুকুর আপনি কিনেচেন?

কোনো জবাব মুখে এলো না। রমেশবাবু বললেন—

র বললে, এক বন্ধুর কাছ থেকে চেয়ে এনেচো
ন্তু ?

স্পেক্টর বললেন,—শোনেন কেন ? মিছে কথা।
ধ সাহেবের খানসামা কুকুর নিয়ে রোজ আসে ;
এসেছিল ! এই লোকটি কুকুরকে আদর করে—
। অন্যমনস্ক হবামাত্র নিয়ে সরে পড়ে। সাহেব
লখে পাঠান। সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। আজ
পথে যাচ্ছিল ; খানসামা তাকে দেখে থানায়
াসে। সে সমস্তই স্বীকার করেচে। তার পর
। নিয়ে এসেচে।

ার মনে হলো, আমায় যেন কে আকাশে তুলে
। মাটীতে আছড়ে ফেললে !

শবাবু বললেন—এই কীর্ত্তি তোমার, কামাখ্যা ?

মাকেও থানায় যেতে হলো। দুদিন পরে ছাড়া
। কি করে, জানি না ! অধর বাবুকে হাজতেই
হতে হলো। তাঁর চুরির মামলা চলবে।

লুম পিশিমার গৃহে। সেখানেও এক কাণ্ড !
এসে ওয়ারেণ্টের জোরে চেয়ার, টেবিল, পর্দ্দা সমস্ত
গেছে। এগুলি অধর বাবু এক ফার্ম্মে জাল চেক
গ্রহ করে এনেছিলেন। তারা নালিশ ঠুকে দেছে।
বাবুর বিরুদ্ধে দু'দফা মামলা ! আমার নসীব
। সাক্ষী সেজে কাছারি ঘুরেই ইতি হলো।

ই মামলার ব্যাপারে অধর বাবুর আসল পরিচয়
। পড়লো। বর্দ্ধমান থেকে তিনি ফেরার···
ন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলছিল এক ঠকামির
। তাঁর আসল নাম মানিকলাল ; ওয়ারেণ্টে
ধরে, তাই অধর হয়েছিলেন। পিশিমার সঙ্গে
ছিল ; কিন্তু নিজের গুণে এ-গৃহে তাঁর
াধিকার হারান্···পিশিমার অনুপস্থিতির সুযোগে
ত আশ্রয় নিয়েছিলেন !

এতগুলো ব্যাপারের পর গৃহে থাকা সমীচীন মনে
। না। তখন ভবসমুদ্রে গা ভাসিয়ে দিলুম ; এবং
ভাবেই সমানে ভাসা চলেছে।

কাহিনী শুনিয়া আমি অবাক্ ! বলিলাম,—অথচ
মার যা বুদ্ধি···

বাধা দিয়া কামাখ্যা বলিল,—সেই বুদ্ধির বলে
তা রক্ষা করে দিন কাটাতে পারচি ভাই।

দ্বারে এক মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। তাকে দেখিবামাত্র
তগতিতে কামাখ্যা উঠিয়া গেল এবং অন্তরালে দশ
নট কাল কি তাদের কথাবার্ত্তা চলিল, জানি না ! দশ
মিনিট পরে ঘরে ফিরিয়া নিজের ওভার-কোটের পকেট
হইতে কি কতকগুলা কাগজ বাহির করিয়া সে আমার
পানে চাহিল, বলিল—দশটা টাকা দিতে পারো ভাই ?
চেক ভাঙ্গানো হলেই দিয়ে দেবো।

টাকা ছিল। কামাখ্যাকে বিশেষ জানিয়া এবং তদুপরি অধর বাবুর কাহিনী শুনিয়াও চক্ষুলজ্জা-বশতঃ না
বলিতে পারিলাম না। দশটা টাকা তাকে দিতে সে
টাকা লইয়া বাহিরে গেল।

সে চলিয়া গেলে, আমি আবার গোর্কির Mother
বইখানায় মনঃসংযোগের চেষ্টা করিতেছিলাম।

ঘরে ঢুকিয়া কামাখ্যা বলিল—বইটা পড়চো ? খাশা
বই ! তা নিয়ে যাও। পড়ে ফিরিয়ে দিয়ো।

আরো কিছুক্ষণ পরে বাড়ী ফেরা গেল—রাত তখন
প্রায় দশটা বাজে।

বইখানা পড়া শেষ হইলে তিন দিন বাদে কামাখ্যার
হোটেলে আসিলাম ; টাকা দশটা চাই। অবস্থা এমন
নয় যে টাকা কটা খয়রাৎ করি !

আসিয়া দেখি, তার ঘর অন্য লোকের দখলে। পাশের
ঘরে সেই ভদ্রলোকটির বাক্সের কশরৎ তেমনি চলিয়াছে
সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলাম,—ইনি কোথায় গেলেন
কামাখ্যা বাবু ?

হোটেলের মালিক কাছেই ছিলেন, বলিলেন,—
চেনেন তাঁকে ? তোফা আমায় ঠকিয়ে গেছে। আমা
বিস্তর পাওনা ! জিনিষ-পত্তর এমন চুপি-চুপি স
সরিয়েছে ! তার পর পাওনাদারের পর পাওনাদা
আসচে। তা আপনার···?

আমি বলিলাম—বেশী নয়। দশ টাকা মাত্র।

তিনি বলিলেন—ঠিকানা জানা নেই ? চিনতে
তো।

বলিলাম—কলেজে এককালে পড়েছিলুম—তার
সেদিন দেখা—তার মধ্যেও কিছু ধার···!

তিনি বলিলেন—হয়েচে !

গোর্কির বইখানার মলাটের উপর চোখ বুলাই
লাগিলাম। তবু বইখানা আছে···কিন্তু আশিটা টাব
এ বই···কতই বা দাম !

একটা নিশ্বাস ফেলিলাম, হোটেলের মালি
বলিলাম,—যদি খপর পান, দয়া করে জানা
আমার ঠিকানাটা···

পকেটে কার্ড ছিল—দিলাম। তার পর নিঃ
সিঁড়ি নামিয়া পথে আসিয়া ট্রাম ধরিলাম।

লোক-চরিত্র

শচীনাথ অফিস হইতে ফিরিয়া ঘরে ঢুকিল, মুখ ভার—কাহারো সঙ্গে কথা নাই।

বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া সে বিছানায় শুইয়া পড়িল। খাশ, ভৃত্যগণ গিয়া মা-ঠাকুরাণীকে সংবাদ দিল। প্রমীলা তখন ওদিককার ঘরে ষ্টোভ জ্বালিয়া কলাই-শুঁটির কচুরি তৈরী করিতেছিল। সংবাদ পাইয়া প্রমীলা তাড়াতাড়ি ঘরে আসিল, আসিয়া দেখে, শচীনাথ চক্ষু মুদিয়া বিছানায় শুইয়া আছে! প্রমীলা তার কপালে হাত দিল; শচীনাথ চোখ মেলিয়া চাহিল। প্রমীলা কহিল—এসেই শুলে যে! অসুখ করচে?

শচীনাথ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—না। বলিয়া সে পাশ ফিরিল এবং আবার চক্ষু মুদিল।

প্রমীলা উদ্বিগ্নভাবে কহিল,—তবে এমন অসময়ে শুলে যে! কি হয়েচে?

শচীনাথ ফিরিয়া প্রমীলার পানে চাহিল; চাহিয়া গম্ভীর স্বরে কহিল,—সর্ব্বনাশ হয়েচে! অনর্থক দশ-বারো হাজার টাকা গচ্চা দিতে হবে আপিসে—নগদ!

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে প্রমীলা স্বামীর পানে চাহিল। শচীনাথ আবার একটা নিশ্বাস ফেলিল! ফেলিয়া কহিল,—কাকেও বিশ্বাস নেই···হতভাগা শঙ্কর···

শঙ্কর! প্রমীলা কহিল,—আবার মদ খেয়ে কিছু গোলমাল করেচে, বুঝি?, এই অবধি বলিয়া প্রমীলা স্বামীর পানে চাহিল। শচীনাথ নিরুত্তর। প্রমীলা কহিল,—বলো না গা, কি হয়েচে! নিজের মনে এমন করে চেপে রেখো না। আমায় বলো দেখি—কতকটা দুঃখ তাতে হাল্কা হবে।

—এ হাল্কা হবার দুঃখ নয়, পিমু···কালই সকালে নগদ এগারো হাজার টাকা গুণে দিতে হবে। না হলে ইজ্জৎ নিয়ে টানাটানি! আর সেই সঙ্গে—

শচীনাথ জানে, ইজ্জতের সঙ্গে আরো কত কি···সে কথা সে অনেকবার ইতিমধ্যে ভাবিয়া দেখিয়াছে এবং যতবার ভাবিয়াছে, ততবারই শিহরিয়া উঠিয়াছে! সে যেন এক পাহাড়ের শৃঙ্গে দাঁড়াইয়া—নীচে অতল গহ্বর—সেখানে ঝাঁপাইয়া পড়া ছাড়া আর কোন উপায় নাই!

প্রমীলা স্বামীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল—বলো গো, সত্যি, আমার প্রাণটার মধ্যে যা করচে! এগারো হাজার টাকা দিলে যদি ইজ্জৎ থাকে তো তাই দিয়ে দাও। টাকাটা তো তোমার চেয়ে বড় নয়!

তা যে নয়, সে কথা শচীনাথ জানে। তবু এগারো হাজার টাকা—সেও কম কথা নয়! কতদিনের পরিশ্রম, কতখানি রক্ত জল করিয়া এই টাকা সঞ্চিত হইয়াছে—এখন এ-বয়সে আবার এগারো হাজার টাকা রোজগার করা—সকল সম্ভাবনার বাহিরে!

প্রমীলা কহিল,—বলবে [illegible] তার স্বরে রাজ্যের মিনতি!

শচীনাথ ব্যাঙ্কের বড় বাবু। নর্থ ব্যাঙ্ক। দশ বছরে তার প্রতিপত্তি খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে। আজ তিন বছর শচীনাথ এই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। তার উপর সাহেবদের অখণ্ড বিশ্বাস। সে যা করে, তাই হয়—কোনদিন তার বিরুদ্ধে একটা কথা বলিবার সাহস কাহারো হয় নাই। তা ছাড়া সে-অবসরও সে কাহাকেও দেয় নাই!

শচীনাথ কহিল,—ব্যাঙ্কের সঙ্গে কুমুদ চৌধুরীর ফার্ম্মের লেন-দেন আছে। মাসে তাদের বহু চেক ব্যাঙ্কে আসে। ছ'মাস পরে হিসাব-নিকাশ হতে কাল দেখা গেল, তারা যত টাকার চেক ভাঙ্গিয়েচে, সে হিসাবে এগারো হাজারের গরমিল! অর্থাৎ পঞ্চাশ টাকার চেক এসেচে, সে-চেকে পঞ্চাশের জায়গায় পাঁচশো টাকা আদায়—এমনি ভাবে এগারো হাজার টাকার গরমিল। কাল সেই হিসাব পাঠাতে হবে, তার উপর আর এক সপ্তাহ পরে অডিটার আসচে হিসাব চেক করতে। তখন? কাজেই ঐ এগারো হাজার টাকা সদ্য সদ্য কাল মিটিয়ে কুমুদ চৌধুরীর হিসাব ঠিক করা চাই!

প্রমীলা অবাক্ হইয়া স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল।

শচীনাথ কহিল,—ঐ শঙ্কর! চেক মিলিয়ে নেওয়া তার কাজ। মাতাল—তাকে এতখানি বিশ্বাস করার ফল খুব পেলুম। মাতাল হলেও এতখানি দুষ্প্রবৃত্তি তার হবে, তা কখনো ভাবি নি।

প্রমীলা কহিল,—তা বেশ, ওঠো। উঠে মুখ-হাত ধোও, খাও দাও। শুয়ে পড়ে থাকলে তো চলবে না। কাল যা করবার, করো। এগারো হাজার টাকা দিয়ে—তা হলেই তো গোল মিটবে?

শচীনাথ একটা নিশ্বাস ফেলিল। এই জন্যই কথায় বলে, স্ত্রীলোক! এগারো হাজার টাকা দিলেই নিশ্চিন্ত! কিন্তু এ টাকা কত দিনে হইয়াছে, এ টাকা আবার এখন হইবার আশা যে নাই, সে কথা একবার বুঝিয়া দেখে না! অনেক পুণ্য করিলে স্ত্রীলোক হইয়া জন্মানো যায়! এমন নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার—সংসার করার দায়িত্ব-বোধ এতটুকু নাই—আশ্চর্য্য কল্প-লোকের জীব!

র সারিয়া শচীনাথ কহিল,—গাড়ীটা আন্‌তে
…

া কহিল,—কেন ?

াথ কহিল,—একবার শঙ্করের সন্ধানে যাই।
পসেও আসে নি। বোধ হয় বুঝতে পেরেচে।

া কহিল,—তাকে পুলিশে দেবে ?

াথ কহিল,—তাতে কি টাকা আদায় হবে ?

া কহিল,—তবে ?

াথ কহিল—এগারো হাজারের কিছুও যদি
রতে পারি তার কাছ থেকে, দেখি।

া কহিল—ভ্যাখো। কিন্তু রাত করো না,
ভাবনায় আমি মরে যাবো। মাতাল-দাঁতাল
কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাও বরং।

গেল!

। হাজির হইলে শচীনাথ গাড়ীতে উঠিল।
মাথার দিব্য দিয়া বলিল—রাগারাগি করো না।
হনা বেচে এগারো হাজার টাকা দিয়ো—তোমার
মজুত টাকা নাই নষ্ট করলে!

াখা যাবে'খন! বলিয়া শচীনাথ চলিয়া গেল।

২

টা বিশ্রী পল্লী। এ-পল্লীতে শচীনাথ জীবনে
পদার্পণ করে নাই। ড্রাইভার ঠিকানা জানিত,
বাড়ী খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইল না।

টা গ্যাস-পোষ্টের পাশেই দরজা।

ভার নামিয়া দ্বারের কড়া নাড়িল। একজন ঝী
দ্বার খুলিয়া দিল, এবং প্রশ্ন করিল,—কাকে
?

ভার কহিল,—শঙ্কর বাবু…বলো গে, বাবু
…

চলিয়া গেল, এবং পাঁচ মিনিট পরে ফিরিয়া
কহিল,—ওপরে আসুন…

ীনাথ নামিয়া দাসীর সঙ্গে চলিল। নোংরা উঠান
ধারে একটা বিশ্রী আবহাওয়া। নাকে রুমাল
চীনাথ দাসীর সঙ্গে উপরে উঠিল। ছোট ঘর।
ড়া বিছানা; বিছানায় শুইয়া শঙ্কর।
ীনাথকে দেখিয়া শঙ্কর মাথা তুলিল, কহিল,—
…?

ীনাথের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। শঙ্কর তখনো
বুঁদ…মদের একটা উগ্র গন্ধ! শচীনাথ কহিল—
ামি…

ঙ্কর হাসিয়া কহিল,—বসুন…

…একটা কাঠের চেয়ার। শচীনাথ
চেয়ারে বসিল, বসিয়া কহিল—তোমার ব্যাপার কি!
আজ আবার আপিস কামাই…?

শঙ্কর কহিল—মানে, কাল একটু বেশী খেয়েছিলুম…
নেশা করে আপিসে যেতে আপনি মানা করে দেছেন কি
না, তাই…

শচীনাথ কহিল—তোমাকে চাকরিতে আর রাখা
চল্‌বে না।

শঙ্কর হাসিল, হাসিয়া কহিল—তাহলে কি খাবো?

শচীনাথ কহিল—খাওয়াবে গভর্ণমেণ্ট…

পাকা মাতাল…নেশা হইলেও জ্ঞান তার ঠিক থাকে,
সব বোঝে। এ কথার অর্থ শঙ্কর কিন্তু বুঝিল না, আশ্চর্য্য
হইয়া কহিল—গবর্ণমেণ্ট…

শচীনাথ কহিল,—হ্যাঁ। কাল তোমায় পুলিশে
দেবো। আমার সর্ব্বনাশ করবার মতলব?

শঙ্কর কহিল,—ছি, ও কথা বলবেন না। ধর্ম্ম, দেবতা,
কিছু মানি না বটে, মাতাল দুশ্চরিত্র লোক, তবু আপনার
ভালো ছাড়া মন্দ চিন্তা কখনো করি নে…

শচীনাথ কহিল—না, চিন্তা করো না! তবে ফাঁক
পেলে গলায় ছুরি দিতে বেশ ওস্তাদ আছো!

মাতাল শঙ্কর মনিবের কাছে কড়া ভৎর্সনা ঢের
পাইয়াছে। তবু এমন কথা সে কখনো শোনে নাই
এ-সব কথার মানে?

শঙ্কর কহিল,—খুলে বলুন, আমি সব কথা ঠিক
বুঝতে পারচি না…

শচীনাথ তখন খুলিয়া বলিল, কুমুদ চৌধুরীর ব্যাঙ্কে
চেক যা আসিত, তার অঙ্ক বাড়াইয়া অনেক টাকা—প্রায়
এগারো হাজার জাল-জালিয়াতি করিয়া শঙ্কর আত্মসাৎ
করিয়াছে। মাতাল হইলেও সে চোর নয়, এ বিশ্বাসটুকু
শচীনাথের ছিল। তা তার অতখানি বিশ্বাসের খুব
শোধ দিয়াছে!

কথাটা শুনিয়া শঙ্কর একেবারে মুষড়াইয়া পড়িল
তার মুখে কথা সরিল না। শচীনাথ কহিল,—আমা
কালই সব টাকা শুণোকার দিতে হবে…তা তোমার কাছে
যদি মজুত থাকে, দিয়ে দাও…তাহলে বুড়ো বয়সে
পুলিশের হাতে আর দেবো না। কি বলো, দেবে?

শঙ্কর কথা কহিল না। সে কি ভাবিতেছিল…

শচীনাথ কহিল,—কি? দেবে? না, সব উড়িয়েচো

শঙ্কর কহিল,—এগারো হাজার টাকা…? তাইতো

শচীনাথ কহিল,—হ্যাঁ, এগারো হাজার টাকা।

শঙ্কর কহিল,—অত টাকা কোথায় বা পাবো
আচ্ছা, দেখি…

শঙ্কর হাঁকিল,—গিন্নি…

শচীনাথ কহিল,—এত টাকা ফুঁকে দিলে কি করে,
ছ'মাসে? কাপ্তেনী তো নেই…খেনো মদ খেয়ে

বেড়াও, আর এই তো বাড়ীর শ্রী! স্ত্রী-পুত্রও নেই যে…

জিভ্ কাটিয়া শঙ্কর কহিল,—চুপ্, চুপ্…

শচীনাথ কি বলিতে যাইতেছিল, তার মুখের কথা বাধিয়া গেল এক প্রৌঢ়া নারীর আবির্ভাবে।

শচীনাথ নারীর পানে চাহিয়া রহিল,—মোটা শরীর, মাজা রং—বয়স বোধ হয় শঙ্করের চেয়ে কিছু বেশী হইবে! এই নারীই—

নারী কহিল,—ডাকচো?

শঙ্কর কহিল,—হ্যাঁ। ইনি আমার মনিব। সেই বছর দশেক আগে নদীতে ঝড়-তুফানে নৌকা ডুবি হয়। শুনেচিস্ তো, বাবু সাঁতার জানেন না, ডুবে যাচ্ছিলেন। দৈবাৎ আমি দেখে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে জল থেকে ওঁকে তুলি—তার জন্ম অফিসে চাকরি করে দেন—আর এখনো যে চাকরি করচি, সে এঁর দয়ায়! এই তো লক্ষ্মীছাড়া বওয়াটে মাতাল আমি, তবু আমার মাহিনা একশো টাকা! ভারী বিশ্বাসের কাজ—এক পয়সা জামিন না নিয়ে, নিজে আমার জামিন থেকে চাকরি দেছেন। নে, প্রণাম কর্, গিরি—ওঁর দৌলতেই খেতে পরতে পারচিস্।

মুখে একরাশ হাসি ফুটাইয়া গিরিবালা শচীনাথের পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া কহিল,—এত দয়া! ওঁর পায়ের ধুলো এখানে পড়লো!

শচীনাথ বিরক্ত হইয়া কহিল,—দয়াই বটে! পুলিশের পায়ের ধুলো তাই এখনো পড়তে দিইনি! তার পর একটু থামিয়া শঙ্করের দিকে চাহিয়া কহিল,—এখন কি বলো, টাকাগুলি দেবে?

শঙ্কর উঠিয়া বসিল, তার পর কহিল,—গিরি, তোর গয়না-পত্তর কিছু আছে রে?

গিরি কহিল,—এক জোড়া তাগা আর আট গাছা সোনার চুড়ি, আর ঐ হেলে হার ছড়া…

শঙ্কর কহিল,—কত দাম হবে তার?

গিরি কহিল—তা, আড়াইশো-তিনশো টাকা।

শঙ্কর কহিল,—সে তো আমায়। বাবু একটা বড় দায়ে ঠেকেচেন।

গিরি কহিল,—তাহলে কাপড় ছেড়ে আসচি। ঐ সিন্দুকের মধ্যে আছে কি না! গিরি চলিয়া গেল।

শচীনাথ অবাক্! শঙ্কর এ কি মস্করা পাইয়াছে! পাজী, মাতাল, বেইমান কোথাকার! সে বেশ ঝাঁজালো স্বরে কহিল,—আড়াইশো-তিনশো টাকার গহনা দিয়ে এগারো হাজারের দায় মেটাবে?

শঙ্কর হাসিল—নিষ্পাপের হাসি! হাসিয়া সে কহিল, —এ ছাড়া তো আর-কিছু সম্বল আমার নেই।

শচীনাথ জলিয়া উঠিল। নিজের উপর তার রাগ ধরিল। তার মাথা খারাপ হইয়াছে, তাই এই বেহেড্ মাতালের কাছে আসিয়াছে, তাকে সুবুদ্ধি দিয়া ভালো পরামর্শ দিয়া যতটা আদায় হয়, সেই চেষ্টায়!

শচীনাথ কহিল,—আমি তোমার গহনা নিতে আসিনি। একদিন প্রাণ বাঁচিয়েছিলে, তাই পুলিশে দিতে চাইনে। কিন্তু আমায় বাধ্য হয়ে সে কাজ করতে হবে, দেখচি।

শঙ্কর কহিল,—রাগ করবেন না। একটা কথা বলবো?

শচীনাথ কহিল,—কি ক…

শঙ্কর কহিল,—আমি মাতাল, আমি দুশ্চরিত্র, এ কথা মানি। কিন্তু চোর নই।

শচীনাথ কহিল—না। তুমি সাধু শঙ্করাচার্য্য!

শঙ্কর কহিল,—ছি, মহাপুরুষের অপমান করতে নেই। তবে আমি চেকের ব্যাপার জানি না।

শচীনাথ কহিল—তুমি জানো না! তবে কে জানে, শুনি?

শঙ্কর কহিল—কবে এ কাজ হয়েচে?

শচীনাথ কহিল—এই ছ'মা…

শঙ্কর কি ভাবিল; ভাবিয়া …হিল,—এই ছ'মা… আমার সঙ্গে আর কাকেও কা… …রতে দেন্ নি। আমার হাতে কাজ জড়ো হয়ে থাক… …লে…?

ঠিক কথা! বিদ্যুতের চমকের … একটা নাম… কার্ত্তিক! কিন্তু সে শচীনাথের সম্বন্ধী…, না, অসম্ভব। মাতালটার চক্রান্ত!

শঙ্কর কহিল—অভয় দেন য… …তা একটা কথ… বলি…

শচীনাথের সর্ব্বশরীর জ্বলিতেছিল…তাই…? কিন্তু না, না, সে যে প্রমীলার দাদা…সহোদর!

শুধু তাই? ব্যাঙ্কে সে এ্যাসিষ্টান্ট কেশিয়ার…তারি দেওয়া চাকরি…

শঙ্কর কহিল—শেয়ারের বাজারে তাঁর খুব ঘন-ঘ… কাজ চলছিল…কিছু মনে করবেন না…এমনি… তিনি যদি এমনি চুপি চুপি ধার বলে নিয়ে থাকেন, পরে এক সময় চুকিয়ে দেবেন ভেবে…?

শচীনাথ গর্জ্জিয়া উঠিল,—ধার? এ যে চেকে… টাকার অঙ্ক কেটে নাম সহি দেওয়া…মামলা হলে পর এ্যাণ্ডামানে গিয়ে বাস করতে হবে।

শঙ্কর কহিল,—সব কখানা চেকেই অমনি?

শচীনাথ কহিল,—হ্যাঁ…

শঙ্কর কহিল—ভারী ভাবনার কথা তো। শঙ্করের স্বর খুব গম্ভীর।

শচীনাথের ইচ্ছা হইল, শঙ্করের চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানিয়া তাকে একতলায় ফেলিয়া দেয়। এমন নিশ্চিন্ত

কহিতেছে!···অথচ তার মনের মধ্যে যে কি কি ঝড় বহিতেছে···

আসিয়া বাক্স খুলিয়া গহনা বাহির করিয়া সামনে মেঝেয় রাখিল।

কহিল,—আপনার চাকর···যেটুকু সামর্থ্য, এ দায়ে···

নাথ কহিল,—রেখে দাও···এজন্য আমি

কহিল—একটা রাত সবুর করুন, বাবু·· কাল উঠেই আমি যমুনাদাস কোঠারীর কাছ থেকে হাজার টাকা এনে দেবো। মাতাল হলেও তারা আমায় করে···গিরির একখানা বাড়ী আছে নায়···সেখানা বেচলে বোধ হয় সাত-আট হাজার

নাথ কহিল—তোমার কাছ থেকে টাকা ধার সেচি, ভাবচো?

কহিল—না, না, তা নয়···আমি চাকর···পরে দিয়ে দেবেন। চুপি-চুপি দায়টা তো চুকুক। দুশ্চিন্তা করবেন না···

, এ মাতালের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করিয়া লাভ থো! যা হয়, কাল দেখা যাইবে। সমস্ত দিন ভাবিয়াছি···আর ভাবিতে পারি না···

নাথ চলিয়া আসিল।

৩

হ ফিরিয়া শচীনাথ দেখে, জানলার ধারে প্রমীলা য়া বসিয়া আছে। সে আসিলে প্রমীলা কোনো লিল না।

ীনাথ কহিল—মাতালটার কাছে গেছলুম···একটা য়ে থাকে···লক্ষ্মীছাড়া পাড়া· আমার সর্ব্বাঙ্গ যিয়ে রয়েচে। সে হাওয়ায়···

মীলা স্বামীর পানে চাহিল; তার দুই চোখে জল! ীনাথ তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল—কাঁদচো! কেঁদে ব? কেঁদো না। ইজ্জৎ রক্ষা করতেই হবে··· থেকে···

মীলা উঠিয়া স্বামীর বুকে লুটাইয়া পড়িল···তার একেবারে সাগরের ঢেউয়ের মত উথলিয়া উঠিল।

চীনাথ ডাকিল—পিমু···

প্রমীলা কহিল,—না, না, আমায় আদর করো না ··আমিই তোমার অলক্ষ্মী।

এ আবার কি! শচীনাথ বিস্মিত নেত্রে প্রমীলার ন চাহিল।

আঁচলের খুঁট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া প্রমীলা শচীনাথের হাতে দিল, দিয়া ছুটিয়া গিয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িল।

শচীনাথ চিঠি খুলিয়া পড়িয়া দেখে,—তাহাতে লেখা আছে—

—কুন্দ

তুমি জানো না, আমি কত বড় শয়তান! আমি চোর; আমি বেইমান। তোমাদের সঙ্গে বাস করার যোগ্যতা আমার নেই, আমি শচীর ব্যাঙ্কের অনেক টাকা ভেঙেচি...এবার ধরা পড়ার সময় এসেচে। তাই সংসার ছেড়ে চললুম। কোথায় যাবো, জানি না। তবে জেলে যাবার সাহস নেই। শচী আর পিমুর কাছে কেঁদে গিয়ে পড়ো,—তারা যদি চোরের স্ত্রীকে আশ্রয় দিতে পারে, আশ্রয় পাবে। না হলে ছেলেমেয়েদের হাত ধরে গঙ্গার জলে ডুব দিয়ো।

তোমার নরাধম স্বামী।

কুন্দ প্রমীলার দাদা কার্ত্তিকের স্ত্রী।

চিঠি পড়িয়া শচীনাথ প্রমীলার পানে চাহিল। তার মনে হইল, প্রচণ্ড একটা আর্ত্তনাদ তুলিয়া সারা দুনিয়া বুঝি এখনি ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল! সে বসিয়া পড়িল। তার চেতনা বিলুপ্ত-প্রায়!

অশ্রু-সজল চোখে প্রমীলা কহিল,—বৌ এসেচে, তুমি বেরিয়ে যাবার পরেই। থাকবার মধ্যে আছে একটা মুক্তোর নেকলেশ,—এসে কেঁদে বলচে—এ ছাড়া আর কিছু নেই ভাই···তোমার দাদা পথে বসিয়ে গেছে। একটু ঠাঁই দিয়ো। গতর খাটিয়ে তোমার সংসারে দাসী-চাকরের কাজ করে যতটা পারি—

শচীনাথ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—তোমার দাদা বাড়ীতে ফেরেনি?

প্রমীলা কহিল—না। আপিস থেকে চিঠি পাঠিয়ে দেছে। বৌ রান্নাবান্না সেরে ওপরে এসে চিঠি পড়ে দেখে —এই কাণ্ড···অমনি চলে এসেচে!

শচীনাথ কহিল—ছেলেমেয়েরা?

প্রমীলা কহিল—কাকেও নিয়ে আসে নি।

শচীনাথ কহিল—রাস্কেল! বীরত্ব ফলিয়েচেন— সংসার ছেড়ে! আর বেচারা-শঙ্করকে দোষী সাব্যস্ত করে আমি তাকে যাচ্ছেতাই বকে এলুম! শঙ্কর নির্দ্দোষ। তাছাড়া সে স্ত্রীলোকটা—তার স্ত্রী নয়, এক জন হেয় গণিকা! সেও ঐ মাতালের কথায় আড়াইশো টাকার গহনা—তার একমাত্র সম্বল—আমার হাতে তুলে দিতে এসেছিল। তার উপর নিজের বেনেটোলার বাড়ী বেচে টাকা দিতে প্রস্তুত! মানুষকে আমরা কি ভুল বুঝি! বুঝে কি অবিচারই না করি!

প্রমীলা বাষ্পার্দ্র কণ্ঠে কহিল—দাদা আপন-হয়ে···

শচীনাথ কহিল—যাক্‌, ভেবে আর কি হবে! ইজ্জৎ আগে—পরের পয়সা আগে ঠিকঠাক বুঝিয়ে দি—তার পর দ্বিতীয় চিন্তা।

প্রমীলা কহিল—সে যা হয়, করো—মানা করচি না। এখন খাবে চলো।

শচীনাথ কহিল—যাই। হ্যাঁ, ভালো কথা, তোমার বৌদি কোথায়? তাঁকে যেন কিছু বলো না। তাঁর বিপদে আমারো বিপদ। এ বিপদে আত্মীয়-বন্ধু দেখবে না তো কে দেখবে?

প্রমীলা কহিল—না, ও কথা আমায় বলো না। আমি যখনই ভাবি, আমার দাদার জন্যই···

শচীনাথ কহিল—ও কি বলচো পিমু! আমি না স্বামী—তোমার মানে আমারও মান নয়?

প্রমীলা কাঁদিয়া ফেলিল, কাঁদিয়া কহিল,—আমি কিছুতে ভুলতে পারচি না যে তোমার এ ভোগান্তি আমার দাদা হতেই!

শচীনাথ কহিল,—আবার! যাও, তোমার বৌদির কাছে যাও···তাঁর বিপদ আরো বেশী। সে বাঁদর তো চুরি করে পালিয়ে ভাবনার দায় এড়িয়েচে, কিন্তু এই গরীব নিরীহ প্রাণী স্ত্রীটার সারা অঙ্গে কি কালি ঢেলে দিয়ে গেল, এর মাথাটা দুমড়ে মুচড়ে মাটীতে ছুঁইয়ে এমন নীচু করে দিয়ে গেল···যে, এর চেয়ে বৈধব্য-যাতনাও বুঝি মেয়েমানুষের কামনার বস্তু!

প্রমীলা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। সে স্বামীর পানে চাহিল।

শচীনাথ আবার বলিল,—তুমি ওঁর কাছে যাও! আমি একবার বেরুচ্ছি।

প্রমীলা কহিল—এই এলে, এখনি আবার···

শচীনাথ কহিল—হ্যাঁ, শঙ্করের কাছে যাবো।

প্রমীলা কহিল,—কাল সকালেই না হয়···

শচীনাথ কহিল,—যাবো না! বলো কি? মিছে সন্দেহ করে তাকে ধমকাতে ছুটেছিলুম, আর এখন ক্ষমা চাইতে যাবো না? আমার লাঞ্ছনা তার অঙ্গে কাঁটার মত বিঁধে আছে···

কথাটা বলিয়া শচীনাথ বাহির হইয়া গেল; প্রমীলার উত্তরের প্রতীক্ষাও করিল না।

কর্ম্মচক্র

াব সকাল। বারুণী তিথি। গঙ্গার ঘাটে
ী মহিলার ভিড় খুব বেশী। উড়িয়া পাণ্ডার
সারিয়া টিকি উড়াইয়া ঘাটের উপর বসিয়া
—সামনে ছোট কাঠের চৌকির উপর রাশীকৃত
র পিতলের বাটিতে বাটা সাদা চন্দন। মেয়েরা
আসিয়া দাঁড়াইলে পাণ্ডার দল তাঁদের কপালে
পিয়া পয়সা আদায় করিতেছে। বেশ রোজগারের
াড়িয়াছে। আজ তাদের মেল্-ডে।

ার কাছ হইতে একটু দূরে একটা লোক পাথরের
ত নিশ্চল বসিয়া এই ভিড় আর পাণ্ডার পয়সা
বর ফন্দীটুকু লক্ষ্য করিতেছিল। লোকটী
! তার নাম সত্য। বয়স ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর
কিন্তু শীর্ণ দেহ আর মুখের বর্ণ দেখিলে বয়স
শ পার হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

। জেল-ফেরৎ আসামী; ক'বারের দাগী। পুলিশ
ালো রকম জানে। সন্ধ্যার পর পথে তার দেখা
পুলিশের আনন্দ উথলিয়া ওঠে—তাকে তাড়া
কড়াইয়া থানায় লইয়া যায় এবং হাকিমের কাছে
দিয়া আবার জেলের পথ প্রশস্ত করিয়া তোলে!
রিয়া সম্প্রতি দেড় বৎসরের মধ্যে সত্য চার-বার
রিয়া আসিয়াছে।

জ ভোরে জেল হইতে খালাস পাইয়া সে গঙ্গার
লিয়া বসিয়া গিয়াছে। হাতে এমন পয়সা নাই
সার মুড়ি কিনিয়া খায়, অথচ পেটে ক্ষুধার জ্বালা
এতবার জেলে গিয়া মনের সব বৃত্তিকে সে
করিয়াছে, পারে নাই শুধু ক্ষুধার সঙ্গে লড়িয়া
কায়দা করিতে।

। পয়সা এখন কি করিয়া সংগ্রহ করা যায়? এই
পাণ্ডার মত দোকান খুলিয়া বসিলে বেশ হয়!
পয়সা কামানো যায়। কিন্তু এ দোকান খুলিতে
লধন চাই,—একখানা চৌকি, ফুল-চন্দন আরো
! এ-সবের যোগাড় হয় কি করিয়া!···সুতরাং
দিয়া কোনো আশা নাই।

চরি? কোথা হইতে মিলিবে? কে দিবে?
সন্ধান চাহিবে। মাহিনা তো দিবে ছ টাকা,
াত টাকা, তার জন্য কোষ্ঠী খুলিয়া মেলিয়া ধরিতে
-সারা জীবনের ইতিহাস বলিতে হইবে!
ই সকালে কার দ্বারে গিয়াই বা দাঁড়াইবে, কার
র চাই···!

— ·· বারুণীর পুণ্য তিথিতে বরং পাওয়া
সম্ভব। কিন্তু ভিখারী সাজিয়া হাত পাতা···তার আজন্মের
সংস্কারে বাধিতেছিল! চুরি সে করিয়াছে, কিন্তু সে চুরি—
ভিক্ষা নয়! ভিখারী যে সকলের অধম!··· তবু উপায়
যখন নাই···

এমনি ভাবিয়া সে উঠিল। এক বৃদ্ধা স্নান সারিয়া
ছোট একটি ঘটি হাতে পথ চলিতেছিল; সত্য গিয়া তার
সামনে হাত পাতিল···বৃদ্ধা তাকে দেখিয়া ভর্ৎসনার
সুরে কহিল,—আ-মর্, জোয়ান মিন্সে, ভিক্ষে চাইতে
লজ্জা হয় না! য্যাঃ···

সত্য চলিয়া আসিল। দুই চোখে আগুন জ্বালিয়া
বৃদ্ধার পানে চাহিল, দিবি তো বড় জোর একটা পয়সা,
তার জন্য এত কথা! ইচ্ছা হইল, বৃদ্ধার চুলের ঝুঁটি
ধরিয়া তার মুখখানা পথে রগড়াইয়া দেয়! গঙ্গাস্নান
করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছিস্, আর ভিখারী একটা পয়সা
চাহিলে অমন করিয়া উঠিস্! সত্যর ঘৃণা ধরিয়া গেল—
দূর হোক্, না খাইয়া মরিতে হয় মরিব, তবু ভিক্ষা আর
চাহিব না!···

সে এক ধারে সরিয়া গিয়া বসিল···চুরি? সেই ভালো!
জেলওয়ালা বদমাস কম নয়, দু'দিন ধরিয়া রাখিলে কি
ক্ষতি ছিল! সে তো গম ভাঙ্গিত, বাগান কোপাইত,
অমনি আহার দেওয়া নয় তো! ভাগ্যে আমরা চুরি
করিয়া জেলে যাই, তাই অমন ব্যবসা ফাঁদিতে পারিয়াছ!
তেল পিষিয়া বাহির করি, সেই তেল বেচিয়া পয়সা যা
পাও ত' তার কমিশন কিছু দাও, বাপু?

সারা দুনিয়ার উপর মন তাতিয়া উঠিল। লক্ষ্মীছাড়া
দুনিয়া! দুনিয়ার গায়ে আগুন ধরাইয়া দিলে ঠিক
হয়!

এমনি চিন্তায় সে তন্ময়, হঠাৎ পিছন হইতে কে
ডাকিল—সত্য না কি?

পুলিশ! চমকিয়া সে চাহিয়া দেখে, না, পুলিশ
নয়—বেহারী! তার জেলের বন্ধু বেহারী!

বেহারী কহিল—আজ বেরিয়েচিস্?

সত্য কহিল—হাঁ।

বেহারী কহিল—কিছু রোজগার কর্‌লি?

সত্য কহিল—না।

বেহারী কহিল—আয় আমার সঙ্গে—ঐ আহিরী-
টোলার ঘাটে। অনেক লোক সেখানে ছোট ছেলেমেয়ে
নিয়ে এসেচে। গায়ে তাদের গহনা আছে···

সত্য কহিল—ভারী ক্ষিদে পেয়েচে···

বেহারী কহিল—বসে থাকলে তো খাবার মুখে

আসবে না। এমন মরশুমে কুঁড়ের মত বসে আছিস্ কেন ?

সত্য ভাবিল, মরশুমের দিনই বটে! এত লোক পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে, সে ফাঁকে উড়িয়া পাণ্ডারাও তোফা রোজগার করিতেছে—ওই খোঁড়া কাণা ভিখারীর দল সার দিয়া বসিয়া গেছে···চাল, আলু, পয়সা—একমাসের সংস্থান একদিনে সংগ্রহ করিয়া লইতেছে···আর সে এমনি পড়িয়া থাকিবে ?

কিন্তু এই হাওয়া, এই স্বাচ্ছন্দ্য···বাঁধনের জোয়াল কাঁধে নাই! মুক্তির এই স্নিগ্ধ পরশ—এ পাইয়া সে গারদখানার মূর্ত্তি ভাবিতে আতঙ্ক হয়। আহার বাঁধা আছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মারধোর গালাগালি আর হাড়ভাঙ্গা খাটুনি·· দু'দিন একটু বাহিরে জিরাইয়া লওয়াও দরকার তো···

বেহারী কহিল—কি ভাবচিস্ ?

সত্য কহিল—না, তুই যা বেহারী···

বেহারী রাগিয়া কহিল—জানি, ছিঁচকে চোরের দুর্দ্দশা কখনো যাবার নয়! একছড়া হার কি দুগাছা বালা পেলে কতটা আরাম হতো—আর তুই একটা ছেঁড়া শাড়ী কুড়িয়ে তো ভারী পয়সা পাবি···

বেহারী চলিয়া গেল। সত্য তার পানে চাহিয়া নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিল।···বেহারী ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলে তার হুঁশ হইল, ঠিক, বেহারীর সঙ্গে গেলেই ঠিক হইত! এখানে দাঁড়াইয়া থাকিলে তো আহার মিলিবে না! আহার না মিলিলে টিঁকিয়া থাকিবে কি করিয়া ?

এক-পা-এক-পা করিয়া সে আগাইয়া চলিল···সম্মুখে লাল পাগড়ী মোটা জমাদার নিদ্ সিং তাকে দেখিয়া হাসিয়া কহিল,—কি রে সত্যি, কবে আসচিস্ ?

সত্য কহিল—আজ!

নিদ্ সিংয়ের মেজাজ ছিল অন্ত রকম। সে কহিল,—এখানে ঘুরতেচিস কাহে ? ফ্যাসাদে পড়িয়ে যাবি। যা, যা, কাম-ধান্দা কর···

এই কাম-ধান্দা পাওয়া যায় কি করিয়া, নিদ্ সিং তার কোনো হদিশ দিল না। সত্য তার পাশ কাটাইয়া আগাইয়া চলিল।···ঐ একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া আছে, গলায় সোনার হার ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে! সত্যর হাত নিস্‌পিস্ করিয়া উঠিল। সে এক-পা আগাইল—কিন্তু দুজন লোক। একজন মেয়েটিকে ডাকিল,—চাঁপা···

মেয়েটি কহিল—তোমার হলো কাকা···?

কাকা কহিল—আয়, আমাদের হয়ে গেছে। মেয়েটি তাদের সঙ্গে চলিয়া গেল। সত্য আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, আপদ চুকিল!

আরো আগে এক বাড়ীর সামনে কাঙালী বিদায় হইতেছে। কাজের অন্ধ, খঞ্জ জুটিয়াছে, ময়লা চিরকুট ন্যাকড়া পরা—সত্য শিহরিয়া উঠিল। ওদের সঙ্গে দাঁড়াইয়া হাত পাতা—না, অসম্ভব!···

সে ধীরে ধীরে জলে নামিল—আঁচল ভরিয়া জল পান করিল, তার পর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া আসিয়া একটা গাছতলায় বসিল। গাছের তলায় বিস্তীর্ণ ছায়া। সে বসিয়া বসিয়া শুইয়া পড়িল; শুইবামাত্র নিদ্রা। তার সমস্ত দুশ্চিন্তা ঘুমের আড়ালে কোথা মিলাইয়া গেল!···

যখন ঘুম ভাঙ্গিল, রৌদ্র তখন প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে—পথ তাতিয়া আগুন। জলের ধারে ভিড় কমিয়াছে—ওই ষ্টীমার চলিয়াছে, ওই নৌকায় মাল বোঝাই হইতেছে! দূরে ওই একটা তর্ক-কোলাহল চলিয়াছে!··· কাজের সাড়া চারিদিকে·· সে শুধু এই কোলাহলের মধ্যে নিশ্চল, স্তব্ধ—যেন ও-সবের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নাই! সে যেন আর এক জগতের জীব···অদৃষ্টের পায়ের ঠোক্কর খাইয়া এখানে ছিটকাইয়া আসিয়া পড়িয়াছে!

সত্য হাই তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আবার অনির্দ্দিষ্ট গতি-ভঙ্গীতে চলিতে সুরু করিল। পথের দুধারে দোকান—কত আসবাব, কত কি···জামা, কাপড় পুতুল, খেলনা, সাবান, শ্লেট, ছাতা, মশারি, ছবি খাবার···

একটা খাবারের দোকানের সামনে সে থমকিয়া দাঁড়াইল। প্রকাণ্ড কড়া চাপাইয়া দোকানী কি তৈয়ার করিতেছে—পিছনে বড় চ্যাঙারীতে একরাশ কচুরি।··· সত্য ভাবিল, জেলে দেয় দিক্—আর পারা যায় না·· চুরি যদি করিতে হয়,—গহনা নয়, কাপড় নয়, এই খাবার! দু'খানা যদি তুলিয়া খায়, কি এমন ইহাদের লোকসান হইবে!

সে দাঁড়াইল। দোকানী কহিল,—কি চাই ?

সত্য কহিল,—কচুরি।

—ক' পয়সার ?

—এক পয়সার।

—একখানা পাবি। পয়সা দে···

সত্য কহিল,—পয়সা নেই···

দোকানী রুক্ষ স্বরে কহিল—পয়সা নেই তো পথ ভাখ্,—ভিড় করিস্ নে···

লজ্জার মাথা খাইয়া সত্য কহিল—একখানা দাও, পথের কুকুরকেও তো মানুষ ভায়...

দোকানী কহিল—তুই তো কুকুর নোস্···

সত্য ভাবিল, কুকুর সে নয়—কুকুর খাইতে পায়, সে কুকুরেরও অধম···পরক্ষণে মন তাতিয়া উঠিল; সে কহিল—তাই না কি—

সত্য রুখিয়া দোকানের মধ্যে ঢুকিয়া চ্যাঙারী হইতে

ুরি তুলিয়া মুখে পূরিল—দোকানী লাফাইয়া
গর্দ্দানা পাকড়াইয়া সজোরে ধাক্কা দিয়া তাকে
দল…ফুটপাথের পাশে সত্যর হাঁটু ছড়িয়া
াকানীর চাকর ডাকিল,—পুলিশ, পুলিশ…
নী কহিল, পুলিশ ডেকে কি হবে? কচুরিখানা
কেড়ে নে। যেমন-কে তেমন!
র মত ছুটো ভৃত্য সত্যকে চাপিয়া ধরিয়া তার
হইতে কচুরি কাড়িয়া নর্দ্দামায় ফেলিয়া দিল!
দু'চারটে ঘুষি মারিয়া দোকানে ফিরিল।
কহিল—নর্দ্দামায় ফেলে দিলি, তবু খেতে দিলি

ানী কহিল—বেশ করেচি। বেরো পাজী

কহিল—তুই ছুঁচো…
! দোকানী চোখ পাকাইয়া গর্জ্জন তুলিল;
য়া ছুট দিল।…
াবাজারের মোড়…পুলিশ দাঁড়াইয়া আছে।
। কহিল,—সেলাম জমাদারজী।
দার তাকে চিনিত। সে কহিল,—সত্যো, আজ
?
হাসিয়া কহিল—হাঁ…আর পারি না সাহেব…
ধরে নিয়ে চলো। হাজতে গেলে খেতে পাবো।
দার হাসিয়া কহিল,—দিল্লাগি করিস না, যা,

্য অবাক্! এমনভাবে আত্মসমর্পণ করিতে গেল,
রিল না! আর কতবার বিনাদোষে ধরিয়া যা-
য়া চালান করিয়া দিয়াছে।…অদৃষ্ট!……
াঁ একেবারে সটান আসিয়া থানায় ঢুকিল।
ক্টর-বাবু বসিয়া কাগজে কি সব লিখিতেছিলেন;
াসিয়া ডাকিল—বাবু…
সপেক্টর-বাবু তার পানে না চাহিয়াই কহিলেন,—
াও, এ ঘরে নয়!
্য কহিল,—আমি সত্য।
সপেক্টর কহিলেন,—কে সত্য…ও, তুই! তা
?
্য কহিল,—কিছু খেতে দিন বাবু।
সপেক্টর কহিলেন,—তোর জন্তে খাবারের দোকান
সে আছি আমি, না?
্য কহিল,—বড্ড ক্ষিদে পেয়েচে বাবু।
্য ইন্‌স্‌পেক্টরবাবুর পায়ে হাত দিল।
নি একটা ঝটকায় তাকে হঠাইয়া ডাকিলেন,—এ
জা…
ক জন কনেষ্টবল আসিয়া হাজির। ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু
ন,—ইস্‌কো নিকাল দে…

কনষ্টেবল আসিয়া সত্যর ঘাড় ধরিয়া তাকে থানার বাহির করিয়া দিল।

সত্য গিয়া সামনের বাড়ীর রোয়াকের উপর বসিল। এত বড় দুনিয়া, এমন অকরুণ! হাত পাতিয়া ভিক্ষা মাগিয়াছে, ভিক্ষা মেলে নাই! হাত বাড়াইয়া পুলিশকে গিয়া বলিয়াছে, ধরিয়া চালান দাও, পুলিশ হাসিয়া সরাইয়া দিয়াছে! আর এতবার যে জেল খাটিয়াছে, অপরাধ সে কটা করিয়াছিল, যার জন্য…?

রোয়াকে বসিয়া বসিয়া বিরক্তি ধরিলে সে উঠিয়া আবার চলিতে সুরু করিল। কোথায় যাইবে? বেঁকির বাড়ী? শয়তানী! সে বেঁকির ভালো ছাড়া মন্দ করে নাই, কেনোদিন। ঐ ভোঁদা! পাজী—তার পরামর্শে বেঁকি মিথ্যা চুরির নালিশ ঠুকিয়া তাকে পুলিশের হাতে দেয়! ভোঁদার রিষেই তো তার আজ এ দুর্দ্দশা! সামনে একটা দোকান…দ্বারের সামনে একটা ছাতা। সে ভাবিল, এটা চুরি করিয়া থানার অধিকার আয়ত্ত করা যায় তো! তাই হোক!

ছাতাটা সে হাতে তুলিয়া লইল। কেহ দেখিল না। দোকানে তিন জনে মিলিয়া কি একটা তর্ক তুলিয়াছিল; ভ্রূক্ষেপ নাই! কিন্তু সত্য তা চায় না। কাজেই একটু শব্দ তুলিয়া তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ছাতা লইয়া ছু দিতে হইল—সে ছুটও তেমন জোরে নয়। দোকানে লোকজন তাকে বামাল-সমেত ধরিয়া ফেলিল, কহিল,— ছাতা চুরি!

সত্য কহিল,—খেতে পাই না বাবা, তাই চু করেছিলুম।

ছাতা কাড়িয়া লইয়া দোকানী কহিল,—যা, খুব চো বটে! চোখের সামনে চুরি, দিনে দুপুরে—বেটা বেকুব!

সত্য অবাক্! এরা ছাড়িয়া দিল! সত্য কহিল,— থানায় দিলেন না, বাবু?

দোকানী হাসিয়া কহিল,—হ্যাঁ, এই ছেঁড়া ছাত জন্ম পুলিশে যাই, পুলিশের খিঁচুনি…তার পর কো গিয়ে পাহারাওলার তাড়া, সার্জ্জেণ্টের গালাগাল খেয়ে কোর্ট-বাবুদের দয়া-প্রার্থী হয়ে হাতজোড় করে সারাদি হাপিত্যেশে বসে থাকি, কাজকর্ম্ম চুলোয় দিয়ে—যে পিতৃ-দায়, না মাতৃ-দায়! ছাতা পেয়েচি, ব্যস্, ত খালাস, আমিও খালাস! যা…

দোকানী চলিয়া গেল। সত্য আরো অবাক্! আ আজ নেহাৎ অপ্রসন্ন! ক্ষুধার যাতনায় আজ যে সে থানার হাজত-ঘরই কামনা করিতেছে! কিন্তু থানার ঘ আজ তাকে ঠাঁই দিতে এমন নারাজ!

পাগলের মত ঘুরিতে ঘুরিতে সে একটা কদর্য্য পা ঢুকিল। ঐ সে বাড়ী…বেঁকি ওই বাড়ীতে থাকে। তা গিয়া দেখা দিয়া বলি, সে যদি দুটী খাইতে দেয়!

সত্য গিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। দ্বারের সাম্‌নে উঠান, উঠানের পাশে কলতলা, তার পাশ দিয়া সিঁড়ি। সত্য সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল। ঐ কোণের ঘরটায়…

—বেঁকি! বলিয়া ঘরের মধ্যে পা দিয়াই সে দেখে, এ কি, এক তরুণী আর এক বাবু মত্ত-প্রায়, সামনে মদের বোতল, গ্লাস, আর ডিশে লুচি, কাটলেট, চপ…সুবাসে বাতাস একেবারে মশ্‌গুল!

বাবু কহিলেন—কে?

তরুণী কহিল—কি চাস্?

সত্য অপ্রতিভভাবে কহিল—বেঁকি…?

তরুণী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল,—বেঁকি এখানে নেই। বেঁকি! বেঁকি তোর স্ত্রী, না? চলে যা, এ বেঁকির ঘর নয়।

সত্য চাহিয়া দেখে, বেঁকিই! এখন…এ যে বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে! ঘরে পালঙ, ফুলদার পর্দ্দা, বেঁকির পরনের কাপড়টাতেও ভারী বাহার! হার্ম্মোনিয়মের বাক্স! বাঃ! বাঃ! সে-সব হইতে দৃষ্টি সরিয়া ডিশটাতে নিবদ্ধ হইল। দুনিয়ার যা-কিছু আরাম ঐ ডিশ্‌টার উপর! ঐ বোতলটার মধ্যে আরাম নাই, তরুণী বেঁকির অবয়বেও কোনো আরাম নাই! সত্য কহিল,—কিছু খেতে দিন বাবু দয়া করে।

বাবুর তখন রঙীন মেজাজ। বাবু কহিল—কি খাবি রে? কথাটা বলিয়া বোতলের দিকে বাবু নির্দ্দেশ করিল।

সত্য কহিল—আজ্ঞে, না…

বাবু কহিল,—কাটলেট খাবি?…

সত্য কাতর মিনতি-ভরা নেত্রে বাবুর পানে চাহিল। বাবু কহিল,—খা…বলিয়া ডিশটা তার দিকে ঠেলিয়া দিল।

সত্য কিছুক্ষণ স্তম্ভিত, নির্ব্বাক্…বাবু কহিল—খা…

সত্য তখনি কি-আবেগে ডিশখানা বাগাইয়া ধরিল! ধরিয়া…আঃ…আঃ…

তরুণী কহিল,—ভ্যালা রঙ্গ যা হোক্…কোথাকার কে…

বাবু হাসিয়া কহিল,—আমার মতই, বুঝলে ডার্বি-সুন্দরী…একদিন এই পথের পথিক ছিল। শুনলে না, বেঁকিকে খুঁজছিল…?

তরুণী মুখখানা বাঁকাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বাবু কহিল,—বেঁকিকে তুই জানলি কি করে?…

বাবুর পানে চাহিয়া সত্য কহিল,—সে অনেক কথা, বাবু…

বাবু কহিল,—বল্ না। আমার মেজাজ একটু রঙে আছে…থিয়েটারের বেঁকিসুন্দরী ডার্বির টাকা-পাওয়া বাবুর হাত ঘুরে আজ নির্ম্মলহাসিনী নাম নিয়েচে…তার কাহিনী সরস। আমরা এখন ডাকি ডার্বি-সুন্দরী…বোতলটা কিনলেই এখানে আসি…এখানে না এলে ও-জিনিষ মুখে তেমন রোচে না।

সত্য কহিল, পাড়াগাঁয়ে তার বাড়ী, সেখানে বুড়ী মা আছে, বিধবা বোন আছে, একটা স্ত্রীও আছে। সে কলিকাতায় আসিয়াছিল সাত বৎসর পূর্ব্বে… বারুদখানায় ঢালাইয়ের কাজ করিত। সঙ্গী মিলিল বদ; কাজেই যা রোজগার করিত, তাদের পাল্লায় পড়িয়া কিরণ, সুবাসিনী, পাঁচি, আর এই বেঁকির পায়েই ঢালিয়া দিত! ভোঁদার রিষ চড়িল…সেই রিষের ফলে ভোঁদা মিথ্যা নালিশে তাকে জেলে পাঠাইল। জেলের বাহিরে আসিলে আবার সেই বেঁকির ঘরে আস্তানা…তখন সেখানে গয়াদীন জমাদারের ভারী পশার… সে বেঁকির হাতেই রোজগারের পয়সা সঁপিয়া দিত, ঠিক যেমন স্ত্রীর হাতে মানুষ রোজগারের পয়সা আনিয়া দেয়! খরচের কোনো কৈফিয়ৎ চাহে নাই কোনো দিন! তবু বেঁকিকে সে বলে, ওর কাছ হইতে পয়সা যদি কিছু মেলে, মিলুক। তা বলিয়া সত্যকে একেবারে উড়াইয়া দিস্ নে…তা সে কথা শুনিতে বেঁকির বহিয়া গিয়াছে! সত্যই তো সে কিছু সত্যর ঘরের স্ত্রী নয়! তবু ঝগড়া-কলহ…গয়াদীন তারই কথায় সাহস করিয়া আবার এক মাকড়ী চুরির ফ্যাসাদ ঘটাইয়া জেলের দ্বার খুলিয়া দিল। কোথা হইতে এক সাক্ষীও আসিল!—যাকে সে কস্মিন্‌কালে দেখে নাই! আর সে মাকড়ীও সত্য আদালতে প্রথম দেখে…কিন্তু কোন কথাই খাটিল না। তিন জন সাক্ষী আসিয়া সটান বলিয়া গেল, তারা দেখিয়াছে, সত্যকে চুরি করিতে… ব্যস, জেল। তারপর পথে দেখিলে ঐ গয়াদীনের পরামর্শেই অন্য সেপাই তাকে ধরিয়া থানায় লইয়া গিয়াছে…

বাবু বোতল হইতে তরল পদার্থ ঢালিয়া এক গ্লাস গলায় ফেলিয়া কহিল—এ-বদ কাজ ছেড়ে দে, বাবা—সাদা চোখে মানুষ এখানে আসে কি করে, তাই ভাবি! আমি আসি এই বোতল-সমেত…দেখচিস্? তা দেশে যাবি? যা। বউ রয়েচে।

কথাগুলায় সেই কোন্ সুদূর পল্লীর ঘর-দ্বার অস্পষ্ট ছায়ার মত চোখের সামনে জাগিয়া উঠিল। সেই উঠানের মাঝখানে তুলসীমঞ্চ, সেই গাব-বন, তার পাশে ছোট পুষ্করিণী, মা, বোন, আর সেই ছোট কাপড়ের পুঁট্‌লির মত ছোট্ট বৌ…

বুকের মধ্যে একরাশ হাহাকার ঝড়ের বেগে গর্জ্জিয়া উঠিল। কত কথা, কত স্মৃতি…কি মনে করিয়া সহরে আসিয়াছিল, আর কি হইল!…বহুকাল বাড়ীর কোনো খপরও রাখে নাই…কে জানে, আজো তারা বাঁচিয়া আছে কি না!…চোখের কোলে কোথা হইতে অমনি একরাশ জল আসিয়া জমিল!…

বাবু কহিল,—কি রে…যাবি? এ পথে কেন, বাবা?

মার আসা···আমি মানুষ নই বাবা—বৌ মারা কি বৌ! যেমন রূপ, তেমনি গুণ! ওঃ, না রে, ায় না। ভুলবো বলে মদ খাই, মাতালদের শি···একেবারে তলিয়ে যেতে চাই, বুঝলি, র অতল তলে···

) কহিল,—আমার পয়সা নেই···

বু কহিল,—নেই? আচ্ছা, দেখি, বলতে পারি াল থেকে এখানে পড়ে আছি...পয়সা এখনো থাকা সম্ভব নয়। তবু···পকেটে হাত পুরিয়া কখানা নোট বাহির করিল, কহিল,—এইখানা াছে—দশ টাকার নোট। নে, এতে হবে?···

ত্যর চোখ বহিয়া জল ঝরিল। এ কি এ···আজ কটা দিনে দুনিয়ার কত মূর্ত্তি তার চোখে পড়িল! অকরুণতার মধ্যে এই বাবু···একটা মাতাল···এই সংসর্গে যে পড়িয়া আছে···আশ্চর্য্য!···

াবু হাঁকিল,—ডার্বি···

বেঁকি ওরফে ডার্বি আসিয়া ঘরে ঢুকিল, কহিল—কেন? বাবু কহিল,—আজ আর ফুর্ত্তি থাক। একটা দশ র নোট শুধু পড়েছিল···একে দিলুম।

বেঁকি চোখ-মুখ ঘুরাইয়া কহিল,—নবাব তিলক-। তার পর সত্যর পানে ফিরিয়া কহিল,—বেরো াগা··ফের যদি এ বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াবি তো মুড়ো রা মারবো···ছোট লোক, ভূত···

সত্যর সহ্য হইল না,—সে কহিল,—তাই বটে। তুই অপ্সরী, আর আমি ছোট লোক, ভূত! একদিন ছোটলোক ভূতই—

ডার্বি হাঁকিল—সুখন···

সত্য কহিল—আর সুখন নয়, এখনি যাচ্ছি। নম-। বাবু, ভগবান আপনার ভালো করুন···

সত্য বিদায় লইল।···

সন্ধ্যা নামিতেছে...সত্য ভাবিল, দেশেই যাই। এখনি য়ালদহ ষ্টেশনে। না হইলে কি জানি কি আবার ব্যাঘাত বে···দশ টাকা সম্বল আছে, আর আহার মিলিয়াছে···

পথের উপর কালী-বাড়ী। আরতি হইতেছিল। াখের ধ্বনি, ঘণ্টার শব্দ, ধূপ-ধুনার গন্ধ। সত্য চাহিয়া খে, ঐ যে কালী লোল-রসনা মেলিয়া দাঁড়াইয়া! ালোর কি দীপ্ত ছটা! দেবীর মুখে-চোখে কি ও াশাসের আভাস···সত্য থমকিয়া দাঁড়াইল। মুগ্ধ তন্ময় ইয়া দেবীর আরতি দেখিতে লাগিল···

কাঁধে হাত পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ কণ্ঠের গালি -শালা···দেবীর খাঁড়াখানা কি?···

সত্যর চমক ভাঙ্গিল! চাহিয়া দেখে, পুলিশ মাদার। সত্য তার স্পর্শ ছাড়াইয়া সরিয়া আসিল। মাদার কহিল,—কুথা যাবি শয়তান? দাগী চোর···

দিনের আলোয় এই দাগী চোর যখন সাধিয়াছে, মিনতি জানাইয়াছে,—আমায় ধরিয়া থানায় লইয়া চলো, তখন কেহ ধরে নাই! ধরা দিয়া জেলে যাইবার তখন তার খুব বাসনা ছিল—আর এখন ঘরের দিকে যেই পা বাড়াইয়াছে···অমনি—

জমাদার কোন কথা শুনিল না; তাকে ধরিয়া থানায় লইয়া আসিল; কহিল,—দাগী চোর···বাবু। সন্ধ্যার পর পথে ছিল—

বাবু কহিলেন—হুঁ···কবে বেরুলি জেল থেকে?

সত্য কহিল,—আজই ভোরে বাবু। দেশে যাচ্ছিলুম।

বাবু কহিলেন,—দেশে যাবি, তা সারাদিনে ফুরসৎ হলো না? একটা দিন না জ্বালিয়ে থাকতে পারিস নে?

সত্য কহিল,—সত্যি বলচি বাবু···এক বাবু ভিক্ষা দেছেন, এই দশ টাকা...এই দেখুন···?

বাবু কহিলেন,—হাঁ, টাকা আছে? ভিক্ষা! বটে! ভিক্ষার জন্য বুঝি ব্রাহ্মণ পাওয়া গেল না···

জমাদার হাসিল, কহিল,—জোর-কেশ আছে, বাবু··· মালভি আছে, ঐ দশ রূপেয়াকা নোট···

এইটুকু···

তার পর হাজত হইতে কোর্টে আসিয়া সত্য দেখিল, সেই দশ টাকার নোটের মালিক অবধি আসিয়া হাজির। সে-বাবু নয়! একটা ভুজাওয়ালা খোট্টা। খোট্টা বলিল, দশ টাকা আদায় করিয়া চাদরের খুঁটে বাঁধিয়া সে আসিতেছিল, কালীবাড়ীর সামনে দিয়া; তখন হঠাৎ চাদরের খুঁটে টান পড়িতে দেখে, চাদরের এক কোণ কাটা, আর এই আসামী ছুটিতেছে। 'চোর' বলিয়া চীৎকার তুলিতে জমাদার সাহেব তাকে ধরিয়া ফেলে—তার হাতে দশ টাকার নোটও মিলিয়া যায়।

সত্য হাসিল, চমৎকার! বাঃ!

শুধু ইহাই নয়—আরো তিনজন সাক্ষী আসিয়া ঠিক ঐ খোট্টার কথায় সায় দিয়া গেল।

হাকিম সত্যকে বলিলেন,—জেরা করবি?

সত্য কহিল—না!···

কোর্ট ইন্‌স্পেক্টর কহিলেন,—পুরোনো দাগী, হুজুর···

হাকিম কাগজ-পত্র দেখিয়া রায় দিলেন—দেড় বছর জেল···

সত্য কহিল,—সেলাম হুজুর! সুবিচার করে বাঁচালেন আমায়! ভগবান আপনাকে রাজা করুন!···

এজলাস-ঘরের বাহিরে জমাদার ভুজওয়ালাকে বলিতেছিল,—এ নোট থানায় গিয়ে নিয়ে আসবি একটা সহি দিবি। তার পাশ দিয়া সত্যকে লইয়া পুলিশ-শেপাই হাজতে চলিল।

হাসিয়া সত্য কহিল—সেলাম জমাদার সাহেব জীতা রহো!

যমের অরুচি

(নক্সা)

উপক্রমণিকা

রেলোয়ে-কোম্পানির কন্‌সেশনে এবার একটু মুস্কিল বাধিয়াছে—এক-ভাড়ায় সেকেণ্ড-ক্লাশে যাতায়াতের ব্যবস্থা নাই। তার উপর বাজার মন্দা—পয়সা-কড়ির আমানত বন্ধ। অথচ সৌখীন নর-নারীর দল করেন কি! ছুটিতে গৃহে বসিয়া থাকিলে মান-ইজ্জত যাইবে! চাকর-বাকরদের আতঙ্ক জাগিবে; বাবুদের গণেশ বুঝি বা উল্টায়! পাড়া-পড়শী মুখ বাঁকাইয়া অন্তরালে হাসিবে! মাথা তুলিয়া সমাজে থাকা দায় হইবে।

কাজেই কেহ লিলুয়ায় বাগান খুঁজিতে চলিলেন; কেহ গেলেন ডায়মণ্ড হার্বার; কেহ দেশে। যাঁরা প্রগতির অগ্রদূত, তাঁরা একটু নূতন কীর্ত্তি রাখিতে উদ্যত হইলেন। কি সে কীর্ত্তি? কি করিয়া রাখা যায়?

দমদমার এরোড্রোমে মস্ত এক এরোপ্লেন আসিয়া [illegible]মিল; একদল যাত্রী ভূপ্রদক্ষিণে বাহির হইয়াছেন, [illegible]দের প্লেনে একখানা খপরের কাগজের মলাট কেমন করিয়া লাগিয়া গিয়াছিল। দমদমায় প্লেন নামিতে অনেকে সে কাগজ দেখিল। যারা চতুর, তারা এরোপ্লেনের ফটো তুলিতে গিয়া সে খপরের কাগজের ফটো লইল। সে ছবি কাগজে কাগজে ছাপা হইয়া গেলে তার লিপি লইয়া মহা-আন্দোলন জাগিল, এবং লিপি-উদ্ধারে পরলোকের অনেক তথ্য জানা গেল। এই তথ্যের অন্তরালে কলিকাতা কর্পোরেশনের কালেক্টরী-চাকরির বিজ্ঞাপনের মত একটি চাকরি-খালির বিজ্ঞাপন আবিষ্কৃত হইল। বিজ্ঞাপনটুকু এই—

যমালয়

মিনিষ্টার ইন্‌-চার্জ্জ—চিত্রগুপ্ত

এবার পূজার সময় অত্র মিনিষ্ট্রীর অধীনে প্রধান [বি]চারপতির পদ অস্থায়িভাবে খালি হইবে। সরকারী [কার্য্যো]পলক্ষে তাঁহাকে ইহলোক-পর্য্যটনে পাঠানো হইতেছে। [য]েহেতু ইহলোকে সামাজিক, পারিবারিক বিধি-ব্যবস্থায় [ব]হু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হওয়ায় যমালয়ে দু'একটা বিচার-[বি]ভ্রাট না ঘটিতেছে এমন নয়! কাজেই অত্র মিনিষ্ট্রী ও [অত্র]-মিনিষ্ট্রীর সভাপতি ও নায়ক শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ [কৃ]তান্ত মহারাজ দি গ্রেট এ্যাণ্ড কিলার অফ্ অল্—[ক্রি]য়েটার এণ্ড কর্ম্ম, স্থাবর-জঙ্গম চরাচর-সংহারী মহানুভব [সি]দ্ধান্ত করিয়াছেন, প্রধান বিচারপতির পক্ষে ইহজগতের আধুনিক বিধি-ব্যবস্থায় পারদ[র্শী হ]ওয়া একান্ত প্রয়োজন। আপাতত তিন মাসের জন্য তাঁহার ছুটী মঞ্জুর হইয়াছে। কাজেই উক্ত পদের জন্য অস্থায়িভাবে একজন সুদক্ষ বিচারপতির প্রয়োজন। আধুনিক অর্থাৎ মডার্ণ প্রগতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাহারো আবেদন গ্রাহ্য হইবে না। আবেদনকারী দরখাস্তে জানাইবেন, যমালয়ের কার্য্য-নির্ব্বাহক বিভাগের কোনো কর্ম্মচারী বা সদস্যের সহিত তাঁহার রক্ত বা ভক্ত কোনোরূপ সম্পর্ক আছে কি না। কোনোরূপ ক্যানভাশিং চলিবে না, ক্যানভাশিং সম্বন্ধে কোনো চেষ্টা বা ফন্দীর কথা মিনিষ্ট্রীর লোক জানিলে আবেদন অগ্রাহ্য হইবে; চাকরি মিলিবার পর সে সংবাদ মিলিলে চাকরি যাইবে। মাসিক মাহিনা গুণানুসারে নির্দ্দিষ্ট হইবে; তবে জামিন-স্বরূপ এক লক্ষ টাকা নগদ গচ্ছিত রাখা চাই। এখানকার মিনিষ্ট্রীতে কোনোরূপ দলাদলির সৃষ্টি যাহাতে না হয়, এতদুদ্দেশ্যে কলিকাতার কর্পোরেশন-সংশ্লিষ্ট কাহারও আবেদন একেবারে গ্রাহ্য হইবে না। বি, পি, সি, সির কোনো ব্যক্তি চাকরির যোগ্য বিবেচিত হইবে না। তবে কর্পোরেশনের সংস্রব বা বি, পি, সি, সির সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া এফিডেভিট বা সেক্রেটারীর সার্টিফিকেট দাখিল করিলে আবেদনকারীর আবেদন মঞ্জুর হইবে। প্রশংসা-পত্রসহ সত্বর দরখাস্ত দি[ন]। ইতি।

ম্যানেজিং গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে চিত্রগুপ্ত—
খতিয়ান-ই-হিন্দ
(স্বর্ণ-পদক)

আবেদনের কথা রাজ্যের খপরের কাগজে ছাপা হইলে সৌখীন নর-নারীর দল রুখিয়া চাকরির দরখাস্ত ছাড়িল। যমালয়ে হাওয়া খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু পয়সা উপার্জ্জন হইবে!

অসংখ্য দরখাস্তের মধ্য হইতে সবগুলিকে বাতিল করিয়া একখানি দরখাস্ত চিত্রগুপ্ত খতিয়ান-ই-হিন্দ মহাশয় শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ কৃতান্ত মহারাজের কাছে পেশ করিলেন। দরখাস্তের কটি লাইনের নীচে চিত্রগুপ্ত নীল পেন্সিলে মোটা দাগ কাটিয়া দিয়াছেন।

আবেদনকারী বাঙালী—নাম শ্রীরুদ্রচৈতন্য বাগ। উপস্থিত পেশা—'ঢক্কা' সাপ্তাহিকের সহ-সহ-সম্পাদক। সুদীর্ঘ আবেদন-পত্র—সঙ্গে প্রশংসা-পত্রও আছে।

বাগ মহাশয়ের আবেদনের যে কয় ছত্রে নীল

দাগ, শ্রীল শ্রীযুক্ত কৃতান্ত মহারাজ সে কটি
লেন,—

লা সাপ্তাহিকের সহ-সহ-সম্পাদকীয় কার্য্য
ায় রাজ্যের খপরের কাগজ হইতে সংবাদ
এবং আধুনিক ও প্রাচীন সর্ব্ববিধ গ্রন্থ-রাজির
াটিয়া নিত্য তত্ত্ব সংগ্রহ করার ফলে জাগতিক
বস্থায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি। তাছাড়া
মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ-কার্য্যে রত থাকায়
দক্ষতা অনিবার্য্য !

গুপ্ত কহিলেন—প্রশংসা-পত্র যা আছে, তার
। হুজুর-সরকারের অনুমতিক্রমে দেখাই…।
পত্রখানি বাঙলার নব-পর্য্যায় সাহিত্য-রাজ্যের
ছত্রপতি শ্রীযুক্ত চামুণ্ডাশঙ্কর রায় মশায়
ছেন,—

দ্রচৈতন্যের লেখার বল বাঘের মত ! যাঁর হাতে
া পড়ে, তাঁর রক্ত তো তিনি শোষেনই, সেই
ড়-মাস নিমেষে কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খান ; তার
খেন না !"

ল শ্রীযুক্ত কৃতান্ত মহারাজ ক্ষণেক চিন্তা করিলেন,
করিয়া কহিলেন—উহাকেই নিয়োগ-পত্র পাঠাও।
। দাও, নিমতলার ঘাটে অমাবস্যা-তিথিতে রাত্রি
য় যেন সেই বিল্ববৃক্ষ-মূলে মাদুরে শয়ান থাকে—
। জোয়ান দূতেরা গিয়া রজ্জুপাশ-প্লেনে তাহাকে
ন করিবে।

ত্রগুপ্ত হাঁফ ছাড়িলেন,—তথাস্তু !

ধান বিচারপতি যমালয় ছাড়িবার জন্য লগেজ-পত্র
বসিয়াছিলেন। দাস-দাসী-পাচককে কাজে জবাব
হুন—ব্যয়-সঙ্কোচের জন্য ! চিত্রগুপ্তের গৃহে দু'বেলা
রাদি চলিতেছিল ; কাজেই চিত্রগুপ্ত বেচারার হাঁফ
বার বিলক্ষণ হেতু ছিল।

চন্দ্রচৈতন্য বাগ মহাশয় এজলাসে বসিয়াছেন।
গুপ্ত খাতা পাড়িয়া পাশের আসনে উপবিষ্ট—তাঁর
ভাগ ! শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ দি গ্রেট কিলার বাহাদুর
শ দিয়াছেন, নূতন লোক—কোথাও যদি বাধে, সে
হঠাইবেন চিত্রগুপ্ত—বহুকালের প্রাচীন মিনিষ্টার—
জানেন-শোনেন। আরো বলিয়া দিয়াছেন, কোনো
ার যদি ঘটে, তাহা যেন শনৈঃ শনৈঃ—নচেৎ
ফগানিস্তানের দশা ঘটা বিচিত্র নয় ! যমালয়ের
োশাক মহল্লাটা নানা দেশের নানা রকম পাপাত্মায়
তি ! যে করিয়া তাদের ঠাণ্ডা রাখা হয়—ডাণ্ডসের
লপ, মুগুরের লোশন্—তবু তারা থাকিয়া থাকিয়া
পিয়া ওঠে।

প্রথমেই মামলার ডাক হইল,—আসামী শিহরণ
। ফরিয়াদী বদ্ধ ডোম।

বুদ্ধু কলিকাতার এক বস্তীতে থাকিত ; বয়সে বুড়া। পরিবারের মধ্যে বুড়া স্ত্রী,—ষোল বছরের মেয়ে লাখপতিয়া ও দুই ছেলে ! বস্তীর পাশে মেশ। সেই মেশে থাকে শিহরণ সেন। কলেজে পড়ে, কবিতা লেখে এবং বস্তীর পানে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে। লাখপতিয়াকে সে দেখে—যেন ষোল ফাল্গুনের হাওয়ায় দোলা ফুলের মালা ! তার গলা চিড়বিড় করে—ও মালা গলায় তোলা যায় না ?

কিন্তু আলাপ করে কি করিয়া ? বস্তীর লোকগুলা যেন ম্যাড়া ভূত ! কবিতা বুঝিবার সামর্থ্য নাই। বহু চিন্তা তার মাথায় উদয় হইত—একটা নাইট-স্কুল করিয়া বিনা ব্যয়ে উহাদের লেখাপড়া শিখানো ? সেই সঙ্গে লাখপতিয়াও বাড়ীতে আসিবে…! নয় তো, এম্পায়ারের ষ্টেজে থিয়েটার ? কিম্বা কোনো প্রোসেশনে কাণ্ডাথারিণী সাজাইয়া ?…

সকালে বস্তীর পানে নজর পড়িতে ভাবিত, মিথ্যা সে আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন দেখে ! এক দিন সুযোগ মিলিল। বস্তীর কলতলায় কুলিদের ভিড়—লাখপতিয়া আসিয়াছিল কলসী হাতে জল লইতে। এক জন কুলিকে সরাইয়া কলে কলসী ধরিবে। কুলি চটিয়া গেল—অমনি কলহ…সে কলহ হইতে শেষে মারামারি ! কুলিটা লাখপতিয়ার পিঠে চড় বসাইল। খোলা খড়খড়ি দিয়া শিহরণ এ দৃশ্য দেখিতেছিল ! সে চড় তার বুকে পড়িল। ছুটিয়া সে কলতলায় গেল এবং বাঘের মত ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কুলিদের মারিয়া লাখপতিয়ার মূর্চ্ছিত দেহ বুকে তুলিয়া মেশে নিজের ঘরে আসিল। লাখপতিয়াকে বিছানায় শোয়াইয়া তার পরিচর্য্যায় রত হইল।

জাগিয়া লাখপতিয়া কহিল—আমি কোথায় ?

শিহরণের প্রাণে শিহরণ জাগিল। শিহরণ কহিল—আমার কাছে !

লাখপতিয়ার চাহনিতে বিদ্যুৎ ছুটিল। লাখপতিয়া তার পানে চাহিয়া—শিহরণের শরীরেও বিদ্যুৎ চমকিল। ধ্যানের ধন এত কাছে ! সে তার তৃষিত ওষ্ঠ লাখপতিয়ার ওষ্ঠের অভিমুখে অগ্রসর করিয়া ধরিল, সুধার পরশ পাইবার পূর্ব্বেই পিঠে ঝড়াঝ্ঝড় কড়িকাঠ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কেঁকাইয়া শিহরণ পড়িয়া গেল। চাহিয়া দেখে, কড়িকাঠ পড়ে নই, পাশে বুড়া বুদ্ধু। বুদ্ধুর এক হাতে চ্যালা কাঠ—শিহরণের পিঠে কাঠ পড়িতেছে ! অপর হাতে সে লাখপতিয়ার চুল ধরিয়া টানিয়াছে। বুদ্ধু ডাকিল,—কশবী।

শিহরণ গর্জ্জন তুলিল—খবর্দ্দার !

গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে কিল-চড়-বর্ষণ !… তখন কুলিরা সদলে মেশের দোতলায় উঠিয়াছে।

কুরুক্ষেত্র বাধিয়া গেল। শেষে থানা পুলিশ…পয়সা, আর ভালো উকীলের জোরে শিহরণ বাঁচিয়া গেল।…

তার পর জীবনের শেষে তিনজনেই এখানে আসিয়াছে! শিহরণ এখানেও বুদ্ধুর কাছ হইতে লাখপতিয়াকে চুরি করিয়া আনিয়াছে। লাখপতিয়ার স্বামী আছে—মংরু। সে দাবী ছাড়িবে কেন?

বিচার কর্ত্তা রুদ্র-চৈতন্য সকলের জবানবন্দী লইলেন। তার পর তাঁর রায় বাহির হইল!—

শিহরণ তরুণ, লাখপতিয়া তরুণী। তরুণ তরুণীকে পাইবে—বিধাতার বিধান। মংরুও তরুণ—এখন বিচার্য্য, কোন্ তরুণ তাকে পাইবে? শিহরণ কবিতা লেখে, মংরু লেখে না; শিহরণের পয়সা-কড়ি আছে, মংরুর নাই; শিহরণ ভদ্র লোক—মংরু তা নয়। অতএব তরুণীতে মংরুর দাবী থাকিতে পারে না। লাখপতিয়াকে পাইবে শিহরণ।

চিত্রগুপ্ত চুপি চুপি বলিলেন—কিন্তু ও যে মংরুর বিবাহিতা স্ত্রী…

রুদ্রচৈতন্য কহিলেন—Fool! বিবাহের চেয়ে বড়ো শিহরণের হৃদয়াবেগ। তা ছাড়া বিবাহ একটা কুসংস্কার মাত্র…তাকে মানা উচিত নয়। মান্ধাতার আমোল হইতে চলিয়া আসার দরুণ বিবাহ মামুলি, পচা হইয়া গিয়াছে—মানা চলে না। যে যাহাকে চায়—পাইবে। বিবাহে রান্না-বান্নার কথা কান্না জাগায়, পুত্রকন্যার বন্যা হন্যা করিয়া তোলে। পুত্র-কন্যা যত দিন না আসে, অবাধ প্রেম! পুত্রকন্যা আসিলে অনাথ আশ্রমে যদি তাদের জন্য জায়গা মেলে,—তখনো অবাধ প্রেম। সেখানে জায়গা না মিলিলে তখন না হয় একটা স্বামী দেখিয়া তার ঘাড়ে ছেলে-মেয়ে ফেলিয়া দিয়ো। দিয়া…

চিত্রগুপ্ত কহিলেন—তাহলে ভবিষ্যৎ বংশধররা যে নিরাশ্রয় হবে…

রুদ্রচৈতন্য কহিলেন—অত ভবিষ্যৎ ভাবলে তরুণ-হৃদয় মরুভূমি হয়ে যাবে।

চিত্রগুপ্ত কহিলেন—সমাজ…শৃঙ্খলা…শিক্ষা, দীক্ষা—

রুদ্রচৈতন্য কহিলেন—ড্যাম্ ইট! যতক্ষণ তরুণ বয়স, তরুণ মন…ততক্ষণ দুনিয়ায় আর কিছু থাকবে না!

চিত্রগুপ্ত হাঁকিলেন,—ভোলা পাল…

ঝাঁকড়া চুল, খালি গা, ময়লা কাপড় পরা এক ছোকরা আসিয়া দাঁড়াইল। চিত্রগুপ্ত কহিলেন,—এ ছোকরা কেবল সকলের পকেট কেটে বেড়িয়েচে। দৈবাৎ বাসের ধাক্কা খেয়ে মারা যায়। গাঁটকাটা চোরের বিচার।

রুদ্রচৈতন্য তাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—চেহারা ভদ্রলোকের মত দেখচি…

চিত্রগুপ্ত কহিলেন—বড় ঘরের ছেলে! মা-বাপ পলিটিক্সে ঢোকেন—ছেলের পানে চেয়ে দেখতেন না। ছেলে স্কুল ছেড়ে পাড়ার যত বাউণ্ডুলের দলে ঘুরে বেড়াতো। বাড়ী থেকে পয়সা-কড়ি, গহনা চুরিতে হাতে খড়ি হয়। বাপ-মা দেশের কাজে অত্যন্ত মত্ত… এদিকে লক্ষ্য ছিল না। ক্রমে ছেলে নেশায় ওস্তাদ হলো। তার পর বাপ-মা মারা গেলে বাড়ী বিক্রয় হলো… সম্পত্তি খোয়ালো! কিন্তু অভ্যাসের দোষ…হাত-টান বেড়ে চললো। কাজেই…

রুদ্রচৈতন্য কহিলেন,—হুঁ…

রায় দিলেন—বেকসুর খালাস! সম্পত্তি হরণ করায় অপরাধ নাই। All equalএ সাম্য-নীতির ছোকরা সাহায্য করেচে, অতএব অপরাধ দেখি না…

চিত্রগুপ্তর দুই চোখ ছানাবড়া হইয়া উঠিল, রুদ্রচৈতন্য বলিলেন,—প্রগতির শেষ লক্ষ্য—আত্মবৎসর্ব্বভূতে জগৎ অর্থাৎ পর কে? নাই। পরের স্ত্রী, পরের ধন—এ সব আত্মবৎ কোলে টান্‌তে হয়! এ-যুগের বাণী তাই! গো-বেচারী চিত্রগুপ্ত একেবারে বিস্ময়ে—যাকে বলে, বিমূঢ়!

রুদ্রচৈতন্য কহিলেন,—Next Case…

চিত্রগুপ্ত ডাকিলেন,—পল্লবকুমার…

দীর্ঘ বাবরী কেশ, পায়ে স্যাণ্ডেল, গদ্দের ধুতি ও পাঞ্জাবি গায়ে এক তরুণ মূর্ত্তির উদয়।

চিত্রগুপ্ত কহিলেন,—ইনি সারা জীবন কবিতা লিখেচেন। সে সব কবিতায় নারীজাতকে ঘরের দেওয়াল ভেঙ্গে নৈশ অভিসারে প্রমত্ত, উন্মুখ করবার প্রয়াস পেয়েচেন! নারীর কল্যাণী মূর্ত্তি ভেঙ্গে তাঁকে শুধু ভোগের বস্তু বলে প্রচার করেচেন। নারীর এতে রীতিমত মানহানি।

রুদ্রচৈতন্য সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া রায় দিলেন, কুম্ভীপাক নরক!

পল্লব কহিল,—কেন হুজুর?

চিত্রগুপ্তও অবাক্। ইহার বেলায় উল্টা পাক। কহিলেন,—তাই তো!

রুদ্রচৈতন্য কহিলেন,—তোমার সেই দুর্ব্বল মরা কবিতা পড়ে কোনো নারী ঘরের দেওয়াল ভেঙ্গে বাইরে অভিসারে আসে নি, তোমার এই অক্ষমতাই তোমার অপরাধ! এর চেয়ে যদি তুমি একটি নারীকেও গৃহ-দ্বার ভেঙ্গে বাহিরে আনতে পারতে, তা হলে তোমার কৃতিত্বে প্রগতির কাজ অগ্রসর হতো। তোমার এ শাস্তিতে প্রণয়-কবিতা-লেখা কবিগুলো শায়েস্তা হবে। প্র্যাক্‌টিকাল হওয়া চাই দেওয়াল ভাঙবার জন্য! নিরাপদ গৃহ-কোণে বসে কলমবাজী করলে চলবে না!

চিত্রগুপ্ত ডাকিলেন,—ক্যানভাস চক্রবর্ত্তী…

শুনিয়া রুদ্রচৈতন্যও অবাক। এমন নাম দেশে শোনে নাই।...

গুপ্ত কহিলেন,—এঁর অপরাধ দেশহিতৈষিতার ইনি বহু ফণ্ড খুলে দেশের টাকা সংগ্রহ করে করেচেন। ছেলেদের বক্তৃতায় ভুলিয়ে স্কুল-ছাড়িয়েচেন; নিজে মোটরে চেপে ছেলেদের টর টানিয়েচেন, গৃহ ভুলিয়ে মেয়েদের দিয়ে নিশান বইয়েছেন...দু চারিটা কোম্পানি খুলে ার হাতে নিয়ে পুরানো কর্ম্মচারীদের বিনাদোষে নিজের জ্ঞাতি-বন্ধুদের সে সব চাকরীতে বাহাল , খবরের কাগজে নিজের প্রশংসা-প্রচারে ঢাক-জিয়েছেন, যিনি এঁর চাতুরী আর ধাপ্পা ধরবার রেচেন, গুণ্ডা দিয়ে তার পিঠে লাঠির ঘা বসিয়ে-অর্থাৎ মনে-জ্ঞানে একের নম্বর শয়তান হয়ে সেজে...

চৈতন্য কহিলেন,—Bravo! ইনি পুরুষ-সিংহ। দ্ধিচাতুর্য্য...স্বর্গের মিনিষ্ট্রিতে বসবার যোগ্যতা শুধু আছে। বেকসুর খালাস। বৈকুণ্ঠের হাওয়া খেয়ে করে বেড়ান।...

রো বহু মামলা হইল। এক কুল-নারী স্বামীকে াওয়াইয়া প্রতিবেশী যুবার সঙ্গে কুল ত্যাগ ছিল;—রুদ্রচৈতন্যের বিচারে তার আসন হইল হিত্য-স্বর্গের সতীলোকে। এক বুড়া বাঙালী উপন্যাস লিখিয়া বড়লোকদের যা-খুশী কুৎসা ইয়া মর্ত্ত্যলোকে জেল খাটিয়া যমালয়ে আসিয়াছিল হার স্থান হইল ব্যাসলোকে বাল্মীকির পাশে। এক লাক আত্মীয়-বন্ধুর টাকা মারিয়া লোন-কোম্পানি া নিজে জমিদারী কিনিয়াছে, তাদের জলে য়েছে; বিচারে তার স্থান হইল, ধ্রুবলোকে।

শেষবেলায় বিচারের জন্য খাড়া করা হইল থিয়েটারের নাট্যকারকে। অপরাধ?

চিত্রগুপ্ত কহিলেন—ইনি দুখানি পৌরাণিক নাটক লিখিয়াছেন। সে নাটকে পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি সীতাদেবীকে রাবণের প্রতি অনুরাগী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণকে লাম্পট্যের অবতার-রূপে আঁকিয়াছেন। এক-খানি সামাজিক নাটক লিখিয়াছেন—তাহাতে মনুষ্যত্বের আদর্শ আঁকিয়াছেন, তাঁর নায়ককে—নায়ক নিজের বিবাহিতা পত্নীর দেহ ভাড়ায় খাটাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছে—এমনি বর্ণনা।...

বিচারে এ নাট্যকারের স্থান হইল ব্যাসলোকে।

সকালে খপরের কাগজে এই সব মামলার রিপোর্ট পড়িয়া শ্রীল শ্রীযুক্ত কৃতান্ত মহারাজ হাঁকিলেন,—চিত্রগুপ্ত!

চিত্রগুপ্ত মাথা চুলকাইয়া কহিলেন,—মহারাজ—হুজুর—

মহারাজ হুজুর বলিলেন—আজ আদালত বন্ধ দাও। আর রুদ্রচৈতন্য ঘুমাইলে দূত মারফৎ উহাকে নিমতলার ঘাটে পৌঁছাইয়া দাও। কপালে দাগিয়া দিয়ো—যমের অরুচি! উহাকে অখণ্ড পরমায়ু দিয়া আবার ঐ বাঙলায় পাঠাইলাম। ও-ব্যক্তিকে যমালয়ে ঢুকিতে দেওয়া নয়, তোমার খাতা হইতে দুর্বৃত্তের নাম কাটিয়া দাও। বাঙলা দেশ বহুভাবে নিপীড়িত হইতেছে—এ নিপীড়ন বাঙলা চিরদিন সহিতেছে। সহিবার শক্তিও বাঙলার প্রচুর। উহাকে অমর করিয়া বাঙলা দেশেই রাখিতে চাই। নহিলে পরজন্ম লইয়া অন্য যে দেশে যাইবে, সেখানকার সমাজ ও সাহিত্য সব ছারখারে দিবে। সে-দেশও বেচারী বাঙলা দেশের মত জ্বলিয়া খুন হইবে অতএব সময় থাকিতে হুঁশিয়ার! আমি বাঁচিয়া থাকিতে যমের অরুচিকে যমালয়ে আর না আনা হয়—সাবধান।

মৃদুস্বরে চিত্রগুপ্ত বলিলেন,—কিন্তু প্রগতি—মহারাজ প্রগতি!

নিলামী ইস্তাহার

(নক্সা)

মহাপূজা মহা-সামনে মহাগত! মা দশভূজা দশ হাত ভরিয়া মহানন্দ আনিয়াছেন,—পাপী, তাপী, দুঃখী, আতুর, অভা-জন, সভা-জন, মহা-জন—সকলকে বিতরণ করিবেন বলিয়া। আমরা তাঁর ভক্ত সন্তান। বহু সাধনায়, সুকঠোর তপশ্চর্য্যায় তাঁর সেই দশভুজ-ভরা মহানন্দ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া দেশবাসী আবালবৃদ্ধবনিতাকে তাহা বিতরণ করিতে উদ্যত হইয়াছি। মূল্য অতি সামান্য, অতি তুচ্ছ, অতি নামমাত্র। মহাপূজার বাজারে ছুটিবার কালে একবার একটু স্তম্ভিত হৃদয়ে ফুট-পাথে দাঁড়াইয়া (ল্যাম্পপোষ্টের আড়ালে দাঁড়াইবেন, নহিলে ভিড়ে ধাক্কা খাইবেন) আমাদের কথা শুনিয়া লউন। তার পর বক্ষে হস্ত দিয়া বিস্ফারিত চক্ষে ভাবুন তো ভাই বঙ্গবাসী, আজ আপনাদের কতখানি অভাব-বিমোচনের জন্য স্বভাব-ঔদার্য্যবশতঃ আমরা কি বিপুল আয়োজন করিয়াছি। চৌরঙ্গীর দোকানে শেলের ব্যাপারে, ম্যাকেঞ্জি লায়ালের অক্সন রুমে, কুকের আড়গড়ায়, রেলের ষ্টেশনে, বসুমতীর গুদাম সাবাড়েও এমন আদি অকৃত্রিম সাচ্চা ও আচ্ছা রকম আয়োজনের মধুপর্ক কখনো প্রত্যক্ষ করেন নাই! এ কথা ভূয়োভূয়ঃ মেঘমন্দ্রস্বরে সরোষে নগর্জ্জনে সবিশেষ স্পর্দ্ধা-সহকারে বলিবই বলিব।

১নং লাট

তরুণীর চোখের দু'ফোঁটা চোখের জল; বুকের দুদুমানি (একটিমাত্র সনেটে ব্যবহারের জন্য); ছাদের আলিশা-ভাঙ্গা (দেড় ইঞ্চিটাক্); বিরাট আকাশ; দখিণ হাওয়া (সাত ভরি); শাড়ীর লাল টুকটুকে পাড় (দেড় গজ)।

এক তরুণ কবির সম্পত্তি ছিল। প্রতিবেশিনীর দিক্ হইতে এক কৌটা অপাঙ্গভঙ্গীর আশায় নিরাশ হইয়া বেচারা মেশের ঘরের ভাড়া না দিয়াই ভাগিয়া গিয়াছে। মেশের বাড়ীওয়ালা এগুলাকে আত্মসাৎ না করিয়া সদয় হৃদয়ে আমাদের কাছে পাঠাইয়াছেন। ওঠো-ওঠো কবিদের ফোটো-ফোটো ভাবে মস্ত সাহায্য হইবে।

২নং লাট

চারগাছি চাঁচর চিকুর দীর্ঘ কেশ; এক ছটাক দীর্ঘ নিশ্বাস (বুক-ভাঙ্গা); থমথমে দৃষ্টি (দেড় রতি টাক্); গমগমে জ্যোৎস্না (তিন ঝলক); খড়খড়ির ভাঙ্গা পাখি (এক জোড়া); লাল নাগরা (এক পাটি); খদ্দরের শাড়ীর টুকরা (কাটিয়া চারখানি রুমাল তৈরী হইতে পারে)।

এগুলিও মেশের খালি ঘরে পড়িয়াছিল; মালিক অজ্ঞাত। ফুটন্ত কবিদের উঠন্ত ভাবের সহচরণ জিনিষগুলি একটু ছাতা-ধরা—তা হোক, শরতের রৌদ্রে দু'দিন ধরিলেই আবার টাট্‌কা তাজা হইবে।

৩নং লাট

হিঞ্চে শাক (এক আঁটি); শেয়ালকাঁটা ফুলের পাপড়ি (২টা); লুচির ফুল্‌কো (এক-টুকরা; তরুণীর মুখে পরাইয়া তাকে ফুল্‌কো-মুখী করা চলিবে; সাধারণ মাপ); তিনটা বাদাম (তরুণীর দাঁতের মাপে); দাড়া-ভাঙ্গা চিরুণী একখানি; ছোট আয়না (পারা-ওঠা); ছেঁড়া ঘুড়ি (লাল রঙের বর্ডার দেওয়া); তরল আলতার শিশির একটি ছিপি (আল্‌তায় ছোপানো)।

পল্লীবাসী এক বাদ্‌লা কবির সম্পত্তি। কবি এখন বিবাহ করিয়া চাকরী-বাকরি লইয়া ব্যস্ত। সংসার-পালনের গুঁতায় তিনি কবিতা লেখা ছাড়িয়াছেন, তাই এ সম্পত্তিগুলি ছাড়িয়া দিয়াছেন। যদিও সেকেণ্ডহ্যাণ্ড, তবু এখনো প্রচুর কাজে লাগিবে। জিনিষগুলি পেটেণ্ট করা; পল্লী-কবির হল্‌-মার্কা দেওয়া। কাজে সমঝ্‌দার জন ইহার মূল্য বুঝুন।

৪নং লাট

বিধবা তরুণীর ধারালো আঁখির পল্লব; উদাস দৃষ্টি (দেড় পোয়া); অধীর প্রতীক্ষা (পৌনে তিন গজ); জানলার গরাদে (আধখানা, একটু ফাটা); পুকুরঘাটের মাটী (তিন রতি); হাস্‌না-হানার শুক্‌নো ফুল (পাঁচটি) গাছের ডগা-সমেত; একটি পুরানো সিঁদুর-কৌটা; খয়েরের টীপ (এক ডজন); মৃদু হাসি (তিন ছটাক); বিলোল কটাক্ষ (একটি চোখের মাত্র; অপরটি খোয়া গিয়াছে; হয় তো পাশের বাড়ীর ঘরে খুঁজিলে পাওয়া যায়)।

ছোট-গল্প-লেখকদের অতি-অতি-অতি-প্রয়োজনীয় বস্তু।

৫নং লাট

মেশের ঝিয়ের ভাঙ্গা চুড়ি (পাঁচ সাত টুকরা); কুন্তলীনের শিশির মোড়ক (একটা); পূর্ব্ব-স্মৃতি (চার

ভাঙ্গা বাসন (এক প্রস্থ); চালের ভাঙ্গা
ক ডজন); মেশের ঠাকুরের ছেঁড়া পৈতা
ই); পোড়া সিগারেট (তিন ডজন); বড়
ম্যাশলাইয়ের বাক্স ছুটা; কোণ-স্থাপ টানো
দু'বোতল); পাণের ছোপ (এক গামলা)।
একালের এক গল্পলেখকের সম্পত্তি। যাঁরা
র লিখিতে চান্, তাঁদের পক্ষে মহা-উপযোগী।
লেখকদেরই প্রয়োজন বেশী; কাঁচারা এগুলি
শ বছর ঘরে তুলিয়া রাখিতে পারেন। পরে
গবে। এ জিনিষ ক্ষয়িবার নয়; ever-
'চির-সবুজ' ছাপ-সমেত রেজেষ্ট্রী-করা।

৬নং লাট

চা-পরা পায়ের ছাপ্; খদ্দরের শাড়ী আধখানা
খীন ধরণের); ভেলভেটের স্লিপার (এক
শোল-খোলা'); ভাঙ্গা পিন-ক্রচ (একটি);
খ (আধ ইঞ্চি টাক); পিয়ানোর ছুই রীড;
ার টুকরা; খড়খড়ির ফাটা সিমেণ্ট (এক সের
মোটর গাড়ীর টায়ারের টুকরা দু'পীশ্;
আবেগ (আধ শিশি); ঠোঁটের গোলাপী
আধ রতি); মাথার ভাঙ্গা কাঁটা (তিনটা)।
লে এক সৌখীন ঔপন্যাসিকের সম্পত্তি। মাথা
ওয়ায় তিনি রাঁচি গিয়াছেন। তরুণ কবি,
ক,গল্প-লেখক—সকলের কাজে লাগিবে। এ-লাট
পথের ভিখারী যে, সে-ও চট্ করিয়া সাহিত্য-
ন্না যাইবে।

৭নং লাট

গানের একটু টুকরা; পথের ধুলা; খদ্দরের
ন; কংগ্রেসের মাটী; ভাঙ্গা ব্যাজের টুকরা
পোয়া); ছাপাখানার ভাঙ্গা টাইপ (দেড়
; পুলিশ-কোর্টের প্রাঙ্গণের প্যায়রা গাছের ছাল
টুকরা); লম্বা চুলের পরচুলা (এক টুকরা);
জামার ছেঁড়া পকেট একটা; চাদার খাতার
(এক পীশ্); ভাঙ্গা বোতল (গেলাসের টুকরা
) একটা; হাততালি এককুড়ি।
দেশ-সেবকের অক্ষয় কবচ। নেতাগিরির শনদ-
প্রত্যেক দেশ-সন্তান এগুলি সংগ্রহ করিতে
বন না। মাতৃভূমির দুঃখে কার না প্রাণ কাঁদে
াব তাই বঙ্গবাসী, এই মহা দুর্দ্দিনে এই মহা-কবচ
করিয়া মাতৃভূমির অশ্রু মোচন করিতে
...।

৮নং লাট

নব-অভিধানের অভিযান। মস্ত বই—তারি
কয়েকটা ছেঁড়া পাতা। সাহিত্যিকের বোমা। এমনি
সব অর্থ ইহাতে বুঝানো হইয়াছে :—

প্রেমিক—প্রেম+দিক্‌বিদিক=প্রেমিক।
প্রেম হইলে দিক্‌বিদিকের জ্ঞান নিদ্ যায়; তাই
দিকবিদ্ লোপ পাইয়া বাক্য রচিল, "প্রেমিক"।
অর্থ,—দিক্‌বিদিকে যে প্রেম করিয়া বেড়ায়। দুরন্ত
অর্থে প্রেমাভিলাষীকেও বুঝায়।

মেশ্—যেখানে ঢুকিলে কাহারো কাহারো
মন মেষের মত হয়। পরের জানালায় বা ছাদে ঢুঁ
বা উঁকি দিবার বাসনা জাগে। এ-অর্থ সকলে
গ্রহণ করেন না; এ-অর্থ চলিত আছে শুধু যা-খাওয়া
পাশের বাড়ীর লোকের কাছে।

কবি—কি+কবি?=কবি। অর্থাৎ যা-খুশী,
তাই যে বলিতে পারে। কবি এ-কথার প্রতিধ্বনি
আছে—

কপ=কপ্ চানি। পুরাকালে অর্থ অত্যন্ত
সীমাবদ্ধ ছিল; এখন কালের বিস্তারে অর্থবিস্তার
ঘটিয়াছে। অর্থাৎ কপ্ চানিতে যে সিদ্ধ, সেই কবি!
"কপ্ চানিদক্ষো বিমূঢ়ো লাজহীনো কবিঃ স্মৃতঃ" ইতি
অমরকোষম্।

সাহিত্যিক—সহ+ইত্যিক। ইত্যিক জাতির
যে সাহচর্য্য করে। এই বিশাল অর্থ হইতে যে ইত্যিক
জাতের হাঁড়িতে কাঠি দেয়, তাহাকেই সাহিত্যিক
বলা চলে।

গবেষণা—অর্থাৎ গো+এষণা; গোরুর
মত সর্ব্ব-বিষয়ে যে দৃষ্টি দেয় অর্থাৎ গোরুর মত বুদ্ধি
লইয়া সবিস্তারে সর্ব্ববিষয়ে যে নিলাজ আলোচনা—
তাহাই গবেষণা; মানুষের বুদ্ধি বা ধারণায় যাহা
গ্রাহ্য নয়। এই কারণেই মাসিক-পত্রে গবেষণামূলক
প্রবন্ধ ছাপা হয়, পাঠক-পাঠিকাদের বুদ্ধি মানুষের
মত কি গোরুর মত, তাহাই পরখ করিবার জন্য।

উপন্যাস—'উপ' কথাটা চিরদিনই গর্হিত
গলি-ঘুঁজিতে ঘোরে—কাজে কাজেই 'উপ'র মত
গর্হিত পথে যার ন্যাস, কি না বিন্যাস—তাহাই
উপন্যাস। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে হালেই শুধু
বঙ্গদেশে উপন্যাস দেখা দিয়াছে; নহিলে বঙ্কিম যাহা
লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা উপন্যাস নয়।
ইত্যাদি, ইত্যাদি......

৯নং লাট

ছেঁড়া টিকি; শামুকের ভাঙ্গা খোল; নস্যের ভাঙ্গা বোতল; ভুঁড়ির চর্ব্বি (আট সের); ভাঙ্গা সংস্কৃত টাইপ 'ং' ও 'ঃ' (আধ মণ); বায়োস্কোপের ক'খানা হ্যাণ্ডবিল; বাঙলা থিয়েটারের ছেঁড়া প্রোগ্রাম; হাফ-শোল্ মারা চটি এক পাটি (ওজনে দেড় মণ); রক্তবর্ণ চক্ষু; অগ্নিময় দৃষ্টি (এক-গাড়ী-ভোর); গোঁড়ামি (দু' মণ)।

শাস্ত্রী পরীক্ষা দিবার জন্ত যাঁরা উদ্যোগী ও সনাতন ধর্ম্মকামীদিগের অত্যাবশ্যক। ব্যবহারে ক্ষয় পায় নাই। আদি, অকৃত্রিম, মান্ধাতার আমোল হইতে এমনি অটুট, অফাট্, এমনি বিশস্তর আকারের।

১০নং লাট

ছেঁড়া টাই (চুনা-গলি-মার্কা); এক পাটি গোড়ালি ছেঁড়া মোজা; চাঁদনির তৈরী স্যুটের বোতাম সাতটা; বুটের একজোড়া হীল; পোড়া চুরুট আধখানা; থক্ থক্ কাসি (সাত ভরি); বেহায়াপনা (ষোল পোয়া); পাওনাদারের রক্ষা (বিরাশি শিক্কা ওজন); ভাঙ্গা প্লেট (তিন খানা); ফাঁকির ফন্দী (তিন পোয়া সাড়ে তিন ছটাক; খাঁটী পাক্কি ওজন); বে-চাল (এক মণ); কেস্‌মেট্রিকের খালি টিউব একটা; কেল্‌নারের ক্যাটালগের মলাট (বোতলের ছবি-সমেত)।

আরিষ্টোক্রাট বানাইতে এমন অমূল্য চীজ আর কোথাও পাইবেন না। মালিক্ হঠাৎ গড়ের মাঠে দম্ ফাটিয়া বেদম্ হওয়ায় মালগুলি বেওয়ারীশ অবস্থায় পড়িয়া আছে। ব্রশে একটু ঝাড়িয়া মুছিয়া লইলেই একেবারে ফার্ষ্ট ক্লাশ বনিয়া উঠিবে।

১১নং লাট

আড়চোখের চাউনি (আধ পোয়া); ছেঁড়া নামাবলী আধখানা; দেড় হাত টিকি (ডগায় গেরো বাঁধা); এক রাশ ভাঙ্গা শ্লোক ইংরাজি বুকনি-মিশেল; গেরুয়া মাটী (সিকি ভরি); চাক্কু ছুরি একখানি (গাঁট কাটিতে কাজে লাগে); পাহাড়-প্রমাণ লোভ।

গুরুগিরিতে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বানাইয়া দিবে। এই সঙ্গে একখানি নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতির মলাট উপহার দেওয়া হইবে।

১২নং লাট

মোষের সিংয়ের ছড়ির ভাঙ্গা হ্যাণ্ডেল একটি; পোড়া সিগারেট একটি; কাঁচি ধুতির পাড় আধ গজ; গিলের টুকরা; গিলেটের ভাঙ্গা ব্লেড একখানি; রামবাগানের মাটী (চার ড্যালা); পট্‌কা বাইয়ের বাড়ীর ঝাঁটার কাঠি দু' গাছি; এক কৌটা মরা আরশোলা; সিঁড়ির দেওয়ালের চটা বালি (এক পুরিয়া); ঢুলু ঢুলু আঁখির দৃষ্টি (এক ঝলক); দেঁতো হাসি (দেড় ছটাক); নাথুর দোকানের পাণের থিলির শুকনো কলাপাতা (আধ ফালি); ছোট আদালতের বেলিফের রুদ্রমূর্ত্তির বিভীষিকা (১২'×৮"); পকেটের বকেয়া সেলাই (দেড় হাত); ছুঁচার কীর্ত্তনের স্বরলিপির ছেঁড়া পাতা; কোঁচার পত্তন (এক ইঞ্চি); কাবলীওয়ালার হুহুঙ্কার (সাত পোয়া)।

বিলাসী সৌখীন বাবু বনিতে যদি চান, অবিলম্বে এই লাট সংগ্রহ করুন। কুলে ধ্বজা উড়িবে, দু'শে মজা মিলিবে।

১৩নং লাট

ডিক্সনারীর ছেঁড়া পাতা (আট খানা); পুরোনো খপরের কাগজ এক বাণ্ডিল; গণ্ডারের চামড়া (এক রত্তি); কাণের তুলা (দু' প্যাকেট); ভাঙ্গা নি[illegible] (আধ ডজন); আস্ত একটি কাটা কাণ; খালি পকে[illegible] (একটি ছেঁড়া); বকেয়া বুলি (দু' রীল); বোকামি[illegible] গাম্ভীর্য্য (এক পেয়ালা); টিকি-আঁটা টাক্ (এক রত্তি); মোটা লাঠি (মাথা ভাঙ্গা)।

শ্মশান-গত এক সুবিখ্যাত সম্পাদকের সম্পত্তি।

যাঁরা সম্পাদকীয় গদির প্রত্যাশী, এ লাট সংগ্রহে যেন তাঁরা বিলম্ব না করেন। বিলম্বে হতাশ হইবেন।

১৪নং লাট

স্বার্থ (ষোল আনা); ভণ্ডামি (তিন কাহন) বুজরুকি (সাত পোয়া); গলাবাজি (এক কলসী) চৌখস মুখোস (ছেঁড়া আধ টুকরা); কার্ডবোর্ডে আঁ[illegible] সেই অমূল্য বাণী,—১। 'সকলে পয়সা [illegible] ত্যাগ করে আমার উদরে সে বিষ ঢালিয়া দাও, আমি সে বিষে[illegible] জ্বালায় পেটটাকে জ্বালায় পরিণত করিয়া পড়িয়া থাকি[illegible] অচিরে দেশ উদ্ধার পাইবে।' ২। 'আমায় কাঁধে তুলিয়া নৃত্য করো—দেশ-মাতা ত্রিশ হাত উপরে উঠি[illegible] তৃপ্ত হইবেন।' নামজাদা দেশ-হিতৈষীর সম্পত্তি।

সম্প্রতি ইনি মোটা মাহিনার চাকরী পাইয়াছেন তাই অপ্রয়োজনে বিতরণের জন্ত আমাদের হাতে দিয়াছেন।

১৫নং লাট

৩৭৩ কাপি হালের ঘাল-করা মাসিক পত্র—

হালুম্

প্রথম ও শেষ অর্থাৎ একম্ ও অদ্বিতীয়ম্ সংখ্যা এই এক সংখ্যা হালুমের হুঙ্কারে সমাজ ও সাহিত্য গুম্-খুম্! এই সংখ্যায় সেই বিশ্বতোলপাড়কারী রচনা গুলি আছে। কতকগুলি পাতা উইয়ে খাওয়া।

শ্রীবুদ্ধিমন্ত জাশু রচিত "ভ্যাবাকান্তর
। ভ্যাবাকান্ত উপন্যাস পড়িয়া বুঝিয়াছিল,
। নাম প্রাণ-বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা। তাই
ায়োস্কোপ দেখিয়া পথে বাহির হইয়া মোটরে
ক প্রথম দর্শনেই ভালোবাসিল, এবং যেমন
ভালোবাসিয়াছে, অমনি ছুটিয়া কয়লার
কিয়া লোহার হাতুড়ি মাথায় ঠুকিয়া প্রাণ
য়া প্রমাণ করিল, ভালোবাসা কি বস্তু!
সেই ঘাড়-ভাঙ্গা কবিতা—গোডিম্ সেন

। গেঞ্জির সুতা ফুঁড়ে ছুটলো
বুকের দীর্ঘশ্বাস,
পুড়ে মলো তাতে গড়ের মাঠের
হাজা শুকো তাজা ঘাস।"

বিতা ছাপা হইবামাত্র বিশ্ব-কবি সভয়ে নিজের
ন হোল্ড-অলে পুরিয়া আমেরিকায় পলাইতে
য়াছিলেন।

) সুবিখ্যাত প্রফেশর শ্রীদুবচটী ডুয়োপাধ্যায়-
"বাঙলা সঙ্গীতে পেঁয়াজ"। এ শুধু চোখ বুজিয়া
বস্তু—চোখ খুলিলেই জ্বালায় চোখ কর্‌কর্‌

) শ্রীনিশ্চিন্তকুমারের ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাস
র"। স্রেফ প্রেমের সুরে গা ভাসাইয়া মাণিক্য-
করিয়া বুড়ী গঙ্গা পার হইয়া কলিকাতায় আসিয়া
ালীর দাই-ঝী লখিয়ার নজরে পড়িল—তারি
র ইঙ্গিত। ক্রমশঃই এর রস এমন বাড়িবে যে,
ঘোষ, ভীম নাগ, ইন্দু দে প্রভৃতি এখন হইতেই
গ্রস্ত হইয়া রসের ভিয়ান বন্ধ করিয়াছেন।

(ঙ) সম্পাদকের সেই জিভ্‌ছানি টিপ্পনী! সমাজ, শ্মশান, ভাগাড়; সাহিত্য, ছাইত্ব, গাইত্ব; দেশ, কেশ, মেষ; নারী, কারী, বারী (বাড়ী); গান, জান, মান; সুর, ক্ষুর, মুর;—এই সব বিষয়ের ঝন্‌ঝনে খন্‌খনে গন্‌গনে আলোচনা। এই এক সংখ্যা পড়িলেই দুনিয়ার সকল ব্যাপারে হুঙ্কার ছাড়িতে পারিবেন।

১৬নং লাট

৯২টি কোটেশন (এলোমেলো টুকরা); পাঞ্জির ষোলখানা ছেঁড়া পাতা (নানা বৎসরের); বর্জ্জয়েস অক্ষর ইংরাজী-বাঙলা মিশেল (বত্রিশ সের); বিশুদ্ধ গোময় (ঘুঁটে ভাঙ্গা, গবেষণার গব্যমাথা); ভাঙ্গা তালা ছুটি (পরের কাণে চমৎকার লাগানো যায়); একটি ভোঁতা কলম; মশলা-বাঁধা কাগজ (এক দিস্তা); গাঁজার ধোঁয়া (এক ঠোঙা)।

যাঁরা গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া মাসিকের কেল্লা ফতে করিতে চান, এমন গুলি-বারুদ তাঁরা আর কোথাও পাইবেন না।

ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অধিকেনালম্। কাগজওয়ালারা পূজার বাজারে মুখাইয়া আছে। বিজ্ঞাপনের চার্জ্জেই সব লাট শেষে তাদের জিম্মায় না ছাড়িয়া দিতে হয়! অতএব—

যাঁহারা বিস্তারিত সংবাদ জানিতে চাহেন, তাঁহারা আমাদের অফিসে আসিয়া সংবাদ লউন।

দি গ্রেট সাপ্লায়ার্শ,
বক্স নম্বর ওয়ান্
C/o জয়-জগদম্বা।

মৃণাল

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

পূজনীয়া দিদি

৺স্বরূপা দেবী

স্মৃতিকল্পে

দিদি

এ বইখানি যখন ছাপিতে দিই, তখন তুমি রোগশয্যায়। এ বইখানি দেখিবার জন্ম তোমার কি সে আগ্রহ ছিল!

আজ এ বই ছাপা হইল, কিন্তু কোথায় তুমি!

স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে, এ কথা আমি বিশ্বাস করি। তাই এ মৃণালের ডোরে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যকে বাঁধিতে চাহিতেছি! তোমার প্রসন্ন দৃষ্টি আমার এ সাধ সফল করিবে, নিশ্চয়।

১৭ মোহনবাগান রো
কলিকাতা, ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৩২৯

স্নেহানুগত
সৌরীন্দ্র

মৃণাল

দোতলার ঘরে আলো জলিতেছিল। ঘরের জানলা না। অন্ধকার পথে দাঁড়াইয়া এক নারী সেই খোলা নলার পানে চাহিয়া আছে। পথে জন-মানবের চিহ্ন ই। নিশুতি রাত্রি। শুধু অদূরে থাকিয়া থাকিয়া -একটা কুকুর ডাকিয়া উঠিতেছে।

চারিধারে অন্ধকার আরও ঘনাইয়া আসিল। যেন নেপথ্যে বসিয়া সারা বিশ্ব-প্রকৃতির বুকে-পিঠে পা কালির উপর মোটা তুলি দিয়া আরও নিবিড় রিয়া কালি লাগাইতেছে। শুধু সেই বাড়ীর কাছে ড় তেঁতুল গাছটার ডাল-পালার উপর ঘরের আলো াসিয়া পড়িয়াছে। মনে হইতেছে, কে যেন এই াঁধার-কালো বিশ্বের ছোট এক কোণে খানিকটা আবীর ালিয়া দিয়াছে!

এক অব্যক্ত বেদনায় নারীর বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। তঙ্গ যেমন আগুন দেখিয়া ছোটে, ঘরের ঐ অস্পষ্ট আলোটুকুর পানে নারীর সারা চিত্ত তেমনই আকুল আগ্রহে ছুটিতেছিল। প্রাণ পুড়িয়া যায়, তবু এ ছোটা কিছুতে রোধ করা যায় না!

নারীর ছিন্ন মলিন বেশ, শুষ্ক কেশে জটা ধরিয়াছে, মুখে-চোখে কালির দীর্ঘ রেখা!

আহা, ঐ আলো-করা ঘরখানি! আলোর পানে চাহিয়া চাহিয়া, নারী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল! বুকটা তাহাতে কতক যেন হাল্কা বোধ হইল। নারী ভাবিল, হায় ঐ ঘর, অমনি আলো-করা ছোট ঘর,—ও ঘরে সে সর্ব্বময়ী ছিল! ও ঘরের মর্য্যাদা না বুঝিয়া সে তাহা হেলায় হারাইয়াছে!

কিন্তু আদরে-গৌরবে পরিপূর্ণ ঐ ঘর কিসের লোভে সে ত্যাগ করিয়া আসিল! আলেয়ার আলোয় মজিয়া বিপথে পড়িয়া সর্ব্বস্ব আজ সে খোয়াইয়া বসিয়াছে! এখন আর তাহা ফিরিয়া পাইবার এতটুকু আশা নাই। কঠিন উপেক্ষার বাণে আজ সে বিদ্ধ জর্জ্জরিত। মোহ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে! শুধু কি তাই? সারা জীবনের উপর দিয়া কি প্রচণ্ড ঝড়ই বহিয়া গিয়াছে! ঝড়ের শেষে আশ্রয়-চ্যুতা পাখীর মত সে আজ নীড়-হারা! এত বড় পৃথিবী—তবু আজ তার দাঁড়াইবার কোথাও এতটুকু ঠাঁই নাই!

অতীতের কথা বিরজার মনে পড়িল। এমনই আলো-করা ঘরে বিবাহের পর ফুলশয্যা হইয়াছিল। আজ কি দিলে সেই অতীত দিন, মুহূর্ত্ত ফিরিয়া আসে! মদের নেশার মতই অতীত স্মৃতির নেশায় মাথা তার ঝিম্-ঝিম্ করিতে লাগিল। কিন্তু হায়রে, সে দিন আর ফিরিবার নয়!

সেই ঘরের পানে চাহিয়াই বিরজার সারা রাত্রি কাটিয়া গেল! তার কোন জ্ঞান ছিল না। ভোরের পাখী গাহিয়া উঠিতে চমক ভাঙ্গিল। দিনের আলো! কি এক ভয়ে বুক দুর-দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সেখানে তার আর দাঁড়াইয়া থাকিবারও সাহস হইল না। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে,—কে তুই? এখানে কেন? যদি তাড়াইয়া দেয়? ধীরে ধীরে সে দূরে সরিয়া গেল; কিন্তু বেশী-দূর যাইতে পারিল না। মন্ত্র-স্পৃষ্ট সর্পের মত সে সেই গৃহের-আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইল।

ক্রমে বেলা দশটা বাজিয়া গেল। তিনটি ছেলে গৃহ হইতে পথে বাহির হইল। পিছনে ভৃত্য—ভৃত্যের হাতে বইয়ের গোছা! ছেলেরা স্কুলে চলিয়াছে—বিরজা ছেলেদের পিছনে চলিল। তিনটী ছেলে! ওদের মধ্যে যেটি বড়, তার মুখখানি—হাঁ, কোনো ভুল নাই! ও-মুখে সেই মুখখানি কে যেন বসাইয়া রাখিয়াছে! এই মুখের ছায়া স্বপ্নে কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে! ভালো করিয়া দেখিবারও সুযোগ দেয় নাই!

বিরজার ইচ্ছা হইতেছিল, ছুটিয়া গিয়া ঐ ছেলেটিকে একবার সে বুকে তুলিয়া লয়, বুকে চাপিয়া ধরে—কোমল মুখখানি স্নেহের অমৃত-ধারায় অভিষিক্ত করিয়া তোলে! তাহার ক্ষুব্ধ অন্তরের পাষাণ-স্তূপ ভেদ করিয়া আজ যেন সহসা স্নেহের নির্ঝর উথলিয়া উঠিয়াছে! সে বিমল স্নিগ্ধ ধারায় বিরজার প্রাণ জুড়াইয়া গেল।

ছেলেরা স্কুলে ঢুকিল; বিরজা ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। যদি আর একবার দেখা মেলে! ঢং ঢং করিয়া সাড়ে দশটার ঘণ্টা বাজিয়া গেল। স্কুল বসিল। সমস্ত স্কুল-গৃহের বুক চিরিয়া একটা সুমধুর গুঞ্জন-ধ্বনি জাগিয়া উঠিল—কর্ম্ম-রত মধুকরের গুঞ্জনের মতই তা জীবন্ত, সঙ্গীতময়! ছেলেরা পড়া করিতেছে, পড়া বলিতেছে। বিরজা উন্মাদের মত স্কুলের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল!

ক্রমে এগারোটা, সাড়ে এগারোটা, বারোটা বাজিয়া-বাজিয়া দেড়টার সময় টিফিনের ছুটি হইল। ছেলের দল উল্লাসে মাতিয়া স্কুলের বহিঃ-প্রাঙ্গণে ছুটিয়া বাহির হইল।

যেন খাঁচা হইতে পাখীর দল ছাড়া পাইয়াছে! তেমনই তাহাদের হর্ষোল্লাস! মার্বেল, কপাটি ও লুকোচুরি খেলার ধূম বাধিয়া গেল। এত ছেলে—কিন্তু সেটি কৈ? কোথায় সে? সে কি খেলিতে আসিবে না? তাহাকে দেখিবার জন্ত বিরজার প্রাণ যে আকুল হইয়া রহিয়াছে!

ঐ না—ছুটিয়া-ছুটিয়া একবার বাহিরে আসিতেছে, আবার ছুটিয়া ভিতরে পলাইতেছে? পিছনে ছেলের দল ছুটিয়া চলিয়াছে! সকলে লুকোচুরি খেলিতেছে। ঐ আবার বাহিরে আসিয়াছে। ও কি? দুটো ছেলে উহাকে ধরিয়া উহার মাথায় চড় মারিতেছে—ছেলে মাথা গুঁজিয়া হাসিয়া সে-মার খাইতেছে! ওরে দস্যু, ওরে কঠিন, দে, দে, ছাড়িয়া দে—আহা, কেন মারিতেছিস্ রে! তোদের ও-খেলার প্রহারে এখানে বিরজার বুকে যে মুগুরের ঘা পড়ে! আহা ছাখ, ছাখ, বাছার মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিয়াছে!

স্কুলের ছুটির পর ছেলেরা বাড়ীর পথে ফিরিল; বিরজাও পিছনে চলিল। এ কি আকর্ষণ! এ আকর্ষণের প্রভাব এত দিন বিরজা কেন বোঝে নাই? ছেলে! সে যে কি বস্তু, বিরজা পূর্ব্বে তা বোঝে নাই,—আজ বুঝিয়াছে বলিয়াই এটিকে সারাক্ষণ চোখে-চোখে রাখিবার জন্ত আজ তার এত আকুলতা, এত আগ্রহ!

এমনই ভাবে ছেলের পিছনে, বাড়ীর আশে-পাশে ঘুরিয়া বিরজার দুই দিন দুই রাত্রি যে কোথা দিয়া কাটিয়া গেল, তাহা সে জানিতেও পারিল না! সেদিনও সকালে পথে দাঁড়াইয়া বিরজা জানলার ফাঁক দিয়া নীচেকার ঘরের মধ্যে আপনার লুব্ধ নয়নের আকুল দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছিল। ছেলেরা মাষ্টার মহাশয়ের কাছে বসিয়া পড়িতেছে, আব্দার ধরিতেছে, দুষ্টামি করিতেছে,—বিরজা তাহাই দেখিতেছিল! হায়, এমন স্বর্গ, এমন সুখ, এ তো তারও অনায়াস-লব্ধ ছিল, নিজের দোষে ধূলার মত সে তাহা তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া আসিয়াছে। আজ শত চেষ্টায়, সহস্র সাধনায় এ স্বর্গের একটি কোণেও আর তার দাঁড়াইবার অধিকার নাই!

হঠাৎ একটা কঠিন কণ্ঠ-স্বরে তার চমক ভাঙ্গিল,—কে? বিরজা চোখ ফিরাইয়া দেখে, গৃহ-দ্বারে ও,—কে ও! ভয়ার্ত্ত শিশুর মত সে দূরে পলাইয়া গেল—সেখানে দাঁড়াইয়া সে-মুখের পানে তাকাইবারও সামর্থ্য হইল না।

তবু এ বাড়ীর মায়া, দেখিবার বাসনা কিছুতে মিটিবার নয়! দৈত্যের মায়া-পুরীর মত এই বাড়ীখানা বিরজার পায়ে এক দুশ্ছেদ্য নিগড় আঁটিয়া দিয়াছে। এক-একবার দারুণ ক্ষোভে যখন দূরে পলাইবার বাসনা হয়, দূরে পলাইবার চেষ্টাও সে করে, তখন এই বাড়ী-খানাই আবার সেই অদৃশ্য সুদৃঢ় নিগড় ধরিয়া টানিয়া বিরজাকে ফিরাইয়া আনে। বিরজা কাঁদিয়া ফেলিল সে কি পাগল হইবে?

কিন্তু পাগল হইলে সে বাঁচিয়া যায়! অতী[illegible] স্মৃতিগুলা সাপের মত ফণা তুলিয়া তার অন্তরে অন্ত[illegible] দংশন করিতেছে, তীব্র বিষ ঢালিয়া দিতেছে! সে জ্বা[illegible] আর সহ্য হয় না! সহ্য করিবার শক্তি নাই, ধৈর্য্য নাই!

পরদিন বাড়ীর দাসী গিয়াছিল দোকানে খাবা[র] আনিতে—বিরজা আসিয়া তার শরণ লইল। মিষ্ট কথা[য়] তার মন ভুলাইয়া সে খবর পাইল, বাবুর দুই সংসা[র] একটি ছেলে রাখিয়া প্রথমা মা[illegible] গিয়াছে—পাঁচ জনে[র] অনুরোধে বাবু দ্বিতীয়বার [illegible] করেন। এ-পক্ষে[র] দুই ছেলে, এক মেয়ে। [illegible] বড় ভালো। সতীন-পোর উপর যেমন টান, [illegible] ভালোবাসা! বাহিরে[র] লোক দেখিলে কে বলিবে, [স]তীন-পো! ভালো জাম[া] ভালো কাপড় সবই তার [illegible] নিজের ছেলেরা আব্দা[র] ধরিলে মা উত্তর দেয়,—ও [illegible] মা তো কে পাবে রে[?] ও যে সব্বার বড়, তোরা ছো[ট] [illegible] আর ছেলেও তেমন[ি] মা বলিতে অজ্ঞান! এমন এক [illegible] ছেলে, পৃথিবীতে যা[র] কাকেও মানে! কিন্তু মার কা[ছে] একেবারে জড়-সড়[!] বাবুও সুশীল-অন্ত প্রাণ! দাসী [illegible]রও বলিল, এ-স[ব] কথা পাড়ার লোকের মুখে সে [illegible]য়াছে। বাড়ীতে 'সতীন-পো' কথাটি কি কাহারো মু[খে] উচ্চারণ করিবা[র] জো আছে! তাহা হইলে আর রক্ষা [না]ই। বৌঠাকরুণে[র] অমন মায়ার শরীর, তখন কোথায় [illegible]ক সে মায়া!

বিরজা মন দিয়া একটি-এক[টি] করিয়া সব কথা শুনিল; শুনিয়া শুধু ছোট একটি [নিশ্ব]াস ফেলিল। দাসী বিস্ময়ে তাহার পানে চাহিল,—ও মা, তোমার চোখে জ[ল] দেখচি যে!

বিরজা আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—[illegible] ভাই, চোখে কি একটা পড়লো! বলিয়াই সে দ্রুত [illegible] স্থান ত্যাগ করিল। দাসী গালে হাত দিয়া অবাক্ হই[য়া] দাঁড়াইয়া রহিল। দোকানী কহিল,—ও একটা পাগলী আজ ক'দিন থেকে দেখচি, এ পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অপরাহ্নে স্কুলের ছুটির পর সুশীল বাড়ী ফিরিতেছিল[;] সঙ্গে ছিল ছোট ভাই দুটি ও কয়েকজন সঙ্গী। বির[জা] অদূরে থাকিয়া তাহাদের অনুসরণ করিতেছিল[।] সুশীল এ কয়দিন এটুকু লক্ষ্য করিয়াছে যে, এ[ই] উন্মাদিনী নারী তাহাদের পিছনে ঘুরিয়া বেড়ায়—বাড়ী[র] দ্বারেও সর্ব্বদা তাহাকে দেখা যায়! ইহার জ[ন্ত] প্রাণে সে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। রা[গ] হয় নাই, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু তাহ[াকে] তাড়াইতেও সাহস হয় না! কি জানি, একে পাগ[ল]

চরিয়া হাতখানা যদি ধরিয়া ফেলে! গাল দেয়! ধরিয়া ফেলিলে পরিষ্কার জামাটা নষ্ট হইয়া বে, তার উপর পথের মধ্যে লোকের কাছেও ভারী দস্থ হইতে হইবে! সে ভারী লজ্জার কথা!

আজ এই এতগুলা সঙ্গী নিকটে থাকিতে তার সাহসের ভাব হইল না। চলিবার সময় বিরজার পানে অলক্ষ্যে চাহিতে ভোলে নাই। তবু কি আপদ! পাগলীটা চ্ছুতে তার সঙ্গ-ছাড়া হয় না! আবার নজর তার শীলের পানেই! জ্বালাতন! সুশীল একজন সঙ্গীর াণে কাণে কহিল,—ত্যাখ্ ভাই, একটা পাগলী!

কথাটা বিরজার শ্রুতি এড়াইল না।

সঙ্গী বালক কহিল,—হ্যাঁ রে! ঢিল মারবো?

সুশীল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—না, না, ঢিল ারে না—তার চেয়ে এক মজা করি, ত্যাখ্।

সঙ্গী কহিল,—কি মজা?

সুশীল পকেট হইতে লজেঞ্জেস বাহির করিয়া মুখে পূরিল; খানিকক্ষণ সেটা চুষিয়া বিরজার পানে ছুড়িয়া কহিল,—এই নে পাগ্লী, লবঞ্চুস্ খা। সঙ্গীর দল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

লজেঞ্জেসটা বিরজার গায়ে লাগিয়া পথে পড়িল। তার মনে হইল, আকাশের বাজ বুকে পড়িলেও বুঝি তার এমন বাজিত না! এই ছেলে—যাকে বুকে তুলিয়া লইবার জন্য প্রাণ তার ছটফট করিতেছে, সে এমন বিদ্রূপ করিল! কৈ, পাষাণ বুক তবু ভাঙ্গিল না তো! বিরজার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। কিন্তু উপায় নাই! এ বিষ যে তারই মন্থন-করা! যে পাপ সে করিয়াছে—এ তার উপযুক্ত ফল! উচিত শাস্তি! চোখের জল সামলাইয়া সে সেই লজেঞ্জেসটুকু বুকে চাপিয়া, তাহাতে চুমা দিয়া অন্তরে প্রথম আজ যে-শান্তি অনুভব করিল, তাহা অপূর্ব্ব! মাণিকের টুকরার মত সযত্নে সে সেই লজেঞ্জেসটুকু আপনার অঞ্চলে বাঁধিল।

পরদিন। সুশীল তখন স্কুলে গিয়াছে, অভয় বাড়ী নাই, বিরজা সাহসে ভর করিয়া অন্দরে ঢুকিল। ভৃত্য তাড়া দিয়া উঠিল,—সে তা গ্রাহ্য করিল না; একেবারে ছুটিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। মৃণাল তখন শিশু-কন্যার দুধের বাটি হাতে লইয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিতেছিল। খাওয়া-দাওয়া চুকিয়া গিয়াছে। হঠাৎ এক অপরিচিতা জীর্ণ-মলিন-বেশা শীর্ণা নারীকে একেবারে উপরে দাঁড়াইতে দেখিয়া প্রথমটা সে চমকিয়া উঠিল। কিন্তু বিরজার মুখে বিষাদের নিবিড় ছায়া, দুই চোখের কোণে সুগভীর কালির রেখা দেখিয়া মায়া হইল! মিষ্ট স্বরে সে কহিল,—তুমি কে গা?

বিরজার মুখে চট্ করিয়া কোন কথা যোগাইল না। মনের মধ্যে একটা ঝড় উঠিয়াছিল। এমন ঘর, এমন বারান্দা—এমন সব—তার কিসের অভাব ছিল! ভিখারীর বেশে আজ এখানে আসিয়া সে দাঁড়াইয়াছে! এখানকার কিছুতে তার অধিকার নাই—এখানে আসিয়া দাঁড়াইতে গেলে পরিচয় দিতে হয়।

মৃণাল কহিল,—তুমি কি চাও,—বলো না?

কি চাই? বিরজার মনে হইল, সে বলে,—ওগো, কিছু নয়, কিছু চাই না—শুধু তোমার এই বাড়ীর কোণে একটু ঠাঁই দাও। তোমাদের উচ্ছিষ্ট উঠাইব, বাসন মাজিব, তোমাদের চরণ-সেবা করিব, দিনান্তে একটিবার শুধু তোমাদের ঐ ছেলেটিকে কোলে লইতে দিয়ো। কিন্তু না, সে কথা বলা চলে না—ভালো দেখায় না! এ যে পাগলের কথা! সে তো পাগল নয়! তার মুখে কোন কথা ফুটিল না।

মৃণালের মনে হইল, বুঝি সে ভড়কাইয়া গিয়াছে। তাই আবার কহিল,—ভয় কি! বলো কি চাও? কিছু খাবে?

বিরজা ভাবিল, এত গুণ না থাকিলে আর আজ এমন গৃহে লক্ষ্মী তুমি! বিরজা কহিল,—আমি—আমি—

মৃণাল কহিল,—হ্যাঁ, কিছু খাবে?

—না, না, খাওয়া নয়, খাওয়া নয়—বলো, আমার কথা রাখবে? বলিয়াই সে মৃণালের পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল। দুধের বাটি রাখিয়া মৃণাল সস্নেহে তার দুই হাত ধরিয়া তাহাকে উঠাইল, কহিল,—ছি, পায়ে হাত দিতে নেই। ওঠো—কি চাও, বলো? যদি রাখবার হয়, কেন তোমার কথা রাখবো না বোন্?

বিরজার চোখে জল দেখা দিল। সে কহিল,—আমি বড় অভাগিনী, বোন্। রাজার মত স্বামী, চাঁদের মত ছেলে, অগাধ ঐশ্বর্য্য, আমার সব ছিল,—কিন্তু আজ কিছু নেই। পোড়াকপালী আমি, সে-সব খুইয়েচি···

করুণ সমবেদনায় মৃণালের অন্তর ভরিয়া উঠিল, মন ভিজিয়া গেল। একখানা মাদুর বিছাইয়া সে কহিল,—বসো ভাই—বসে বসে বলো।

বিরজা বসিল, ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে কহিল,—তোমার ঐ ছেলে,—বড়টি—তার মত ছেলে! হুবহু তার মত! তাই—তাই—

মৃণাল কহিল,—তাই কি? বলো।

বিরজা কহিল,—ওকে ক'দিন দেখে অবধি কোথাও আর আমি নড়তে পাচ্ছি না। বুকের মধ্যে সর্ব্বদাই যেন আগুন জ্বলচে! এ যে কি জ্বালা, বোন্, তা কি বলবো।

মৃণালের চোখ জলে ভরিয়া উঠিল—মধ্যাহ্নের প্রখর আলো তার চোখে ঝাপসা বোধ হইল। মুখ হইতে অস্ফুট করুণ স্বর ফুটিল,—আহা!

বিরজা কহিল,—তবু যাবো,—আমায় যেতেই হবে। কিন্তু যাবার আগে একবার বড় সাধ হচ্ছে, তোমার ঐ ছেলেটিকে বুকে তুলে নি—বুকে চেপে ধরি—ও চাঁদ-মুখে দুটি চুমু খাই। তাহলে এ-জ্বালা জুড়োয়—কতক জুড়োয়!

মৃণাল কহিল,—তার আর কি! তবে এখন তো ছেলে বাড়ী নেই, স্কুলে গেছে। ফিরুক। তুমি বিকেলে এসো।

বিরজা কহিল,—কিন্তু তোমার স্বামী যদি আমায় দেখলে বকেন? বাড়ীতে ঢুকতে না দেন?

মৃণাল কহিল,—তাঁকে আমি কিছু বলবো না। তুমি এসো।

কৃতজ্ঞতায় বিরজার প্রাণ পূর্ণ হইল। চোখের জল মুছিয়া আবার সে মৃণালের পায়ে হাত দিল। মৃণাল শশব্যস্তে হাত সরাইয়া দিয়া কহিল,—ও কি! ছি, ছি, পায়ে হাত দিচ্ছ কেন ভাই?

—তাতে কোন দোষ নেই, দিদি। তুমি সতী-লক্ষ্মী, দেবতা! বেশী আর কি বলবো, দিদি,—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি চিরসুখী হও!

সুশীলের সেদিন স্কুল হইতে ফিরিতে দেরী হইল। যে-ভৃত্য আনিতে গিয়াছিল, সে আসিয়া সংবাদ দিল, ছুটির পর স্কুলে ম্যাজিক হইবে। মাষ্টারবাবু বলিয়া দিলেন, খোকাবাবুরা ম্যাজিক দেখিয়া তাঁর সঙ্গে গৃহে ফিরিবে।

যথাসময়ে বিরজা আসিয়া মৃণালকে কহিল,—কৈ দিদি, ছেলে তো ফেরেনি এখনো! আমি স্কুলের ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলুম, বেরুতে দেখলুম না ত!

মৃণাল তখন ম্যাজিকের কথা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া বিরজা বলিল,—তা হলে আবার আমি আসবো! এখন যাই!

মৃণাল কহিল,—কেন, বসো না! ওপরে আমার ঘরে ততক্ষণ বসবে চলো!

বিরজা জিভ কাটিয়া বলিল,—তোমার ঘরে কি আমি ঢুকতে পারি দিদি? ও যে লক্ষ্মীর ঘর! আমার বাতাস ও-ঘরে লাগা ঠিক নয়!

মৃণালের অজ্ঞাতে তার ক্ষুব্ধ অন্তর মথিত করিয়া ছোট একটি নিশ্বাস সন্ধ্যার বাতাসে মিলাইয়া গেল। মৃণাল ভাবিল, আহা উন্মাদিনী, অভাগিনী!

মস্ মস্ করিয়া অভয় আসিয়া উপরে উঠিয়া গেল। মৃণালের ডাক পড়িল। মৃণাল স্বামীর কাছে গেল। স্বামী বলিল,—কার সঙ্গে অন্ধকারে বসে কথা কইছিলে?

—আহা, ও একটি মেয়েমানুষ—ছেলের শোকে, স্বামীর শোকে মাথা ওর কেমন হয়ে গেছে!

—তা এখানে কেন? কিছু চায়, দিয়ে বিদেয় করে এসো।

—ও একবার শুধু সুশীলকে দেখতে চায়! আহা, ওর যে ছেলেটি ছিল, সে না কি আমাদের সুশীলের মত দেখতে!

অভয়ের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে কহিল,—না, না, ও সব আবদার রাখে না! কোথাকার কে মাগী—অভয়ের স্বর শেষের দিকটায় চড়িয়া উঠিল!

মৃণাল বাধা দিয়া কহিল,—আহা, অমন কথা বলো না গো,—আজই না হয় ও এমন হয়েচে, তবু ওর মায়ের প্রাণ!

মৃণাল কোন কথা না বলিয়া নীচে নামিয়া আসিল। আসিয়া দেখে, বিরজা নাই, চলিয়া গিয়াছে।

পরদিন সকালে স্নান সারিয়া গরদ পরিয়া মৃণাল পূজায় বসিতে যাইবে, এমন সময় [illegible] ভীত কণ্ঠে কে ডাকিল,—দিদি!

মৃণাল মুখ তুলিয়া দেখে, সেই উন্মাদিনী।

তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া পড়িল, [illegible]ল,—তুমি এই ঘরে এসো ভাই,—আমি সুশীলকে ডা[illegible] পাঠাচ্ছি।

সুশীল তখন বাহিরে মাষ্টার [illegible]য়ের সহিত গত রাত্রির ম্যাজিক লইয়া বিষম [illegible] তুলিয়াছিল এবং ম্যাজিক শেখাটা যে ভুগোল মুখস্থ [illegible]র চেয়ে অনেকখানি প্রয়োজনীয়, তাই প্রতিপন্ন [illegible]র জন্য ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। মাষ্টার মশায় তাকে [illegible]ছুতেই ম্যাজিকের অসারতা বুঝাইতে পারিতেছেন না। এমন সময় দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, মা ডাকিতে[illegible]। তর্কটা সেইখানেই মুলতুবি রাখিয়া সুশীল এক লম্ফে উঠিয়া মাতৃ-সন্নিধানে ছুটিল; কহিল,—কি মা? ডাকচো?

মৃণাল কহিল,—হ্যাঁ, একবার এ ঘরে এসো বাবা।

সুশীল ঘরে ঢুকিয়াই সেই উন্মাদিনীকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল! এই যে মাগী বুঝি মার কাছে সেদিনকার লজেঞ্চেস ছোড়ার কথা বলিয়া দিয়াছে! বটে! আচ্ছা, পাগলীকে পরে মজা দেখাইব'খন।

বিরজার উপর একেই তার রাগ ছিল, আজ আবার মার কাছে তাকে দেখিয়া সে রাগ বাড়িয়া গেল। বক্র কটাক্ষে তার পানে চাহিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—কেন মা? ডাকছিলে কেন? শীগ্‌গির বলো। মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে আমার খুব ইয়ে চলেছে! জানো মা, মাষ্টার মশাই বলেন, ও ম্যাজিক-ট্যাজিক ও-সব কিস্যু নয়! আচ্ছা মা, মাষ্টার মশাই তো এত জানেন, কত লেখাপড়া শিখেচেন,—কৈ, কওয়ান দেখি, কাটা মুণ্ডুকে কথা কওয়ান, কাটা পায়রাকে জ্যান্ত করে দিন তো দেখি! হ্যাঁ, তা আর পারতে হয় না!

বিরজা স্থির দৃষ্টিতে সুশীলের পানে চাহিয়া রহিল। ।, এমন ছেলে! যেমন রূপ, তেমনি বুদ্ধি! তার হইল, ছেলেকে ডাকিয়া সে বলে, ওরে বাছা আমার, আমার, তুই মা বলিয়া ও কাহাকে ডাকিতেছিস? তোর মা? ও নয় রে, ও নয়! আমি যে তোর ঐ ; স্পর্শটুকু পাইবার জন্ম কাতর তৃষিত প্রাণে এখানে াইয়া আছি, আমায় এইবার মা বলিয়া ডাক্! ওরে মি, আমি, আমি তোর মা! এ ঘর, এই সব,—এ ..

মৃণাল কহিল,—শোনো একবার ছেলের পাগলামির া! হ্যাঁ, ডেকেচি কেন, শোনো! ইনি একবার ামায় দেখতে চান।

—কে? এই পাগলী? যাও—এই বুঝি? আমি ল, কি!

সুশীল চলিয়া যায় দেখিয়া বিরজা ছুটিয়া তাহাকে রল, ধরিয়া একেবারে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া তাহাকে কে চাপিল, চাপিয়া তার ছোট মুখখানি অজস্র চুমায় রাইয়া দিল।

সুশীল রাগে আগুন হইয়া হাত-পা ছুড়িয়া চীৎকার লিল,—ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বল্চি আমাকে, াগলী কোথাকার। আমি বাবাকে বলে দেবো। ছাড় লচি আমাকে!

অভয় নীচে নামিতেছিল। সুশীলের চীৎকার শুনিয়া পূজা-গৃহের সম্মুখে আসিল; বিরজা বহিরে যাইতেছিল, তাকে দেখিয়া কাঠের মত শক্ত হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া পড়িল। মৃণালও অপ্রতিভ হইয়া গিয়াছিল। সুশীল বিরজার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আপনাকে সামলাইয়া লইতেছিল।

অভয় আসিয়া কহিল,—কি! হয়েচে কি? সুশীল অত চেঁচাচ্ছিল কেন?

অভিমানের সুরে সুশীল কহিল,—দ্যাখো না বাবা, ঐ পাগলীটা আমায় জাপটে ধরেছিল—মা ওকে কিছু বলচে না!

—কে পাগলী? বিরজা কি ভাবিয়া মুখ তুলিল—অভয়ের দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিল। নিমেষের জন্ম! তখনই বিরজা চোখ নামাইল। অভয়ও দ্বার ছাড়িয়া সরিয়া আসিল। বিরজা অমনি ঝড়ের মত বেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

অভয় মৃণালকে কহিল,—ওকে এখানে ঢুকতে দিয়েছিলে কেন?

মৃণাল ব্যথিত স্বরে কহিল,—আহা, বেচারী বড় দাগা পেয়েচে গো!

—দাগা পেয়েচে! তুমি তাহলে ওকে চিনতে পারো নি!

মৃণাল যেন আকাশ হইতে পড়িল, কহিল,—কেন? কে ও?

—দেখবে, এসো—বলিয়া অভয় আপনার শয়ন-কক্ষে গেল; মৃণাল তার অনুসরণ করিল।

আর্শির টেবিলের টানা খুলিয়া অভয় একখানা কাগজে মোড়া ফটোগ্রাফ বাহির করিল। সে এক কিশোরীর প্রতিকৃতি। অভয় চেয়ারে বসিয়া, আর তার কাঁধে হাত রাখিয়া সে দাঁড়াইয়া আছে! ছবিখানা একটু অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে; তবু একটা সুশ্রী মুখের ঈষৎ আভাস পাওয়া যায়। ফটোখানা মৃণালের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া অভয় কহিল,—এই ছাখো!

মৃণাল দেখিল, দেখিয়া কহিল,—এঁ্যা—ও তবে?

—সে।

—দিদি?

—চুপ! দিদি নয়। পাপীয়সী, পিশাচিনী! আমি ওকে দেখেই চিনেচি। আজ কদিন ধরে ওকে এই বাড়ীর ধারে ঘুরতে দেখচি!

মৃণাল স্বামীর পানে চাহিল, দেখিল, তাঁর দুই চোখ জলে ভরিয়া গিয়াছে। মৃণালের চোখেও জল আসিল।

পাশের বাড়ী

মার্চেন্ট অফিসে চাকুরি করি। থাকি বেণেটোলার এক জীর্ণ মেসে। সকালে সাড়ে-ন'টা বাজিতেই গরম ভাতে বর্ণহীন পাঁচনের মত ঝোল মাখিয়া তাহাই মুখে পুরিয়া অফিসে বাহির হইয়া পড়ি। সারা পথ লোকের ভিড় ঠেলিয়া অফিসে গিয়া হাজিরা দিতে হয় দশটায়। অফিস হইতে ফিরি সন্ধ্যার পর,—কোনদিন সাতটায়, কোনদিন বা আটটায়। ফিরিয়া মুখ-হাত ধুইয়া মেসের অন্ন গলাধঃকরণ করি, খানিক তাশ-পাশা পিটি, তার পর শয়নে পদ্মনাভ! দিনের আলো ফুটিলে পালা-ক্রমে বাজার করা আছে, জামা-কাপড়ে সাবান লাগানো আছে। এমনি ভাবেই সময় কাটে। আর কোনদিকে, বা কাহারো পানে চাহিবার ফুরসুৎ মেলে না।

সাত বৎসর পরে মেসের ঘরে মিস্ত্রী লাগিয়াছিল। বাজার করিয়া ফরমাশ খাটিয়া মেসের কর্ত্তার মন একটু পাইয়াছিলাম, তাই সুপারিশ আর মিনতির জোরে দক্ষিণ দিকের সিঙ্গ্‌ল্‌-সীটওয়ালা ছোট ঘরটায় বদলি হইয়া আসিলাম। এক টাকা ভাড়া বেশী দিতে হইল। তা হোক্, তবু এ ঘরে একটু হাওয়া আছে, গরমে পচিয়া মরিতে হইবে না। তা ছাড়া একটু আকাশের মুখও দেখা যাইবে। যে ঘরে ছিলাম, সে ঘরে জানলা একটা মাত্র ছিল, তার নীচে অন্ধকার সরু গলি, ছাপ-মারা সেওয়ার্ড ডিচ্। হাওয়ার নামও ছিলই না, মাঝে মাঝে গুম্‌সুনি ঝাঁজের সঙ্গে এমন একটা ভ্যাপসানি গন্ধ উঠিত যে নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম করিত।

বাজার করিয়া আসিয়া নূতন ঘরে বিছানা-পত্র পাতিয়া বসিয়া ছিলাম। সেদিন রবিবার। কোন তাড়া ছিল না। কাগজ-পত্র বাহির করিয়া বাড়ীতে চিঠি লিখিতেছিলাম। স্ত্রীর অসুখ, ছোট ছেলেটা মাসখানেক ভুগিতেছে, তাহার জন্য একটিন বার্লি আর কিছু বিস্কুট কিনিয়া পাঠাইতে হইবে। একবার বাড়ী যাইতে পারিলে ভালো হইত! কিন্তু পয়সায় কুলায় না। সেবারে বাড়ী গিয়া দুই দিন থাকিয়া আসিয়াছি। বাড়ী যাওয়ার মানে যাতায়াতে প্রায় তিন টাকার উপর ট্রেণ ভাড়া লাগে। তাই, মনে করিলেই যাওয়া চলে না। পূর্ব্বে মাসে একবার করিয়া যাওয়া ঘটিত; এখন চারটি ছেলে-মেয়ে ডাগর হইয়া উঠিয়াছে, সংসারে খরচ বাড়িয়াছে—ঘন-ঘন গেলে অনর্থক কতকগুলা পয়সা খরচ হয়, তাই তেমন যাওয়া চলে না।

স্ত্রী অনুযোগ করিয়াছিল, একবার গিয়া বাড়ীর হাল দেখিয়া আসিলে হয়! তাই তাকে বুঝাইয়া আশ্বাস দিয়া এক লম্বা চিঠি ফাঁদিয়া বসিয়াছিলাম। কেরাণী-জীবনের দুঃখ যে কি, বিশেষ মার্চেন্ট অফিসের সামান্য কেরাণীর জীবন—তাহাই বুঝাইতেছিলাম,—হঠাৎ নীচে পাশের বাড়ী হইতে কতকগুলা কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল। বালিকা-কণ্ঠে একটা ধ্বনি উঠিল,—এই ছাখো'সে মা, তোমার আদরের বৌ কলতলায় পড়ে দাদার সেই ভালো চায়ের বাটিটা ভেঙ্গে ফেলেচে!

অমনি সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ কণ্ঠে তীব্র ভৎর্সনা জাগিল—এঁ্যা! এমন বেয়াক্কেলে বাপের মেয়েও তো দেখিনি কোনকালে, বাবা! হাড় জ্বালিয়ে খেলে! ধিঙ্গি মাগী! কলতলায় পড়লো কি বলে, বল দিকি! এ খালি হিংসে বৈ নয়! চায়ের বাসন নিত্যি ধোওয়া-মাজা,—ভাঙ্গ একটা—তাহলে আর ধুতে বলবে না! তা হচ্ছে না বাবা। এই বাটি ভাঙ্গার খেসারৎ তুলবো এবেলার খাবার থেকে! মনে করেচো, পার পেয়ে যাবে, ভেল্‌কি দেখিয়ে! আমার কাছে সে ফাঁকি চলবে না! আসুক আজ নন্দ বাড়ী। তার আদরের বৌয়ের কীর্ত্তি স্বচক্ষে দেখুক একবার! মা বড় মন্দ! মিছি-মিছি বৌয়ের পেছনে লাগে, না? আমি যাই বাপের বেটী, তাই এই বৌ নিয়ে ঘর করচি, নৈলে এ অসৈরণ কে সয়, একবার দেখি!

চিঠি লেখা বন্ধ হইল। খোলা জানলার মধ্য দিয়া পাশের বাড়ীর দিকে উঁকি মারিলাম। তক্তাপোষে কিছু দেখা গেল না। সরিব কি না, ভাবিতেছি, এমন সময় সেই কর্কশ কণ্ঠে আবার ঝঙ্কার উঠিল,—ঢং করে আর কতক্ষণ পড়ে থাকবে গো! ও মা, এ আবার কি! মূচ্ছো গেলেন না কি রাজনন্দিনী!

তার পরই একটি মিষ্ট কণ্ঠে করুণ সুর জাগিল,—আহা, ঠোঁট কেটে রক্তে রক্ত হয়ে গেছে মা,তা দেখেচো?

এ স্বর কোনো কিশোরীর! সংসারের ব্যথায় বেদনায় ক্লিষ্ট ব্যথিত সুর! বড় মিঠা লাগিল।

অমনি আবার সেই ঝঙ্কার,—দেখো, ডাক্তার-বদ্যি চাই না কি! নাহলে ওঠা হবে না? বাঁদী-বান্দা এসে পাখা চলোবে, তবে রাজনন্দিনীর মূচ্ছো ভাঙ্গবে! আমি আর পারি না বাবা, সত্যি! আমার তিতি-বিরক্তি ধরে গেছে। ওঠো না গো রাজার কন্তে!

সেই কিশোরীর সুর তখন কর্কশ ঝঙ্কারের উপর মিহি তুলি বুলাইয়া দিল,—ওঠো তো বৌ, দেখি! আহা, এসো ভাই, আমি ধুইয়ে দি। ছাখো দেখি মা, কি রকম কেটে গেছে! যে তোমার কলতলায় পেছল—

মার কণ্ঠে আবার কাঁশর বাজিল—দেখতে হয় তুই গে। অত আদর আমার দ্বারা পোষাবে না! ভালো দ! দামী বাটিটা ভেঙ্গে চুরমার করে ফেল্‌লে! র আমার কত সাধের বাটি! কিছু রাখেনি! ভাঙ্গ- ও তারিফ আছে!

কিশোরী বলিল,—মানুষটা কেটে রক্তারক্তি হলো, তে একটা আহা নেই, তুমি এক বাটির শোকে পাগল ল মা! ও কি ইচ্ছে করে ভেঙ্গেচে? ও সব থাক্‌ ই বৌ, তোমায় মাজতে হবে না। আমি সব মেজে য় দিচ্ছি।

অমনি খুব চাপা গলায় মৃদু আর্ত্তনাদের মত একটি ীণ স্বর ফুটিল—না ভাই ঠাকুরঝি, আমিই মাজ্‌চি।

—না, না, না—ভারী রাগ করবো আমি। তুমি সরে াড়াও। আমায় মাজতে না দিলে আমি ভারী রাগ করবো কিন্তু।

এই বিচিত্র স্বরের দেওয়ালিতে কয়েকটি মূর্ত্তি যেন আমার চোখের সাম্‌নে নিমেষে জাগিয়া উঠিল। কাংস্য-কণ্ঠী এক স্থূলদেহী গৃহিণী, পাশে তার এক আহ্লাদী মেয়ে, প্রকাণ্ড উঁচু ঢিপি কপালের উপর চুলগুলা টানিয়া বাঁধা, —ওদিকে কলতলায় ময়লা ছেঁড়া শাড়ী পরা কুণ্ঠিতা ভীতা বৌ, আর তাহার হাত ধরিয়া দেবীর মত সান্ত্বনা-ময়ী কিশোরী মূর্ত্তি! কথাগুলার ফাঁকে ফাঁকে এমন একটি করুণ নাট্য জাগিয়া উঠিল যে আমার মন নিতান্ত ব্যথা-হত হইয়া এই বিচিত্র স্বরের মালিকদের দেখিবার জন্য অধৈর্য্যে ভরিয়া উঠিল।

তক্তাপোষ ছাড়িয়া জানলার ধারে আসিয়া দাঁড়াইলাম। পাশের বাড়ীর উঠানের একটুখানি দেখা যাইতেছিল। কয়েকটা শাড়ীর প্রান্ত-মাত্র চোখে পড়িল! আর কিছু না। তার পর আরো কয়টা ঝঙ্কার এবং মিনতির সুর তুলিয়া স্বরগুলা স্তব্ধ হইল।

চিঠি সারিয়া স্নান করিতে গেলাম। মনটা কিন্তু ঐ পাশের বাড়ীর উঠানের আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। স্নান সারিয়া ঘরে আসিয়া মাথায় চিরুণী ছোঁয়াইয়াছি, আবার সেই কর্কশ কণ্ঠ বাজিল,—ঐ দেখ্‌গে নন্দ, তোর সাধের সে চায়ের বাটি আদুরী বৌ ভেঙ্গে একেবারে খান্ খান্ করেচে!

ছেলে নন্দ তীব্র ঝাঁজে বলিয়া উঠিল,—ভেঙ্গেচে! আঃ! রোজ রোজ আর পারি না, বাপু! কি করে ভাঙ্গলে?

মার স্বরে কাঁশর বাজিল—ঢং গো ঢং! রাজনন্দিনীর কি ও-সব ধোয়া মাজা পোষায়! তাই ভাঙ্গলে—যে, আর মাজ্‌তে বলবে না! 'আর কেনই বা মাজতে যাওয়া, তা বুঝি না। আমার কি গতরে পোকা ধরেচে, না, আমি মরেচি! আমি দাসী-বাঁদী আছি তো! সব করচি যখন, তখন ওটাও না হয় ধুতুম!

সেই মিহি সুর তখন বীণার মত বাজিয়া উঠিল,—ও কথা বলো না মা।…না দাদা, বৌ পড়ে ঠোঁট কেটেচে, বাটিটাও তাই ভেঙ্গে গেছে। তোমাদের কলতলায় যে পেছল বাবু! দৈবাৎ ভেঙ্গে গেছে। ও কি ইচ্ছে করে ভেঙ্গেচে! কথা ত্থাখো না! বাটি ভাঙ্গ্‌তে ও একেবারে চোরের অধম হয়ে আছে গো, বেচারী যেন মরে আছে! আর সেই মরার উপর মার খাঁড়া সামনে চলেছে! তুমিও এবার কোমর বাঁধবে না কি?

তার পর একমিনিট চুপচাপ। সুপুত্র সহসা গর্জ্জন ছাড়িল,—দেখি সে ভাঙ্গা বাটি!—ভেঙ্গেচে, ত্থাখো! এর একটার দাম দশ আনা! তিন দিনও হয় নি, কিনে এনেচি!

মা বলিলেন,—সর্ব্বস্ব উড়ে-পুড়ে গেল। কি বৌই এনেছিলুম, বাবা! ছি ছি!

—মা—

এ আবার সেই দেবীর কণ্ঠস্বর! দেবীর কণ্ঠের সুে যেন আগুন ছুটিল।

মা বলিলেন,—তুই থাম্ বীণা, আর আস্কারা দিস্‌নে শাসনের সময় শাসন করতে দে।

দেবীর নাম বীণা! নামটা সার্থক হইয়াছে! কণ্ঠের সুর বীণার ঝঙ্কারই বটে!

পুত্র গর্জ্জন তুলিল,—এক বেলা খাওয়া বন্ধ করো মার-ধর তো করতে পারি না, ভদ্দরলোকের ঘরে—

বীণা বলিল—আমারো খাওয়া সেই সঙ্গে তাহ'ে বন্ধ করো। দুজনের ভাত বাজারে বেচে এসো গে মায়ে পোয়ে। তোমাদের পেয়ালার দাম উশুল হ যাবে।

তার পর পাশের বাড়ীর রঙ্গভূমি চুপচাপ। আ খাইতে গেলাম। গলা দিয়া ভাত যেন আর নামি চায় না। কেবলি মনে হইতেছিল,—আহা, পাশে বাড়ীর ঐ বালিকা দুটি আজ অনশনে কাটাইবে! দৈব একটা ঘটনা হইয়া গিয়াছে, তাহারি ফলে আজ উহা উপবাস করিয়া থাকিবে! এমনি মানুষের অন্ধ হিং আর স্পর্দ্ধিত অহঙ্কার! আহা, ঐ বেচারী বৌটি,- বাঙালীর ঘরের অসহায়া বালিকা! এ কি কঠোর নির্ নির্য্যাতনের ধারা তার উপর! স্নেহ-মমতার ধা কেহ ধারে না!

২

সেদিন অফিসে যাইতেছি, হঠাৎ আবার সেই কাংস্য বাজিয়া উঠিল,—ঢং গো ঢং! অসুখ! আনো বদ্যি, আ হকিম। খরচের তুলকালাম বাধাও।…অসুখ,— হবে কি? দাঁতে দড়ি দিয়ে পড়ে থাকুক!

বীণা বলিল,—ভয় নেই। আমি পয়সা দিয়ে স

আনাচ্ছি, তোমাদের খরচ করতে হবে না। আনিয়ে নিজে সাবু তৈরী করে দিচ্ছি। তোমরা গতর তুলিয়ে দশভূজা হয়ে অন্নের গ্রাস মুখে তোলো গে। ওকে না খাইয়ে আমি খাবো না।

মা বলিল,—তোর আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচি নে।

অসুখ? সেই বেচারী বধূটির অসুখ হইয়াছে? ঐ রাক্ষসের পুরীতে দুরন্ত চেড়ীগুলার বাক্য-যাতনা আর সহস্র নির্য্যাতনে না জানি মুখখানি ম্লান করিয়া কি-ভাবেই সে পড়িয়া আছে! মুখে জল দিতে ভাগ্যে ঐ বীণা ছিল! নহিলে কি দশাই হইত!

ইচ্ছা হইতেছিল, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া শুনি, চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা হয় কি না! যদি না হয়, তবে নিজেই গাঁট হইতে পয়সা দিয়া কোন ডাক্তারকে উহাদের গৃহে পাঠাইয়া দিই—দেখিয়া ব্যবস্থা করিয়া যান্! কিন্তু দাঁড়াইবার উপায় নাই! ঘড়িতে ওদিকে নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। অফিসে লেট্ হইলে মাহিনা কাটা যাইবে! কেরাণীর আবার পরের দুঃখে দুঃখ করা সাজে কখনো!

মনের মধ্যে পাহাড়ের বোঝা বহিয়া আহারে বসিলাম। তাড়াতাড়ি নাকে-মুখে ভাত গুঁজিয়া কোটটা গায়ে চড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। দশটা বাজিতে তখন আর দশ মিনিট বাকী! বেলা হইয়া গিয়াছে।

যাইবার সময় পাশের বাড়ীর দিকে একবার তাকাইয়া গেলাম। বাড়ীটা দারুণ স্তব্ধতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমার মনে হইল, নানা নির্য্যাতনে কাতর ব্যথিত বাড়ীখানা কি যেন এক অজানা ভয়ে শিহরিয়া স্তম্ভিত চিত্তে দাঁড়াইয়া আছে!

সেদিন ফিরিতে একটু রাত্রি হইল। ভোরে বড় বাবুর মেয়ের পাকা দেখা—তাঁহার সঙ্গে নিউ-মার্কেটে গিয়া কতকগুলা ফল-ফুলুরি কিনিয়া দিতে হইল। যখন ফিরিলাম, তখন চারিধার নিশীথের নিদ্রা দিয়া ঘেরা। পাশের বাড়ীরও সেই অবস্থা।

পরদিন ভোরে উঠিয়াই বড় বাবুর বাড়ী ছুটিতে হইল। সেইখানেই আহার সারিয়া অফিসে রওনা হইলাম। পাশের বাড়ীর বৌটি কেমন আছে, জানিবার জন্য সারাদিন প্রাণটা অস্থির হইয়া রহিল! অফিসে কাজকর্ম্মের মধ্যেও ঐ পরিচয়-হীনা বালিকার রোগ-কাতর ম্লান ছলছল দৃষ্টিটুকু আমার আশে-পাশে বেদনার ঝড় তুলিয়া যেন ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। তাহার বেদনা ছুঁচের মত বুকে বিঁধিতেছিল।

ফিরিবার পথে দুটি বেদানা ও কিছু আঙুর কিনিয়া লইলাম। ভাবিলাম, পাশের বাড়ীর কাহাকেও ডাকিয়া বৌটির জন্য পাঠাইয়া দিব! তবু বেচারী মুখে দিলে একটু তৃপ্তি হইবে! কিন্তু কি বলিয়া পাঠাই?

এক-রকম পাগলের মত ছুটিয়া বাসায় ফিরিলাম। গলির পথে তখন গ্যাস জ্বালিয়া দিয়াছে। মেশের কাছে আসিতেই সুর-লয়যোগে একটা তীব্র ক্রন্দনের শব্দ কানে আসিল,—ওগো মা গো, আমার ঘরের লক্ষ্মী ঘর ছেড়ে কোথায় গেলে মা!

বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল! তবে কি—!

যা ভাবিয়াছিলাম! সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে! ঠিক সন্ধ্যার সময় পাড়ার গৃহে গৃহে যখন শঙ্খরোল উঠিয়াছে তখন সেই বেচারী বালিকা সংসারের শত অত্যাচার, শত নির্য্যাতনের পাশ কাটিয়া, সকল যাতনার হাত এড়াইয়া বাঁচিয়াছে!

মেশের সদরে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। পাশের বাড়ীতে গুঞ্জন-ক্রন্দনের ফাঁকে ফাঁকে সেই রাক্ষসী শাশুড়ীর তীব্র ক্রন্দন জাগিয়া উঠিতেছিল,—ওগো আমার ঘরের লক্ষ্মী ঘর আঁধার করে কোথায় গেলে মা! ও বাবা নন্দ রে!

রাগে আমার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। মনে হইল, এখনি ঝড়ের মত ঐ বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া ঐ রাক্ষসীর কণ্ঠ সবলে চাপিয়া ধরি—প্রচণ্ড প্রহারে তার ওই নির্লজ্জ শোকাভিনয় একেবারে জন্মের মত বন্ধ করিয়া দিই!

বেদানা আঙুরগুলা দ্বারের সামনে রাখিয়া দিলাম। মরণ-পথযাত্রিণী বালিকার উদ্দেশে বলিলাম,—দেবী, তোমার দুঃখে গলিয়া তোমারই উদ্দেশে এগুলি নিবেদন করিলাম। বড় জ্বালায় জ্বলিয়া গিয়াছ! প্রার্থনা করি, মরিয়া সুখী হও, শান্তি পাও, তৃপ্তি পাও!

উপরে আসিয়া জামাটা খুলিয়া দড়ির আলনায় ঝুলাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িলাম। বীণার কথা মনে হইতেছিল। বেচারী শোকে-দুঃখে অভিভূত হইয়া ঘরের কোণে কোথায় উপুড় হইয়া পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে! শোকের এই বিরাট অভিনয়ের মাঝখানে কে আর তাহাকে দেখিতেছে! ইচ্ছা হইতেছিল, তাহার শ্রান্ত বেদনাহত শির এই বুকে তুলিয়া লইয়া বলি—কেন কাঁদচো মা? সে যে মরিয়া সকল জ্বালা জুড়াইয়াছে! এ তার মৃত্যু নয়, এ যে মুক্তি, মুক্তি!

কিন্তু তা বলা চলে না! বলিবার অধিকার নাই। আমার দুই চোখে অশ্রুর সাগর একেবারে উথলিয়া উঠিল।

কতক্ষণ পড়িয়া ছিলাম, জানি না! হঠাৎ ও-বাড়ীর সেই রাক্ষসীর কণ্ঠে আবার তীব্র ক্রন্দন জাগিল,—ও গো মা গো, ও আমার ঘরের লক্ষ্মী—মায়া কাটিয়ে কোথায় চললে মা? কি দুঃখে আমাদের ছেড়ে গেলে মা? ওগো আমার ঘরের লক্ষ্মী আজ কোথায় চললো গো!

ধড়মড়িয়া উঠিয়া নীচে আসিলাম। দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, ফুলের ভারে সজ্জিত দড়ির খাটে বাসি ফুলের

শুক ম্লান মূর্ত্তি! আল্‌তা-রাঙা পা দুখানি বাহির
া আছে, সীঁথির সিঁদূর রক্তরাগে সৌভাগ্যের দীপ্ত
মা ফুটাইয়া তুলিয়াছে! একটা নিশ্বাস ফেলিয়া
লাম, যাও মা, দেবীর মহিমায় সাজিয়া ওপারেই
। সেখানে গিয়া ও-সিঁদূর মুছিয়া ও আল্‌তার রঙ
া বিশ্ববিধাতার কাছে এই শোকের ভণ্ডামির খোলশ,
ড়িয়া নির্য্যাতনের নালিশ করো গিয়া। আর মিনতি
নাইয়ো, বাঙালীর ঘরে যেন বৌ করিয়া তোমার মত
চ কচি মেয়েদের তিনি আর না পাঠান্!

হরিবোল-বলিয়া বাহকেরা খাট লইয়া চলিয়া গেল।
দ হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিতেছিল। তার মাথার
াকড়া চুলগুল ঝুলিয়া মুখে পড়িয়াছে—ডাকাতের মত
াষণ মূর্ত্তি! এই পাষণ্ডই বালিকাকে খুন করিয়াছে,
ার উহার সেই দুর্দ্দান্ত মা! খুনই করিয়াছে! ইহাদের
াচার করে, এমন আদালত দুনিয়ায় নাই? আমি গিয়া
লফ লইয়া সেখানে তাহা হইলে সাক্ষ্য দিই, বলি, হাঁ,
হারা খুনে! হাকিমকে গিয়া বলি, উহাদের ফাঁশি-
াঠে লটকাইয়া দাও!

কিন্তু মিথ্যা রে, মিথ্যা এ অভিযোগ, মিথ্যা এ
কাতরতা! উপরে আসিয়া বিছানায় দেহ-ভার লুটাইয়া
দিলাম। হঠাৎ মনে পড়িল, ঐ বালিকা বধূটির বাপ-
মায়ের কথা! হয় তো এই একটিমাত্র সন্তান তাদের!
ইহাকে যোগ্য বরে যোগ্য ঘরে দিয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে
কোথাও তাহারা বসিয়া আছে! জানেও না—এখানে
তাহাদের কি সর্ব্বনাশই হইয়া গেল!

আমার দুটি চোখে হু-হু করিয়া জল ঠেলিয়া আসিল।

ঠাকুর আসিয়া বলিল,—বাবু, খাবার দেওয়া হয়েচে
অনেকক্ষণ।

গম্ভীর কণ্ঠে বলিলাম,—খাবো না! শরীর খারাপ।

ঠাকুর চলিয়া গেল।

রাত্রিটা কোথাকার কতকগুলা দুঃস্বপ্নের মাঝ দিয়া যে
কাটিয়া গেল! পরদিন ভোরে মেশের কর্ত্তাকে বলিয়া
আবার সেই বায়ু-হীন পুরানো ঘরেই ফিরিয়া আসিলাম।
দক্ষিণদিকের ও-ঘরে টেঁকা যায় না। পাশের বাড়ীর
হাওয়ায় কেমন যেন বিষাইয়া রহিয়াছে—ও হাওয়া গায়ে
না লাগে!

অপরাধী

বিশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা বলিতেছি। মুঙ্গেরের কলেজে পড়িতাম। বয়স তখন আঠারো কি উনিশ।

গোরাবাজারের ওদিকে ফুটবল ম্যাচ দেখিতে গিয়াছিলাম। হঠাৎ সারা আকাশ মেঘে ঢাকিয়া ঝড় তুলিয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। মাথা বাঁচাইবার উদ্দেশে দিগ্বিদিকের জ্ঞান হারাইয়া একদিকে ছুট্ দিলাম। পিছনে ডাক শুনিলাম,—আমাদের বাড়ী আসুন, অজিত বাবু।

চাহিয়া দেখি, অশ্বিনী। আমাদেরই সহপাঠী সে, পাশের একটা বাংলার বারান্দা হইতে আমায় ডাকিতেছে। সানন্দে তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সাগ্রহে তাহার বাড়ী গিয়া উঠিলাম।

অশ্বিনীরা নেটিভ ক্রীশ্চান্। বাঙালীপাড়ার বাহিরে থাকে। ছোট ফটকের মধ্যে একটু কম্পাউণ্ড আছে, ফ্লোরের উপর ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার বাংলাখানি—ভারী পরিচ্ছন্ন। কম্পাউণ্ডে লাল নীল নানা রঙের ফুলে ভরা ছোট বাগান। ঠিক যেন একখানি ছবি!

ভিজা কাপড় বদলাইয়া মাথায় ব্রশ্ চালাইয়া ভদ্রলোক সাজিয়া ভিতরে আসিয়া বসিলাম।

অশ্বিনীর বিধবা মা আসিয়া সস্নেহে অভ্যর্থনা করিলেন। মধুর স্নেহ-করুণায় তাঁহার মুখখানি ঢলঢল করিতেছে—শান্ত সুন্দর শ্রীতে সমুজ্জ্বল,—যেন ম্যাডোনার মূর্ত্তি! একবার দেখিলে জীবনে সে মূর্ত্তি ভোলা যায় না! পরক্ষণেই অশ্বিনী ডাকিল,—রেবা!

টক্‌টকে লাল রঙের শাড়ীতে আপনার দেহখানিকে আবৃত করিয়া রাজ্যের লজ্জা গায়ে মাখিয়া এক বালিকা কক্ষে প্রবেশ করিল। অস্তগামী সূর্য্যের কিরণচ্ছটায় সমস্ত আকাশ যেমন এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ বর্ণে আপনাকে রঞ্জিত করিয়া তোলে, বালিকার সর্ব্বাঙ্গে তেমনি এক রূপের হিল্লোল! তাহার সে অপরূপ রূপের জ্যোৎস্নায় প্রলয়ান্ধকারে আচ্ছন্ন সেই ঘরখানি মুহূর্ত্তে যেন চকিত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশে দোদুল বেণী, মাথার উপর টক্‌টকে লাল ফিতায় বো-বাঁধা—সে এক অপূর্ব্ব শোভা! আমি তাহার পানে চাহিয়া চকিতে চোখ নামাইলাম।

অশ্বিনী বলিল,—ইনিই অজিত বাবু, কলেজ-টীমে খেলেন। সেদিন গোরাদের সঙ্গে কলেজের যে ম্যাচ দেখেচো, তাতে গোরারা যে গোল খেয়ে হেরে গেল—সে গোলটি ইনিই দিয়েছিলেন। এঁকে চা খাওয়াও দেখি। এঁর অভ্যর্থনার ভার তোমার উপর।

সলজ্জ মধুর ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়িয়া রেবা বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় তাহার চোখ ও ঠোঁটের কোণে যে আনন্দ-দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেটুকু আমার লক্ষ্য এড়ায় নাই। আমার মনে হইল, যেন হাসির একটা জীবন্ত বিদ্যুৎ-শিখা আমার সাম্‌নে হইতে সরিয়া গেল। এই জ্যোৎস্নাময়ী বালিকার হাতের তৈয়ারী চায়ে সেদিন অমৃতের স্বাদ পাইলাম।

অনেক রাত্রে বৃষ্টি থামিলে বাড়ী ফিরিলাম। সে রাত্রে ঘুমের বড় ব্যাঘাত হইল। কেবলি রেবার সেই সুন্দর মুখ আমার প্রথম যৌবনের সমস্ত বাসনা-কামনার প্রদীপটিতে শিখার মত জাগিয়া জ্বল্ জ্বল্ করিতে লাগিল। রেবা ক্রীশ্চান, ক্রীশ্চান,…এই কথাটা বার বার মনের মধ্যে জাগিয়া তীক্ষ্ণ ছুরির মত আমার সমস্ত কল্পনাকে রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত করিয়া তুলিল।

ইহার পর হইতে অশ্বিনীর সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা খুবই বাড়িয়া উঠিল। নানা অছিলায় তাহাদের বাড়ী যাইতাম। সন্ধ্যায় চায়ের টেবিলে স্পোর্টিংয়ের নানা অবান্তর আলোচনায় ঘড়িতে কখন্ যে দশটা এগারোটা বাজিয়া যাইত, সেদিকে কাহারো হুঁশ্ থাকিত না। আমি শুধু রেবার রূপ-সুধা আর তাহার হাতের তৈয়ারী চা পান করিয়া আমার সেই প্রথম যৌবনের সুদুর্ল্লভ মুহূর্ত্তগুলিকে এক বিচিত্র রমণীয়তায় পরিপূর্ণ বিভোর করিয়া বাড়ী ফিরিতাম।

প্রাণে তৃপ্তি কি তেমন পাইতাম! অসহ্য বেদনা বোধ হইত, যখন বুঝিতাম, এই রেবাকে কোনদিন আমার পাইবার আশা নাই! সে ক্রীশ্চান। এই রেবা,—কোথায় থাকিবে সে, আর কোথায় বা আমি! হায় রে, এখানকার এই মুহূর্ত্তগুলার সকল স্মৃতি তখন অতীতের কোন্ অতল গহ্বরে তলাইয়া যাইবে!

বেশী ভাবিতে পারিতাম না। স্বার্থের বিষে সমস্ত মন বিষাইয়া উঠিত। রাত্রে বাড়ী ফিরিবার সময় কতবার মনে করিতাম, আর না, রেবাকে আর দেখিব না। নৈরাশ্যের আগুনে বাসনার এ ইন্ধন মিথ্যা আর কেন জোগাই! রেবা পরের, রেবা সুদূরের!

কিন্তু পরদিন কলেজের ছুটি হইলেই রেবার সেই তরুণ রূপের মোহ কি প্রবল নেশায় আকুল উন্মাদ করিয়া আমায় আবার তাহারই গৃহের দ্বারে টানিয়া আনিত। ওঃ, সে কি ভীষণ মুহূর্ত্তগুলা! নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কেবলি আঘাত পাইতাম। তবু সে আঘাত পাইয়া আগ্রহে আবার সে-যুদ্ধে মাতিয়া উঠিতাম। আমি যেন পাগল হইয়াছিলাম।

আর পারিলাম না। একদিন ভাবিলাম, রেবাকে সব খুলিয়া বলি। যদি বুঝাইতে পারি, কি তীব্র পাসা, কি প্রবল অনুরাগ আমার প্রাণে! হোক্ সে চান্। অন্তরের এই যে প্রবল আকর্ষণ, সে কি ষের হাতে গড়া ধর্ম্মের এই কৃত্রিম বেড়াটাকে ভাঙ্গিতে রিবে না? ভাঙ্গিয়া দুইজনকে এক করিয়া দিবে না? বা মানুষ, আমিও মানুষ। তবে…?

একদিন একটা সুযোগ মিলিল। সেদিন অশ্বিনী থায় কি কাজে বাহির হইয়া গিয়াছিল, কলেজে আসে ই। ব্যাপার কি জানিবার জন্য কলেজের ছুটির পর াহার বাড়ীতে আসিয়া হাজির হইলাম। অশ্বিনীর মা লিলেন,—রেবার বিয়ের কথা হচ্ছে! অশ্বিনী তাই ছেলেটিকে দেখতে গেছে সাহেবগঞ্জে।

আমার বুকে কে যেন মুগুরের ঘা মারিল। রেবার বিয়ে!

অশ্বিনীর মা বলিলেন,—রেবা, চা এনে দাও। দিয়ে এখানে বসো। অশ্বিনী তো বাড়ী নেই।

তিনি চলিয়া গেলেন। রেবা চা লইয়া আসিল।

সন্ধ্যার ম্লান ছায়া তখন ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতে-ছিল। কাছেই এক সাহেবের বাঙলা হইতে পিয়ানোর ঝঙ্কারে একটা মাতাল সুর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া সমস্ত বাতাসকেও মাতাইয়া তুলিয়াছিল। আমার প্রাণ সে সুরে মাতাল হইয়া উঠিল। তার উপর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রেবা—তার তারুণ্যের অপূর্ব্ব দীপ্তি লইয়া! গোধূলির সেই মৃদু আভায় তাকে কি অপরূপই না দেখাইতেছিল!

পাগলের মত রেবার হাত ধরিয়া ডাকিলাম,—রেবা—;

স্বরটা সব বাহির হইয়াছিল কি না, জানি না। সে স্বরে আমার হৃদয়ের সমস্ত আবেগ অসহ্য আশঙ্কা-উদ্বেগে একেবারে মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়িল।

রেবা চকিতের মত আমার পানে চাহিল। তাহার দুই চোখ বিস্ময়ে পরিপূর্ণ।

আমি বলিলাম,—রেবা, আমি তোমায় ভালোবাসি, বড় ভালোবাসি। হও তুমি ক্রীশ্চান—তাতে কি বাধা? আমিও ক্রীশ্চান হতে রাজী আছি। রেবা—রেবা—

গুছাইয়া ঠিক এই কয়টা কথাই বলিয়াছিলাম কি না না! তবে এই ভাবের কথাগুলাই আমার মনের ায় ফুটিবার জন্য আতালি-পাতালি করিতেছিল। -নিশ্বাসে আরো কত কথা যে বলিয়া

া বসিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না। পানে সাগ্রহ পিপাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রক্তিম কপোলে ক্ষণে ক্ষণে লজ্জার সুরক্তিম আভা ফুটিয়া উঠিতেছিল, তার চোখের পাতা ক্ষণে ক্ষণে মুদিয়া আসিতেছিল।

হঠাৎ একটি নিশ্বাস ফেলিয়া রেবা বিদ্যুৎ-শিখার মত সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তার পর আমি কতক্ষণ যে মূক মৌন পুতুলের মত সেখানে ছিলাম, জানি না। হঠাৎ ঘড়িতে দশটা বাজিতেছে শুনিয়া আমার যেন চেতনা হইল। আমি চোরের মত নিঃশব্দে বাহির হইলাম। ফ্লোরের নীচে একঝাড় হাস্নুহানার পাশে শাণ-বাঁধানো ছোট চাতালটার উপর রেবা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। ওখানে রেবা কি করিতেছে? মন কৌতূহলী হইলেও পা সে দিকে গেল না। সটান্ পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম। পথে আসিয়া ভাবিলাম, এ কি করিলাম! মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায়, ক্ষণিক উত্তেজনায় একটা বালিকার কাছে এমন ভাবে—ছি!

দারুণ ধিক্কারে সমস্ত মন ভরিয়া উঠিল। রেবা কি ভাবিল? পাছে পরদিন অশ্বিনীর সঙ্গে দেখা হইলে এ-কথা ওঠে, সেই ভয়ে কলেজে গেলাম না। বৈকালে কষ্টহারিণী ঘাটের দিকে চলিয়া গেলাম। বাসায় ফিরিয়া শুনিলাম, অশ্বিনী কি জরুরি কাজে আমায় খুঁজিতে আসিয়াছিল। বুকটা ছঁাৎ করিয়া উঠিল! তার পর দু-তিনদিন কলেজের ছুটি ছিল—বাসা ছাড়িয়া ফাঁকে ফাঁকে ঘুরিয়া বেড়াইলাম,—কয়দিনই অশ্বিনী আসিয়া দুই তিন বার আমার খোঁজ করিয়া গিয়াছে!—কেন—? কেন?

আশার দোলায় মন দুলিয়া উঠিল—আবার এক দারুণ লজ্জা তাহাকে চাপিয়া ধরিত। এমনি জ্বালাতন হইয়া কাজের অছিলা তুলিয়া হঠাৎ কলিকাতায় পলাইলাম।

চট করিয়া ফেরা গেল না। বাড়ীতে অকস্মাৎ নান অসুখ-বিসুখের হাঙ্গামা আসিয়া আমায় প্রায় দুই মাস বাড়ীতে আটক করিয়া রাখিল। খাঁচার পাখীর মত পড়িয়া ছটফট্ করিলাম—অশ্বিনী কেন আমার খোঁজে আসিয়াছিল? তবে কি রেবাকে পাওয়া সম্ভব! মুঙ্গেরে ছুটিয়া যাইব? একখানা চিঠি লিখিব? কি জানি, হয়তো হাতের নাগালে পাইয়াও কামনার ধনটিকে চিরদিনের জন্য খোয়াইয়া বসিলাম!

তার পর মুঙ্গেরে ফিরিলাম, একেবারে পূজার পর, কলেজ খুলিলে! ফিরিয়া সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত সন্তর্পণে অশ্বিনীদের পাড়ার দিকে চলিলাম। ঐ যে বাড়ী দেখ যায়! সেই বাড়ী! আমার মাথার মধ্যে রক্তটা ছ করিয়া নাচিয়া উঠিল। কম্পিত চরণে ক হইলাম। এ কি, ফটকের সম্মুখে ছোট ঘোড় চড়িয়া এক সাহেব-বালক বেড়াইতেছে যে,

তরুণী মেম। ফটকের সম্মুখে দেখি, কাঠের ছোট সাইনবোর্ড, তাহাতে একটা বিলাতী নাম লেখা। কে যেন আমায় নিমেষে কোন্ উচ্চ পর্ব্বত-শিখা হইতে একেবারে অতলস্পর্শ অন্ধকার গহ্বরে ঠেলিয়া দিল।

নিকটে এক ভুট্টাওয়ালার দোকান। সেখানে সন্ধান লইতে গিয়া দেখি, অশ্বিনীদের বাড়ীর সেই লখিয়া দাইটা এক কোণে বসিয়া ভুট্টা সেঁকিতেছে। তার মুখে শুনিলাম, অশ্বিনী আজ মাসখানেক হইল বোনের বিবাহ দিবার পরই কি-একটা চাকরি লইয়া রেঙ্গুনে চলিয়া গিয়াছে—বিধবা মা সঙ্গে গিয়াছেন। যাইবার সময় বাড়ীটা বিক্রয় করিয়া গিয়াছে। বিবাহটা এক-রকম গোলমালের মধ্যেই সারা হইয়াছে। অশ্বিনী, রেবা, কি মা—কাহারও মত ছিল না। জামাইয়ের বাপের কাছে বাড়ীটা বাঁধা ছিল—তাহারা মামলা-মকর্দ্দমা করিয়া ক্রোক দিবার চেষ্টায় ছিল, তাই এই বিবাহ দিয়া সে-সব দায় এড়াইয়া বাঁচিয়াছে। *

কলেজের বন্ধুদের মুখে শুনিলাম,—আমি চলিয়া গেলে অশ্বিনী পাগলের মত আমার সন্ধান করিয়াছিল। আমার কলিকাতার ঠিকানা কেহ জানিত না…কাজেই বলিতে পারে নাই। আমার সঙ্গে অশ্বিনীর নাকি এই বিবাহের ব্যাপারেই ভারী জরুরি পরামর্শ ছিল!

—রেবাকে যে-কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, অশ্বিনী তবে কি তাহারই জবাব দিতে আসিয়াছিল। তবে কি রেবার কাছে আপনাকে ধরা দিয়াছিলাম,—সেই ভরসায় দেনার দায় কাটাইবার জন্য বেচারী অশ্বিনী আমারই কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিল! কে জানে!

* * * *

তার পর আজ বিশ-বৎসর পরের কথা বলিতে বসিয়াছি। সংসারের প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া কোথায় গিয়াছে রেবা, আর আমার তরুণ যৌবনের সেই অরুণ-স্বপ্ন! দুই মেয়ের বিবাহ দিয়া নাতি-পুতি লইয়া আমি এখন দস্তুর-মত সংসার ফাঁদিয়া বসিয়াছি। বাংলা নভেলে প্রেমের কথা পড়িলে গাঁজাখুরি বলিয়া সে বই ছুড়িয়া ফেলিয়া দি!

এফ-এ পাশ করিয়া হঠাৎ ধনী শ্বশুরের নজরে পড়িয়া তাঁর একটিমাত্র কন্যার সহিত অনেকগুলি টাকা ঘরে আনিয়া পরম পরিতৃপ্তিতে কাল কাটাইতেছি। মফস্বলে ডাক্তারি চাকরি করি—পরিশ্রম কম, খাতির খুব,—বেশ নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটিতেছে!

সে এই চাকরিতে ঘুরিতে ঘুরিতে আজ চারমাস হইল, গোপালপুরে আসিয়া উঠিয়াছি।

এঁর অর্জ্জুন সন্ধ্যার সময় গৃহিণীর হাতে তৈয়ারী দুই-সলজ্জ ... মুখে তুলিতেছি, এমন সময় খপর আসিল, এক জরুরি অ্যাক্সিডেন্ট কেসে এখনই বাহিরে যাইতে হইবে।

ভাড়া-গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল। গাড়ীতে গি[য়া] উঠিলাম। গৃহিণী মুখ ভার করিয়া দাঁড়াইলেন। কি উপায় ছিল না। বাঙালী স্ত্রীরা কর্ত্তব্যের ডাক—এ জিনিষটার অর্থ বোঝে না। তারা চায় স্বামীগু[লা] তাহাদের হাতে মাথা গুঁজিয়া আদর-সোহাগ লইয়াই—কিন্তু সে কথা থাক্!

রেলোয়ে-ব্যারাকের ধারে গিয়া একটা জীর্ণ বাংলা[র] মধ্যে ঢুকিতে দেখি, সম্মুখেই পাঁচ-সাতটি ছেলে-মে[য়ে] খেলা করিতেছে—ছিন্ন মলিন বেশ,—সুকুমার মূর্ত্তিগু[লা] জরাজীর্ণ। তাহাদের ঘেরিয়া, সমস্ত স্থানটাকে ঘেরি[য়া] দারিদ্র্যের বিকট শীর্ণ কঙ্কালখানা যেন খট-খট করি[য়া] ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

ভিতরে গেলাম। রোগশয্যায় শায়িতা এক তরুণী-রোগী। ইহাকেই দেখিতে হইবে। বয়স বেশী ন[য়] তবে দারিদ্র্যে আর অভাবে গায়ের চর্ম্ম বিশ্রী, কর্ক[শ] হইয়া গিয়াছে। রূপ ম্লান, চোখের নীচে কা[লি] পড়িয়াছে! তরুণী এককালে সুন্দরী ছিল বটে, এখ[ন] সৌন্দর্য্যের একটা ষোড়শ-মাত্র তাহার অঙ্গে লাগি[য়া] আছে। তরুণী অচেতন পড়িয়া আছে।

ব্যাপার শুনিলাম—মাতাল লম্পট স্বামী পয়সার জ[ন্য] তর্জ্জন করিয়া স্ত্রীর কাছে যখন পয়সা পায় নাই, তখ[ন] জুতা-শুদ্ধ পা তুলিয়া নিতান্ত পাষণ্ডের মত পদাঘা[তে] বেচারীকে জর্জ্জরিত করিয়া গিয়াছে। খানিকক্ষ[ণ] শুশ্রূষার পর রোগীর চেতনা হইল। রোগী চোখ মেলিয়[া] চাহিল। এ কি—এ যে আমার পরিচিত মূর্ত্তি!...কোথা[য়] দেখিয়াছি? চমকিয়া উঠিলাম। কি!—এ যে রেবা

সবিস্ময়ে ডাকিলাম—রেবা—

না, ভুল নয়। তরুণী আমার পানে ফিরিয়া চাহিল চাহিয়া মৃদু স্বরে বলিল—অজিতবাবু!

তার পর দুজনেই নির্ব্বাক্। কাহারো মুখে কথ[া] নাই। রেবার দুই ডাগর চোখের কোলে মুক্তার মত দুই বিন্দু জল ফুটিয়া উঠিল। ফোঁটা বড় হইল—তা[র] পর দুই গাল বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। আমার বুক ফাটিয়[া] কতদিনকার একটা বিস্মৃতপ্রায় রুদ্ধ বেদনা তীব্র নিশ্বাসে ফুটিয়া বাহির হইল। আমি দুই হাতে রেবা[র] চোখের জল মুছিয়া বলিলাম,—রেবা! তোমার এই দশা!

আমার বুকের উপর অসহ্য বেদনা পাহাড়ের মত চাপিয়া বসিয়াছিল—চোখে জল আসিল।

রেবা আকাশের পানে একটা হাত উঠাইল, তার পর ধীরে ধীরে বলিল,—প্রভুর ইচ্ছা!

কোন কথা বলিলাম না—বলিবার শক্তি ছিল না।

রেবা,—সেই রেবা ! এক অতর্কিত মুহূর্তে ক্ষণেকের জন্য যাহাকে বলিয়াছিলাম—

জিজ্ঞাসা করিলাম—অশ্বিনী কোথায় ?

—জানি না। এই বিয়ের ব্যাপার নিয়েই দাদার হয়। এ বিয়েতে কারো মত ছিল না। দাদাও বিয়ে বন্ধ করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু হলো না—ই প্রভুর ইচ্ছা !

হা রে স্বার্থপর বর্ব্বর কাপুরুষ ! এই বিবাহ বন্ধ ার চেষ্টা হয়তো তোর সেই কথাটাকেই কেন্দ্র রিয়া ! কে যেন আমার সর্ব্বাঙ্গে তীব্র কশাঘাত রিল।

আমি আজ ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যের মধ্যে—আর আমার সেই প্রথম-যৌবনের কামনার ধন রেবা—! কেন তাহাকে সেই সন্ধ্যায় আশার উচ্ছ্বাসে মাতাইয়া তুলিয়াছিলাম ! তার পর কাপুরুষের মত পলাইয়া…!

রেবাকে বলিলাম,—আমার ওখানে তুমি চলো।… যাবে রেবা ?

রেবা বলিল,—না।

—আমার বাড়ীতে না হয় না গেলে, আমার বাড়ীর কাছে অন্য বাড়ীতে থাকবে,—আমার দেখবার সুবিধা হবে। ছেলেমেয়েদের জন্যও—?

তবু সেই এক উত্তর—না।

ঠিক ! ঠিক জবাব দিয়াছ, রেবা ! নারী, এই তেজেই দুর্ব্বল অসহায় হইয়াও লক্ষ্মীছাড়া বিশ্বে নিজেকে তুমি খাড়া রাখিয়াছ !

ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া উঠিলাম। উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। গাড়ীতে উঠিব, এমন সময় দশ-এগারো বছরের একটি মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া আমার হাতে চারিটা টাকা গুঁজিয়া দিল, দিয়া বলিল,—আপনার ভিজিট।

কোন কথা বলিলাম না, বলিতে পারিলাম না—হাতটাও সরাইতে পারিলাম না। গরম আগুনের ম বোধ হইলেও টাকা চারিটা হাতে রহিয়া গেল।

গাড়ী চলিল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন বেশ নিবি হইয়া উঠিয়াছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্ট দেখিল রেবার কি দীপ্ত মহিমাময় মূর্ত্তি ! রাজেন্দ্রাণীর সিংহাসনে সে বসিয়া আছে—আর আমি তার স হইতে আমার ধিক্কৃত কুণ্ঠিত মনকে লইয়া নতা সরিয়া পড়িবার জন্য পথ খুঁজিয়া মরিতেছি !

মোটরে কাশ্মীর

(ভ্রমণ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

৪

৭ই সেপ্টেম্বর। ভোরে উঠে সকালে স্নান সেরে নিলুম। তার পর চা-পানান্তে কাণপুর সহর দেখবার জন্ত বেরিয়ে পড়লুম! শুধু সহর দেখাই বা বলি কেন, পেট্রোল এবং খাতও সংগ্রহ করা চাই। হোটেলের কামরা ভাড়া পড়লো ৭৷৹, ছু'খানি ফ্যানের ভাড়া আরো ২৲ টাকা,—তা ছাড়া ভিস্তি, ম্যাথর-লোকজনদের কিছু কিছু বখ্‌শিসও দেওয়া হলো। বেলা তখন সাড়ে সাতটা—দাম চুকিয়ে হোটেলের বাহিরে এসে দেখি, পথে ট্রাম চলেছে। একখানি করে গাড়ী—ইলেকট্রিক ট্রাম। আমাদের সঙ্গে একজন গাইড্ জুটলো। গাইডকে সঙ্গে নিয়ে আমরা প্রথমে এলুম, কাণপুরের রেস্‌কোর্শে। রেস্‌কোর্শটি এলাহাবাদ রোডের উপর। এখানেই কাছাকাছি গোরা বারিক, প্যারেডের মাঠ। তার পর ডাহিনে কুইন্‌স্ পার্ক। এই পার্কে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এক ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি আছে। পার্কের কাছে মেমোরিয়ল গার্ডন্‌স্। এই মেমোরিয়ল গার্ডন্‌সের মধ্যে সেই প্রসিদ্ধ 'মেমোরিয়ল ওয়েল'—সিপাহী-বিদ্রোহের সময় যেখানে বন্দী ইংরাজ মহিলা ও শিশুদের নিক্ষেপ করা হয়েছিল। ওয়েলটির সম্মুখে শ্বেতপাথরের এক পরী-মূর্ত্তি—শান্তি ও ক্ষমার প্রতিমূর্ত্তি! এই বাগান দেখতে হলে ওখানকার য়ুরোপীয়ান্ এসোসিয়েশনের সেক্রেটারীর কাছ থেকে অনুমতি-পত্র সংগ্রহ করতে হয়। বলা বাহুল্য, আমাদের জন্তই অনুমতি-পত্রের ব্যবস্থা—সাহেব লোকরা অবশ্ব বিনা-পত্রেই দর্শন করেন।

আমরা পাশ-সংগ্রহের জন্ত মোটেই লোলুপ ছিলুম না। বাহির থেকে যেটুকু দেখা যায়, তাই দেখে তৃপ্ত হলুম! মেমোরিয়ল ওয়েল দেখবার পথে এডোয়ার্ড মেমোরিয়ল টাউন হলও দেখা হলো। পার্কের মধ্যে সুদৃশ্ত গৃহ—ভৃত্য-পরিজনের সঙ্গে বহু শিশু পার্কে এসে সেই সকালেই জড়ো হয়েচে। এ-সব দেখে কাণপুরের 'মলে' এলুম—এইটিই ঠাণ্ডী শড়ক বা বড় রাস্তা। আমাদের এখানকার চৌরঙ্গী বললে যা বোঝায়, কাণপুরের মলও তেমনি, অর্থাৎ কাণপুরের চৌরঙ্গী।

কাণপুর হলো এখানকার ম্যাঞ্চেষ্টার—ব্যবসার একটা মস্ত কেন্দ্র। এলগিন্ মিল্‌স্, ম্যুর মিল্‌স্, কাণপুর কটন্ মিল্‌স্ প্রভৃতি গরম কাপড়-চোপড়ের মিল একেবারে অসংখ্য। তাছাড়া তাঁবু, সতরঞ্চ, চামড়ার কারখানাও প্রচুর। এখানকার নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ ট্যানারির নাম শোনেন্ নি, এমন বাঙালী নেই বললেও চলে! কাণপুরে স্কুল-কলেজও আছে অনেকগুলি—তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এগ্রিকালচারাল কলেজ। গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব্ ডাই-ইং এণ্ড প্রিণ্টিং, গভর্ণমেণ্ট লেদার ওয়ার্কিং স্কুল, আর গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব টেক্‌স্‌-টাইল্‌স্। মৌলাগঞ্জে বড় রাস্তার উপর কয়েকটি সিনেমা হাউস দেখলুম—ছুটি কলকাতার ম্যাডান কোম্পানির।

এ সব দেখিয়ে গাইড আমাদের নিয়ে গেল, জৈন' মন্দির দেখাতে। খুব সরু গলির মধ্যে মন্দির। কোনো গাড়ী মন্দির-দ্বার অবধি আসতে পারে না। মন্দিরের গলিটি নোংরাও খুব! গলি নোংরা হলেও মন্দিরটি খাশা। বাগান-বাড়ীর মত সাজানো ছোট-খাট বাড়ীখানি—কাঁচের ঘর, কাঁচের থাম,—কতকটা এখানকার পরেশনাথের মন্দিরের মতই দেখতে! তবে এর চেয়ে ঢের ছোট। এর পকেট-সংস্করণ বলা চলে! বাগানে শ্বেত-পাথরের পুতুল, প্রতিমূর্ত্তি—দেখে তৃপ্তি হলো। তার পর দেখবার বস্তু ম্যাসাকার ঘাট—সিপাহী-বিদ্রোহের স্মৃতিতে ভরপুর। মেমোরিয়ল চার্চ্চের সোজাসুজি আর্টিলারী লাইন্‌সের অদূরে গঙ্গার তীরে এই ম্যাসাকার ঘাট। ঘাটের কাছে এক বিচিত্র গড়নের মন্দির আছে। মন্দিরটি পুরাণো—ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে! মন্দিরের সিঁড়ি নদীর দিকে। এখানে একটি ক্রশ্ চিহ্ন আছে, তাতে লেখা আছে, In Memorium 1857.

ঙ্গার ধারে এক চক্র ঘুরে আমরা ম্যাকেঞ্জি পানির দোকানে এলুম, পেট্রোল কিনতে। দু'খানি তে ন'টিন পেট্রোল আর দু'টিন বি-মোবিল অয়েল য়া হলো। পেট্রোলের টিনের দাম পড়লো ৩।৵০ , আর মোবিল-অয়েলের টিনের দাম ৫৻০। ীতে পেট্রোল ভরে পাঁওরুটী, মাখন আর কিছু কিনে আমরা আবার গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে ুম।

সহর তখন দোকান-পাট খুলে সজীব হয়ে উঠেচে! কাণপুরে পাঁচটি রেলোয়ে লাইন এসে মিশেচে—ইষ্ট ণ্ডিয়ান, জি-আই-পি, আউদ্-রোহিলখণ্ড রেল, বম্বে-রোদা এ্যাণ্ড সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া, আর বেঙ্গল-নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ ল। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের পাশ দিয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড লেছে। এই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে বেলা ঠিক ন'টায় আমরা কাণপুর ছাড়লুম।

সহরের প্রান্তে গরীবের বস্তী। বস্তীর পিছনে বড় ড় গাছপালা-ভরা অনিবিড় বনভূমি। বস্তীর চাল ড়ে কুণ্ডলাকৃতি ধোঁয়া উঠেচে—রৌদ্র-মাখা ধোঁয়ার ং নীলাভ। বস্তীর মধ্যে সজীব প্রাণের চপল কলরব! দু'পাশে বস্তী রেখে আমরা পথের পথিক সামনের পথে অগ্রসর হয়ে চললুম।

কাণপুরের ৭.৮ মাইল পরে কল্যাণপুর; বাঁয়ে রেল-ষ্টেশন। এই কল্যাণপুর থেকে একটা পথ ডাইনে বেঁকে গেছে। এই বাঁকা পথে বিঠুর। বিঠুর হলো নানা সাহেবের জন্মভূমি। তাছাড়া বিঠুর হিন্দুর তীর্থ। এই বিঠুরে নাকি প্রাচীন যুগে ব্রহ্মা অশ্বমেধ-যজ্ঞ করে-ছিলেন। তার উপর এই বিঠুরেই বাল্মীকির আশ্রম ছিল, শুনলুম; এবং এই বিঠুরের আশ্রমে নাকি লব-কুশের জন্ম হয়। কল্যাণপুর থেকে বিঠুর যাবার জন্য ছোট একটি রেলের লাইন আছে।

মহিলারা বাল্মীকির আশ্রম দেখবার জন্য লালায়িত হলেন। কিন্তু আমরা বাঁকা পথে যাবো না, স্থির-সঙ্কল্প ছিল, কাজেই সে কথায় বিচলিত না হয়ে সোজা গাড়ি বাহাল রাখলুম।

এ পথেও প্রচুর ময়ূরের দেখা মিলতে লাগলো। পথের ধারে কোথাও বন, কোথাও বা মাঠ,—আবার কোথাও মাঠের পরে—ছোট-খাট গ্রাম মাথা তুলে জেগে ওঠে! এ-সব গ্রামে মুসলমানের বসতি বেশী। রেলোয়ে লাইনকে বাঁয়ে রেখেই আমরা বরাবর চলেছিলুম। পথে চলন্ত ট্রেণের সঙ্গে দেখা মিলছিল; মাঝে মাঝে ষ্টেশন। ষ্টেশনে লোক-জনের কোলাহল এক-একটি ঝাপটার মত চোখের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল!

১০৫ মাইল-পোষ্টের কাছে শিউরাজপুর। শিউরাজ-পুরের ডাক-বাংলা পার হবামাত্র পথের দুধারে দু'খানি প্রকাণ্ড কাষ্ঠ-ফলক নজর পড়লো। তাতে লেখা আছে Caution, Dangerous for Motorists.

একটু সতর্ক হয়ে গাড়ী চালিয়ে ১০২ মাইল-পোষ্টে বিলহৌরে এক পুল পেলুম। সরু পুল—অবস্থা জীর্ণ-গোছের। পুলের নীচে নদী—নদীর নাম ঈশান এই পুলের উপর দিয়ে রেলগাড়ী, গোরুর গাড়ী লোক-জন সবই পার হয়। ধনুকের মত বাঁকা প দিয়ে এসে পুলে উঠলুম। পুল পার হয়ে আব চওড়া পথের দর্শন মিললো। এর পাঁচ মাইল প পেলুম অরৌল। অরৌল থেকে তিন মাইল দূ মাখনপুর; মাখনপুরে শ্রীপঞ্চমীর সময় মস্ত মেলা বসে লোকের ভিড়ও খুব জমে।

এর পরে দেখি, মাইল-পোষ্টের সংখ্যা আব বাড়লো। ১৭২ মাইলে এক তে-মাথা মোড়। সেখ কাষ্ঠ-ফলকে লেখা আছে, ডাহিনে কনৌজ। এ ... কনৌজ···বাঙালী নাট্যকারের দল যেখান থেকে তাঁদের নাটকে আর গীতিনাট্যে হুড়হুড় করে রাজা, রাণী, রাজকন্যা এবং সখীদের আমদানি করে কলকাতার ষ্টেজে নামান? শুনলুম, হাঁ, সেই কনৌজই বটে! কনৌজ একদিন হিন্দুর সমৃদ্ধি-ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত ছিল। তে-মাথা থেকে কনৌজ দেড়-মাইল দূর। গাড়ী থামিয়ে পথের পানে তাকিয়ে রইলুম। অদূরে ক্ষেত আর অনিবিড় বনভূমির অন্তরাল দিয়ে প্রাচীন হর্ম্ম্যরাজির কিছু কিছু ধ্বংসচিহ্ন চোখে পড়ছিল। শুনলুম, রাজা অজয়পালের প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, আর মুসলমানী আমলের জুমা মসজিদ,—এই দুটি মাত্র ওখানে দেখবার জিনিষ আছে। কনৌজের গোলাপ-জল আর আতরের খ্যাতিও বেশ আছে। বেলা বাড়ছিল বলে আমরা পথ থেকে কনৌজের উদ্দেশে নতি জানিয়ে সোজা চললুম।

১৮৫ মাইল-পোষ্টের কাছে রেলোয়ে-লাইন পার হ জন-বহুল এক গ্রামে প্রবেশ করলুম। তার পর আ এক মাইল পার হয়ে গুর-শাহীগঞ্জ পেলুম। এখা পথ ত্রিধা-ভিন্ন হয়েছে। এই ত্রিধা-ভিন্ন পথের মা গাছপালার ছায়ায় হরিদ্রাবর্ণের একখানি চমৎক বাংলা। ফ্লোরের উপর ছায়া-শ্যামল বাংলাখা ফটকের সামনে এসে দেখি, এটি ডাক-বাংলা। তখন সাড়ে বারোটা বাজে। স্নানাহার করতে হবে! কাজেই এই ডাক-বাংলায় আমরা নামলুম। চৌকিদার বাংলার ঘর খুলে দিলে! দিব্যি প্রশস্ত সব কামরা—চেয়ার, টেবিল, টানাপাখা, ইজি চেয়ারে সাজানো। তিনটি বাথ-রুম আছে। ভিস্তিকে ডাকিয়ে বাথ-রুমে জল তোলানো হলো। মহিলারা ষ্টোভ জ্বেলে রন্ধনের উদ্যোগ করলেন। তার পর স্নানাদি সেরে যথাসময়ে আহার সুসম্পন্ন করলুম। আহারাদি সেরে কয়েক

বিশ্রাম-অন্তে বেলা ৪-৫ মিনিটে আবার যাত্রা সুরু হলো।

এই গুর-শাহীগঞ্জ থেকে এক পথ ফতেগড়-ফরাক্কাবাদ মহম্মদাবাদ হয়ে বেওয়ারে গেছে; আর-এক পথ সোজা গেছে বেওয়ার। বেওয়ার হয়ে আগ্রা যেতে হয়। প্রথম পথটি দিয়ে গেলে বেওয়ার পঞ্চাশ মাইলের উপর পড়ে, দ্বিতীয় পথে ত্রিশ মাইল মাত্র। আমরা এই দ্বিতীয় পথ গ্রহণ করলুম। এ পথে কতকগুলি সমৃদ্ধ গ্রাম আছে। তার মধ্যে সাজাহানপুর, শিবরামৌ, মহীগঞ্জ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বেওয়ারের পথ সরু; গলি-ঘুঁজির অন্ত নেই। নোংরা বাড়ীর সংখ্যাই বেশী। বেওয়ারের পর ভনগাঁও। ভনগাঁও মস্ত জংশন। এখান থেকে সিধে পথ করৌলী হয়ে এটায় গেছে; বাঁয়ের পথ গেছে মৈনপুরী হয়ে আগ্রা। ভনগাঁও থেকে আগ্রা পঁচাত্তর মাইল। এই বাঁয়ের পথ ধরে বিশ মাইল এসে আমরা মৈনপুরী পৌছুলুম! মৈনপুরী এ অঞ্চলে মস্ত সহর।

যখন মৈনপুরী পৌছুলুম, বেলা তখন পড়ে এসেচে। এ পথের আশেপাশে ফৌজের বিস্তর ছাউনি পড়েচে, দেখলুম। পথ বেশ চওড়া, আর তার level চমৎকার। মৈনপুরীর পর কল্পুর, ঘিবর পার হয়ে বত্রিশ মাইল পরে শিকোয়াবাদ। শিকোয়াবাদ থেকে ডাহিনের পথ গেছে এটায়; বাঁয়ের পথ একেবারে যমুনা-বক্ষে। এখানে বহু পথ। এত শাখা-প্রশাখা মিলে একসঙ্গে মিশে রয়েছে যে খুব হুঁসিয়ার হয়ে অগ্রসর হওয়া দরকার।

গাড়ীর সার্চ্চ লাটটের সাহায্যে টুণ্ডলার পথ ঠিক করে নিয়ে আমরা সবেগে গাড়ী ছাড়লুম। পথে একটিমাত্র বড় সহর ফিরোজাবাদের দর্শন মিললো; তার পর বিশ মাইল পরে টুণ্ডলা। অদূরে অন্ধকারের মধ্যে একটা জায়গায় তীব্র আলোর হল্কা দেখে বুঝে নিলুম, ঐটে টুণ্ডলা। সহরে ঢুকতে হলো না। আমাদের পথ ছিল সহরের গা ঘেঁষে প্রান্তর বয়ে। সেই প্রান্তর-পথে গাড়ী ছুটিয়ে চললুম। খানিক এসে জল-শীতল হাওয়ার পরশ গায়ে লাগলো। দুধারে মাটীর উঁচু ঢিপি—গাছ-পালার চিহ্ন নাই। গাড়ীর আলোয় মনে হচ্ছিল, যেন বালুময় 'মরু' প্রান্তরের বুক বয়ে চলেছি! টুণ্ডলার একটু আগেই ইৎমদ্দৌলা। নুরজাহান বেগমের বাপ গিয়াস বেগের সমাধি-মন্দির এই ইৎমদ্দৌলা,—দেখবার জিনিস। এই গিয়াস বেগ হলেন আবার তাজমহলের প্রাণ মমতাজ-বেগমের মাতামহ। ১৬২১ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর যাবার পথে কাংরায় গিয়াস বেগের মৃত্যু হয়; এই ইৎমদ্দৌলায় তাঁর দেহ এনে সমাহিত করা হয়।

ইৎমদ্দৌলার গড়নের কাজেই সর্ব্ব-প্রথম ইতালীয় শিল্পীর হাত পড়ে। সূক্ষ্ম কারিগরিতে ভারতীয় শিল্প-প্রতিভার রচা তাজমহলের গড়নেও এই ইৎমদ্দৌলার আদর্শ কতক নেওয়া হয়েচে। আমরা বিস্ফারিত চোখে চারিদিকে চেয়ে দেখছিলুম, ইৎমদ্দৌলার কোনো চিহ্ন যদি চোখে পড়ে!...পড়লো না। আঁধারের মধ্য দিয়ে ইৎমদ্দৌলা পার হয়ে এসে হঠাৎ নজরে পড়লো, জনহীন প্রান্তর—পাশে বড় বড় অট্টালিকা আর প্রাসাদ-ভবনের ভগ্নাবশেষ। এখনো অতিকায় দেহে সে ধ্বংস-স্তূপ বিদ্যমান দেখে মন অশ্রুর বাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে এলো। একদিন ঐ সব প্রাসাদ-নিকেতনে রোশ্‌নির জলুশে কি সমারোহই না ফুটে উঠতো! কত তরুণী নর্ত্তকীর চপল চরণের নূপুর-নিক্কণে, কত আমীর ওমরাওয়ের বুক দুলতো, তাদের গানের সুরে বুকে কত রকমের তরঙ্গ উঠতো, কত লোকের কত সাধ-আশা কত নৈরাশ্যের গান ঝরে পড়তো! এখানে কত রাজ্য-লিপ্সু শাহজাদার কানে বিশ্বাসঘাতক নফরের দল কত বিষ উগরে দেছে! কত গুপ্ত হত্যার গভীর ষড়যন্ত্রই না চলেছে একদিন! আজ পাথর বুকে মহাশ্মশানের কালিমা মেখে নিশ্চল জড় দাঁড়িয়ে আছে! এই সব ধ্বংস-স্তূপের মধ্য দিয়ে এসে যমুনার পুলে গাড়ী উঠলো। গাড়ীর হুড্ নামানো ছিল। চারিদিকে তাকাতে লাগলুম, কোথায় সে স্বপ্ন-স্মৃতির হারে গাঁথা তাজ-মহল! আমাদের শৈশবের স্বপ্ন, কৈশোরের কল্পনা, তাজ-মহল!...নদী বেঁকে গেছে, কাজেই নির্ম্মল আকাশ-পটে সাদা রেখায় তার আভাসও দেখা গেল না!

পুল পার হয়ে গাড়ী এসে থামলো আগ্রা ফোর্ট রেলওয়ে ষ্টেশনের সামনে। ডাহিনে ষ্টেশন, বাঁয়ে আগ্রার দুর্গ! মোগল ঐশ্বর্য্যের কত কাহিনীই ওর বুকের পাঁজরায়-পাঁজরায় জড়ানো আছে! ইতিহাসের মৌন মূক এক বিরাট ছায়ার মত নিশীথে অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়ে! ওর বিশাল ফটক দিয়ে হাতী-ঘোড়ার কত মিছিল বার হতো—ভিতরে সানাই-নহবতের রাগিণীর ফাঁকে-ফাঁকে কত হাসি, আনন্দের কত মালা দুলে-দুলে উঠতো!

য—এর পূর্ব্বে আগ্রায় এসেছিলেন। তিনি নেমে আগ্রা ফোর্ট ষ্টেশন থেকে লোক নিয়ে রাতের আস্তানার সন্ধান করলেন। এখানকার এম্প্রেশ হোটেলে বন্দোবস্ত ভালো শুনে আমরা একেবারে সেখানে গিয়ে উঠলুম। রাত্রিবাসের জন্য কখানি ঘর নেওয়া হলো। ঘরগুলি বেশ সজ্জিত, প্রত্যেক ঘরের সঙ্গে বাথ-রুম। ঘরে বাথ-রুমে ইলেকৃটিক আলো-পাখা; বন্দোবস্ত পাকা রকমের। রাত্রে স্নানাহার সেরে আরামে শুয়ে পড়া গেল।

সকালে একজন রজক ডাকানো হলো। তাকে কাপড়-চোপড় কাচতে দিলুম। বেলা তিনটে াদ সমস্ত ধোপ্‌দোস্ত ফেরৎ দেবে। ওখানকার টেল-ওয়ালা এক জুড়ি ক্রহাম ঠিক করে রেখেছিল; পানান্তে সেই গাড়ীতে চড়ে আমরা সকলে আগ্রা র্টে চললুম। মোটর-গাড়ী দুখানি ধুয়ে মুছে ইতি-ধ্য সাফ করাবার ব্যবস্থা হলো।

আগ্রা দুর্গ! মোগলের লীলা-নিকেতন, বাদশাহীর ত্তি-মন্দির। গাড়ী থেকে নেমে ফটকে দু'আনা করে র্নী দিয়ে প্রবেশ-পত্র পেলুম। প্রবেশ-পত্র পেয়ে াতী-পুল পার হয়ে ফটকে ঢুকে একটু এগিয়ে দেখি, াইনে খোলা ময়দানের মত একটা জায়গা। সেখানে কাণ্ড এক পাথরের টব। গাইডের কাছে শুনলুম, টি জাহাঙ্গীর বাদশার স্নানের হৌজ। টবটি মানুষ-ভার উঁচু। এই টবের পিছনে জাহাঙ্গীর-মহল—হিন্দু াপত্য-কলার বিচিত্র তুলির লেখায় পরম রমণীয়; প্রকাণ্ড মহল। ভিতরে গিয়ে দেখি, সামনে মস্ত উঠান, —চারিধারে দোতলা চক্‌-মিলানো ঘর-দ্বার। এক তলায় বেগম যোধাবাইয়ের পূজার ঘর। তাছাড়া বেগমদের নিয়ে বাদশারা লুকোচুরি খেলতেন, সে গোলক-ধাঁধা ঘর-দালানও পড়ে আছে। স্তব্ধ জনহীন মহল··· একদিন অলঙ্কার-শিঞ্জনে, তরুণীর কল-কোলাহলে, প্রহরীর অস্ত্র-ঝঞ্জনায় কি মুখরিতই থাকতো! এই মহলের যে-অংশ যমুনার দিকে, সে দিকটায় অল্প ভাঙ্গন ধরেচে।

জাহাঙ্গীর-মহল দেখে আমরা বাদশাহী খাশমহলে এলুম। শ্বেত-পাথরে তৈরী মহল। এ অংশে শাহজাহান বাদশার সৌখীনতার পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিল্প-রুচি, আর কল্পনার পরিচয়ও বড় অল্পে ফোটেনি! তিনি যে একজন man of great idea and imagination ছিলেন, তা তাজ-মহলের কথা ছেড়ে দিয়ে এই আগ্রা দুর্গের মধ্যে তাঁর মহল দেখলেও বেশ বোঝা যায়।

এই মহলে এসে প্রথমটা কেমন অভিভূত হয়ে পড়লুম! এত সুন্দর! এমন চমৎকার! কবির কাব্য যেন চোখের সামনে ফুটে উঠলো! রূপ-কথার মত সে বাদশাহী ঐশ্বর্য্য, বাদশাহী জাঁক-জমকের আভাস এখনো এই পরিত্যক্ত মহলে স্বপ্ন-সুষমার মত জেগে আছে! এই মহলের খুঁটিনাটী বর্ণনা দিতে গেলে একখানি আলাদা বই লিখতে হয়। পাথরের উপর নক্সার কাজ, আঙ্গুরী-বাগ প্রভৃতির মনোহারিত্ব চোখে দেখে সে সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার বস্তু। এ মহলে দেখবার আছে মচ্ছি-ভবন, বাদশাহী হামাম, শীষমহল, মতি-মসজিদ, আঙ্গুরীবাগ, চামেলি-মহল প্রভৃতি। তা ······ যমুনা-স্নানে যাবার গুপ্ত পথ, বাঁদী ও দুষ্টা বেগমদের বন্দী করে রাখবার জন্য ফ্লোরের নীচে কারা-কক্ষ—এ-সবও দেখবার জিনিষ। সব চেয়ে চমৎকার চামেলি-মহলের বারান্দা থেকে দূরে তাজ-দৃশ্য···সে যেন স্বপ্নের মত জেগে আছে! যমুনা বেঁকে গেছে আর সেই বাঁকের মুখে দূরে তাজ-মহল!

আগ্রার এই দুর্গ আকবরের তৈরী। শাহজাহান সে দুর্গ আরো বাড়িয়ে তাকে আরো রমণীয় শ্রীতে মণ্ডিত করে তোলেন। গাইড দেখালে সেই জায়গা, যেখানে বসে বন্দী শাহজাহান তাজমহল দর্শন করতেন, —যে জায়গায় পুত্রের নির্ম্মমতায় বাদশার অন্তিম নিশ্বাস বুক ফেটে বেরিয়ে বাতাসে মিশে যায়! দেখে আমাদের বুক বেদনায় ভরে উঠলো!

এই রঙ্‌মহলের সর্ব্বপ্রথম মহল হলো দেওয়ান-ই-আম। এখানে সাধারণ লোকের প্রবেশাধিকার ছিল। রাজ্যের সাধারণ কাজ-কর্ম্ম এই ঘরেই সম্পন্ন হতো, সাধারণ প্রজারাও এখানে দরবার করতে আসতো। এর তিন দিকে ছিল প্রজাদের অর্থাৎ সাধারণের বসবার জায়গা, আর মর্ম্মর-চত্বরের উপর বাদশাহী তখ্‌ত্‌ থাক্‌তো। বিচার করবার সময় সম্রাট আকবর তখ্‌তের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন। দেওয়ান-ই-আমের দুদিকে পথ; সেই পথের অন্তরালে বসে বাদশাহী-মহলের মহিলারা দরবারের কাজ-কর্ম্ম দেখতেন। তখ্‌তের পিছনে দ্বার-পথ। এই দ্বার-পথে বাদশা আর তাঁর অতি-বিশ্বস্ত অনুচরবর্গ অন্দরে মচ্ছিভবনের অভিমুখে যেতেন। মচ্ছিভবন ছিল সেকালে প্রকাণ্ড জলাধার; তাতে মাছ ভাসতো অসংখ্য; এবং উপরের বারান্দায় বসে বাদশারা মাছ ধরবার সখ মেটাতেন। এর পরই দেওয়ান-ই-খাশ। দেওয়ানী-ই-খাশের সামনে ফারশী হরফে লেখা আছে।

শা-আদৎ সরাই ওয়া হুমায়ুন আশাস্‌ অর্থাৎ আনন্দ-নিবাস ও মঙ্গল-নিকেতন।

দেওয়ান-ই-খাশ গৃহটি আকারে ছোট; দু'খানি হল; তবে গৃহের দেওয়ালে চিত্র-বিচিত্র-করা অপরূপ সজ্জা; গড়ন হিন্দু প্রথার। আগাগোড়া শ্বেত মর্ম্মরে রচা; থাম আর দেওয়াল মণি-রত্ন-খচিত।

দেওয়ান-ই-খাশের পরই এক প্রকাণ্ড খোলা ছাদ। শীষ্‌মহলের ঠিক ওপারেই। ফারশী হরফে সাল তারিখ খোদা আছে, ১০৪৬, অর্থাৎ ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দ। আর লেখা আছে, দেওয়ান-ই-খাস তৈরী করান্‌ বাদশা শাহ জাহান। খোলা ছাদের দুই প্রান্তে দুখানি মর্ম্মর আসন। একখানি শ্বেত মর্ম্মরের, অপরখানি কালো পাথরের। কালো আসনখানিতে ফাটা দাগ—জাঠ-বিদ্রোহের সময় ভরতপুরের রাজা জোয়াহির সিংহের বর্ব্বর রুচিহীনতার পরিচয় দিচ্ছে। শিল্পকলার সুকুমার শ্রী এমনি করেই অস্ত্রের ফলায় ছিঁড়তে হয়! কালো

আসনে ফারসী হরফে কি সব লেখা আছে, তার অর্থ,—সেলিম যখন সিংহাসনে বসলেন, নাম বদলে নূতন নাম নিলেন জাহাঙ্গীর। তাঁর তীক্ষ্ণ বিচারশক্তির জন্ম তাঁকে নুরুদ্দিন বলা হতো। তাঁর তরবারির আঘাতে বহু শত্রুর শির দ্বিখণ্ডিত হয়েছে।

এই ছাদের বহু নীচে অলিন্দে হাতী-ঘোড়ার নানা রকম ক্রীড়া ও মল্লযুদ্ধ দেখানো হতো। এর কাছে পাথরের ঘর-কাটা পঁচিশী অর্থাৎ বাদশাহ আকবরের দশ-পঁচিশখেলার ছক্। প্রকাণ্ড ছক্। বাঁদী আর বেগমদের ঘুঁটি করে বাদশা এখানে দশ-পঁচিশ খেলতেন।

দেওয়ান-ই-খাশের নীচে এবং পঁচিশীর পাশে শমন বুরুজ। ফারসী মশমন থেকে শমনের উৎপত্তি। মশমনের অর্থ অষ্ট-কোণ। এই গৃহের অপর নাম চামেলি মহল, ইংরাজ নাম দেছে যেশোমিন টাওয়ার।

শমন বুরুজে মস্ত চারটে হল, প্রকাণ্ড তোরণ, এবং কতকগুলি ঘর আছে। এ মহাল বাদশা জাহাঙ্গীর তৈরী করান—বেগম নূরজাহানের বাসের জন্য। লাল পাথরের সঙ্গে সাদা মার্বেল পাথর—দেওয়ালের থামে ফুল-লতা-পাতা আঁকা বিচিত্র বাহার ফ্লোরেনটিন মোজেকের কাজ। একেবারে অপরূপ শোভায় আজো ফুটে আছে!

শমন বুরুজের পর খাশমহল আর আঙ্গুরী-বাগ। এ মহল বাদশা শাহজাহানের তৈরী। বেগম মমতাজ মহল বা আর্জামন্দ বাণু বেগমের বাসের জন্য এ মহল তৈরী হয়। প্রকাণ্ড কামরা; আশেপাশে ছোট ছোট আরো কখানি কামরা, হামাম,—খাশমহলের বাহিরে প্রকাণ্ড জলাধার, নীচে আঙ্গুরী-বাগ। এই খাশমহল থেকে দূরে তাজমহলের দৃশ্যটুকু অপূর্ব্ব। আঙ্গুরী-বাগের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে শীষমহল। শীষমহলের অর্থ আয়নার ঘর। আঙ্গুরী-বাগ থেকে মর্ম্মর-রচিত দ্বার-পথে শীষ্‌মহলে আসতে হয়। থামে দেওয়ালে মণিরত্ন আর আয়না এমন সাজানো যে তাতে হাজার প্রতিবিম্ব পড়ে ঝক্‌মক্ করে ওঠে! ছোট দীপের রশ্মি হাজার মূর্ত্তিতে ফেটে ঠিক্‌রে পড়ে! এইটিই ছিল বাদশাহী হামাম। এটি তৈরী করান বাদশা জাহাঙ্গীর।

খাশমহলের দুদিকে যমুনা-মুখী দুই মহল। এর একটি ছিল জাহানারার, অপরটি রোশিনারার।

বাদশাহ শাহজাহানের খাশ-কামরায় এখন আগ্রার আর্কিওলজিকাল সোসাইটির অফিস। এখানে প্রকাণ্ড এক ফটক খাড়া আছে—১২ফুট উঁচু, ক্ষোদাইয়ের কাজ-করা ফ্রেমে আঁটা। শুনলুম, এই ফটক সোমনাথ মন্দিরের সেই প্রসিদ্ধ ফটক।

এই অফিসের উত্তর-পশ্চিমে ছোট একটি মসজিদ আছে, নাম নাগিনা মসজিদ। বাদশাহী মহলের মহিলাদের উপাসনার জন্য বাদশা ঔরংজীব এ মসজিদ তৈরী করান্। নাগিনা মসজিদের নীচে বাজার বসতো। সদাগরেরা অন্তঃপুরিকাদের কাছে বিবিধ পণ্য দেখাতেন, এইখানে তাঁদের মালপত্র এনে। এর পরই মোতি মসজিদ। প্রকাণ্ড মসজিদ—মাথায় তিনটি চূড়া, তা ছাড়া ছোট ছোট চূড়া অনেকগুলি। মসজিদটি আগাগোড়া শ্বেতপাথরে তৈরী। সাধু-ফকিরদের আস্তানার জন্য অসংখ্য কামরা আছে। এ মসজিদ তৈরী করান বাদশাহ শাহজাহান। ছশো লোক এ মসজিদে বসে অনায়াসে উপাসনা করতে পারেন। এর সৌন্দর্য্যে অভিভূত হয়ে এক য়ুরোপীয় পর্য্যটক বলে গেছেন, one of the purest and most elegant buildings of its class to be found anywhere.—

মতি মসজিদের কাছেই খানিকটা খোলা জায়গা। এইখানে সেই প্রসিদ্ধ মীনা-বাজার—যেখানে সুন্দরীর মেলা বসতো।

খাশ মহলের সামনে সোপানশ্রেণী নেমে গেছে বহু নীচে,—গোলকধাঁধার মত নীচে কত ঘর। এগুলির নাম বাউলি বা গ্রীষ্মাবাস। বাদশাজাদী আর বেগমদের শয়ন-কক্ষে আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করলুম,—দেওয়ালের মাঝে মাঝে ছোট ছোট গহ্বর; মেয়েদের একখানি ছোট হাত মাত্র সে গহ্বরে প্রবেশ করতে পারে—শুনলুম, এই গহ্বরগুলিতে তাঁরা টাকা-কড়ি ও গহনা-পত্র রাখতেন।

জাহাঙ্গীর মহলের দক্ষিণে আকবর মহল। এ মহলের অবস্থা অপেক্ষাকৃত জীর্ণ।

দুর্গের বাহিরে সুবিখ্যাত জুমা মসজিদ। সম্রাট শাহজাহানের কন্যা জাহানারা বেগম সাধারণের উপাসনার জন্য পাঁচ লক্ষ-টাকা ব্যয়ে এই মসজিদ তৈরী করিয়ে দেন।

দুর্গ থেকে বেরিয়ে আগ্রা সহর, বাজার, সমস্ত দেখে হোটেলে ফিরে চটপট স্নানাহার সেরে নিলুম। ওদিকে আমাদের মোটর ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে তৈরী ছিল। খাওয়া-দওয়া চুকে গেলেই মোটরে চড়ে তাজ দেখতে বেরুলুম।

তাজ! মর্ম্মরে রচিত অশ্রু।
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোল-তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজ-মহল!

ক্ষণে ক্ষণে কেমন যেন চমক লাগ্‌ছিল! সত্যই চোখের সামনে তাজ দেখছি! না, এ স্বপ্ন দেখা চলেছে! তাজের পাথরের কাজ, থামের বাহার, কারিগরের আর্টের বাহাদুরী, এ-সব নিয়ে হিসেব খতিয়ে যিনি তার সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করতে বসবেন, তাঁকে আমি কৃপার

ধ দেখবো। এ কি পাথর মেপে তারিফ করার জিনিষ ? ্র দেখো ঐ সমগ্র ছবি, এ তো হাতে-গড়া সমাধি-সৌধ !

রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেচেন, এ যেন রূপহীন মরণেরে ্যহীন অপরূপ সাজে সাজিয়ে তোলা হয়েচে! প্রমের করুণ কোমলতা ফুটিল তা সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্জে শস্ত পাষাণে!" শ্রদ্ধায় চিত্ত ভরে উঠলো। মন ালে, এ তীর্থ, মহা-মানবের স্মৃতির তীর্থ, প্রেমের ীর্থ, সর্ব্বজাতির পূজার এ মন্দির, মসজিদ, চার্চ্চ! -গাইড বললে, তাজ তৈরী করতে কত কোটি-াটি টাকা খরচ হয়েছিল, জানেন ?

আমি তাকে ধমক দিয়ে বললুম—থামো তুমি! এ র্গে বসে টাকার নামও মুখে উচ্চারণ করো না!

ফটকের ভিতর ছাদের নীচে খানিকটা পোড়া দাগ, দখে বেদনা বোধ হলো। শুনলুম,এটি আদি তোরণ ছিল; াঠেরা লুঠ করে নিয়ে গেছে। শয়তান! এ মন্দিরের াছে হিন্দু নেই, মুসলমান নেই, খৃষ্টান নেই—এ ন্দিরের অপরূপ সৌন্দর্য্য যার অঙ্গুলিস্পর্শে এতটুকু ্লান কি নিষ্প্রভ হবে, সে মানুষ নয়, শয়তান! ঐ ফটক···ফটকের পর সিঁড়ি, তার নীচে বাগান—দু পাশে ঝাউয়ের কেয়ারি, মাঝখান দিয়ে জলের লহর বয়ে চলেছে। লহরের বুকে মস্ত জলাধারে পদ্ম-বন। রাশ-রাশ পদ্ম ফুটে আছে। তার পর আবার সিঁড়ি বয়ে উঠে সমাধি-মন্দির। দোতলায় সজ্জিত সমাধি সম্মূর্ণ—তার নীচে এক তলায় আসল কবর। তাজের সমাধি-লগ্ন চত্বরে ওঠবার সময় জুতা খোলবার ব্যবস্থা আছে। এ ব্যবস্থাটি খুব সমঞ্জস বলে মনে হলো!

সমাধি-গৃহে পুরুষানুক্রমে সমাধি-রক্ষকেরা সমাধি রক্ষা করচেন। এঁদের ঐ কাজ—বংশ-পরম্পরা-ক্রমে চলে আসছে। তাঁরা ধূপ-ধুনা জেলে দিলেন, কবর ছুঁয়ে ফুল দিলেন—সে ফুল মাথায় নিলুম।

তার পর সকলে সমাধি প্রদক্ষিণ করে নদীর ধারে এসে বসলুম। তাজের একদিকে মসজিদ,আর একদিকে জমায়েৎ-খানা। রবীন্দ্রনাথের কবিতার অমর ছত্র মনে জাগছিল,—

হে সম্রাট কবি
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত
অপূর্ব্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে···
··· ··· ···
তোমার সৌন্দর্য্য-দূত যুগ-যুগ ধরি
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্ত্তা নিয়া,—
ভুলি নাই ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া!'

হঠাৎ নজর পড়লো ও-পারে! লাল পাথরে গড়া কি ও? কতকগুলো মিনার? গাইড্ বললে,—ওপারে এই তাজের অনুরূপ আর একটি তাজ গড়বার বাসনা নিয়ে শাহজাহান বাদশা ওর গড়ন সুরু করান। এ তাজ শ্বেত পাথরের; ও তাজ হবে কালো পাথরের। এ তাজে প্রিয়তমার বিরাম,—ও তাজে দেহান্তে তিনি চির-বিরাম নেবেন,—আর এই দুই তাজকে যমুনার বুকের উপর দিয়ে ছুঁয়ে থাকবে এক রূপোর পুল! এই ছিল বাদশার সাধ।

শুনে দুই চক্ষু অশ্রু-সজল হয়ে এলো! কল্পনায় সেই কালো তাজের ছায়া ফুটে উঠলো বুকের মধ্যে··· তা যদি হতো!

হায় রে, জগতে কত স্বপ্নই এমনি আকাশ-কুসুমের মত ঝরে গেছে! মানুষের স্বপ্ন যদি সত্য হতো, তা হলে দুনিয়া থেকে হাহাকার-দুঃখও যে একদিন বিদায় নেবার পথ খুঁজে পেতো না!

তাজের পাশেই তাজগঞ্জ গ্রাম। এখানে পাথরের যত শিল্পি-কারিগরের বাস। এ গ্রামের পত্তন করান শাহজাহান্। পাথর সব আসে জয়পুর থেকেই বেশী।

তাজ থেকে ফিরতে মন চায় না—তবু ফিরতে হলো। এসে জিনিষপত্র গাড়ী বোঝাই করচি, এমন সময় হোটেলের এক ভৃত্য তাড়া দিতে লাগলো—পেট্রোল আনিয়ে দি সাব।

আমাদের আসা-ইস্তক লোকটা পেট্রোল আনিয়ে দেবার জন্য উৎসুক। কারণ বুঝলুম,—নিশ্চয় কমিশনের বন্দোবস্ত করে এসেচে। আমি বললুম, না, আমি পেট্রোল আনচি। বলে কাছাকাছি পাঁচ-সাতটা দোকানে গিয়ে দেখি, সব এক-দর, এবং দর বেশ চড়া। শেষে খানিকদূরে এক দোকানে ঢুকতে দর পেলুম, কিছু কম। অর্থ শুনলুম, হোটেলের লোকটা সকাল থেকে কাছের সব দোকানে বলে এসেচে,—কলকাতা থেকে বাঙালী বাবুরা এসেচেন; তাঁদের পেট্রোল চাই; তাঁদের পেট্রোল দেবে, আর আমায় দেবে কমিশন।···ওখানকার রামকুমার-মোহনলালের দোকান থেকে ১০টিন পেট্রোল নিলুম; দাম পড়লো টিন-পিছু ৩৸৹ করে। দুটিন মোবিল অয়েলও নেওয়া হলো; তার দাম পড়লো ১১৲ টাকা। হোটেলের ঘর-ভাড়া পড়লো ৮৲ টাকা; ইলেকট্রিক ফ্যান, আলো এবং স্নানের জল-খরচ-সমেত। মেথর আর ভিস্তীকে আলাদা কিছু বখশিস দেওয়া হলো। এদের বখশিসের আশা জানিয়ে রাখলে এরা হামে হাল হাজির থাকে—কাজে এতটুকু গাফিলি করে না, এই লাভ! ধোপার কাছ থেকে পোষাক-পরিচ্ছদ ধোপ-দোস্ত হয়ে এসেছিল, গুছিয়ে নিয়ে আমরা বেলা পাঁচটায় আগ্রা ছাড়লুম।

আগ্রা থেকে মথুরার পথে পাঁচ-ছ মাইল দূরে সেকান্দ্রা। সেকান্দ্রা ছোট গ্রাম। বাদশা আকবরের সমাধি আছে এই সেকান্দ্রায়। কেউ বলেন, সেকন্দর লোদির নামে গ্রামের নাম হয়েছে সেকেন্দ্রা; আবার কেউ বলেন, না, তা নয়, সেকন্দর-শা এ গ্রামের নাম দিয়ে গেছেন সেকন্দর!

যাক্, এ হলো প্রত্নতাত্ত্বিকের কথা। আগ্রা থেকে সেকান্দ্রায় আসতে পথে দেখে এলুম আকবরের তৈরী গির্জ্জা আর মার্ব্বেলের কারখানা। তা ছাড়া দেখবার জিনিষ আছে, গুরু-কা-টল। লাল পাথরে বাঁধা প্রকাণ্ড জলাশয়, পূবদিকে বেগম মরিয়মের সমাধি। অর্থাৎ মেরি ছিলেন বাদশা আকবরের খৃষ্টান-পত্নী। এ ছাড়া সেকন্দর লোদির সমাধি, ভুরি খাঁর মসজিদ, কালান্ মসজিদও দেখবার বস্তু।

সেকান্দ্রা ছিল আকবরের বিশ্রাম-কুঞ্জ। সমাধি-মন্দিরটি আকবর নিজেই তৈরী করান। মৃত্যু হলে তাঁর দেহ এইখানে সমাধিস্থ করা হয়। আগ্রা থেকে সেকান্দ্রা হয়ে মথুরার যে পথ, সেই পথেই মোগল বাদশারা সেকালে লাহোরে কাশ্মীরে যেতেন। আগ্রা থেকে ২৩ মাইল দূরে ফতেপুর শিক্রি—সম্পূর্ণ আলাদা পথে। কাজেই এ-যাত্রা ফতেপুর শিক্রি দেখা হলো না; আমরা মথুরার পথ ধরে দিল্লীর দিকে যাত্রা করলুম। আগ্রা থেকে মথুরা ৩৬ মাইল, দিল্লী ১২৫ মাইল।

আগ্রা ছেড়ে পথে বিশেষ কিছু দেখলুম না—ধূলার মাত্রাধিক্য ছাড়া। গাড়ী খুব জোরে চালিয়ে দেওয়া হলো। কারণ, সন্ধ্যার মধ্যে মথুরায় না পৌঁছুলে মথুরার কিছুই দেখা হবে না।

কিন্তু মথুরা দেখে নিরাশ হতে হলো। মথুরা-দিল্লী রোড গেছে মথুরা ক্যান্টনমেন্টের মধ্য দিয়ে।

মথুরা মস্ত জেলা। সমস্ত জেলাটার নাম ব্রজমণ্ডল। মথুরায় বৌদ্ধ অধিকারের চিহ্নই বেশী; প্রচুর বৌদ্ধস্তূপ। তা ছাড়া পুরানো মন্দিরেও বৌদ্ধ কালের জৈন প্রভাবটুকুই বেশী নজরে পড়ে! ঔরংজীবের আমলের এক পুরানো মসজিদ আছে—জুমা মসজিদ; তার ঠিক পাশেই ভূতেশ্বরের মন্দির। পুরানো কেল্লার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রাজা জয়সিংহের মান-মন্দিরের ধ্বংস-স্তূপ আছে। মথুরার কাছাকাছি দেখবার জায়গা হলো গোকুল, মহাবন, বলদেও।

মহম্মদ গজনী আর সেকন্দর লোদি মথুরার যত মন্দির-মঠ ভেঙ্গে অমানুষিক কাণ্ড করে গেছলেন। গোকুল অর্থাৎ নন্দালয়। মহাবন,—ইষ্টকস্তূপ আর কর্দ্দমের মস্ত ঢিপি। দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০ বিঘা। এর একটু কাছে পুরানো কেল্লার ধ্বংসাবশেষ। বলদেওয়ের আর এক নাম দাউজী। এখানে এক মন্দির আছে—সঙ্গে বাঁধানো মস্ত এক দীঘি; দীঘির নাম ক্ষীর-সাগর। ক্ষীরের সাদা রং নেই। কখনো ছিল বলে মনে হলো না! ক্ষীর-সাগরের জলের রং গাঢ় সবুজ। যাঁদের পুণ্যের সাধ কিছু বেশী, তাঁরা ওই সবুজ জলই পুরাকালের গোকুলের ক্ষীর বলে গণ্ডূষে পান করেন। মথুরার আট ক্রোশ পশ্চিমে গোবর্দ্ধন—যে গোবর্দ্ধন-গিরি শ্রীকৃষ্ণ ধারণ করেছিলেন! ছোট্ট সরু পাহাড়ের শ্রেণী বর্ত্তমান; নাম গিরি রাজ পাহাড়। এই পাহাড়ের কাছে মন্দির আছে, এবং কুণ্ডও আছে। কুণ্ডটির নাম মানসী গঙ্গা,—মথুরা থেকে ভিন্ন পথে বৃন্দাবন।

ক্রমে সন্ধ্যা চারিধার আঁধারে আচ্ছন্ন করে তুললে। দুধারে বন, আমরা মথুরা থেকে দিল্লী লক্ষ্য করে সবেগে সোজা পাড়ি দিলুম।

রাত প্রায় সাড়ে দশটায়—দিল্লীর প্রান্তে এলুম। ঠিক এগারোটায় দিল্লী ফটক দিয়ে ঢুকে ফৈজবাজার রোডে আমাদের আত্মীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে এসে পৌঁছুলুম। আগে থেকে খপর দেওয়া ছিল—কাজেই স্নানাহারের জন্য নিজেদের কিছুমাত্র আয়োজন করতে হলো না।

৫

৯ই সেপ্টেম্বর সকালে আমাদের প্রথম কাজ হলো, গাড়ী দু'খানিকে ওখানকার কোনো মোটরের কারখানায় পাঠিয়ে তাদের আগাগোড়া পরখ আর মেরামত করানো। কাশ্মীর গেটের কাছে ইষ্টার্ণ মোটর-কার কোম্পানির কারখানাই এ-কাজের জন্য যোগ্য মনে হওয়ায় সেইখানে গাড়ী পাঠানো হলো। তার পর আমরা দুখানি টঙ্গা ভাড়া করে দিল্লী-ফোর্ট দেখতে বেরুলুম।

এই দিল্লীই ছিল এককালে রাজা যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ। পরে ঐতিহাসিক যুগে রাজা অনঙ্গপাল যে রাজধানী তৈরী করান, সে দিল্লী হলো কুতব মিনারের কাছে। সে ১০২৫ খৃষ্টাব্দের কথা। অনঙ্গপালের রাজধানীর নাম ছিল লালকোট্। তার পর ১১৮০ খৃষ্টাব্দে পৃথ্বীরাজ আবার নূতন করে রাজধানী গড়েন অনঙ্গপালের সেই ধ্বংস-স্তূপের উপর। আজো তার চিহ্ন পড়ে আছে—এবং বেশ উজ্জ্বল সে চিহ্ন! পুরানো দুই দুর্গ এবং সেই স্তম্ভ হিন্দু আধিপত্যের বিজয়-নিশান আজো দিল্লীর বুক থেকে বিলুপ্ত হয় নি।

পাঠান আমলের প্রধান কেল্লা সিরি—আলাউদ্দিন তৈরী করান ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে। কুতব মিনার গড়েন এই আলাউদ্দিন খিলিজি হিন্দু মন্দির এবং হর্ম্যরাজি ভেঙ্গে, তার বুকের পাঁজরার উপর। তার পর টোগলক্ বংশের পালা। ফিরোজ শাহ টোগলকাবাদ নাম দিয়ে নূতন রাজধানীর পত্তন করলেন; তার পর লোদি-বংশ

।গ্য লাভ করে; সেকন্দর লোদি ও বেহলল্ দির দুই সমাধি দিল্লীর বুকে লোদি-বংশের প্রাধান্যের র মত পড়ে আছে, আজও!

পাঠান বাদশা শের শাহও দিল্লীতে আধিপত্য করে ছেন। তবে হুমায়ুনের হাতেই মোগল-দিল্লীর আসল ন সুরু হয়। তাঁর পরে আকবর দিল্লী থেকে আগ্রায় ধানী তুলে নিয়ে যান্। আকবর এবং জাহাঙ্গীর ল্লীর সৌষ্ঠব-সাধনে ততটা মনোনিবেশ করেন নি। ল্লীর শ্রী-সম্পাদনে মনোযোগী হন বাদশা শাহজাহান। ল্লীর দুর্গ তাঁর আমলেই তৈরী হয়। দুর্গটি লাল-ঙের বেলে পাথরে তৈরী (sand stone)—এ মহ-ার তখন নাম হয় শাহ-জাহানাবাদ। শত্রুর অস্ত্র দিল্লীকে চিরকাল বিপর্য্যস্ত করে এসেচে…এই দিল্লীতে পৃথ্বীরাজ পরাস্ত হন্ সাহাবুদ্দীন ঘোরীর হাতে; তার পর তৈমুর-লঙের আক্রমণ ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে; নাদির শাহের আক্রমণ ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে; এবং আফগান আহমদ শাহ দুরানির আক্রমণ ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে। নর-শোণিতে দিল্লী যেমন রঞ্জিত হয়েছিল, পৃথিবীর বুকে আর কোনো দেশের ভাগ্যে বোধ হয় তেমনটি ঘটেনি! সত্যেন্দ্রনাথ ঠিকই বলেচেন,—

…শোণিতের কণা
তোমারে ঘিরিয়া ঘুরিয়া নাচে!

যাক্—যে কথা বলছিলুম। দিল্লীর দুর্গে প্রবেশ করলুম;—যে ফটক দিয়ে প্রবেশ করলুম, তার নাম লাহোর গেট্। ফটক দিয়ে ঢুকে পথের দুধারে অনেক-গুলি কামরা দেখলুম। এ কামরাগুলিতে এখন বাইশিক্ল, জুতা, সোডা-লেমনেড এমনি নানা জিনিষের দোকান। সামনেই নহবৎখানা। বাদশাহী আমলে ঘোড়ায় চড়ে আমীর-ওমরাওয়ের দলের কেউ দুর্গে এলে তাঁদের ঘোড়া থেকে এখানে নামতে হতো। শুধু শাহজাদাদের সম্বন্ধেই এ নিয়ম খাটতো না; ঘোড়া থেকে তাঁদের আর নামতে হতো না।

ফটকের সামনে খিলান, তারি নীচের পথ পার হলে মস্ত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণ-সংলগ্ন পথের পূর্বদিকে দেওয়ান-ই-আম, এবং উত্তরে দেওয়ান-ই খাশ্। দেওয়ান-ই-খাশে তখত-ই-তাউস বা ময়ূর-সিংহাসন ছিল। তাতে বাদশা বসতেন—এর ছাদ ছিল রূপায় মোড়া। জাঠেরা সে রূপা খুলে নিয়ে গেছে। দেওয়ান-ই-খাশ্ শ্বেত পাথরে তৈরী; বারোটি সুন্দর থামের উপর ছাদ। এই দেওয়ান-ই-খাশের সামনের খিলানে ফারশী হরফে লেখা আছে,—

অগর ফিরদৌস্ বরুয়ে জমীনস্ত।
— — [illegible] ওস্ত জমীনস্ত।

স্বর্গ যদি কোথাও থাকে মর্ত্ত্যলোকের মাঝখানে
এই খানে সে, এইখানে গো, এইখানে, সে এইখানে।

এই দেওয়ান-ই-খাশের কামরায় বসে নাদির শাহ দিল্লী লুঠ করবার আদেশ দেন্! এইখানেই আহমদ শাহ দুরানি এসে নিজের জয়-বার্ত্তা ঘোষণা করেন, আর এই কামরাতেই রোহিলা গোলাম কাদের হতভাগ্য বাদশা শাহ আলমকে অন্ধ করে দেন। আর এই কামরায় বসেই বাদশা ফরকশিয়র ইংরাজ ডাক্তার গেব্রিয়েল হামিল্টনকে হুগলিতে কুঠি-স্থাপনার শনদ্ দেন্!

দেওয়ান-ই-খাশের দক্ষিণে রঙমহল—সম্রাজ্ঞীর বাস-গৃহ। তার দক্ষিণে মমতাজ-মহল। এই মহলে এখন দিল্লীর আর্কিয়োলজিকাল মিউজিয়ম স্থাপিত হয়েছে।

দেওয়ান-ই-খাশের উত্তরে বাদশাহী হামাম। হামামে তিনটি ঘর। তা ছাড়া মোতি-মসজিদ এর পাশে। মোতি-মসজিদ শ্বেত পাথরে তৈরী;—ছাদের উপর তিনটি গম্বুজ, তার উপর সোনার কলাই-করা কাজ। এ মসজিদটি তৈরী করান্ বাদশা ঔরংজীব—বাদশাহ ও বেগমদের উপাসনার জন্য। এই গৃহগুলির উত্তরে বাগান। বাগানের মধ্যে শাভন-আর ভাদুই নামে ছোট দুটি মহল—এ মহলে বসে বেগমদের নিয়ে বাদশারা বর্ষায় বারিধারার উৎসব-লীলা দেখতেন।

দুর্গের এক প্রান্তে যুদ্ধ-মিউজিয়ম—সম্পূর্ণ এ কালের। সেখানে গত জার্মাণ যুদ্ধের বহু স্মৃতি-চিহ্ন জড়ো করা আছে।

দুর্গ দেখা শেষ করে দিল্লীর পথে চক্র দিয়ে খানিক ঘোরা গেল। দিল্লী যেন ভারতবর্ষের ইতিহাস! নানা জাতির উত্থান-পতনের ধারা এই দিল্লী বয়ে চলে এসেচে, সে কোন্ অতীত অনাদি যুগ থেকে! সত্যেন্দ্র-নাথের দিল্লী-নামার কয় ছত্র কেবলি মনে পড়ছিল,—

অতুল! বিরাট! বিপুল দিল্লী!
শত-সম্রাট-প্রেয়সী অয়ি!
গজ-মোতি-গুঁড়া তব পথধূলা—
মোহিনী! রূপসী! মহিমময়ী!
… … … …
মোগল মরেছে, মরেছে পাঠান,
জেগে আছে তার কীর্ত্তি যত,
কেল্লা-কসর পাহাড়-সোসর
বুরুজ-মীনার সমুন্নত!
… … … …
অতীতের রাখী রক্তে রঙীন!
অতীত-সাক্ষী দিল্লী তুমি,
তুমি দশমহাবিদ্যা-রূপিণী,
শক্তির তুমি লীলার ভূমি!

দিল্লী সত্যই অতীতের সাক্ষী। তার অসংখ্য মসজিদ অসংখ্য সমাধি-স্তম্ভ—প্রাচীন সমৃদ্ধির কি কাহিনীই না বুকে নিয়ে আজ মৌন পাষাণ দাঁড়িয়ে আছে!

মসজিদগুলির মধ্যে প্রধান হলো জুমা মসজিদ—এটি ঔরংজীব তৈরী করান। মসজিদটি তৈরী হতে চৌদ্দ বৎসর সময় লেগেছিল। তার সুবিস্তীর্ণ সোপান-শ্রেণী দেখলে তাক্ লাগে! মসজিদের উপর ফারসী হরফে লেখা আছে,—ইয়া হাদি! অর্থাৎ হে গুরু!

কালান মসজিদ—ফিরোজ শাহ টোগলকের তৈরী। সোনেরী মসজিদ—রৌশন উদ্দৌলার তৈরী। এই মসজিদের মধ্যে বসে নাদির শাহ দিল্লীর ভীষণ নর-হত্যা দেখে আনন্দে স্ফীত হয়েছিলেন। চাঁদনী চকের কাছে ফতেপুরী মসজিদ শাহ জাহান বেগমের তৈরী। আর একটি ছোট মসজিদ আছে দেখবার মত—সে মসজিদের নাম জিন্নৎ উন্নিসা বেগমের মসজিদ। জিন্নৎ ছিলেন বাদশা ঔরংজীবের কন্যা।

তার পর সমাধি। সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য হুমায়ুনের সমাধি। এই সমাধি হুমায়ুন-পত্নী হামিদা বেগম তৈরী করান। এই বিস্তীর্ণ সমাধি-মন্দিরে হুমায়ুন, হুমায়ুন বেগম হামিদা বানু ও হুমায়ুনের অন্য পুত্র-কন্যাদের সমাধি আছে। এই সমাধি-মন্দিরের এক কক্ষে শেষ মোগল বাদশা মহম্মদ শাহ এসে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে লুকিয়ে ছিলেন; শেষে এই ঘরেই তিনি ইংরাজের হাতে আত্ম-সমর্পণ করেন। অদৃষ্টের এমনি বিধান! যে হুমায়ুন ভারতে মোগল-শক্তির প্রতিষ্ঠা করেন, সেই হুমায়ুন এ মন্দিরে শেষ শয়নে চির-নিদ্রায় অভিভূত, সেই মন্দিরেই মোগল-শক্তির বিসর্জ্জন হলো! হাসি ও অশ্রুর, আনন্দ ও শোকের এমন মিলন বুঝি কল্পনা-তীত!

এই সমাধির দক্ষিণ দিকে একটু দূরে আরো দুটি সমাধি-মন্দির আছে। একটির নাম নীল বুরুজ। শুনলুম, সেটি হুমায়ুন বেগমের চুড়িওয়ালীর কবর; তার পাশে আর একটি সমাধি আছে, গাইড বললে, সেটি হুমায়ুনের নাপিতের সমাধি। তার পর উল্লেখযোগ্য সফদরজঙ্গ, রিজিয়া বেগমের কবর ও নিজামুদ্দিন।

নিজামুদ্দিন ফকির; বাদশা আলাউদ্দিন খিলিজি ছিলেন তাঁর শিষ্য। মুসলমানরা নিজামুদ্দিনকে খুবই শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন। এঁর সমাধি আর মসজিদ চতুর্দিকে মস্ত প্রাচীর-বেষ্টিত গৃহের মত। এই গৃহে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাধি আছে। এ মন্দিরে ঢুকে প্রথমেই দেখি, মস্ত একটি কূয়া বা বাউলি; কূয়াটি লম্বে ১২০ হাত, চওড়ায় ৮০ হাত। জল আছে ৩০ হাত গভীর। এ কূপ নিজামুদ্দিনের আমলের—কূপের জলের বর্ণ গাঢ় সবুজ। এই সমাধি-গৃহের খিলান-দেওয়া পথের ডান দিকে গম্বুজওয়ালা একটি ঘর। সেই ঘরের ছাদ থেকে অনেক লোক আট আনা পয়সা নিয়ে কূপের মধ্যে ঝাঁপ খেয়ে নিজেদের সাহস আর শক্তির পরিচয় দেয়।

খিলান-দেওয়া যে পথের কথা বলেছি, সেই পথের পরেই প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণে নিজামুদ্দিনের সাহেবের সমাধি; শ্বেত পাথরে তৈরী—ধূপের গন্ধে সারাক্ষণ মশগুল। সমাধির দেওয়ালে নানা কারুকার্য্য, এই গৃহের প্রাঙ্গণের একধারে শাহজাহান-কন্যা জাহানারার সমাধি। চারিপাশে জাফ্‌রি-দেওয়া শ্বেত পাথরের দেওয়াল। সমাধিতে কোনো কারুকার্য্য নেই, আড়ম্বর-হীন। শ্বেত পাথরে লেখা আছে—"আমার কবরের উপর কোনো মণি-রত্ন আভরণ চাপিয়ো না! শাহজাহান-কন্যা দীন জাহানারার কবরের উপর তৃণগুচ্ছই যোগ্য আবরণ!"

এগুলি ছাড়া আরো বহু সমাধি এ মন্দিরে আছে। তার মধ্যে মহম্মদ শাহের স্ত্রী, শাহজাদা মির্জ্জা জাহাঙ্গীর ও কবি খশরু—এঁদের কবরগুলিই উল্লেখযোগ্য। এখানে ছোট একটি জলাশয় আছে। মুসলমানরা বলেন, এ জল মন্ত্র-পূত। মানসিক করে এ জল পান করলে বা স্পর্শ করলে দুরারোগ্য রোগও নাকি আরাম হয়! নিজামুদ্দিনের দক্ষিণে চৌষট্টি থাম্বা—মির্জ্জা আজিজের সমাধি।

সফদরজঙ্গ ছিলেন অযোধ্যার নবাব-বংশের পূর্ব্বপুরুষ। এঁর সমাধি-মন্দিরটি হুমায়ুনের সমাধির অনুকরণে নির্ম্মিত। সফদরজঙ্গ, হুমায়ুনের কবর, নিজামুদ্দিন—এগুলি দিল্লী সহরের বাহিরে, কুতবে যাবার পথে। এই পথেই যন্তর-মন্তর—জয়পুরের রাজা জয়সিংহের তৈরী মান-মন্দির। জয়সিংহের মৃত্যু হওয়ায় এটি সম্পূর্ণ গড়ে ওঠেনি। জাঠেরা এই মন্দিরের অনেক জিনিষ লুট-পাট করে নিয়ে গেছে।

কুতব হলো দিল্লী থেকে সাত মাইল দূরে। কুতব মিনার তৈরী করান কুতবুদ্দিন। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে গড়ন সুরু হয়, শেষ হয় ১২২০ খৃষ্টাব্দে। সুলতান আলতামাস তখন দিল্লীর সিংহাসনে।

মিনারটি পাঁচতলা। সব তলাগুলি সমান উঁচু নয়। কেউ বলেন, এর খানিকটা তৈরী করান পৃথ্বীরাজ; তাঁর রাণী এর উপর থেকে যমুনা দর্শন করতেন। তার পরে কুতবুদ্দিন একে আরো উঁচু করে; গড়েন এর চূড়ায় ওঠবার সিঁড়ি আছে—সিঁড়ির সংখ্যা ৩৭৯টি। সর্ব্বোচ্চ তলাটি ভূমিকম্পে পড়ে গেছে। এখন সে জায়গা লোহার রেলিংয়ে ঘেরা।

কুতব-মিনারের কাছেই কুতব মসজিদ। আশে-পাশে বহু সমাধি। মসজিদটি তৈরী হয়েছে পৃথ্বীরাজের রাজপ্রাসাদ আর মন্দির ভেঙ্গে, তারই উপর। মসজিদ

...লে এখনো শ্রীকৃষ্ণের জীবন-লীলার নানা
...দী আছে।
...ই মসজিদের প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে প্রসিদ্ধ লৌহ-
...স্তম্ভটি নিরেট লোহার। স্তম্ভের অঙ্গ এখনো এমন
... আর উজ্জ্বল যে, দেখলে মনে হয়, সগু তৈরী হয়েচে।
...যে লেখা ক্ষোদা আছে, তা থেকে জানা যায়, দ্বিতীয়
...দপাল ১০৫২ সালে দিল্লী নগর প্রতিষ্ঠা করেন।
...দার বলেন, এ স্তম্ভটি পাণ্ডবদের আমলের। কিন্তু
...গায়ে ক্ষোদা আছে,—এই পৃথিবীর অধিপতি চন্দ্র···
...পাদ গিরিতে বিষ্ণু-ধ্বজ ওড়াবার জন্য এই সুবৃহৎ
... তৈরী করান।

দিল্লীর এই বিবিধ প্রাসাদ-ভবন, সমাধি-মন্দির, ...জিদ প্রভৃতির মধ্যে বিভিন্ন যুগের শিল্পকলার এমন ...কৃষ্ট রেখা আজো বর্ত্তমান আছে যে, তা উপভোগ ...রবার মত। আদি পাঠান-যুগের শিল্পকলার নমুনা ...ই—কুতব মিনারে আর কুতব মসজিদে; আলতামাসের ...মাধি, আলাই দরোয়াজা—(এটি কুতব মিনারের ...ক্ষিণে; আলাউদ্দিন খিলিজির তৈরী); খিজরী বা ...মাৎখানা মসজিদে (নিজামুদ্দিন)। মধ্য-পাঠান-...গের শিল্পকলার পরিচয় পাই, টোগলক খাঁর সমাধি, ...লান মসজিদ, কদম সরিফে (ফিরোজ শাহার পুত্র ...শাহজাদা ফতেখাঁর সমাধি); হৌজখাঁর সমাধি ও ...নিজামুদ্দিনে। শেষ পাঠান-যুগের শিল্পকলার নিদর্শন —সৈয়দ ও লোদি-বংশীয় বাদশাহদের সমাধিতে; পুরানো কেল্লা ও মসজিদে; জুমালি মসজিদ ও ঈশাখাঁর সমাধিতে। আদি মোগল-যুগের শিল্পকলার নিদর্শন—হুমায়ুনের সমাধি, আজমখাঁর সমাধি। মধ্য-যুগের মোগল শিল্পকলা—দিল্লীর দুর্গ ও প্রাসাদ, জুমা মসজিদ ও ফতেপুরী মসজিদ; আর শেষ মোগল-যুগের শিল্পকলার নিদর্শন হলো,—জিন্নৎ বেগমের মসজিদ, মোতি মসজিদ, সোণেরী মসজিদ ও সফদরজঙ্গ।

দিল্লীতে ক'দিন থেকে ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভোরে ৪৷৷০টায় আমরা দিল্লী ছাড়লুম। দিল্লী ছাড়বার পূর্ব্বক্ষণে দুখানি গাড়ীতে ১৪ টিন পেট্রোল ভরা হলো।

সমস্ত সহর তখন নিস্তব্ধ, আমরা আলিপুর রোড ধরে কর্ণালের পথ নিলুম। সহর পেরিয়ে পথের দুধারে পেলুম প্রশস্ত মাঠ—উল্টো দিক থেকে মাল-পত্র বয়ে সার-সার মোষের গাড়ী আসছিল;—গাড়োয়ানগুলো মোষের দড়ি হাতে দিব্যি ঘুমুচ্ছে। মাঠের বুকে মাঝে মাঝে মাটীর ঢিপি,—সেকালের কত সমাধি, কত কীর্ত্তিরই না জানি ধ্বংস-স্তূপ! শোণ-পথে (দিল্লী থেকে ২৭ মাইল) এসে বেলা ৭-২৫ মিনিটে ৪১৩১ নং গাড়ীর ... হলো। এই দীর্ঘ যাত্রা-পথে এই

আমাদের প্রথম ব্রেক-ডাউন। তখনি দোসরা চাকা পরানো হলো। ইতিমধ্যে সকালে জলযোগ সেরে ...

শোণপথ তারি একটি। বাকীগুলির নাম পাণিপথ, বাঘপথ, ইন্দ্রপথ ও তিলপথ। ইন্দ্রপথ হলো ইন্দ্রপ্রস্থ।

জলযোগান্তে দেখি, পথে উটের সার চলেছে দিল্লীর দিকে। লোভ হলো উটে চড়ি। একজন চালককে ডেকে অভিপ্রায় জানালুম। সেলাম করে তখনি সে ব্যবস্থা করলে! উটে চড়ে তার ছবি নেওয়া হলো। উটওয়ালাকে কিছু বখশিস দিয়ে বেলা ৮-৬ মিনিটে আবার যাত্রা সুরু।

একটু পরেই পাণিপথ পৌঁছুলুম। ফকির কালন্দরের সমাধি আছে এখানে। এই ফকিরের সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। ফকির যেখানে বসেছিলেন, যমুনার জল নাকি সেখানে স্রোতে উচ্ছ্বসিত হয়ে আসে। ফকির যমুনাকে আদেশ করেন, সপ্তপদ পেছিয়ে যেতে! নদী ভয়ে সপ্তপদ পেছুতে একেবারে সাত মাইল পেছিয়ে যান!

এই পাণিপথে বড় বড় যুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করেচে। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বাবর ও ইব্রাহিম লোদির যুদ্ধ হয়—সে যুদ্ধে পাঠান-বংশের উচ্ছেদ আর মোগল-বংশের অভ্যুত্থান ঘটে। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে এইখানে হিমুর পরাজয় ঘটে আকবরের সুশিক্ষিত বাহিনীর হাতে; তার পরে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে আফগান আহমদ শাহ দুরাণির হাতে মারহাট্টার পরাজয় হয় এইখানেই।

পাণিপথের পর কর্ণাল। কর্ণাল খুব প্রাচীন সহর। কিম্বদন্তী, মহাভারতের যুগে কর্ণরাজা এই সহর প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিহাসের যুগে দিল্লী-প্রবেশের পূর্ব্বাহ্নে এই কর্ণালেই তৈমুর লঙ প্রথম বিশ্রাম গ্রহণ করেন। আর ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে এই কর্ণালেই মোগল বাদশা আহম্মদ শাহ নাদির শাহের কাছে যুদ্ধে পরাস্ত হন। তার পর ঝিন্দের রাজা গুরদিৎ সিং কর্ণাল অধিকার করেন এবং কর্ণাল বহুকাল মহারাষ্ট্র-অধিকারে থাকে; পরে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ অধিকার-ভুক্ত হয়। এই কর্ণালে কাবুলের আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁকে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে রাজ-বন্দী করে রাখা হয়। তার পর তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়।

কর্ণালে বহু হিন্দু-মুসলমানের বাস; হিন্দুর সংখ্যাই বেশী। কর্ণাল থেকে ৩৫ মাইল দূরে দৃষদ্বতী নদী পার হয়ে কুরুক্ষেত্র-থানেশ্বর। দৃষদ্বতী এখন বালির রেখা। দুধারে শুধু ধু-ধু মাঠ—কোথাও বা বন-জঙ্গল। এইখানেই মহাভারতের বিরাট যুদ্ধ হয়। এইখানেই সাহাবুদ্দিন ঘোরীকে পরাভূত করেন হিন্দু-রাজা পৃথ্বীরাজ (১১৯২ খৃষ্টাব্দে)।

রেলওয়ে ষ্টেশনের এক মাইল পশ্চিমে ব্রহ্মসর—প্রকাণ্ড হ্রদ। এটি হলো মহাভারতের সেই দ্বৈপায়ন হ্রদ। হ্রদটি এক মাইল লম্বা, আধ মাইল চওড়া—দুধারে বিস্তর ঘাট। ঘাটের অবস্থা জীর্ণ-প্রায়। ঋগ্বেদেও এই হ্রদের উল্লেখ আছে। এ হ্রদে wild fowls wild ducks প্রচুর—কিন্তু মারবার উপায় নাই। হ্রদের জল অপরিষ্কার। চারিধারে বহু প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংস-স্তূপ, মাঝখানে দ্বীপের মত একটা জায়গা। সেখানে শিবের মন্দির আছে। শুনলুম, ছত্রপতি শিবাজী না কি এ মন্দিরটি তৈরী করিয়ে দেন! এই মন্দির-সংলগ্ন জায়গাটুকুর নাম ধর্ম্মক্ষেত্র। আর্য্যজাতি এইখানে এসে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন। এইখানেই হিন্দুত্বের প্রথম প্রভাত-উদয়! এখানকার বন-ভবনেই প্রথম প্রচারিত জ্ঞান-ধর্ম্ম কত পুণ্য-কাহিনী! এ জায়গাটি হলো কুরুক্ষেত্রের ঠিক মাঝখানে। কুরুক্ষেত্রের পর সরস্বতী নদী। সেটি এখন শুধু বালির রেখায় পর্য্যবসিত। অম্বালার কাছে সরস্বতীর অঙ্গ বর্ষাকালে জলে ভরে ওঠে! এখানে তাঁর অবস্থা বর্ষাকালেও শোচনীয় থাকে।

কুরুক্ষেত্রে দেখলে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, লাল মসজিদ ও শেখ চিলির কবর আছে! এখানে সরস্বতী নদীর সঙ্গে মিশেছে মার্কণ্ড নদ—নদের অঙ্গ বালির রাশিতে ভরা।

কুরুক্ষেত্রে মন উদাস হয়ে উঠলো। গীতার প্রথম ছত্র বার বার মনে পড়তে লাগলো—

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়॥

মৌন মূক দাঁড়িয়ে আছে গাছ-পালা···মূক ঐ পথের ধূলা···একদিন অশ্বরথ-চক্রে গজ-পদক্ষেপে পথের এ ধূলারাশি কি বিপর্য্যস্তই না হয়েছিল! কুরুক্ষেত্র আজো হিন্দুর মহাতীর্থ।

কুরুক্ষেত্রে থানেশ্বর থেকে এক পথ গেছে সাহারাণপুর। এই পথে সাহারাণপুর হয়ে রুড়কি যাওয়া যায়। থানেশ্বর ছেড়ে আমরা সোজা উত্তরমুখে চললুম। রৌদ্র তখন বেশ তপ্ত হয়ে উঠেছে। পাঞ্জাবী রৌদ্র! আর পথে ধূলাও তেমনি! আশে-পাশে ক্ষেতগুলার দিকে চেয়ে দেখি, গরমে মাটী যেন ফুটি-ফাটা হয়ে রয়েছে! পথের ধারে মাঝে মাঝে persian wheel অর্থাৎ কুয়া। এই কুয়ার উল্লেখ আছে ঋগ্বেদে। ঋগ্বেদে এর নাম অশ্বচক্র। ইংরাজীতে persian wheel হলো কি করে, গবেষণার বিষয়! কুয়াগুলির বৈশিষ্ট্য আছে। সমতল ভূমির একটা জায়গায় মস্ত গহ্বর—আর সেই গহ্বরের সামনে কলুর ঘানির মত একটা কাঠ আছে; সেই কাঠের সঙ্গে একটা খুঁটি জোড়া। খুঁটির গায়ে লম্বা দড়িতে বাঁধা এক প্রকাণ্ড চাকা। সেই চাকায় কুড়ি-পঁচিশটা টিনের মগ নয় তো মাটীর ভাঁড় কাৎকরে বাঁধা, একেবারে ঘেঁষা-ঘেঁষি। ঘানির লম্বা কাঠটা গরু দিয়ে টানা হয়। একজন মানুষও সেটা টানতে পারে। সে টানে চাকাটা কুয়ার মধ্যে চলে যায়, আর সেই টানে চাকাটা ঘুরতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে মগের পর মগ জলে ভরতি হয়ে উপরে ওঠে। দেখতে বেশ মজার।

এই দীর্ঘ পথ রৌদ্র আর ধূলা খেয়ে এসে পেলুম শাহাবাদ। শাহাবাদে বিশেষ কিছু বৈচিত্র্য দেখলুম না। থাকলেও তা দেখবার জন্ম অপেক্ষা করা পোষালো না। বেলা দশটা বাজে—রোদ ঝাঁঝাঁ করছে, কোন-মতে মাথায় জল ঢালতে পারলে বেঁচে যাই—অবস্থা তখন এমন! কাজেই দ্রুত গাড়ী চালিয়ে এগিয়ে চল-লুম। ১০-১৫ মিনিটে পেলুম অম্বালা। বাঁয়ে রেল-ষ্টেশন! ধূলি-ধূসরিত হয়ে ষ্টেশনের হিন্দু রিফ্রেশমেণ্ট রুমে এসে খাবার ব্যবস্থা করতে বলে আমরা সোজা গেলুম, ওখানকার পাঞ্জাব মোটর এণ্ড ক্যারেজ-ওয়ার্কসে। ষ্টাফ রোডের উপর তাদের মস্ত কারখানা। সেখানে গিয়ে দুখানি গাড়ীতে নয় টিন পেট্রোল আর দুই টিন মোবিল অয়েল (বি) ভরতি করা হলো। এখানে পেট্রোলের দাম পড়লো টিন [illegible] ৩৸৵ করে; আর মোবিল অয়েল ৫৸৹ করে। যে টায়ারের টিউবটা ফুটো হয়েছিল, এদের কারখানায় সেটা জোড়াতালি করা হলো। তখন রৌদ্রের তাপে কান মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করছে! প্রাণ যাবার জো! ওখান থেকে ফিরে অম্বালা রেলোয়ে-ষ্টেশনে আশ্রয় নিলুম। ওয়েটিং-রুমে ঢুকে জল পেলুম প্রচুর। মুখ-হাত ধুয়ে ফ্রেঞ্চ-বাথ সেরে নিলুম, তার পর হিন্দু রিফ্রেশমেণ্ট-রুমে ঢুকলুম আহার করতে। রান্না চমৎকার—বিশেষ মাছটা তারিফের যোগ্য। খাওয়ানোয় এদের যত্ন-আত্যিও খুব। খাওয়া হলে রেলোয়ে প্লাটফর্ম্মে এলুম। প্লাটফর্ম্মে দু-একজন বড় মিলিটারী অফিসারের সঙ্গে আলাপ হলো। কলকাতা থেকে মোটরে সস্ত্রীক সব কাশ্মীর চলেছি শুনে তাঁরা খুব তারিফ করলেন। একজন বললেন, আমার হিংসা হচ্ছে! ইচ্ছা করছে, আপনাদের দলে ভিড়ে যাই। তাঁরা পথ সম্বন্ধে খুব ভরসা দিলেন, বললেন, পথ খুব চমৎকার! তবে অম্বালার খানিক আগে একটু হুঁশিয়ার হ'তে হবে। কারণ, সোজা পথ গেছে একেবারে কালকায়; আর বাঁয়ে রেল-লাইনের উপর পুল পার হয়ে যে পথ, সেই পথে গেলে সোজা অমৃতসরে গিয়ে পৌঁছুবো!

অম্বালায় অম্বা দেবীর মন্দির আছে। কেউ বলেন, তাঁর নাম থেকেই জায়গার নাম অম্বালা; আবার কেউ বলেন, অম্বা নামে এক রাজপুত এই প্রদেশ প্রতিষ্ঠা করেন। অম্বালা ক্যাণ্টনমেণ্ট-ষ্টেশন:—এখানে ব্রিটিশ

ফুল ও কাঁটা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

মানসী

প্রথম তোমারে হেরিনু যখন—
রবির প্রখর আলো
তোমার শান্ত সুন্দর ছবি
দেখিতে দ্যায়নি ভালো!
সহস্র আঁখি কৌতুক-ভরে
চেয়েছিল সখি, তব মুখ'পরে—
জানি না কি ভাব করিয়াছে পাঠ
তোমার নয়নে কালো!
কোন্ সুদূরের গীতি সুমধুর,
কত না ছন্দ, কত নব সুর
তব কেশপাশ ঘিরিয়া ঘিরিয়া
কত কথা বলে গেল!

জানি না, তাহারা পেয়েচে কি সখি,—
আমি যে পেয়েচি কত—
কেমনেতে তাহা বুঝাবো তোমায়
কি রতন শত-শত!
কি যে সরলতা নয়নের মাঝে,
কি পবিত্রতা চারিধারে রাজে
—মধুর গন্ধ কুসুমে বেড়িয়া
রহে যথা অবিরত!
প্রথম তোমার দৃষ্টি-পরশে
বাক্‌হীন আমি, মৌন হরষে!
কোন্ দেবী আসি নিমেষে হরিল
মলিন বাসনা যত!

মৃদু হাসি হেসে তুমি গেলে চলি'
চমক ভাঙ্গিল মম!
হা রে অভাগ্য, ফুরালো নিমেষে
মহাস্বপ্ন অনুপম!

কি যে হিল্লোল উঠিল চমকি—
হীরার মতন ঝমকি-ঝমকি—
নড়িয়া উঠিল যবে দেহ-লতা
সুকোমল মনোরম!
মানস-প্রতিমা এসেছিল দ্বারে—
হা রে আঁখিহীন, চিনিলি না তারে!
হাতের নাগালে পাইয়া হারালি
অবোধ শিশুর সম!

মন, ওরে মন, নাহি আর আশা—
এ-কথা বলিল কে রে!
সে গেছে চলিয়া,—ছায়াটুকু তার
চোখে লেগে আছে যে রে!
সে ছায়া, সে মোহ কে দেয় ভাঙ্গিয়া?
আপন বক্ষ-শোণিত রাঙিয়া
করেছি তাহারে নিবিড়, গভীর
মুগ্ধ এ অন্তরে!
চিরদিনকার প্রীতি-আরাধনা,
সুগভীর ধ্যান আর উপাসনা
আনিবে, তাহারে আনিবে আবার
আমার গৃহের দ্বারে!

এবার যখন আসিবে ললনে,
এসো না তেমন করে—
কোলাহল-ভরা পথে এসো না কো
প্রখর রবির করে!
এসো অতি মৃদু নীরব চরণে,
জনহীন পথে বিরলে গোপনে,—
সন্ধ্যার ঘন ছায়া-তলে এসো
এ দীন কবির দ্বারে!

যা কিছু আমার আছে আপনার—
স'পে দিব সব দু'হাতে তোমার—
তুমি রবে শুধু আপনার জন
নিখিল ভুবন'পরে!

বীণাখানি মোর তোমারেই দিব,
তোমারেই দিব সব—
সুখ-দুখ, মোর হাসি ও অশ্রু,
মৌনতা-কলরব!

ঘুমে-জাগরণে শয়নে-স্বপনে
রাখি নয়নের নিবিড় শাসনে
সঙ্গীত-ছন্দে মাধুরী তোমার
নিখিলের কাণে কব!

স্তম্ভিত সবে রবে বাকহীন—
ভুলিবে ধরার দুঃখ মলিন—
ভাসিবে মর্ত্ত্য বিপুল পুলক-
উচ্ছ্বাসে অভিনব।

ভবানীপুর, ১৩১০

পরিচয়

অসহ বিরহে চিনেছি তোমারে প্রিয়া,
চিনেছি কে তুমি, চিনেছি তোমারে ভালো!
পাশে ছিলে যবে, মিলনের মাঝ দিয়া
ছিলে দিবসের উদয়-অস্ত-আলো!
নিশীথে যখন মুদিত নয়ন, হিয়া—
বিমল স্বপন-বাতি সে তুমিই জ্বালো!

বেদনা নিবিড় জাগে, যবে দূরে রহ—
নিখিল বিশ্বে কালো যবনিকা নামে;
নিবে যায় আলো শেষ রশ্মির সহ;—
গাছে ঝরে ফুল,—পাখী-কল-গান থামে!

* * *

ফিরিয়াছ আজি, বহিছে গন্ধবহ,
নববসন্ত জাগে সুন্দর ঠামে!

ভবানীপুর, ১৩১৫

হৃদয়-লক্ষ্মী

কেন আজি ম্লান-মুখ? এমন কাতর?
কেন মেঘে ঢাকা দেখি হৃদি-শশধর?
কি হয়েছে? হা রে মোর আদরিণী রাণী,
বলেছি তোমারে রূঢ় অকরুণ বাণী?
চপল আমার চিত্ত তোমার বিহনে,
সুতীক্ষ্ণ স্ফুলিঙ্গ হায়, বুঝি-বা তাহারি
তোমার কোমল বুকে পড়েছে ঠিকারি!
মনে ভাবিয়ো না সখি, অমন উদার
বুঝিনি হৃদয়, প্রেম নীরব তোমার!
দগ্ধ বেদনায়'পরে স্নিগ্ধ শান্তি দিয়া
আমারে করেছো মুগ্ধ, বলি সত্য প্রিয়া!
সে কথা স্মরিলে আমি রহি বাকহীন,
—শ্রেষ্ঠ কাব্য তার পাশে নিষ্প্রভ মলিন!
ও বিশাল হৃদয়েতে প্রেম থাকে যদি,
কিসের অভাব মোর? মণি-রত্ন আদি
চাহি না! কোথায় তার মূল্য পড়ে থাকে?
প্রেমস্নিগ্ধ হৃদি মোরে ছায়া দিয়া ঢাকে!
এত ভালোবাসো মোরে—আমি কত হীন!
শুধিতে নারিব কভু এ প্রেমের ঋণ!
আমার বিশ্বাস—প্রিয়ে, সত্য কহি আজ
স্বরগের দেবী পায় তব পাশে লাজ!
কি আর কহিব বলো? যা-কিছু আমার
সকলি স'পেছি আমি ও-হাতে তোমার!
সর্ব্বস্ব তোমারে স'পি কি সুখ সে জানে—
যে তার সকলি স'পি দেছে ভগবানে!
শুধু কি প্রেয়সী তুমি? প্রীতিময়ী-সাজে
দেবী তুমি, স্বার্থভরা ধরণীর মাঝে।
স্বর্গের অমৃত দিয়া গড়া চিত্তখানি—
যেথা রহো, বহে সেথা পুণ্য-মন্দাকিনী।

ভবানীপুর, ১৩১৫

কাল

আজো তুমি ছিলে মোর এ হৃদয় ভরি
একমাত্র রাজ্যেশ্বরী! কাল যাবে চলে!
আমার কল্পনা-বধূ সঙ্গিনী-বিহীনা
কি নবসঙ্গীত রচি কোন্ মায়া-বলে
এ অভাব পূর্ণ করি ভুলাইবে মোরে?
ভুলাবে? ভুলিব আমি? না, না, মিছা কথা-
তুমি ভালো জানো, কত শান্তি, কত সুখ,
কত প্রেম,—সে তো সখি, নহে দুর্ব্বলতা!

সব লয়ে যাবে আজ হে নিষ্ঠুরা নারী?
কিছু রেখে যাও হেথা—কিছু হাসি-গান,
কিছু কথা; তারি বলে বাঁধিয়া হৃদয়
তোমারি স্মৃতিতে মুগ্ধ সুখদীপ্তিমান
অতীত মিলন-কথা নবছন্দে গাঁথি,
যাপিব তোমারি ধ্যানে বিরহের রাতি।

অপ্রতিভ

আমায় তুমি ভালো বাসবে খুব—
এমন কথা বলছি না কো ঠিক !
তা যতই তুমি মান করো না সখি,
যতই কেন তাকাও দিক-বিদিক্ !
কথা আমার বুঝতে যদি চাও,
বলছি ঠিক,—এবার মেনে নাও—
বাড়ানো এর নয়কো একটাও,
কিম্বা আগাগোড়া এর অলীক !

বলছি আমি, চাঁদের আলোয় যবে
কাননখানি হাসবে মৃদু-মধু—
ডাকবে দোয়েল, ছাদের 'পরে বসি
চাঁদের পানে তাকিয়ে রবে বঁধু—
মৃদু চরণ-শব্দ পাশে শুনে,
অবগুণ্ঠন দিয়ো নাকো টেনে—
হাসির আভাস জাগিয়ে অধর-কোণে
পাশে ঈষৎ চেয়ে দেখো শুধু !

বলছি আমি,—তরুণ ঊষার আলো
পূব-আকাশে ফুটবে যবে ধীরে—
মুক্ত অলক শিথিল ঝর-ঝর,
বসবে এসে বাতায়নের তীরে !
পথের পথিক চাইলে সেদিক-পানে,
উঠে যেন যেয়ো না সেই ক্ষণে—
ঈষৎ বাঁকা কটাক্ষ-ঈক্ষণে,
দেখো চেয়ে সে-পথিক কি করে !

ভালো তুমি বাসবে আমায় অনেক—
এমন কথা আমি বলছি না কো !
তা আঁখি তোমার হোক্ সে রোষে রাঙা,
পরিহাসটা যতই করো না গো !
বলছি আমি দ্বিপ্রহরের কালে,
কপোত যখন ডাকবে আমের ডালে,
কালো নয়ন বারেক তবে তুলে,
ইঙ্গিতটা দিতে ভুলো না কো !

তার পরে হায় সন্ধ্যা হয়ে এলে
বসবে যখন দীঘির ধারে গিয়ে—
সন্ধ্যারাণী মন্দাকিনীর কূলে—

সে মর্মর যখন পাশে এসে
কাণে কাণে বলবো কথা হেসে—
লুব্ধ অধর অসংযমীর বেশে—
শাস্তি নেবো অধর-সুধা নিয়ে !

আবার যখন বিদায় নিয়ে যাবো—
মিনতিটি রেখো আমার সখি,—
মলিন মুখে দাঁড়িয়ে তরু-তলে
আমার 'পরে রেখো করুণ আঁখি !
আমার নয়ন হবে ছল-ছল,
তোমার চোখে ভরা অথির জল—
আসবো ফিরে, তখন ঢল-ঢল
মুখটি আমার বুকে রেখো ঢাকি !

তাহার পরে আবেগভরে ধরি
বাহুর বাঁধে, ব্যথায় করো দূর—
দোঁহার হিয়া হিয়ায় রবে গাঁথা—
সকল বাধা হবেই হবে চূর !
এর বেশী আর কিছু নাহি চাই,
তবু বলবে ভালোবাসাটাই—
ঘুরিয়ে নাকি আসল কথা ছাই—
চাইছি আমি নানান্ ছন্দ সুর !

দোহাই তোমার ! সরল মানুষ আমি—
এ অপবাদ হচ্ছে ভারী রূঢ়—
আমায় তুমি ভালোবাসবে খুব—
এমন কথা বলেছে কোন্ মূঢ় !
আমি চাই কি, তোমার অমল মনে
রই মিলনের নিবিড় আবরণে !
এ ছাড়া আর সত্য, হৃদয়-বনে
কোনো কথা নাইকো জেনো গূঢ় !

ভবানীপুর, ১৩১০

সফল সাধনা

তোমায় আমায় দেখা নিমেষের লাগি
সেই শ্যাম বনানীর মাঝে—
ভরা ভাদরের নদী কূলে-কূলে ভরা,
স্নিগ্ধ বায় বহে সেই সাঁঝে !
একধারে বসে আছি, আপনার মনে
গেয়ে যাই আপনার গান—
তুমি এলে অপরূপ রূপময়ী-বেশে—

আকুল আমার আঁখি বিস্ময়ে আবেশে !
এ কি হেরি অশরীরী মায়া !
কিম্বা সে সঙ্গীত মোর সুরে রচি তোলে
এ-সন্ধ্যায় রূপসীর ছায়া !
আমি গাহিবারে ছিনু,—"এসো সখি, এসো,
তুমি মোর পরাণের আলো !
তোমার হাসির দীপ এ আঁধার বুকে,
জ্বালো সখি, জ্বালো, ওগো জ্বালো !
মায়া নাই, প্রীতি নাই, নাই ভালোবাসা—
এ-জীবন ভরিব কি দিয়া ?
ছিন্নতন্ত্রী বীণা হাতে, কণ্ঠে নাই সুর—
এসো প্রাণে হে পরাণ-প্রিয়া !
ছায়া নামে গাঢ় হয়ে, রবি গেছে ডুবে—
আঁধার, আঁধার কালো-করা—
নয়নের দীপ্তি আলো, হাসির কিরণ জ্বালো
আনো আশা, ভাষা চিত্ত-হরা !"

আমি কি ভাবিয়াছিনু, এমনি করিয়া
আসিবে গো সাধনার ধন !
সফল, সফল আজ সঙ্গীত আমার—
ঘুচে গেল সকল বেদন !
মুগ্ধ আমি স্থির আঁখি,—তোমা'পরে নত,
এ রহস্য নারিনু বুঝিতে—
তুমি ধীরে মৃদু হাসি হাতে দিলে হাত,
কহিলে সে—কি সুর-সঙ্গীতে,—
"কেন এ করুণ সুর ? কেন বিমলিন আঁখি ?
কেন হায়, এত আকুলতা !
কি চাহো, কহো তা মোরে—বিজন গোপনে এই,
বলো, চিত্তে কি তোমার ব্যথা !
বাঁশী আর সুরে গানে পরাণ বিকল মোর—
শুধু সখা পড়িতেছে মনে,—
এমনি বাজিত বাঁশী, এসো, এসো, এসো বলি
সে-অতীতে দূর-বৃন্দাবনে !
হ.কুল লুণ্ঠিত রাধা, কেমনে রহিবে ঘরে ?—
নীপ-মূলে, যমুনার তীরে !
সে-ব্যথা বাজিল বুকে,—তোমার গানের সুর
যেমনি পশিল চিত্ত-নীড়ে !
তাই আসিয়াছি আমি,—এ ব্যাকুল সুর—
যুগে যুগে নারী তায় ভুলে—
আকাশ-বাতাস হের মিলন-আকুল ওই—
এ চায় উহারে ফুলে-ফুলে !"

বিস্মিত রহিনু আমি,—এতদিন পরে
প্রাণের সঙ্গীত-সুরে এসেছে, এসেছে পাশে
ঈপ্সিত সে—মোর কাম্যতম !
তার পরে মনে পড়ে, তুমি কি সোহাগ-ভরে,
নিলে মোরে ও বাহু-বন্ধনে—
হাতের সে মালাগাছি পরালে আমার কণ্ঠে
মুছে দিলে হিয়ার ক্রন্দনে !
বারেকের তরে আসি, সেই যে চকিতে সখি,
দিয়েছিলে যাহা একদিন,—
আর কি পাবো না তাহা ? আর কি আমার গান
জাগাবে না আর সে সুদিন ?
পরাণ মথিয়া আমি গাহিতে কি পারিব না
এ-প্রাণের যত কিছু কথা ?
তুমি কি বোঝো না সখি, কত না যতন করি,
কোথা তবে সেই সফলতা !

আজ পুনঃ আসিয়াছি সেই নীপ-মূলে,
সেই নদী ওই বহে যায়—
সেই বীণা ছিন্নতন্ত্রী, কণ্ঠে সেই গান,
কোথা তবে সে মিলন, হায় !
ওই সে আকাশ'পরে সেই চাঁদ উঠিয়াছে,
সেই ফুল, সেই তারা হাসে !
সেই পাখী আজো গায়—সেই পরিমল
আজো মধু বিলায় বাতাসে !
মনে হয়, মনে হয়, ওই যেন দেখিতেছি,
সেই দিঠি—সে দুটি নয়ন !
কাছে আসে, আরো কাছে—ওই যায় সরি,
হা-হা করে আকুল পবন !
আজ কি হলো না দয়া, হে আমার প্রাণময়ি
হে আমার হৃদয়ের রাণি,—
সেই মালাগাছি ছাখো শুকানো, আজিও তবু
বুকে দোলে—সেই স্মৃতিখানি !
তোমারি সে দেওয়া সুর, তোমার রূপের আলো
আজো আছে এ-হৃদয়-মাঝে,
আজ কি বিফল হবে এ মোর সাধনা সখি,
আজিকার এ মধুর সাঁঝে !

সেদিন যা পেয়েছিনু, আজ তা পাবো না কেন ?
আজ সখি কি হলো আমার ?
ভাদরের ভরা নদী ওই চলিয়াছে বহি,
ধু-ধু-ধু-ধু জলের বিথার !
তবে কি আমার সুর আজ এ অন্তর হতে
পায় নাই—অমৃত পরশ ?
তাই তা অন্তরে তব পশিতে না পারে আজ ?